বৈশাখ—১৩৫২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

গীতার কথা

শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় সমস্তই গীতার অবতরণিকা। দশ দিন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ হওয়ার পর যখন ভীষ্ম শর-শয্যায় শয়ান ছিলেন এবং কৌরব পক্ষের জয়াশা ক্ষীণ হইয়াছিল তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কুরু-পাণ্ডবেরা যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াই কি করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে সঞ্জয় বলেন যে, রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যকে বূ্যহবদ্ধ দেখিয়াই দ্রোণাচার্য্যের নিকট গিয়া উভয় পক্ষের সেনাপতিগণের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত আমাদের বল অপর্য্যাপ্ত এবং ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবগণের বল পর্য্যাপ্ত। অতএব আপনারা স্ব স্ব বিভাগে অবস্থান করিয়া ভীষ্মকেই রক্ষা করুন। এই সময় ভীষ্ম পিতামহ শঙ্খনাদ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং কৌরব পক্ষের রণবাদ্য সকল বাদিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবেরা এবং এই পক্ষীয়েরা দিব্যশঙ্খ সকল বাজাইলেন এবং অর্জ্জুন ধনুক তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ রাখ, আমি দেখি কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। অতঃপর সেনাদিগের মধ্যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবগণকে দেখিয়া তিনি পরম কৃপাবিষ্ট ও বিষাদগ্রস্ত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে এই আত্মীয় স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন ও রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং কাঁপিতেছে, মুখও শুকাইতেছে, হাত হইতে ধনুক খসিয়া পড়িতেছে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার চিত্ত যেন অত্যন্তই বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং আমি কুলক্ষণ সকল দেখিতেছি। স্বজনগণকে বধ করিয়া আমি বিজয়, রাজ্য ও সুখ চাহি না। আত্মীয় স্বজন বধে আমাদের কি লাভ হইবে? বরং ইহাতে আমরা পাপগ্রস্ত হইব। ইহাতে কুলক্ষয়, সনাতন কুলধর্ম্মের নাশে ও অধর্ম্মের আবির্ভাব হইবে। তখন কুলকামিনীগণ ভ্রষ্টাচারিণী হইবে এবং বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে। ইহাতে জাতিধর্ম্ম এবং শাশ্বত কুলধর্ম্মও নষ্ট হইবে। অতএব ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গলকর। এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। এই অধ্যায়ে এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য অধ্যায়ে যে সকল কথা উঠিয়াছে শ্রীভগবান্ গীতায় তাহারই সমাধান করিয়াছেন। গীতার ৭০০ শ্লোকের মধ্যে কেবল এই প্রথম শ্লোকটিই ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি। আর বাকী সমস্তই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে

বলিলেও—তন্মধ্যে তাঁহার নিজের উক্তি ৪০টি শ্লোকে এবং অর্জ্জুনের উক্তি ৮৪টি শ্লোকে আছে। বাকী ৫৭৫ শ্লোক শ্রীভগবানের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সমস্ত সৃষ্টি তত্ত্ব, প্রকৃতির কার্য্য ও তাহার মঙ্গলজনক অপরিবর্ত্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, মানুষের কর্ত্তব্য ও কি প্রকারে মানুষ 'মানুষ' হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহার উপায় সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া লিখিয়াছেন। অর্জ্জুনের উক্তি কেবল প্রশ্নে, প্রার্থনায় ও স্তব-স্তুতিতে পূর্ণ। সেই সমস্ত তত্ত্ব কথা শুনিয়া অবশেষে অর্জ্জুন ১৮।৭৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন যে তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ ও সন্দেহ দূর হইয়াছে, আমার জ্ঞান হইয়াছে, আমি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছি এবং আমি তোমার কথামত কার্য্য করিব। শ্রীভগবানের ও অর্জ্জুনের কথোপকথন শুনিয়া সঞ্জয়ের মনে যে ভাব হইয়াছিল তাহা তিনি গীতার শেষ পাঁচটি (১৮।৭৪-৭৮) শ্লোকে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই কথোপকথন অদ্ভুত ও রোমহর্ষণকারী। এই পরম গুহ্য যোগের বিষয় আমি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্বমুখে বলিতে শুনিয়াছি। তাহা স্মরণ করিয়া আমি প্রতি মুহূর্ত্তে হৃষ্ট হইতেছি। শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি। আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন সেই পক্ষে বিজয়, অভ্যুদয়, রাজশ্রী ও ধর্ম্ম সুনিশ্চিত। ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের, অর্জ্জুনের ও সঞ্জয়ের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে আর কোন কথা সরে নাই।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন ১।১; সঞ্জয়ের উত্তর ১।২-১৮।৭৮; দুর্য্যোধনের সৈন্য দর্শন ও বর্ণন এবং কৌরবগণের শঙ্খনাদ ও রণবাদ্য ১।২-১৩; পাণ্ডবগণের শঙ্খসমূহের নামোল্লেখ, ধ্বনি এবং তাহার ফল—১।১৪-১৯; অর্জ্জুনের সৈন্য দর্শন ১।২০-২৭; অর্জ্জুনের বিষাদ ও ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ১।২৮-৪৭

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—এই সঙ্কটকালে তোমার এই অনার্য্যজনোচিত, স্বর্গহানিকর ও অকীর্ত্তিকর মোহ কোথা হইতে আসিল? তুমি ক্লীব-ভাবাপন্ন হইও না। ইহা তোমাতে শোভা পায় না। হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। ইহার উত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন—'আমি পূজনীয় ভীষ্ম-পিতামহের ও আচার্য্যদেব দ্রোণের সহিত কিরূপে প্রতিযুদ্ধ করিব? যাহাদের বধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা সম্মুখে রহিয়াছেন। পৃথিবীর নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং দেবতাদিগের উপর আধিপত্য পাইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক শোক কি প্রকারে দূর হইতে পারে তাহা দেখিতেছি না। ইহার পর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'যুদ্ধ করিব না' বলিয়া নীরব রহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে অর্জ্জুনকে বলিলেন যে যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, আবার জ্ঞানের কথাও বলিতেছ। আমরা পূর্ব্বে ছিলাম না বা পরে থাকিব না—তাহা নহে। শরীরের নাশে শরীরে যিনি বাস করেন তাঁহার অর্থাৎ আত্মার নাশ কখনও হয় না। আত্মা অজ ও অমর। অতএব তোমার কাহারও জন্য শোক করার কারণ নাই। আর ধর্ম্মহানির কথা যাহা বলিতেছ, তাহাও ঠিক নহে, কারণ তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মযুদ্ধ করাই তোমার কর্ত্তব্য। যুদ্ধ না করিলেই তোমার অপযশ হইবে। যদি তুমি সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ কর, তাহা হইলে তোমার পাপ হইবে না। অতএব সর্ব্বপ্রকারেই তোমার যুদ্ধ করা উচিত, যুদ্ধ না করার কোন কারণই নাই।

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—২।২-৩।

অর্জ্জুনের উত্তর ২।৪-৯।

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর :—

জন্মান্তর বাদ ২।১১-১৩।

দেহ ও দেহী ২।১৬, ১৮-৩০

স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ২।৩১-৩৭

পাপ হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় ২।৩৮।

গীতার বিষয় জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌কে জানা প্রথম আবশ্যক। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ৪।৫-৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখন তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য নিজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কিরূপে হয় বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কর্ম্ম হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। কর্ম্ম ঠিকমত, নিয়ম মত না হইলেই অধর্ম্ম হয়। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কর্ম্ম করে। ইহাদের কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যেমন হাত দিয়া জনসেবাও করা যায়, আবার চুরি, ডাকাতি, খুন, ইত্যাদিও করা যায়। ঐ জন-সেবাই ধর্ম্ম আর চুরি, ডাকাতি, খুন করা অধর্ম্ম। কর্ম্ম করার জন্য হাত—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। হাত দিয়া ভাল কাজ করা বা মন্দ কাজ করা মানুষের ইচ্ছাধীন। এই নিমিত্ত মানুষ নিজ কর্ম্মের জন্য দায়ী। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগের সহিত অনেক প্রকারে আততায়ীতা করিয়াছিলেন, সেই কারণে রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। বংশের অত্যাচারও ভয়ানক হইয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়ায় সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুরাচারদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন।

পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্মের বিষয় তত্ত্বও জানেন তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় জীবের আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারে। তখনও শ্রীভগবান্

জীবের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া উহা নিবারণের ব্যবস্থা করেন। এই কথাটি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মঙ্গলময় ভগবানের প্রতি ভক্তি স্বতঃই আসে। মানুষ দোষ করিলেও তাহাকে তিনি ত্যাগ করেন না, তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবতারতত্ত্বের আরও কথা ৭।২৪-২৭ এবং ৯।১১-১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন।

৯।৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত মূর্ত্তিতে তিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। অতএব যিনি ব্রহ্ম তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মে ও ভগবানে কোন ভেদ নাই। জ্ঞানীর নিকট তিনি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, যোগীর নিকট তিনি চিদাত্মস্বরূপ পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান্।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে :—

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

ভগবানকে কেহ সগুণ কেহ নির্গুণ, কেহ সাকার কেহ নিরাকার নানা প্রকারে কল্পনা করেন। ভগবান্ নির্গুণ হইয়া সগুণ কিরূপে হইতে পারেন তাহা ১৩।১৪ শ্লোকে বলিয়াছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে গীতার শ্লোক :—২।১৭, ৮।৩, ৯।৪-৬, ১৩।১২-১৮, ১৩।৩০-৩৪, ১৪।২৭ ও ১৭।২৩-২৮ দ্রষ্টব্য।

সাংখ্য মতে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষই সংসারে আছেন। পঞ্চমহাভূতে গঠিত এই শরীরই ক্ষর পুরুষ এবং নির্ব্বিকার আত্মা অক্ষর পুরুষ। এই দুই পুরুষ ভিন্ন আর এক পুরুষ আছেন যিনি উত্তমপুরুষ পরমাত্মা এবং যিনি এই ত্রিলোক পালন করিতেছেন। যে হেতু ইনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম এই জন্য ইঁহাকে লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলা হয়। যে মোহহীন ব্যক্তি শ্রীভগবানকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার ভজনা করেন। শ্রীভগবান্‌কে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিলে আর জানিবার কিছু বাকী থাকে না। সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, দ্বৈত-অদ্বৈত ইত্যাদি সংশয় আর থাকে না। তিনি জানেন যে, ভগবান্‌ই নির্গুণ পরব্রহ্ম, তিনিই সগুণ বিশ্বরূপ, তিনিই সর্ব্বলোক মহেশ্বর, তিনিই লীলাবতার, তিনিই হৃদয়ে পরমাত্মা। সুতরাং সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারেই ভগবানের ভজনা করেন। এই সম্বন্ধে ১৫।১৬-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়ে ৮ হইতে ১২ শ্লোকে, নবম অধ্যায়ে ১৬ হইতে ১৯ শ্লোকে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে ১২ হইতে ১৫ শ্লোকে এবং অর্জ্জুনের প্রার্থনায় সমস্ত দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ আত্মবিভূতির কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

—আমি অজ, অনাদি ও লোক মহেশ্বর।

—আমি দেবতাদিগের ও মহর্ষিদিগের সর্ব্বপ্রকারে আদি।

—আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।

—আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, বায়ুগণের মধ্যে মরীচি, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, যক্ষ রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের, পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র।

—আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, জীবসকলের নিয়ন্তাদিগের মধ্যে যম, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, অশ্বদিগের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ধেনুদিগের মধ্যে কামধেনু, সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, নাগগণের মধ্যে অনন্ত।

—মহর্ষিদিগের মধ্যে আমি ভৃগু, সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি, মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে আমি উশনা কবি।

—সপ্তমহর্ষি, সনকাদি পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন ও চতুর্দ্দশ মনু আমার সঙ্কল্প হইতে জাত এবং আমার প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন॥

—শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি শ্রীরামচন্দ্র, বৃষ্ণিবংশীয়-গণের মধ্যে আমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয় অর্জ্জুন।

—নরগণের মধ্যে আমি রাজা এবং নারীগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা।

—পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড় এবং মৎস্যদিগের মধ্যে আমি মকর।

—বৃক্ষসকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ।

—আমি ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ। বেদ সকলের দ্বারা আমি বেদ্য। আমিই বেদান্তকৃৎ ও বেদবিৎ। সর্ব্ব বেদে আমিই পাবন প্রণব ওঁকার।

—বেদ সকলের মধ্যে আমি সামবেদ, সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম। ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী।

—অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার। সমাস সকলের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব। বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম-বিদ্যা। তার্কিকগণের কথাসমূহের মধ্যে আমি সদ্বিচার।

—আমি বেদবিহিত কর্ম্ম, আমি স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম, আমি শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ, আমি ওষধি জাত অন্ন বা ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি অগ্নি, আমি হোম, আমি হোমের ঘৃত।

—যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ।

—আমি পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ, জলে রস, অগ্নিতে তেজ, আকাশে শব্দ ও পাবক বায়ু।

—আমি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের মধ্যে রশ্মিযুক্ত সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে প্রভা ও তেজ তাহাও আমি। আমি উত্তাপ দান করি, জল আকর্ষণ করি ও পুনরায় বর্ষণ করি। আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ভূতকে শক্তির দ্বারা ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ওষধি সকল পুষ্ট করি। আমি জঠরাগ্নিরূপে সর্ব্বপ্রকার অন্ন পরিপাক করি। আমি সকলের হৃদয়ে বাস করি। আমা হইতেই স্মৃতি জ্ঞান এবং তাহাদের বিলোপ হয়।

—অচল পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়, পর্ব্বত সকলের মধ্যে আমি সুমেরু, জলাশয়সমূহের মধ্যে সাগর এবং নদী-সকলের মধ্যে আমি ভাগীরথী গঙ্গা।

—আমি সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ, ভূতসমূহের যাহা মূল কারণ তাহা আমি। চরাচর ভূত এমন কিছু নাই যাহা আমা ছাড়া হইতে পারে। আমি সর্ব্বভূতে জীবন, সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা। ভূতগণের মধ্যে চেতনা (জ্ঞানশক্তি) আমি। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন। আমিই ভূতগণের ধর্ম্মের অবিরোধী সন্তানোৎপাদক কাম। আমি সর্ব্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা।

—ভূতগণের নিম্নলিখিত ভাবগুলি আমা হইতেই উৎপন্ন হয়, যথা—(১) বুদ্ধি, (২) জ্ঞান, (৩) অসম্মোহ, (৪) ক্ষমা, (৫) সত্য, (৬) দম, (৭) শম, (৮) সুখ, (৯) দুঃখ, (১০) উৎপত্তি, (১১) বিনাশ, (১২) ভয়, (১৩) অভয়, (১৪) অহিংসা, (১৫) সমতা, (১৬) তুষ্টি, (১৭) তপ, (১৮) দান, (১৯) যশ, (২০) অযশ।

—সৃষ্ট পদার্থ সমূহের আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা, সংহর্ত্তা, ও স্থিতির হেতু। সংখ্যাকারিগণের মধ্যে আমি কাল। আমি অক্ষয় কাল, আমি সর্ব্বসংহারকারী মৃত্যু এবং ভাবিকালের প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণ। আমি সর্ব্বকর্ম্মফল বিধাতা ঈশ্বর।

—আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফল দাতা, পিতামহ। আমি গতি, পোষণ কর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভ দ্রষ্টা, আশ্রয়স্থল, রক্ষক, অযাচিত উপকারক, সৃষ্টিকর্ত্তা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং অবিনাশী কারণ। আমিই জীবন ও মৃত্যুস্বরূপ, আমি নিত্য অক্ষর আত্মা ও অনিত্য ক্ষর জগৎ।

—আমি বলবানের কামরাগ বিবর্জ্জিত বল, তেজস্বীদিগের তেজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, জ্ঞানবানের জ্ঞান ও তপস্বীর তপ। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আমা হইতেই জাত। প্রবঞ্চকগণের মধ্যে আমি দ্যূত ক্রীড়ারূপ ছল। আমি জয়, আমি অধ্যবসায়, দমনকারিগণের আমি দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের আমি নীতি এবং গোপনীয় বিষয়ে আমি মৌন।

—আমি আমার ভক্তগণকে সেই বুদ্ধিযোগ দান করি যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহার্থই আমি তাঁহাদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা অজ্ঞানজনিত মায়ারূপ অন্ধকার নাশ করি।

—আমার দিব্য বিভূতির শেষ নাই। সংক্ষেপে আমি ইহা বলিলাম। ঐশ্বর্য্যযুক্ত শোভাসম্পন্ন অথবা প্রভাব সম্পন্ন যে সকল পদার্থ আছে, সে সমস্তই আমার প্রভাবের অংশ হইতে জাত জানিও। সার কথা এই সমস্ত জগৎ আমিই আমার একাংশ মাত্রে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। শ্রীভগবানের বিভূতিসকল বারংবার পাঠ করিলে ও চিন্তা করিলে তাঁহার বিষয় যৎকিঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে। অর্জ্জুন এই অভিপ্রায়েই তাঁহার বিভূতির কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন। (আগামীবারে সমাপ্য)

শুক্লারাতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মাধবী-বল্লরী বুকে জ্বলিছে জোনাকি
অরণ্যের আঁখি
নভোতলে নিভৃতে ঝিমায়।
মৃদুমন্দ বায়

হিল্লোলিত। দোলে ছায়া তরু চিত্ত করিয়া হরণ,
চাঁদ যেন স্বপ্নভঙ্গ কবিতার প্রথম চরণ
ফেলে চলে দিগন্ত প্রসারী
হেরি আলো তারি।

পল্লী পথে মৌন যাত্রী সঙ্গীহীন চলি
শষ্পগুচ্ছ দলি'।

বিমানের কেন্দ্রস্থলী কাছে
শঙ্কা ঘিরে আছে
এ সুন্দর শুভ্রালোকে অগ্নিবর্ষী বোমা পড়ে যদি
নিরবধি এই ভাবি অদৃষ্টেরে জানায়ে প্রণতি।

এ রজনী পৌর্ণমাসী চিরদিন ধরে
মানব-অন্তরে
যৌবনের বাজায়েছে বাঁশী;
আজ সর্ব্বনাশী
পিশাচী সভ্যতা এসে দিল বাধা সৌন্দর্য্য সম্ভোগে।
অনন্তের স্তবগান স্তব্ধ এবে যন্ত্র যোগাযোগে।
ত্রস্ত পল্লী-নাগরিক প্রাণ,
কে করিবে ত্রাণ!

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

(উপন্যাস)

প্রথম অঙ্ক

অমল গরীবেরই ছেলে। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবের সহানুভূতি এবং বিধবা মা'য়ের স্বর্ণালঙ্কারের অবশিষ্ট অংশের উপর নির্ভর করিয়াই সে বি-এ পাশ করিয়াছিল কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা তাহার তবুও মিটিল না। যেমন করিয়াই হউক সে এম্-এ পড়িবে স্থির করিল। যাহারা সাহায্য করিয়াছিল তাহারা এখন সাহায্য করিবেন না, সে তাহা জানিত তবুও সে এম্-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া গেল। ভাগ্য তাহার প্রসন্ন, একটা টিউসানীও জুটিয়া গেল। বাড়ীর সামান্য জমি-জমা হইতে একমাত্র বিধবা মাতার একবেলার হবিষ্যান্ন জুটিয়া যাইবে—সে নিশ্চিন্ত মনেই পড়া আরম্ভ করিল।

সে গ্রামের ছেলে, সম্ভবতঃ সেই জন্যই তাহার কৌতূহলটা বেশী হইয়া থাকিবে—যাহারা স্বাধীনভাবে ট্রামে বাসে চলা ফেরা করে, এক বোঝা বই লইয়া কলেজে যাতায়াত করে তাহারা কিরূপ, তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ, তাহাদের মন কত উদার তাহা জানিবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল তাহার ছিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের দারিদ্র্য ও অক্ষমতার জন্য ভয়ও ছিল; কাজেই এম্-এ ক্লাসের সহপাঠিনীগণের সহিত আলাপ করিয়া উঠিতে পারে নাই। যাহারা সে ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সে শ্রদ্ধার চোখেই দেখিত—যাঁহারা এ সৌভাগ্য দান করিয়াছেন তাহাদিগকেও সে সমীহ করিত।

সকালের একটা ক্ষুদ্র ঘটনা সারাটাদিন কলেজে তাহাকে দুঃখ দিয়াছে, মনটা বার বার বিমর্ষ হইয়া তাহাকে সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই রাখিয়াছিল। এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া তাহার দারিদ্র্য, দৈন্য, অক্ষমতা আজ যেন হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তাহারা কশাঘাতের লাঞ্ছনায় তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিতেছে। ঘটনাটা সামান্যই—

সকালে পড়াইতে গেলে জনৈকা কুমারী মহিলা দরজা খুলিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজে তাহাকে আহ্বান না করিয়া, দ্বিতলে উঠিতে উঠিতে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ছাত্রের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—খোকা পড়তে যা, মাষ্টার এয়েছে।

মাষ্টার কথাটির পরে 'মহাশয়' ও এয়েছের পরে সামান্য অপরিসর একটি 'ন' যোগ করিলে এমন কোন ক্ষতি বা শ্রম তাহার হইত না, তথাপি এই দুইটির অভাব তাহাকে সারাটা দিন অশেষ লাঞ্ছনায় বিমর্ষ করিয়া দিয়াছে। একবার সে ভাবিয়াছে সম্মানই জগতে শ্রেষ্ঠ, অর্থের জন্য মনুষ্যত্ব বিক্রয় করা অপৌরুষ, অতএব ও টিউসান সে ছাড়িয়া দিবে। আবার ভাবিয়াছে—ওইটুকুই তাহার অবলম্বন, আজ সে ছাড়িয়া দিলে তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা, বিদ্যার্জ্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। একদিকে সম্মান, অন্যদিকে বিফলতা এই দুইএর সংঘর্ষ তাহাকে সর্ব্বকর্ম্মে আজ বিমনা করিয়া তুলিয়াছে।

ছুটির পরে একটু চা খাইয়া সে লাইব্রেরীতে কয়েকখানা বই লইয়া বসিয়াছিল কিন্তু কোন শাস্ত্র কোন লেখকই আজ তাহার ভাল লাগিল না। কিছুক্ষণ অকারণ পাতা উল্টাইয়া ক্ষণিক সময় কাটাইয়া সে বসিয়াই রহিল। পিছনের টেবিলে মহিলাগণ নানা কেতাব পাঠে ব্যস্ত—অন্যদিন কৌতূহলী সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাহাদিগকে সংগোপনে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, কিন্তু আজ তাহারাও তাহাকে কোনরূপেই আকর্ষণ করিতে পারিল না।

একটি শীর্ণা, তন্বী, সুন্দরী, তরুণী, কুমারী রোজই টেবিলের এককোণে বসিয়া, তাহার আয়ত চক্ষু মেলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরের মাঝে কি যেন খুঁজিয়া মরে। কদাচিৎ চোখ মেলিয়া চায়, পাখার বাতাস কপালের উপর কুঞ্চিত চূর্ণকুন্তলগুচ্ছ আন্দোলিত করে, কাণের দুলে আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করে। সে আসে যায়, উঁচু-হিল্ জুতার শব্দে আরও অনেকের সঙ্গে অমলের চোখেও স্বপ্নাবেশ বুলাইয়া দিয়া যায়। অমল জানে না কেন, তবুও এই মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগে—তাহার চেহারায় যেন একটা মাদকতা আছে, চলিবার বলিবার ভঙ্গির মধ্যে একটা উদার আভিজাত্য আছে—অথচ বেমানান চঞ্চলতা বা নিজেকে প্রাধান্য দিবার ব্যগ্র সচেষ্টতার দৈন্য নাই। অমল সংগোপনে, পড়িবার ফাঁকে ফাঁকে অন্য সকলের সঙ্গে তাহাকেই ভাল করিয়া দেখে।

নামটা লোকমুখে সে শুনিয়াছে—অত্যন্ত আধুনিক নাম—ডেজি। বিলাতী ফুলের নাম—কবির কাব্যের মারফতে আমাদের কাছে সুন্দর বলিয়াই মনে হয়।

অমল অকস্মাৎ বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন কিছুই আজ তাহার ভাল লাগিল না। নির্জ্জন সিঁড়ি দিয়া অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে সে নামিতেছিল—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, সিঁড়ির মাঝে একটিমাত্র আলো। কলেজে বিড়ি খাওয়া অশোভন—আশে-পাশে কেহ নাই দেখিয়া সে বিড়িই ধরাইয়া ফেলিল। কলেজের লোকসমক্ষে সে সিগারেটই খাইয়া থাকে।

আনমনে সে পুনরায় সকালের ঘটনাটাই ভাবিতেছিল—কুমারী মহিলাটি কি ইচ্ছাকৃতভাবেই তাহাকে অপমান করিয়াছে;—না 'মাষ্টার'কে তাহারা ঠাকুর চাকরের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া এইরূপেই সম্বোধন করিয়া থাকে—নিতান্তই অভ্যাস-প্রসূত!

বিড়ি নিঃসৃত একরাশ ধোঁয়া বাতাসে বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে স্বচ্ছতা ফিরিয়া আসিল—অমল আশ্চর্য্য হইয়া দেখে—ডেজি তাহারই পাশে পাশে অত্যন্ত নিঃশব্দে নামিতেছে—

বিড়িটার জন্য লজ্জিত হইয়াছিল কিন্তু ফেলিয়া দিয়া লাভ নাই—ডেজি নিশ্চয়ই দেখিয়াছে। সে লজ্জিত হইয়া সরিয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ ডেজি তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিল—আপনার নাম অমল বন্দ্যোপাধ্যায় ?

—হ্যাঁ।

—আপনি ইংলিশে ফার্স্টক্লাস পেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ। আপনি জান্‌লেন কেমন করে ?

ডেজি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়াই বলিল—'সংহতি'তে আপনার কবিতাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি কি আগেও লিখ্‌তেন ?

অমল হাসিয়া বলিল—লিখতাম, তবে তা ছাপা হয়নি—

ডেজি মৃদু হাসিয়া বলিল—ছাপাতে চেষ্টা ক'রেছিলেন কি !

—বিশেষ না।

—আপনি ত খুব পড়েন লাইব্রেরীতে—না ?

অমল মাথা চুলকাইয়া বলিল—বই সাম্‌নে ক'রে বসে থাকাই পড়া নয়, কাজেই ব'ল্‌তে হয় লাইব্রেরীতে অনেকক্ষণ থাকি—এই পর্য্যন্ত—

ডেজি হাসিয়া বলিল—আপনার বিনয় যথেষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু পড়াটা ত পাপ কার্য্য নয় যে তাকে অস্বীকার ক'রতে হবে—

অমল সংক্ষেপে বলিল—বলা বাহুল্য মাত্র—

অমলের হাতের মধ্যে জলন্ত বিড়িটা নিভিয়া গিয়াছিল, সে সেটাকে ফেলিয়া দিল। ডেজি মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনি বিড়ি খান ?

—অস্বীকার ক'রলে আপনি বিশ্বাস ক'রবেন না নিশ্চয়ই।

—কেন খান ?

—অভ্যাস—আপনার প্রশ্ন কি ? সিগারেট না খেয়ে বিড়ি খাই কেন ?

—হ্যাঁ।

অমল মিথ্যা কথা বলিল—খাই আমি চুরুট, কিন্তু এখানে চুরুট সেবনের সময় নেই—আর চুরুট বিনা সিগারেট বিড়ি উভয়েই সমান।

—তবে সিগারেট খেলেই ত পারেন, গন্ধটা তবুও সহ্য হয়।

অমল তাচ্ছিল্যের সহিত অভিনয় করিবার ভঙ্গিতে বলিল—That's meant for ladies.

ডেজি সিঁড়ির মাঝে অকস্মাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তার মানে ?

—মানে, অত্যন্ত নরম, নেশা হয় না।

আবার দুই জনেই শ্লথ মন্থর পদক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিতেছিল। অমল সহসা বলিল—মিস্ ডেজি—

ডেজি বলিল—আমার নাম ডেজি তা জান্‌লেন কি ক'রে ?

—লোক পরম্পরায় অবগত হ'য়েছি—

—আপনারা আমাদের সম্বন্ধে এতও খোঁজ ক'রতে পারেন ! আমার ডাক-নাম ওই কিন্তু আসল নাম অপর্ণা রায়—কিন্তু ডাক-নামটা সংগ্রহ ক'রলেন কি ক'রে !

অমল ডেজির এই ব্যঙ্গে আহত হইয়াছিল, সে জবাব দিল, —আমার নাম আপনি ঠিক যেমন ক'রে জান্‌লেন তেমনি ক'রেই জেনেছি।

ডেজি একটু হাসিয়া মুখের দিকে চাহিল—এরূপ জবাব সে প্রত্যাশা করে নাই। অমল প্রশ্ন করিল—আপনি অপর্ণা রায় ?

—হ্যাঁ কেন বলুন ত ?

—গেজেটে আমার নামটির ঠিক পরেই ওই নামটি ছাপা হ'য়েছিল কাজেই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, আর আজকে আপনার সঙ্গে এমনি অকস্মাৎ আলাপ হওয়াটাকে তাই একটা lucky coincidence ব'লে মনে হচ্ছে।

ডেজি একটু হাসিয়া বলিল—Lucky ?

ডেজি প্রগল্‌ভের মত ক্ষণিক হাসিয়া, ছোট্ট সুবাসিত রুমালে কপাল মুছিয়া বলিল—গেজেটে নামটা ঐ জায়গাটায় ছাপা হওয়াটাও তা হ'লে Lucky !

—আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল। অমল তাই প্রশ্ন করিল—আপনি ত ট্রামেই যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—চলুন। তুলে দিয়ে আসি—আজকার এই সামান্য পরিচয়ের পরে এটাকে কর্ত্তব্য বলে মনে ক'রছি।

—ধন্যবাদ।

ডেজিকে ট্রামে তুলিয়া দিয়া অমল হাটিয়াই মেসে ফিরিতেছিল। সকালের বেদনাদায়ক ঘটনাটা অকস্মাৎ যেন উবিয়া গিয়াছে। ডেজির প্রসঙ্গ তাহার অন্তরকে সুখ-স্বপ্নের সৌরভে সুবাসিত করিয়া দিয়াছে। অমল আনমনেই পথ চলিতেছিল—

এখনই ছাত্র পড়াইতে যাইতে হইবে—

মেসের সংকীর্ণ বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে তাহাই ভাবিতেছিল—পড়াইতে যাইবে কিনা! সকালের পুঞ্জীভূত অভিমান নৈরাশ্য ও অপমান যেন ডেজির অকূল সকালনে অন্তর্হিত হইয়াছে। ডেজির কথা কয়েকটি বার বার তাহার অন্তর অনবদ্য সুখাবেশে সুবাসিত করিয়া দিতেছে। মনে মনে সে প্রশ্ন করে —ডেজি এমন করিয়া সংগোপনে অতি অকস্মাৎ তাহার সঙ্গে আলাপ করিল কেন ? এতদিন ত কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নাই—তাহার মনে কি কোন দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছে ? প্রেমের দেবতা অন্ধ—হয়ত তাহাই।

সে বসিয়া বসিয়া তাসের ঘর নির্ম্মাণ করে—টালিগঞ্জের ছোট্ট একটি গৃহ, তাহার মাঝে গৃহবধূ ডেজি—প্রয়োজন হইলে দুইজনেই উপার্জ্জন করিতে পারিবে। এই ক্ষুদ্র গৃহের কর্ত্রী হইবেন তাহার অনশনক্লিষ্টা, দীর্ঘবৈধব্যের কৃচ্ছ্র সাধনে শীর্ণা মাতা। কোন অশুভ মুহূর্ত্তে তিনি অমলকে লইয়া বিধবা হইলেন, তাহার পর দুঃখে, দৈন্যে, অনশনে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজের গৃহ একদিন অকস্মাৎ ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হইয়াছিল, পুত্রের গৃহের মাঝে সে গৃহকে হয়ত ফিরিয়া পাইবেন—ডেজি হয়ত ধনী কন্যা, হয়ত এ কেবল বিলাস মাত্র, হয়ত সামান্য কৌতূহল মাত্র···কিন্তু অমল তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না—

সকালের সমস্ত দুঃখকে ভুলিয়া অমল হৃষ্টচিত্তেই ছাত্র পড়াইতে রওনা হইল—

দৈনন্দিন অভ্যাস মত কড়া নাড়িতেই একজন মহিলা দরজা খুলিয়া দিলেন। কালকার সেই উদ্ধত, অহঙ্কারী কুমারী মেয়েটি। অমল অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন—আসুন, খোকা মামাবাড়ী গেছে, একটু দেরী হবে বসুন—

অমলের কথা বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না। সে নিঃশব্দে পড়ার ঘরে ছারপোকাসঙ্কুল বেতের চেয়ারের উপর খবরের কাগজ পাতিয়া বসিয়া পড়িল। মহিলাটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে বলিলেন—একটু চা খাবেন কি?

অমল সংক্ষেপে বলিল—না থাক্।

—আপনিত ভারী লাজুক—চা না খেলে সময় কাটাবেন কেমন ক'রে?

অমল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল কালকের সেই মহিলাটিই, আজ তাহার মুখে চোখে একটা সকৌতুক প্রচ্ছন্ন হাসি রহিয়াছে। এ ব্যবহার যদি কেবলমাত্র অভিনয়ই না হয় তবে কাল দুইটি কথার জন্য ওই বাচনিক মিতব্যয়িতা না দেখাইলেও ক্ষতি ছিল না। অমল বলিল—প্রয়োজন নেই, তাই, নইলে এক আধ কাপ চা খেলে গুরুভোজনের কোন সম্ভাবনা নেই।

মহিলাটি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—আপনিত বেশ কথা বলেন। আপনি ত এম্-এ পড়ছেন?

—হ্যাঁ। কৌতূহল প্রকাশ করা অন্যায়, তাহ'লেও জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি খোকার দিদি?

—হ্যাঁ, খোকার দিদি। পরিচয়টা বিশেষ ক'রেই দি, নাম আমার রমলা। কি পড়ছি সেটাও জানতে চান নিশ্চয়ই? ···বি-এ পড়ি বেথুনে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন কি?

অমল মেয়েটির প্রগল্ভতায় আশ্চর্য্য হইয়াছিল, সে বলিল—এর পরে আর প্রশ্ন করা চলে না—তবে আপনি বলে গেলে শুনতে পারি—সেটা সম্ভবতঃ দোষের হবে না।

—আমার কমবিনেশন্ ইকনমিক্স, হিস্ট্রি, অনার্স প্রথমটায়, আমাদের সাত জনের অনার্স আছে, ক্লাসে একশ' ছাব্বিশজন মেয়ে। ডলি দত্ত দেখতে সবচেয়ে সুন্দরী···রমলা নিজেই অত্যন্ত অশোভন ভাবে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বসুন, চা নিয়ে আসি।

রমলা চলিয়া গেল—অত্যন্ত অহেতুকভাবে আঁচলটাকে দোলাইয়া নাচাইয়া কাঁধে ফেলিয়া এবং চলন ছন্দে অশোভন গতি ও ভঙ্গি দিয়া। অমল হাসিয়া ফেলিল। কাল ওঁর ব্যবহারে সে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, আজ ওর প্রগল্ভতা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। অমল আপনমনে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—ও হয়ত কোন পুরুষকে তাহার ঐশ্বর্য্য, রূপ ও বিদ্যাদ্বারা সম্মোহিত করিতে পারে নাই, তাই অভাগ্য মাষ্টারটিকে পাইতে চায় তাহার ভগ্ন-হৃদয় একান্ত উপাসক করিয়া। জীবনে আজই সে প্রথম দুইটি মহিলার সহিত পরিচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অমল একথা মনে মনে বিশ্বাস করিত যে, আধুনিক মেয়েদের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় হইতেছে এই যে, তাহার জন্য শতাধিক বুভুক্ষু নর উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের কবিতা লিখিতেছে। অমল নিজেই হাসিয়া ফেলিল—মিস্ রমলা যে পাত্রটিকে সেই গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন সে সে পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

মিস্ রমলা চাকরের মারফতে এককাপ চা ও একটি স্যাণ্ডউইচ্ আনিয়া বলিলেন—নিন্, এটুকুর সদ্ব্যবহার ক'রতে ক'রতে হয়ত খোকা এসে পড়বে—

অমল হাসিয়াই বলিল—আপনার আদেশ পালনের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবই।

মিস্ রমলা অকস্মাৎ অভিনেত্রীর মত কপট অভিমানে ওষ্ঠ উল্টাইয়া বলিলেন—এটাকে আদেশ মনে ক'রলেন, অনুরোধ কি ভদ্রতাও মনে ক'রতে পারতেন ত?

অমল স্যাণ্ডউইচে একবার কামড় বসাইয়া বলিল—আপনি ভুললেও আমার পক্ষে এটা ভুল করা সম্ভব নয়—আমি ত আপনাদের চাকরই—

মিস্ রমলা কথাটা শুনিয়া হয়ত আনন্দিতই হইয়াছিল—এ কি ব'লছেন মাষ্টারম'শায়, মানুষ মানুষই, টাকা দিয়ে কি তার বিচার হয়—

মাষ্টারম'শায় সম্বোধনটা অমলের পিঠের উপর যেন কশাঘাতের মত আসিয়া পড়িল। সে বলিল—মোটরগাড়ী চিরদিনই পথচারীর গায়ে কাদাজল ছিটিয়ে দিয়ে যায়, এর অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। আর মাষ্টার মশায়টা আমার পৈতৃক নাম নয়—বাপ-মা আমার একটা নাম দিয়েছিলেন—সেটা হচ্ছে অমল।

অমলের কথা কয়েকটির মধ্যে যে তীব্র ভর্ৎসনা ছিল তাহা না বুঝিয়াই মিস্ রমলা বিজ্ঞের মত ক্ষণিক বোকার হাসি হাসিয়া বলিলেন—আপনার নাম অমল, নামটি ত বেশ!

—আজ্ঞে বাপমায় যদি ঘণ্টাকর্ণ, বিকর্ণ ধরণের একটা নামও দিতেন তবে তাও আমার কাছে ভালই হ'ত।

খুব উচ্চাঙ্গের একটা রসিকতা হইয়াছে মনে করিয়া রমলা ক্ষণিক মুখে আঁচল দিয়া হাসিয়া লইলেন—আর বলিলেন—চা'টা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল যে!

অমল এতগুলি কঠোর কথা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল, তাই বলিল—আপনার অতিথি সেবার দিকে যা নজর দেখছি, তাতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি সেই অতিথি বলে গর্ব্বও বোধ করছি।

রমলা কি যেন ক্ষণিক ভাবিয়া বলিল—আপনি কবিতা টবিতা লেখেন না?

—আজ্ঞে ভুলক্রমেও না। আর যত অপবাদই লোকে দিক, এ অপবাদ কখনই কেউ দেবে না।

—কলেজের পত্রিকায়ও নয়?

—না।

—আপনার অনার্স ছিল কিসে?

অমলের অনার্স ছিল ইংরাজি সাহিত্যে এবং সে ফার্ষ্ট ক্লাসও পাইয়াছিল কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা বলিল—অনার্স অঙ্কে, পেয়েছি একটা কোনমতে সেকেণ্ড ক্লাস।

রমলা রসিকতা করিল—ও বাবা অঙ্ক! আপনি দেখছি একেবারেই কাপালিক—

অমল কহিল,—কাপালিক, তবে কপালকুণ্ডলাও নেই এবং নবকুমারেরও অভাব—

রমলা বিস্ফারিত আঁখি ভঙ্গিতে কৃত্রিম ব্যাকুলতার প্রলাপ

দিয়া ব্রীড়াভঙ্গিসহ বলিল—কে বলে, আপনি কবি নয়! কাপালিক প্রসঙ্গে যখন কপালকুণ্ডলার কথা মনে হয়—

—ওটা কাপালিকের কবিত্ব! সংসর্গে তা হ'তে পারে—

—জীবনে আমি কবিতা লিখিনি আপনার ভয় নেই—তবে কলেজের কাগজে, সকলে ধরলে তাই একটা কোনমতে লিখেছিলাম।

অমল আগ্রহের সহিত বলিল—কিন্তু, আপনাদের কলেজের কাগজ কোথায় পাই?

রমলা বলিল—ও আপনার ত ভারী কৌতূহল—আচ্ছা দেব একদিন প'ড়তে—

অমল মনে মনে হাসিতেছিল সন্দেহ নাই। রমলার স্বল্পবুদ্ধি-প্রসূত কথার মাঝে মাঝে তাহার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নগ্ন-প্রয়াস বেশ সুস্পষ্টভাবেই সে বুঝিতেছিল তাই বলিল—আমার মত কাপালিকের পক্ষে কবিতা বোঝা অবশ্য একটা অনৈসর্গিক ব্যাপার—তবুও আপনার লেখা ব'লেই তা পড়তে খুব কৌতূহল হ'চ্ছে। লেখক লেখিকাকে সামনে দেখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়!

রমলা এই প্রশংসাবাদে আরও অনেকের মতই খুশী হইয়াছিল। সে লাস্যময়ী সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত আঁখিভঙ্গি করিয়া বলিল—আপনার বিনয় প্রশংসনীয়। তবে আপনার কৌতূহল কবিতার প্রতিই—না কবির প্রতি—

রমলার কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তাহা অমল ভাল করিয়াই বুঝিল। ঈষৎ হাসিয়া রমলার পাউডার অবলুপ্ত সুঠাম সুন্দর মুখখানাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—প্রথমটাকে ভদ্রতার রীতি অনুসারে স্বীকার করা চলে, দ্বিতীয়টি বলা চলে না—যদিও দ্বিতীয়টাই অনেক সময় প্রবলতর হ'য়ে দেখা যায়—

খোকা আসিয়া পড়িল। রমলা অধ্যয়ন অধ্যাপনার সুযোগ দিয়া প্রস্থান করিল। খোকাকে বৃহৎ একটা অঙ্ক কষিতে দিয়া অমল কি যেন এলোমেলো ভাবিতেছিল—রমলা এমনি করিয়া স্বেচ্ছায় প্রগল্‌ভতার সহিত এ অকারণ হৃদ্যতা করিয়া গেল কেন? সে কি তাহার মাঝে একটি অনুগত পারিষদকেই চায়—না আরও কিছু—ডেজিও ত ঠিক এমনি করিয়াই আলাপ করিয়া গিয়াছে—কেন?

অমল ছাত্র পড়াইয়া ফিরিবার পথে নিজে নিজেই বেশ আমোদ উপভোগ করিতেছিল, কতকটা আত্মপ্রসাদে, কতকটা সাফল্যে। আজ যে সে সেই উদ্ধত রমলাকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ করিয়া তাহার 'ন'এর অ ব্যবহারকে শতগুণে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে এই জন্য মনে মনে গর্ব্বই অনুভব করিতেছিল। সে যে কাপালিক সাজিয়া কোনরূপ কবিতা লিখিতে পারে না প্রভৃতি নানা অসত্য কথা বলিয়া আসিয়াছে সে জন্যও বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল—মিথ্যা কথা বলিয়া যে অনেক সময়ে এমন আনন্দ পাওয়া যায় সে তাহা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করে নাই। রমলার পদাশ্রিত হইয়া ব্যর্থ প্রেমিকের ভূমিকা অভিনয় করিতে সে প্রলুব্ধই হইয়া উঠিয়াছিল।

বাসায় ফিরিয়া ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়িবার কথা ছিল, কিন্তু সে কোন ক্রমেই তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিল না। রমলার কথা মনে করিয়া সে হাসিল এবং ডেজির কথায় মনে মনে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে ভুলিয়াই যায় যে সে একান্তই দরিদ্র—ডেজির এই আলাপ, হয়ত কেবল কৌতূহলই অথবা রমলার বাসনারই একটা ভব্য প্রকাশ। অমল মনে মনে নানা সম্ভব অসম্ভব কথা ভাবিতে ভাবিতে যেন অকারণেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ডেজির সঙ্গে কালও হয়ত দেখা হইবে, হয়ত পরিচয় আর একটু ঘনিষ্ঠতা লাভ করিবে—

অমল ভাবে দারিদ্র্য ও এই কৃচ্ছ্র সাধনের একটা পুরস্কার হয়ত' আছে। যৌবনের মন লইয়া আরও অনেকে যেমন মনে মনে মানসী মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া বাহ্য জগতে তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায় অমলও যে তেমনি কিছু করে নাই, একথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। আজ অকস্মাৎ ডেজির মাঝে সে তাহার মানসীকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে—যাহা কেবলমাত্র কল্পনারই, যাহা পাওয়ার অতীত তাহাকে ছোট করিয়া, ডেজির শত অক্ষমতাকে মার্জ্জনা করিয়া, তাহার দেহ সৌষ্ঠবের ত্রুটিকে উপেক্ষা করিয়া অমল তাহাকেই মনের মাঝে একান্ত দুর্লভ করিয়া অতি সংগোপনে আপনার করিয়া রাখিয়া দিল—

অমল জানিত, এমনি করিয়া সকল মানুষই আকাশের রঙিন্ মেঘলোক ছাড়িয়া মর্ত্ত্যের বস্তুর মাঝে নামিয়া আসে—মানুষের মনের এই দৈন্য তাহাকে সর্ব্বসাধারণের মতে স্বাভাবিক করিয়া তুলে। (ক্রমশঃ)

মুহূর্ত বিলাস

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

এমনি অনেক রাত, অনেক স্বপন,
জীবনেরে পরিক্রমি গড়িয়াছে তাজ;
মদির সোনালী নেশা না জানি কখন,
দেখায়েছে পৃথিবীরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
তাই নিয়ে রচিয়াছি কত কাব্য-কথা,
কত ছন্দ, কত গান, ঐশ্বর্য প্রচুর;
তন্দ্রা-ঘন কুহেলীর স্বপ্ন-মাদকতা,
রাতের আঁধার ঘেরি' সুপ্তি সুমগন॥
রাত্রি যায়, আসে দিন, মধ্যাহ্ন-আকাশ,
রাতের প্রহরগুলি ক্ষীণ পরমায়ু;
প্রাত্যহিক জীবনের উলঙ্গ প্রকাশ,
কঠিন সংগ্রাম শুধু মরে বেঁচে থাকা।
তবুও আঁধার ঘেরা রহস্য উল্লাস,
জীবনেরে দিয়ে যায় মুহূর্ত বিলাস॥

ফুলধনু

শ্রীসমেরেশচন্দ্র রুদ্র এম্‌-এ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবনের ভগিনীকন্যা উর্মিলার কলকাতার বাড়ী, উর্মিলা তার স্বামী অপূর্বর সঙ্গে কথা কইছে।

অপূর্ব। ব্যাপার তাহলে জটিল বল!

উর্মিলা। এ সব ব্যাপার তো চিরকালই জটিল!

অপূর্ব। কেন, তোমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে নাকি?

উর্মিলা। আছে।

অপূর্ব। তাহলে এতদিন বলনি কেন? খাঁচায় আবদ্ধ থেকে শুধু পাখা ঝাপ্‌টে মরছ!

উর্মিলা। হাঁ গো মশাই, এখন মামাবাবু এলে এসব কথা কে বল্‌বে বল?

অপূর্ব। যার বলবার সে বলবে—

উর্মিলা। অর্থাৎ?

অপূর্ব। অর্থাৎ যাঁর প্রেমের কাহিনী, তিনিই গোচর করবেন।

উর্মিলা। কি যে বল, তার ঠিক নেই! রচনা কখন এ সব কথা মামাবাবুর কাছে বলতে পারে?

অপূর্ব। কেন পারবে না? তোমার কাছে বলতে পারলে আর মামাবাবুর কাছে পারবে না?

উর্মিলা। রসিকতা রাখ, কি হবে বল। দেখ্‌ছ তো, অন্যদিক থেকে বিয়ের ব্যাপার ঘনিয়ে আসছে।

অপূর্ব। তাহলে তুমিই না হয় বল না।

উর্মিলা। আমার বাপু লজ্জা করে। এ সব কি বলা যায়! তার চেয়ে তুমি বল।

অপূর্ব। আমি! বাপ্‌রে! যে রকম মানুষ, তাতে রিটায়ার্ড পুলিশের লোক, সন্দেহের ঘোর এখনও চোখ থেকে কাটেনি, ভাববেন, আসামী বেকসুর খালাস পাবে বলে স্বীকারোক্তি করছে।

উর্মিলা। সত্যি তাহলে কি করা যাবে বল?

অপূর্ব। আমি বলি কি, শ্রীমানকে ডেকেই পাঠাও না। তিনি এসে নিজের দাবী উপস্থিত করুন।

উর্মিলা। (বিস্মিতভাবে) কাকে ডেকে পাঠাব?

অপূর্ব। ভগিনীর মনচোরকে, অর্থাৎ তোমার ভাবী ভগিনীপতিকে, অর্থাৎ শ্রীমান্ রবীন্দ্রকে।

উর্মিলা। রবিকে? এখানে?

অপূর্ব। এরই মধ্যে রবীন্দ্র থেকে রবি হয়ে গেছেন! তাহলে তো ছুর্গের একদিক ভগ্ন হয়ে গেছে বলতে হবে।

উর্মিলা। ঠাট্টা রাখ, বল কি করা যাবে।

অপূর্ব। বললুম তো, রবিকে এখানে কাল বিকেলে আসতে লিখে দাও।

উর্মিলা। তুমিই একটু লিখে দাও না।

অপূর্ব। আমি লিখ্‌লে সে কি আস্‌বে। তার চেয়ে তুমি লেখ।

উর্মিলা। কি লিখব?

অপূর্ব। তাও বলে দিতে হবে? এই আই-এ পাশ শিক্ষিতা নাকি! নাও, কাগজ আর পেনটা নাও।

উর্মিলা। (কাগজ পেন নিয়ে এসে) ত্রুটি পেলে আর রক্ষে নেই। কি বিপদেই পড়েছি—বল।

অপূর্ব। লেখ। সবিনয় নিবেদন, আমি শ্রীমতী রচনার দিদি। কাল বিকেল চারটের সময় আমাদের বাড়ী যদি একটু বেড়িয়ে যান, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। ইতি—হয়েছে?

উর্মিলা। হয়েছে।

অপূর্ব। দেখি দাও, বানান ভুল হয়েছে কিনা।

উর্মিলা। বানান ভুল অমনি হলেই হল! আহা কি শক্ত লেখাটা!

অপূর্ব। শক্ত লেখার জন্যে নয়, রিভিশনের অভাবে চিঠি লিখে ফিরে পড়ার ধৈর্য্য তোমার বড় একটা থাকে না কিনা, তাই বলছি।

উর্মিলা। খুব হয়েছে। এখন ঠিকানাটা কি লিখব বল।

অপূর্ব। এইজন্যেই বলি, মেয়েরা প্র্যাকটিক্যাল নয়। হোষ্টেলের ঠিকানায় ছেড়ে দাও।

উর্মিলা। খুব প্র্যাকটিক্যাল মশাই, তোমাদের চেয়ে বেশী প্র্যাকটিক্যাল। হোষ্টেলের ঠিকানায় দেওয়া যায়, তা জানি; কিন্তু আমাদের লেখা দেখলেই মশায়ের বন্ধুরা সেটা যথাস্থানে পৌঁছতে দেবে কিনা, তাই ভাবছি।

অপূর্ব। ভয় নেই, নিশ্চয় পৌঁছবে। এ তো আর নব-বিবাহিতার চিঠি নয় যে ভিতরে কিছু মূল্যবান জিনিস থাকবে। রচনা কোথায়?

উর্মিলা। পাশের ঘরে।

অপূর্ব। (একটু জোর গলায়) রচনা! রচনা!

রচনার প্রবেশ

রচনা। ডাকছেন আমাকে?

অপূর্ব। হাঁ, কি মুস্কিলেই পড়েছ বলতো! কোথায় এগজামিন দিয়ে বাড়ীতে গিয়ে নিশ্চিন্তে কিছুদিন ঘুমোবে, না বিয়ে বিয়ে! আমি হলে তো বলতুম, বাড়ী ছেড়ে পালাব।

উর্মিলা। হুঁ, পালাবে! মেয়েমানুষ হয়ে দেখবে একবার?

অপূর্ব। কেন, বেশ তো ভাল জিনিস, টাকাকড়ি উপায় করতে হয় না, কোন ঝক্কি পোয়াতে হয় না, খাও দাও, ঘুমোও। কি বল রচনা?

উর্মিলা। খাও দাও, ঘুমোও! বেশ!

অপূর্ব। শুধু একটি জিনিসের দায়িত্ব নিতে চাইব না। সেটা কি রচনা?

উর্মিলা। খুব হয়েছে, চুপ কর।

অপূর্ব। তুমি আমাকে চুপ করতে দিলে কই? শুধু বিয়ে আর বিয়ে!

উর্মিলা। মামাবাবু এখনও এসে পৌঁছচ্ছেন না কেন?

অপূর্ব। গাড়ী লেট বোধ হয়।

রচনা। আজকাল তো গাড়ী রোজই লেট।

অপূর্ব। তা তো হবেই, আজকাল মানুষ যে রোজই ফাস্ট; পৃথিবীকে ভারসাম্য রাখতে হবে তো? এখন হোষ্টেল ছেড়ে এসে এখানে কেমন লাগছে বল!

রচনা। ভালই তো লাগছে।

অপূর্ব। দেখ, মামাবাবু যে রকম ব্যস্তবাগীশ মানুষ, একেবারে পাত্র ধরে নিয়ে এসে হাজির করবেন না তো?

উর্মিলা। তার দরকার কি, একজন তো হাজিরই আছে।

অপূর্ব। এত অনুকম্পা! দেখছ রচনা? তা এক পক্ষ যাঁর আছে, তাঁকে দ্বিতীয় পক্ষ দিয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি উড়তে দেবেন কেন?

উর্মিলা। বড় দুঃখ, না?

অপূর্ব। তুমি তার আর বুঝবে কি! জান রচনা, কাল এখানে মানভঞ্জন পালা হবে।

রচনা। কোথায়? যাত্রা নাকি?

অপূর্ব। প্রায় যাত্রাই বটে। তোমার দিদি বৃন্দে দূতী সাজছেন, অধীন আয়ান ঘোষ, আর তোমায় রাধিকা সাজতে হবে।

উর্মিলা। কি হচ্ছে সব তোমার!

অপূর্ব। আর শ্রীকৃষ্ণকে হোষ্টেল থেকে নেমন্তন্ন করে আনান হচ্ছে, তৈরী থেক।

(নীচে থেকে ডাক শোনা গেল, উর্মিলা, অপূর্ব!)

উর্মিলা। (ব্যস্ত হয়ে) মামাবাবু এসে গেছেন—

রচনা। বাবা?

উর্মিলা রচনার সঙ্গে অপূর্ব বেরিয়ে গিয়ে আবার বৃন্দাবনকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করল

বৃন্দা। (প্রবেশ করতে করতে) উর্মি, তোমাকে তো একটু রোগা রোগা দেখাচ্ছে মা। কিছু হয়নি তো?

উর্মিলা। কই না তো।

বৃন্দা। রচনার শরীরও ভাল নয়। অবশ্য ওর এগজামিন গেছে, সে জন্যে হতে পারে।

চেয়ারে বসলেন

অপূর্ব। আপনার পৌঁছতে দেরী হল, গাড়ীটা কি লেট্ করলে?

বৃন্দা। (ঘড়ি দেখে) হুঁ, দেড়-ঘণ্টা লেট। তিন দেড়ে সাড়ে চার ঘণ্টা লেট হয়নি, তাই যথেষ্ট।

উর্মিলা। (হাসিমুখে) আপনার ডাক্তারী এখনও চলছে মামাবাবু?

বৃন্দা। চলছে মা। দেশে অসুখ কত জান? বাংলা দেশে সুস্থ লোক কটা? তা ছাড়া হোমিওপ্যাথির মত এমন সুলভ অথচ মূল্যবান চিকিৎসা আর কোথায় পাওয়া যাবে!

অপূর্ব। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় দুঃখী লোকদের একটা মস্ত বড় উপকার করা হয়।

উর্মিলা। মামাবাবু তো কারুর কাছেই পয়সা নেন না।

বৃন্দা। সেটাই বড় ভুল করি মা। পয়সা দিলেই লোকে ওষুধে বিশ্বাস করে, না নিলে ভাবে, হয় ডাক্তার বেকার, নয় ওষুধ জল, কি জান মা, একশটি যদি রুগী দেখ, তাহলে দেখবে তার ভেতর নব্বইটি পেটের অসুখের। নাক্সভমিকা থাবটির চারটে ছটা বড়ি খেয়ে যদি সারে, ভাবি, চুলোয় থাকগে দু-দশ আনা, এরা সারুক। বাংলাদেশে একদিকে যেমন পেটের জ্বালা! তেমনি অন্যদিকে পেটের অসুখের জ্বালা! পেট নিয়েই দেশটা গেল!

সকলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল

অপূর্ব, বল সত্যি কিনা?

অপূর্ব। আজ্ঞে হাঁ, তা সত্যি বৈকি।

বৃন্দা। বড় সহরে দেখ ডিসপেপ্সিয়া, অম্বল, ছোট সহরে দেখ আমাশা, কলেরা, গ্রামে দেখ লিভার পিলে। সর্বত্রই পেটের ব্যাপার। ষ্টম্যাক ট্রাবলই বাংলাদেশের বড় ট্রাবল মা, পলিটি-ক্যাল ট্রাবলের চেয়ে এ ট্রাবল বড় কম নয়।

সবাই হাসতে লাগল

দ্বিতীয় দৃশ্য

হোষ্টেলের কক্ষ—রবি, সুকুমার ও যোগেশ কথা কইছে

রবি। বাবা কাল আসবেন লিখেছেন।

সুকুমার। কি ব্যাপার বল তো?

যোগেশ। হয় তো পরীক্ষার আগে একবার ছেলের সঙ্গে দেখা করে যেতে চান, তাছাড়া অন্যকিছু কাজও সেরে যেতে চান।

সুকুমার। কিছু লেখেন নি তিনি?

রবি। না, এমনি লেখেছেন, যাচ্ছি—

চাকর প্রবেশ করে রবিকে উদ্দেশ করে বললে—বাবু, আপনার চিঠি

সুকুমার। (লাফিয়ে উঠে) রবির চিঠি? খাম? দাও আমাকে।

চাকরের হাত থেকে নিতে চাকর বেরিয়ে গেল

এ্যা, ব্যাপার কি রবি? খামে চিঠি যে?

রবি। কেন খামে কি আমার চিঠি আসতে দেখনি? দাও, খুলি।

সুকুমার। আমিই খুলি না ভাই, অনুমতি দিচ্ছ তো?

যোগেশ। অনুমতি আবার কি! এ কি ওর স্ত্রীর চিঠি যে অনুমতি দেবে!

সুকুমার। তাহলে ছিঁড়ি?

যোগেশ। নিশ্চয়।

সুকুমার। (চিঠি পড়ে খাটের উপর ধপ্ করে বসে পড়ে) ভগবান!

যোগেশ। রবি। (বিস্ময়ে) কি হল! কি হল! কি খবর? দেখি দেখি—

সুকুমার। (পত্রটা আড়াল করে) ভগবান!

রবি। কি মুস্কিল! বল না কি?

সুকুমার। ভাল ভাল, মিষ্টি আনাও।

যোগেশ। কি খবর ভাই?

সুকুমার। বলছি, বলছি, শর্ম্মা একদিন বলেছিল মনে আছে, কিছুদিনের ছুটীতে যাচ্ছি, এ ছুটী বৃথায় যাবে না, দেখে নিও?

যোগেশ। কবে বলেছিলে?

রবি। চিঠিখানা দেখি।

সুকুমার। কবে বলেছিলুম, মনে আছে তোমার রবি?

রবি। আছে কিন্তু চিঠিখানা দাও—

যোগেশ। তা মিষ্টির কি হল?

সুকুমার। নিশ্চয়ই তো, মিষ্টির কি হল?

রবি। হবে এখন হবে, চিঠিটা একবার দেখতে দাও।

যোগেশ। কি মিষ্টি আনাবে?

সুকুমার। রবি, কি মিষ্টি তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে?

রবি। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

সুকুমার। যে মিষ্টি তুমি এখন সব চেয়ে ভালবাস, সেই সন্দেশ-এর ভেতর লুকিয়ে আছে।

রবি। দাও, ভাই দাও।

সুকুমার। দিতে পারি শুধু মুখে ফেলে, গিলে নিতে হবে। হাতে পাবে না!

যোগেশ। খাবার নেমন্তন্ন নাকি হে?

সুকুমার! সব রকম।

যোগেশ। বল কি!

সুকুমার। বস নিশ্চিন্ত হয়ে, বলছি। বস। (দুজনে বসল) পড়ি শোন। (চিঠি পড়তে লাগল) সবিনয় নিবেদন, আমি শ্রীমতী রচনার দিদি। কাল বিকেল চারটের সময় আমাদের বাড়ী যদি একটু বেড়িয়ে যান, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। ইতি—শ্রীউর্ম্মিলা চৌধুরী। শুনলে? নাও, এবার নয়ন সার্থক কর।

রবির হাতে দিলে, যোগেশ মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল। রবির মুখ আনন্দে হাসিতে যেন চিক্‌মিক্ করতে লাগল

কেমন? কেমন লাগছে ভায়া ভাবী শ্যালিকার পত্র?

যোগেশ। সুন্দর, মনোহর, মধুর!

সুকুমার। কেমন হে কান্ত, কথা কইছ না যে?

রবি। দেখ, তাহলে সত্যি—

সুকুমার। সত্যি নয়তো কি মিথ্যে চিঠিটা এসেছে?

রবি। (দ্বিধাভরে) তাহলে তো যেতে হবে?

সুকুমার। অবশ্য যেতে হবে, কি বল যোগেশ?

যোগেশ। নিশ্চয়। ইটকাঠ এনে, চুনসুরকী এনে, এত মেহনৎ করে বাড়ী তুলে জিজ্ঞেস করছ, গৃহপ্রবেশ করবে কি না।

সুকুমার। গৃহপ্রবেশ করে বলছ, গৃহলক্ষ্মী আনবে কি না!

রবি। কাল যেতে লিখেছেন।

সুকুমার। তুমি বলতে চাও কি যে আজ নয় কেন? ভায়া হে, ব্যস্ত হ'য়ো না, এ সবের মানে আছে।

যোগেশ। কি রকম?

সুকুমার। ছোট ছেলেকে এক সঙ্গে লোভার্ত ও শান্ত করবার জন্যে প্রিয় বস্তুটি 'কাল পাবে' বলে বাক্সে তুলে রাখছেন।

যোগেশ। আবার বিকেল চারটের সময় যেতে লিখেছেন।

সুকুমার। তারও মানে আছে।

যোগেশ। বুঝিয়ে বল।

সুকুমার? বলছি। তার আগে—রবি, তোমার হার্টট্রাঙ্গ আছে তো? দেখো, নার্ভাস হোয়ো না।

যোগেশ। দেখি রবি, পাল্‌স্‌টা ফিল করি—

রবি। ভয় নেই, ভয় নেই।

সুকুমার। সত্যিই ভয় নেই। আগে জল দেখে ভয় পেত, এখন জলে নামতেও শিখেছে, সাঁতার কাট্‌তেও শিখেছে, শ্যাওলায় পা পিছ্‌লে গেলে ডুবে যাবে না।

যোগেশ। সাবাস ভায়া! কি রকম শিক্ষকের হাতে পড়েছে, দেখতে হবে তো!

সুকুমার। ভাই, অধীর দ্রোণ কিনা বলতে পারিনা, তবে ছাত্র তো আর দুঃশাসন নয়, এ যে দ্রৌপদীপ্রিয়!

যোগেশ। আর এ অধমকে কি ঠাঁই দিচ্ছ?

সুকুমার। তুমি মহামতি ভীষ্ম।

যোগেশ। তারপর চারটের ব্যাখ্যাটা ত করলে না!

সুকুমার। হুঁ, চারটের যেতে বলেছেন। অর্থাৎ সাড়ে তিনটেও নয়, সাড়ে চারটেও নয়, একেবারে চারটে। ভায়া হে, চার চক্ষুর মিলন জান? যুগল হাতে যুগল হাত ধরা জান? যুগলের উদ্যোগে যুগলের হৃদয় বিনিময় জান?

যোগেশ। বিউটিফুল!

রবি। তাহলে নির্ভয়?

যোগেশ। নির্ভয়, নির্ভয়।

সুকুমার। ন ভেতব্যম্, মাভৈঃ। (ক্রমশঃ)

মুদ্রানীতির গোড়ার কথা—অর্থের মূল্য

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

গত চৈত্র সংখ্যায় অর্থ-শাস্ত্রের যে সব নিয়মকানুন ও তত্ত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে বাস্তবজগতের দৈনিক আদান প্রদানে তার ফলাফল পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হয় না। তার কারণ অর্থনীতি বিজ্ঞান হলেও এ একটি জটিল শাস্ত্র, এর কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষের প্রভাব এসে পড়ে। পুরুষের অর্থনৈতিক কার্য্যাবলী তার সামাজিক পরিস্থিতি, তার মানবিক বৃত্তি, তার নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা বহুল পরিমাণে পরিচালিত হয়; কাজেই অর্থনীতি শাস্ত্রকে একটা অপূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান (Imperfect Science) বলা চলে। সেই জন্য আমাদের আলোচিত কানুন হিসাবে সব সময় জোর করে বলা চলে না যে মুদ্রা বা টাকার নম্বই

বাড়লেই দ্রব্যের মূল্য সব সময়েই বৃদ্ধি পাবে। তবে অর্থ ও সম্পদ যে এক জিনিষ নয় এবং অর্থ বাড়লে যে সম্পদ বাড়বে না এ তথ্যটি পরবর্ত্তী আলোচনা থেকে আমাদের বেশ পরিষ্কার হয়েছে। অনেক সময়েই আমরা শুনে থাকি, গবর্ণমেন্টের টাকা নেই, তার টাকার এখন বড় টানাটানি। অনেকে হয়তো আশ্চর্য্য হয়ে যান, ভাবেন যে রামশ্যামের টাকার টানাটানি পড়তে পারে, কিন্তু যেখানে গবর্ণমেন্ট ইচ্ছে করলে যত খুসী নোট ছাপ্‌তে পারেন, সেখানে তার আবার অর্থাভাব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরও আমাদের আলোচনায় সুপরিস্ফুট হয়েছে। দুনিয়ায় যদি একটি মাত্র কেনবার মত জিনিষ থাকে, আর সব শুদ্ধ দশটি মাত্র টাকা থাকে, তখন মানুষ ঐ জিনিষটির জন্য দশ টাকা দিতেই সহাস্যে সম্মত হবে, কারণ আর দ্রব্য না থাকলে টাকা রেখে সে করবে কি? অর্থাৎ জিনিষটির মূল্য এক্ষেত্রে দাঁড়াল দশটাকা। দশের জায়গায় যদি বিশ টাকা সৃষ্টি করা যায় তবে মানুষ জিনিসটির জন্য বিশ টাকাই দেবে অর্থাৎ জিনিষটার এবার দাম হবে বিশ টাকা। এখানে অর্থ বৃদ্ধি পেল বটে কিন্তু জিনিষ বা সম্পদ বৃদ্ধি পেল না, শুধু মাত্র সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পেল। তাই গবর্ণমেন্ট যত খুসী নোট ছাপালে, জিনিষের দামই শুধু বাড়বে এবং গবর্ণমেন্টকেও সেই সব জিনিষের জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হবে, কাজেই অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে তার কোন ভালই হলো না বা তার টাকার অভাবও ঘূচলো না। তাই অর্থ বাড়লে রাম, শ্যাম, রহিম, করিম এইরূপ কয়েকজনের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি হলো বটে, কিন্তু সমগ্র দেশের তাতে কোন উপকারই হলো না, উপরন্তু অনেক সময় এই মুদ্রাসম্প্রসারণে ঘোর অনিষ্ট এসে উপস্থিত হতে পারে। যাক্ এ বিষয়ে অন্য স্থানে আলোচনা করা যাবে।

কিন্তু অর্থ বৃদ্ধি পেলে সম্পদ কি কিছুতেই বৃদ্ধি পেতে পারে না? আমরা আবার একটি নূতন প্রশ্নে এসে পড়লাম। নব্য মতের অর্থনীতিবিদ্‌গণ কিন্তু ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের মতে নূতন অর্থ নূতন পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করে এবং যেহেতু অতিরিক্ত টাকার সঙ্গে দ্রব্যসামগ্রীও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই এস্থলে জিনিষের মূল্য নাও বাড়তে পারে। অথচ এক্ষেত্রে বর্দ্ধিত আয়ের দ্বারা লোকে বেশী সম্পদ ভোগ করে থাকে। ইংরাজ অর্থনীতিবিশারদ সুপণ্ডিত জন্ মেনিয়ার্ড কেইন্‌স্ (John Manyard Keyns) (বর্ত্তমানে লর্ড) এই মতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং এই সুঅবস্থার নাম দিয়েছেন quasi-boom বা চিরস্থায়ী আর্থিক সুদিন। কিন্তু এ ধরণের জিনিষ সম্ভব হতে গেলে দুটি অবস্থার প্রয়োজন। প্রথমত, এই অতিরিক্ত অর্থ পণ্য ক্রেতা (consumer)দের হাতে না পড়ে প্রথমে শিল্পী, ব্যবসায়ী অর্থাৎ Producerদের হাতে পড়বে। তাহলে তারা যন্ত্রপাতি, কলকারখানা অর্থাৎ Capital goodsএর সাহায্যে সেই অর্থ দ্বারা প্রথমেই পণ্যসামগ্রী বা consumers Goods তৈরী করে ফেলতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ, পর্য্যাপ্ত অর্থের অভাবে যখন দেশের কলকারখানাগুলি ও মজুরেরা সব অলসভাবে বসে আছে, সেই অবস্থায় নূতন অর্থ মিল্‌-মালিকগণ বা ব্যবসায়ীর হাতে পড়লে পণ্য বৃদ্ধির আশা আছে। কিন্তু দেশে যখন সকল কল-কারখানাই পূরোদমে চলেছে, মজুর যখন আর বসে নেই এবং নূতন কলকারখানা সৃষ্টিরও আর সম্ভাবনা নেই, অর্থাৎ এক কথায় দেশে যখন Full-employment বর্ত্তমান, তখন নূতন অর্থ কোন প্রকারেই আর, পণ্য বা সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এই অর্থ-প্রসারণ নীতি (Policy of monetary expansion) কেবল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে এবং ইনফ্লেশন নামক বিভীষিকাকে ডেকে আনবে। কিন্তু অর্থ সম্প্রসারণ দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি করতে হলে বহুল পরিমাণে সাবধানতা ও সতর্কতার প্রয়োজন এবং সনাতনপন্থীরা তাই বলেন যে কার্য্যতঃ প্রায়ই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাঁরা বলেন যে প্রথমতঃ পণ্যভোগীদের হাত এড়িয়ে এই নূতন টাকাটা কেবলমাত্র কলকারখানার মালিকদের হাতে দেওয়াইতে কিছু শক্ত ব্যাপার। কিছু না কিছু টাকা মজুরি বাবদও পণ্য-ক্রেতাদের হাতে গিয়ে পড়বেই। তারপর দেশের হস্তান্তর যোগ্য পণ্যের সঠিক সংখ্যা, দেশের মোট টাকার পরিমাণ, সেই টাকার আবার প্রচলন গতি বা Velocity ইত্যাদি এই সব তত্ত্বের খবর রাখাও শক্ত ব্যাপার। অথচ এসবের সঠিক খবর জানা না থাকলে নূতন অর্থ শুধু মাত্র পণ্যসম্ভার উৎপাদনে প্রয়োগ করা দুষ্কর। তাই সনাতন পন্থীরা নব্যতন্ত্রের এই মতবাদে সর্ব্বদাই অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়ে থাকেন।

ভারতবর্ষে কোনদিনই কলকারখানা পুরোদমে চলেনি বা বেকার সমস্যার অভাবও কোনদিন ঘটেনি। সুতরাং Full employmentএর কোন প্রশ্নই আসতে পারে না এদেশে কিন্তু এখানে একটি গলদ আছে। ভারতবর্ষ তার পরাধীনতার দৌলতে প্রায় সর্ব্ববিধ কলকারখানা বা capita। Goodsএর জন্য বিলেত বা অন্য দেশের মুখাপেক্ষী। তাই যুদ্ধে রাস্তা বন্ধ হওয়ায় সেই সব উৎপাদনকারী কলকারখানা ইচ্ছামত আমদানী করতে অক্ষম। কাজেই শত চেষ্টা ও সুযোগ থাকলেও তার প্রয়োজন মত ভোগ্য বস্তু বা পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষমতা তার নেই, হাত পা থাকা সত্ত্বেও তার জগন্নাথ সেজে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? সুতরাং কার্য্যত তার অবস্থা Full employmentএরই সামিল। এক্ষেত্রে অর্থ বৃদ্ধি বা অর্থ সম্প্রসারণ করলে পণ্য বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে শুধু পণ্য মূল্যই বৃদ্ধি পাবে।

আর্থিক জগতের ভাগ্যচক্র

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এই হাসি-কান্না নিয়ে যেমন মানুষের জীবন গঠিত, আর্থিক জগতেও নাকি সুদিনের পর দুর্দ্দিন, আবার দুর্দ্দিনের পর সুদিন, এই লীলাখেলাই নিয়ত চলছে। ব্যবসা বাণিজ্য খুব পুরোদমে চলছে, সকলেই অহরহ কাজকর্ম্মে লিপ্ত, বেকার হয়ে ঘরে আর কেহ বসে নেই, বিজ্ঞানের নিত্য নূতন অভিযান ও আবিষ্কার মানুষের ভোগ লালসা নিবৃত্তি করবার জন্য অহরহ ব্যস্ত, অস্থিরমতি ক্রেতাদের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অসংখ্য প্রকার বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুতের ক্লান্তিতে কলকারাখানাগুলির যখন প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম, হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে আর্থিক জগতের যন্ত্রজাহাজের কোথায় যেন এক মারাত্মক ছিদ্র হয়েছে, ভরা গাঙে তরী এবার ডুবেছে। এত বড় একটা কলরবকে হঠাৎ যেন একটা ভীতিকর নিঝুম ও নিস্তব্ধতার ছায়া গ্রাস করে ফেল্‌লো, রূপকথার সেই রাক্ষুসী যেন এসে সমস্ত লোককে আত্মসাৎ করে রাজকন্যাকে ঘুম পাড়িয়ে চলে গেল। বাজার ভরা অসংখ্য মাল, কিন্তু ক্রেতার দেখা নেই, কাল যারা অযাচিতভাবে যে কোন মূল্যে নিজেদের ভোগ চরিতার্থের উপাদান আহরণ করতে ব্যস্ত ছিল, আজ যেন তারা অন্ধকারে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে, সকলের মুখেই যেন একটা ভীতি ও আশঙ্কার চিহ্ন। মিলের মালিক তাদের ভুল বুঝলো। তারা বুঝলো যে সুদিনে উচ্চ মূল্য পেয়ে অতি লোভের আশায় তারা চাহিদা বা প্রয়োজনের থেকেও বেশী মাল উৎপন্ন করে ফেলেছে। তাদের বিজ্ঞানপ্রসুত যন্ত্র বা কলকারখানা খুব শক্তিশালী, সুতরাং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তারা অসংখ্য মাল প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ক্রেতার হালফ্যাশানের দৌরাত্ম্যে কাল যা সমাজের গৌরবের বস্তু ছিল, আজ তা বাতিল। এতদিনে উৎপাদনকারীরা একবার পেছনের দিকে দৃষ্টি দিল। নূতন মাল তৈরী থেকে পুরাতন মাল অল্প মূল্যেও বিক্রয়ের জন্য আজ তারা বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আগত দিনের এক মহাতঙ্কে বিক্রেতার মধ্যে যেন মাল বিক্রয়ের একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। জিনিসের দাম পড়তির মুখ ধরলো। ব্যবসা জগতের ভাগ্যচক্র একবার নিম্নগামী হওয়া মাত্রই দ্রব্য বিক্রেতার দল আরো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সকলেই যে-কোন মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে টাকা নিয়ে ঘরে বোঝাই

করতে তৎপর ; ফলে দ্রব্যের মূল্য ধাঁ ধাঁ করে নেমে চললো, বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘ মানুষকে আরো দুর্ব্বল করে ফেললো। আজ মানুষ দ্রব্য চায় না, মানুষ শুধু আজ চায় টাকা। আর্থিক জগতে টান পড়লো, কলকারখানা বন্ধ হলো, কুলী মজুর বেকার হলো, মানুষের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা কমে গেল, অসংখ্য ভোজ্যের মধ্যেও মানুষ বুভুক্ষু রয়ে গেল। অভাবে স্বভাব নষ্ট, সকল দেশই নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত, চারিদিকে কেবল অবিশ্বাস ও অনাস্থার ছায়া,জাতিতে জাতিতে রেষারেষি, ছিদ্র তরীর ভার কমাবার জন্য একজন আর একজনকে ধ্বংস করতে চায়, আন্তর্জ্জাতিক সৌহার্দ ও অবাধ বাণিজ্যনীতি নির্ম্মমভাবে শেষ হয়ে গিয়ে তার জায়গায় গড়ে ওঠে উগ্র জাতীয়তাবাদ, উচ্চ শুল্ক-প্রাচীরের নিষেধাজ্ঞা (Tariff wall), অ-দক্ষ ব্যবসায়ীকে সরকারী সাহায্যনীতি (subsidy) এবং মুদ্রা মূল্য হ্রাস (Currency Devaluation)। এতেও যখন জাতি নিজেকে বাঁচাতে পারে না, তখন বেজে ওঠে রণডঙ্কা, আর আরম্ভ হয় বিশ্ব-সংগ্রাম।

বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে যায়,তখন যখন অসংখ্য ভোগের মাঝে মানুষ মানুষকে বুভুক্ষ রেখেছে। কাজেই প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে। তাই নরমেধযজ্ঞের ভিতর দিয়ে মানুষের আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়ে যায়। যুদ্ধের জীবন মরণ সমস্যায় বহু অর্থ ও বহু সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন। চারিদিকে অবরোধ নীতি (blockade) চলেছে, কাজেই বিদেশ থেকে মাল আমদানির পথ বন্ধ। দেশের কলকারখানাগুলি আবার সজাগ হয়ে উঠলো, আর্থিক জগতের ভাগ্যচক্র আবার উর্দ্ধগামী হলো। চারিদিকে কেবল জিনিষের জন্য হাহাকার। কুলি মজুরের দল আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো, আবার তারা কাজে হাত দিল। আজ আর ঘরে কেউ বসে নেই, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই নরমেধযজ্ঞের উদ্‌যাপনে আমন্ত্রিত হলো। প্রত্যহ কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন ; কাজেই ভুয়ো অর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া উপায় নেই, তাই নোট ছাপাবার মেশিনটিও ঘুরে চললো অনবরত। একদিকে জিনিষের প্রচণ্ড রূপ চাহিদা, অন্যদিকে এই অফুরন্ত মেকী মুদ্রা, এই দুইয়ের চাপে পড়ে জিনিষপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে চলে। নিত্য মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কায় দ্রব্য মজুতের স্পৃহা যায় বেড়ে, অবচয়িত মুদ্রা (Depreciated currency) আর কেউ চায় না, মানুষের মধ্যে মুদ্রাতঙ্ক দেখা দেয় (Fight from the currency) এবং এইভাবে নিত্যই চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জিনিষের দাম ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এখানেও সেই বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘ আরও বেশী অনিষ্ট করে। দেশে ইন্‌ফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম আরম্ভ হয়। ধনী ও ব্যবসায়ীরা ফেঁপে লাল হয়, গরীব ও মধ্যবিত্তদের রক্ত ধীরে ধীরে শুকোতে থাকে।

তারপর একদিন যুদ্ধও শেষ হয়ে যায়। আবার যে যার ঘরে ফিরে চললো। পণ্যের অভাবনীয় চাহিদা হঠাৎ কবে শেষ হয়ে গেছে, অথচ পণ্যোৎপাদন যন্ত্রগুলি সতেজ ও সক্ষম। যুদ্ধকালীন অবরোধ প্রথার জন্য পূর্ব্বে যে মাল বিদেশ থেকে আসতো, তা আজ দেশে তৈরী হচ্ছে। তাই যুদ্ধান্তে বিদেশ থেকেও যখন আবার মাল আসতে আরম্ভ হলো, তখন দেশে আবার পণ্যের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। আবার বেকার সমস্যা আরম্ভ হলো, লোকের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেল, দেশে অর্থ-সঙ্কোচন প্রথা সুরু হলো, মূল্য আবার পড়্‌তির মুখ ধরলো। তারপর আরম্ভ হয় বিজিত দেশের উপর শ্বাসরোধকারী ঋণের বোঝার প্রতিক্রিয়া (Reparation)। বর্ত্তমান যুগে দেশকালের ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় এক দেশের দুর্দ্দশার প্রভাব মুহূর্ত্ত মধ্যে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিজিত দেশের বিষাক্ত নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে জয়ী দেশের উপরেও এবং পৃথিবী ক্রমশঃ এগিয়ে চলে আবার এক বিশ্বব্যাপী ব্যবসা মন্দার (Depression) দিকে। এইভাবে ব্যবসা জগতের ভাগ্যচক্র ঘুরে চলেছে পর্য্যায়ক্রমে উন্নতি ও অবনতির মধ্যে দিয়ে। আর্থিক জগতের এই ঘূর্ণাবর্ত্তে আজকের ধনী কাল হয় পথের ভিখারী, আবার আজ যে নিঃসম্বল ও দরিদ্র সে এই অদৃশ্য বিধাতাপুরুষের অঙ্গুলি হেলনে কাল হয়ে পড়ে সমাজের গৌরবমুকুট। তবে এই নির্ম্মম ভাগ্যচক্র পৃথিবীর অধিকাংশ জনসমাজেরই ভাগ্যে আনে দুর্দ্দশা ও অশান্তি, মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান লোক অবশ্য উপভোগ করতে থাকে পৃথিবীর এই রাজকীয় উপাদান-গুলি।

এই ব্যবসা জগতের ভাগ্যচক্র (Trade cycle) হলো ধনতান্ত্রিক যুগের নিদর্শন এবং এই উত্থান-পতনের আহুতি যোগায় আমাদের সেই মধ্যস্থ টাকা নামক দালালটি। যে দেশে টাকা নেই সেখানে পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সাক্ষাৎ হয়ে যায়, যার যা প্রয়োজন সে তাই পায়, কাজেই মূল্যের উত্থান পতনের সম্ভাবনা নেই সেখানে। তাই যুদ্ধ-পূর্ব্বের দশ বৎসর ধরে পৃথিবীর যাবতীয় দেশ যখন আর্থিক মন্দায় ঘোরতর খাবি খাচ্ছিল, রুশিয়া তার নূতন প্রবর্ত্তিত সমাজ ও অর্থনীতির ধারা অনুসরণ করে শান্তি ও তৃপ্তির সম্পদে গৌরবান্বিত ছিল। অর্থই হলো যত অনর্থের মূল। এই অর্থের দৌলতেই দ্রব্য মূল্য স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জিনিষের জোগান ও চাহিদার মধ্যে ভুয়োদর্শিতা দ্বারা মানুষ যদি সামঞ্জস্য রাখতে সক্ষম হয় তবুও এই মুদ্রার হ্রাস বৃদ্ধির জন্য মানুষের সমস্ত গণনা ও শ্রম পণ্ড হয়ে যায়, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিকরণ (Stabilisation of prices) কিছুতেই সফল হয় না। কিন্তু এই টাকা নামক মধ্যস্থটির ভবলীলাসাঙ্গের নামে ধনী সম্প্রদায় আঁৎকিয়ে ওঠেন, কারণ এই দৌলতেই তাঁরা আজ ধনী, এরই আহরণে তাঁদের জীবনের যা কিছু আনন্দ! আর যদি এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম রেখে ধনী সম্প্রদায়কে রক্ষা করতেই হয়, তবে অন্তত অর্থের এই অবাধগতি, অফুরন্ত প্রতিপত্তি, স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালকে অবরোধ করতে হবে, প্রভুর বদলে অর্থকে মানুষের ভৃত্য করতে হবে। আর তা নইলে দেশে শান্তি ও কল্যাণের আশা চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন দিতে হবে। এই যুদ্ধে মুদ্রাস্ফীতির দৌলতে ভারতবর্ষে টাকার আর অন্ত নেই, কোটি কোটি টাকা সপ্তাহে সপ্তাহে বাজারে বেরিয়ে চলেছে। অথচ দেশের সম্পদ একটুও বৃদ্ধি পায়নি। দেশটা তার পুঁজি ভেঙ্গে খেয়ে চলেছে ; টাকার গরমেতে। গোটা দেশটা না খেয়েই মলো। এই যে টাকার খেলা, এরি নাম হলো কায়া ছেড়ে ছায়া নিয়ে খেলা। কতদিন আর মানুষ চোখে ঠুলি বেঁধে জন্তুর মত ঘুরে বেড়াবে—এ অন্ধ বিশ্বাস মানুষের কি যাবে না? রামপ্রসাদের সেই দুটি লাইন মনে পড়ে গেল—

মা আমায় ঘুরাবি কত
(এই) এই চোখ বাঁধা বলদের মত !

কপট-বন্ধু

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরী

কুসুমের বুকে বসি মধুকর হাসি ভরা মুখে কয়,
তব মুখে যেন লেখা আছে শত জনমের পরিচয়।

ফুল কহে, জানি দরদী বন্ধু, মধু যেই ফুরাইবে,
শত জনমের পরিচয় রেখা নিমিষে মুছিয়া দিবে !

টেম্পেষ্ট্ ইন্ তুফান মেল

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্-সি

৺পূজার বন্ধ হবার দিন পনের আগে এক কণ্ট্র্যাক্টার্-কোম্পানীর কাজে দেওঘর যেতে হ'য়েছিল। বাড়ীভাড়া পাওয়া যায় না, হোটেল-বোর্ডিংএ সীট পাওয়া যায় না—এ বদনাম হ'য়ে গেছে ক'লকাতার। কিন্তু দু'শো মাইল পশ্চিমে বাঙ্গালীপ্রধান এই সহরটির অবস্থা কত জটিল, তা ভুক্তভোগী না হ'লে বুঝ্তে পারবেন না। দূন-পাঞ্জাব এক্স্প্রেসে বেলা বারোটার সময় কলিকাতা থেকে রওয়ানা হ'য়ে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় দেওঘর পৌঁছুলাম। টিকিট দিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে একা, ঘোড়াগাড়ী ও রিক্সা সব সওয়ারী নিয়ে চলে গেল। একজন দারওয়ান শ্রেণীর লোক প্ল্যাটফর্ম্ থেকে সব শেষে বেরিয়ে এল। তার নাম পালোয়ান চৌবে। যে কোনও একটা হোটেলের সন্ধান তার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রলাম। সে ব'লল—নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় তার 'ভতিজা' দারওয়ানের কাজ করে—তার কাছে সে শুনেছে সেখানে 'জাগ্গা' নাই। সারা সহরে বাড়ী কোথাও খালি নেই। কোনও হোটেলের সন্ধান সে জানে না। ষ্টেশনের লোকেরাও কোনও হোটেলের সন্ধান দিতে পারলেন না। পালোয়ানের মনটা একটু নরম হ'ল আমার দুরবস্থা দেখে। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বাঙ্গালী ডাঁকু কিনা এ বিষয়ে একবার নেপথ্যে সন্দেহ প্রকাশ সে ক'রেছিল। অবশেষে একে একে সকলেই স'রে পড়ার পর পালোয়ানজি ব'ললে—হামার মালিকের বাসার নজিগে হামার একঠো ছোটা এক কামরা ঘর আছে—সো হামি ভাড়া দিয়ে থাকে। লাগাওয়াং ইন্দারা আছে—টাট্টির ফরাগৎ জগ্গা আছে—ভাড়া লেকিন্ রোজ দু-রূপেয়া দিতে হোবে। আমি বিশেষ জরুরি কাজে এসেছি। কয়দিন থাকতে হবে। বাধ্য হ'য়ে রাজী হ'য়ে গেলাম। ষ্টেশনে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাউন্ ট্রেনের সওয়ারী নিয়ে তখন এল। তাতে আমার জিনিষপত্র তুলে পালোয়ানজী সহ রওনা হ'লাম। কিছুক্ষণ পরে নন্দন পাহাড়ের নীচে একটা ফাঁকা যায়গার গাড়ী দাঁড়ালো। দারোয়ান কথিত এক কামরাওয়ালা বাড়ীতে উঠ্লাম। বড় বাড়ী একটা কাছে ছিল। সেখানকার মালী পালোয়ানের আদেশে কুয়া থেকে জল তুলে দিয়ে গেল এবং একটা খাটিয়া রেখে গেল। সঙ্গে খাবার যা ছিল, খেয়ে শু'য়ে প'ড়লাম। মালীকে বারান্দায় শুতে ব'লে পালোয়ান তার মালিকের বড় বাড়ীতে চ'লে গেল।

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর জানলাম—ভোরের ট্রেণে বড় বাড়ীর মালিক কলিকাতা থেকে এসে পৌঁছেছেন। বিকালে গৃহস্বামীর সঙ্গে আলাপ ক'রে এলাম। তারপর একসঙ্গে দু'জনে বেড়াতে বেরোলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপের ফলে আমার কণ্ট্র্যাক্টের কাজ কর্ম্মে বিশেষ সাহায্য হ'ল। বাড়ী বা হোটেলের চেষ্টায় তিনি সাহায্য ক'রেও কিছু ক'রে উঠ্তে পারলেন না। আমার অসুবিধা হ'লে পালোয়ানের কামরা ছেড়ে দিয়ে তাঁদের বাড়ীতে উঠে আস্তে ব'ললেন। আমি দরকার মনে ক'রলাম না। মধ্যে মধ্যে চায়ের নিমন্ত্রণ ওবাড়ীতে চ'লতে লাগ্লো। ভদ্রলোক বিপত্নীক। তাঁর বড় মেয়ে সুনন্দা কলিকাতায় এম্-এ পড়ে। হোষ্টেলে থাকে পড়ার সুবিধার জন্য। ছোট ছেলেমেয়ে দুটিও কলিকাতায় স্কুলে পড়াশোনা করে। বৎসরের এই সময় তিনি মাসখানেকের জন্য দেওঘরে থাকেন। 'সুনন্দার সঙ্গে আলাপের পর আমার প্রোগ্রামের অনেক ওলট্ পালট্ হ'য়ে গেল। বাড়ীতে (গয়ায়) জানালাম কোম্পানীর কাজে দেওঘরে দেরী হ'তে পারে। যাহোক কলিকাতা ফেরার আগে গয়া হ'য়ে নিশ্চয় যাবো। কিছুদিন পরে গয়া গেলাম। আমার সঙ্গে এল সুনন্দা। সেও ক'লকাতা ফিরে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে গয়া এসেছে—কারণ তার বুদ্ধগয়া দেখার সখ অনেকদিন থেকে, অতএব পথে বুদ্ধগয়া দেখে ফিরে যাবে। তার পিতা মাতৃহীনা আদরিণী কন্যার প্রস্তাবে অসম্মত হ'তে পারলেন না। তিনি আমাকে একদিন আড়ালে ডেকে ব'লেছিলেন, আমার জানা-শোনা ভালো পাত্র যদি থাকে তবে যেন একটু খোঁজ ক'রে তাঁকে জানাই—এবং তাঁর কলিকাতার বাসায় মধ্যে মধ্যে যাই। সুনন্দা আড়াল থেকে একথা শুনেছিল। আমাকে নিভৃতে সে ব'ললে—দেখুন বাবা আপনাকে কি সব ব'ললেন না, ওসব কিছু খোঁজ ক'রতে হবে না। যাই হোক বুদ্ধগয়া দেখেই সুনন্দা কিন্তু চ'লে গেল না। দু'দিন পরে সুনন্দাকে নওয়াদা হ'য়ে নালন্দা ও রাজগীর নিয়ে যেতে হ'ল। সে ব'লল, রাজগীর থেকে বক্তিয়ারপুর হ'য়ে—সে কলিকাতা ফিরে যাবে। কিন্তু রাজগীর থেকে আবার ফিরে এল আমার সঙ্গে—গয়ায়। ব'ললে রাত্রে একলা যেতে ভরসা হয় না—যা ভিড় গাড়ীতে। ধিঙ্গী মেয়ের, ধিঙ্গীপনা দেখে স্ত্রী অবাক হ'লেন। সুনন্দাও কেমন ট্যাক্‌লেস্—যেখানে যেতে চাইবে—সঙ্গে আমার স্ত্রীকে যেতে ব'লবে না। আমি মাঝে থেকে অপ্রতিভ হই।

এর কয়েকদিন পরেই আফিসের ছুটী শেষ হ'ল। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে মার দেওয়া নারিকেল-চিঁড়ে মুখে দিয়ে তুফান-মেলের জন্যে রওয়ানা হ'লাম—দু'খানা সাইকেল—রিক্সায়। যাবার সময় স্ত্রী আড়ালে ব'ললেন—ধিঙ্গী মেয়েটা কাছে কাছে ছিল ব'লে, অনেক কথা ব'লব ব'লব ক'রে ব'লতে আর অবসর পেলাম না। যখন মনে হ'ল বলি, রাত্রে যখন রোজ শুতাম তখন ত' কোনও দিন সুনন্দাকে সে ঘরে ঢুকতে দেখি নি। কথা আর বাড়ালাম না। রিক্সায় ষ্টেশনে না গিয়ে ডাউন ট্রেণের হোম-সিগ্ন্যালের কাছে গেলাম। সুনন্দা একটু ঘাবড়ে যাওয়া যাওয়া ভাব চেপে গেল। ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কাটা ছিল। সেদিন ট্রেণের ভিড়ের কথা ভেবে আমি সিগ্ন্যালারকে আগে থেকে টিপ্স্ দিয়ে তুফান মেলকে হোম্-সিগ্ন্যালে লাইন্ নট্-ক্লিয়ার্ দিয়ে পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখার ব্যবস্থা

ক'রেছিলাম। গাড়ী ব্যবস্থামত সেখানে দাঁড়াতেই ডিহরী থেকে যে বোগিটা আসে সেটাতে দুজনে জিনিসপত্র নিয়ে উঠে প'ড়লাম। অন্য কোনও কাম্‌রায় জায়গা খালি দেখ্‌লাম না। মনে ক'রেছিলাম বোগিটা খালি থাকবে। কিন্তু উঠে জান্‌লাম আমার চেয়েও উৎসাহী কয়েকজন এই বোগিতে জায়গা পাবার জন্য সেদিন দুপুরে বেনারেস প্যাসেঞ্জারে গয়া ছেড়ে সন্ধ্যায় ডিহরিতে ওই বোগিতে উঠেছেন এবং এখন দিব্য বেঞ্চে বিছানা পেতে শুয়ে আস্‌ছেন। কষ্ট ক'রলে কেষ্ট মেলে। সুনন্দাকেও বলা ছিল। সে ট্রেণে উঠেই হোল্ড-অল্‌ খুলে ফেল্‌লে এবং জান্‌লার ধারে যাঁরা শুয়ে বা ব'সেছিলেন তাঁদের নিজ নিজ বিছানা তুল্‌তে অনুরোধ ক'রতেই—সকলেই নিজের বিছানা তুলে নিয়ে সুনন্দাকে বেঞ্চে বিছানা পাততে জায়গা ছেড়ে দিলে।

গাড়ী ছাড়ার পর যাত্রীদের শয়ন, উপবেশন, বোঁচকা হস্তে দণ্ডায়মান প্রভৃতি অবস্থার নানা রকম এ্যাড্‌জাষ্ট্‌মেণ্ট্‌ হ'ল। জানানা-সওয়ারীর বিছানার ম্যাগিনট মাইন অক্ষত রইল। সুনন্দা একবার ব'ললে—এমন পূর্ণিমার রাত দেখে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। ওয়ার্ণ্‌ ক'রে দিলাম, সে উঠে ব'স্‌লেই তার বিছানার ধার গুটিয়ে দিয়ে লোকে বেঞ্চিতে ব'সতে আরম্ভ ক'রবে—এবং বিছানা গোটান আরম্ভ হ'লে, তার পরিণতি সাম্‌নের বেঞ্চির মতন হবে। সে নিদ্রার ভাণ ক'রলে—এবং একটু পরেই নিদ্রিত হ'য়ে গেল। আমি কোণের দিকে অর্দ্ধশয়ান ভাবে ঝিমুতে লাগ্‌লাম। ট্রেণ বেগে ছুট্‌তে লাগ্‌লো। পাশের বেঞ্চে একটা আলোচনা হ'চ্ছিল।

তাদের আলোচনা শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি ঠিক নেই। আসানসোল পৌঁছাবার পর সুনন্দার গলার শব্দ পেয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ বুঁজে তার কথা শুনতে লাগ্‌লাম। জান্‌লার বাইরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পুরুষ কণ্ঠ ব'লছে—এই বগিরই পাশের কম্পার্ট্‌মেণ্টে আমার রিজার্ভড্‌ ফাষ্ট্‌ক্লাস কুপে—আর কেউ নেই, চ'লে এস তুমি। সুনন্দা ব'ললে—বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে দোকা এক কুপেতে ট্র্যাভল্‌ করা কি ভাল দেখাবে? উত্তর হ'ল—তোমাকে এত শেখাচ্ছি—তবু কন্‌ভেন্‌শানালিজ্‌ম্‌ গেল না? তার উত্তর—আমার লাগেজ-গুলো এখান থেকে তোলার ব্যবস্থা কর তাহ'লে। তার উত্তর—আমার বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর একটা আইডিয়া আছে আমার—এমন ভাবে দেখা যখন হ'য়ে গেল তোমার সঙ্গে—বর্দ্ধমানে নেবে আমরা দু'জনে ট্যাক্সি ক'রে ক'লকাতা যাবো। তার উত্তর—না, না সেটা ভাল হবেনা। উত্তর—আচ্ছা সে হবে এখন। বাই দি ওয়ে, তোমার সঙ্গে, হু ইজ্‌ হি? তার উত্তর—ও আমাদের দারওয়ানের ভাড়াটে। কলিকাতা যাচ্ছিলো—বাবা ওকে সঙ্গী ঠিক ক'রে দিলেন। তার উত্তর—দ্যাট্‌ পালোয়ান? সে তোমাদের চাকরী এখনও ক'রছে? উত্তর—হ্যাঁ কোথা আর যাবে ও? আমাকে এ্যাক্‌সিডেণ্ট্‌ থেকে সেভ্‌ করার জন্য মা ওকে যে পুরস্কার দিয়েছিলেন—তা দিয়ে দেওঘরে আমাদের বাড়ীর কাছে একটু জমী নিয়ে—এক কাম্‌রা একটা বাড়ী ও তুলেছে এবং ভাড়া দিচ্ছে। উত্তর—আই সী। তুমি এস তা'হ'লে? ওকে ডেকে তুল্‌তে হবে? তার উত্তর—কিছু দরকার নেই। তোমার বেয়ারাকে ব'লে দাও,—যা বলবার ব'লে—লাগেজ নিয়ে চলুক্‌। সুনন্দা গাড়ী থেকে নেমে গেল। একটা বেয়ারা এসে, 'মিসি বাবার' লাগেজ নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চিটা হুড়মুড় ক'রে লাগেজ ও যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেল। আমার কাছে সবটা এক স্বপ্নের মতন বোধ হ'ল। 'দারওয়ানের ভাড়াটের' দায়িত্ব কতখানি সুনন্দার ক'লকাতা না পৌঁছান পর্য্যন্ত—তার বাবা ব'লতে পারেন কিনা—তোমার সঙ্গেই ত' ওকে পাঠিয়েছিলাম—এই সব ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে প'ড়লাম। ঘুম ভাঙ্গ্‌লো—একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী ইন্‌ করার পর।

ট্রেণ থেকে নেমে পাশের ফাষ্ট্‌ক্লাস কুপের দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখ্‌লাম—কুপে খালি। বর্দ্ধমান থেকে ট্যাক্সিতে যাবার আইডিয়ার কথা মনে প'ড়লো। আরও মনে প'ড়লো, সুনন্দার বাবার মা-হারা কন্যাটির জন্য সুপাত্র অন্বেষণের অনুরোধ,—তথা সুনন্দার নিষেধ বাণী। ভুলে যেতে চাইলাম,—নালন্দায় উন্মুক্ত প্রস্তর বেদীর ওপর রাত্রে চাঁদের আলোয় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে আমার পাহারায় সুনন্দার গভীর নিদ্রা যাওয়া, রাজগীরে গুহার ভেতর হঠাৎ সাপের অস্তিত্ব বোধ ক'রে ব্যাকুলভাবে আমার কটিলগ্ন হ'য়ে তার গুহা হ'তে নিষ্ক্রমণ এবং আমার পরিহাসে আর বিবর্ণ মুখে সাবলীল হাসির আবির্ভাব,—এমনি আরও কত কি।

গোলাপ ও মালতী

শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র

দূর পারস্য বসোরার স্মৃতি ওমরের গীতি গেয়ে,
রূপ-সৌরভে গৌরবে ভরি এলো বিদেশিনী মেয়ে।
বোস্তানী পাখী গান গায় নাকি ঘুম ভাঙ্গাবার তরে
চাঁদনী রাতের প্রহরে প্রহরে সুরে সুরে উঠে ভ'রে।
রাঙা গাল ওর রাঙাইতে আরো ঝরায় বুকের লোহু
কাঁটা হ'য়ে ফুটে বেদনা তাহার রঙ, হ'য়ে জাগে মোহ।
মরি মরি মোর মুগ্ধমানস হেরি বরণের মেলা
বিকচোন্মুখ যৌবন জাগে অনুরাগে করে খেলা।

সহসা সুরভি ঘননিশ্বাসে চমকি ফিরানু আঁখি,
পাতার আড়ালে মালতী-বধূর একি অভিমান নাকি?
চির-চেনা মুখ হৃদি উৎসুক ভুলিতে পারি কি তোরে?
রাণী থাকে দূরে রাণীর আসনে, প্রিয়া বাঁধে বাহু-ডোরে।

বৈভবে ঘেরা চৌদিক যার নাহি অবকাশ তাঁই
তুমি রিক্তের একান্ত কাছে আঁখিতে তোমারি ঠাঁই।

আধুনিক জগতে বিজ্ঞান ও ধর্ম

রায় বাহাদুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

(২)

বিজ্ঞান-প্রগতির ফলে নানাবিধ তথ্যের আবিষ্কার জড় যন্ত্রতন্ত্রের মূল ভিত্তিকেই দুর্ব্বল করিতেছিল। বিজ্ঞান বস্তুকে (mass) আসল পদার্থ ও শক্তিকে (energy) তাহার উপসর্গরূপে কল্পনা করিয়া আসিতেছিল। শক্তির সংরক্ষণ (conservation of energy) শক্তিকে একটি অক্ষয় স্থায়ী আসন দিলেও বস্তুর প্রাধান্তকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল বস্তু পিছু হটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার এ পরিত্যক্ত স্থানগুলি দখল করিয়া শক্তি বিজয় গর্ব্বে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পরিশেষে, বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বস্তু একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাড়িৎ-চুম্বক (electro-magnetic) ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তখন বস্তুকে (matter) স্রেফ বাদ দিয়া শক্তি লইয়াই পরীক্ষা সুরু করিলেন। যে পরমাণুকে (atom) বৈজ্ঞানিক এতদিন অবিভাজ্য (indivisible) বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও চূর্ণ হইয়া গেল—তখন দেখা গেল যে তাহার মধ্যে কতিপয় বিদ্যুৎকণা (electron ও proton) ভিন্ন আর কিছু নাই। বৈজ্ঞানিক আরও দেখিল, প্রত্যেক পরমাণু প্রকৃতপক্ষে একটি সৌর-জগৎ, প্রোটোনকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইলেকট্রোনগুলি ধারণাতীত বেগে ঘুরিতেছে। বিদ্যুৎ-কণার সংখ্যা ও সংগঠন (organisation) মৌলিক পদার্থগুলির (element) মধ্যে ভিন্নরূপ ; এ সংখ্যার ও সংগঠনের বিভিন্নতাই সোণাকে সোণা ও লোহাকে লোহা অর্থাৎ মৌলিক পদার্থগুলিকে বিভিন্ন গুণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। আসলে কিন্তু মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন হইলেও, যে বিদ্যুৎকণা লইয়া উহারা গঠিত তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। স্বর্ণ ও পারদের পরমাণুতে বিদ্যুৎকণার সংখ্যা ও গঠনের তারতম্য শুধু একটিমাত্র ইলক্‌ট্রোণ লইয়া…ঐ বিদ্যুৎকণাটিকে উহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া অপরটির কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে পারা সোণা হইয়া যায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আণবিক সৌরজগতের বিশাল শূন্যগর্ভে ঐ বিদ্যুৎকণাগুলি কয়েকটি ক্ষুদ্র সরিষার মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত,… এবং উহাদের সংস্থান, সংগঠন ও গতির ভেল্কী বাজি শূন্যকেই বস্তুর আকার দান করিতেছে! এই শূন্য ও গতিবেগ বৈজ্ঞানিকের মনে একটা মস্ত ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিল। এতদিন সে মনে করিত বস্তুর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অগ্রসর, যেমন উৎক্ষিপ্ত তীরের শূন্যে উত্থান… উহার গতি একটি অবিচ্ছিন্ন (continuous) চলতি পথে ঐগুলির ছেদ নাই এবং তাহা যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন—নিউটনের গাণিতিক সূত্র-গুলি (Principle) ঐ ধারণাকেই সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু এই বদ্ধমূল ধারণাকেও ওলট্-পালট্ করিয়া দিয়া গণিত এখন দেখাইল যে প্রাকৃতিক পদার্থের গতি ধারাবাহিক নহে, বিভিন্ন এবং উহার মধ্যে কোন সুনির্দ্দেশ নিয়ম নাই। সিনেমার পটে চিত্রকে দেখা যায় চলমান গতি-ধারা রূপে, কিন্তু ফিল্‌মে ঐ ছবিটিই অসংখ্য ক্ষুদ্র খণ্ড চিত্রে বিভক্ত ; তেমনই প্রকৃতিও গতিখণ্ডগুলিকে জোড়া দিয়া ধারাক্রমের বিভ্রমের সৃষ্টি করে। প্রকৃতি থাকিয়া থাকিয়া ঝম্পা (jerk) দিয়া চলে, উহার গতি ধারাবর্জ্জিত (discontinuous) ইহাই ম্যাক্‌স্ প্ল্যাঙ্কের কোয়ানটাম্ তত্ত্ব (Quantum Theory) এই তত্ত্ব হইতে বিজ্ঞান কার্য্য-কারণ (cause and effect) সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। তাহা এই যে ফল কারণের পুনরাবৃত্তি, রূপান্তর বা ছদ্মবেশে আবির্ভাব মাত্র নহে …কারণগুলির সংস্থান ও সংগঠন যে ফল প্রসব ক'রে তাহা সম্পূর্ণ একটি নূতন জিনিস, এবং উহার মধ্যে এমন সব গুণ-ধর্ম্মের বিকাশ (emergence) ঘটিয়া থাকে যাহা কারণের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন,…এখানে বোধকরি এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, উহা জীবনতত্ত্ব, বিবর্ত্তন বাদ—এমন কি দর্শনের মধ্যেও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

গণিতের আর যে তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক জগতকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহা আইনষ্টাইন প্রবর্ত্তিত আপেক্ষিকতা-বাদ (Theory of Relativity)। এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে প্রকৃতির নিয়ম অতির্দ্দেশ্য, যেহেতু উহা দেশ-কালের (space-time) বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। দেশকে (space) কাল (time) হইতে পৃথক করিয়া দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতা এই তিনটি বিস্তারিত সংযোগ রূপে কল্পনা করা প্রাকৃতিক দর্শনের অভ্যাস,…ইউক্লিডের ভূমিতি ঐরূপ কাল-বর্জ্জিত দেশ লইয়াই গবেষণা করিয়াছে। কিন্তু সত্যকার জগতে দেশকে কাল হইতে বা কালকে দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না,…কেননা এমন দেশ নাই যেখানে কাল নাই এবং এমন কাল নাই যেথানে দেশ নাই। দেশের যে কোন বিস্তৃতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে কালের পথ ধরিয়াই চলিতে হয়। পথকে অতিক্রম করি আমরা কালের মধ্য দিয়া, তাই গন্তব্যে পৌছিতে ঘণ্টা মিনিটের হিসাব করিয়া থাকি। আবার দেশের প্রতিটি বিন্দু এক একটি কাল-বিবর্জ্জিত দেশ-বিন্দু নহে, উহা দেশ-কাল বিন্দু (point instant)…নিজ নিজ কালের একটি রেখা ধরিয়া চলিয়াছে, উহার প্রতিটির একটি ইতিহাস আছে এবং ঐ কালের ইতিহাস দেশকে বিশিষ্ট পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। কালকে আমরা সমগ্র বিশ্বের উপল খণ্ডের উপর স্রোতের মত বহমান দেখিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুত উহা সেরূপ নহে। পুরাণে ব্রহ্মার মুহূর্ত্তের উল্লেখ আছে, তাহা মানুষের কাল-জ্ঞান হইতে পৃথক, দেশ-কালের স্বরূপও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন। প্রকৃতির এমন কোন নিজস্ব নিরলম্ব বিশ্ব-মান নাই যাহার দণ্ড দিয়া সকল দেশ-কাল একই পরিমাপে যাচাই করা চলিবে। পৃথিবী প্রতি মুহূর্ত্তে ১৮ মাইল গতিবেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু পৃথিবীকে স্থির বলিয়া ধরিয়া লইয়াই আমরা রেলগাড়ির বেগ নিরূপণ করি। আবার একই গতিবেগ বিশিষ্ট পাশাপাশি ধাবমান দুইটি গাড়ির যাত্রীগণের কাছে উভয়ই স্থির,…বেগের তারতম্য ঘটিলে একের তুলনায় অন্যকে গতিসাধন দেখিতে পাওয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও বিকারের কারণ দেশ-কাল ধারাক্রমের (space, time continium) সংস্থান ও সংগঠন, উহার বক্র খণ্ডিত অংশ (curvature) হইতে যাবতীয় বিভিন্নতার সৃষ্টি এবং উহাই বিদ্যুৎ কণার সন্নিবেশকে বস্তুর বিশিষ্ট রূপ দান করিয়াছে।

বস্তুতন্ত্র বা জড়বাদ (materialism) বিশ্বের সকল মীমাংসা করিতে উদ্যত হইয়াছিল বস্তুর মৌলিক সত্ত্বা ও জড়ত্বকে, প্রকৃতির প্রণালীবদ্ধ নিয়মকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়া…কিন্তু দেখা গেল যে বস্তু নাই, জড়ত্ব নাই, প্রকৃতিও ধারাবর্জ্জিত ও অনির্দ্দেশ্য। পদার্থবিজ্ঞান জড়যন্ত্রকে দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া যখন আবিষ্কার করিয়া বসিল, জগৎ বস্তু-সম্পর্ক শূন্য এক বিরাট শক্তির ইন্দ্রজাল…মায়া-মরীচিকার শোভাযাত্রা …তখন বস্তুতন্ত্রের বিরাট সৌধটি যেন কোন মায়াবীর যাদুদণ্ডের স্পর্শ নিমেষে অন্তর্ধান করিল। ইহা সত্য যে, ঐ বিরাট শক্তির স্বরূপ বিজ্ঞান আজও জানিতে পারে নাই,…প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্ত্বার সহিত সাক্ষাত সম্পর্ক এখনো স্থাপিত হয় নাই। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর যেমস্ জিনস্ বলিয়াছেন, "The outstanding achievement of twentieth century physics is not the theory of Relativity, nor the theory of Quanta nor the dissection of atom ; it is the general recognition that we are not yet in contact with the ultimate Reality" মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ…শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই মহাবাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিজ্ঞান জনসমক্ষে ধরিয়াছে,

জড়বাদের স্থলে বৈদান্তিকের মায়াবাদকেই সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা অল্প শ্লাঘার কথা নহে।

বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতি বিশ্লেষণমূলক,···সমগ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া পরীক্ষা করা উহার কার্য্য। অণু পরমাণুকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া বিজ্ঞান শক্তির ইঙ্গিত পাইয়াছে, কিন্তু শুধু বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা দ্বারা সমগ্রের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সে কি কখনো পারিবে? দেশ-কালের অন্তর্নিহিত সত্তা···অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্···কি টেলেস্‌কোপ বা মাইক্রস্‌কোপের দৃষ্টি সীমার মধ্যে ধরা দিবে? ইন্দ্রিয় সংযোগে বাহ্য প্রকৃতির যে জ্ঞান আমরা লাভ করিয়া থাকি তাহার একটা জীবন-তত্ত্ব-মূলক তাৎপর্য্য আছে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ইন্দ্রিয়গুলিকে তীক্ষ্ণ সচেতন করিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বিষয়ই উহারা গ্রহণ করিতে পারে না। তাই, **ultra violet, infra-raol** কিরণগুলি আমরা চোখে দেখিতে পাই না, ইথরের বিদ্যুৎ তরঙ্গের স্পন্দনও অনুভব করিতে পারি না···উহাদের তথ্য জানিতে হইলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ আমাদের মনে যে ছাপ অঙ্কিত করে তাহা ফটোগ্রাফের অনুরূপ,···ঐ ছবিতে রক্ত-মাংসের চিহ্ন মাত্র নাই। মনের ফলক হইতে প্রতিবিম্বকে পৃথক করিতে আমরা অক্ষম, তেমনই আবার বস্তু-সত্ত্বার সত্য পরিচয়ও প্রতিচ্ছবির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাহার একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান কিরূপ তাহা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,···আমরা একটি অন্ধকার গুহায় আলো জ্বালিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছি। পশ্চাতে গুহামুখে অজ্ঞাত সত্ত্বার আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটিতেছে, ঘুরিয়া দেখিবার শক্তি আমাদের নাই, শুধু প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সম্মুখে গুহাগাত্রে চলন্ত ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া উহাকেই প্রকৃত সত্ত্বা বলিয়া মনে করিতেছি।

গুহাভ্যন্তরের ঐ ছায়াবাজি লইয়া বিজ্ঞানের খেলা, উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক শ্বেতকেতু উপাখ্যানের পুনরভিনয় করিতেছেন···এক স্থানে পৌঁছিয়া আর কিছু দেখা যায় না, বস্তু নাই! তখন বিজ্ঞানের পালা সাঙ্গ হইয়া আসে, জাগে উপলব্ধি (**intuition**)···সেষ্য অণিমা ঐতদাত্ম্যং ইদম্ সর্ব্বং। এই উপলব্ধিজাত জ্ঞান বিতর্কের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহাও ঠিক যে বিজ্ঞান সত্যের বিকার, নির্জ্জীব বহিরাবরণকেই বিচার বিশ্লেষণ করে,···উহা বস্তুবিচ্ছিন্ন খণ্ড দর্শন (**abstraction**) মাত্র। নদীর প্রবাহ হইতে আমরা এক গণ্ডুষ জল তুলিয়া বিশ্লেষণ করিতে পারি,···আমাদের ঐ কার্য্য হইয়া উঠে তখন শব-ব্যবচ্ছেদ, জীবন্ত স্রোতধারা মুঠের বাহিরে তেমনই বহিয়া যায়। স্রোত-জীবনের মূল সত্যের পরিচয় পাইতে হইলে উহারই স্নিগ্ধ প্রবাহ মধ্যে অবগাহন করিতে হয়। ঘূর্ণ্যমান আবর্ত্তের, বীচিক্ষুব্ধ সলিলের শক্তিপুঞ্জ আমরা পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারি, উহার সহিত যখন আমাদের একাত্মবোধ জাগিয়া উঠে এবং তাহাই সারা মন-প্রাণ ভরিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রতিধ্বনি তুলিয়া দেয়। এই উপলব্ধিজনিত অপরূপ উচ্ছ্বাস, সত্যের আনন্দময় রূপ ধর্ম্মের, দর্শনের ও শিল্পের নিজস্ব সম্পদ···বিজ্ঞানের দাবী ওখানে পৌঁছিতে পারে নাই।

বিজ্ঞান জগতকে মায়া-মরীচিকারূপে দেখাইয়াছে, সে জন্য সবই মিথ্যা, সৌন্দর্য্যের নীতির-সমাজ গঠনের কোন কিছুরই মূল্য নাই···এরূপ মনে করা ভুল। সত্য আপেক্ষিক···গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে সত্যের যে আকার প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে তাহা অন্যরূপ; আমরা শুধু তুলনা করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করি। মানুষের জীবনযাত্রার ব্যবহারিক সত্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য হইতে পৃথক···উহা বিভিন্ন স্তরের সত্য। সত্যের একটি বিশিষ্ট স্তরে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ নীতিজ্ঞান, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের বিকাশ দেখা দিয়াছে···প্রকৃতির মূল কারণ, স্বয়ংসিদ্ধ সত্ত্বার মধ্যে ঐ সব গুণ ধর্ম্মের অস্তিত্ব না-ও থাকিতে পারে; সেখানে হয়ত তুমি নাই, আমি নাই, হন্তা ও হত, খাদ্য ও খাদক কিছুই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, ক্ষুধার সময় আহার্য্যকে কতগুলি ইলেক্‌ট্রোন প্রোটোন সমন্বিত মায়া বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে মূঢ়তা ও অজ্ঞানতাই প্রকাশ পাইবে। আমাদের দেশে মায়াবাদ অনেক ক্ষেত্রে ঐরূপ অদ্ভুত আচারে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। গোটা সংসারকে ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, জ্ঞান-বর্জ্জিত অপরিণত মনোবৃত্তি সম্পন্ন অনেক মানুষ আপনাকে ও জগতকে প্রতারিত করিয়াছে···ইহা বোঝে নাই, মায়ার খেলায় মায়ার সংসারই সত্য এবং ঐ ক্ষেত্রেই মায়ার পুতুলের চরম সার্থকতা। আমাদের শাস্ত্রে উপলব্ধিজাত তত্ত্বজ্ঞানকে বিদ্যা বলা হইয়াছে, অন্য সর্ব্ববিধ জ্ঞান অবিদ্যার রূপ। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা একই চিরন্তন সত্ত্বার অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির জ্ঞান···ধর্ম্ম অন্তরের উপলব্ধি, বিজ্ঞান বাহিরের অন্বেষণ। অবিদ্যাকে বাদ দিয়া বিদ্যার ধ্যান ও চর্চ্চা অসম্পূর্ণ এবং উহা আদৌ ফলপ্রসূ হইতে পারে না, ঈশোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাম্ উপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যে অবিদ্যার উপাসনা করে সে অন্ধ তমো গর্ভে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করে সেই ব্যক্তি, যে শুধু বিদ্যার উপাসনা করে। আত্ম প্রকৃতি ও নৈসর্গিক জগৎ···জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়···উভয়ের সংযোগ ও পরস্পরের পরিচয়ের মধ্যেই যথার্থ জ্ঞান ফুটিয়া উঠে···এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা, আত্মদর্শন ও বিজ্ঞান, এই দুয়ের সহযোগে মানুষ অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ত্ব লাভ করিতে পারে।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তথর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

প্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানকে বিজ্ঞান উপহার দিয়াছে, মানুষের জীবনের পথ সুগম করিবার জন্য···সে উহাকে অশ্বের মত রথে জুড়িয়া ঘণ্টার পথ মিনিটে অতিক্রম করিতেছে। কিন্তু, সারথীর দৃষ্টি অন্ধ, উন্মাদের মত শুধু গতির আনন্দে মাতিয়া, পথ বিপথ ভুলিয়া পাহাড়ের একটি সঙ্কটপূর্ণ ভৃগুস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর এক ধাপ, রথ হয়ত চূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহার এত সাধের বিজয় যাত্রা কি শেষে সমাধিস্তূপে পরিণত হইবে? হয়ত, এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। জীবন-প্রকৃতি আজ আত্মবিস্মৃত, কিন্তু উহার বাঁচিবার প্রবৃত্তি লোপ পায় নাই···তাই, একদিন আত্মোপলব্ধি, একাত্মবোধ, বিশ্ব-মানবের ইষ্ট ও সমগ্রের অনুভূতি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমেরিকার রাজনীতিজ্ঞ ওয়েনডেল্ উইল্‌কি প্রাচ্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া **One World** নামে যে বইখানি লিখিয়াছেন উহাতে বিশ্বমানবের একাত্মবোধের সূচনা দেখা যায়। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই,···মানব-জাতির শৈশবে ধর্ম্মকেও দুর্ব্বল চরণে চলিতে দেখা গিয়াছে, শত্রুর উচ্ছেদ-সাধন করিতে সে মারণ উচাটন মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে, তখনো তাহার আত্মচেতনা জাগে নাই। বিজ্ঞানকেও আজ ঐ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়,···উহার অভ্যুত্থানের কাল মাত্র তিন শত বৎসর। স্যর্ অলিভর লজের কথায়,···মানুষ পৃথিবীতে নব-আগন্তুক, তাহার জীবনে সবেমাত্র প্রভাত দেখা দিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র জীবাণু যখন জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতিরূপে দেখা দিয়াছিল, তখন তাহা দেখিয়া বৃক্ষ পশু ও পক্ষীর আবির্ভাবের কথা কে ভাবিতে পারিত? আর আজ মানবের বর্ত্তমান পরিণতি দেখিয়া দূর ভবিষ্যতে বিবর্ত্তনের পথে সে কোথায় গিয়া পৌঁছিবে, কে তাহা কল্পনা করিতে পারে?

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৩

বিস্ময়ের ভাবটা কিছু পরিমাণে কাটিলে আত্মস্থ হইয়া বলরাম বসিলেন। খাসমহল কাছারীর সেই তরুণ তহশীলদার মণিমোহনই বটে। এতটা আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জীবনটা ঘুরিয়া চলিয়াছে চক্রবৎ গতিতে—মণিমোহনেরও পদোন্নতি হইয়াছে। বলরামের মনটা অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল। আহা, উন্নতি হোক, সব দিক দিয়াই উন্নতি হোক। বড় ভালো ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একটা অবচেতন গর্বের অনুভূতি আসিয়া তাঁহাকে দোলা দিয়া গেল। মণিমোহন—সাধারণের চোখে আজ সে হাকিম, অসংখ্য লোকের দণ্ডমুণ্ডের সে বিধাতা। কিন্তু বলরামের কাছে দশবছর আগেকার সেই ছেলেমানুষ সরকারী বাবুটি ঠিক তেমনিই রহিয়া গিয়াছে—এতটুকু ইতর-বিশেষ হয় নাই, একবিন্দু রূপান্তর ঘটে নাই। কেশীকংসজয়ী সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেও কি যশোদা এমনি করিয়াই ভাবিতেন ?

প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখে বলরাম মণিমোহনের দিকে নির্নিমেষ ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

—কবিরাজ মশাই, একটু চা খাবেন নাকি !

বলরাম ভাবিতে লাগিলেন—হাঁ, বয়স একটু বাড়িয়াছে বইকি মণিমোহনের। গলার আওয়াজটা বেশ গভীর আর গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে—জাঁদরেল একটা হাকিম হইতে গেলে যা দরকার হয়। গায়ের রঙ্ আরো একটু কালো হইয়াছে—লাবণ্য শুকাইয়া গিয়া যেন একটা রুক্ষ বাস্তবতার ছাপ পড়িয়াছে সর্বাঙ্গে। চোখের দৃষ্টিতে আজ যেন খানিকটা দাম্ভিকতা আর আলস্যের স্তিমিত ছায়া ; অথচ সেদিন এই চোখ দুটি মধ্যে মধ্যে যেন স্বপ্নের ঘোরে পিছাইয়া পড়িত, শাণিত বুদ্ধিতে চিক চিক করিত। হাঁ, বয়স নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে মণিমোহনের। একটা দশাসই দস্তুর মতো হাকিম হইতে গেলে যা দরকার, সবই।

—কবিরাজ মশাই, একটু চা করতে বলি ?

কবিরাজ ভাবনার অতলতা হইতে ভাসিয়া উঠিলেন। গর্বে গৌরবে মনটা ভরিয়া উঠিতেছে। বড় ভালো ছেলে মণিমোহন। এতদিন পরে, এতটা বড় হইয়াও তাঁহাকে কেমন মনে রাখিয়াছে, আদর অভ্যর্থনা করিতে এতটুকু ত্রুটি নাই কোথাও। বলিলেন, চা ? না, চা তো বিশেষ—

—খান না এক পেয়ালা। চায়ের মতো কী আর জিনিব আছে ? গ্রীষ্মকালের শীতল পানীয়, আর শীতের দিনে গরম পানীয়—বিজ্ঞাপনে পড়েননি ? আপনার মৃত-সঞ্জীবনীসুরার চাইতে অনেক বেশি ফলদায়ক, কী বলেন ?

—যা বলেছেন।

ভারী খুশি হইয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন। মাথার তৈল-মসৃণ সুডোল ইন্দ্রলুপ্তটির উপরে রোদের একটি ফালি পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল ; বলরাম যদি গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী হইতেন, তাহা হইলে শিষ্য-সামন্তেরা অনায়াসেই মনে করিতে পারিত যে একটা অশরীরী জ্যোতির্ময়তা বলরামের মাথা হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে বাহিরে।

—ওরে, দু পেয়ালা চা দিয়ে যাস্ এখানে—হাঁকিয়া চাকরকে বলিয়া দিল মণিমোহন। সত্যিই হুকুম করিবার মতো গলার আওয়াজটা বটে। পদ-মর্যাদায় চাপে যথোচিত ভারিক্কী আর গুরুভার যে হইয়া উঠিয়াছে, এ সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় পোষণ করিবার কারণ নাই কোনোদিক হইতে। সেদিনের তরলোজ্জ্বল কণ্ঠস্বর দশ বছর আগেকার খরস্রোতা তেঁতুলিয়ার জল-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই কালের দিগন্তে ভাসিয়া গেছে। তা যাক, সবই তো যায়, কিছুই কাহারো জন্যে অপেক্ষা করিয়া পড়িয়া থাকে না। কত লোকই তো এমন করিয়া চলিয়া গেল। সেই ডি-সুজা—বাঘের মতো দুঃসাহসী মানুষটা ; সেই হরিদাস—যাযাবর, আপনভোলা একটা বিশৃঙ্খল মানুষ ; সেই জোহান—বর্মীরা যাহার গলা কাটিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল ; সেই লিসি—যাহার শোকে পাগল হইয়া গিয়াছিল ডি-সুজা ; সেই মুক্তো—

নামটা মনে করিতেই বলরাম আবার চমকিয়া উঠিলেন। মুখের উপর বেদনার কতগুলি রেখা বিকীর্ণ হইয়া গেল নিজের অজ্ঞাতেই। দশবছর সময়টা কি এতই দীর্ঘ দূরান্তব্যাপী ? যদি তাহাই হয়, তবে এতদিনে কেন সেই দুঃস্বপ্নটাকে তিনি ভুলিতে পারিলেন না। কেন এখনো মুক্তোর কথাটা বুকের মধ্যে আঘাত করিয়া করিয়া তাঁহাকে এমন ভাবে রক্তাক্ত করিয়া দেয় ?

—তারপরে কবিরাজ মশাই, দেশের খবর কী আপনাদের ?

কবিরাজ আপাদমস্তক শিহরিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মণিমোহন মুক্তোর কথাটা ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে নাকি ? কিন্তু মুক্তো সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু একটা সে তো জানিত বলিয়া মনে পড়ে না। তবু অপরাধী মনে আশংকাটা সময়ে উদ্যত হইয়া আছে—ব্যথার জায়গাটাতে পাছে ঘা লাগিয়া বসে, সেই জন্য সদাসর্বদা সেটাকে দুহাতে আগলাইয়া রাখিতে চান বলরাম।

—অ্যাঁ. খবর ? কী খবর জিজ্ঞেস করছিলেন ?

মণিমোহন খবরের কাগজটা উল্টাইতেই উল্টাইতে প্রশ্ন করিয়াছিল—কিছু একটা জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়াই। তাই বলরামের এই চমকটা তাহার চোখে পড়িল না। একটা কোণে দৃষ্টি রাখিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, এই দেশের গাঁয়ের।

—ওঃ। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন বলরাম : দেশের খবর তো নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। ধান-চালের বাজার বড় খারাপ। তা ছাড়া ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া এসেছে এবারে। দশবছর আগে তো লোকে এসব বালাইয়ের কথা ভাবতেই পারেনি। হালে দু চারটে করে জ্বরে ধরেছিল বটে, কিন্তু এবারে একেবারে মড়কের মতো জাঁকিয়ে বসেছে।

—লোক মরছে নাকি ?

—মরছেই তো দু দশটা। এক জেলে পাড়াতেই তিন চারটে সাবড়ে গেল কদিনের মধ্যে।

—হুঁ, কুইনাইন আসছে না। গম্ভীর মুখে কাগজটা ভাঁজ করিয়া পাশের টিপয়টার উপর নামাইয়া রাখিল মণিমোহন: ওষুধ-বিষুধের চালান সব বন্ধ। যা যুদ্ধ লেগেছে।

—যা বলেছেন, যুদ্ধ!—আগ্রহে বলরামের চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে কৌতূহলী মনের খোরাকটা পুরোপুরি মিটিতে চায় না—লোভ বাড়াইয়া দেয়। সাগ্রহে বলরাম বলিলেন: এই যুদ্ধই যত গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আচ্ছা, যুদ্ধের ব্যাপারটা কী, বলুত তো? জার্মানী এবার লড়াই জিতে নেবে, তাই নয়?

—কী বললেন, জার্মামী লড়াই জিতে নেবে?—মণিমোহন হাসিয়া বলরামের দিকে তাকাইল: খবরদার, ও সব কথা আর ভুলেও মুখ দিয়ে বের করবেন না কোনোদিন। যুদ্ধের সময়, কোন্ দিকে যে কার কান খাড়া হয়ে আছে ঠিক নেই। গভর্ণমেণ্ট এ সব কথা জানতে পারলে আপনাকে ডিফেন্স্ অফ ইণ্ডিয়া আইনে ধরে নিয়ে যাবে।

সর্বনাশ! সভয়ে বলরাম বলিলেন, না, না, ও সব কথা আমি বলতে যাব কেন। কী দরকারটা পড়েছে আমার। ওই ওরা সব আলোচনা করছিল—

—ওরা কারা?

মণিমোহন অনেকটা যেন ধম্‌কাইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি কঠোর হইয়া আসিল খানিকটা। বলরাম আবার অনুভব করিলেন মণিমোহন এখন অনেকটা বদলাইয়া গেছে, আজ অনেকটা দূরত্ব রাখিয়া এবং অনেকখানি সতর্ক হইয়াই কথা বলিতে হইবে তাহার সঙ্গে। গর্ব ও আনন্দের যে তরঙ্গটা একটু আগেই মনের মধ্যে উছলাইয়া উঠিতেছিল, মুহূর্তে সেটা স্তিমিত সংকোচে শান্ত হইয়া আসিল।

জ্যোতির্ময় টাকটি একটুখানি চুলকাইয়া লইয়া বলরাম কহিলেন, এই খাসমহালের যোগেশবাবু, হালদার মিঞা, গালু বিশ্বাস—

নিষেধ করে দেবেন, সবাইকে নিষেধ করে দেবেন। সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে, তাই না? শুধু জেনে রাখবেন আমরা জিতছি, আমরা জিতবই। বেশী কৌতূহল ভালো নয়, সময় বিশেষে সেটা দস্তর মতো মারাত্মকও হয়ে উঠতে পারে—জানেন তো?

মণিমোহন আবার বলরামের দিকে চাহিয়া হাসিল। কিন্তু এবারে তাহার হাসিটা আর তেমন করিয়া বলরামের ভালো লাগিল না। কোথায় কী একটা যেন খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছে, একটা আবরণ বেদনার বোঝায় সমস্ত মনটা ভারী হইয়া রহিল।

—যা বলেছেন।

বলরামের তরফ হইতে হাসিবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছে সমস্ত মনটা। যে দিনগুলি যায় তাহারা আর ফিরিয়া আসে না নতুন করিয়া। কাল বদলায়, পৃথিবী বদলায়। চড়া পড়িয়া তেঁতুলিয়ার উদ্দাম কয়াল স্রোত মন্থর হইয়া আসে। সেদিনের সেই তরুণ শান্ত মণিমোহন আজ রাশভারী একটা হাকিম হইয়া ফিরিয়াছে চর-ইসমাইলে।

চা আসিল।

মণিমোহন একটা পেয়ালা আগাইয়া দিয়া কহিল, খান কবিরাজ মশাই।

সোনালি ফুল-কাটা পেয়ালাটায় সোনালি রঙের চা কবিরাজ মুখের সামনে তুলিয়া লইলেন। অত্যন্ত গরম। খানিকটা চা ডিসে ঢালিয়া লইয়া বলরাম এক মনে চুমুক দিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন শুধু এই জন্যেই তিনি এখানে আসিয়াছেন—হাকিমের সঙ্গে বসিয়া এক পেয়ালা চা খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যই তাঁহার নাই। সোনালি পেয়ালার সোনালি চা'টা বেশ ভালো লাগিতেছে, ঘরের মধ্যে জমিয়া থাকা অস্বস্তির ঝাঁঝাটা যেন সরিয়া যাইতেছে একটু একটু করিয়া।

মণিমোহন বলিল: হাঁ, যে জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার স্ত্রীর ভারী সখ, এই সব নদী নালা দেশে একটু বেড়িয়ে যাবেন। তাই তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কী বিভ্রাট দেখুন, পথে আসতে আসতেই ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিয়েছেন। আপনি একটু দেখে যান তাঁকে। ডাক্তারখানায় খবর পাঠিয়েছিলাম, ওষুধ-বিষুধ কিছু নেই সেখানে। মহা-মুস্কিলেই পড়া গেছে। আপনার কথা শুনে তো আরো বেশী ভয় ধরে গেল। আপনি একটু দেখুনদিকি।

—বেশ তো—চায়ের ডিসে শেষ চুমুক দিয়া বলরাম বলিলেন, বেশ তো।

চাকরটা সামনেই দাঁড়াইয়া ছিল। মণিমোহন বলিলেন, মেম সায়েবকে তৈরী হতে বল, কবিরাজ মশাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন ভেতরে।

মেম সাহেব! আর একটা অপরিচিত শব্দ বলরামের কানে আঘাত করিল। চাকরটা চলিয়া গেল খবর দিতে।

বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্বরটা বেশি নাকি?

—না, তেমন বেশি নয়। তবে যা দিনকাল—বোঝেন তো।

—তা তো বটেই।

চাকর আসিয়া জানাইল মেম সায়েব তৈরী হইয়াই আছেন, কবিরাজ মশাই স্বচ্ছন্দে ভেতরে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতে পারেন। মণিমোহন কহিল, চলুন। সংশয়গ্রস্ত পা দুইটাকে টানিয়া বলরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরের মধ্যে একখানা ডেক চেয়ারে গলা পর্যন্ত শাল টানিয়া দিয়া মেম সায়েব চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স হইবে, শ্যামবর্ণ সুশ্রী মুখখানি দেখিলে তাঁহাকে কিছুতেই হাকিমের গৃহিণী বলিয়া কল্পনা করা চলে না, অথবা মেম-সায়েব বলিয়া ডাকিতেও ইচ্ছা হয় না। অসুস্থতার ছোঁয়াচ লাগিয়া মুখের উপর বিষণ্ণ ক্লান্তির পাণ্ডুর একটা ছায়া পড়িয়াছে। ডেক-চেয়ারের হাতলের উপরে উঠিয়া বছর চারেকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর ছেলে বসিয়া আছে; অত্যন্ত গম্ভীর মুখ—যেন মায়ের অসুখ দেখিয়া নিতান্ত দুর্ভাবনায় পড়িয়াছে এবং এ অবস্থায় কী যে করিবে স্থির করিতে না পারিয়া আমসত্বর টুক্‌রোর মতো কী একটা কালো জিনিস দুই হাতে প্রাণপণে চাটিতেছে, কনুই পর্যন্ত আঁঠা আর লালা জমিয়াছে।

—আমার স্ত্রী। আর ইনি আমার পুরোনো বন্ধু—এখানকার কবিরাজ মশাই।

মেমসায়েব দু হাত তুলিয়া কবিরাজকে নমস্কার জানাইলেন।

চেয়ারের হাতলে বসিয়া থাকা ছেলেটি কী বুঝিল সেই জানে, সেও মার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করিল। খাদ্যের টুকরাটা হাত হইতে পড়িয়া গেল মেজের উপরে।

—ছাখো, ছাখো, কাণ্ড দেখো ছেলের! কী রকম অসভ্য একটা চাষার মতো চকোলেট খেয়েছে। রাগ করিতে গিয়া মণিমোহন হাসিয়া ফেলিল।—ওরে পিয়ারী, বাইরে নিয়ে গিয়ে হাত মুখ ভালো করে ধুইয়ে দে তো।

মেমসাহেব মৃদু সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন, ওর কাণ্ডই তো এই।

চাকর আসিয়া ঝিণ্টুকে কোলে তুলিয়া লইয়া গেল। একটা তীব্র প্রতিবাদ জানাইবার ইচ্ছা ছিল ঝিণ্টুর, কিন্তু সামনে অপরিচিত লোক দেখিয়া সে আত্মসংবরণ করিল।

—হাতটা দেখাও রাণী।

মেমসাহেব হাত বাহির করিয়া দিলেন। সুডোল আঙুলে লাল পাথরের একটি আংটি। মুখের তুলনায় হাতখানির রঙ যেন বেশি ফর্সা, যেন আংটির সোনার রঙটা দেহের রঙের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গেছে, আর লাল পাথরটা দীপ্তি পাইতেছে এক-বিন্দু রক্তের মতো। চারগাছি চুড়ি এক সঙ্গে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিয়া মিষ্টি খানিকটা আওয়াজ দিল।

নরম সুডোল হাতখানি মুঠোর মধ্যে টানিয়া লইলেন বলরাম। মনের মধ্যে একটা অলক্ষ্য তন্ত্রী কী যেন মীড় মূর্ছনায় থাকিয়া থাকিয়া অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে। এই রকম একখানি হাতের স্পর্শ একদিন তাঁহারও জীবনকে মধুময় সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত জানাইয়াছিল কিন্তু—সে স্পর্শ কার? সেই বা আজ কোথায়?

নিজের ভাবনার মধ্যে তলাইয়া থাকিয়াই বলরাম কিছুক্ষণ অনুভব করিলেন নাড়ীর স্পন্দনটা। তারপরে হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, কিছু ভয় নেই, সামান্য কফাশ্রিত জ্বর। আমি গিয়ে একটা পাঁচন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—তাড়াতাড়ি সেরে যাবে তো? যা চারিদিকের অবস্থা, তাতে—

—না, না, কোনো ভয় নেই। কালই ছেড়ে যাবে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আমি বরং এখন আসি তা হ'লে—নমস্কার করিয়া কবিরাজ বাহির হইয়া পড়িলেন: বিকেলেই আবার না হয় খবর নেবো এসে।

মণিমোহনও কবিরাজের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা বাহির হইয়া আসিল।

—আচ্ছা কবিরাজ মশাই!

—বলুন!

—এখানকার পোষ্টমাষ্টারটিকে মনে নেই আপনার? সেই যে কী রকম একটা পাগল লোক—কী নাম?

—হরিদাস সাহা।

—হাঁ, হাঁ, হরিদাস সাহা। এখানে আছেন তিনি?

—নাঃ।—বলরাম একটা দৃষ্টি মেলিয়া আকাশের দিকে তাকাইলেন। উজ্জ্বল নীল আকাশে সাদা মেঘ যাযাবরের মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছে, অমনি করিয়াই একদিন দূর-বিস্তৃত পৃথিবীর উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে কোন্ শূন্য দিগন্তে মিলাইয়া গেছে? হরিদাস। বলরাম আবার বলিলেন, নাঃ, অনেকদিন আগেই চলে গেছে।

—বেশ লোকটা ছিল, তাই নয়? ভারী অদ্ভুত লোক।

—হুঁ।—হরিদাসের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যেন বলরামের ভালো লাগিতেছে না। অত্যন্ত অকারণে মনটা ব্যথাতুর আর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে—ওই যোগাযোগে বড় বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে মুক্তোকে—বড় বেশি করিয়া যন্ত্রণা জাগাইয়া তুলিতেছে দশ বৎসরের পুরোণো ক্ষতটাকে।

বলরাম বলিলেন, তা হলে আমি যাই। অনেক কাজ আছে। চার দিকে জ্বর—ব্যারামের জন্যে ডাকের আর কামাই নেই কি না।

—আচ্ছা আসুন। বিকেলে মনে করে একবারটি খবর দেবেন কিন্তু। আর একটা কথা। নাঃ, থাক, আসুন আপনি:

টাকের উপরে রৌদ্রের আলোটা জ্বালা করিতেছে। ছাতাটা খুলিবার জন্য দাঁড়াইতেই বলরামের কানে ভাসিয়া আসিল মায়ের গলায় সস্নেহ তিরস্কার: ছিঃ ঝিণ্টু, এখন কোলে উঠবার জন্যে দুষ্টুমি করতে নেই। আর ওই ভদ্রলোকের সামনে কী অভদ্র ভাবে তুমি চকোলেট খাচ্ছিলে বলো তো? উনি কী যে ভাবলেন—

পঙ্কের জন্যে কী একটা অর্থহীন আকর্ষণে দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার দ্বিগুণ বেগে চলিতে সুরু করিলেন বলরাম। এ একটা স্বতন্ত্র জীবন—এ একটা প্রেম এবং আনন্দের নতুন অমৃত লোক। এখানে বলরামের অধিকার নাই, এই স্বর্গ হইতে তিনি নির্বাসিত। কিন্তু কেন? কেন এমন হইল? কেন আজ রাধানাথকে আশ্রয় করিয়া নিঃসঙ্গ দিন তাঁহাকে কাটাইতে হয়? মরিয়া গেলে মুখে একটুখানি আগুন ছোঁয়াইবে এমন লোকও তো আশে পাশে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এ অধিকার হইতে কে তাঁহাকে বঞ্চিত করিল? ইচ্ছা করিলে একটার জায়গাতে তিনটা বিবাহ অত্যন্ত অনায়াসেই কি তিনি করিতে পারিতেন না? আর তাহা হইলে এমনি করিয়াই তাঁহার ঘর ভরিয়া সন্তান দেখা দিত, এমনি করিয়াই সব কিছু—

—কিন্তু! কিন্তু বলরাম আলেয়ার পেছনে ছুটিয়াছিলেন। ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন মিথ্যার উপরে। তাহার শাস্তি তিনি পাইছেন, ভালো করিয়াই পাইয়াছেন। এই শূন্যতা, এই নিঃসঙ্গতা, এ তাঁহারই অপরিহার্য কর্মফল। অকস্মাৎ নিজের উপরে একটা সুতীব্র অর্থহীন বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হইয়া গেল বলরামের মনটা। দ্রুতবেগে তিনি চলিতে লাগিলেন—অনেকগুলি রোগী পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, এ সব অবাস্তর ভাবনায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সময় কাটাইলে তাঁহার চলিবে না।

আর ওদিকে মণিমোহনও তাঁহার গন্তব্য-পথের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

একটা কথা তাহার মনে পড়িতেছিল, ভাবিতেছিল একবার বলরামকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয় ব্যাপারটা। কিন্তু প্রশ্ন করিতে গিয়াই খেয়াল হইল সে সব বলরামের জানিবার কথা নয়। মণিমোহন উদ্যত জিজ্ঞাসাটা মনের মধ্যে টানিয়া লইল। কিন্তু কথাটাকে ভোলা যাইতেছে না কিছুতেই।

সে কি ভুলিবার। দশ বছর আগেকার কথা—কিন্তু মনের দিকে চাহিলে মনে হয়, এই তো সেদিন। কষ্টিপাথরে সোনার দাগ পড়িয়া যেমন জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে, তেমনি করিয়া স্মৃতি-

বিস্মৃতির পটভূমিকার উপরে সেই লেখাটা ক্ষয়হীন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

...সেই ঝড়ের রাত্রি। দুটি নীলার মতো চোথ হইতে বিষাক্ত কামনার আলো যেন ছুরির ফলার মতো বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। বাহিরে গর্জ্জন করিতেছে ঝড়। ধুলার ঘূর্ণিতে বাগানটা অন্ধকার হইয়া গেল। মড় মড় শব্দ করিয়া কী একটা ভাঙিয়া পড়িল—একখানা ডাল, অথবা আস্তো গাছই একটা। তার ঝাপ টায় জানালার পাল্লা দুইটা হতাশভাবে বারে বারে আছড়াইয়া পড়িতেছে। বড় বড় ফোঁটায় শব্দ করিয়া ডানায় বৃষ্টি উড়িয়া আসিতেছে—চড়বড় চড়বড়—যেন একদল ঘোড়সওয়ার আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ছুটিয়া গেল। তারপর দুইটি কঠিন আর কোমল বাহুবন্ধন—সাপের আলিঙ্গনের মতো। চুলের গন্ধটা ক্লোরোফর্মের কাজ করিয়া তাহাকে যেন ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়াছিল। ছোরা দেখাইয়া সেদিন সেই ভালোবাসা আদায় করিয়া নেওয়া। প্রেম নয়—কামনা। সুধা নয়—মদিরা।

তারপরে আর একটি রাত। সেদিনকার সেই বিজয়িনীই সেই রাত্রে আসিয়াছিল আশ্রয়ার্থিনী হইয়া। বোটের মধ্যে আরো অন্ধকার। নীচে নদীর জল যেন কল কল করিয়া কাঁদিতেছে—কোথায় চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল নিশাচর পাখী। হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে মেয়েটি, তাহাকে ভালো করিয়া দেখা যায় না, চেনাও যায় না। অসংলগ্ন মন লইয়া সেদিন কত কী ভাবিয়াছিল মণিমোহন—কত কী বলিয়াছিল। নিজের জীবনের সঙ্গে ওই বিচিত্ররূপা বিদেশিনীকে সে জড়াইয়া লইতে চাহিয়াছিল একান্ত করিয়া। কিন্তু মেয়েটি কর্ণপাত করে নাই সে কথায়। অন্ধকারের মধ্যে যেমন রহস্যময়ী হইয়া সে দেখা দিয়াছিল, তেমনি রহস্যময়ীর মতোই মিলাইয়া গেছে।

যদি সেদিন সে রাজী হইয়া যাইত মণিমোহনের প্রস্তাবে? যদি সেদিন সত্যিই বাস্তবীরূপে আসিয়া তাহার জীবনকে অধিকার করিয়া বসিত, তাহা হইলে? তাহা হইলে আজকের মণিমোহন সম্পূর্ণ নতুন রূপ লইয়া দেখা দিত। সংগ্রাম আসিত, সংঘাত আসিত। কর্মজীবনের ধারা উল্টা দিকে বহিত, বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হইত কোন্ একটা অনিশ্চয়তার কণ্টকাকীর্ণ তারে—কোথায় যে সে ভাসিয়া যাইত কে জানে। তার চাইতে এই তো ভালো। উন্নতির বাঁধা পথ—জীবনের সুনিশ্চিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিসমাপ্তি।

ঘরের মধ্যে ঝিণ্ট হাসিতেছে—রাণী হাসিতেছে। সুখের জীবন, পরিতৃপ্তির জীবন। এই ভালো, এই ভালো। রাণী সুখী হইয়াছে, সে সুখী হইয়াছে, সবাই সুখী হইয়াছে।

সে সুখী হইয়াছে?

এই নদীর দেশ—প্রাগৈতিহাসিক দেশ। এখানে আসিয়া মনের সুরটা যেন অন্তভাবে বাজিয়া উঠিতে চায়। সৃষ্টিছাড়া দেশে আসিয়া সৃষ্টির নিয়মটাকেই যেন বদলাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। ভালোমন্দের সংজ্ঞাটা নতুন করিয়া বিচার করিতে ইচ্ছা হয় একবার। (ক্রমশঃ)

বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তি

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বি-টি

দেবপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির লিপি বোধহয় (১) বাংলার সেন রাজগণের প্রাচীনতম লেখ। প্রশস্তি-রচয়িতা উমাপতি ধর সুকবি ছিলেন। অপূর্ব শব্দ-চয়ন-নৈপুণ্য এবং ছন্দ-মাধুর্যে শ্লোকসমূহ সত্যই চিত্ত-হারী। কিন্তু ইহার ফলে উল্লিখিত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ-ধারণা করা সুকঠিন। এ কারণে উনবিংশতিতম শ্লোকের প্রকৃত অর্থ আজও নির্ণীত হয় নাই।

বিজয় সেনের বীরত্ব মহিমা কীর্ত্তন করিতে কবি বলিয়াছেন:

দত্তা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতি ভৃতামুর্ব্বী মুরীকুর্ব্বতা
বীরাস্‌গ্ লিপি লাঞ্ছিতোঽসি রমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতীভোগে বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্ট কৃপাণধারিণি গতাভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিঃ॥

'দিব্যভুবঃ' বলিতে 'স্বর্গের স্থান' বুঝাইতে পারে। শ্লোকের অর্থ হয় 'বিজয় সেন শত্রুদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া (নিধন করিয়া) তাহাদের রাজ্য গ্রহণ করিতেন।' কিন্তু অনেকে মনে করেন(২) 'দিব্যভুবঃ' বলিতে দিব্যের রাজ্য (রাম চরিতের 'দিব্য-বিষয়') বুঝাইতেছে। বিজয় সেন তাঁহার শত্রুকে দিব্যের (বরেন্দ্রীর বিদ্রোহী নায়ক দিব্বোকের) রাজ্য দিয়াছিলেন। রামপাল বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃভূমি উদ্ধার করেন। সে সময় নিদ্রাবলের বিজয়রাজ নামে জনৈক সামন্ত তাঁহার সহায়ক ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন এই বিজয়রাজ এবং বিজয় সেন একই ব্যক্তি(৩)। সুতরাং 'প্রতিক্ষিতিভৃৎ' বলিতে রামপালকে বুঝাইতেছে কারণ পরবর্ত্তীকালে সেনরাজ কর্ত্তৃক পাল বংশের উচ্ছেদ সাধিত হয়।

রামপালের এই বিদ্রোহ দমন কাহিনী সন্ধ্যাকরণ-দী 'রাম-চরিত' কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে পালরাজ নদীতীরস্থ বহু ভূমি এবং বিপুল অর্থদানে সামন্তদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। 'দেবেন ভুবো বিপুল দ্রবিণস্ত চ দানতঃ সুখাচক্রে"। বর্ত্তমান শ্লোকে আছে "বীরাস্‌গ্ লিপি লাঞ্ছিতোঽসি রমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ"। বিজয় সেন কর্ত্তৃক 'দিব্যভুবঃ' 'প্রতিক্ষিতিভৃতাম্' দানের পূর্ব্বে তাহার অসি কি কারণে বীরাস্‌গ্ লিপি-লাঞ্ছিত হইয়াছিল? পালরাজের সহিত যুদ্ধ হয় নাই সুনিশ্চিত। কেহ কেহ মনে করেন যে বিজয় সেন প্রথম বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং তখন পালরাজের সহিত যুদ্ধ বটে। রামপাল দেব ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন আর সেনরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৯ বৎসর পর। তাঁহার পিতা রাজরক্ষা সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি "নিজভুজমদমত্তারাতি-

---

(১) বীরভূম জেলার পাইকোরে 'রাজেন শ্রীবিজয় সে' লিপিসংযুক্ত একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার তারিখ নাই। (P, 4, Paul Early Hist of Bengal I P 89).

(২) Proc. 3rd Ind. Hist. congress P. 534 ; I. H. QXIX pp 156-157.

(৩) R. D Banerji বাংলার ইতিহাস I p 262 H. C. Roy Choudhury-studies in Ind Antiquities P 159 R ma charita (V. R. S' Ed) P XXVII প্রথম এবং তৃতীয় পুস্তকে বিরুদ্ধ মত আছে।

মারাঙ্কবীরঃ"। এই 'নিজভুজমদমত্ত অরাতি' পালরাজ না হইয়া বিদ্রোহ নায়ক দিব্বক বা রুদক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আর বিজয়রাজ রামপাল প্রদত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু স্বীয় রাজ্য (দিব্যভুবঃ) তাঁহাকে দিবেন কেন? শ্লোকে যে রাজ্য বিনিময়ের ইঙ্গিত আছে, তাহার সমর্থন মিলে না। অপর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার আছে। এখানে পালরাজ গৌড়ের কোন উল্লেখ নাই। আছে, পরবর্তী শ্লোকে (৪) 'গৌড়েন্দ্রমদ্রবৎ'। ঐ শ্লোকের প্রথম পাদে যেন দুইটি ঘটনার মধ্যে একটু সময়ের দূরত্ব বুঝাইতেছে। এই "প্রতিক্ষিতি ভুৎ" এবং "দ্বিষাং সন্ততিঃ" সেন বংশের অপর কোন শত্রুকে ইঙ্গিত করিতেছে কি?

রামচরিতে উল্লিখিত হরি যে বিক্রমপুরাধিপতি হরিবর্মা হইতে অভিন্ন সে কথা সম্প্রতি নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।(৪ক) সুতরাং হরিবর্মা বিজয় সেনের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট রাঢ় অঞ্চলে একটি সরোবর খনন এবং নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

রাঢ়ায়ামজলাম্ব জাঙ্গল পথগ্রামো কণ্ঠস্থলী
সীমাসু শ্রমমগ্ন পান্থ পরিষৎ-প্রাণাশয়-প্রীণনঃ।
যেনকারি জলাশয়ঃ পরিসর স্নাতাভিজাতাঙ্গনা
বক্ত্রাব্জ-প্রতিবিম্বমুগ্ধমধু পীশূন্যাঙ্কিনী কাননঃ॥২৬॥
তেনায়ং ভগবান্ ভবার্ণব সমুত্তারায় নারায়ণঃ
শৈলে সেতুরিব প্রসাধিত ধরা পীঠঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ॥২৭॥

বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসনে আছে যে সেনরাজগণের অনেকে রাঢ়ে রাজত্ব করেন। সীতাহাটীর অনতিদূরে অবস্থিত নিড়োল গ্রাম বিজয়রাজের নিদ্রাবল হইতে পারে। সেন রাজগণের শাসনোল্লিখিত বহু স্থান এই রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত। সুতরাং প্রায় একই সময়ে রাঢ়ে দুইটি রাজশক্তির প্রাধান্য দেখা যায়।

হরিবর্মের রাজ্যসীমা তাঁহার অজ্ঞাতনামা পুত্রের রাজত্বকালেও কিছুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল কারণ ভবদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা এ সময়ের ঘটনা। (৫) পরবর্তী বর্মরাজ সামলবর্মার বজ্রযোগিনী শাসন ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। প্রদত্তভূমির বর্ণনা বুঝা যায় না। তৎপুত্র ভোজবর্মার বেলাব শাসন কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় রামদেবপুর গ্রাম। (৬) দানগৃহীতা সিদ্ধল গ্রামীয়। তবে তিনি বোধহয় স্বগ্রামবাসী ছিলেন না; কারণ প্রদত্তভূমি বহুদূরবর্তী। পরবর্তী কোন বর্ম রাজার নাম জানা যায় না। আর ভাগীরথী তীরবর্তী ভূমির তাম্রশাসন পাওয়া গেল ঢাকা জেলায় প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের তীরে। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে ভোজবর্মের রাজ্য ভাগীরথীর পূর্বতট পর্যন্ত ছিল এবং পরবর্তী কালে উহাও বর্মবংশের হস্তচ্যুত হয়।

রামচরিতে উল্লিখিত আছে যে জনৈক প্রাগদেশীয় বর্মনরপতি স্বপরিত্রাণ নিমিত্ত রামপালের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করেন (৭) কেহ কেহ মনে করেন (৮) যে রামপাল বঙ্গ আক্রমণ করিলে বর্মবংশীয় রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সমসাময়িক ঘটনসমূহ বিবেচনা করিলে এরূপ অনুমানের সমর্থন মিলে না। রামপালের রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে নান্যদেব বিজয়সেন প্রভৃতি কর্ণাটকগণের অভ্যুত্থান হইতেছিল। উড়িষ্যায় চোড়গঙ্গের প্রবল প্রতাপ। এমতাবস্থায় রামপালের মত বুদ্ধিমান নরপতি চির সুহৃদ্ বর্মদের রাজ্য আক্রমণ করিবেন ইহা সম্ভব নহে। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের মতে (৯) বর্মবংশে গৃহবিবাদের ফলে ঐ বংশের কেহ রামপালের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। হরিবর্মের পুত্রের পর রাজা হন হরির ভ্রাতা সামল। ইহাতে গৃহবিবাদের সম্ভাব্যতা দেখা যায়। কিন্তু রামপাল কি সুহৃদ পুত্রের বিপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন? হরির পুত্র তো পরাজিত হন। রামপাল পরাজিত পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিলে সন্ধ্যাকর নন্দী তাহা উল্লেখ করিতেন না। সামল বর্মের বজ্রযোগিনী শাসনে হরি এবং তাহার পুত্রের উল্লেখ আছে, নাই ভোজবর্মের বেলাব শাসনে। সুতরাং গৃহবিবাদ অনেক পরবর্তী ঘটনা। সে সময় রামপাল জীবিত ছিলেন না।(৯ক) এসব কথা বিবেচনা করিলে প্রশ্ন আসে বর্মনরপতি কাহার নিকট হইতে পরিত্রাণের জন্য রামপালের শরণ লইয়াছিলেন।

আমার ধারণা দেবপাড়া প্রশস্তির ঊনবিংশতিতম শ্লোকে বর্ম এবং সেন রাজাদের দ্বন্দের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়সেন বর্মরাজ্য আক্রমণ করিলে বর্মনরপতি মিত্র রাজ রামপালের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রামপাল বিজয়সেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং কলিঙ্গ পর্য্যন্ত (১০) অগ্রসর হন। ফলে যে সন্ধি হয় তাহাতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল বিজয়সেনের অধিকারে চলিয়া যায়। কিন্তু গঙ্গাতীরে যে রাজ্যাংশ তিনি রামপালদেবকে সাহায্য করিয়া পাইয়াছিলেন (১১) তাহা হস্তচ্যুত হয়। এই যুদ্ধেই বিজয়সেনের অসি বীর শোণিতে পত্রীকৃত হয় এবং রাজ্যবিনিময় ঘটে। পরবর্তীকালে বর্মগণ নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলে ঐ "প্রাগের পত্রীকৃত" অসির সাহায্যে তিনি বর্মদিগকে পরাজিত করেন এবং "ভঙ্গংগতা দ্বিষাং সন্ততিঃ"। সেনরাজাদের তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের অনুল্লেখ এই অনুমান সমর্থন করে। কেহ কেহ মনে করেন (১১) বঙ্গ তখন পালরাজাদের শাসনাধীন ছিল তাই উহার পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই। কিন্তু পালবংশীয়গণ পুনরায় বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন ইহার প্রমাণাভাব। দেবপাড়া প্রশস্তির শ্লোক বিন্যাসে দেখা যায় যে ঊনবিংশতিতম শ্লোকে বর্ণিত ঘটনা বিজয়সেন কর্তৃক গৌড়পতিকে পরাজয়ের পূর্ববর্তী। বিজয়সেন ১১৮০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় গোপালদেবকে নিহত করিয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন (১২) তাহার বিশ বৎসর পূর্বে ১১২০ খৃষ্টাব্দে রামপাল দেহত্যাগ করেন (১৩) এই সময় মধ্যে বিজয়সেন বর্মদিগকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাই আলোচ্য শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। মত মস্তু ভবতাম্

(৪) তং নান্য বীর বিজয়ীতিগিরঃ কবীনাং শ্রুত্বামন্যথামনন রূঢ় নিগূঢ় রোষঃ। গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥

(৪ক) Dr. D. C. Sircar 'ভারতবর্ষ ১৩৪৮ পৃ ৭৭৪; Dr. R. C. Majumder Ramoharita (V. R. S. Ed) P XXXIII Dr. N. K. Bhattasali I. H. Q. XIX P. P. 126—138.

(৫) তন্নন্দনে বলতি যস্য চ দণ্ডনীতি বর্মানুগা বহল কল্পলতেব লক্ষ্মী। ভবদেবের প্রশস্তি পূর্বে ভুবনেশ্বর অনন্ত বাসুদেব প্রশস্তি নামে পরিচিত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে ভবদেব প্রতিষ্ঠিত মন্দির ভুবনেশ্বরে হইতে পারে না। উহা রাঢ়ে কোথাও ছিল। (Proc 3rd Ind Hist. Cong pp 287)

(৬) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৯ পৃ ৮-৯

(৭) স্ব পরিত্রাণ নিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্‌দিশীয়েন
বর বারণেন চ নিজস্যন্দন দানেন বর্মণারাধে॥

(৮) বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড পৃ ২৬৭, Early Hist of Bengal 1 p 65. (৯) I. H xix p 133. (৯ক) "রামচরিতে'র ৪র্থ পরিচ্ছেদ (৩৭ ও ৪০ শ্লোক) হইতে মনে হয় যে হরিবর্মা মদনপালের সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।" ভারতবর্ষ ১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ। (১০) জগদবতিস্ম সমস্তং কলিঙ্গতস্তান্ নিশাচরান নিঘ্নন্ রামচরিত ৩।৪৫। (১১) "তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্ বরেন্দ্রে' কুলশাস্ত্রের এই উক্তির সহিত রামচরিতে উল্লিখিত নদী তটে ভূমিদান কাহিনী এবং আলোচ্য শ্লোকের "দিব্য ভুবঃ" কথা বিবেচনা করিলে এ সিদ্ধান্তেই আসা যায়। (১২) I. H. XVII p 222 (১৩) I bid seka Subhodaya (Dr. Sen's edition p 9) ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় শ্লোকটির পাঠ শুদ্ধ করিয়াছেন—শাকে যুগ্মক রেণু চন্দ্রগণিতে কন্যাম্ গতে ভাস্বরে। Prof. D. C. Bhattacharya I. H. III p 583

পেলে তার সন্ধান

শ্রীউষা মিত্র

১

প্রথম হেমন্তের শিশির হাওয়ার ছোঁয়া এসে লাগ্ছে বঙ্গ-জননীর পাণ্ডুর ললাটে। যেন তাঁরই চোখের অশ্রুবিন্দুর মত হিমবিন্দু ঝরে প'ড়ছে প্রাসাদ-শিখর হ'তে জীর্ণতম কুটীরের পরিত্যক্ত অঙ্গনে, লতা-গুল্মে, তৃণদলে—সর্ব্বত্র। সোনার ফসলভরা ক্ষেতে উৎসাহ-ভরা মুখ চাষার দল আর চোখে পড়ে না। গ্রামের মাঠে বাটে কলরব-মুখর শিশুর দল আর ঘুরে বেড়ায় না। "বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ" দেখা যায় না ঘাটের পথে। হতাবশিষ্ট যারা বা ফিরে এসেছে গ্রামে, কোনমতে নিজেদের ভগ্নজীর্ণ শরীরগুলো টেনে নিয়ে কষ্টে, তারা দৈনন্দিন কাজগুলো ক'রে চলে।

২

মৃত্যুঞ্জয় বল্লে—নবীন! তুমি ত অল্পদিন ফিরেছো। আসবার আগে কিরণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? ওকে নিয়ে এলে না কেন?

নবীন উত্তর দিলে—দেখা হয়েছিল, আসতেও ব'লেছিলাম; সে সহর ছেড়ে আসতে ত' চায় না।

মৃত্যুঞ্জয় খেদের সঙ্গে বল্লে—আসবেই বা কার কাছে? থাক্‌বে কোথায়? খাবে কি? দোষ তার কিছু নেই।

কিরণ মৃত্যুঞ্জয়ের দূরসম্পর্কে জ্ঞাতির মেয়ে। বিয়ের পর গ্রামে আর বেশী আসা-যাওয়া ছিল না; দেখাশোনাও আর বিশেষ হ'ত না। বিপদের বন্যায় যেদিন গ্রামগুলির প্রায় সকলেই একসঙ্গে ঘর ছেড়ে বাহির হ'তে বাধ্য হ'লো, সেই শঙ্কট সময়ে মৃত্যুঞ্জয় ও কিরণ মাসকয়েক একসঙ্গে কাছাকাছি বাস ক'রেছিল নগরের প্রান্তে একটি নিতান্ত দুর্দশাপন্ন স্থানে। তারপর, প্রায় সবার আগেই, মৃত্যুঞ্জয় ফিরে এলো গ্রামে। তার উঁচু ভিতের দু-চারখানা ঘর তখনো ছিল বাস করার যোগ্য। আসবার সময় নগরীর জনস্রোতে কিরণ যে কোথায় গিয়ে প'ড়েছিল, সন্ধান পায়নি মৃত্যুঞ্জয়। শুধু এইটুকু শোনা গিয়েছিল, আত্মীয়স্বজন, স্বামী সন্তান—অনেককে সে হারিয়েছে। গ্রামবাসী কেউ ফিরে এলেই মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসা করে কিরণের কথা; এ যেন তার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল।

৩

ধোঁয়ায়ভরা আকাশের নীচে সহরের রাজপথগুলি মনে হয় যেন অপেক্ষাকৃত জন-বিরল হ'য়ে এসেছে। সকাল হ'তে সন্ধ্যা অসংখ্য বুভুক্ষিতের হাহাকার আর তেমন ক'রে শোনা যায় না; কতক গিয়েছে জন্মের মত চ'লে, কতক প'ড়েছে নানাদিকে ছড়িয়ে। নির্ব্বিকারভাবে বিস্তৃত রাস্তাগুলি পূর্ণ ক'রে কঙ্কালসার নিরুপায়ের দল আর প'ড়ে থাকে না আগের মত। তবুও কিন্তু তারই মধ্যে সরু পথগুলির ভিতর হ'তে শোনা যায় মর্ম্মভেদ বেদনার আর্ত্তনাদ! অনশনে মৃত্যুর সংখ্যা অনুপাতে কম হ'লেও, অগ্রাহ্য করবার মত নয়।

সরু একটি গলির মধ্য হ'তে সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আস্‌চে কিরণ,—কোলে তার পাঁচ বৎসরের ছেলে—শঙ্কর। শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে একবার চেয়ে দেখ্‌লে ছেলের জীর্ণ শরীরটির দিকে; কম্পিত হাতে স্নেহভরে স্পর্শ ক'রলে শিশুর তপ্ত ললাট; অল্পদূরে এসেই সে ব'সে প'ড়্‌লো ফুটপাথের উপর। ক্লান্তি ও চিন্তা আজ তাকে সকল রকমে অবসন্ন ক'রেছে। প্রথমে ছিল ছেলে ও মেয়েতে মিলে তার চারটি। একটিকে গ্রাম ছাড়বার আগেই সে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে; সবার ছোটটিকে এই পথেরই ধারে আবর্জ্জনা-কুণ্ডের পাশে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছে নিজের হাতে সে। আর একটিকে নিয়ে গিয়েছে হাসপাতালের গাড়ী;—আর সে ফিরে আসেনি। অবশিষ্ট এই সন্তানটিকে কেন্দ্র ক'রে তার ভীরু হৃদয়ের উদ্বেগ ও শঙ্কা এবং সকল স্নেহ পুঞ্জিত হ'য়ে আছে। তাই তার এতটুকু পীড়া কিরণের সমস্ত মনটিকে আকুল ক'রে তোলে এমন করে। আত্মীয়স্বজন তার যারা ছিল, এখানে এত দুর্দ্দশার মধ্যেও যাদের সঙ্গে একত্রে বাস করতে পেরেছিল, এক এক ক'রে কে কোন্ পথে চলে গিয়েছে, কেউ বা নিয়েছে চির-বিদায়! স্বামীরও সন্ধান সে পায়নি বহুদিন। তবু মৃত্যু-সংবাদ পায়নি বলেই আজও আশায় আশায় আছে।

শঙ্কর কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়্‌লো। তারই মুখের দিকে চেয়ে আবার সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো তার হারানো সন্তানগুলির কথা। এখন সে শঙ্করের জন্য পায় প্রতিদিনই একটু ক'রে দুধ, অন্নসত্র প্রভৃতি থেকে খিচুড়ী বা মণ্ড যা পায়, তাও দু'জনের উপযুক্ত; গৃহস্থ-বাড়ীতে কিছু কিছু কাজ ক'রে সামান্য উপার্জ্জন করে। এখানে আসার পর প্রথমেই যদি এটুকু সুবিধা পেতো, তাহ'লে হয়ত তার অন্য সন্তানগুলি এমন ক'রে তাকে ছেড়ে যেতো না। তবু শঙ্করকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার আগ্রহ তাকে বন্দী ক'রে রেখেছে আজও এই সহরে। গ্রামে যে আর কেউ নেই তার; সেখানে ফিরে গিয়ে ওকে কি সে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবে?

একটা অজানা আশঙ্কায় ম্লান হ'য়ে আসে তার মুখ। কয়েক দিন ধরেই সে শুনছে অনেকের কাছে, তাদের মত লোকেরা আর থাকতে পাবে না এই সহরে। কোথায় যাবে, কেন যাবে, —কিছু সে জানে না। আশঙ্কায় শিউরে ওঠে তার সমস্ত অন্তর; কেঁপে ওঠে সারা দেহ। রাস্তায় সে মাঝে মাঝে দেখেছে একরকমের বড় খোলা গাড়ী,—তারই মত সর্ব্বহারা মানুষদের যাতে বোঝাই ক'রে নিয়ে যায় কোন্ অপরিচিত স্থানে। হিংস্র অতিকায় পশুকে মানুষ যতখানি ভয় করে, তারও চেয়ে বেশী ভয়ে শঙ্করকে বুকে চেপে নিয়ে যে কোনও একটা গোপন স্থানে সে লুকিয়ে থাকে, পাছে তাকেও হ'তে হয় ওদের সহযাত্রী।

৪

"রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়" দাওয়ার উপর একখানি মাদুর বিছিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্রাম ক'রছিল। রান্নাঘরের দিক হ'তে

একটা বিড়াল-ছানার ডাক্ শোনা যাচ্ছে ; উত্তরের অশথ গাছ হ'তে ঘুঘুর একটানা করুণ সুর ভেসে আস্‌ছে কানে। তন্দ্রাঘোরে মৃত্যুঞ্জয়ের মনোরাজ্যে জেগে উঠ্‌ছে—কতশত হারাণো দিনের কাহিনী।

সহসা কার পদশব্দে স্বপ্ন যায় টুটে। নিদ্রালস মনটাকে বাস্তবতার মধ্যে সচেতন ক'রে নিয়ে উঠে বস্‌লো—মৃত্যুঞ্জয়। সামনের দিকে চেয়ে হর্ষে বিস্ময়ে, সে প্রায় চিৎকার ক'রেই ব'লে উঠ্‌লো,—"আরে, একি ? সনাতন যে ? কবে এলে ? কোথায় ছিলে এতদিন ? কিরণ কোথা ? তার সঙ্গে দেখা হয়েছে তো ?" —একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন ক'রে সে উৎসুক দৃষ্টিতে সনাতনের মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌ল।

শান্তভাবে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে সনাতন দাওয়ার একধারে বস্‌লো ; অবসন্নভাবে শুষ্কমুখে ধীরে ধীরে বল্‌তে আরম্ভ করলে তার গত কয়েক মাসের কাহিনী। উপায়ান্তর-হীন ভাবে পথে পথে কিছুদিন ঘোরবার পর অবশেষে সে একটা কাজ পেয়েছিল। সরকারী যে সব রাস্তা তৈরী হ'চ্ছে, তারই জন্য কুলী সংগ্রহ করা হ'চ্ছিল। সেই কাজ নিয়ে কুলির দলে সেও চলে যায়। খবর দিতে পারেনি—অকস্মাৎ গাড়ী বোঝাই হ'য়ে তাদের রওনা হ'তে হ'য়েছিল। কোথা যে যেতে হবে তাও তাদের জানা ছিল না। পেটভরে খেতে পেয়ে, সাফল্য ও সচ্ছলতার আশায় প্রলুব্ধ মন ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপ্নে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিল। অনেকদিন একটানা কাজ করবার পর একমাসের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছে। নিজের গ্রামে গিয়ে আত্মীয়-স্বজন কারুরই প্রায় দেখা বা সন্ধান পায় নি। অবশেষে এসেছে এখানে।

মৃত্যুঞ্জয়কে সনাতন বল্‌লে,—আপনি আছেন শুনে আমার মনে ভরসা হ'ল ; জানি,যা হোক্ কিছু খোঁজ পাব আপনার কাছে।

মৃত্যুঞ্জয় তাকে আশ্বস্ত ক'রে বল্‌লে,—নিশ্চয়, নিশ্চয় ; বুড়ো হ'য়েছি, ছুটোছুটি করতে পারিনা, তবু খবর ত' সবারই রাখি। আর আমারই বা কে আছে ? একটামাত্র ছেলে—সেও কারখানায় চাকরী নিয়ে চ'লে গেছে।

সনাতন প্রশ্ন করলে,—কাকীমা ?

—সে ত'কলকাতা থেকে ফির্‌তে পারেনি, গঙ্গায় গেছে।

—বুড়ার চোখে জল বেরিয়ে আসে। ঠিক্ হ'লো সনাতন সেদিন এখানে বিশ্রাম ক'রে কাল সকালেই কিরণের খোঁজে রওনা হবে। লোকের মুখে খবর নিয়ে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় কিরণের ঠিকানা জেনে রেখেছিলেন একরকম।

৫

রাস্তার ধারে সমবয়সী আর কয়েকটি ছেলের সঙ্গে শঙ্কর খেলা করছে। হাসিমুখে তার কাছে বিদায় নিয়ে কিরণ দ্রুতপদে এগিয়ে চল্‌লো অদূরবর্ত্তী বাড়িখানির দিকে। কয়েকদিন হ'ল ঐখানেই সে একটি কাজ পেয়েছে। মনে মনে সে ঠিক্ করেছে মনিবকে ব'লে ঐ বাড়ীতেই সে একটু থাকবার জায়গা চেয়ে নেবে ; যদি পায়, ছেলেটা তার বেঁচে যাবে। এলোমেলো-ভাবে এমনি দু-চারটে কথা তার মনে আস্‌ছে—অন্যমনস্ক ভাবে ঐ বাড়ীটার দরজার কাছে এসে প'ড়েছে প্রায়। ক্ষিপ্র বেগে ছুটে এল একখানা খোলা গাড়ী,—যে গাড়ীকে দেখ্‌লে ভয়ে তার সমস্ত শরীর থর্ থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে। কতবারই না কোনমতে আত্মগোপন ক'রে সে পরিত্রাণ পেয়েছে ঐ দানবের মত গাড়ীর কবল হ'তে। আজ কিন্তু পলায়নের কোন পথই সে খুঁজে পেলে না। কি যে হ'লো ভাল ক'রে বুঝ্‌তেও পারলে না। শুধু আরও কয়েকজনের আপত্তি ও আর্ত্তনাদের সঙ্গে মিশে গেল তার কণ্ঠস্বর। সহসা তার অনুভব হ'লো ঐ গাড়ীটার উপরে সেও দাঁড়িয়ে আছে। মর্ম্মান্তিক চিৎকার ক'রে সে লুটিয়ে প'ড়্‌তে গেল'। যেখানে গাছের ছায়ায় শঙ্কর খেলা করছিল ছেলেদের দলে, ব্যগ্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌লে সেই দিকে। ছেলেরা তখন আরও খানিকটা এগিয়ে, পথের বাঁক ঘুরে, একটু দূরে জটলা করছিল,—দেখতে পেলে না কিরণ তাদের। অশ্রুহীন নির্নিমেষ দৃষ্টি পথের পরেই মেলে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

গাড়ীটা মোড় ঘুরতেই হ'লো বিভ্রাট। দু-হাত মেলে আর্ত্ত চিৎকার ক'রে শঙ্কর ছুটে এল' গাড়ীখানার দিকে। সকরুণ মিনতিতে কিরণ জানালে তার নিবেদন,—তার ঐ ছেলেটিকে যেন তুলে নেওয়া হয় তাদের সঙ্গে। কেউ সেকথা বুঝলে কি না কে জানে। গাড়ী ছুটেই চল্‌লো সমান বেগে—বিভ্রান্ত কিরণ পাগলের মত লাফ দিয়ে প'ড়লো চলন্ত গাড়ী হ'তে রাস্তার উপরে! একটা ভীষণ কোলাহল ও আর্ত্তনাদে মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিদিকের লোক সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো! দেহটাকে ঘিরে জমে গেল' একটা বড়-রকমের জনতা, তারপর সব নিস্তব্ধ! মন্বন্তরের করাল মুষ্টির পেষণেও যে দেহ সম্পূর্ণ হারায়নি তার শ্যামশ্রী, এক মুহূর্ত্তেই সে পরিণত হ'ল রক্তাক্ত প্রাণহীন জড়বস্তুতে ; একদিন স্রষ্টা যাকে নিজ সৃষ্টির গরিমা-মাতৃরূপে-ধরিত্রীতে রূপ দিয়েছিলেন, আজ তার এই পরিণতি!

পথের পাশে শঙ্কর অব্যক্ত বেদনায় চিৎকার করে অচেতন হয়ে প'ড়েছিল। গোলমালে তার দিকে আর কারো লক্ষ্য হয়নি। হ'য়েছিল একজনের ;—সে সনাতন। শঙ্করের যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলে সে তার বাবার কোলে শুয়ে আছে। ছোট ছোট দুটি হাত দিয়ে শক্ত করে বাবাকে চেপে ধ'রে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, কোন কথাই বলবার সাধ্য ছিল না তার।

কিরণকে খুঁজতে এসে অবশেষে সনাতন এই ভাবে পেলে তার সন্ধান।

নববর্ষ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সবাই যাহারে নূতন বর্ষ বলে,
আমি বলি তারে, একটি নূতন পথ,
যাহা ধরি নব ছন্দ লইয়া চলে—
মানব প্রাণের পুরাতন আশা রথ॥

বেদান্ত ও সূফীমতে সৃষ্টি

ডক্টর রমা চৌধুরী

"সূফী" শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধিকাংশ সূফীর মতে "সূফী" শব্দটী আরবী শব্দ "সফা" হইতে উৎপন্ন। "সফা" শব্দের অর্থ "পবিত্রতা"। অতএব যিনি কায়মনোবাক্যে পবিত্র, তিনিই একমাত্র "সূফী" নামবাচ্য। যাহা হউক, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে "সূফ্" শব্দ হইতেই, প্রকৃতপক্ষে "সূফী" শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে। "সূফ্" শব্দের অর্থ "পশম"। এই মতানুসারে যিনি কর্কশ পশমের পরিচ্ছেদ পরিধান করেন তিনিই "সূফী"। সূফীগণ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন এবং সকলপ্রকার ভোগবিলাস বর্জ্জন করিয়া অতি অল্প মূল্যের কর্কশ পশমবস্ত্র পরিধান করিতেন। সেই জন্যই তাঁহাদিগকে "সূফী" অথবা "পশমবস্ত্রধারী" বলা হইত। ইহা সত্ত্বেও পবিত্রতাবাচক "সফা" শব্দ হইতেই "সূফী" শব্দের উৎপত্তি এইরূপ একটী যে সাধারণ ধারণা আছে, তাহার কারণ এই যে, সূফীগণ বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কলাপ অপেক্ষা আন্তরিক পবিত্রতা ও অকপটতাকেই সমধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত সূফীগুরু বাগদাদ নিবাসী জুনাইদ্ বলিয়াছেন যে, পবিত্রতাই সূফীধর্ম্মের মূলভিত্তি, যিনি সংসারক্লেদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তিনিই একমাত্র পবিত্রচেতা, তিনিই প্রকৃত সূফী।

অতএব, আচারানুষ্ঠানের দিক হইতে সূফী মতবাদ সন্ন্যাসব্রত বিশেষ (Asceticism)। মানব মনের বাসনা কামনার সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং জাগতিক সকল সুখের প্রতি বৈরাগ্য সৃষ্টিই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আবুল হাসান নূরী বলিয়াছেন যে, সূফীগণ কেবল নির্ধন নহেন, তাঁহারা নিষ্কামও; তাঁহারা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত বরণ করেন এবং ঈশ্বর ব্যতীত তাঁহাদের অপর কোনও দ্রব্যে আসক্তি নাই। ধর্ম্মের দিক হইতে সূফী মতবাদ ঈশ্বরের সহিত পরিপূর্ণ, বাধাহীন মিলনকেই মানবজীবনের একমাত্র কাম্য ও সার্থকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই মিলন বুদ্ধিপ্রসূত নহে, সম্পূর্ণরূপে আবেগসম্ভূত। প্রেমই মানব ও ঈশ্বরের মিলন সেতু, বিচার বুদ্ধি অথবা সাধারণ প্রমাণজন্য (প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি) জ্ঞান নহে। তজ্জন্য সূফীমতকে ইস্লামীয় অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমিয়াবাদ (Islamic Mysticism) বলা হয়। বিখ্যাত সূফী আবুল হাসান নূরী জগতের প্রতি ঘৃণা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিকে সূফীধর্ম্মের মূলভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জুনাইদ্ ও বলিয়াছেন, মানবের ক্ষুদ্র 'আমিত্বের' বিনাশ ও ঈশ্বরের পুনর্জীবন লাভই সূফীধর্ম্মের সারকথা।

বিভিন্ন সূফীগণ সূফীধর্ম্মের বিভিন্ন বিবরণী ও সংজ্ঞা দিয়াছেন। তন্মধ্যে মারুফ্ আল্ কার্খীকৃত ব্যাখ্যাই প্রাপ্ত বিবরণীর মধ্যে প্রাচীনতম। তাঁহার মতে সূফীমতবাদ "পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ক উপলব্ধি ও জাগতিক বস্তুবিষয়ক বৈরাগ্য" ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সূফীগণকে "তত্ত্বানুগামী" অথবা "ঈশ্বরানুগামী" (আহল্ আল্ হাক্) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। তাঁহাদের সমগ্রসত্তা ভগবদারাধনাতেই নিমগ্ন থাকে, অন্য কোনও বস্তু বা তত্ত্বে তাঁহাদের স্পৃহা ও প্রয়োজন নাই।

সূফীদের বিশ্বাস যে তাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং জগতে তাঁহারাই ঈশ্বরের দূত ও প্রচারক। ইয়ুসুফ্ ইবন্ হুসেইন্ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক সমাজে একদল সাধু থাকেন যাঁহাদের স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় দূতরূপে বরণ করেন এবং যাঁহাদের সহায়তাতেই তিনি স্বীয় বাণী মানবসমাজে প্রচার করেন ইস্লাম্ সম্প্রদায়ে সূফীগণই ঈদৃশ নির্ব্বাচিত ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক। বহু সূফীর বিশ্বাস যে, মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে দুই প্রকারের বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—প্রথমটী কোরাণে এবং দ্বিতীয়টী মহম্মদের হৃদয়ে লিখিত আছে। প্রথমটীকে মহম্মদের "গ্রন্থনিহিত জ্ঞান" (ইলম্ ই সাফিনা) ও দ্বিতীয়টীকে তাঁহার 'হৃদয় নিহিত জ্ঞান' (ইলম্ ই সীনা) বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রথমটী সর্ব্বসাধারণের ও দ্বিতীয়টী নির্ব্বাচিত কয়েকজনের জন্য মাত্র। সূফীদের মতে তাঁহারাই ঈদৃশ নির্ব্বাচিত সম্প্রদায় এবং তাঁহারাই একমাত্র মহম্মদের প্রকৃত শিষ্য ও অনুগামী। সনাতনপন্থী ইস্লামধর্ম্মিগণ অবশ্য উক্ত দুই প্রকার বাণীর সত্যতা স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে, মহম্মদ ভগবানের নিকট হইতে যে বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা একমাত্র কোরাণেই লিপিবদ্ধ আছে, সূফীগণ অপর কোনও বিশেষ বাণী প্রাপ্ত হন নাই। যাহা হউক, অন্যান্য ইস্লাম সম্প্রদায়ের ন্যায় সূফী সম্প্রদায়ও মহম্মদের উপদেশাবলী হইতেই উদ্ভূত বলিয়া সূফীগণের বিশ্বাস, যদিও সনাতনপন্থী ইস্লাম সম্প্রদায় সূফী মতকে ইস্লাম মতানুযায়ীরূপে গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীন সূফীমতবাদ অপেক্ষা তৎপরবর্ত্তী মতবাদই প্রাচীনপন্থী ইস্লামের নিকট অধিকতর আপত্তিজনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। বিখ্যাত সূফীগণও তাঁহাদের মতবাদ যে কোরাণের মতবাদের বিরোধী নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় :—ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? প্রত্যেক কর্ম্মের পশ্চাতে থাকে একটী প্রেরণা; অর্থাৎ যে বস্তু আমাদের নাই, অথচ যাহা আমরা চাই তাহারই লাভের তীব্র ইচ্ছা। অতএব অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্যই কেবল লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অপ্রাপ্ত বস্তু অথবা অপূর্ণ ইচ্ছা থাকা সম্ভবপর নহে। তিনি আপ্তকাম, নিত্যতৃপ্ত, পরিপূর্ণ আনন্দময়। অতএব তাঁহার জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্যটী কোন উদ্দেশ্যপ্রসূত?

এই সম্বন্ধে সূফীগণ সাধারণতঃ একটী সুবিদিত পরম্পরাগত জনশ্রুতি সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা এই: "ডেভিড ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু! আপনি কেন মানবজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন?' ঈশ্বর উত্তর দিলেন:—'আমি গুপ্তনিধি এবং আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি'।" অতএব মানবের নিকট সুবিদিত হইবার বাসনায় ঈশ্বর জগৎ এবং জগতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী (Idealist) সূফীগণ উক্ত জনশ্রুতির এই অর্থ করেন যে, মানবের ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরের স্বাত্মজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। ঈশ্বর স্বীয় সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে জানিবার জন্যই, স্বীয় অনভিব্যক্ত স্বরূপকে পূর্ণ প্রকটিত করিবার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই ঈশ্বর তাঁহার অপ্রকটীকৃত শুদ্ধস্বরূপাবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নামরূপ বিশিষ্ট বিশ্বসংসারে ক্রমবিবর্ত্তিত হন, এবং পরিশেষে মানব সৃষ্টি করেন। মানবেই ঈশ্বরের পূর্ণ পরিণতি, এবং মানবেই তিনি স্বীয় পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। অতএব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের দর্পণস্বরূপ, যে দর্পণে তিনি স্বয়ং স্বীয় স্বরূপ দর্শন করেন। কিন্তু জগৎ মলিন দর্পণতুল্য; কারণ ইহা ঈশ্বরের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র, তাঁহার সমগ্র স্বরূপ অথবা সমগ্র গুণাবলীর প্রপঞ্চনা ইহাতে নাই। কিন্তু মানব অর্থাৎ 'পূর্ণমানব', ঈশ্বরের নির্ম্মল, পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ দর্পণস্বরূপ, কারণ পূর্ণমানব তাঁহার সমগ্রস্বরূপ ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিব্যক্তি। এইরূপে, ঈশ্বর পূর্ণমানবের দ্বারাই নিজেকে নিজে পরিপূর্ণভাবে জানিতে পারেন, এবং নিজেকে নিজে জানিতে ইচ্ছুক হইয়াই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া যুগপৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, প্রেমিক ও প্রিয়রূপ ধারণ করিয়াছেন।

সুন্দরী নারী ও তাঁহার দর্পণের উদাহরণ দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হইবে। সুন্দরী নারী স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে ও জানিতে উৎসুক। তজ্জন্য দর্পণ তাঁহার নিকট অত্যাবশ্যক। একমাত্র দর্পণের সাহায্যেই তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য স্বয়ং দর্শন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। নতুবা, তিনি সৌন্দর্য্যবতী হইয়াও স্বীয় সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকিয়া যান।

দর্পণ অবশ্য তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অথবা বর্দ্ধিত করে না, কিন্তু পূর্ব্বস্থিত সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত ও তদ্রূপে তাঁহার নিকট জ্ঞাত করে মাত্র। মলিন দর্পণে কিন্তু সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য নির্ম্মল দর্পণের প্রয়োজন। ঈদৃশ নির্ম্মল দর্পণেই তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া আনন্দে আত্মহারা হন। সুতরাং, সুন্দরীর দর্পণদর্শন কার্য্যটী নিরর্থক নহে এবং তাহার ফলস্বরূপ যে দর্পণস্থ প্রতিচ্ছবি তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক। সুন্দরীর স্বসৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দই দর্পণাবলোকন কার্য্য ও দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের সাক্ষাৎ ফল এবং ইহাদের অভাবে তাঁহার জ্ঞান ও আনন্দেরও অভাব ঘটিত। সুতরাং, তাঁহার জ্ঞান ও আনন্দের সম্পূর্ণতার জন্যই, দর্পণদর্শন কার্য্য ও দর্পণস্থ প্রতিচ্ছবি অত্যাবশ্যক।

ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য্যটীও একই উদ্দেশ্য প্রসূত, নিরর্থক নহে। ঈশ্বরও স্বীয় সমগ্র সত্তা, স্বীয় পূর্ণস্বরূপ পরিপূর্ণভাবে জানিতে উৎসুক। তজ্জন্য তিনি স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপকে অনন্ত কল্যাণ গুণগ্রামে অভিব্যক্ত করেন এবং এই অভিব্যক্তিই জগৎ সৃষ্টি। অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্ত গুণগ্রাম, দর্পণ, অথবা প্রতিচ্ছবি মাত্র। জগদ্রূপ দর্পণ অথবা প্রতিচ্ছবির সাহায্যেই ঈশ্বর স্বীয় স্বরূপ ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ জানিতেছেন ও জানিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন। জগতে অবশ্য ঈশ্বরের গুণাবলীর অর্থাৎ স্বরূপের আংশিক বিকাশ মাত্র হইতেছে বলিয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির পরে মানব সৃষ্টিও করিয়াছেন। পুনরায় তন্মধ্যে যাঁহারা মরমী ভক্ত, যাঁহারা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই "পূর্ণমানব" এবং তাঁহারাই ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। ঈদৃশ পূর্ণমানবেই ঈশ্বর স্বীয় সমগ্র স্বরূপ ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি ও পরিপূর্ণ আনন্দলাভ করিতেছেন। ঈদৃশ পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান ও তজ্জনিত পূর্ণ আনন্দানুভব এতদ্দ্বয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

এস্থলে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। উক্ত মতানুসারে, সুন্দরী যেরূপ দর্পণে স্বীয় সৌন্দর্য্য অবলোকন না করিলে সে সম্বন্ধে অজ্ঞই থাকিয়া যান এবং আনন্দও লাভ করিতে পারেন না, তদ্রূপ ঈশ্বরও জগতে, অর্থাৎ পূর্ণমানবে, স্বীয় স্বরূপ বা গুণাবলী প্রত্যক্ষ না করিলে স্বস্বরূপ বা গুণাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকেন এবং আনন্দলাভেও সমর্থ হন না। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি অজ্ঞ ও নিরানন্দ ছিলেন ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অনভিব্যক্ত স্বরূপ, নির্গুণ পরমাত্মার জ্ঞানের ও আনন্দের অভাব ছিল; সৃষ্টির পরেই সেই অভাবদ্বয় বিদূরিত হয়। কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বগুণোপেত, জ্ঞানস্বরূপ, নিত্যতৃপ্ত, আপ্তকাম মহান্ পুরুষের পক্ষে কোনোরূপ অভাব, দোষ, ন্যূনতা বা অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ, কোনও কোনও সূফী বলিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও পরমাত্মার জ্ঞান ও আনন্দের অভাব ছিল না—তৎকালেও তিনি স্বীয় স্বরূপকে পরিপূর্ণভাবেই জানিতেন এবং তৎকালেও তাঁহার আনন্দের লেশমাত্রও অভাব ছিল না। তথাপি জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, পরমাত্মা পুনরায় স্বীয় স্বরূপ দর্শনে উৎসুক হইয়া জগৎ সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং, জ্ঞান ও আনন্দের বিন্দুমাত্র অভাব না থাকিলেও, পূর্ণমানবের দ্বারা পুনরায় জ্ঞান ও আনন্দলাভের জন্যই তিনি সৃষ্টি করেন। জামী বলিয়াছেন: "যদিও তিনি স্বীয় স্বরূপেই স্বীয় গুণগ্রাম পরিপূর্ণভাবে দর্শন ও উপলব্ধি করেন তথাপি তাঁহার স্বরূপ বা গুণাবলী যেন অপর এক দর্পণে তাঁহার নিকট পুনরায় প্রতিফলিত হয় তজ্জন্য তাঁহার অভিলাষ জন্মে।" হাল্লাজ্ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর তাঁহার স্বীয় স্বরূপ, অর্থাৎ স্বীয় আনন্দ ও প্রেমকে বহির্বিক্ষিপ্ত করিতে ইচ্ছুক হন, যাহাতে তিনি তদ্দর্শন ও তৎসঙ্গে কথোপকথন করিতে পারেন। অতএব জগৎ ঈশ্বরস্বরূপের পরিণাম, তাঁহার প্রেম ও আনন্দের মূর্ত্ত প্রকাশ।

উপরিলিখিত সূফী প্রতিবিম্ববাদের সহিত অবশ্য অদ্বৈত প্রতিবিম্ববাদের বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। অদ্বৈত মতে, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মায়া বা অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঈশ্বররূপ, ও অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপ, ধারণ করেন (১)। প্রতিবিম্ব মিথ্যা, মায়া মাত্র সত্য বস্তু নহে। তদ্রূপ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম ও জীবও মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। কিন্তু উক্ত সূফী মতে, জগৎ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ সত্য প্রকাশ ও পরিণতি, মিথ্যা নহে। নির্গুণ পরমাত্মা সত্যই সগুণ ঈশ্বরে অভিব্যক্ত হন এবং সত্যই জগতে ও পূর্ণমানবে ক্রমবিবর্ত্তিত হন। অতএব জগৎ পরমেশ্বর তুল্য সত্য। অবশ্য কোনও কোনও সূফী সম্প্রদায় জগতের মিথ্যাত্বও স্বীকার করিয়াছেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার জ্ঞান ও আনন্দের বিন্দুমাত্রও অভাব না থাকিলেও তিনি কোন্ উদ্দেশ্য অনুপ্রাণিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনরায় জ্ঞান ও আনন্দ লাভে উদ্‌গ্রীব হইলেন, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার আলোচনা সূফীমতবাদে দৃষ্ট হয় না। হাল্লাজ্ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান ও আনন্দের অভাব না থাকিলেও, তিনি প্রতিচ্ছবি ও সাথীরূপে মানব সৃষ্টি করেন।

'ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন?' ইহা দর্শন শাস্ত্রের চিরন্তন প্রশ্ন। বেদান্তমতে, জগৎ সৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা অথবা ক্রীড়ামাত্র। ক্রীড়া অভাবজাত নহে; উপরন্তু যাঁহার কোনরূপ অভাব বা প্রয়োজন নাই, তিনিই ক্রীড়ায় কালক্ষেপ করিতে পারেন। ক্রীড়া কর্ম্মবিশেষ সন্দেহ নাই, কিন্তু অপরাপর কর্ম্মের সহিত ইহার মূলগত প্রভেদ এই যে, ইহা প্রয়োজনসম্ভূত নহে। অপরাপর কর্ম্মের পশ্চাতে থাকে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছা, অভাব পূরণের প্রচেষ্টা; সুতরাং ইহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। কিন্তু ক্রীড়া কর্ম্মবিশেষ হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্ স্বভাব। ইহা অভাব পূরণের প্রচেষ্টা নহে, উপরন্তু অভাব পূরণ হইবার পরেই ইহার উদ্ভব পূর্ব্বে নহে। প্রয়োজন সিদ্ধি হইবার পরে প্রাণে যে শান্তি ও আনন্দের উদয় হয়, ক্রীড়া তাহারই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র। বেদান্তে এই প্রসঙ্গে মহাপরাক্রান্ত নৃপতির দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়া, সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিঃশেষে সম্পাদন করিয়া, সকল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধ করিয়া তৎপরেই তিনি ক্রীড়া ও উৎসবে রত হন। সেই সকল ক্রীড়া ও উৎসবাদি তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় নহে—কারণ বর্ত্তমানে তাঁহার অভাব কিছুই নাই, তাহারা কেবল তাঁহার আনন্দের বাহ্যিক প্রকাশ। অতএব, প্রথমে অভাবমূলক কর্ম্ম, তৎপরে উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও তজ্জনিত আনন্দ, তৎপরে আনন্দমূলক কর্ম্ম বা ক্রীড়া। এতদ্রূপে ক্রীড়া আনন্দভাবমূলক কর্ম্ম নহে, প্রাপ্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং, প্রত্যেক কর্ম্মই যে প্রয়োজনানুরোধী ইহা স্বীকার করা চলে না। অবশ্য সাধারণতঃ, কর্ম্মসমূহ যে অভাবমূলক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রীড়ারূপ কর্ম্মকে উক্ত পর্য্যায়ভুক্ত করা অসঙ্গত।

ঈশ্বর আপ্তকাম, আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ—তাঁহার অভাব ও প্রয়োজন কিছুই নাই। অতএব তাঁহার জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্যটী সাধারণ অভাবমূলক কর্ম্ম হইতেই পারে না। সুতরাং ইহা ক্রীড়ারূপ কর্ম্মমাত্র। জগৎ সৃষ্টির দ্বারা ঈশ্বর কোনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করেন না। উপরন্তু, কোনও অভাব ও প্রয়োজন নাই বলিয়াই জগৎ সৃষ্টিরূপ ক্রীড়ায় তিনি মত্ত হন। এইরূপে সৃষ্টি ঈশ্বরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত, নিত্য উদ্বেলিত, অসীম, অপরিমেয় আনন্দের মূর্ত্ত বিকাশমাত্র। তজ্জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ৩—)। আনন্দ হইতেই সমগ্র বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি; আনন্দেই তাহাদের স্থিতি; আনন্দেই তাহাদের লয়।

(১) বেদান্ত পরিভাষা, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ-আর্-ই-এস্

(১০)

ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতি বা Indian National Congress প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন * তাহার মর্ম্ম এই :—

"অনেকেই জ্ঞাত নহেন যে মার্কুইস অব ডাফরিণ যখন ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন তখন তাঁহারই মনে কংগ্রেসগঠনের কল্পনা উদিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার এ-ও-হিউমের মনে হয় যদি প্রতিবৎসর ভারতের নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া সামাজিক প্রশ্নাদির আলোচনা করেন তাহা হইলে অনেক সুফল প্রসূত হইতে পারে। তিনি সে সভায় রাজনীতিক আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তাহা হইলে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের রাজনীতিক সভাসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। যে বারে যে প্রদেশে সভার অধিবেশন হইবে সেইবার সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে সভাপতি করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, কারণ তাহাতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমধিক সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে।

লর্ড ডাফ্‌রিণ

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বড়লাট লর্ড ডাফরিণ (যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন) সিমলায় গমন করিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করেন। লর্ড ডাফরিণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনার পর তাঁহাকে কিছুদিন পরে ডাকিয়া বলেন, উহাতে বিশেষ সুফল ফলিবে না। তিনি বলেন, ইংলণ্ডে যেমন একদল মন্ত্রী শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন আর একদল প্রতিপক্ষ তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা করেন, এদেশে তেমন opposition বা সরকার-বিরোধী দল নাই। এদেশের সংবাদপত্রে লোকমত প্রতিফলিত হইলেও তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না। ইংরাজেরা তাঁহাদের স্ব তাঁহাদের অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে ভারতবাসীরা কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন তাহা তাঁহারা জানেন না। এ অবস্থায় ভারতীয় রাজনীতিকরা যদি বৎসর বৎসর সভায় সমবেত হইয়া শাসন-প্রণালীর ত্রুটি দেখাইয়া দেন ও সংস্কারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেন তবে শাসক ও শাসিত সকলেরই উপকার হয়। এরূপ সভায় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না; কারণ, তাঁহার সমক্ষে সকলে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে না পারেন। মিষ্টার হিউম লর্ড ডাফরিণের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তিনি তাঁহার প্রস্তাব ও লর্ড ডাফরিণের প্রস্তাব দুইটাই কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য স্থানের প্রসিদ্ধ রাজনীতিকগণের নিকট উপস্থাপিত করেন। ইঁহারা সকলেই ডাফরিণের প্রস্তাবটির অনুমোদন করেন এবং তদনুসারে কার্য্যারম্ভে প্রবৃত্ত হন। লর্ড ডাফরিণ মিষ্টার হিউমের সহিত এই সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, লর্ড ডাফরিণের ভারতবর্ষে অবস্থানকালে যেন এই প্রস্তাবসম্পর্কে তাঁহার নাম না প্রকাশিত হয় এবং এই সর্ত্ত সাবধানে প্রতিপালিত হইয়াছিল, হিউম যাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যতীত একথা আর কেহ জানিতেন না।"

কিন্তু লর্ড ডাফরিণকে আমরা "কংগ্রেসের পিতা" বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না, কারণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে উমেশচন্দ্র উহার উদ্দেশ্য ও নীতি প্রকাশ করিবার পরেই তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতে স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন প্রমুখ প্রাদেশিক গবর্ণরগণ উহার পথে বহু বাধা বিঘ্ন উপস্থাপিত করিয়া সূতিকাগারেই উহাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদারহৃদয় ভারতপ্রেমিক অ্যালান

অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম

অক্টেভিয়ান হিউম অবসর-প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান [illegible] প্রথমাবধি কংগ্রেসের সেক্রেটারীরূপে [illegible] কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা ধীরভাবে কংগ্রেসের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে হিউমের [illegible] ও দাদাভাই নৌরোজী না থাকিলে কংগ্রেস [illegible] হইত না। হিউম স্বয়ং উমেশচন্দ্রকে কংগ্রেসের [illegible] বলিয়া গিয়াছেন।

* Introduction to Natesan's "Indian Politics"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর পুণা সহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইবে স্থির হয়। কিন্তু তথায় বিসূচিকার প্রাদুর্ভাবহেতু সে অধিবেশন বোম্বাই সহরেই গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে হইয়াছিল। মিষ্টার হিউমের প্রস্তাবে মাননীয় সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও মাননীয় কে-টি-তেলাং এর সমর্থনে উমেশচন্দ্র এই অধিবেশনে সভাপতির আসনে বৃত হন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বার-এট-ল সম্পাদিত "মহাজাতি গঠন পথে (রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি)" নামক গ্রন্থের

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বার-এট-ল

পরিশিষ্টে Nativity of the Indian National Congress নামক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে চৌধুরী মহাশয় উমেশচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"মিষ্টার ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী ভারতবর্ষীয় জাতীয় সমিতির প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি তৎসময়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ভারতীয় ব্যবহারাজীব ছিলেন, অধিকন্তু বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বিচারপতিগণ ও ব্যবহারাজীবগণের নিকট এবং সরকার ও জনসাধারণের নিকট অসাধারণসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। একসময়ে ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী যে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, লর্ড সিংহও তাঁহার ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠালাভের সময়েও সেরূপ লাভ করিতে পারেন নাই! তিনি দীর্ঘাকৃতি, সৌম্যমূর্ত্তি এবং বাক্যে ও ব্যবহারে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশালী হইলেও তিনি দেশের সাধারণ কার্য্যে কদাচিৎ যোগদান করিতেন এবং তৎকালীন রাজনীতিক আন্দোলনে তাঁহার বিশেষ সংস্পর্শ ছিল না। তৎকালীন রাজনীতিক চক্রাদিতে যাহা শ্রুত হইয়াছিলাম তাহা এখানে বলিতে পারি। লর্ড রিপণের শাসনকালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় একজন সদস্যের পদ শূন্য হইলে ডব্লিউ-সি-বনার্জীর নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড রিপণ এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে "তিনি প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার রাজনীতিক জীবনের কোন ইতিহাস নাই" এবং তাঁহার নাম পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল।

লর্ড রিপণের অবসর গ্রহণের ঠিক একবৎসর পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী সভাপতি হইয়াছিলেন উহাতে তৎকালে যে জনরব শ্রুত হইয়াছিল তাহা অমূলক নহে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। সে জনরব এই যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্দেশ্য ছিল যে বাঙ্গালায় যে জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যাহা লর্ড রিপণের শাসনকালে অপূর্ব্ব শক্তি ও গতিবেগ লাভ করিয়াছিল তাহা কোন শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন নেতার ধীর ও বিচক্ষণ বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত ও শমিত হয় (put under the control and guidance of a safe and sober man of light and leading.)

উইকলি নোটসের প্রতিষ্ঠাতাসম্পাদক ব্যারিষ্টার চৌধুরী মহাশয় হাইকোর্টে উমেশচন্দ্রের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা এবং সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু কংগ্রেসপ্রতিষ্ঠারপূর্ব্বে উমেশচন্দ্র যে কোন রাজনীতিক কার্য্য করেন নাই—রাজনীতিক চক্রাদিতে শ্রুত এই কথা যে সত্য নহে তাহা পাঠকগণকে বলা নিষ্প্রয়োজন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি লণ্ডন ইণ্ডিয়া সোসাইটী ও পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে যে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং পার্লামেণ্টের প্রতিষ্ঠাশালী সভ্যগণের নিকট যুক্তিতর্কদ্বারা ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকারসম্প্রসারণের ন্যায়সঙ্গত দাবীর যৌক্তিকতা যে ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের পর টাউনহলে তিনি দেশবাসীর সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, এবং 'ইণ্ডিয়ান য়ুনিয়ন' প্রতিষ্ঠাদ্বারা সমগ্র ভারতে রাজনীতিক প্রচেষ্টা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসম্পাদিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় ও য়ুরোপীয় উচ্চতম সমাজে সমান ভাবে মিশিতেন এবং উভয় সমাজেই তাঁহার মত সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকৃষ্ট করিত। মিষ্টার হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাঁহার প্রস্তাব ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্‌গণের নিকটেই উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং যদি উমেশচন্দ্র প্রসিদ্ধ রাজনীতিকগণের মধ্যে গণ্য না হইতেন তাহা হইলে হিউম তাঁহার পরামর্শ যাচ্ঞা করিতেন না বা তিনি প্রথম সভাপতিরূপে বৃত হইতেন না। প্রথম কংগ্রেসের অন্যতর প্রধান উদ্যোগী দাদাভাই নৌরোজী ও ফিরোজশাহ মেটা ইংলণ্ডেই উমেশচন্দ্রের রাজনীতিক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র কেবল খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ছিলেন, অধিকন্তু বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়াই যে প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ যদিও প্রথম কংগ্রেসের প্রধান কার্য্য—সভার নিয়মাদি প্রণয়নে—হয়ত Constitutional Law এ অভিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের সাহায্য আবশ্যক ছিল এবং রাজনীতিক মহাসভা প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ ভারতে প্রথম রাজনীতিক আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির সাহায্যলাভ করা প্রয়োজন ছিল, সে সময়ে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ও ব্যারিষ্টার আরও ত ছিলেন!

লর্ড রিপণের মন্তব্য সম্বন্ধে যে কাহিনী চৌধুরী মহাশয় শ্রবণ

করিয়াছিলেন তাহারও সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, সেকালে এমন লোককেও ব্যবস্থাপক সভায় লওয়া হইত যাঁহাদের কেবল রাজনীতিজ্ঞান ছিলনা তাহাই নহে, যে ভাষায় সভার কার্য্য নির্বাহ হইত সেই ইংরাজী ভাষাতেও সম্যক জ্ঞান ছিল না। রাজপুরুষদের ইঙ্গিতানুসারে ইঁহারা ভোট দিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। একথা উমেশচন্দ্রই ইংলণ্ডে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেসের কতকগুলি সুলিখিত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, বিশেষতঃ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের 'কংগ্রেস', 'বাংলা ও কংগ্রেস' প্রভৃতি তথ্যবহুল গ্রন্থে বিশদভাবে কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে কংগ্রেসের কার্য্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেসে উমেশচন্দ্রের কার্য্যেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইব।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে উমেশচন্দ্র ব্যতীত কলিকাতা হইতে

রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর

'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক খ্যাতনামা এটর্নী নরেন্দ্রনাথ সেন, 'নববিভাকর' সম্পাদক, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী, হাইকোর্টের উকীল গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এবং এলাহাবাদ হইতে আগত 'ইণ্ডিয়ান য়ুনিয়ন' সম্পাদক জানকীনাথ ঘোষাল উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা ছাড়াও মিষ্টার এ-ও-হিউম, বোম্বাইয়ের দাদাভাই নৌরোজী ও ফিরোজশাহ মেটা এবং মান্দ্রাজের সুব্রহ্মণ্য আয়ার, এস চিপলঙ্কার, পি আনন্দ চার্লু—কংগ্রেসে বিশেষভাবে যোগদান করেন।

নৌরোজী সভাপতি মহাশয়কে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করিলে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত ৪ ভাগে বিভক্ত করেন :—

(১) সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাঁহারা দেশের কাষ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন—

(২) পরিচয়ের ফলে জাতিগত, ধর্ম্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার যথাসম্ভব দূরীকরণ এবং লর্ড রিপণের শাসনকালে যে জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছে তাহার পরিপুষ্টি সাধন ;

(৩) আবশ্যক সামাজিক ব্যাপারে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মত নির্দ্ধারণ ;

(৪) আগামী দ্বাদশ মাসে ভারতীয় রাজনীতিকদিগের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ।

প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

জানকীনাথ ঘোষাল

(১) এদেশে ও বিলাতে ভারতশাসন-সংস্কার সম্বন্ধে একটী রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হউক। উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হউক এবং কমিশন কর্ত্তৃক ভারতে ও বিলাতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক।

(২) ভারত-সচিবের পরামর্শ-পরিষদ বিলুপ্ত করা হউক।

(৩) নির্ব্বাচিত সদস্যগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভাসমূহের সংস্কার করা হউক।

(৪) বিলাতের মত এ দেশেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক।

(৫) সামরিক বিভাগের বর্ত্তমান ব্যয় অনাবশ্যক এবং রাজস্বের তুলনায় অত্যধিক।

(৬) যদি সামরিক বিভাগের ব্যয় হ্রাস করা না হয় তবে অতিরিক্ত ব্যয় কাষ্টমস-শুল্ক ও লাইসেন্স-কর দ্বারা নির্ব্বাহিত হউক।

(৭) কংগ্রেসের মতে উত্তরব্রহ্ম অধিকার অনাবশ্যক। কিন্তু যদি সরকার অধিকার করাই স্থির করেন, তবে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে সিংহলের ন্যায় উপনিবেশ করা সঙ্গত।

(৮) কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রাদেশিক রাজনৈতিক সভাসমিতির গোচরে আনা হউক।

(১) আগামী কংগ্রেস ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতায় হইবে।

সভাপতির অভিভাষণ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে পরবর্ত্তীকালের সভাপতিদের ভাষণের ন্যায় উহা দীর্ঘ ও অনাবশ্যক অলঙ্কার ভারাক্রান্ত নহে, কিন্তু উহাতে সংযত ভাষায় সংক্ষেপে কাজের কথাগুলি বলা হইয়াছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী Chief ছদ্মনামে এই অধিবেশনের একটি মনোজ্ঞ চিত্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রেইজ এণ্ড রায়ত' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ফিরোজশাহ মেটার ওজস্বিনী বক্তৃতা, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গের সরস বাণী, দাদাভাই নৌরোজীর অদম্য উৎসাহ, নরেন্দ্রনাথ সেনের সরল আন্তরিকতা, জানকীনাথ ঘোষালের শান্ত ও সংযত সুর, সুব্রহ্মণ্য আয়ারের 'বাঙ্গালার পঞ্চ' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক হাস্যোদ্রেককারী বাণী, হিউমের সরল সহৃদয়তা ও বুদ্ধিদীপ্ত আননের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া লেখক (সম্ভবতঃ গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়) সভাপতি উমেশচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—
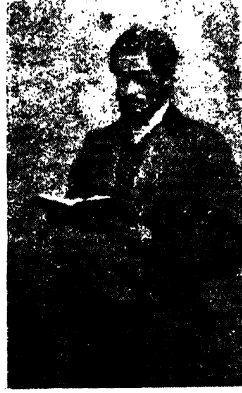
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"উমেশচন্দ্রকে সম্মানিত করিয়া—জ্যেষ্ঠা ভগিনী বাঙ্গালাকে সম্মানিত করিয়া—বোম্বাই নিজেকে সম্মানিত করিয়াছিল। উচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জাত, অনন্যসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী, হৃদয় ও মনের অপূর্ব্ব সদগুণে অলঙ্কৃত, ভারতবাসীর পক্ষে এদেশে যে সকল অত্যুচ্চ আসন অধিকার সম্ভব স্বকীয় প্রতিভাবলে তাহার একটিতে অধিষ্ঠিত, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারিতেন না। তিনি যে ভাবে সভাপতির কর্ত্তব্য সুসম্পাদিত করিয়াছিলেন তাহা দেখিবার জন্য সকল প্রকার কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা সার্থক। কার্য্যের গতি কোথাও প্রতিহত হয় নাই, কোথাও শৃঙ্খলাবিহীন হয় নাই, যে অবস্থায় সভা হইয়াছিল তাহাতে যে সঙ্কোচ স্বভাবতঃই আশা করা যায়, সে সঙ্কোচ তাঁহার কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, উপবেশন করিয়াছিলেন, শান্তভাবে সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছিলেন, যেন একার্য্যে তিনি চিরাভ্যস্ত, যেমন সহজভাবে তিনি মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। সুন্দর দীর্ঘ অবয়ব, উজ্জ্বল আনন, দীর্ঘ দোদুল্যমান শ্মশ্রুরাজি, মনোজ্ঞ নির্দ্দোষ ভাষণ, আধুনিক যুবকগণের অনুকরণীয় শিষ্টাচার ও বিনয় এবং তৎসহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ সমন্বিতা অনিন্দনীয়া ঝঙ্কারময়ী বাণী—এই সমূহের দ্বারা তিনিই সভার কার্য্যের সুষ্ঠু পরিচালনার অর্দ্ধেক সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ইংরাজের মত, ধরণধারণ, বসিবার ও দাঁড়াইবার ভঙ্গী সমস্ত ইংরাজের মত, তাঁহার ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গী, মৃদু হাস্যসঞ্চালন হইতে মৃদু মস্তক সঞ্চালনের ভঙ্গী সমস্তই ঠিক ইংরাজের মত। তথাপি, এ সকল সত্ত্বেও হিন্দুর বিশেষত্ব তাঁহার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিতে চলনে এবং বাণীতে যে সৌন্দর্য্য ও বিনয় প্রকটিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ এদেশীয়। বস্তুতঃ তাঁহাকে তাঁহার সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর ভারতবাসী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল এবং তিনি সভাস্থলে সকলের ঈর্ষা, গর্ব্ব এবং লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন।

পুনশ্চ, এলিফ্যান্টা গুহায় প্রমোদ ভ্রমণ কালে তাঁহার চরিত্রের অন্তরতম প্রদেশ পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল। তিনি স্নেহশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শান্ত স্বভাবে এমন কিছু ছিল না যাহা আকৃষ্ট করিলেও কখনও কখনও বিরক্তি উৎপাদন করে। সকলের সহিত তিনি একইভাবে কথোপকথন করিয়াছিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে একটি স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া সকলের প্রতি একটি কোমল স্নেহময় ভাব প্রকটিত করিয়াছিল—সে কোমলতা যে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উদ্ভূত তাহা অনুভব করা কঠিন ছিল না। তরুণগণের প্রতিও তিনি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত সৌজন্য সহকারে বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে মুরুব্বিয়ানার দোষ আদৌ পরিলক্ষিত হয় নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহার আচার ব্যবহার প্রত্যেক হিন্দুর—হিন্দুর কেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর গর্ব্ব করিবার বিষয়। ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে যেরূপ প্রতিষ্ঠা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন—রাজনীতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার সমক্ষে সেইরূপ প্রতিষ্ঠার পথ প্রসারিত হইয়া আছে।"

প্রতীক্ষায়

শ্রীবীণা দে

হে প্রিয় আমি তোমারি তরে জ্বালিয়া দীপ-শিখা
জাগায়ে আঁখি রয়েছি বসি' একেলা ঘরে মোর,
জানি না তুমি কখন্ আসি আমারে দিবে দেখা।
নাহি কো তারা ডুবেছে শশী রজনী অমা ঘোর।

বাহিরে বায়ু বহিছে বেগে কাঁপিয়া উঠে শিখা।
বুকের আড়ে যতনে ঢাকি তরাসে করি ত্বরা,
মনেতে ভয় কী আছে ভালে—না জানি আছে লিখা—
ফিরিয়া যাও আঁধার দেখি আঁধার করি ধরা।

আসিবে তুমি মনেতে জানি আসিবে তুমি প্রিয়
আশাতে জাগে—জীবন মোর করিবে রমণীয়।

নামের মূল্য

যাদুকর পি-সি-সরকার

একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, "Wh t's in a name" অর্থাৎ নামে কিছুই আসে যায় না, কারণ গোলাপফুলকে যে কোন নামই দেওয়া যাক না কেন, উহার গন্ধ বিতরণে তাহাতে কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হয় না। এরূপ উদাহরণ অনেকেই দেওয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ এই কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নামেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—'নামকে যাঁহারা নাম মাত্র মনে করেন আমি তাঁহাদের দলে নেই।' এই কথাটা খুবই সত্য। বিশেষ করিয়া যাদুবিদ্যা দ্বারা যাঁহারা যশ অর্জ্জন করিতে চাহেন, তাঁহাদের নাম স্থির করা (nomenclature) সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করিবার বিষয় আছে। শ্রুতিকঠোর নাম সর্ব্বক্ষেত্রের ন্যায় যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রেও শ্রোতার মনের উপর বিকর্ষণ আনিয়া থাকে। শ্রুতিমধুর বিবেচনা করিয়াই মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের বার্ষিক উৎসব 'ত্রিপুরী'তে এবং তৎপর 'রামনগর'এ অনুষ্ঠিত করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন—ইহা সংবাদপত্রপাঠক মাত্রেই বিশেষ অবগত আছেন। সে যাহাই হউক আলোচ্য প্রবন্ধে যাদুকর জীবনে নামের মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা কি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইব। প্রথমতঃ কয়েকজন পৃথিবী বিখ্যাত যাদুকরের কথা আলোচনা করিলেই এই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর 'হুডিনি' (Houdini)র কথা ধরা যাইতেছে। তাঁহার আসল নাম ছিল (Erich Weiss) 'এরিক ওয়েস্' কিন্তু ইহা অনেকেই হয়ত জানেন না। তিনি 'রবার্ট হুডিন' (Robert Houdin) নামক একজন প্রসিদ্ধ যাদুকরের নাম অনুকরণ করিয়া 'হুডিনি' নাম গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—

......When it became necessary for me to take a stage name, and a fellow-player, possessing a veneer of culture, told me that if I would add the letter "i" to Houdin's name, it would mean, in the French language, "like Houdin." I adopted the suggestion with enthusiasm. I asked nothing more of life than to bec me in my profession "like Robert-Houdin."......

অর্থাৎ "আমার ষ্টেজ নাম লওয়ার প্রয়োজন হইলে আমারই একজন বিশিষ্ট শিক্ষিত সহকর্ম্মী আমাকে বলেন যে 'হুডিন' এই নামের পশ্চাতে ইংরাজী অক্ষর 'আই' যোগ করিলে ফরাসী ভাষায় উহার অর্থ হয় 'হুডিনের ন্যায়,' আমি উহা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করি ; কারণ আমি ব্যবসায়ী জীবনে 'হুডিনের ন্যায়'ই হইতে চাহিয়াছিলাম তদপেক্ষা বেশী নহে।" এই শ্রুতিমধুর 'হুডিনী' নামটি করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি **Harry Houdini** 'হ্যারী হুডিনী' নাম গ্রহণ করেন এবং এই নামেই তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি যে কোন দেশের হাতকড়ি খুলিতে পারিতেন বলিয়া এবং ঐটিই তাঁহার বিশেষ খেলা ছিল বলিয়া উত্তরকালে তিনি **Harry Handcuff Houdini** নামে পরিচয় দিতেন এবং পুস্তকাদিতেও সেই নামই প্রকাশিত হইত। বিশেষ মজা এই যে 'হুডিনি' যে ফরাসী যাদুকরের কথা নকল করিয়াছিলেন, পরে তিনি তদপেক্ষা অধিক সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাদুকর হুডিনির নাম হইতেই ওদেশের অভিধানে **Houdinise** নামে একটি নূতন শব্দ গ্রথিত হইয়াছে, যাহার অর্থ "অদ্ভুত কিছু সম্পাদন করা।"

বিখ্যাত চাইনিজ যাদুকর 'চাং লিং সু' (**Chung Ling Soo**)র নাম শুনেন নাই এমন যাদুকর পৃথিবীতে বোধ হয় কেহই নাই। পৃথিবীর সর্ব্বদেশে তিনি একজন প্রকৃত চাইনিজরূপেই পরিচিত ছিলেন, যদিও আসলে তিনি ছিলেন স্কচ-আমেরিকান (**Scotch American**). তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'ক্যাম্বেল' (**Campbell**) এবং উত্তর নিউইয়র্ক ষ্টেটে তাঁহার বাড়ী ছিল। তিনি প্রথমে তাঁহার নাম "উইলিয়াম এলস-ওয়ার্থ রবিনসন" (**William Elsworth Robins n**) করেন, পরে "চিং লিং ফু" (**Ching Ling Foo**) নামক একজন আসল চীনা যাদুকরের নাম অনুকরণ করিয়া নিজের নাম রাখেন—

......"After the advent of the chinese Conjuror, Ching Ling Foo, Robinson, disguised as a chinaman, under the nom de theatre of Chung Ling Soo toured Europe. It is reported that certain Parisian journalists actually interviewed Chung Ling Soo on the chinese imbroglio. Decked out in a yellow robe his face enamelled and painted, with the eyes m de up to perfection, the pretended chinese magician received the journalists in a room dimly illuminated with lanterns. He spoke through an interpreter, who had been carefully tutored for the act, and told all he knew, and lots that he did not, concerning the Boxer uprisings in h s native land (?)"......Page 74 (Magic and its Professors.)

অর্থাৎ চিং লিং ফু নামক একজন চীনদেশীয় যাদুকর যখন স্বনামের সহিত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছিলেন, রবিনসন সাহেব তখন চৈনিক বেশ গ্রহণ করিয়া ও চাং লিং সু নাম গ্রহণ করিয়া ইউরোপে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। শুনা যায় প্যারিসের কয়েকজন সাংবাদিক তাঁহাকে খাঁটী চাইনিজ মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হলুদ রংএর পোষাক পরিধান করিয়া গায়ে ও চক্ষুর উপর রং মাখাইয়া খাঁটী চাইনিজ সাজিয়া লণ্ঠন আলোকিত আধ-আলো আধ-ছায়াতে একটি প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে 'বিশেষ ভাবে শিক্ষিত' দোভাষীর সাহায্যে আপন মুলুক (?) চীনদেশে 'বক্সার যুদ্ধ' প্রভৃতি সত্য মিথ্যা জানা অজানা নানা গল্প করিয়াছিলেন। নামের এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সম্ভবতঃ খুব কমই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যাদুকর শুধু নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের জাতি (**nationality**)র পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে যাদুকর যেন তাসের রং পরিবর্ত্তন করার মতই অতি সহজে নিজেদের নাম গোত্র ও জাতির পরিবর্ত্তন করেন।

হল্যাণ্ডের **Bamberg family**ও বর্ত্তমানে আসল চাইনিজ যাদুকর নামে সুপরিচিত। তাঁহারা আজ ছয় পুরুষ যাবৎ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছেন। বর্ত্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ চাইনিজ যাদুকর 'ও কিটো' ও তৎপুত্র 'ফু মানচু' উভয়েই এই বংশ হইতে জাত (**Okito**) 'ও কিটো' সাহেবের প্রকৃত নাম থিওডোর ব্যামবার্গ (**Theodore Bamberg**) এবং ফু মানচু (**Fu Manchu**) সাহেবের প্রকৃত নাম (**David Bamberg**) ডেভিড ব্যামবার্গ [illegible] জানেন না।

যাদুবিদ্যা জগতে হফম্যান (**Hoffman**) সাহেবের [illegible] —এমন লোক বোধ হয় নাই। তিনি কতকগুলি [illegible]

পুস্তক লিখিয়াছেন যাহা যাদুবিদ্যা জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই হফম্যান সাহেবের পুস্তক পাঠ করিয়াই বহু বড় বড় যাদুকর যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। ইনি আর কেহই নহেন লণ্ডনের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার লুইস (Mr. Angelo Lewis. M. A.) সাহেবের ছদ্মনাম। তিনি নিজেই 'হফম্যান' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—আমরা সকলে হফম্যান নামকে চিনি এবং শ্রদ্ধা করি কিন্তু 'লুইস' সাহেব কে, কি করিতেন কেহই খোঁজ রাখি না।

'পামার' (Palmer) সাহেব নিজের নাম রবার্ট হেলার (Robert Heller) নামে জগৎ প্রসিদ্ধ হন। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার নানারূপ বিজ্ঞাপন ছিল—একটিতে নিম্নরূপ কবিতা ছাপান হইত—

Shakespeare wrote well
Dickens wrote weller ;
Anderson was * *
But the greatest is Heller.

পরবর্ত্তীকালে কেলার (Kellar) নামে একজন যাদুকর প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। তিনিও পৃথিবীময় যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া হুলস্থুলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি যখন ভারতবর্ষে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতে আসিয়া কলিকাতায় আসেন তখন Asian পত্রিকাতেও অনুরূপ একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। 'The old & the new magic' পুস্তকের 241 পৃষ্ঠায় প্রকাশ—"During his stay at Calcutta, India, the Asian of Jan 3. 1882, printed the following effusion' a paraphrase an Robert Heller's verse about himself and Anderson :

'For many a day,
We have heard people Say
That a wondrous magician was Heller ;
Change the H into K,
And the E into A
And you have his superior in Kellar"...

এইরূপ আরও অনেক যাদুকর আছেন যথা William B. Caulk সাহেব প্রফেসার বেনজামিন (Prof. Benjamin) নামে, William Peppercorn সাহেব D. Alvini নামে, Count Edmond de Jrisy সাহেব নিজেকে টরিনি (Torrini) নামে পরিচিত করেন। যাদুকর লেফায়েতের নামও জগৎপ্রসিদ্ধ। তিনিও চৈনিক খেলাতে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাদুজগতে তিনি The great Lafayette নামে পরিচিত হইলেও তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল সিজমণ্ড নিউবার্জ্জার (Siegmund Neuberger) এবং জাতিতে জার্ম্মান ছিলেন। জার্ম্মান নামগুলি উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর বলিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ছোটনাম গ্রহণ করেন। একজন জার্ম্মান যাদুকরের প্রকৃত নাম আমি অদ্যাবধি উচ্চারণ করিতে পারি নাই—তাঁহার নাম ইংরাজী অক্ষরে এইভাবে লিখিত হয় Burgenbungenthalerstein , তিনি ষ্টেইন (Stein) নাম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। আমেরিকার যাদুকর সম্মিলনীর মুখপত্রে প্রকাশ

......A conjuror by the name of Burgenbungenthalerstein, has made application to change his name to Stein, giving as a reason, that his name will look too crowded on the billing material. Lengthy names are very common in Germany, but the above is the longest name of any conjuror in the world, I think he ought to advertise himself as the king of long Name Magicians"...

এক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে যাদুকরগণ নিজের নামে যেরূপ পরিচিত তাঁহাদের বিশেষণেও অনুরূপ পরিচিত হইয়া থাকেন। এদেশে দেশবন্ধু বলিলে যেমন চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় বলিলে যতীন্দ্রমোহন, দেশগৌরব, দেশপ্রাণ, লোকমান্য, মহাত্মা, দয়ার সাগর, বাংলার ব্যাঘ্র, ছত্রপতি প্রভৃতি বলিলেই যেমন ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায় ; যাদুবিদ্যা জগতেও এইরূপ Handcuff king 'হাতকড়ির রাজা' বলিলে হুডিনি, King of Cards বলিলে থার্সটন, king of koins (coins) বলিলে নেলসন ডাউনস্ সাহেব, Queen of coins বলিলে ম্যাদাম টাল্মা (Talma), 'Jap of Japs' বলিলেন D. Alvini, Comic Corjuror' বলিলে Imro Fox,' Merry wizard বলিলে J. J. Sargent, father of Modern Magic বলিলে Robert Houdin, 'Military Mystic' বলিলে Bert Powell বুঝায়।

এতদ্ব্যতীত বড় বড় যাদুকরদিগের মধ্যে ইংলণ্ডের যাদুকর সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা উইল গোল্ডষ্টোন (Will Goldston) সাহেবের নিজের 'কার্ল ডেভো' (Carl Devo) পরিচয় দিয়া ব্লাক আর্টের ক্রিয়া দেখাইতেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও ইংলণ্ডের যাদুকর সম্মিলনীর সভাপতি 'হরেস গোল্ডিন' (Horace Goldin) সাহেব নিজের নাম 'ফকির করিম দাম্বিলা' পরিচয় দিয়া বিলাতের রঙ্গমঞ্চে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ ইংলণ্ডে 'করাচী' নামক একজন ভারতীয় যাদুকর ও তাঁহার ছেলে 'কাদের' উভয়ে মিলিয়া যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে উঁহারা জীবনে ভারতবর্ষেই আসেন নাই। ইহাদের প্রকৃত নিবাস ইংলণ্ডেরই অন্তর্গত 'প্লিমাউথ' সহরে এবং ইহাদের নাম 'ডার্বি'। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে পিতার অর্থাৎ 'করাচী'র প্রকৃত নাম 'আর্থার ক্লড ডার্বি' (Arthur Claude Derby).

আমেরিকার একজন বিখ্যাত যাদুকরের নাম 'জন্ মুলহল্যাণ্ড' (John Mulholland) ; কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তিনি কখনও চিং লিং ফুঃ আবার কখনও 'মুহাম্মদ বক্স' নামে পরিচিত। যাদুকর 'হুডিনি'র অনুকরণে বর্ত্তমানে একজন অষ্ট্রেলিয়ান যাদুকর হাতকড়ি খোলা, বাক্স হইতে বহির্গমন প্রভৃতি খেলা দেখাইতেছেন। ইনি 'মারে' (Murrey) নামে পরিচিত হইলেও আসলে তাঁহার নাম ওয়ালটারস্ (Walters). —এইরূপ আরও অসংখ্য আছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে যাদুকর জীবনে ছদ্মনামের প্রয়োজন কম নয়। গোলাপকে যে কোন নাম দিলে গন্ধের তারতম্য হয় না সত্য কিন্তু যাদুকরজীবনে নামের মূল্য খুবই বেশী।

প্রকৃত নাম অপেক্ষা ছদ্মনাম অনেক সময় কার্য্যকরী হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ' হইয়াছিলেন, প্রমথনাথ 'বীরবল' এবং বলাই চাঁদ মুখার্জ্জি 'বনফুল' হইয়াছেন, সেইরূপ পরশুরাম, অপরাজিতা প্রভৃতি অনেককেই আমরা জানি। 'নাম-ঢাকা নাম' অনেক সময় আসল নাম ছাড়াইয়া উঠে। সেইজন্য বেনামের অধিকারী আসল ব্যক্তিগণ নিজেদের চারিপাশে দুর্ভেদ্য সিগফ্রীড সীমা রচনা করিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে প্রকৃত নামে চিনিবার ও জানিবার সৌভাগ্য খুব অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাদুবিদ্যাজগতে একজনকে অদ্যাবধি কেহ অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেকে L' Homme Masque (বা মুখস পরিহিত লোক) বলিয়া অভিহিত করিতেন। মুখস পরিহিত এই যাদুকর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ইওরোপে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। কিছুদিন পরে প্রকাশ পাইল তাঁহার নাম Marquis d' O কিন্তু O একজনের নাম হইতে পারে না উহাও ছদ্মনাম। এই ক্যামেরাবাহুল্য ও আলোকচিত্র বিলাসের যুগে মুখোস পরিহিত যাদুকরের একটি ছবিও বাহির হইল না ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য !

যাদুকর জীবনে ছদ্মনামের প্রয়োজন এবং মূল্য কম নহে। উহা তাঁহাদিগকে প্রচারের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। সেইজন্য যাদুকরগণ যুগে যুগে নানারূপ অদ্ভুত নাম গ্রহণ করেন এবং

নানারূপ অদ্ভুত শব্দ (মন্ত্র) উচ্চারণ করেন ও অদ্ভুত বেশ ধারণ করেন। কোন কোন যাদুকর নিজেদের খেলাগুলির অদ্ভুত নামকরণ করিয়া থাকেন—Comus নামক যাদুকর লণ্ডনে বিজ্ঞাপন দেন—

..."**Various uncommon experiments with his Enchanted Horologium, Pyxidees Literarum, and many curious operations in Rhabdology, Steganography and Phylacteria, with many wonderful performances on the grand Dodecahedron, also Chartomantic Deceptions and kharmamatic operations**"...**The old and new magic** পুস্তকে (১৯ পৃষ্ঠা) প্রকাশ যে—

"...**These magical experiments were doubtless very simple, what puzzled the Spectators must hava been the names of the tricks**"...অর্থাৎ "কমাস সাহেব বর্ণিত খেলা প্রত্যেকটিই অতিশয় সহজ ছিল। দর্শকগণ খেলার নাম পাঠ করিয়াই প্রথমে অবাক হইয়া যাইতেন।" সত্যই ইংরাজী ভাষায় যাহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারাও ঐ ইংরাজী বুঝিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। যাদুকর খেলার নামের যাদু দ্বারা লোকদিগকে স্তম্ভিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কাজেই যাদুকরগণ পূর্ব্বকালে "**Drooh myrooh, and senaroth betu barooh attimaroth, rounsee, farounsee, hey passe passe**" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতেন। "**An account of the beginnings of the art of magic**"এ প্রকাশ যে..."**In the old days it was thought good business to dress in weird clothes and mumble incomprehensible words to encourage the spectators' belief in the magician's satanic connection**......" প্রাচীনকালে যাদুকরগণ নানারূপ অদ্ভুত পোষাক পরিধান করিয়া নানারূপ অদ্ভুত অবোধ্য শব্দ (মন্ত্ররূপে) উচ্চারণ করিতেন ইহাতে দর্শকগণের ধারণা বলবতী হইত যে যাদুকর ভূত প্রেতের সহায়তায় যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কাজেই যাদুকরগণের নিজের নেওয়া নামের কোন অর্থ না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নামে অর্থও থাকিত যেমন **Houdini** অর্থ ফরাসী ভাষায় 'হুডিনের ন্যায়' (**like Houdini**) সেইরূপ চাং লিং সু অর্থ চীনা ভাষায় ভাল সৌভাগ্য (**Extra Good luck, double goodluck**) ইত্যাদি।

জনৈক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের ছদ্মনামের আলোচনা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ (প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩২ পৃঃ ২১৫-১৬) লিখিয়াছেন—

..."পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না, কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে......।" অন্যত্র লিখিয়াছেন

..."সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যদি দ্বারের কাছে দেখি একটা উইয়ের ঢিবি, আশ্চর্য্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি মস্ত একটা বটগাছ তবে সেটাকে কি ঠাউরাইব ভাবিয়া উঠা যায় না।".........সাহিত্যিকদের বেলায় সেই বটগাছের সচিত্র কুলজিকোষ্ঠী দিলে অনেক সময় হয়তো দর্শকদের আনন্দ বিধান চলিতে পারিবে কিন্তু যাদুকরের বেলায় উহা যত অপ্রকাশ থাকে ততই ভাল। ইংরাজী ভাষায় তাঁহারা **Mystery maker** নামে পরিচিত কাজেই তাঁহাদের নাম এবং পরিচয়ে **Mystery** থাকাই উচিত, অবশ্য না থাকিলেও দোষ নাই।*

* লেখক শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকার মহাশয় স্বয়ংও নিজের নাম (SORCAR) এই বানানে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সঃ ভাঃ

দান

শ্রীসলিলা মুখোপাধ্যায়

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি তার পানে। কী অপরিসীম তার দান। সারাদিন জানালার ধারে চুপচাপ বসে তার কাজ লক্ষ্য করি। পৌষের শেষে বড়দিনের বন্ধে এসেছি 'বোধনা' নামে একটা ছোট কলোনীতে। ঝাড়গ্রামের আগের ষ্টেশন। কিছুই দেখবার নেই, তবুও মামার নূতন বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি, দু চারিদিনের জন্য। চারিধারে ধূ ধূ মেঠো লালমাটীর রাস্তা, খানকতক নূতন নূতন ছোট বাড়ী, আর অগণিত শাল মহুয়ার বন। খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি কাজগুলি সারা ছাড়া—জানালা ছেড়ে কোথায় যেতাম না। সামনে ধূ ধূ করছে মাঠ, তার মধ্যে অসংখ্য শাল গাছ। পৌষমাসের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সমস্ত গাছের পাতাগুলি দুলে দুলে বিদায় নেবার আগের খেলায় মত্ত। রোজই দুপুরে দেখি কোলেদের একটী ছেলে তার কাছে এসে দাঁড়ায় কিছু পাবার প্রত্যাশায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে দুটী হাত ভর্ত্তি করে হাসতে হাসতে লাফাতে লাফাতে বনের পথে অদৃশ্য হয়ে যেত। ছেলেটীকে কিছু দান করে মনে হোত সে যেন কত খুসী হয়েছে। ছেলেটীর জন্য আগে থেকে সে কিছু সঞ্চয় করে রাখত, কারণ দূর থেকে ছেলেটীর মুখে হাসি দেখতে তার ভারি ভাল লাগত। ছেলেটী আশার অতিরিক্ত যেদিন পেত খুসীতে কালো মুখখানির মধ্য দিয়ে সাদা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ত—আর কৃতজ্ঞতায় সে তার দিকে একবার তাকিয়ে দুহাতে প্রাপ্ত জিনিসগুলি তুলে নিত বুকের কাছে। একটু করে যাচ্ছে আর ফিরে তার দিকে তাকাচ্ছে—এই ভেবে যে অনেকদিন সে তার কাছ থেকে এই অযাচিত স্নেহের দান পেল। ক্রমশঃ দানের বহর কমে আসতে লাগল। একদিন দেখি ছেলেটী ছল-ছল চোখে শূন্য হাতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আজ তার দান করবার কিছু নেই। রিক্ত সে। ছেলেটীর দিকে তাকাতে পারছিল না। নিজেকে শূন্য করে নিঃস্ব করে সর্ব্বশেষ সামর্থ্যটুকুও সে ছেলেটীকে দান করেছে। ছেলেটীর চলার পথে তাকিয়ে সে ভাবছিল আর আসবে না। আজ সব শেষ। পরদিন দেখি ছেলেটী নিত্য যে গাছতলাটিতে এসে দাঁড়াত শূন্য হাত পূর্ণ করতে সেখানে আজ দাতা গ্রহীতা কেউ নেই। তবু জনকয়েক লোক সেখানে কথাবার্ত্তা কইছে। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম, বন-বিভাগের কর্ত্তার কাঠের দরকার হওয়াতে লোকজন নিয়ে এসেছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বড় বড় কুঠার নিয়ে তারা তার উপর [illegible] চালালে। যতই আঘাত করছে [illegible] ঝরিয়ে [illegible]। আমি তবু ভাবতে লাগলাম এ তার বেদনার [illegible], না [illegible]।

শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ ও বৈকুণ্ঠের উইল

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

চন্দ্রনাথ—চন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের একখানি ছোট উপন্যাস। এই উপন্যাসখানিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথেষ্ট। তাহার ফলে উপন্যাসখানি গীতিকবিতার সুরে মর্ম্মস্পর্শী। এমন অপূর্ব্ব গীতি-মাধুর্য্য শরৎচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে আছে কিনা সন্দেহ। একটি বৃদ্ধ ও একটি শিশুকে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র এই অপূর্ব্ব গীতি-মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উপন্যাসের শেষাংশে শরৎচন্দ্র কেবল কথাসাহিত্যিক নহেন—একজন গীতিকাব্যের কবিও।

শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন—কেবল সমাজভয়ে পরিত্যক্তা পত্নীর পুনর্গ্রহণের এবং তদনুষঙ্গিক নৈতিক সাহসের কাহিনীই প্রথমশ্রেণীর একটি রচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই তিনি উপসংহারে কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাই চন্দ্রনাথ-সরযূর কথা ফুরাইয়া গেলেও কৈলাসখুড়োর কথা ফুরায় নাই, তাঁহার কথাতেই গল্পটির উপসংহার হইয়াছে। শেষ পরিচ্ছেদটি নৈবেদ্যের উপরে তুলসীপত্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

সবচেয়ে উপন্যাসের যে চরিত্রটি আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয়, প্রীতিতে পরম অন্তরঙ্গ হইয়া চিরদিন বিরাজ করে, তাহা ঐ কৈলাসখুড়োর চরিত্র। এই চরিত্রটি বঙ্গসাহিত্যের নীলাভ্রে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া শরৎচন্দ্রের লেখনীও ধন্য হইয়াছে।

মনুষ্যত্বের একটি পরিপূর্ণ আদর্শ, হৃদয়বত্তার একটি পরিপূর্ণ প্রতীক এই কৈলাস খুড়ো। এই চরিত্র সৃষ্টির জন্য শরৎচন্দ্রকে ধনিসংসার, মঠ-আশ্রম, টোল-চতুষ্পাঠী, সমাজের উচ্চস্তর ইত্যাদিতে আদর্শ খুঁজিতে হয় নাই, কুড়িটাকা-মাত্র-পেনসন ভোগী দরিদ্র, দাবাখেলায় আসক্ত, একটি অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী কাশীবাসী বৃদ্ধের মধ্যেই পাইয়াছেন। আমাদেরই চিরপরিজ্ঞাত অথচ চির-অবজ্ঞাত জনসমাজের মধ্যেই অনেক কৈলাসখুড়ো আছেন। আমাদের দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে—আমরা কেবল শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে আদর্শ মানুষ খুঁজি। সাধারণ লোকের মধ্যে ঐরূপ মানুষের—জনতার মধ্যে দেবতার—অস্তিত্ব প্রত্যাশাও করি না। তাই মুক্তকণ্ঠে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে—কৈলাস খুড়ো শরৎচন্দ্রের একটি অদ্ভুত আবিষ্কার। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই ঐরূপ মানুষের সঙ্গেই একদিন কোথাও না কোথাও দাবা খেলিয়াছেন—তাই তাঁহার কাছে কৈলাস বড়ই অন্তরঙ্গ জন। শরৎচন্দ্র সেই কৈলাস খুড়োর সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিলেন—প্রথম পরিচয় হইতেই—সে আমাদেরও অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহার বিগলিত হৃদয়ের বেদনায় আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না। এ অশ্রু কাশীর গঙ্গা-জলের চেয়ে পবিত্র। কৈলাসনাথেরই কাশীবাস সার্থক—কারণ, আত্মভোলা কৈলাসনাথের বিল্বপত্রধুতুরার আশীর্ব্বাদ তিনিই পাইয়াছিলেন।

কাব্যের দিক ছাড়া এই উপন্যাসে আর একটা দিক আছে। সরযূর প্রতি গভীর দরদের দ্বারা শরৎচন্দ্র সামাজিক অন্ধ সংস্কারের অসারতা দেখাইয়া তাহার উর্দ্ধে পরম সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সমাজকে গালাগালিও করেন নাই—তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযানও চালান নাই—লৌকিক সংস্কারের তীব্র সমালোচনাও করেন নাই, পতিতার কন্যার জন্য কোমর বাঁধিয়া ওকালতিও করেন নাই! তিনি অতি-সন্তর্পণে অত্যন্ত অনুদ্ধত ভঙ্গীতে পতিতার কন্যা সরযূকে সরযূতীরের মহাসতীর পদ্মাসনে বসাইয়া দিয়া আপনার প্রাণের নিভৃত সত্যকে রূপদান করিয়াছেন।

উদারতার যে অত্যুচ্চ স্তরে আরোহণ করিলে সরযূর মত হতভাগিনীকে প্রসন্ন চিত্তে কুললক্ষ্মীদের মণ্ডলীতে স্বীকার করা যায় সে উদারতা দয়ালঠাকুর ও মণিশঙ্করের চরিত্রে আসিয়াছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে নয়। চন্দ্রনাথের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছে কিন্তু তাহাও রূপযৌবনের আকর্ষণে ও সন্তানের দৌত্যে ও স্নেহানুরোধে। শরৎচন্দ্র নিজে ইহাদের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। সত্যোজ্জ্বল সমুদারতার উচ্চস্তরে অবস্থিত শরৎচন্দ্র তাই—এই উপন্যাসে নিজে কৈলাসনাথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৈলাসনাথের ভূমিকার মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার চিরবন্দিত সত্যকে রূপদান করিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষ মাত্র। সে যে সরযূকে পরিত্যাগ করিয়াছিল—তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। যে দেশে রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াও বন্দনীয় হইয়া আছেন—সে দেশের পাঠকের বিচারে চন্দ্রনাথ নিন্দনীয় হইবেন কেন? রামচন্দ্রও লোকভয়েই প্রাণাধিকা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—সীতা সরযূর মতই তখন সসত্ত্বা ছিলেন। সীতা বাল্মীকির তপোবনে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়েও সাম্য আছে—কৈলাস খুড়োই এ কাব্যের বাল্মীকি। কিন্তু ত্রেতাযুগের কাব্যে অন্নবস্ত্রের চিন্তার কথা বর্জ্জনীয়—বর্ত্তমান যুগের কাব্যে তাহা বাদ দেওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ সরযূকে ত্যাগ করিলেন—কিন্তু তাহার যোগক্ষেমের ব্যবস্থা হইল কিনা তাহার খোঁজও ল'ন নাই এবং 'বাল্মীকি'র আশ্রমে তাঁহার সীতা পৌঁছিল কিনা তাহারও সন্ধান লন নাই। তবে চন্দ্রনাথের পক্ষে একটা কথা বলার আছে—চন্দ্রনাথ আর সরযূর পরীক্ষার কথা তোলে নাই। না তুলিবার একটা কারণ এই চন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত বুঝিল। সরযূ নিজে ত অপরাধিনী নয়—তাহার জননী কলঙ্কিনী। তাহা ছাড়া, খুড়া মণিশঙ্কর শেষ কথা বলিয়া দিয়াছিলেন—'যাহার টাকা আছে তাহার জাত মারে কে?' যাহাই হউক, চন্দ্রনাথ চরিত্র একেবারে মেরুদণ্ডহীন নয়—তাহার চরিত্রেও কিছু উদারতা ও তেজস্বিতা ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলিতে সমাজসংসারের সহিত গাঢ় ভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এইরূপ কূটস্থ প্রকৃতির অর্দ্ধ-উদাসীন একপ্রকার যুবচরিত্রের একটা Type এর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ সেই Type এরই একজন। শরৎসাহিত্যের হিসাবে চন্দ্রনাথ Indvvidualistic নয়—Typical.

চন্দ্রনাথ শকুন্তলা নাটকের দুষ্মন্ত চরিত্রকেও মনে পড়ায়—বিশেষতঃ শিশুপুত্র বিশেশ্বরের কাজটা অনেকটা সর্ব্বদমন ভরতের মতই হইয়াছে।

লৌকিক সংস্কারের সহিত সত্য ও প্রেমের দ্বন্দ্ব সাহিত্যের চিরন্তন বিষয় বস্তু। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এই দ্বন্দ্বে প্রেমকেই—সেই সঙ্গে তদাশ্রিত সত্যকেই বিজয়ী করিয়াছেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদে মণিশঙ্করের কথাগুলো উদারপন্থী শরৎচন্দ্রের নিজেরই অন্তরের কথা—"দোষলজ্জা প্রতিসংসারে আছে। মানুষের দীর্ঘজীবনে তাকে অনেক পা চলতে হয়। দীর্ঘপথটির কোথাও কাদা, কোথাও পিছল, কোথাও বা উঁচুনীচু আছে—তাই বাবা, লোকের পদস্খলন হয়। তারা কিন্তু সে কথা বলে না, তারা পরের কথাই বলে। পরের দোষ পরের লজ্জা চীৎকার ক'রে তারা যে ঘোষণা করে, সে শুধু আপনাদের দোষটুকু গোপনে ঢেকে ফেলবার জন্য। তারা আশা করে, পরের গোলমালে নিজের লজ্জাটুকু চাপা প'ড়ে যাবে।" *

বৈকুণ্ঠের উইল—যে সকল অকপট মুগ্ধ প্রকৃতির লোকের মুখে ও বুকে অক্ষরে অক্ষরে মিল নাই তাহাদের বাক্য ও আচরণ, অনেক সময় ভ্রান্তভাবে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে জটিলতার সৃষ্টি করে। সেইরূপ জটিলতার দ্বারা আখ্যানবস্তু বয়ন করিয়া শরৎচন্দ্র কয়েকটি গল্প উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। যাহারা মুখে মধুভাষী ও সাধু, কিন্তু বুকে ইতর ও নীচ এরূপ মানুষের অভাব নাই। এইরূপ চরিত্র দত্তার রাসবিহারীর। মুখেও সৎ, বুকেও সৎ এইরূপ চরিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অনেক আছে। মুখেও অসৎ বুকেও অসৎ—এইরূপ 'অকপট' চরিত্রও অনেক আছে—দত্তার বিলাস চরিত্র এই শ্রেণীর। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে—যাহারা বুকে সৎ, কিন্তু মুখে সকল সময় তাহা প্রকাশ পায় না। বরং মুখের কথায় অনেকে তাহাদের হৃদয়েরসংবাদ ধরিতেই পারে না। এই শ্রেণীর অনেকগুলি চরিত্র শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে আছে।

এই শ্রেণীর চরিত্রের দ্বারা বিশেষতঃ তাহাদের মুখের তিক্ত-মধুর বচন বৈচিত্র্যের দ্বারা শরৎচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে নূতন ধরণের রস সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ চরিত্র কথা-সাহিত্যের পক্ষে বড়ই উপযোগী। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, হৃদয় মহৎ উদার ও মধুময়—কিন্তু কোন একটি মনোবৃত্তির অতিরিক্ত প্রাবল্যের জন্য, মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষা সংস্কৃতির অভাবে অথবা কপট নীচাশয় ব্যক্তিদের প্ররোচনায় বা প্রভাবে—চরিত্র বিশেষের হৃদয়ে সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্য্যন্ত তাহার সদ্‌বৃত্তিই জয়লাভ করিতেছে—তাহার মৌলিক মনুষ্যত্ব নষ্ট হইতেছে না, মাঝে মাঝে হৃদয়ের মাধুর্য্য মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় আচ্ছন্ন হইতেছে মাত্র। এই দ্বন্দ্বের দ্বারা চরিত্রের জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে—এবং ইহাতেই পুষ্টিলাভ করিয়া আখ্যান বস্তুও জটিল হইয়া পড়িতেছে। শরৎচন্দ্র এই দ্বন্দ্বজাত জটিলতাকে কতকগুলি রচনায় চমৎকার রসরূপ দিয়াছেন। এই দ্বন্দ্বের ফলে চরিত্রগুলি মুখে ও বুকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সাধারণতঃ অশিক্ষিত অমার্জ্জিত সরল নির্বোধ অথচ স্নেহময় উদার নিঃস্বার্থ চরিত্রের পক্ষে এই মুখ ও বুকের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক বলিয়া শরৎচন্দ্র মনে করিয়াছেন।

অবশ্য যেখানে নরনারীর প্রণয়ের কথা, সেখানে এইরূপ চরিত্রের ততটা প্রয়োজন নাই। সেখানে দ্বিধা সংশয় সংকোচ মান অভিমান এমন কি হাবভাবের বিলাস ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। যেখানে বাৎসল্য, স্নেহ ও অন্যান্য মধুর বৃত্তির কথা সেখানেই অশিক্ষিত নির্বোধ চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। দত্তার বিজয়া নরেন্দ্রের ব্যাপারটা প্রথম শ্রেণীর। রামের সুমতির নারায়ণী, বিন্দুর ছেলের বিন্দু, নিষ্কৃতির বড়বৌ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র। আর বৈকুণ্ঠের উইলের মূর্খ নির্বোধ গোকুল চরিত্র এই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বৈকুণ্ঠের উইলে গোকুল পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃগতপ্রাণ, সরল ও সাধু-চরিত্র। কিন্তু সে নির্বোধ,—এমনি নির্বোধ যে বাপ উইল করিয়া গিয়াছে—সে উইল ছিঁড়িয়া ফেলিলেই যে আপদ চুকিয়া যায় তাহাও সে বুঝে না। সে কথাও তাহার বাড়ীর দাসী হাবুর মার কাছ হইতে শুনিতে হয়। সে অশিক্ষিত, এমনি অশিক্ষিত যে 'অনার গ্র্যাজুয়েট' ভাইকে উপদেশ দেয় বাঙ্গালী হাকিমদের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলিতে এবং ভাইএর মেডাল সে সকলকে দেখাইয়া বেড়ায়। পিতৃবিয়োগ, বাপের উইল, বাড়ুয্যে মহাশয়ের উপদেশ, ভাইএর চরিত্রহীনতা এবং [illegible] দুর্নাম, স্ত্রীর প্ররোচনা, শ্বশুরের কুপরামর্শ, বিমাতা ও [illegible] মিতভাষণ—এই সমস্তের চক্রান্তে পড়িয়া সে হতবুদ্ধি। [illegible] এই হতবুদ্ধিতা তাহার [illegible] এমন কি তাহার আচরণকে [illegible] এবং এলোমেলো। [illegible]

* চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের সদুত্তর উপন্যাসে পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ শিক্ষিত ভদ্রযুবক—সরযূকে সে খুবই ভালবাসিত—তাহার আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো, সে নিতান্ত অবিবেচক বা নিতান্ত সমাজভীরু শ্রেণীর লোকও নয়। একজন অজ্ঞাতকুলশীলা বিধবা পাচিকার কন্যাকে বিবাহ করিবার সৎসাহস তাহার ছিল। তাহা ছাড়া, সে নিঃস্পৃহ উদাসী প্রকৃতির লোক। শ্রীকান্তের চরিত্রের প্রভাব শরৎচন্দ্রের একাধিক যুবক চরিত্রে আছে, চন্দ্রনাথেও কিছু আছে। এ স্ত্রী যে সসত্ত্বা চন্দ্রনাথ তাহা জানিত না—তাহা না জানা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে জানিবারই কথা। সে জানিত না—কিন্তু হরিবালা জানিত। হরিবালা তা'হা চন্দ্রনাথকে জানাইয়া দিল। চন্দ্রনাথের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু একথা জানা সত্বেও চন্দ্রনাথ দুই বৎসর ধরিয়া সরযূর কোন খোঁজ লইল না। দয়াল ঠাকুর বা তাহার জননীর কাছে সে আশ্রয় পাইল কিনা তাহারও সন্ধান পাইল না। এতদিন যে সরযূ কোন অর্থ সাহায্য পায় নাই—সে খেয়ালও তাহার নাই। মুখে সে বলিল—পাঁচশত টাকা করিয়া পাঠাইতে—কিন্তু তাহার পর দুই বৎসর ধরিয়া সে যে কোন সাহায্যই পাইল না, তাহার সন্ধান সে রাখিল না। কোথায় কাহার নামে টাকা পাঠানো হয়—কে গ্রহণ করে—কোন খোঁজই সে রাখিল না। দয়াল ঠাকুর কি চরিত্রের লোক তাহা তাহার জানিতে বাকি ছিলনা। সে আশ্রয় দিল কিনা এবং তাহার কাছে টাকা পাঠাইলে সরযূ পায় কিনা—তাহার খবরও সে লয়-নাই। এইরূপ ঔদাসীন্য চন্দ্রনাথ চরিত্রের পক্ষে সমঞ্জস ও স্বাভাবিক কিনা এ প্রশ্ন আজকালকার পাঠকের মনে জাগে। পাঁচশত টাকা মাসোহারার আদেশ চন্দ্রনাথের মুখে শোনা যায়—কিন্তু ধনিগৃহের কোন আবেষ্টনী অথবা ধনিসংসারে উপযুক্ত কোন আচরণ উপন্যাসে রূপলাভ করে নাই। রাখাল ভট্টাচার্য্যকে জেলে পাঠানোর ব্যাপারটাও খুব সতর্কতার সহিত রচিত হয় নাই।

সেদিকেও দৃষ্টি ছিল। বিনোদ অসচ্চরিত্র, সে বিষয়ের অংশ পাইলে উড়াইয়া দিবে। যত দিনে তাহার চরিত্র সংশোধন না হয় ততদিন ব্যবসায়টিকে রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবার মত বিদ্যা বুদ্ধিও তাহার ছিল না। মুখে সে যাহা বলুক বুক তাহার খাঁটিই ছিল, তাই সে শেষ পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রীর মতলব মাটি করিয়া দিল।

যাহারা তাহার বুকটিকে চিনিত না—তাহারা তাহার মুখের কথায় উৎসাহিত হইয়া তাহাকে ভুল বুঝিয়া আকাশকুসুম রচনা করিতেছিল। যাহারা তাহার বুকটিকে ভাল করিয়াই চিনিত তাহারাও অর্থাৎ তাহার সেই বিমাতা ও ভ্রাতাও তাহার মুখের কথায় ও এলোমেলো আচরণে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছিল। এই ভুলের মালাই শরৎচন্দ্রের হাতে ফুলের মালা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের গোকুল রবীন্দ্রনাথের পণরক্ষা গল্পের তাঁতী ভাই বংশীকে মনে পড়ায়।

গোকুলের বাহ্য মৌখিক অভিব্যক্তিতে শরৎচন্দ্র একটু আতিশয্যের সৃষ্টি করিয়াছেন! Emphasisএর মাত্রা একটু বেশি হইয়া গিয়াছে, কাহারও কাহারও মতে ইহাতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সংযমের অভাব হইয়াছে। গোকুল একজন পাকা ব্যবসায়ী, তাহারই বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফলে ব্যবসায়ে এমন শ্রীবৃদ্ধি। তাহার পক্ষে শিশুর মত নির্বোধ হওয়ার কথা নয়।

শরৎচন্দ্র বাচালতার দ্বারা গোকুল ও মনোরমার চরিত্র ফুটাইয়াছেন, কিন্তু মৌন ও মিতভাষণের দ্বারা ফুটাইয়াছেন ভবানী চরিত্রটিকে। এই চরিত্র সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব সংযম ও সামঞ্জস্যবোধ দেখা যায়। মিতভাষণ ও মৌনের ব্যঞ্জনায় কি অপূর্ব্ব চরিত্রসৃষ্টি হইতে পারে, ভবানীচরিত্র তাহার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

নিমাই রায় ও বাড়ুয্যের চরিত্র যথাযথই হইয়াছে। ইহারা দত্তার রাসবিহারীর অমার্জ্জিত রূপ।

সত্যচরণ শাস্ত্রী

শ্রীসুবোধকুমার রায়

মানুষ সৃষ্টি করে ইতিহাস, ইতিহাস গড়ে মানুষের মত মানুষ। অতীতের ভুল, ত্রুটি, অতীতের গৌরব, কলঙ্ক বহন করে এনে ইতিহাস মানুষের প্রাণে যে আগুন জ্বালিয়ে তোলে তারই জ্বালায়, তারই আলোকে মানুষ চলবার চেষ্টা করে সত্যকারের গৌরবের পথ চিনে। ভবিষ্যতে তার যাতে কেউ কলঙ্কের পথে পা না দেয় তারই নির্দ্দেশ করে ইতিহাস।

সত্যচরণ শাস্ত্রী ছিলেন ঐতিহাসিক। সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন ঐতিহাসিক গবেষণায়। দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করতে তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তাঁর সৃষ্ট পুস্তকাবলীই তার প্রমাণ। এক একটী জীবনকে উপলক্ষ্য করে লিখে গেছেন এক এক সময়ের সারা দেশের ইতিহাস। অতীতের বাংলা, অতীতের ভারতবর্ষ এক একটী বিশেষ সময় নিয়ে মূর্ত্ত হয়ে আছে তাঁর লেখার মধ্যে।

যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বংশ-গৌরবের দিক দিয়ে বাংলা দেশে তা চিরপ্রসিদ্ধ, তাই সত্যচরণ ছিলেন আবাল্য তাঁর বংশ গৌরবে গরীয়ান। একখানি পত্রে স্বনামধন্য সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে লিখেছেন, "সকল বড় বংশই কোন না কোন বিশেষত্ব গুণে বড় হয়ে থাকেন। দক্ষিণেশ্বরে ৺নবকুমার চট্টোপাধ্যায় ম'শার বংশেও সে বিশেষত্ব ছিল। আমি ধনৈশ্বর্য্যের কথা বলছি না, সেটা ছোট বড় অবস্থার তুলনামূলক কথা। আমার কথা প্রকৃতি আকৃতি প্রভাব প্রভৃতি নিয়ে।"

"ছেলেবেলা উক্ত বাড়ীটিকে আমরা কাবলেদের বাড়ী বলেই শুনতুম ও জানতুম। বোধ হয় তাঁরা প্রায় সকলেই ছয় ফিটের ওপর এবং প্রস্থেও তদনুরূপ ছিলেন বলে। প্রভাবে ও **lordly** কোন কিছুর ভয় ডর রাখতেন না কথায় বা কাজে। উচ্চ শিরেই চলে যেতেন। প্রতিবাদের সাহস কেউ পেতেন না বরং ভয়ই পেতেন। এই ছিল তাদের প্রভাব ও প্রকৃতির কথা। মনে যেন থাকে এর একটী কথাও আমি মন্দ অর্থে ব্যবহার করছি না, বিশেষত্বটাই বলছি। বরং আমাদের ঘরে ঘরে সেরূপ বলিষ্ঠ শরীর ও মনের সাহসী বাঙালী পাওয়া প্রার্থনীয় (**desirable**) বলেই মনে করি। আজ আমার কথাটা সেই বংশের স্বনামখ্যাত ৺সত্যচরণ শাস্ত্রী সম্বন্ধে। তিনি ছিলেন উক্তবংশের ৺ক্ষেত্রনাথচট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ৺নবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাতী শ্রেণীভুক্ত।"(১)

তাঁর বংশ পরিচয় ও জীবন কাহিনীর কথা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করবো। সেই নিরলস একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধক স্বদেশ ও সাহিত্যের কল্যাণে যে অমূল্য সম্পদ দান করে' গেছেন তা স্মরণ করলে শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁর প্রথম দান ছত্রপতি মহারাজা শিবাজীর জীবনচরিত (১৮৯৫ খৃঃ)। শ্রদ্ধাস্পদ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে লিখেছেন যে "শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে হানিবলের জীবনী লেখেন।" তিনি যে উক্ত বইখানি লেখার চেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু আমি বহু চেষ্টায়ও ঐ পুস্তকখানি সংগ্রহ করতে পারিনি—উপরন্তু এমন কতকগুলি প্রমাণ পেয়েছি যাতে মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে যে শাস্ত্রী মহাশয় হানিবলের জীবনী লেখা সম্পূর্ণ করেছিলেন কিনা এবং তা ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা। কেন না বম্বের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকা শাস্ত্রী মহাশয় ও শিবাজীর জীবনচরিত পুস্তকের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,..."**He was once writing a life of Hannibal in Bengali when a friend of his suggested him to spend his energy on writing a life of Sivaji rather than that of Hnnibal. young Chatterjee took up the idea with great zest.**" আবার বরদার 'বড়দা বৎসল' পত্রিকাও লিখছেন যে "তিনি প্রথমে হানিবলের চরিত্র লেখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোন এক বন্ধুর অনুরোধে এই লেখার চেষ্টা ত্যাগ করে' বাংলায় শিবাজীর চরিত্র লেখা আরম্ভ করেন।" এই পত্রিকা দুইখানির উক্ত উক্তিই আমার 'হানিবল' পুস্তক সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ।(২)

বাংলা সাহিত্যের আসরে ছত্রপতি শিবাজীকে বরণ করে' এনে তিনি

---

(১) শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাস্ত্রী মহাশয়ের একই গ্রামে জন্ম এবং উভয়ে সমসাময়িক। তাই তার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবার আশায় কেদারবাবুকে এই প্রবন্ধ লেখার বাসনা জানাই। তিনি আমার পত্রের উত্তরে পূর্ণিয়া থেকে যে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখে পাঠিয়েছেন তাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের আকৃতিপ্রকৃতি বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি অতি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

(২) যদি কোন সহৃদয় পাঠক দয়া করে' এই পুস্তকখানির সন্ধান দিতে পারেন তা হলে তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

যে যশ ও গৌরব অর্জ্জন করেছিলেন তা তখনকার সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকাগুলি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে ঘুরে, মহারাষ্ট্রী ভাষার রীতিমত শিক্ষা ও আলোচনা করে' সেই বীরশ্রেষ্ঠ ছত্রপতির লীলাক্ষেত্র হতে' জীবনী লেখার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যে যে অমূল্য সম্পদ সৃষ্টি করেছিলেন, বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেরই পত্রিকাগুলি তা অতি সমাদরে গ্রহণ করে' তার যশোগাথা কীর্ত্তনে মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই সকল পত্রিকা থেকে দুই একটী মন্তব্য এখানে তুলে দেওয়া আশা করি অন্যায় হবে না।

"আজ আমরা শিবাজীর একখানি প্রকৃত চিত্র দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, এরূপ নির্দ্দোষ চিত্র ইহার পূর্ব্বে আমরা আর দেখি নাই। বাবু সত্যচরণ শাস্ত্রী এই চিত্র সৃজন করিয়াছেন। সত্যচরণ বাবুকে আজ আমরা শত ধন্যবাদ দির্তেছি। এরূপ সত্যানুসন্ধিৎসা আমরা সচরাচর আজকাল বাঙ্গালীর ভিতর দেখিতে পাই না। সত্যচরণ-বাবুর শিবাজীর জীবনী দেখিয়া আমরা বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে আশাশূন্য হইতে পারি না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে বাংলার ভবিষ্যৎ আকাশ চির অন্ধকার থাকিবে না।" (মুর্শিদাবাদ হিতৈষিণী, ২২শে ফাল্গুন, ১৩০২)

পিতার অনুরোধকে আদেশরূপে শিরোধার্য্য করে নিয়ে তিনি যে কাজে হাত দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ করা যে তখনকার দিনে কত দুরূহ কাজ তা আজ অনুমান করাও শক্ত। শিবাজীর মত ভারতগৌরব বীর-পুরুষের চরিত্রকে বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম রূপ দেওয়ার-গৌরবও তাঁর। "**Indian spectator's Bengal correspondent says,…It is the first biography in any Indian…vernacular of the founder of the Maharatta Empire**" সকল পত্রিকার সমস্ত মতামত লিপিবদ্ধ করে' লাভ নেই। অনেক সমালোচক ও পত্রিকা বইখানিকে নির্দোষ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন বল্লেও একেবারেই যে ক্রটী শূন্য তা নয়। পুস্তকের ভাষা যে স্থানে স্থানে অযথা রূঢ়ভাব ধারণ করেছে একথা স্বীকার না করে' উপায় নেই। সে সময়েও এই ক্রটী কোন কোন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় নি। ১৯০৫ সাল, ১৭ই বৈশাখ এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রিকায় কোন এক সমালোচক একখানি পত্রে শিবাজী চরিতের যথাযথ সমালোচনায় এই ক্রটীর কথা উল্লেখ করেছেন। ভাষাগত ক্রটী ছাড়া ঐতিহাসিক তত্ত্বানুশীলনেও যে তাঁর কিছু কিছু প্রমাদ ঘটেছে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ তা নির্দ্দেশ করেছেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় এরূপ সামান্য সামান্য ক্রটি অবাঞ্ছনীয় হলেও অস্বাভাবিক নয়। এই সমস্ত সামান্য ক্রটি ও ভুল দিয়ে শিবাজীর জীবন চরিতের বিচার চলে না। শিবাজীর জীবন চরিত বাঙ্গালা তথা সারা ভারতবর্ষের আদরের ও গৌরবের জিনিস।

তাঁর দ্বিতীয় অবদান "বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত।" (১৮৯৬ খৃঃ) প্রথম বাংলা গদ্যে প্রতাপাদিত্যের চরিত্র লিপিবদ্ধ করার গৌরব রামরাম বসুর। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক আগে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত পুস্তকখানি রচনা করে গেছেন। সত্যচরণ-বাবুর "তথ্যান্বেষী মন শুধু পুস্তক পাঠে তৃপ্ত না হয়ে যশোহর, সুন্দরবন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করে' গভীর গবেষণা ও নূতন নূতন তথ্য অনুশীলন দ্বারা যে ভাবে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চরিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

"মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে ইংরাজিশিক্ষিতগণের নিকট পরিচিত করিয়া তিনি আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। যেদিন হইতে বাঙ্গালী বালক ভীরু ও কাপুরুষ সেইদিন হইতে সকলে অহঙ্কার করিয়া থাকে যে কাপুরুষ হইলেও আমরা তীব্র বুদ্ধিজীবী। প্রতাপাদিত্য পাঠ করিয়া এ ভ্রম ঘুচিবে। প্রতাপাদিত্য পাঠ করিতে যে অপূর্ব্ব আনন্দ হয় তাহা লিখিয়া বোঝানো যায় না।— [illegible] উঠে। আবেগে উত্তেজনায় আত্মহারা হইতে হয়। ইংরাজ-বুট-প্রহার-সহিষ্ণু,…সদা ম্রিয়মাণ, সেলাম তৎপর বাকপটু বাঙ্গালী কখন যুদ্ধ করিতে পারিত, মোগল সৈন্যকে সম্মুখ সমরে হঠাইত, মহাবীর মানসিংহকে বিহ্বল এবং ত্রস্ত করিত ইহা যেন স্বপ্নের কথা, গল্পের কথা, বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না, ধারণা করিতে মাথা ঘুরিয়া যায়। যাহা ছিল তাহা গিয়াছে, যাহা পাইয়াছিলাম তাহা অবহেলায় হারাইয়াছি। আবার আসিবে কি? আবার পাইব কি? এমনি স্মৃতির ভস্মস্তূপ আলোড়িত করিয়া, এমনি অতীতের মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া সুবর্ণকণা ও অমৃতের ভাণ্ড পাওয়া যায় না কি? কি বলিব, কোন ভাষায় এমন পুস্তকের সুখ্যাতি করিব জানি না।…" (বঙ্গবাসী)

এই উচ্ছসিত প্রশংসার পর প্রতাপাদিত্যের চরিত্র সম্বন্ধে আর কোনরূপ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ প্রতাপাদিত্যের চরিত্র চিত্রণে যে অনেকাংশে তাঁর কাছে ঋণী সে কথা স্বীকার করে মান্যবর সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যশোহর খুলনার ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে "আধুনিক সময়ে তিনি (সত্যচরণ শাস্ত্রী) সর্ব্বপ্রথম প্রতাপাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলন করেন; তাই তাঁর ভ্রান্ত অভ্রান্ত বহু মত এখানে বঙ্গেতিহাসের পৃষ্ঠা পূরণ করিয়াছে।" বাঙ্গালা দেশ "ছত্রপতি শিবাজী"র মতই প্রতাপাদিত্যকে গ্রহণ করেছিল অতি আদরের সঙ্গে।

তাঁর তৃতীয় পুস্তক 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। নন্দকুমার সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিকের নানা মত। একদিকে মেকলে, ম্যালেসন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ নন্দকুমারের চরিত্রে নানারূপ দোষারোপ করে' নন্দকুমারের ফাঁসী যে ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল তা প্রমাণ করবার চেষ্টা কিছু কম করেন নি, অন্যদিকে ওয়াল্‌স্, বেভারেজ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মহারাজার গুণগানও করেছেন যথেষ্ট। হেষ্টিংস্ যে ইম্পের সাহায্যে নন্দকুমারকে অন্যায়ভাবে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যেই ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে ছিলেন সে কথা তাঁরা স্পষ্টভাবে প্রমাণ ও প্রচার ক'রতে দ্বিধা করেন নি। কাজেই নন্দকুমারের জীবনচরিত লেখায় পদে পদে যে কত বাধা তা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সত্যচরণবাবু সেই সকল বাধা অতিক্রম করে বার্ক, ম্রেকলে, মিল, বেভারিজ, ওয়াল্‌স্, ষ্টিফেন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদি এবং নন্দকুমার সম্বন্ধীয় নানারূপ নথিপত্র পর্য্যালোচনা করে সুনিপুণ ভাবে মহারাজের জীবনচরিতের যথাযথ রূপ দিয়ে আপনার কৃতিত্ব, বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই পুস্তকখানি প্রকাশ হবার পর বাঙ্গালী সুধী সমাজেও এ বিষয়ে আন্দোলন সুরু হয়েছিল। ১৩১০ সাল, শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় 'নবকৃষ্ণের জীবন চরিত ও নন্দকুমার' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন,…"……শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ শাস্ত্রী স্বপ্রণীত নন্দকুমার চরিত নামক গ্রন্থে মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করায় অনেকের সে বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইহার ফলে দেখিতেছি যে শ্রদ্ধাস্পদ ইণ্ডিয়ান নেশন সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন্, এল, ঘোষ সাহেব মহোদয় স্বরচিত 'নবকৃষ্ণের জীবন' চরিত নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে গুরুতর আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন।" ইত্যাদি। নিখিলবাবু স্বেচ্ছায় এই আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে ঘোষ সাহেবের নানারূপ বিরুদ্ধ মত ও যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। (১) শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর ১৩০৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বঙ্গীয় সমাজ' নামক গ্রন্থে নন্দকুমারের ফাঁসী সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে সত্যচরণবাবু প্রভৃতির মতই সমর্থিত হয়েছে।

(১) সাহিত্য—শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ১৩১০ [illegible]

মহারাজ নন্দকুমারের পর তাঁর দুখানি পুস্তক 'ক্লাইব চরিত' বা 'জালিয়াৎ ক্লাইব' (১৩১৪ সাল) ও ১৩১৬ সালে 'ভারতে অলিকসন্দর' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক দুখানি রচনায় ও তাঁর ইতিহাসে গভীর জ্ঞান, রচনানৈপুণ্য ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভকে একটী ভারতীয় ভাষায় জালিয়াৎ নামে অভিহিত করে' প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা জালিয়াৎ সাব্যস্ত করা ইংরাজশাসিত ভারতীয়ের পক্ষে যে কতখানি দুঃসাহস তা ভারতবাসীমাত্রেই অনুমান করতে পারেন। সাহসী লেখক পুস্তকের প্রস্তাবনায় লিখেছেন,…"জাল না করিলে বোধ হয় সিরাজের পতন হইত না,…পলাশীর যুদ্ধ হইত না,… ইংরাজের ভাগ্যোদয় হইত না।"

এই বইখানির রচনাভঙ্গী আগের বইগুলি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে। অন্যান্য বইগুলি অপেক্ষা জালিয়াৎ ক্লাইবে ভাবাতিশয্যের (**sentiment**) স্থান অতি অল্প, ভাষা ও পূর্ব্বাপেক্ষা মাজ্জিত ও বহুল পরিমাণে আধুনিক।

'ভারতে অলিকসন্দর' পুস্তকে আলেকজাণ্ডারের বাল্যজীবন থেকে আরম্ভ করে' ভারত আক্রমণ ও পরে ভারত পরিত্যাগ অবধি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে আলোচনা ক'রে তাঁর ঐতিহাসিক খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পুস্তকখানি রচনা ক'রতে তাঁকে বহুশ্রম ক'রতে হ'য়েছিল। আলেকজাণ্ডার ও সেই প্রাচীন কালের ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানারূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন ছাড়াও তাঁকে রচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য গান্ধার তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ ক'রতে হয়েছিল। এই পুস্তকখানিতে সে সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক রীতিনীতি ও বহু কৌতূহলপূর্ণ কাহিনীর সন্নিবেশ থাকায় পুস্তকখানি হয়ে উঠেছে যেমন গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ, তেমনি সুখপাঠ্য।

সত্যচরণবাবুর পুস্তকাবলী পাঠে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ। তাঁর পুস্তকাদি পাঠ ক'রলে নিরপেক্ষ পাঠকের মন একদিকে যেমন স্বতঃই জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয় অন্যদিকে তেমনি অতিরিক্ত হিন্দু-প্রীতি ও স্থানে স্থানে অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিরূপতায় ব্যথিত হয়ে ওঠে। নিরপেক্ষ সমালোচকের গৌরব অর্জ্জন ক'রতে হ'লে ঐতিহাসিককে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হয় শাস্ত্রী মহাশয়ের সৃষ্টির মধ্যে সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব। মনে হয় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ই এই অভাবের কারণ।

শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন ধার্ম্মিক, তেজস্বী ও মুক্তিকামী পুরুষ। কিশোর বয়স থেকে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সংস্পর্শে এসে তাঁর মনের গড়ন হয়েছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণের মত অধ্যয়নশীল, কর্ম্মঠ ও নির্ভীক। স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ কামনায় সারাজীবন অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে নিরলস কর্ম্ম প্রচেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। একধারে যেমন ইতিহাস ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যধারে তেমনি ভ্রমণবীর। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য ও নানা দেশ ভ্রমণের ইচ্ছায় হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, বম্বাই, সীমান্ত প্রদেশ থেকে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁর সেই কর্ম্মবহুল জীবনের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়…তাই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আমি তাঁর জীবনী আলোচনা করবো।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার,…চৈত্র সংক্রান্তির দিন তিনি দক্ষিণেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন চিকিৎসা ব্যবসায়ী,…কিন্তু প্রথমে তিনি চাকুরী করতেন গভর্ণমেন্টের দপ্তরে। অফিসে সাহেবের সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হওয়াতে সেই চাকুরি ত্যাগ করে' চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের বাসনায় এবং যশোহর জেলার অন্তর্গত চন্দনপুরের জমিদারের অনুরোধে প্রথম তিনি চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন সেই চন্দনপুর গ্রামে গিয়ে।

পিতামহ ৺নবকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একধারে যেমন নির্ভিক ও কর্ম্মঠ, অন্যধারে তেমনি রসিক ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। সত্যচরণবাবু বাল্যকালে পিতামোহের কাছে তাঁর স্বরচিত কবিতাদি ও নন্দকুমারের ফাঁসী প্রভৃতি যে সকল ঘটনা তাঁর জীবিতাবস্থায় ঘটেছিল সেই সকল পুরাতন কাহিনী শুনতেন। তিনি ১২০ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে পরলোকগমন করেন।

তিন বছর বয়সে সত্যচরণ একদিন পুকুরে আঁচাতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলেন জলে। তাঁর মা তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় তুলে এনে অতি কষ্টে সে যাত্রা জীবনরক্ষা করেছিলেন। যদি আর কিছুক্ষণ জলে থাকতে হোতো তাহলে বোধ হয় সেই ৩ বছর বয়সেই তাঁকে ফেলতে হোতো জীবনের শেষ নিশ্বাস।

তাঁর হাতেখড়ি হয় পাঁচ বছর বয়সে এবং সাত আট বছর বয়সে পিতার সঙ্গে চলে যান চন্দনপুর। সেখানে ৬।৭ মাস বাস করে' পূজার সময় আবার ফিরে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁদের বাড়ীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হোতো। এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় বাহুল্য হ'বে না যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দুর্গোৎসবের কয়দিন তাঁদের বাড়ীতে এসে প্রতিমার সামনে বসে মায়ের নাম শোনাতেন সকলকে; সত্যচরণবাবুও বাল্যকালে রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠনিঃসৃত সেই গান শুনেছেন। চন্দনপুর থেকে ফিরে ভর্ত্তি হন স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল প্রবল; রামায়ণ, মহাভারত পড়ার ঝোঁক ছিল অসাধারণ।

তাঁর এক খুড়া নেপালে কর্ণেল হেমন্ত বাহাদুর নামে একজন সর্দ্দারের ছেলেদের ইংরাজী পড়াতেন। তিনি ১০।১১ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে যাত্রা করেন নেপালে। নেপাল যাবার পথে হিমালয় দেখে সত্যচরণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন; সেই শিশুমনে হিমালয় কতখানি ছাপ ফেলেছিল, কতখানি আনন্দ বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছিল তা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি…"যাইতে যাইতে অদূরে পৃথিবীর মানদণ্ড হিমালয় দেখিতে পাইলাম। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্বেত উষ্ণীষ পরিশোভিত যেন বিরাটকায় নীল পুরুষ সৃষ্টির আদিকাল হইতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যতই উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম হিমালয় ততই স্পষ্টতর হইয়া আমার বিস্ময়কে অধিকতর বর্দ্ধিত করিতে লাগিল।" তিনি এগার মাস ছিলেন নেপালে। এখানে লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেল হেমন্ত বাহাদুরের কাছে শিক্ষা ক'রেছিলেন কিছু কিছু যুদ্ধ-বিদ্যা। এই সর্দ্দার তাঁর আত্মীয় স্বজন ও অনুচরবর্গের ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটী ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী গড়েছিলেন যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার জন্য…। সত্যচরণকেও যোগ দিতে হয়েছিল সেই সৈন্যবাহিনীতে। এই স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালে অবস্থান ও কর্ণেল হেমন্ত বাহাদুরের সংস্পর্শে এসেই তাঁর অন্তরে প্রথম জাগরিত হয় স্বদেশানুরাগ ও স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন।

নেপাল থেকে ফিরে তিনি যান বাঁকিপুর, তখন তাঁর মাতা ছিলেন সেখানে। এতদিন পরে ফিরে এলেন মায়ের কাছে, কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হলেন মাতৃহারা। বাঁকিপুর অবস্থান কালে তাঁর মা মারা যান ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তাঁর অসীম। মায়ের মৃত্যুর পরদিনই ফিরে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। (আগামী বারে সমাপ্য)

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(৬)

প্রথম অধিকরণ

প্রথম প্রকরণ—বিদ্যাসমুদ্দেশ

তৃতীয় অধ্যায়—ত্রয়ী-স্থাপনা

মূল :—সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ—এই তিনটি (বেদ) ত্রয়ী,—অথর্ব্ববেদ ও ইতিহাস-বেদ—বেদ-সমূহ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দোবিচিতি ও জ্যোতিষ—অঙ্গ-সমূহ।

সঙ্কেত :—সাম—গীতি-রূপ মন্ত্র। ঋক্—ছন্দোবদ্ধ পাদবদ্ধ মন্ত্র—যজুঃ—গীতি ও পদ্য ব্যতীত গদ্যাত্মক মন্ত্র। সামমন্ত্রের সমষ্টি সামবেদ বা সাম-সংহিতা বা সামবেদ-সংহিতা। ঋঙ্‌মন্ত্রের সমষ্টি—ঋগ্‌বেদ বা ঋক্-সংহিতা বা ঋগ্‌বেদ-সংহিতা। যজুর্মন্ত্রের সমষ্টি যজুর্ব্বেদ বা যজুঃ-সংহিতা বা যজুর্ব্বেদ-সংহিতা। মন্ত্র এই তিন শ্রেণীর। বেদ তিন শ্রেণীর মন্ত্রে রচিত বলিয়াই 'ত্রয়ী' নামে অভিহিত হয়—ইহাই মহর্ষি জৈমিনির অভিপ্রায়। তাঁহার মতে—অথর্ব্ববেদের মন্ত্রাবলীও এই তিন শ্রেণীরই অন্তর্গত—নূতন কোন চতুর্থ-শ্রেণী-ভুক্ত নহে। অতএব, অথর্ব্ববেদ-সংহিতা সংহিতা-হিসাবে চতুর্থ সংহিতা হইলেও—মন্ত্রের দিক্ দিয়া (নূতন কোন চতুর্থ শ্রেণীর মন্ত্রে রচিত নহে বলিয়া) 'ত্রয়ী'রই অন্তর্গত। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—কৌটিল্য জৈমিনির এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন নাই। জৈমিনির মতে—ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রে রচিত চারিখানি সংহিতাই (ঋক্-সংহিতা, সাম-সংহিতা, যজুঃ-সংহিতা ও অথর্ব্ব-সংহিতা) 'ত্রয়ী'-পদ-বাচ্য। পক্ষান্তরে, কৌটিল্য তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহার মতে—ত্রিবিধ-মন্ত্রাত্মক সংহিতা-চতুষ্টয় 'ত্রয়ী' নহে—কিন্তু ঐ তিন প্রকার মন্ত্রের এক এক শ্রেণীভুক্ত মন্ত্রে যথাক্রমে রচিত তিনখানি মাত্র সংহিতাই (সামমন্ত্রে রচিত সাম-সংহিতা, ঋঙ্‌-মন্ত্রে গঠিত ঋক্-সংহিতা ও যজু-র্মন্ত্রে বিরচিত যজুঃ-সংহিতা) 'ত্রয়ী'-শব্দের বাচ্য ; অথর্ব্ব-সংহিতা—ত্রয়ীর অন্তর্গত নহে—তবে 'বেদের'র অন্তর্গত। 'বেদ'-শব্দে বুঝাইতেছে—ত্রয়ী (অর্থাৎ—সাম-সংহিতা, ঋক্-সংহিতা ও যজুঃ-সংহিতা) ও অথর্ব্ববেদ-সংহিতা, আর ইতিহাস-বেদ। পাঞ্জাব সংস্কৃত সিরিজের অর্থশাস্ত্রের সংস্করণে বলা হইয়াছে—**"The three Vedas are called the triple science (trayi), and are superior in sanctity to the Atharvaveda and to the Itihasaveda, i. e., the epics or epic lore in general, which is elsewhere called a fifth Veda."** শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদও প্রায় অনুরূপ—**"The three Vedas...constitute the triple Vedas. These together with...are known as the Vedas."** সামবেদের নাম সর্ব্বাগ্রে থাকায় শ্যামশাস্ত্রী এই ক্রমটিকে প্রণিধান-যোগ্য বলিয়াছেন। ইতিহাস-বেদ—মহাভারতাদি (গঃ শাঃ) ; ইতিহাসের বিবরণ পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা—বর্ণোচ্চারণের উপদেশক শাস্ত্র—পাণিনীয়-শিক্ষাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ; **phonetics (SH)**। কল্প—যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের উপদেশক শাস্ত্র—আশ্বলায়নাদি-রচিত সূত্র-গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য ; **ceremonial injunctions (SH)** ;—**injunctions** বলা উচিত হয় নাই ; কারণ, **injunction** বলিতে বুঝায় বিধি-শাস্ত্র—উহা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড—ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, কল্প—বিধির বিনিয়োগ কিরূপে করিতে হয়, তাহার বিবরণ-মূলক পৌরুষেয় আর্ষ গ্রন্থ। ব্যাকরণ—অব্যাকৃত (অব্যক্ত) শব্দের ব্যাকরণ (ব্যক্তীকরণ) যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে—পাণিনি-রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রভৃতি গ্রন্থ ; **grammar (SH)** ; শব্দানুশাসন (গঃ শাঃ) ; নাম-ধাতু-পারায়ণ (রাজশেখর)। নিরুক্ত—বৈদিক শব্দাবলীর নির্ব্বচন বা ব্যুৎপত্তি-প্রতিপাদক গ্রন্থ—যথা যাস্ক-প্রণীত নিরুক্ত ইত্যাদি ; নির্ব্বাচন-শাস্ত্র (গঃ শাঃ) ; **glossarial explanation of obscure Vedic terms (SH) ; etymology of typical Vedic expressions**—বলাই ভাল। ছন্দোবিচিতি—ছন্দের 'চয়নিকা'—ছন্দঃ-শাস্ত্র—পিঙ্গলাদি-প্রণীত। লৌকিকযুগে মহাকবি দণ্ডী 'ছন্দোবিচিতি' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন—কিন্তু বস্তুতঃ তদ্রচিত ঐরূপ গ্রন্থ অধুনা দৃষ্টিগোচর হয় না। 'কাব্যাদর্শে' উল্লিখিত 'ছন্দোবিচিতি' শব্দটি সাধারণভাবে ছন্দো-গ্রন্থের বাচকও হইতে পারে। জ্যোতিষ—জ্যোতিষ্কগণের গতি-প্রতিপাদক গণিতাঙ্গ শাস্ত্র-বিশেষ ; সূর্য্যাদি-গতি-প্রতিপাদক শাস্ত্র (গঃ শাঃ) ; **Astronomy (SH)**। ইহা গণিত-জ্যোতিষ-মাত্র। ফলিত-জ্যোতিষ—পরবর্ত্তীকালে ব্যবহারের বিষয় হইয়াছিল। অঙ্গ-সমূহ—ছয়টি 'অঙ্গ'—ইহাদিগেরই নাম 'ষড় বেদাঙ্গ'।

মূল :—এই ত্রয়ীধর্ম্ম চারি বর্ণ ও আশ্রম-সমূহের স্বধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু উপকারক।

সঙ্কেত :—ত্রয়ীধর্ম্ম—ত্রয়ী-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম্ম (গঃ শাঃ) ; দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে—ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্রয়ী-কর্ত্তৃক নিরূপিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। শ্যামশাস্ত্রী 'ধর্ম্ম'—অংশটুকুর অনুবাদ করেন নাই। চতুর্ণাং বর্ণানামাশ্রমাণাং চ—'চতুর্ণাং' বিশেষণ—'বর্ণানাম্' ও 'আশ্রমাণাম্'—দুইটি পদেরই। চারি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—**four castes (SH)**। চারি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাস—**four orders of religious life (SH)**। স্বধর্ম্ম-স্থাপনাৎ—স্ব-স্ব-ধর্ম্মে স্থাপন-হেতু—প্রত্যেক বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক প্রত্যেক বর্ণ ও আশ্রমকে স্ব-স্ব-ধর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করা হেতু (গঃ শাঃ) ; **as the triple Vedas definitely determine the respective duties (SH) ; on account of enjoining in their respective duties** বলা চলিত। উপকারিক :—উপকারক—উপকার-ফল-প্রদ ; **useful (SH)**।

মূল :—ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ।

সঙ্কেত :—বর্ণ-ধর্ম্মরূপ স্বধর্ম্ম বিবৃত হইতেছে। অধ্যয়ন—বেদাদি শাস্ত্রের স্বয়ং পাঠ—**study (SH)** ; অধ্যাপন—অপরকে শাস্ত্র পড়ান—**teaching (SH)**। যজন—নিজে যাগ করা ; **performance of sacrifices (SH)**। অপরের যাগে পৌরোহিত্য করা ; **officiating in others' sacrificial performance (SH)**। দান—অপরের দুঃখনাশের ইচ্ছায় তাহাকে অর্থাদি দেওয়া ; **giving (SH)**। প্রতিগ্রহ—অপরের প্রদত্ত দান গ্রহণ ; **receiving of gifts (SH)**।

মূল :—ক্ষত্রিয়ের (স্বধর্ম্ম)—অধ্যয়ন, যজন, দান, শস্ত্র-আজীব জীবিকা-নির্ব্বাহ ও প্রাণিরক্ষা।

সঙ্কেত :—অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ—এই তিনটি বাদ দিয়া অবশিষ্ট তিনটি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও সাধারণ ধর্ম্ম। অধ্যয়ন (মূল)

—শস্ত্র-দ্বারা আজীব অর্থাৎ বৃত্তি বা জীবিকা (গঃ শাঃ); **military occupation** ভূতরক্ষণ (মূল)—ভূত—যাহার সত্তা আছে—এস্থলে 'ভূত' অর্থে প্রাণী; প্রজাবৃন্দ, গবাদি পশু এ সকলই 'ভূত' মধ্যে গণ্য। **Protection of life**(SH) ;—ইহা মূলানুগ নহে—**protection of subjects and domestic animals** (**creatures**)—ইহা বলাই ভাল ছিল।

মূল :—বৈশ্যের (স্বধর্ম)—অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি, পশুপালন ও বণিগ্‌বৃত্তি।

সঙ্কেত :—অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ—এই তিনটি বাদ দিয়া অবশিষ্ট তিনটি অধ্যয়ন, যজন ও দান—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য—ত্রৈবর্ণিকেরই সাধারণ ধর্ম্ম। কৃষি—চাষ; **agriculture** (SH)। পাশুপাল্য—পশু পালন; **cattle-breeding** (SH)। বণিজ্যা—পাঠান্তর বাণিজ্যা বাণিজ্য; **trade** (SH)।

মূল :···শূদ্রের (স্বধর্ম্ম)—দ্বিজাতি-পরিচর্য্যা, বার্ত্তা, কারু-কর্ম্ম ও কুশীলব-কর্ম্ম।

সঙ্কেত :—দ্বিজাতি-শুশ্রূষা—দ্বিজাতি—যাঁহাদিগের মাতৃগর্ভ হইতে একবার দেহ-জন্ম ও বেদাধ্যয়ন (উপনয়ন)-দ্বারা আর একবার বেদ-জন্ম—এই দুইবার জন্ম হয়—ত্রৈবর্ণিক—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। শুশ্রূষা—সেবা, পরিচর্য্যা, **serving of the twice-born** (SH)। বার্ত্তা—কৃষি-পাশুপাল্য-বণিজ্যা। কারু-কুশীলব-কর্ম্ম—শিল্পি-কর্ম্ম ও চারণ-কর্ম্ম (গঃ শাঃ); কারু—স্থূল-শিল্প-বিৎ; কুশীলব—নটনর্ত্তক; **profession of artisan and court-bards** (SH); **actors and dancers** বলা উচিত ছিল। গণপতি শাস্ত্রী ও শ্যামশাস্ত্রী উভয়েই 'কুশীলব' বলিতে 'চারণ' বুঝিলেন কোন্ প্রমাণে? কুশীলব—নট-নর্ত্তক ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত চতুর্ব্বর্ণের স্বধর্ম্ম কথিত হইল।

মূল :—গৃহস্থের (স্বধর্ম্ম)—স্বকর্ম্ম-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, তুল্য (কুল-শীল) (অথচ) অসমান-ঋষি-(প্রসূত)-গণের সহিত বিবাহ, ঋতুগামিত্ব, দেব-পিতৃ-অতিথি- ভৃত্যদিগের (উদ্দেশ্যে) ত্যাগ ও শেষ-ভোজন।

সঙ্কেত :—অতঃপর আশ্রম-ধর্ম্ম বিবৃত হইতেছে। স্বকর্ম্মাজীব (মূল)—স্বকর্ম্ম—নিজ বর্ণধর্ম্ম; তদ্দ্বারা আজীব অর্থাৎ বৃত্তি বা জীবিকা। গৃহস্থ যে বর্ণের অন্তর্গত হইবেন, সেই বর্ণের যে যে বর্ণ-ধর্ম্ম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে সেই সেই নিজ বর্ণধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। গৃহস্থ যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে বর্ণধর্ম্ম হিসাবে—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ—তাঁহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহারই নাম তাঁহার 'স্বকর্ম্মাজীব'। **Earning livelihood by his own profession** (SH); **by his own caste-duties**—বলিলে ভাল হইত। তুল্য—বর্ণে-কুলে-শীলে ও অন্যান্য গুণাবলীতে, অর্থসম্পদ্ ইত্যাদিতে সমান। অসমানর্ষিভিঃ—'ঋষি' বলিতে এস্থলে—গোত্র-প্রবর-প্রবর্ত্তক ঋষি বুঝাইতেছে। অতএব, কুটুম্ব করিতে হইবে—যিনি কুলে-শীলে-সম্পদে সমান—সমান বর্ণ (সবর্ণ)—অথচ সগোত্র বা সমান-প্রবর নহেন। বৈবাহ্য (মূল)—বিবাহ; বৈবাহিক-সম্বন্ধ-স্থাপন। **Marriage among his equals of different ancestral Rishis** (SH)। কৌটিল্য সগোত্রা-বিবাহের বিরোধী—ইহাই ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়। ঋতুগামিত্ব—ধর্ম্মপত্নীর ঋতুস্নানের পর তাঁহার সহিত মিলন। যোড়শ রাত্রি ঋতু-কাল। উহার মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি পরিত্যাজ্য। অবশিষ্ট নিশায় ধর্ম্মপত্নীর সহিত মিলিত হওয়া গৃহস্থের আশ্রম-ধর্ম্ম। **Intercourse with his wedded wife after her monthly ablution** (SH)। ত্যাগ—দেবপূজা, যাগাদি, পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, অতিথিসেবা; ভৃত্য-পালন; **gifts** (SH)। শেষ-ভোজন—দেবাদির উদ্দেশ্যে ত্যাগের অনন্তর অবশিষ্টাংশ গৃহস্থ স্বয়ং ভোগ করিবেন।

মূল : ব্রহ্মচারীর (স্বধর্ম্ম)—স্বাধ্যায়, অগ্নিকার্য্য, অভিষেক, ভিক্ষাবৃত্তি, ব্রতিত্ব, আচার্য্যের (নিকট) আমরণ অবস্থিতি—তাঁহার অভাবে গুরু-পুত্রের (নিকট) অথবা সহাধ্যায়ীর (নিকট) (আমরণ ব্রহ্মচারিরূপে) অবস্থান।

সঙ্কেত :—ব্রহ্মচারি :—'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ। বেদ-বিদ্যা-গ্রহণার্থ—উপনয়নান্তর দণ্ড-অজিন ইত্যাদি ধারণপূর্ব্বক ব্রতাচরণ যিনি করেন—তিনিই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্ম (বেদ)-গ্রহণার্থ ব্রত—ব্রহ্ম; উহার চরণ (আচরণ) যিনি করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী। স্বাধ্যায়—স্ব-শাখোক্ত বেদ-মন্ত্র পাঠ, বেদাধ্যয়ন; **learning of the Vedas** (SH); **study of the particular branch of the Vedas to which he belongs**—ইহাই বলা উচিত। অগ্নিকার্য্য—অগ্নি-শুশ্রূষা; গুরুর অগ্নিতে ত্রিষবন আহুতি-দান। অগ্নি-পরিচর্য্যা—যাহাতে গুরুর অগ্নি ঠিকমত প্রজ্বলিত থাকে—নিভিয়া না যায়—এইরূপভাবে অগ্নির সেবা; **fire-worship** (SH)। অভিষেক—ত্রিষবণ স্নান-প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ং-কালে—তিনবার অগ্নিতে আহুতি দিবার পূর্ব্বে স্নান ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য। ভৈক্ষব্রতত্বম্ (মূল)—ভৈক্ষ—ভিক্ষাবৃত্তি; ব্রতত্ব—ব্রতিত্ব—গোদানান্ত কর্ম্ম (গঃ শাঃ); গোদানের পর ব্রতি-জীবন সমাপ্ত হয়; গোদান—'গো' অর্থে কেশ;—গোদান—কেশমুণ্ডন। শ্যামশাস্ত্রী 'ভৈক্ষ' ও 'ব্রতত্ব'—দুইটি পৃথক্ পদের সমষ্টিরূপে ইহাকে ধরেন নাই—**living by begging** (SH); কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার অনুবাদ মূলানুগ নহে; **beggging and observance of vows** (**till tonsure**). অথবা **the vow of begging**—ইহার অন্যতর ভাব প্রকাশ করা উচিত। ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—(১) উপকুর্ব্বাণ ও (২) নৈষ্ঠিক। যাঁহারা উপকুর্ব্বাণ, তাঁহারা গোদানানন্তর সমাবর্ত্তন-স্নান সারিয়া স্নাতক ও পরে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তনই করিতেন না—আজীবন গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর ও গুরুর অগ্নির পরিচর্য্যা করিতেন—ইহাই অতঃপর উক্ত হইয়াছে। আচার্য্যে প্রাণান্তিকী বৃত্তিঃ (মূল)—গুরুসমীপে আমরণ অবস্থান; আচার্য্যে— আচার্য্য-সমীপে আচার্য্য-সেবা-পূর্ব্বক, আচার্য্যের অগ্নি-পরিচর্য্যা-পূর্ব্বক; প্রাণান্তিকী—মরণ-পর্য্যন্ত বৃত্তি—স্থিতি—গুরুকুলে আমরণ অবস্থানপূর্ব্বক গুরুসেবা ও গুরুর অগ্নির পরিচর্য্যা; **devotion to his teacher at ihe cost of his own life"** (SH); **at the cost of his own life**—প্রাণ-দিয়াও; জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত, আমরণ—ঐরূপ অর্থ উহা হইতে পাওয়া যায় না।—তদভাবে—গুরুর অভাবে—গুরুর অবর্ত্তমানে—গুরুপুত্র-সমীপে ঐরূপে অবস্থান। সব্রহ্মচারিণি—যিনি একগুরুর নিকট বেদ-গ্রহণার্থ ব্রহ্মচর্য্য স্বীকার করেন—সহবেদাধ্যায়ী সহাধ্যায়ী; অবশ্য ইনি বয়োবৃদ্ধ হইবেন—নতুবা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাঁহার সেবা বয়োজ্যেষ্ঠ করিতে পারেন না। তাই গণপতি শাস্ত্রী বিশেষণ দিয়াছেন—"সমানশাখা-ধ্যায়িনি বা বৃদ্ধে"। শ্যামশাস্ত্রীও ঐ মতের পোষক—**to an older classmate.**

মূল :—বানপ্রস্থের (স্বধর্ম্ম)—ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিতে শয়ন, জটা ও অজিন ধারণ, অগ্নিহোত্র, অভিষেক, দেব-পিতৃ-অতিথি-পূজা ও বন্য আহার।

সঙ্কেত :—ব্রহ্মচর্য্য-সমাপনানন্তর উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হন; গৃহস্থ অবস্থায় অপত্যের অপত্য উৎপন্ন হইলে পঞ্চাশোর্দ্ধে বনবাসী হওয়ার নিয়ম। সস্ত্রীক বনবাসী হওয়া চলে, কিন্তু বনবাসে ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম একান্ত বিধেয়। বনে প্রকর্ষেণ তিষ্ঠতি ইতি বনপ্রস্থঃ, স্বার্থে অণ্, বানপ্রস্থঃ (গঃ শাঃ)। ব্রহ্মচর্য্য—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—ঊর্দ্ধরেতস্ত্ব (গঃ শাঃ)

chastity (SH); celibacy বলিলে ভাল হইত। ভূমৌ শয্যা (মূল)—স্থণ্ডিলে শয়ন; sleeping on the bare ground (SH)। অজিন—মৃগচর্ম্ম। অগ্নিহোত্র—সায়ম্প্রাতর্হোম। অভিষেক—ত্রিকাল-স্নান। বন্য আহার কন্দ-ফল-মূলাদি (গঃ শাঃ); living upon food-stuffs procurable in forests (SH)।

মূল :—পরিব্রাজকের (স্বধর্ম্ম)—সংযতেন্দ্রিয়ত্ব, অনারম্ভ, নিষ্কিঞ্চনত্ব, সঙ্গত্যাগ, বহুস্থানে ভিক্ষাচরণ, অরণ্যবাস, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ।

সঙ্কেত :—পরিব্রাজক—সব পরিত্যাগ করিয়া ব্রজন (গমন) করেন যিনি—সন্ন্যাসী; an ascetic retired from the world (SH)। সংযতেন্দ্রিয়ত্ব—জিতেন্দ্রিয়তা; complete control of the organs of senses (SH)। অনারম্ভ—কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি; নৈষ্কর্ম্ম্য (গঃ শাঃ); abstaining from all kinds of work (SH)। নিষ্কিঞ্চনত্ব (গঃ শাঃ); disowning money (SH); disowning everything বলিলে ভাল হইত। সঙ্গত্যাগ—অন্য প্রব্রজিতের সহিতও সংসর্গ-পরিহার (গঃ শাঃ); কিন্তু আমাদিগের মনে হয় গীতোক্ত অর্থই ভাল—আসক্তি-ত্যাগ। Keeping from society (SH); giving up all attachments বলাই উচিত। অনেকত্র ভৈক্ষম্—যদিও ভিক্ষা বহু গৃহে মাগিতে হইবে, তথাপি প্রাণযাত্রার নিমিত্ত যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র ততটুকুই সংগ্রহণীয়। অরণ্যবাস—The Dharma-shastra has an analogous rule that mendicants should not sleep two nights in the same village (See Gaut. III. 21)—Jolly and Schmifz. বাহ্য শৌচ—দেহ-শৌচ—জলাদি-দ্বারা সম্পাদনীয়। অভ্যন্তর শৌচ—মানস শুচিতা—ভাবশুদ্ধি। ইহা ছাড়া বাক্-শৌচের কথা কবিরাজ রাজশেখর কাব্যমীমাংসায় বলিয়াছেন—উহা সত্য ও স্বাধ্যায় হইতে জাত। Purity both internal and external (SH)। This summary of rites applicable to all stages in the life of a Brahman may also be traced to the Dharmasastra. See Vishnusmriti II. 17—Tolly and Sehmidt, Punjab Sanskrit Series, No. 4.

মূল :—সকলের (স্বধর্ম্ম)—অহিংসা, সত্য, শৌচ, অসূয়ার অভাব, আনৃশংস্য ও ক্ষমা।

সঙ্কেত :—সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম বিবৃত হইতেছে। অহিংসা—কায়মনোবাক্যে হিংসার অভাব; Harmlessness (SH)। সত্য—কায়-মনো-বাক্যে সত্য-পালন; trustfulness (SH); truth—বলিলেই চলিত। অনসূয়া—গুণে দোষাবিষ্কার—অসূয়া; তাহার বিপরীতত্ব অনসূয়া—গুণের প্রতি পক্ষপাতি (গঃ শাঃ); freedom from spite (SH)। আনৃশংস্য—অনিষ্ঠুরতা (গঃ শাঃ); abstinence from cruelty (SH)।

মূল :—স্বধর্ম্ম—স্বর্গ-ফলক ও অনন্তফলহেতু। উহার অতিক্রমে লোকের সঙ্করহেতু উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা।

সঙ্কেত :—স্বর্গীয়—স্বর্গীর হেতু। স্বর্গ—পরলোক-সুখ। আনন্ত্যায়—অনন্তফলের হেতু; অনন্তফল—যাহার বিনাশ নাই—মোক্ষ; infinite bliss (SH); eternity বলিলেই চলিত। যদিও উহা আনন্দরূপ (Bliss)—তথাপি ভাষান্তরে উহা না বলাই ভাল। অতিক্রমে—উল্লঙ্ঘন দ্বারা। লোক :—জগৎ; জনগণ। সঙ্কর-হেতু—কর্ম্মসাঙ্কর্য্য ও বর্ণসাঙ্কর্য্য হেতু; অনুষ্ঠাতৃ-ব্যবস্থার অভাবে এই সাঙ্কর্য্যের সম্ভাবনা (গঃ শাঃ) owing to confusion of castes and duties. (SH) (কামন্দক ২।৯—৩৫)।

মূল :—সেই হেতু রাজা ভূতগণের স্বধর্ম্ম ব্যভিচার করাইবেন না। যিনি স্বধর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে ধারণ করেন, তিনি পরলোকে ও ইহলোকে আনন্দ প্রাপ্ত হন।

সঙ্কেত :—এটি সংগ্রহ-শ্লোক। ভূতগণের—প্রাণিগণের—এক্ষেত্রে প্রজাগণের। প্রথমার্দ্ধের অর্থ এই যে, রাজা তাঁহার প্রজাগণকে স্বধর্ম্ম-চ্যুত হইতে দিবেন না,—যদি কোন প্রজা স্বধর্ম্মচ্যুত হয় বা স্বধর্ম্ম মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে তাহা হইলে তিনি প্রজার সেই অধর্ম্মাচরণের অনুমোদন করিবেন না (গঃ শাঃ)। ন ব্যভিচারয়েৎ (মূল)—স্বধর্ম্ম-ব্যভিচার করাইবেন না—প্রজারা যদি স্বধর্ম্ম-ব্যভিচার করে, রাজা তাহার অনুমোদন বা উপেক্ষা করিবেন না—পক্ষান্তরে প্রজাগণকে স্বধর্ম্ম-ব্যভিচারের নিমিত্ত শাস্তি দিবেন—ইহাই তাৎপর্য্য। স্বধর্ম্মের ব্যভিচার—ইহার অর্থ স্বধর্ম্ম অতিক্রম বা স্বধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন—transgressing the limits of ones own duties. শ্যামশাস্ত্রী—shall never allow people to swerve from their duties. সন্দধানঃ—সম্যগ্‌-রূপে ধারণ করিতে থাকিলে—সম্যগ্‌রূপে (যথাবিধি) স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে (গঃ শাঃ); whoever upholds his own duty (SH); properly performing his own duty—হইলে ভাল হইত। প্রেত্য—প্র—ই+ল্যপ্—বস্তুতঃ ইহা ল্যবন্ত পদের মত দেখিতে—কিন্তু আসলে নিপাত বা অব্যয়—"ল্যপ্‌প্রতিরূপো নিপাতঃ" (গঃ শাঃ)

ল্যবন্ত ক্রিয়াপদটির অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে গমন করিয়া—যেস্থানে যাইলে আর লোক ফিরে না, এমন স্থানে যাইয়া—পরলোকে যাইয়া। অব্যয় পদটির অর্থ—পরলোকে।

মূল :—যাঁহার আর্য্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থিত ও যিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে স্থিতি করিতেছেন, ত্রয়ী-দ্বারা রক্ষিত সেই লোক প্রসন্ন হইয়া থাকেন—অবসন্ন হন না।

সঙ্কেত :—ব্যবস্থিতার্য্যমর্য্যাদঃ (মূলঃ)—অবস্থিত (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-দ্বারা প্রতিবদ্ধ বা নিয়মিত) হইয়াছে আর্যমর্য্যাদা (অর্থাৎ সদাচার-নিয়ম) যাঁহার (অর্থাৎ যে লোকের) (গঃ শাঃ); গণপতিশাস্ত্রীর মতে—যে লোকের সদাচার-নিয়ম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় এরূপ অর্থ না করাই ভাল; কারণ, পরের বিশেষণটিতে বর্ণাশ্রম-স্থিতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত মত সরল অর্থ করা চলে—আর্য্যোচিত মর্য্যাদা যে লোকের ব্যবস্থিত অর্থাৎ আর্য্যোচিত মর্য্যাদা যে লোক উল্লঙ্ঘন করেন না। মর্য্যাদা—সদাচার-সীমা limits of good conduct, decency, decorum সমগ্র অংশের ইংরাজি—in whose case the limits of Aryan decorum are (rigidly) fixed, শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ—adhering to the customs of the Aryas—ঠিক মূলানুগ নহে। কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতি :—(১) বর্ণাশ্রমে স্থিতি যাঁহার দ্বারা কৃত হইয়াছে অর্থাৎ যে লোক বর্ণাশ্রমের মধ্যে অবহিত; অথবা—(২) কৃত (পালিত) বর্ণাশ্রমস্থিতি (বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা) যৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ যে লোক বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন না। শ্যামশাস্ত্রীর ইংরাজি—folowing the rules of caste and divisions of religions of life; rules না বলিয়া limits—বলিলেই ভাল হইত। সমগ্র অংশের তাৎপর্য্য—(১) যে লোকের আর্য্যোচিত মর্য্যাদা (সদাচার-সীমা) নিয়ন্ত্রিত ও যে লোক বর্ণাশ্রমের মধ্যে অবস্থিত, অথবা (২) যে লোক সদাচার-সীমা (আর্য্যমর্য্যাদা) ও বর্ণাশ্রম-সীমা উল্লঙ্ঘন করেন না। শ্যামশাস্ত্রী প্রথম-শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অন্বয় করিয়াছেন। উহার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। ত্রয়ী-দ্বারা রক্ষিত—[illegible]

বিধি-দ্বারা পরিচালিত—maintained in accordance with injunctions of the triple Vedas (SH) প্রসীদতি—মোদতে—আনন্দিত হয় (গঃ শাঃ); will progress (S H)। প্রসন্ন হয়—স্থিরতা প্রাপ্ত হয়—becomes steady (stable) বলা ভাল। ন সীদতি—অবসন্ন হয় না ; ন নশ্যতি (গঃ শাঃ); will never perish (S H); does not weaken (decline) বলিলে ভাল হইত। লোক বলিতে (১) ভুবন ও (২) জন দুইই বুঝায় ; world (S H)।

ইতি কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিকে প্রথমাধিকরণে তৃতীয় অধ্যায়—বিদ্যাসমুদ্দেশ-প্রকরণে ত্রয়ী-স্থাপনা।

খনিজ তৈল ও অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদ *

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস্‌, এ-আই-বি (লণ্ডন)

বর্ত্তমান সভ্যজগতের বেশী দরকার হইতেছে যথেষ্ট পরিমাণে 'শক্তি' সরবরাহ। আর 'শক্তি' সংগ্রহ হয় দাহ্য দ্রব্য হইতে। বিজ্ঞান এই শক্তিকে ক্রমে ক্রমে আয়ত্তে আনিয়া ও কাজে লাগাইয়া সভ্যতাকে আগাইয়া দিতেছে। কিন্তু এ 'শক্তি' রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নয়। এতদিন কয়লাই ছিল একমাত্র শক্তির উৎস, এখনও একটা প্রধান উৎস সন্দেহ নাই। ডিজেল ও ওটো এঞ্জিন আবিষ্কারের পর হইতে খনিজ তৈল আমাদের নূতন শক্তি সঞ্চয়ের উপায় হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারও শেষ নাই। সভ্যতার 'তৈল যুগ' চলিয়াছে বলা চলে। এককালে বৈজ্ঞানিকেরা বলিত সাল্‌ফিউরিক এসিড বা গন্ধক দ্রাবকের ব্যবহার দ্বারাই সভ্যতার গতি নিরূপিত হয়। এখন বলা চলে খনিজ তৈলের ক্রমবর্দ্ধমান নিয়োগই সভ্যতার অগ্রগতি প্রমাণ করে। আজ আমেরিকার এত বড় উন্নতির পিছনে রহিয়াছে মার্কিন বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিদ্‌গণের তৈলকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতা। আজকের যুদ্ধের অংশীদার বৃটেন ও আমেরিকা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত খনিজ তৈলের মালিক। ওলন্দাজ ভারতীয় দ্বীপগুলি বাদ দিয়াও ইংলণ্ড ও মার্কিন উভয়ে আজ পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ খনিজ তেলের মালিক। বর্ত্তমান শতাব্দীর সকল অন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের মূলে এই খনিজ তৈলের দখলীসত্ত্ব রহিয়াছে সন্দেহ নাই।

খনিজ তৈলের উৎপাদক ও খাদক হিসাবে ভারতবর্ষ

খনিজ তৈলের সম্পদে ভারতবর্ষ নিতান্তই দরিদ্র। পাঞ্জাবে রাউলপিণ্ডীর নিকট পটওয়ার উপত্যকায়, খাউর ও ধুলিয়ানে ছোট ছোট তৈলের খনি আছে। আবার আসামেও তৈলের খনি আছে। যখন ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের সামিল ছিল (১৯৩৭ সনের পূর্ব্বে) তখন এ দেশ উৎপাদক হিসাবে আরও উন্নত ছিল। ১৯৩৫ সনে মোট তৈলের উৎপাদন হইয়াছিল ৩২ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন, অথচ ব্রহ্মদেশ আলাদা হইবার পরে উৎপাদন খর্ব্ব হইয়া ৮ কোটী ৪০ লক্ষ গ্যালনে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সনে ভারতবর্ষ নানা রকমের মোট ৪৬ কোটী ৩০ লক্ষ গ্যালন খনিজ তৈল প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইরাক ও আমেরিকা হইতে ১৭ কোটী টাকার বিনিময়ে আমদানী করিয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতেই ভারতের সমুদ্রপথের আমদানীর পরিমাণ বোঝা যাইবে :—

১৯৩৭-৩৮—সর্ব্বপ্রকার তৈলের মোট আমদানী		৪৭,৪৯,৪৬,০০০	গ্যালন
১৯৩৮-৩৯—	...	... ৪৩,৮৭,১১,০০০	গ্যালন
১৯৩৯-৪০—	...	... ৪৬,২৯,৫০,০০০	গ্যালন

যুদ্ধের দরুণ ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের তৈল আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালে শিল্পের প্রসার হইলে খনিজ তৈলের ব্যবহার যে ভয়ানকভাবে বাড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গভর্ণমেণ্ট ও বিদেশী কোম্পানীর অনুসন্ধান হইতে জানা গিয়াছে যে উত্তর ভারতের নানা অংশে যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ তৈল সঞ্চিত আছে, তবে কবে এই তৈল পাওয়া যাইবে তাহা আজও অজ্ঞাত।

এই বিষয়ে একটী ভয়ের কারণ দাঁড়াইয়াছে বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে তৈল অনুসন্ধান সম্পর্কে অনুমতি প্রদান। ইংরেজ কোম্পানী ত বটেই, মার্কিন কোম্পানীকে উত্তর ভারতের পর্ব্বতপাদদেশের অধিত্যকা প্রদেশগুলিতে নানা বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা তৈলের অনুসন্ধান করিতে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। অথচ ভূনিম্ন অনুসন্ধানের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের জিওলজিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেণ্ট রহিয়াছে এবং এই বিভাগের কার্য্যের সুখ্যাতিও শোনা যায়। এই বিভাগের এক অংশ খনিজ দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিবার জন্য নূতন ভাবে গঠন করিলেই সহজে কাজ চলিত। অষ্ট্রেলিয়া কার্য্যের সুবিধার জন্য এরূপ একটী বিভাগ খুলিয়া গত ১৫ বৎসরে অনেক সুফল পাইয়াছে। ককেসীয় তৈলের খনি পূর্ব্বে বিদেশীগণের হাতে ছিল কিন্তু ১৯১৯ সনে রুশিয়েরা ভূনিম্ন অনুসন্ধান বিভাগ (Geophysical Section) খুলিয়া যে উন্নতি দেখাইয়াছেন ও যে পরিমাণ লাভবান হইয়াছে তাহার তুলনা নাই। বিদেশীর হাতে দেশের সম্পদের রক্ষণ ও পরিচালনের ভার দেওয়ার অর্থ অনেক সময়ই দাঁড়ায়—বিদেশী স্বার্থ কায়েম করা ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণকে ডাকিয়া আনা।

১৯৪০ সনে স্মিথসোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউসনের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে মিষ্টার জি, এম, লী "তৈলের সন্ধান" নামক একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে পৃথিবীতে তৈলের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মার্কিন দেশে আরও ভয়ানকভাবে বাড়িবে। এইরূপ বাড়িলে এবং তৈল উত্তোলন এই ভাবে চলিলে প্রায় বারো বৎসরেই আমেরিকার তৈল শেষ হইয়া যাইবে। প্রবন্ধটা অবশ্য সরল ভাবেই লেখা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ইঙ্গিত হইতেই সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন মন তাহার চোখ এসিয়ার দিকে ফিরাইয়াছে। ইহাতে আমরা ভারতবাসী শঙ্কিত না হইয়া পারি না।

মার্কিনের স্বার্থ

লী লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশের বহুপূর্ব্ব হইতেই মার্কিনজাতি তাহার তৈল নিঃশেষের চিন্তায় সজাগ হইয়া আছে এবং এই জন্যই এসিয়া মহাদেশে তেলের সন্ধান চালাইতেছে। এসিয়া পৃথিবীর মাত্র ৯·৪ ভাগ তৈল সরবরাহ করে, সুতরাং ইহার স্থান নিতান্তই নগণ্য। মার্কিন দেশে ও ইউরোপে সন্ধানীরা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ঐ সকল দেশের নিতান্ত অজ্ঞাত স্থানেও কোথায় তৈল আছে জানিয়া ফেলিয়াছে, আর সেখানে নূতনের সন্ধান বৃথা। এবারে এসিয়ার পালা। এজন্য ইরাক, ইরান্‌, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সোভিয়েট রুশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান তৈল সম্পদ আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। একমাত্র সোভিয়েট্‌ রুশিয়া ও

---

* অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও এস এন সেন লিখিত (১৯৪২-৪৩ সনের "Oil and Invisible Imperialism" শীর্ষক প্রবন্ধের সার-সংকলন Science and Culture পত্রিকায় প্রকাশিত)।

জাপানের হুদ্দার বাহিরের সকল দেশেই ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানীগুলি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই তৈল নিষ্কাশনে ব্রতী হইয়াছে। ভূমধ্য-সাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। মশুল তৈলক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানীর মালিকানা। ইরাক্ তৈল ক্ষেত্র ইংরেজ—ওলন্দাজ—ফরাসী ও মার্কিন ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করিতেছে। পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেরও এই দশা।

মার্কিনেরা পৃথিবীর এই তৈল লুণ্ঠনে পরে নামিয়াছে। মার্কিনের নিজেদের তৈল-ঐশ্বর্য্য যথেষ্টই ছিল, তাহা ছাড়া মেক্সিকোর তৈল গত ২৫ বৎসর ধরিয়া মার্কিন ধনকুবেরগণের ঘাড়ে চাপিয়া ছিল। নিজেদের আরও বেশী তৈল দরকার হওয়ায় এবং দেশের উৎপাদন ক্রমে ক্ষীয়মাণ হওয়ায় আজ মার্কিনের দৃষ্টি এসিয়ার উপর পড়িয়াছে। লী সত্যই বলিয়াছেন যে আমেরিকাকে আজ অন্যত্র বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকা ও এসিয়ায় তৈলের সন্ধান করিতে হইবে। যদিও এসিয়ার মোট উৎপাদন একশত ভাগের ৯·৪ মাত্র, তবুও ইংরেজ ও ওলন্দাজের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই এসিয়া খণ্ডে মূল্যবান তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে আরও ভাল ফল আশা করা যায়।

লীর কয়ছত্র লেখা হইতেই মার্কিন জাতির উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়।

তৈল-সাম্রাজ্যবাদের আওতায় মেক্সিকো

মেক্সিকো দেশে মার্কিন তৈল-মালিকেরা যে সাম্রাজ্যবাদের জাল ফেলিয়াছিল তাহা হইতে ভারতের শিক্ষণীয় অনেক আছে। ১৮৩০ সনে মেক্সিকো স্পেনের অধীনতা ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাবে মেক্সিকোর প্রথম ডিক্টেটর পরফিরিও ডায়াজ (১৮৭৭-১৯১১) তৈলের খনির মালিকানা বিদেশীগণের নিকট বিক্রয় করেন। রেড ইণ্ডিয়ানগণের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া ডায়াজ তাহা বিদেশীর নিকট ইজারা দিয়াছিলেন। ১৮৯২-১৯০৯ সনের আইন দ্বারা ভূনিম্ন সম্পত্তির অধিকার বিদেশীয়গণকে দেওয়া হয়—যদিও মেক্সিকোর ইতিহাসে রাষ্ট্রই ছিল এইরূপ সম্পত্তির একমাত্র মালিক। ডায়াজ বুঝিয়াছিলেন যে দারিদ্র্যই দেশের একমাত্র সমস্যা এবং তাহা দূর করিবার জন্য বিদেশী মূলধনের সাহায্যে দেশকে শিল্পপ্রধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাহার এ স্বপ্ন সফল হয় নাই। "তৈলের নল বহিয়া মেক্সিকোর ধনসম্পদ দেশের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল এবং মার্কিন ধনকুবেরগণকে আরও ধনবান করিয়াছিল। দরিদ্র মেক্সিকোবাসী দরিদ্রই রহিয়া গেল।" দেশের আর্থিক জীবন তৈল-মালিকের ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হইত এবং মেক্সিকো রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক হইয়া পড়িল মার্কিন ধুরন্ধরগণ। খাস মেক্সিকোর লোকেরা তৈলের কারখানায় বড় জোর পিওনের কাজ পাইত এবং তাহাও না জুটিলে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। ডায়াজ পদচ্যুত হইলে, দরিদ্র মেক্সিকো দেশ বিপ্লবের গ্রাসে পড়িল। বিড়ালের পিঠা ভাগের মত বিভিন্ন দলের মধ্যে গোপনে অনুগ্রহ বণ্টন করিয়া তৈল-মালিকগণ বানরের অভিনয় চালাইতে লাগিল। যখন এই গণ্ডগোলের মধ্যে জেনারেল ভিক্টরিয়ানো হুয়ের্ডা মেক্সিকো নগর দখল করিয়া নূতন গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিলেন তখন প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ তাহার গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিলেন না ও তাহার দলীয় লোকের নিকট অস্ত্র বিক্রয় করিতে রাজী হইলেন না—অথচ তাহার বিরুদ্ধ দলীয়ের নিকট হাতিয়ার বেচিতে তাহার বিবেকে বাঁধিল না। এক সময় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট এক অছিলায় এড্‌মিরাল ফ্লেচারকে এক নৌবাহিনী দিয়া পাঠাইয়া ভেরাক্রুজ বন্দরে গোলা বর্ষণ ও শুল্ক গৃহ দখল করাইলেন। ক্রমে ক্রমে মেক্সিকো বাসীর জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হইল, তাহারা দেখিতে পাইল যে তাহাদের তৈলের খনিতে ইংরেজ ও মার্কিনের ৯৩ কোটী ডলার মূলধন খাটিতেছে, অর্থাৎ কিনা শতকরা ৯৫ অংশই ইংরেজ-মার্কিনের করায়ত্ত, শতকরা ৪ অংশ খুঁদে সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজের হাতে, বাদবাকী শতকরা ১ অংশ মেক্সিকোবাসীর দখলে। ইহা ১৯২২ সনের কথা। মেক্সিকোবাসীরা বুঝিল যে যে পর্য্যন্ত দেশ বিদেশীর শোষণে থাকিবে ততদিন কোন বিপ্লব দ্বারাই দেশে স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এইরূপ ধারণা হইতেই ১৩১৭ সনে প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জা নূতন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে দেশের জমির মালিক হইবে দেশের রাষ্ট্র এবং বিদেশীরা খাস মেক্সিকোবাসীর অপেক্ষা কোন বেশী স্বত্ব ভোগ করিতে পারিবে না। কিন্তু কারাঞ্জার ক্ষুদ্র ক্ষমতা এই বিধান কায়েম করিতে পারে নাই, কারণ মার্কিন তৈল-মালিকগণ তাহাকে বাধা দিয়াছিল।

১৯২০ সনে জবরদস্ত জেনারেল ওব্‌রিগণ প্রেসিডেণ্ট হইলে যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র তাহাকে মেক্সিকোর সভাপতি বলিয়া স্বীকার করিল না। পর বৎসর ওয়াসিংটন হইতে বাণী আসিল যে মার্কিন রাষ্ট্র ওব্‌রিগণকে সভাপতি বলিয়া স্বীকার করিবে যদি তিনি মেক্সিকো দেশে মার্কিন নাগরিকগণের সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করেন। ওব্‌রিগণ ইহার যে উত্তর পাঠাইলেন তাহাতে তাঁহার মনের দৃঢ়তাই প্রকাশ পাইল। কারণ তাঁহাকে স্বীকার বা অস্বীকার করার দিকে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, দেশের স্বাধীনতা ও সম্মানই ছিল তাঁহার কাম্য। শীঘ্রই ১৯১৭ সনের নিষ্ফল আইনকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পরিণত করা হইল এবং ভূমির উপর বিদেশীর অধিকারকে চিরদিনের মত তুলিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য মার্কিনেরও এ বিষয় বলিবার কিছু ছিল না কারণ আরিজোনা ষ্টেটে অনুরূপ একটা আইন ছিল। আমেরিকায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল, খবরের কাগজগুলি গবর্ণমেণ্টকে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বলিলেন, তৈল-মালিকগণ বলিলেন মেক্সিকান্‌রা ডাকাত, ব্যাঙ্ক মালিকেরা বলিল মেক্সিকানরা এনার্কিষ্ট। কিন্তু মেক্সিকোবাসী তাহাদের কর্ত্তব্যে দৃঢ় রহিল।

১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে ডোয়াইট্ মরো ভূমি-আইন সম্পর্কে মীমাংসা করিবার জন্য মার্কিন দূত হইয়া মেক্সিকোতে গেলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় মার্কিন গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলেন যে মেক্সিকো দেশে মার্কিন প্রজাকে রক্ষার দায়িত্ব মেক্সিকো সরকারের। ইহাও স্বীকৃত হইল যে মেক্সিকো দেশে মার্কিন প্রজার ভূমিতে স্বত্ব সম্বন্ধে মেক্সিকোর সুপ্রিম কোর্টই চরম বিচার করিবে। সুপ্রিমকোর্ট মার্কিন প্রজার তথা তৈল-কোম্পানীর অধিকার স্বীকার করিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করিল।

কিন্তু এই মীমাংসাই চরম নহে। যে পর্য্যন্ত মেক্সিকো হইতে বিদেশীর অধিকারের উচ্ছেদ না হয় সে পর্য্যন্ত কোন মীমাংসাই চরম হইতে পারে না। কিছুকাল ঠাণ্ডা থাকিয়া আবার তৈল-নিষ্কাশনের প্রশ্ন জ্বলিয়া উঠিল। ১৭টী ইংরেজ, মার্কিন ও ওলন্দাজ কোম্পানীকে এক সালিসী বোর্ড খাস করিবার মজুরী দিলেন। তৈল-কোম্পানীগুলি আপিল করিলে ১৯৩৮ সনে ১লা মার্চ্চ সুপ্রিম কোর্টে তাহা অগ্রাহ্য করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট কার্ডিনাস্ এই সকল বিদেশী কোম্পানীর সম্পত্তি খাস্ করিলেন। ষ্টেটের শাসনকর্ত্তাগণ সকলেই বিদেশী কোম্পানী-গুলিকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হইলেন। মেক্সিকো দেশে জাতীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লড়িতে প্রস্তুত এরূপ প্রেসিডেণ্ট আর হয় নাই। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পরিচালনের ভার জাতীয় পেট্রোলিয়াম প্রতিষ্ঠানের উপর দেওয়া হইল। এইরূপ কার্য্য দ্বারা মেক্সিকোর সহিত বিদেশী শক্তিবর্গের বন্ধুত্ব ভাঙিয়া গেল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সরাসরি ক্ষতিপূরণ চাহিলে মেক্সিকোর গবর্ণমেণ্ট উহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিল। মার্কিন ও ডাচ্ গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ফলে মেক্সিকোর বিদেশী বাণিজ্যে [illegible] এবং বাজারে [illegible] দেখা দিল। [illegible] ভাবে করিয়া গেল, বহিঃ জার্মানী, ইটালী, [illegible] ও [illegible] সহিত কিছু কিছু নূতন বাণিজ্যের পত্তন [illegible]।

১৯৩৯ সনের ২রা ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেন যে ১৯৩৮ সনের বাজেয়াপ্তকরণ সম্পূর্ণ আইনতঃ হইয়াছে কিন্তু বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলি ব্যবসায়ে যে মূলধন ন্যায়তঃ লগ্নি করিয়াছে তাহার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট অনধিক দশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় খেসারৎ পাইতে অধিকারী। এতদিনের বিতণ্ডা মোটামোটীভাবে এইরূপে শেষ হইল। বিদেশী শক্তির হুমকিতে ভয় পাইলে অবশ্য একরূপ মীমাংসা হইতে পারিত না।

সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত

আমরা সোভিয়েটের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। জার-শাসিত রুশ দেশ ঠিক্ মেক্সিকোর মতই বিদেশীর সাহায্যে দেশের শিল্পোন্নতি করিতে চাহিয়াছিল। এক্ষেত্রে ইংরেজ ও ফরাসী শোষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এই বিদেশী শোষণই ১৯১৭ সনের রুশবিপ্লবের অন্যতম কারণ। বিপ্লব আরম্ভ হইলে রুশিয়া বিদেশী ঋণগুলি অস্বীকার করিয়া বসে। ইহার পরে আরম্ভ হয় সোভিয়েটের নিজের শিল্প পরিকল্পনা (১৯২৬)। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে উহাতে দেশের হাওয়া ফিরিয়া যায়। উহার পর আরও দুইটা পরিকল্পনা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার সময় বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হয়। এই পরিকল্পনার জন্যই রুশ দেশে শিল্পোন্নতি অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। আমরা কেবল মাত্র খনিজ তৈলের দিক হইতে দেখিতে পাই—১৯২১ সনের পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর পরেই ছিল রুশিয়ার স্থান। ১৯৩১ সনের মধ্যেই রুশিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। লীগ্ অব্ নেশনের প্রকাশিত হিসাব (১৯৩৩-৩৪) হইতে জানা যায় যে রুশিয়া ১৯২৭-২৮ সনে পেট্রোলিয়াম্ প্রস্তুত হয় ১১·৬ মিলিয়ন্ টন্ কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে ১৯৩২ সনে উহা বাড়িয়া ২২·২ মিলিয়ন টনে দাঁড়ায়। ১৯৩৮ সনের পরিকল্পনা অনুযায়ী রুশিয়া এখন ৩০ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম প্রস্তুত করিতেছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে রুশিয়ায় ভূনিম্নে ৭০০ মিলিয়ন টন তৈল মজুত আছে এবং সম্ভবতঃ আরও ৬,৩৭৬ মিলিয়ন টন পাওয়া যাইবে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি মাত্র ২০০০ মিলিয়ন টন। এই যুদ্ধে রুশিয়া জয়ী হইলে তাহার খনিজ তৈলের সম্পদ বাড়িবে বৈ কমিবে না।

গত পঁচিশ বৎসরে নিজের চেষ্টায় রুশিয়ার মত একটী কৃষিপ্রধান দেশ শিল্পে যে উন্নতি করিতে পারিয়াছে তাহাতে মনে হয় রুশিয়ার পন্থাই এদেশের পক্ষে কার্য্যকরী হইবে। পশ্চাৎপদ দেশকে উন্নত দেশের আর্থিক সাহায্যে চাঙ্গা হইতে হইবে এইরূপ সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ যে ভুল তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

মেক্সিকোর ইতিহাস হইতে ভারতবর্ষের ইহাই শিক্ষা করা উচিত যে সাম্রাজ্যবাদীর কবলে পড়িলে মুক্তির আশা খুব কম—বিশেষতঃ এ দেশের মত পরাধীন দেশের পক্ষে। বিদেশীয়গণকে সুযোগ সুবিধা দিলে এবং তাহারা একবার গাড়িয়া বসিলে তাহাদিগকে হটান শক্ত এবং ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমেরিকা এদেশের উন্নতিতে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ইহা খোলাখুলি ভাবেই বলা হয়। এদিকে দেশে যাহাতে ভারী শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা হয় সে বিষয়ে দেশের গবর্ণমেণ্ট মোটেই সজাগ নহে বরং অরাজী। আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ কমিটির আমদানী, ভারতীয় শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য দানের অনিচ্ছা, জাহাজ নির্ম্মাণ, মোটর তৈরি, কলকব্জা প্রস্তুত প্রভৃতি ভারি শিল্পগুলির পত্তনে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার অভাব আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্পের খুব নির্ম্মেঘ ভবিষ্যতের সূচনা করে না। আমেরিকান প্রতিষ্ঠানকে দেশের ভূনিম্ন তৈল শিল্পকে পরিচালন করিবার ক্ষমতা দিলে ভারতবর্ষ তাহা নিষ্কাম ভাবে গ্রহণ দেখিতে পারে না, কারণ অতীতের বিদেশী শোষণ তাহার আর্থিক দেহ পঙ্গু করিয়াছে এবং ভবিষ্যতের আর্থিক বিপর্য্যয় তাহার জীবন-মরণের সমস্যা হইবে।

প্রার্থীর ব্যথা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ, কাব্যরঞ্জন

কামনার রাগে রঞ্জিত বলি'
মোর প্রার্থনাগুলি—
প্রভু, তুমি কভু শুনিবে না হায়,
বারেক বদন তুলি' ?

অভ্রংলিহ নহে মোর আশা,
সিন্ধু শুষিব—নহে সে পিয়াসা—
বিন্দু পেলেই এ কাঙাল আর—
চাহিবে না কিছু ভুলি' !

ক্ষুদ্র বাসনা—হ'য়েছে ব্যর্থ—
তারি লাগি' কাঁদে হিয়া,
যদি পাই সুখ সেই মোর দুখ
তোমারেই নিবেদিয়া,—

যাচক বলিয়া তুমিও কি নাথ,
ঘৃণাভরে নাহি করি' দৃক্‌পাত—
তব দ্বার হ'তে রিক্ত আমায়
দিবে আজ ফিরাইয়া ?

গীতার মন্ত্র পারি না বুঝিতে—
বাসনায় জ্ব'লে মরি,
আমারি মত কত অভাজন
আছে এ ভুবন ভরি'।

কোটির মাঝারে গুটিকের লাগি',
করুণা লইয়া আছ কিহে জাগি ?
আর আছে যারা তরিতে তাহারা
পাবেনা চরণ-তরী ?

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কথা চিত্র)

১

ইভাকুইদের ক্যাম্প ভরাট। নিত্যই যোগান চলেছে, কমতে চায় না। আজ লাল পল্টন, কাল কালা পল্টন। সন্ধ্যা না হতেই 'বেঁটে পল্টন' পশুপতিনাথ কি জয় ঘোষণা করতে করতে হাজির। গা ঢাকা হতেই লম্বাদের প্রবেশ। এরা আবার কারা? "ওরা গুরুকি ফতে" শুনে ধাতে আসতে হয়। আওয়াজ কিন্তু সবারই চাপা। সবার কথাবার্ত্তার সমবায়ে ভাষাতত্ত্বের একাকার। যেন দেবভাষার সৃষ্টি চলেছে—

ট্রেণ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে—নিশ্বাসে নিজের অস্তিত্বের আশ্বাস দিচ্ছে—"আমি আছি!"

হুকুম হলেই সব চাঙ্গা—সুড় সুড় করে' রথে গিয়ে ওঠে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে! জেনে দরকারই বা কি?

তখন রেল কর্ম্মচারীরা ধর্ম্ম রক্ষা করে' বিশুদ্ধ সাধু ভাষা প্রয়োগ করতে করতে সিগারেট ধরায়। বলে—"একটু চা পেলে যে বাঁচি।" হারাধন বলে—"এই এলো বলে।" ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম চলে।

শৈলেন বলে—"থাম্ বাবা, বাড়িতে একটু নুন নেই যে কচু পুড়িয়ে খাই, তার সেরও বার আনা।"

নীরেন বলে—"গুরুজনেরা সে খেদ রেখে যাননি—কথায় কথায় কলাপোড়া কচুপোড়ার আশীর্ব্বাদ প্রচুর ঝেড়ে লালন-পালন করেছিলেন। পাড়াপড়শীদের দাতব্যও কম ছিল না। তাঁদের দয়াতেই গয়ার পিণ্ডীর মত এই রেলের চাকরী মিলেছে। কচুপোড়া মিলবে, ভাবনা বটে ত নুনের জন্যে। সাগরের নুন নাকি হাঙরের গর্ভে গেছে।" ইত্যাদি সুখ দুঃখের কথা চলে।

পাশের "রিফ্রেস্‌মেণ্টরুমে" কাঁটা চামচের সুমধুর টুং টাং আর এগ্, মাংস, হুইস্কি ও হাসি।

বীরেন বলে—"করে নাও বাবা, এদিন থাকবে না—হ্যায়সা দিন নেহি রহেগা, ভগবান আছেন।"

বিজয়বাবু বয়সে কিছু ডেঁসেছেন; বলেন "কি করে' জানলে বীরেন! ফস্ করে যা-তা বোলো না। আমার এতটা বয়েস হোলো, আমি জানলুম না, আর তুমি জেনে ফেললে—"

"আলবৎ! দেখলেন না Robertson বেটা for nothing আমাকে গালাগাল দিলে, আমি ভগবানকে জানালুম। বিকেলে শুনি, বেটা ট্রলি থেকে পড়ে পা ভেঙে হাঁসপাতালে রয়েছে। ডাক্তার বলেছেন ও গো-হাড় আর জোড়া লাগবে না।"

"ওরে সে শুয়ে থাকলেও পেনসন্ টানবে, ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যকর পাহাড়ে কোম্পানীর খরচে পড়বে, খাবে-পরবে, টেনিস খেলবে। ভগবান আছেন বইকি। আমি তাঁকে না দেখলেও 'অস্বীকার করি না—" ইত্যাদি—

প্ল্যাটফরম পরিষ্কার—কুলিদের নাক ডাকে।

২

ওদিকে Head quarter-এ হুলস্থূল। জরুরী 'তার' পৌঁছে গেছে—ইভ্যাকুই ক্যাম্প ঘেঁসে, আশে পাশে কলেরা দেখা দিয়েছে—best Certificate holder expert ডাক্তার with medicine ও বাক্সি early morning-এই হাজির চাই। কড়া হুকুম।

Sub-assistant Surgeon বিনোদ বেচারা মাস কয়েক আগে, একটি সপ্তদশী বিবাহ করে' এনে বেশ খুশিতে ছিল, প্রেমালাপের মধ্যে প্রমাদ গণ্‌লে।—"ও তো আমার ঘাড়েই চাপবে দেখছি। বড় বড়দের কাজের ভার চিরদিনই ছোটোদের বহনের সৌভাগ্য মেলে! ও তো জানা কথা!"

রাত তখন এগারটা।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে প্যারদার পেয়ারের ডাক—"বড়া জরুরী তলব ডাক্টার বাবু। আমি সাহেবের পায়ে মালিস করছিলুম, উঠিয়ে দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে হুসরা তাঁর আরা হুজুর।"

"আমার মাথা খায়া—তা বুঝেছি। চলো যাচ্ছি।"—

—"দু'টাকায় হাট্ পাওয়া যায়—পদস্থ হলেই সব সাহেব—Colour bar নেই। হাফ্ প্যাণ্ট পরলেই হাকিম। এইবার সাধ মিটিয়ে হুকুম ছাড়বেন। যতো সব···"

দুর্গানাম জপ করতে করতে বিনোদ গিয়ে হাজির।

"সব বুঝেছ তো বিনোদ, তোমার জন্যে অনেকদিন থেকেই ভাবছি এই একটা মওকা মেলেছে, দেখি কি করতে পারি। এখন দুর্গা বলে···"

"আমি তাঁকেই ডাকতে ডাকতে এসেছি Sir, তার পর আপনি আছেন।"

"সে আমি ঠিক করে রেখেছি, সুনাম নিয়ে ফিরলেই, বুঝলে··· বেশীদিন নেবেনা, বড় জোর কয়েক মাস—say 2, 3, 4,—তার পর যা করবার করবো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—"

বিনোদের জানাই ছিল কোনো কথাই কাজ দেবে না, মিছে কেবল Sir, Sir করা। বললে—"তবে আর কি, এ আর ক'দিন!"

"হ্যাঁ—এই তো চাই, তাই না তোমাকে ডেকেছি—"

"তা আমি জানি Sir, আপনি দয়া না রাখলে বিদেশে আমার আপনার বলতে আর কে আছে—"

"First train-এই বেরিয়ে পড়, বুঝলে? বাড়ির জন্যে ভেব না, আমি আছি—"

"ভরসা তো আমার তাই হুজুর, আচ্ছা [illegible]···"

"হ্যাঁ, গুছিয়ে নাও [illegible]! [illegible] Co[illegible], তাকেই দিচ্ছি—[illegible]"

"এই বাতের যন্ত্রণার মধ্যে কি করে এতো চিন্তা—ধন্য আপনাদের মাথা। তবে অনুমতি—"

"হ্যাঁ,আর দাঁড়িও না—emergency—বুঝলে ? হ্যাঁ Camp এখান থেকে দুটো ষ্টেসন বইত নয়—এই ভেবে এখানে যেন কোনো দিন এসে পড় না, আমি না ডাকলে আসবে না—বুঝলে ?—এখানকার জন্যে ভেব না—আমি আছি।"

"আপনি যখন আছেন তখন আর ভাবনা কি ?" ইত্যাদি বলতে বলতে বিনোদ বাসার রওনা হ'ল—

তার মাথা ঠিক ছিল না—"৭ মিনিটের মধ্যে সতের বার বললেন—"বুঝলে" ? যেন "Great ওহাবি কেসের" রায় লিখতে হবে। আবার ২৩ বার "ভেবনা আমি আছি।" তাতো বটেই তবে আর ভাবনা কি ? এত আত্মীয়তা জানলে—যাক এখন too late—"

বাসায় পৌঁছে—"দোরটা খোলো—শুনচো—আমি গো।"

"বড় ভয় করছিল—"

"ভয় আবার কি, স্বয়ং সাহেব রয়েছেন অভয়ের মালিক।" বেগটা সামলে—হাসি মুখে বললে—"বাঘ এলে ফেউ ডাকে, প্যায়দার ডাক শুনেই বুঝেছিলুম—আমি ছাড়া কলেরার মওড়া নেবার expert ডাক্তার এ Districtএ নেই। Certificateএ কলেরা-মাষ্টার বলে underline করা রয়েছে যে,—আমাকে ছাড়চে কে ?"

রাণী ভীত হাস্যে বললে—"কেউ না ছাড়ুক—কলেরায় ছাড়লে যে বাঁচি।"

"সে ছাড়বে না ! সেই আমাকে medal দিইয়েছে ?" তার পর অনেক কথা।—হপ্তাখানেকের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কটা দিন সাবধানে থেকো। সাহেব স্বয়ং এসে খবর নেবেন বোধ হয়, তুমি ঘর থেকে কথা ক'য়ো, বেরিও না, আত্মসম্মান রেখে চোলো।" ইত্যাদি সব বুঝিয়ে সুজিয়ে, সাহস দিয়ে, কম্বল আর ছেঁড়া ওভারকোট সম্বলে সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ল। First train বেলা আটটায়।

"তিনজন বড়কর্ত্তার সঙ্গেই দেখা করে সেলাম জানিয়ে যাওয়াই উচিত—ওটা তুষ্টির মুষ্টিযোগ। নচেৎ তাঁরা বিনা মেঘে শিলা বৃষ্টি করেন। Self-Governmentএর পরিচয় দেন।"

বিনোদ বিনয় বচন শুনিয়ে এল, শেষ বড় কর্ত্তার সঙ্গে পুনশ্চটা সারলে। তিনি অভয় দিলেন—"কোনো চিন্তা রেখ না, কলেরা বইতো নয়। ভয় খেয়োনা, আমি মাঝে মাঝে যাব।"

"না, ভয় আবার কি—কলেরা বইত নয়।"

"আমার পাটা একটু সারলেই—বুঝেছ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আর হপ্তাখানেক বেরুবেন না, rest দরকার। ও রোগে বালিস আর মালিস, আপনাকে আর কি বলবো—"

"জলটা গরম করে খেয়ো, আর বাজারের কিছু—ওই ছাই ভস্মগুলো—তুমি তো সব জানো…"

বিনোদ মনে মনে বললে—"হ্যাঁ জল গরম করে দেবে আমার ৭টা দাসী আর মাসি, আর কচুরি জিলিপি ঠোঙা ভরে আসবে, সেরটা দু' টাকা বই তো নয়!"

"তবে একখানা গাড়ি বলে আসি সময়ও কম"…

"তাইতো,এই সময় আমার carখানা বিগড়েছে তা'নাতো"…

"তা'নাতো আমারও চিন্তা ছিল না, ওতো এখন ঘরের কথা হুজুর…"

"বাসার জন্যে কোনো চিন্তা রেখনা। দেখা শোনা নিত্যই করব—বুঝলে ?"

"ও পা নিয়ে এখন কষ্ট পাবেন না। ঝি চাকরকে দিয়ে খবরটা নিলেই হবে, তাদের সঙ্গে সব কথা সে কইতেও পারবে—"

"আরে আমার তো নাতনী হে, আমাকে আর লজ্জা কিসের ?"

বিনোদ নমস্কার করে বেরিয়ে পড়লো—"যা করেছেন বেশ করেছেন, আবার এত দয়া কেন !"

৩

মাঝে মাঝে এই সব কথা ফুট্ কাটে, বেচারা বিনোদ বেজায় দুশ্চিন্তা নিয়ে চললো। সে মধ্যবিত্ত সদ্বংশের ছেলে বলিয়ে কইয়ে আমুদে। তাকে সকলেই চায়—ভালোবাসে। এই সস্নেহ বাইটি বা বাতিকটি সম্প্রতি জুটেছে বোধহয়। সর্ব্বদা হাসি খুশিতে থাকাই তার অভ্যাস। রবিবাবুর পরম ভক্ত, চয়নিকা নিয়েই থাকে। ভাবছে—"ফাগুন মাসে বিয়েটা করলেই ভাল ছিল, তিনটে সুতহিবুক যোগও ছিল—এখনো তার কয়-মাস বাকি রয়েছে; কি ভুলই করা হ'য়েছে ! এটা তো শ্বশুর মশায়ের মাতৃদায় ছিলনা,তাঁর মেয়েও গৌরীটি ছিলেন না—Long nine years in default অরক্ষণীয়া ! বয়সটা ২।৩ বছর ফাঁকি দিয়েই বলে থাকবেন—I can swear moreover ফজহুরী আদালতের সমনও কেউ দেয়নি—ধপাস্ করে সেই মেঘ-মেদুর নিবিড় আষাঢ়ে যখন "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী"

এখন এ কাজ না করলেই কি তাঁর তালুক বিকিয়ে যাচ্ছিল ? nonsense—

আমিও কি বের জন্যে পাগল হ'য়েছিলুম ? অবশ্য আমার যেন আপত্তি ছিল না, সেটা কোন্ Sensible young man এরই বা থাকে, except এ few unfortunates তারা বোধ হয় অতবড় বিজ্ঞান-বিশারদ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, অকুতোভয়ে যা লিখে গেছেন—যৌবনকাল অতি বিষম কাল, এই কালে—ইত্যাদি, দেখেনি; সুতরাং আমি কোনো অন্যায় অসামাজিক কাজ করিনি, তা বলে যাট পেরিয়ে শ্বশুর মশায়ের তো "সেকাল" ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। নির্ল্লজ্জের মত…চুলোয় যাক্—

Compounder মাণিকলাল কখন এসে দাঁড়িয়েছে, হুঁস ছিলনা। "এই যে মাণিকলাল, এসো এসো, তোমার কথাই ভাবছিলুম। বড় বিপদ, যত ইভ্যাকুই-ট্রেণ কি এই District-এই ভ্যাকুয়ম-ব্রেক্ কসবে ? সাহেবের আবার বেজায় emergency চেগেছে—

মাণিক বললে—"আজ্ঞে আমি যে শুনলুম "বাত।"

"শুনেছ ঠিক, সেটা হিন্দি-"বাত" ছাড়া আর কিছুই নয়, বড়রা সত্য কথা কন কিনা পরে বুঝবে।"

বিনোদ কথা কবার লোক পেলে ভাল থাকে।

ভিন্ন লোকের ভিন্ন চিন্তা। মাণিকলালের সঙ্গে ওষুধ ভরা প্যাকিং কেস্। যে বললে, "আজ্ঞে সে সব পরে বুঝিয়ে দেবেন। এখন সে মহাবিপদ—"

"তোমারো নাকি ?"

"আজ্ঞে হাঁ, আসল জিনিষেরই অভাব সোডিয়ম ক্লোরাইড বড় কম দিয়েছে, অথচ যে কাজে আসা, ওইটাই যে কলেরা কেস মাত্রেই দরকার।"

বিনোদ বিরক্ত ভাবে বললে—"কে বল্লে ? সরকারের বিপদটা বুঝি রোগের মধ্যে নয়,—সেটা ভাববার দরকার নেই ? সেইটাই প্রধান বলে মনে রেখ। আর মনে রেখ—কেষ্টা, বেষ্টা, ভুতো, ভুলো, ধুলো পেলেই সারবে না হয় সরবে। মালিকের বিপদের সময়ে, কার্পাণ্যই বৈধ পন্থা। যেটা কম দিয়েছে সেটা কম দিলেই হবে—recent circular গুলো দেখনা বুঝি।"

"তাতে লোক বাঁচবে কি sir। আপনার যে বদনাম হবে—"

"কতদিন কাজে ঢুকেছ ? ওসব কি সত্যি সত্যি ঐ গরীব হতভাগাদের জন্যে নাকি ? ও সব করতে হয়। দেখনি যার ঘরে আগুন লাগে, তার ঘর বাঁচাবার আশা থাকলেও পুড়তে দিতে হয়, না হয় আগে ভেঙে ফেলে দিতে হয়, আসে পাশে না আঁচ পৌঁছায়। নিয়ম ঠিক আছে, কোথাও গলদ নেই। আমাদের কাজ বটে বাঁচানো, তার মানে তাদের, দুঃখ দৈন্য কষ্ট থেকে বাঁচানো—তারা মলেই বাঁচে—বুঝেছ ? হিঁদুর ছেলে শাস্ত্র মানতো, তিনি বলেছেন—যদ জীবতি তন্মরণম্। ওদের মারতে পারলেই পুণ্য আছে, সেটা অলিখিত কথা, বুঝে নিতে হয়। আর বদনামের কথা বলছ ! সেটা তো আমাদের হাত নয়, বদনাম বাঁচাবার উপায় আছে কি ? আমরা ছাই ফেলবার broken soup—ভাঙা কুলো হে ! বড়দের গলদের বলদ আমরা, তাঁদের খোসনাম নেবার উপায়।—বাঁচালেই তাঁরা বাঁচান, মলেই—আমরা মেরেছি। তাঁদের চিরদিনই open door—পথ খোলসা—

মাণিকলাল বললে—"তাহলে যে মশাই—"

"হ্যাঁ—তাই। যাও, এখন শুওর থাকবার মত একটা বেশ দুয়োর জানলা ভাঙা বাসা খুঁজে বার করো গিয়ে। চার মাস তো আর এই ঠাণ্ডায় এই প্ল্যাটফর্মে চলবে না। বড় বড়দের করমের বালাই নেই, বাড়িতে লেপের মধ্যে গরম থাকবেন। যাও এখন বাজারটা তো করা চাই, পেট্‌টাতো সঙ্গেই এসেছে, ঐ হারামজাদার জন্যে কোথাও আরাম নেই। যাও আর দাঁড়িও না, তোমার অনেক কাজ—যাও।"

ঠিকানায় পৌঁছে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে এই সব কথা। মাণিকলাল অবাক। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।—বলছেন অনেক কাজ, কিন্তু কাজের কথা তা একটাও শুনলুম না। যাই বাজারেই যাই ; বাসা ঠিক করাও হবে। কিন্তু বাসার যা বর্ণনা দিলেন,—দেখাই যাক্—"

Medicine boxটা গুদোম বাবুর জিম্মায় রেখে মাণিক বেরিয়ে পড়লো। যে বাসার ফরমাজ হয়েছে সে তো আর এদেশে খুঁজতে হয় না। সহজেই মিলে গেল। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়ে দিলে তিনিও বললেন—"ও: খুব হবে, খুব হবে। অর্থাৎ সে দিকে তাঁর মনই ছিলনা মন অন্যত্র ঘুরছে। কেবল অভ্যাসমত একটু হাসি টেনে বললেন—"ভুস করে দিল্লী এসে গেলুম নাকি। বেগমদের toilet house নয়তো, বড় বড় mouse বেড়াচ্ছে যে ?"

মাণিকলাল একটু কিন্তু হয়ে বললে—"আপনি যেমন বললেন Sir, বলেন তো—"

"না না, ওইতেই বেশ হবে। এখন বাজারটা—"

"আজ্ঞে এই চললুম।"

মাণিকলাল চলে গেল।

"কার জন্যেই বা বাসা, কিসেরি বা বাসা, আর কেনই বা বাসা"—বিনোদ অন্যমনস্ক। "ও-সব ভুলে যাচ্ছি—Telegram করতে হবে যে। বিনোদ ষ্টেশনে ছুটল। পিসির Presence urgently required, অবস্থা very serious, must avail first train.

"পিসি এলে আর ভয় করি না। তাঁর দাপটে পাড়ায় শেয়াল কুকুর ডাকে না। তিন তিনবার যম এসে ফিরে গেছেন।"

নিশ্চিন্ত হয়ে একবার গ্রাম ঘুরে এলেন।—"গরীবরা জন্মায় কেনো, জন্মায় তো মরে না কেনো ? এদের বাঁচাবার মহাপাপ নেবে কে ? এ কষ্ট দেখার চেয়ে সব সাফ করেই ফেরা ভাল। না ঘরের চাল চুলো, না পেটে একমুঠো দেবার চাল। ভাল ডাক্তারের উচিত এদের শেষ করে দেওয়া। এ দেশে ডাক্তারদের ওই একটি করবার মত পুণ্য কর্ম্ম আছে। দেখা যাক কতটা পারি।" সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসি খেলে গেল। বিনোদ ক্রমশ ধাতে আসছে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে "কি শুভানুধ্যায়ী—শুনিয়ে দিলেন—দেখা শোনা তো আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে হে ! তাতো বটেই, —পিসি এলে একবার দেখো।"

বিনোদের বেগড়ানো মাথাটা নিজের কাঁধে ফিরছে।

* * *

মাণিকলাল ব্রাউন পেপারের একটি বড় থলচে করে বাজার নিয়ে ফিরলো।

"একি, তরকারি আর মাছ এক গোয়ালেই পুরেছ বুঝি ? জাত জন্ম আর—"

"আজ্ঞে ওতে সব নিরামিষই আছে—"

"ও: আমি বলি—আজকাল সব—যাক্"

"আপনাকে বলতে হবে, স্থানটিও তা মেনে চ'লে—বৃন্দাবনের বাবা, বষ্টোম বানিয়ে ছাড়বে।"

"কেন, মাছ পেলেনা বুঝি ?"

"আজ্ঞে তাই বটে। যা আছে তা কেনবারও নয়, খাবারও নয়। তবে দেখবার জিনিষ বটে—ইয়া ইয়া কই, থই থই করছে। আধ হাতের কম একটাও দেখলুম না।"

"তবে ! ওর চেয়ে কি মাছ আছে—ছেড়ে এলে যে বড় ? —তোমাদের বাড়ী কোথা ?"

"আজ্ঞে হুগলি জেলায়।"

"ও—তাই ! ওর মর্ম্ম বুঝবে কি করে। গুগ্‌লিই চেন। আমরা যশোর-ঘেঁসা লোক—কই যেখানে মসুর। যাও ছুটে যাও, ছুটে যাও, অন্তত গোটা চারেক নিয়ে এসো গে—চট্।"

"চারটেতে এক সের হবে, এক টাকা করে সের, আপনি বাজার করতে মোট সাড়ে চার আনা দিয়েছিলেন।"

বিড়িটার আঁচ আঙুলে পৌঁছেছিল। সবেগে ছুঁড়ে ফেলে, হতাশ ভাবে—"কি গ্রহেই পড়েছি, আড়াই টাকা টেলিগ্রামে গেল ! দূর হোক্, কি আনন্দে দেখি।"

"যা পেয়েছি সবই এনেছি—কচু কাঁচকলা, বেতোশাক আর

ডাক্তারের নাম' করায়—একটা মুলোও মিলেছে। দরদস্তুর নেই—এক কথা—সব সত্যবাদী, যা বলবে তাই…"

"ও, বাজার নয়—এজলাস, হাকিমরা বসেছেন! তা বুঝলুম, কিন্তু বুঝতে যে পারছি না ও চতুর্বর্গ মিলিয়ে, গুষ্টীর মাথা ছাড়া আর কোন মেওয়া দাঁড়ায়! পেটে কিন্তু Great Hunger, কিছু না খেলে নয়। সাহেব বলেছেন "জলটা গরম করে খেও।" শেষ সেই ঋষিবাক্যই ভাগ্যে ফলবে দেখছি!—"

"যাও দু'পয়সার মুড়িই নিয়ে এস; চুলো জ্বেলে আর কাজ নেই। ঐ মুলোটি সম্বলে দু'গাল মুড়ি মেরে কম্বল মুড়ি দেওয়া।"

মাণিক বললে—"তাই যদি ব্যবস্থা হয় তো আর এক আনা দিন! মুড়ির সের দশ আনার কম নয়!"

"Emergency,"—নাও, এক আনাই নাও। ফতুর হ'তে আসাই গেছে, 'ফেরার্' না হতে হয়,—যাও!"

মাণিকলাল ব্রাউন পেপারের খলচে খালি করে নিচ্ছিল—

"ওটা কি?"

"আজ্ঞে খলচেটা নিচ্ছি—মুড়ি আনতে হবে।"

"দেখচি কোনো খবরই রাখ না। কেবল ম্যাগ্‌সালফই মুখস্ত করেছ। আজকাল ওটা খলচে নয়—'কলচে'। কাগজের মন্বন্তর। তালপাতায় তাল সামলাবার দিন এসেছে। লুকিয়ে ফেল—লুকিয়ে ফেল। অনেক শ্রীমান মুকিয়ে আছে, দৃষ্টি পড়লেই শ্রীঘর! বুঝলে? Very strict order."

"তবে মুড়ি আসবে কিসে Sir?"

"কেন—কাপড়ে"

"আজ্ঞে half-pantএর তো কোঁচা নেই!"

"তাই তো, ভাবালে যে। আমার হ্যাট্‌টাই নিয়ে যাও, ওতে তেলও পাবে, সে খরচটা বেঁচে যাবে।"

মাণিকলাল হ্যাটটি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"লোকটা দেখছি নীরস নয়, কাটবে ভাল। কিন্তু পিসি না আসা পর্য্যন্ত মগজটা থিতুচ্ছে না, স্থির হয়ে কিছু ভাবতে পারছি না। ও কই মাছ খেতেই হবে…"

বিনোদ বিড়ি ধরালে।

মাণিকলাল এসে গেল।

"আঃ বাঁচলুম, পেট বাপান্ত করছে!"

"কিন্তু যা পেয়েছি মশাই, তা হ্যাটের গহ্বরে ডুব মেরে যেন কবরে শুয়ে আছে।"

"সে জন্যে ভেবনা মাণিকলাল, ওর কারণ আছে, খেতে খেতে বলব। এখন মুড়ি নিয়ে এস।"

মাণিকলাল খবরের কাগজ পেতে মুড়িগুলো ঢেলে ফেললে। নাঃ নিতান্ত কম নয়, আমি ভয় পাচ্ছিলুম।

ডাক্তার হাসি মুখে বললে—"বলেছিত ওর secret আছে, খেতে খেতে হবে। কই মুলো কই?"

"আজ্ঞে এই যে—"

উভয়ে মূলো সংযোগে মুড়ি চর্ব্বণে মন দিলেন। ডাক্তার আরম্ভ করলেন—"সব অদৃষ্ট হে—অদৃষ্ট মাণিকলাল। হ্যাটের হাঁড়োল দেখে বুঝছনা, মাথাটি মিলেছিল রাজা রামমোহনের মত —কিন্তু ভাগ্যটি মিলেছে খাজা ড্যামমোহনের মত·· বুঝলে। তাই মুড়ি ভাগ্যই প্রবল—"

মুখটা বিকৃত করে—"ইস্ তাইতো—দু'দিন যে সে কাজ হয় নি—"

"কি কাজ মশাই বলুন না—আমার দ্বারা—"

বিনোদ সহাস্যে—"সে স্বয়ং ছাড়া ভগবানের দ্বারাও হয় না। ঐখানেই তিনি অসম্পূর্ণ—সর্ব্বশক্তিমানের কলঙ্ক হে। ইস্ পেটটা যে,—দু'দিন খাওয়া নেই, ওটা থাকে কি করে!"

"আজ্ঞে তা থাকে, যেমন ঘরে চাল না থাকলে খিদে থাকে, বরং বাড়ে—"

"ঠিক বলেছ মাণিকলাল, সত্যিই বাড়ে—কিন্তু কোথায় যাই বল দেখি—"

আজ্ঞে আপনি যাদের মত বাসা দেখতে বলেছিলেন, তারা তো ও বালাই রাখে না। ভাববেন না—sidingএ সেদিনকার ঘা-খাওয়া গাড়িখানা এনে রেখেছে, তার 2nd classএ ঢুকে পড়ুন তো, তোফা বন্দোবস্ত আছে—"

"আঃ বাঁচালে মাণিক—many thanks."

* * *

"তাই তো—এখনো যে ডাক্তারবাবু ফেরেন না। কোনো বিপদ ঘট্‌ল না তো। এটা আবার বড় জংসন, চারদিকে লাইন, তায় তার মাথা একদণ্ড চিন্তাশূন্য নয়। এগিয়ে দেখব নাকি!"

এই সময় ডাক্তার—"মাণিক মার দিয়া" বলতে বলতে হাসি-মুখে হাজির।

"আমাকেও 'মার' দিয়েছিলেন মশাই। দেরি দেখে এই বেরুচ্ছিলুম, ভাগ্যিস্ এসে পড়লেন—বাঁচলুম! যে রকম রেল পাতা, দেখলে মাথার ঠিক থাকে না, কোন্‌টা দিয়ে কখন বোঁ করে',—যাক্—মা রক্ষা করেছেন।"

"সত্যিই করেছেন! জলের কথাটা বলে' দিতে হয়। ভগীরথ শাঁখ বাজিয়ে পানি এনেছিলেন, আমি মাথা খুঁড়েও পাইনা। গামছা রাখবার একটা সুবিধে খুঁজতে গিয়ে শেষ পাহাড়ী ঝরণা খল খল করে' হেসে, নাইয়ে দিলে—বাঁচলুম! সাধে কি ব্রাহ্মণে গামছা কাঁধে না করে বেরুতেন না।"

"আশ্চর্য্য, ট্রেণে দেশে বিদেশে ঘুরছেন, কলের কায়দা জানতেন না।"

"ভেবেছ বুঝি ভারতে মহাত্মা ঐ একটি। বরাবর 3rd classএই যাতায়াত যে। কলই ওদের বল—কিন্তু আমাদের দিশী ঋষিরা বুঝেছিলেন—সর্ব্বম্ আত্মবশম্ সুখম। নাও এখন সতরঞ্চিখানা পেতে ফেল, একটু গড়িয়ে নাও। মুলোর দৌলতে আজ তো আর চুলোর ব্যবস্থা নেই।"

"আপনি শুয়ে পড়ুন, আমার এখন অনেক কাজ, রাতে শোবার ব্যবস্থা করাও তো আছে। আমি লম্বা মানুষ এ ঘরে আমার আধখানার বেশী কুলয় না। তার উপায়ও ভাবতে হবে।"

"আমি আর ভাবতে পারি না, সকালে আমার বহুৎ কাজ। তার ওপরই সব নির্ভর করছে।"

"সেতো বটেই, যে কাজে আসা, তার চিন্তা আগে, সে সম্বন্ধে এখনো—"

"থাক মাণিকলাল—তার জন্যে তো"…

"যে আজ্ঞে,—কাল কিন্তু…

"হাঁ,সেই ভালো,মাথাটা আগে ঠাণ্ডা হতে দাও।" (ক্রমশঃ)

আমাদের সিন্ধু পর্য্যটন

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারপর চার মাস বিশ্রামের পর ২৪শে এপ্রিল নিজের কাজে যোগদান করলাম। এদিকে পুলিশ ডাকাতদের খোঁজ পেয়ে (বেলুচিস্থানের) কালাত রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষকে ওদের বৃটিশ পুলিশের হাতে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন কালাতের পুলিশ ভারি এক মজা করে তাদের ধরে। প্রথমে ঐ দেশীয় কতকগুলি লোককে চুপিচুপি তাদের বাসস্থানের খোঁজ নিতে বলা হয়। পরে তাদের শিখিয়ে দেওয়া হলো, তারা গিয়ে বলবে, যে তারাও একদল ডাকাত। কালাতের নবাব তাদের নিশ্চিন্তে বাস করতে দিচ্ছে না, তাই তাকে শিক্ষা দেবার জন্য তারা ওদের দলে মিশে দল ভারি করতে চায়। আর তারা বন্দুক ব্যবহার করতে জানে না, ঐটা শেখাই তাদের বিশেষ প্রয়োজন। তাতে ওরা রাজি হয়ে গেল।

বেলুচিস্থান অঞ্চলে বন্দুক রাখার জন্য লাইসেন্স লাগে না। তারা ইচ্ছামত কার্টিজ বন্দুক তৈয়ারি করতে পারে, রাখতেও পারে। পরের দিন সকালে তারা ওদের কাছেই থাকবে বলে চলে এলো। এদের একজনের কাছে মাত্র একটী বাঁশী (whistle) লুকান ছিল। ডাকাতদের কাছে যতগুলি কার্টিজ তৈয়ারি ছিল, তারা তাদের শেখাবার জন্য খরচ করে ফেলতে দ্বিধা করে নি, কারণ তারা জানতো যে খানিকবাদেই আবার তৈয়ারি করে নিতে পারবে। তারা যখন ওখানে আসে, তখন সঙ্গে তাদের অনেক বন্দুকধারী সৈন্য পাহাড়ের আশে পাশে লুকিয়ে ছিল। যখন তারা বুঝতে পারল যে আর একটী কার্টিজও তাদের হাতে নাই, তখনই বাঁশী বাজিয়ে ঐ সৈন্যদের ইসারা করলে আসবার জন্য। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হলো। এদের মধ্যে একজনের কাছে একটী মাত্র কার্টিজ ছিল, সে কিছুতেই ধরা দেবে না, তাই তাকে গুলী করে মারা হলো। বাকি সকলেই নিরুপায় হয়ে ধরা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাসাতেও যে কয়জন ছিল তাদেরও ধরে ফেলা হলো। আর সেখানে লুঠকরা জিনিষের মধ্যে যা সামান্য কিছু পড়েছিল তাও নিয়ে আসা হলো। তার মধ্যে একটী উটও পাওয়া গিয়েছিল। উটের মালিকেরা কিন্তু তাদের উটগুলি যখন এরা নিয়ে পালাচ্ছিল তখনই কোরাণের শপথ দিয়ে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করতে করতে অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়েছিলো। তাতে ডাকাতেরা বলে যে জামালখান গ্রামে তারা আছে, ওরা পরে ওখান থেকে গিয়ে যেন নিয়ে আসে। কিন্তু ভয়ে তারা আর কেউ যায় নি। পুলিশ তাদের নিয়ে গিয়ে কালাত জেলে আপাততঃ আটকে রাখলে।

এবার তাদের সনাক্ত ও বিচারের পালা। তারা ব্রিটিশ প্রজা নয় বলে কিন্তু বৃটিশ কোর্টে বিচারের জন্য পাঠাতে তাদের ভয়ানক আপত্তি হতে লাগলো। তার প্রধান কারণ ছিল যে তাদের তাহলে হত্যাপরাধে বৃটিশ কোর্টে প্রাণদণ্ডের আদেশ হবে। প্রাণদণ্ডের বালাই ওদের দেশে একেবারেই নেই। যারা নরহত্যা করে, তাদেরও সাত বছরের বেশী জেল হয় না।'

ভারত সরকারের একজন গেজেটেড্ অফিসারের হত্যার জন্যই কাউন্সিলে নানান রকম প্রশ্ন করা হতে লাগলো। কাজেই বাধ্য হয়ে একটা মাঝামাঝি রকমের ব্যবস্থা করা হলো। সেইরূপ বিচারকে ওরা বলে "জীর্গা"। তাতে কালাত রাজ্যের তিনজন বড় বড় কর্ম্মচারি এবং বৃটিশ কোর্টের তিনজন বড় বড় কর্ম্মচারির সামনে বিচার হলো। অন্যের বেলায় কালাত রাজ্যেই এটা হওয়া নিয়ম, কিন্তু আমাদের জন্য এটা হলো দাদুতেই। ১৫ই ফেব্রুয়ারি আমরা সেখানে সকলেই আবার সাক্ষী দেবার জন্য গেলাম। ভক্তিব্রতবাবুর বাসাতেই উঠ্লাম। তিনি আমাদের যথেষ্ট আদর যত্ন করেছিলেন। আমরা প্রধান সাক্ষী বলে, পাছে আমাদের কেউ ডাকাতদের পক্ষ থেকে হঠাৎ কোনও ক্ষতি করে, তাই আমরা যে কয়দিন ওখানে ছিলাম, সব সময়েই আমাদের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা থাকতো।

বিচারের দিন ১১টার সময় কোর্টে গিয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে ১৩জন ডাকাতকে হাতে ও পায়ে লোহার শিকল দিয়ে, পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তাদের বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাসি তামাসা করছে। আর তাদের ২০।২৫জন সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তাদের পরণে তখন বেশ পরিষ্কার লংক্লথের ঢিলা পায়জামা, পাঞ্জাবী ও পাগড়ী ছিল। বিচারকেরা সামনের চেয়ারে বোসেছিলেন। আর ২জন "দোভাষী", সাক্ষীরা যা বলছিল টুকে নিচ্ছিলেন। বিচারকদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরাজি না জানায় সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী উর্দ্দুতে নেওয়া হলো। আগে ধনরাজমলদের সাক্ষ্য নেওয়া হলো এবং পরের দিন আমাদের নেওয়া হলো। আমি ইতিপূর্ব্বেই একটা কৃত্রিম হাত তৈয়ারি করিয়েছিলাম এবং সেটা পরেই ছিলাম। যখন আমার সাক্ষীর পালা এলো, আমায় দেখে তো ওরা অবাক হয়ে গেল! প্রথমতঃ আমি বাঁচলাম কি করে, তারপর আমার সেই হাতখানিই বা কি করে ঠিক আছে তাই দেখে। আমাকে সমস্ত ঘটনা বলতে বলা হলো। তারপর ওদের মধ্যে কাউকে চিনতে পাচ্ছি কিনা জিজ্ঞাসা করা হলো। আমি সেই ছোকরা—যে আমায় মেরেছিল, তাকে বেশ চিনতে পারলাম এবং আরও দুইজনকে চিনতে পারলাম। কিন্তু ছোকরার বয়স কম ছিল বোলেই বোধ হয়, ডাকাতরা সকলেই বলতে লাগলো যে "ও ছিল না, তবে আমরা সবাই ছিলাম"। একজন বললে, আমিই তো তোমায় গুলী করেছিলাম। আর একজন বললে যে সে মজুমদার মশাইকে হত্যা করেছে। তারপর একজন হঠাৎ বলে উঠলো "আরে তা না, মুসলমান বোলে"? আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কোর্ট থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে বারণ করে দিলে। একে একে সকলেরই সাক্ষী নেওয়া হয়ে গেল। তাদের বেশ হাসি মুখেই কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের দেশের অনেক লোক কোর্টের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। তারা যাবার সময় সকলের সঙ্গেই হাসি মুখে কথা বলে, তাদের আশ্বাস দিয়ে গেল।

আমরা সেইদিনই কলকাতা রওনা হয়ে এলাম। সশস্ত্র প্রহরী আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল।

অনেক দিন পরে একদিন কাগজে দেখলাম যে তাদের প্রত্যেককেই দোষী সাব্যস্ত করে বিচারকরা ৭ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। সেটার পরিসমাপ্তি বোধ হয় ১৯৪৬ সালের গোড়াতেই ঘটবে।

ডাকাতদের কাছ থেকে কেড়ে আনা জিনিষের মধ্যে সামান্য ২।৪টা জিনিষ, যা আমাদের বলে সনাক্ত করেছিলাম, তা আমাদের কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। অবশ্য সেগুলির কোনটাই ব্যবহার-যোগ্য ছিল না।

সরকারি কাজ করবার সময় আমাদের এরূপ হওয়ায় আমরা কতকটা অক্ষম হয়ে পড়া সত্ত্বেও আমাদের চাকুরী বজায় রইল। আর ক্ষতিপূরণ বাবদ আমাদের দয়া করে সরকার কিছু দিলেন।

বাংলায় হিন্দু আন্দোলন

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

বর্ত্তমানে বাংলার হিন্দুসমাজ নানাভাবে উৎপীড়িত। তাহার স্বাধিকার আজ উপেক্ষিত, তাহার স্থায়সঙ্গত দাবীগুলি আজ বিশেষভাবে আক্রান্ত। তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা উপদ্রুত, রাজনৈতিক অধিকার অপহৃত, ধর্ম্মানুষ্ঠান বিপর্য্যস্ত, শোভাযাত্রার অধিকার সঙ্কুচিত। তাঁহার সংস্কৃতি ও সত্তা ক্ষুণ্ন। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ আজ বাংলায় সংক্রামক হইয়া আছে। বিগত কয়েকবৎসর ধরিয়া বাংলার হিন্দুগণের উপর হিন্দু-নিপীড়নের যে ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে তাহার কাহিনী মর্ম্মন্তুদ।

কিন্তু সর্ব্বশক্তিমানের বিধান এই যে, ক্রন্দনশীল জাতির অস্তিত্ব প্রকৃতি সহ্য করে না, যে পুরুষকার আশ্রয় করে—সেই বাঁচে; শুধু বাঁচে না, সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাই

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এখন যে সঙ্কট চলিতেছে, তাহাতে হিন্দুকে বামহস্তে তরবারি-মুষ্টি ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে বন্ধুর সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে হইবে। কেননা বন্ধুর মুখোস ধারণ করিয়া অনেক গুপ্ত শত্রু হিন্দুর বক্ষবিদারণ করিতে উদ্যত। এক্ষণে বাঙ্গালী হিন্দুর এই পৌরুষের পথ ছাড়া আর বাঁচিবার পথ নাই। বিগত বজবজ, জলপাই-গুড়ি প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত হিন্দুসম্মেলনের উদ্দীপনাময় কার্য্যে প্রমাণিত হয় যে বাংলার হিন্দুরা এই পৌরুষের পথ গ্রহণ করিতে পশ্চাদপদ নহে।

বজবজ হিন্দুমহাসভার উদ্যোগে বিগত ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বজবজে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে এক বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে ২৪ পরগণা জেলা হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বাংলার বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দুই শতাধিক প্রতিনিধি এবং অন্যূন দশ সহস্র হিন্দু নরনারী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, হিন্দু-রাষ্ট্রপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী, মেজর পি, বর্দ্ধন, অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ প্রভৃতিকে এক শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন তোরণের ভিতর দিয়া সভামণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর মেজর পি, বর্দ্ধন এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা হিন্দুর জাতীয় পাতাকা উত্তোলন করেন। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ২৪ পরগণা জেলা হিন্দু মহাসভার সম্পাদক কর্ত্তৃক দেশবাসী ও মহাসভার পক্ষ হইতে সম্মেলনের উদ্বোধক অখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাঁহার তেজোগর্ভ উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, "হিন্দুকে মুখ ফুটিয়া কথা বলিবার সাহস অবলম্বন করিতে হইবে। সমগ্র ভারতে হিন্দুদের মনে যে একটা পরাভবের মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে হিন্দুমহাসভার নেতৃত্বে তাহা দূরীভূত হইবে। ভারতের ত্রিশকোটি হিন্দু যদি সংঘবদ্ধ হয় তাহা হইলে সে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। আর এই ত্রিশকোটি হিন্দুর সমন্বয়ের দ্বারা শুধু ভারতের কল্যাণ নয়, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হইতে পারে।" পাকিস্থান প্রস্তাবটি যে কিরূপ অনিষ্টকর সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি মন্তব্য করেন যে এই অখণ্ড ভারত পাকিস্থানী পরিকল্পনায় দ্বিধা বিভক্ত হইলে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে এবং ফলে ব্রিটিশ শাসন আরও শক্তিশালী হইবে। তিনি তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা আরও বুঝাইয়া দেন যে হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে এবং উহা হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন কামনা করেন।

অতঃপর জেলামহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন "আমার যুবক বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, মহাসভা কংগ্রেসের ন্যায় কি অহিংস অসহযোগ বা আইনঅমান্য প্রভৃতি কোন আন্দোলন করিয়াছে? তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে ঐরূপ আন্দোলনে মহাসভার কোন আস্থা নাই। মহাসভা মনে করে যে ঐরূপ আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নহে। প্রয়োজনীয় সংগঠন কার্য্যের পূর্ব্বে সমস্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করা যাইতে পারে না। তবে হায়দারাবাদে হিন্দুর অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে বা ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইলে মহাসভা এই সকলের প্রতিবাদে সংগ্রাম করিয়াছে।"

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ, বি, এস, মুঞ্জে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ পাকিস্থান, মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলে ও হিন্দুকোডের প্রতিবাদ এবং শ্রমিকদের দাবীর অনুকূলে গৃহীত প্রস্তাবাদির উত্থাপনে ও সমর্থনে আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। ঔপন্যাসিক-নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর হরলাল হালদার, ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্মেলনে যোগদান করেন।

ইহার পর গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়িতে ৭৫ বৎসর বয়স্ক ধর্ম্মবীর ডাঃ বি, এস, মুঞ্জের পৌরহিত্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার একাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে, হিন্দুরাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও প্রায় ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ বিশিষ্ট হিন্দুনেতা বাবা-সাহেব খাপার্দ্দে, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জলপাই-গুড়িতে পৌছিলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ঐদিন বেলা দশটার সময়ে ডাঃ মুঞ্জে ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদকে লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীযুক্ত বি, জি, খাপার্দ্দে হিন্দু মহাসভা পতাকা উত্তোলন করিয়া বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় আর্য্যনাট্য সমাজহলের পার্শ্বস্থিত ময়দানে সুসজ্জিত মণ্ডপে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সম্মেলন আরম্ভ হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত ও মঙ্গলাচরণের পর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া বলেন 'আজ এই সম্মেলন বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমাদের গত অধিবেশনের পর প্রদেশের উপর দিয়া এক শোচনীয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। স্বৈরশাসনই প্রধানতঃ ইহার জন্য দায়ী। দুর্ভিক্ষের পর অখাদ্য ভক্ষণের দরুণ ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়াছে। বস্ত্র ও ঔষধ অভাবে লোকের দুর্দ্দশার সীমা নাই। বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভা অন্যান্য বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সঙ্কটের সময়ে যথাসাধ্য সেবাকার্য্য করিয়াছে। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেশকে এরূপ দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাই বর্ত্তমান অবস্থার প্রধান কারণ। কাজেই জনসাধারণের অপরিহার্য্য প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালিত না হইলে এই সমস্যার যথার্থ সমাধান হইতে পারে না।

হিন্দুমহাসভা এই কয় বৎসরের মধ্যে বিশেষ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দুমহাসভা এই প্রদেশে অন্যান্য সম্প্রদায় ও মুসলমানদের এক বিরাট অংশের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছে। মহাসভা সকল সম্প্রদায়কেই বন্ধুভাবে মিলিত দেখিতে চায়। মহাসভা এই মত পোষণ করেন সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একযোগে, দেশমাতৃকার সেবা করুন। তিনি আরও বলেন, যে পাকিস্থানের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার অবসান ঘটিবে না। গান্ধীজির সমর্থন লাভ করিলেও শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারীর প্রস্তাব বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদিগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। বাংলার কংগ্রেস-সেবীদের এক বিরাট অংশ ইহার প্রতিবাদে দণ্ডায়মান হন। হিন্দুগণ ও মুসলমান সমাজের একটি অংশ ইহার বিরোধিতায় একত্র সম্মিলিত হন।

সম্মিলিত শক্তিবর্গের স্মৃতি হইতে আজ ভার্সাই সন্ধির মধ্যে বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত জগতে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। ভারত রাজকীয় দানস্বরূপে স্বাধীনতা লাভ করিবে না, সে তাহার প্রভুর নিকট হইতে আপনার অধিকার অর্জ্জন করিয়া লইবে। সস্তা ভাবালুতা ও কতকগুলি বুলির উপর নির্ভর করিয়া যেন কেহ ঐক্যের প্রত্যাশা না করেন। যাহাদের লক্ষ্য এক, কেবল তেমন ব্যক্তি ও দলের মধ্যে ঐক্য হওয়া সম্ভব।

রাষ্ট্রপতি ডক্টর মুখোপাধ্যায় অতুলনীয় বাগ্মীতাপূর্ণ উদ্বোধন-বক্তৃতার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন ঘোষ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন
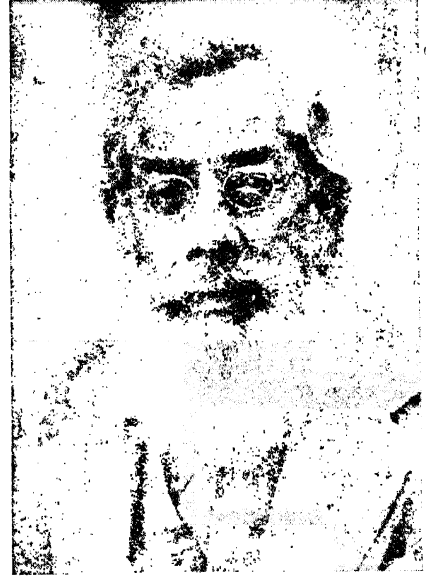
ডাঃ মুঞ্জে

যে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা দ্বারা হিন্দুদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। হিন্দু সংগঠনের সবচেয়ে বড় বিঘ্ন এই জাতিভেদ প্রথা। এই প্রথাকে যথাশক্তি প্রতিরোধ করিয়া জাতিভেদের বৈষম্য পরিহার করিতেই হইবে।

অতঃপর নির্ব্বাচিত সভাপতি ধর্ম্মবীর ডাঃ মুঞ্জে হিন্দু মহাসভার নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদাত্ত কণ্ঠে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। ভারতে আমরা যে রাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাই তাহা হইবে গণভোটের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজ। এই রাজ্য কেবলমাত্র হিন্দুরাজ বা মুসলমানরাজ কিংবা খৃষ্টানরাজ হইবে না। ইহা হইবে ভারতীয় গণরাজ—যে রাজ্যে ভারতের প্রত্যেক জাতি স্বাধীন এবং বাধামুক্ত নাগরিক হইবে। এখানে কোন পক্ষপাতিত্ব অথবা এক ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের অথবা

এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের কোন বিদ্বেষভাব থাকিবে না। বরং সকলেই বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে ও যোগত্যানুসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু উপভোগ করিতে পারিবে। তিনি প্রসঙ্গত: ইহাও বলেন যে স্বাধীনতা ভিক্ষা দ্বারা পাওয়া যায় না; ইহা অর্জ্জন করিতে হয় ও তজ্জন্য মূল্য দিতে হয়। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে তাঁহার গঠনমূলক কর্ম্মপন্থার মধ্য দিয়া স্বাধীনতা আসিবে এবং পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে তাঁহার আস্থা নাই। কিন্তু হিন্দু মহাসভা পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসংগঠিত হিংসাবাদের উপরেই হিন্দু মহাসভার রাজনীতিক মতবাদের মূল ভিত্তি।

সম্মেলনে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, আসামে লাইন প্রথা, পাকিস্থান, হিন্দুকোড, সত্যার্থ প্রকাশের অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতির প্রতিবাদ, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, রাজনৈতিক কর্ম্মসূচী গ্রহণ প্রভৃতি নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাবাসাহেব খাপার্দ্দে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. সি. দীমান, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "আমাদের রাজনীতি বুর্জ্জোয়া রাজনীতি নহে। আমরা চাই প্রকৃত স্বরাজ—দরিদ্র, অত্যাচারিত ও পদদলিত জনগণের স্বরাজ।" ডক্টর মুখোপাধ্যায় শেষ দিনের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "হিন্দুজাতি নীচ নহে। হিন্দুধর্ম্ম জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। হিন্দুস্থান হইতে সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হয়।"

এই সকল সম্মেলন ভবিষ্যতের শুভ সূচনা বলিয়া অনুমিত হয়। তাই ইহার গুরুত্বের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

পশ্চিম রণাঙ্গন

পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার প্রচণ্ড অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিম দিকে রাইন নদী ছিল জার্ম্মানীর প্রাকৃতিক প্রহরী। ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা এই রাইন অতিক্রম করিয়াছে। জার্ম্মানীর প্রাণকেন্দ্র রূঢ় এখন প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন। মার্শাল মণ্টগোমারীর সেনা রূঢ়ের উত্তরে রাইন অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব দিকে ওয়েষ্ট-ফেলিয়ার সমতল ভূমিতে অগ্রসর হইতেছে। জেনারল হজের ১ম মার্কিণ আর্ম্মী রূঢ়ের দক্ষিণে রাইন অতিক্রম করিয়া প্যাডারবার্ণ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। মণ্টগোমারীর সেনা এবং এই মার্কিণ বাহিনীর মধ্যে এখন ব্যবধান মাত্র ৫০ মাইল। ইহার অর্থ—মিত্রপক্ষ জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রধান শ্রমশিল্পকেন্দ্র রূঢ়কে পরিবেষ্টিত করিতেছেন।

এক সময়ে রূঢ়ল্যাণ্ডে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের সমাবেশ ছিল; ৬৫০ বর্গমাইল স্থানে ৩৫ লক্ষ শ্রমিক অস্ত্রের কারখানায় ও সহকারী শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করিত। কয়লা হইতে তৈল উৎপাদনের ও জল হইতে শক্তি সঞ্চার করিবার বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল রূঢ়ল্যাণ্ড; এখানকার গ্রেসেন-কার্টেন্ হইতেছে কৃত্রিম পেট্রল উৎপন্ন হইবার প্রধান কেন্দ্র। অবশ্য রূঢ়ল্যাণ্ডের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান জার্ম্মানরা সরাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ক্রপ্‌দের (এসেনে) বিশাল ঢালাইয়ের কারখানা, খনি, রেলপথ ও খাল সরাইয়া ফেলা সম্ভব নয়। তবে মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণে এই অঞ্চলের বহু প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হইয়াছে।

আরও দক্ষিণে জেনারল প্যাটনের নেতৃত্বাধীন ৩য় মার্কিণ আর্ম্মী রাইন অতিক্রম করিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে যেন নদীর তীরবর্ত্তী ফ্রাঙ্কফুর্ট অধিকার করিয়াছিল; এখন তাহারা আরও পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহারা জেনারল হজের সেনাবাহিনীর সহিত যোগ রাখিয়াই আগাইতেছে। সর্ব্বশেষ সংবাদ—১ম ফরাসী আর্ম্মীও ১০ মাইল জায়গায় রাইন নদী অতিক্রম করিয়াছে।

রাইন নদীর পশ্চিম তীরে প্রবলভাবে প্রতিরোধ চালাইয়া শত্রুকে আটকানোই ছিল জার্ম্মানীর রণনীতি। এই নীতি ব্যর্থ হইবার পর ফন্ রেশষ্টেড্ তাঁহার প্রায় সব সৈন্য লইয়া হটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর রাইনের পূর্ব্বতীরে প্রতিরোধ-ব্যূহ রচনা করা আর সম্ভব হয় নাই। শেষ মুহূর্ত্তে কেসারলিংকে ইতালীর রণাঙ্গন হইতে সরাইয়া আনিয়া তাঁহাকে এই অসাধ্য সাধনের ভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পক্ষে এই অসম্ভব দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় নাই। এই অঞ্চলে জার্ম্মান সেনার প্রতিরোধ এখন খুবই দুর্ব্বল। এল্‌ব্ নদীর পশ্চিমে জার্ম্মান সেনা আর প্রবল প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না; এল্‌বের তীরেই হয়ত বার্লিন রক্ষার জন্য জার্ম্মান সেনাবাহিনী শেষবার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে সচেষ্ট হইবে।

পূর্ব্ব রণাঙ্গন

সোজা বার্লিন অভিমুখী অভিযান এখনও লালফৌজ আরম্ভ করে নাই; কুয়েষ্ট্রিনের কাছে মার্শাল জুকভের সৈন্যের ওডর অতিক্রম করিবার কথা এখনও সমর্থিত হয় নাই। এই সময়ে বাল্টিকের তীরে লালফৌজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ওডরের মোহনা হইতে পূর্ব্ব দিকে কোল্‌বার্গ, ষ্টল্‌প্, ডিনিয়া ও ড্যান্‌জিগ্ এখন লালফৌজের অধিকারভুক্ত। পূর্ব্ব প্রুসিয়ার রাজধানী কনিস্‌বার্গে জার্ম্মানদের প্রতিরোধ চূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই।

এখন লালফৌজের প্রচণ্ড অভিযান চলিতেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। মার্শাল্ তল্‌বুখিন্ ও মার্শাল ম্যালিগোভস্কির সেনা এখন দানিয়ুবের উত্তর হইতে বালাতান্ হ্রদের দক্ষিণ পর্য্যন্ত ২৫০ মাইল রণক্ষেত্র প্রচণ্ড বেগে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে। লালফৌজ অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভিয়ানা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়ার উত্তরে মার্শাল কনিয়েভ ও পিট্রভের আক্রমণ চলিতেছে। বল্‌কান্ ও ইতালীর সহিত জার্ম্মানীর প্রধান সংযোগসূত্রগুলিই হইতেছে লালফৌজের আশু লক্ষ্য। তাহাদের দূরবর্ত্তী লক্ষ্য হইতেছে, শ্রমশিল্পপ্রধান উত্তর-পূর্ব্ব চেকোস্লোভাকিয়া।

নাৎসী নেতারা দক্ষিণ জার্ম্মানীতে শেষ প্রতিরোধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। উক্ত অঞ্চল বাঁচানো যে আর সম্ভব নয়, ইহা

তাঁহারা বুঝিয়াছেন। জার্ম্মানীর বহু কারখানা পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের নিকটেই চেকোশ্লোভাকিয়ার বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ। এই দুইটি প্রদেশেই কয়লা, লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে সমৃদ্ধ। বোহেমিয়া প্রদেশই বিখ্যাত স্কোডা কারখানা অবস্থিত। বস্তুতঃ সাইলেসিয়া ও রুঢ় হস্তচ্যুত হইবার পরও বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ হাতে থাকিলে জার্ম্মানী শক্তিহীন হইবে না। এই জন্যই চেকোশ্লোভাকিয়া লক্ষ্য করিয়া লালফৌজের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মানীর সমগ্র সামরিক শক্তি চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই লালফৌজের রণনীতি রচিত। সেই রণনীতি অনুসারে লালফৌজ দক্ষিণ জার্ম্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়া বিধ্বস্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এই অঞ্চল বিপর্য্যস্ত হইলে জার্ম্মানী সত্যই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে। বার্লিনের উপকণ্ঠে পৌঁছানো—এমন কি বার্লিনে বিজয় কেতন উড়ানো অপেক্ষাও জার্ম্মানীকে এই ভাবে শক্তিহীন করিবার সামরিক মূল্য অনেক বেশী। যুদ্ধ অবসানের দিন ইহাতেই বেশী নিকটবর্ত্তী হইবে।

সোভিয়েট-তুর্কি সম্বন্ধ

সোভিয়েট রুশিয়া তুরস্কের সহিত তাহার ১৯২৫ সালের চুক্তি বাতিল করিবার নোটিশ দিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার সহিত ঐ চুক্তির সামঞ্জস্য নাই। সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের মুখপত্র ইজভেস্তিয়া মন্তব্য করিয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তুরস্কের সম্বন্ধটা ঠিক আশানুরূপ ছিল না।

১৯২৫ সালের চুক্তির মর্ম্ম এই যে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের কেহ অন্যের বিরুদ্ধে সামরিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না। এই চুক্তি বাতিল করিবার প্রকৃত কারণ সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের কৈফিয়তে খুব স্পষ্ট হয় নাই। তবে, 'ইজভেস্তিয়া' ঠিকই বলিয়াছেন—যুদ্ধের সময় তুর্কি-সোভিয়েট সম্বন্ধটা ঠিক আশানুরূপ ছিল না।

কামাল আতাতুর্ক যখন নবীন তুরস্ককে গঠন করেন, তখন সোভিয়েট রুশিয়াই ছিল যে তুরস্কের একমাত্র মিত্র ও সহায়ক। তাই, কামালের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সৌহার্দ্য। তিনি জানিতেন—সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থন ও সাহায্য না পাইলে সাম্রাজ্যবাদীদের কুচক্র ব্যর্থ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তুরস্কের এই একমাত্র মিত্রকে কামাল কখনও ভোলেন নাই।

১৯৩৮ সালে কামালের মৃত্যুর পরই তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ১৯৩৯ সালে ইউরোপীয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ রুশিয়ার সহিত পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করিয়া তুরস্ক যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিতে চায় নাই। ইউরোপীয় যুদ্ধে শক্তিমানের পক্ষে থাকিয়া তুরস্ক নিজের সুবিধা করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। এই সুবিধাবাদী নীতির জন্যই সে ১৯৩৯ সালে নভেম্বর মাসে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু জার্ম্মানী কর্ত্তৃক উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া সে ঐ চুক্তি পালন করিতে সাহসী হয় নাই। পরে, সে জার্ম্মানীকে লৌহ পরিষ্কারের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রোম্ সরবরাহ করিয়া তাহাকে খুসী করিয়াছে। সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধের প্রথম দিকে তুরস্কে সোভিয়েট-বিরোধী আন্দোলন বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তুর্কি অধ্যুষিত সোভিয়েট অঞ্চল তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বৃহত্তর তুরস্ক গড়িবার জন্য প্রকাশ্যে সভা ও শোভাযাত্রা হইয়াছিল। এই সময় জার্ম্মান বিমান তুরস্কের ঘাঁটি ব্যবহার করিয়াছে এবং তুরস্কের এলেকাভুক্ত সমুদ্রে জার্ম্মানীর সাবমেরিণ আশ্রয় পাইয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ইনোনুর নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কয়েকখানি জার্ম্মান জাহাজকে দার্দ্দানেলিজ অতিক্রম করিতে দেওয়ায় পররাষ্ট্র-সচিব মেনেমেনজুলু পদচ্যুত হয়।

লালফৌজের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ১৯৪৪ সালে জার্ম্মানীর দৌর্ব্বল্য যখন বিশেষভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন তুরস্ক জার্ম্মানীকে ক্রোম্ সরবরাহ বন্ধ করে। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে সে জার্ম্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। য়াল্টা সম্মেলনের পর শান্তি বৈঠকে বসিবার আশায় জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণাও করিয়াছে।

তুরস্ক সোভিয়েট-রুশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র। অধুনা আবিষ্কৃত মারণাস্ত্রের সাহায্যে তুরস্ক হইতে সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষতি করা যায়। ইহা ছাড়া তুরস্ক হইতেছে দার্দ্দানেলিজ প্রণালীর রক্ষক। এই তুরস্ক সম্বন্ধে সোভিয়েট-রুশিয়া উদাসীন থাকিতে পারে না। ইহার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে তাহার নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন। ইহার দ্বারা যে সোভিয়েটের নিরাপত্তা ও স্বার্থ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবার পূর্ব্বে ১৯২৫ সালে কামালের তুরস্ককে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বোঝা সে বহিয়া চলিতে পারে না।

ফ্রাঙ্কোর নূতন চাল

সম্প্রতি জেনারল ফ্রাঙ্কো এক নূতন চাল চালিয়াছেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জাপানীরা অত্যাচার করিয়াছে—এই অজুহাতে তিনি জাপানের সহিত বিরোধের ভাণ করিতেছেন। তাঁহার গভর্ণমেন্ট জাপানকে জানাইয়াছে যে, জাপানের সহিত যুদ্ধরত দেশগুলিতে জাপানের স্বার্থ-রক্ষার দায়িত্ব স্পেন আর বহন করিতে পারিবে না। জনরব—স্পেন হয়ত শীঘ্রই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাও করিবে।

এক সময় স্পেনীয়রা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিলেও বর্ত্তমান ফিলিপিনোদের সহিত তাহাদের জাতিগত বা সংস্কৃতিগত কোন যোগ নাই। কাজেই, হঠাৎ ফিলিপিনোদের জন্য জেনারল ফ্রাঙ্কোর দরদ উথলিয়া ওঠা স্বাভাবিক নয়। এই ফ্রাঙ্কোর পক্ষ হইতেই কিছু দিন আগে ফিলিপাইনে জাপানের তাঁবেদার শাসককে অভিনন্দন জানানো হইয়াছিল। প্রকৃত কথা এই—জেনারল ফ্রাঙ্কো এখন আমেরিকার নিকট "ভাল মানুষ" সাজিতে চাহিতেছেন। আটলান্টিকের অপর পার হইতে তাঁহার প্রতি সহানুভূতির বিন্দুমাত্র আভাস পাইলে তিনি স্বদেশেও প্রচার করিতে পারেন যে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি নিঃসঙ্গ নন। বস্তুতঃ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান নিঃসঙ্গতার ফলে নিজ দেশেও ফ্রাঙ্কোর আসন টলিয়া উঠিয়াছে।

এই সময় স্পেনের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। স্পেনের সিংহাসনের দাবীদার প্রিন্স জুয়ান এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে স্পেনে রাজতন্ত্রের অবসান হয় নাই—উহা স্থগিত আছে মাত্র; তাহার পর, গৃহবিবাদে স্পেনের রাজবংশের সকলেই নাকি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। সম্প্রতি স্পেনের নির্ব্বাসিত রিপাব্লিক্যানরা এক বিবৃতি প্রচার করিয়া প্রিন্স জুয়ানের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

১৯৩১ সালের নির্ব্বাচনে যখন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, স্পেনের জনমত রাজতন্ত্রের বিরোধী তখনই রাজা আলফোন্সো রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। জনমতের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশে স্পেনে রাজতন্ত্রের অবসানই হইয়াছে—আলফোন্সো বংশের সৌভাগ্যে উহা "কোল্ড্ ষ্টোরেজে" জিয়ানো নাই। স্পেনের গৃহদ্বন্দ্বের সময় রাজতন্ত্রানুরাগীরা যে ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করিয়াছিলেন, সে কথা চাপা দিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তাঁহাদের তখন আশা ছিল যে, ফ্রাঙ্কো হয়ত স্পেনে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই চাহিবেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লণ্ডনের 'টাইমস্', 'অবজার্ভার' প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকা প্রিন্স জুয়ানের এই বিবৃতিকে "সময়োপযোগী" বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ইহাতে আশঙ্কা হয়—স্পেনের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কোর আসন টলিয়া ওঠায় হতভাগ্য স্পেনীয়দের স্কন্ধে হয়ত রাজতন্ত্র চাপাইবার একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে ভূমধ্যসাগরীয় রাষ্ট্র স্পেনে বামপন্থী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হওয়া স্বাভাবিক নয়। অথচ, হিট্লার ও মুসোলিনির হাতধরা ফ্রাঙ্কো লোকটা যুদ্ধের সময় যে সব কাজ করিয়াছে, তাহাতে ইহাকে স্পেনের গদিতে বসাইয়া রাখা লোকে আর সহ্য করিতেছে না। এই জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হয়ত স্পেনে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দুই দিক বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সুদূর প্রাচী

সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের সব চেয়ে বড় কথা—খাস জাপান লক্ষ্য করিয়া মার্কিণ সেনাবাহিনীর অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে মার্কিণ সেনা খাস জাপান হইতে ৭৫০ মাইল দূরবর্ত্তী আইওজিমায় অবতরণ করিয়াছিল। সম্প্রতি মার্কিণ সেনা ফরমোজা হইতে খাস জাপান পর্য্যন্ত প্রসারিত রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করিয়াছে। তাহাদের অবতরণ ক্ষেত্র হইতেছে এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী বৃহত্তম দ্বীপ ওকিনাওয়া। এখান হইতে খাস জাপানের দূরত্ব মাত্র ৩৫০ মাইল।

জাপানের সমর প্রচেষ্টার প্রধান দৌর্ব্বল্য এই যে, তাহার সমরশিল্প প্রধানতঃ খাস জাপানে অবস্থিত। মাঞ্চুরিয়াতেও তাহার কিছু সমরোপকরণের কারখানা আছে। সমগ্র জাপানী সাম্রাজ্যে সমর-প্রচেষ্টার জন্য খাস জাপানের ও মাঞ্চুরিয়ার সমরোপকরণের উপর জাপানকে নির্ভর করিতে হয়। বলা বাহুল্য—রিউকিউ হইতে মার্কিণ সেনাবাহিনী প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইবে—একদিকে খাস জাপানে এবং অন্যদিকে ফরমোজায়। ইহার পরই তাহারা প্রথমে ফরমোজায় অবতরণ করিবে এবং পরে খাস জাপানে অবতরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। ফরমোজা হইতে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে মাঞ্চুরিয়ার সহিত ইন্দো-চীন, শ্যাম, মালয় প্রভৃতির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। এদিকে খাস জাপানের ঘাঁটী হস্তগত হইলে মাঞ্চুরিয়ার সমরশিল্পকেন্দ্র অতি সত্বর বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে।

মার্কিণ রণনীতির লক্ষ্য এখন চীন ও খাস জাপান। একই সময় দক্ষিণ চীনে ও খাস জাপানে মার্কিণ সেনা অবতরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। জাপান হয়ত মনে করে—খাস জাপানের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে চীনে সে প্রতিরোধ চালাইতে পারিবে; মাঞ্চুরিয়ার সমরশিল্প চীনের জাপানী সেনাবাহিনীকে সমরোপকরণ যোগাইবে। কিন্তু খাস জাপানের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার পর চীনে জাপানের প্রতিরোধ তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। খাস জাপানের ঘাঁটী হইতে মাঞ্চুরিয়ার সমরশিল্প পঙ্গু করা সহজ।

ব্রহ্মদেশে ইঙ্গ-ভারতীয় সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। মান্দালয় তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এই সময় আর একটি সেনাবাহিনী পূর্ব্ব দিক হইতে ঘুরিয়া যাইয়া মিক্‌টিনা অধিকার করে। এই মিক্‌টিনায় ৮টি ভাল বিমান ঘাঁটী মিত্রপক্ষের হাতে আসিয়াছে। ওদিকে চীনা সৈন্য কর্ত্তৃক লাশিও পূর্ব্বেই অধিকৃত হইয়াছিল। এখন মান্দালয় ও লাশিওর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে মিত্রপক্ষ একরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইঙ্গ-ভারতীয় সেনা মান্দালয় অধিকারের পর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া কীয়াউক্‌সে অধিকার করিয়াছে। মিক্‌টিলার সহযোদ্ধৃগণের সহিত তাহাদের মিলিত হইতে আর দেরী নাই।

মিত্রপক্ষ এখন উত্তর ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলা যাইতে পারে। এখন তাঁহাদের অভিযান চলিবে দক্ষিণ ব্রহ্মে। তবে, দক্ষিণ ব্রহ্মে কেবল স্থলপথেই অভিযান চলিবে না—সমুদ্রপথেও মিত্রপক্ষের সেনা দক্ষিণ ব্রহ্মে অবতরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। এই অঞ্চলের সমুদ্রে যে শক্তিশালী বৃটিশ নৌবহর আসিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ ব্রহ্মে অভিযানের জন্য উহা ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা। (১।৪।৪৫)

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন অর্থনীতি

একে ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, তাহার উপর পরাধীনতার অভিশাপে তাহাকে বাধ্য হইয়া শ্বেতহস্তী পোষণের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে হয় বলিয়া এদেশের সরকারী তহবিলে প্রায়ই ঘাটতী হইয়া থাকে। জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে যে ভারত সরকারের দায়িত্ব আছে, এদেশের অর্থসদস্যের বাজেটে তাহার উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয়ই কোনদিন পাওয়া যায় না। সাধারণ সময়ে তবুও জোড়াতালি দিয়া সরকারী অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষিত হইত, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রবল ঘূর্ণীপাকে সেই স্বার্থপর শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থাটুকুও ভাসিয়া গিয়াছে। এখন যুদ্ধের বিপুল ব্যয় মিটাইতে বাজেটে বৎসরের পর বৎসর যে পর্ব্বতপ্রমাণ ঘাটতী দেখা যাইতেছে তাহার বিপরীতদিকে বেসরকারী অপব্যয়ের চূড়ান্ত নিদর্শনসমূহ অতিসাধারণ এবং অনবধানী ব্যক্তির দৃষ্টিতেও ধরা না পড়িয়া পারে না। বেসামরিক খাতে সরকারী ব্যয়ের যত বাহুল্যই হউক, সেই ব্যয় যদি সদুদ্দেশ্যে হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে ভদ্রতায় বাধে। কিন্তু যখনই এই ব্যয়বাহুল্য অপব্যয়খাতে যাইয়া পড়ে, তখনই অধিকার থাকিলে যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষেই তাহার প্রতিবাদ করা স্বাভাবিক। কয়েকদিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয় দলের পক্ষ হইতে মিষ্টার জিওফ্রে টাইসন কেন্দ্রী-ব্যবস্থা-পরিষদে ভারত সরকারের বেসামরিক বিভাগসমূহের ব্যয়নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কিত যে ছাঁটাই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, সরকারী বিধিব্যবস্থার নিন্দাসূচক হইলেও সেই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। ভারত সরকারের অর্থ-সদস্য এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রদর্শন করিতে যাইয়া কার্য্যতঃ যুদ্ধোত্তর স্বাচ্ছল্য-সম্ভাবনার কথাই বলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরে অনিশ্চিত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার এই আশাবাদী মনোভাব অধিকাংশ সদস্যই সমর্থন করিতে পারেন নাই। তদ্ভিন্ন বেসামরিক বিভাগে সরকারী অর্থ অপব্যয়িত হইবার অভিযোগ আসিয়াছে বলিয়াই যে বাজেটে সামরিক বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় সর্ব্বদা যুক্তিযুক্ত পথ গ্রহণ করা হইতেছে এমন কথাও ধরিয়া লওয়া যায় না। আমাদিগের মনে হয়, যুদ্ধের মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সামরিক প্রয়োজনের নামে অর্থ-সদস্য যে ভাবে এই কয় বৎসর ভারত সরকারের রাজকোষ ব্যবহার

করিয়াছেন, তাহা অতি অল্পক্ষেত্রেই সমর্থনযোগ্য। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হইবার অজুহাতে অর্থসদস্য ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের চূড়ান্ত বাজেটে দু'মাসের হিসাবে উক্ত বৎসরের সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা ৯৬ কোটি টাকা অধিক ব্যয় দেখাইয়াছেন, অথচ বর্ত্তমানে ভরিত সীমান্ত হইতে যুদ্ধ বহুদূরে সরিয়া যাইলেও ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের বাজেটে সামরিক ব্যয় ৪শত কোটি টাকা ধরিতে তাঁহার সঙ্কোচ হয় নাই। ভারত-সীমান্ত বিপন্ন হইবার সময় ভারতের যে দায়িত্বই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে জাপানীদিগের কবল হইতে ব্রহ্ম, মালয়, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি উদ্ধার করিবার জন্য ভারতকে ব্যয়ভার বহনে বাধ্য করা অত্যন্ত অযৌক্তিক বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতের উপর যে কোন আর্থিক ভার চাপাইবার পূর্ব্বে এদেশের অর্থনীতিক দুরবস্থার কথাও বিবেচনা করা উচিত এবং সেদিক হইতে বেসামরিক বিভাগের অপব্যয় যেমন ভোটের জোরে বন্ধ করা হইতেছে, সামরিক বিভাগের অপব্যয় সেইরূপ অর্থসদস্য নিজের বিবেচনায় বন্ধ করিবেন, ইহাই আমরা তাঁহার নিকট আশা করিয়া থাকি। বাজেটের ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতী বহুলাংশে ঋণসংগ্রহ করিয়া পূরণ করা হইতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় ফাঁপা বাজারে যে ঋণ সংগৃহীত হইল, তাহা যুদ্ধের পরে নরম বাজারে যে পরিশোধ করিতে হইবে, ইহাও অর্থ-সদস্যের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক বাজেট উপস্থিত করিবার সময় অর্থসদস্য সার জেরেমী রেইসম্যান বাজেটের ঘাটতি পূরণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ভারত সরকার ঋণ-সংগ্রহই ব্যয়নির্ব্বাহের প্রধান পথ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং জনসাধারণের সকল শ্রেণীই যাহাতে সরকারের এই ঋণসংগ্রহনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে, তজ্জন্য সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, অভাবের সময় নিরুপায় হইয়া ভারতসরকার যে ঋণসংগ্রহে বাধ্য হইতেছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া লাভ নাই; কিন্তু বাজেট অধিবেশনে সরকারী অর্থনীতি সম্পর্কে যে সকল সমালোচনা হইয়াছে তাহা হইতে সত্যই এমন কোন ধারণা জন্মায় না যে, ভারত সরকারের সমস্ত সংগৃহীত ঋণ ন্যায্য ভাবে ব্যয়িত হইতেছে বা জাতীয় স্বার্থে ন্যস্ত করা হইতেছে। তদ্ভিন্ন ভারতে এই ঋণ সংগ্রহ করিতে ভারত সরকারকে যে সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইতেছে, ঋণ সংগ্রহ করিবার প্রশ্ন না থাকিলে অথবা অল্পতর পরিমাণ ঋণ সংগৃহীত হইলে সেই সুদ হিসাবে কত টাকা বাঁচিয়া যাইত তাহাও ভারতসরকারের বিবেচনার বিষয়, সন্দেহ নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে ভারত সরকারের সাধারণ ঋণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে, ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে সংগৃহীত সরকারী ঋণের পরিমাণ ১২ শত ৫ কোটি টাকা ছিল, ১৯৪৫-৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ২ হাজার ২ শত কোটি টাকার উর্দ্ধে পৌঁছাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই বর্দ্ধিত ঋণের উপর ভারত সরকারকে অন্ততঃ শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ দিতে হইবে এবং সেদিক হইতে তাঁহাদিগের দায়িত্বও নিতান্ত অল্প নহে। ভারতের বিলাতী দেনার যে অংশ এই যুদ্ধের সময় শোধ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকারের অন্তর্দ্দেশীয় ঋণভার সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও সে সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিবাদ করিবার বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু লণ্ডনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অফিসে বর্ত্তমানে যে ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পাহাড় জমিতেছে তাহার জন্য ভারতের অন্তর্দ্দেশীয় ঋণবৃদ্ধির যৌক্তিকতা আমরা খুঁজিয়া পাই না। ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের পরিমাণ এখনই ১৪ শত কোটি টাকার উর্দ্ধে পৌঁছিয়াছে। যত দিন যাইবে এই পাওনার পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং তজ্জন্য ভারতেও জাতীয় ঋণের পরিমাণ স্ফীত হইয়া উঠিবে। এই ষ্টার্লিং পাওনা কবে আদায় হইবে সে সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই; বৃটেনের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা যেরূপ হতাশাজনক, তাহাতে তাহার পক্ষে যুদ্ধের মধ্যে বা যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নহে। তদ্ভিন্ন এপর্য্যন্ত বহু বৃটিশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে বিলম্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই পাওনা ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে ভারত সরকারের ভারতে সংগৃহীত ঋণপরিশোধের কথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকিলেও এদিক হইতে ভারত সরকার যে বৃটিশ সরকারকে বিশেষ তাগিদ দিতেছেন, এমন কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। বিলাতে ষ্টার্লিং পাওনা যতই জমিয়া যাউক, তাহার সুদ হিসাবে ভারত সরকার এমন কিছুই পাইবেন না যে তাঁহাতে ভারতে সংগৃহীত ঋণের সুদ প্রদান করা চলে। অবস্থা এখনই যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির পরিপূরক হিসাবে ভারতের ঋণ সংগ্রহের প্রচেষ্টার ফলে ভারত সরকারকে কেবলমাত্র সুদের হিসাবে বৎসরের অন্ততঃ দেড় কোটি পাউণ্ড বা ২০ কোটি টাকা ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। তদ্ব্যতীত ষ্টার্লিং পাওনার উপর নির্ভর করিয়া যে বিধানে ভারতীয় মুদ্রানীতি পরিচালিত হইতেছে, তাহাও সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ যাহাই হউক না কেন, স্বর্ণের জামিনে নোট ছাপাইবার নীতি কাগজের জামিনে নোট ছাপাইবার নীতি অপেক্ষা অবশ্যই অনেক স্বাস্থ্যকর ও সমর্থনীয়। যুদ্ধের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে এ সম্বন্ধে জনসাধারণ সচেতন হইতেছে না সত্য, কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে কাগজী মুদ্রার সম্ভ্রমহীনতার জন্য ভারতের সাধারণ অর্থব্যবস্থার যদি ভারসাম্য রক্ষিত না হয় এবং ভারতের পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপারে ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে ভারত সরকার সেই সকল সমস্যা কি ভাবে সমাধান করিবেন? ভারত সরকারের অর্থ-বিভাগ বর্ত্তমান সঙ্কট লইয়াই ব্যস্ত, ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমাদিগের সতর্কবাণী তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইবে কি?

বাঙ্গালার বস্ত্রসঙ্কট

প্রাচ্যযুদ্ধের পট-ভূমিকারূপে কার্য্যতঃ বাঙ্গালাদেশ ব্যবহৃত হইতেছে এবং রণাঙ্গনের সম্মুখবর্ত্তী ভূমিভাগ হিসাবে তাহার দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত নাই। যুদ্ধজনিত নানাবিধ অসুবিধা যখন নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমেই বাঙ্গালার অধিবাসিগণ সহ্য করিতেছে, তখন ইহা আশা করা অন্যায় নহে যে, এদেশের শাসকসম্প্রদায় দেশবাসীর সুখসুবিধা বিধানের জন্য তাঁহাদিগের সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগকে যাঁহারা শাসন করেন, তাঁহারা মনে রাখেন না যে দেশবাসীকে পালন করাও তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য এবং এই দায়িত্ববোধের লজ্জাকর অভাববশতঃই যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার সুযোগে আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার ফলেই বাঙ্গালায় ৩০।৩৫ লক্ষ লোকক্ষয়কারী তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছিল এবং সেই দুর্ভিক্ষের পেষণে কেবল যে দলে দলে নিরন্ন প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে এদেশের বহু-শত বৎসরের পুরাতন সামাজিক জীবনেও তুমুল আলোড়ন উঠিয়াছে। এই অন্ন-দুর্ভিক্ষের ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতেই মাত্র এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে পুনরায়—বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে এবং অবস্থা বর্ত্তমানে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, প্রচলিত সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতি জনসাধারণের বিবেচনায় প্রহসনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কাপড়ের অভাব গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত তীব্র; মানুষ সেখানে কবর খুঁড়িয়া পর্য্যন্ত কাপড় সংগ্রহ করিতেছে এবং ভদ্রমহিলার লজ্জা-নিবারণে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা—সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া সংশ্লিষ্ট সকলেই আপনাকে নিরাপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না এবং মানুষের চরম দুঃখ দুর্দ্দশার দিনে ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের পরস্পরের প্রতি দোষারোপের এইরূপ হাস্যকর প্রয়াস আমাদিগকে সত্যই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। গত ৮ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে

বাণিজ্যসদস্য সার আজিজুল হক বাঙ্গালার বস্ত্রাভাব সম্পর্কে বাঙ্গালা সরকারকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন, বরাদ্দ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রদেশ-গুলিতে বস্ত্র পাঠাইয়াই ভারতসরকারের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে এবং বাঙ্গালায় বস্ত্র-বণ্টন ব্যবস্থা সম্পাদনের বা বাঙ্গালা হইতে বস্ত্র-রপ্তানী বন্ধ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাঙ্গালা সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা সরকারের দিক হইতেও এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য সর্ব্ববিধ প্রয়াস দেখা গিয়াছে এবং বাঙ্গালার জন্য বরাদ্দ বস্ত্রের স্বল্পতায় গুরুত্ব আরোপ করিয়াই বাঙ্গালার সচিবরা এই শোচনীয় অবস্থার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতিলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি মীমাংসা কমিটির বৈঠক সম্পর্কে কলিকাতায় আসিয়া সার তেজবাহাদুর সপ্রু ও সার জগদীশপ্রসাদের ন্যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পর্য্যন্ত দেশের এই ভীষণ বিপদের দিনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিবার আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা এই নিদারুণ সঙ্কট হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য বড়লাটকে বাঙ্গালায় বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহারা যথার্থই বলিয়াছেন, দোষ যাঁহারই হউক, সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দের কর্ত্তব্যকর্ম্মে শৈথিল্যের জন্যই যে দেশের এই দুরবস্থা সম্ভব হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারী বস্ত্রের অভাবে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছে না কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে যাঁহারা দোষী প্রমাণিত হউন না তাহাতে তাহাদিগের দুঃখ ঘুচিবে কি? এইভাবে পরস্পরকে দোষারোপ করিয়া সমস্যা সমাধানে ঔদাসীন্য প্রদর্শন এক্ষেত্রে কেবল অন্যায় নহে অপরাধ এবং বড়লাট যদি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিয়া বস্ত্র বণ্টন নীতিতে শৃঙ্খলা বিধানের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেই এ অবস্থায় দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে। বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ঘ বণ্টননীতি পরিচালনায় কিরূপ অক্ষম ও অযোগ্য তাহা গত দুর্ভিক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে, এই দুঃসময়ে পুনরায় তাঁহাদিগের উপর বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার একরূপ ইচ্ছা করিয়াই এই বস্ত্রসঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা প্রয়োজনের তুলনায় বাঙ্গালার জন্য মাথাপিছু ১০ গজ হিসাবে যে বস্ত্র বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অল্প এবং এই ১০ গজের মধ্যে বাঙ্গালার তাঁতে যে তিনগজ বস্ত্র উৎপাদনের হিসাব ধরিয়াছেন, বাঙ্গালার তাঁতে তাহা স্বাভাবিক সময়েই উৎপন্ন হয় কিনা সন্দেহ এবং বর্ত্তমানে সূতার অভাবে তাঁতের উৎপাদন একেবারে কমিয়া যাওয়ায় সেই ৩ গজ হিসাবে বস্ত্র উৎপাদন সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তদ্ব্যতীত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী বাঙ্গালায় যে ৬ কোটি ১০ লক্ষ লোক ধরা হইয়াছে তাহা এই প্রদেশের প্রকৃত লোকসংখ্যা অপেক্ষা প্রায় ৭০ লক্ষ কম। এইভাবে কেন্দ্রী-সরকার মাথাপিছু বস্ত্র বরাদ্দের ব্যাপারেই বাঙ্গালার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন এবং এই অবিচারের পরেও তাঁহারা পুনরায় বাঙ্গালার কুখ্যাত সচিবসঙ্ঘের হস্তে সেই বরাদ্দ সামান্য পরিমাণ বস্ত্র বণ্টন করিবার ভার দিয়াছিলেন বলিয়াই দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে সাধ্যায়ত্ত মূল্যে বস্ত্র সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ঘের স্বজনপ্রীতি সর্ব্বজনবিদিত, যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার বিবেচনা অপেক্ষা তাঁহাদিগের নিকট গদি বজায় রাখিবার মোহ অনেক বড়, সুতরাং এই অবস্থায় তাঁহাদিগের প্রীতিভাজনগণের পক্ষে বস্ত্র বণ্টনের ভারপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চোরাবাজারের যে জুলুম আজ বাঙ্গালায় মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বণ্টনভার লাভের সময় কর্ত্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট কি না বিবেচ্য? যতদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের এই স্বার্থজনিত সম্পর্ক বজায় থাকিবে, ততদিন ব্যবসায়িগণের মুনাফাবৃত্তি বন্ধ হইতে পারে না। চাহিদার তুলনায় জোগান কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিলে স্বচ্ছলতর জনসাধারণের মানসিক দৌর্ব্বল্যের জন্য বাজার হইতে বহুপরিমাণ পণ্য অদৃশ্য হইয়া যায়। গত দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতার পরেও বাঙ্গালায় কর্ত্তৃপক্ষ যে এই বিষয়ে অবহিত হন নাই ইহাও কি তাঁহাদিগের অযোগ্যতার প্রমাণ নহে? বাঙ্গালায় বস্ত্রবরাদ্দ যখনই কম হইয়াছে, তখন হইতেই আসন্ন দুর্দ্দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া সেই বরাদ্দ বস্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বণ্টন করিবার ব্যবস্থা করা কি তাঁহাদিগের উচিত ছিল না? খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে বরাদ্দনীতি প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা সাফল্য দাবী করিয়া থাকেন, অথচ খাদ্যাদি সংগ্রহের সূত্রসমূহ এত জটিল যে খাদ্য বণ্টনে বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন অপেক্ষা বস্ত্র বণ্টনের ব্যাপারে বরাদ্দ নীতি-প্রবর্ত্তন তাঁহাদিগের পক্ষে অনেক সহজ-সাধ্য ছিল। বাঙ্গালা দেশে মাত্র ৩৪টি কাপড়ের কলে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাঁতের কাপড় সূতা সরবরাহ ব্যবস্থা অনুযায়ী সংগ্রহ করাও কিছুই কঠিন নহে, বাহির হইতে আমদানী বস্ত্রও তাঁহাদিগের নিকটেই জমা হইয়া থাকে, সুতরাং এ অবস্থায় বাঙ্গালা সরকার সমস্ত কাপড় সংগ্রহ করিয়া বরাদ্দ ব্যবস্থা অনুযায়ী জনসাধারণকে কাপড় প্রদানের ব্যবস্থা করিলে এই বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ কোনক্রমেই সম্ভব হইত না। বস্ত্র বিক্রয়ে চোরাবাজারের মুনাফা-সুবিধা আছে বলিয়া সম্প্রতি অনেকেই কাপড়ের দোকানের লাইসেন্স পাইবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছে এবং যাহাদিগকে এই লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের সকলেরই যে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা বা সাধুতার প্রমাণ আছে এমন কথা কেহই বলিবেন না। বাঙ্গালা দেশে ৮০ হাজার দোকানের মারফৎ বাঙ্গালা সরকার বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অন্যান্য নানা পণ্যের ন্যায় নিয়ন্ত্রণনীতির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই যে বাজার হইতে বিক্রয়জাত বস্ত্র অদৃশ্য হইয়া গেল ইহারই বা প্রকৃত কারণ কি? ব্যাঙের ছাতার মত চতুর্দ্দিকে এই সব লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের অনেকগুলির অস্তিত্বই যে বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইবে তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু যাহারা এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাদিগের অনেকেই যে বস্ত্রব্যবসায়ের চোরাবাজারী মুনাফাভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া এই পথে আসিয়াছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সে দিন টেক্সটাইল ডিরেক্টরের অফিসে টেক্সটাইল কণ্ট্রোল এডভাইসারী কমিটির যে সভা হয় তাহাতে সভাপতি মিঃ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় স্বীকার করেন, তাঁহার বিশ্বাস, পূর্ব্বে এদেশে এত অধিকসংখ্যক বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিল না এবং বর্ত্তমানে বস্ত্র ব্যবসায়ের অত্যধিক মুনাফায় আকৃষ্ট হইয়াই এত অধিক লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ঘের মুখপাত্র ছিলেন না বলিয়াই হয় তো তাঁহার পক্ষে বলা সম্ভব হইয়াছে যে, বাঙ্গালার বস্ত্র-বণ্টননীতিতে বরাদ্দপ্রথার প্রচলন করিয়া রেশন কার্ডের অনুপাতে বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক এবং ইহাতে অবাঞ্ছিত মুনাফাভোগীদের কোন স্বার্থ যদি ক্ষুণ্ণ হয় তাহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই।

মোট কথা, আমরা সার তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কেন্দ্রীয় সরকারকে বাঙ্গালায় বস্ত্র বণ্টনের দায়িত্ব-গ্রহণের দাবী সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের যদি বাঙ্গালার জন্য বস্ত্র বরাদ্দ করিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে সেই বস্ত্র মুনাফাভোগীদিগের তহবিল বৃদ্ধি করিতেছে, কি প্রকৃত অভাবগ্রস্তদিগের চাহিদা মিটাইতেছে, তাহা দেখাও তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। বড়লাট হস্তক্ষেপ করুন বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবে বাঙ্গালা সরকার বণ্টন ব্যবস্থার দুর্নীতিসমূহ দূরীকরণে সচেষ্ট হউন, তাহাতে আমাদিগের কিছু আসে যায় না; বর্ত্তমান সঙ্কটের দিনে দেশবাসীর ন্যূনতম প্রয়োজনানুযায়ী বস্ত্র সরবরাহ আমরা দাবী করি এবং যে কোন উপায়ে আমাদিগের সেই দাবী পূরণ করা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব। ১।৪।৪৫

শোক সংবাদ

পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী—

খ্যাতনামা অধ্যাপক পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী গত ৪ঠা চৈত্র ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা অপূর্ব মিত্র রোডস্থ বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন ; বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন—বহুদিন কুচবিহার রাজ-কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত পাণ্ডিত্য বর্ত্তমান যুগে ক্রমে বিরল হইতেছে।

কবি গিরিজাকুমার বসু—

খ্যাতনামা কবি গিরিজাকুমার বসু মহাশয় গত ২৮শে মার্চ্চ ৬৩ বৎসর বয়সে হাওড়া বাজেশিবপুরে নিউমোনিয়া রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকারের দৌহিত্র ছিলেন। প্রথম জীবন হইতে কবিতা লিখিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তাহার পত্নী শ্রীমতী তমাললতা বসুও সুকবি। ভারতবর্ষে গিরিজাকুমারের বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—

বঙ্গবাসী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে গত ৩০শে মার্চ্চ বসন্ত রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে চট্টগ্রাম কলেজ, বেথুন কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছাত্র আন্দোলনের নেতা এবং সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। অধ্যাপক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল।

লালা দুনীচাঁদ—

খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও ব্যারিষ্টার লালা দুনীচাঁদ গত ২৬শে মার্চ্চ লাহোরে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১৯ সালে সামরিক আইন প্রয়োগের সময় তিনি প্রথমে নির্ব্বাসিত ও পরে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন ও ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। তিনি বেশ সবল ও সুস্থ অবস্থায় প্রাতভ্রর্মণ করিয়া আসিয়া হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা গিয়াছেন।

সার এ-এফ রহমন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার সার এ-এফ রহমন গত ২৪শে মার্চ্চ জলপাইগুড়ীতে মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পুরাতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং সারাজীবন অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন ও বর্ত্তমানে জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টের প্রাদেশিক নেতা হইয়াছিলেন।

রজনীকান্ত মৈত্র—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, শান্তিপুরনিবাসী পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম-এ, বি-এল, কাব্যসাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের পিতা রজনীকান্ত মৈত্র গত ২৭শে ফাল্গুন ৮৮ বৎসর ৫ মাস বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অল্প বয়সে মাতৃপিতৃহীন হইয়া রজনীবাবু অতি দরিদ্র অবস্থায় জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি পাটের ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থার্জ্জন করেন ও তাহার সদ্ব্যয় করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৫০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দেবোত্তর করিয়া ট্রাষ্ট ডিড্ রেজিষ্টারী করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া পিতামহীর নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীর নামে গঙ্গাতীরে শিবপ্রতিষ্ঠা, গঙ্গাবাসীর জন্য আশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয়, টোল, পাঠশালা, নৃত্য-কালীর পূজার দালান, ইঁদারা প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই 'পল্লীরত্ন' ছিলেন।

লয়ড জর্জ্জ—

গত ২৬শে মার্চ্চ বিখ্যাত বৃটীশ রাজনীতিক আর্ল লয়ড জর্জ্জ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ৫০ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া দেশসেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে মিঃ চার্চ্চিল যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন ১৯১৫ সালের যুদ্ধে মিঃ লয়ড জর্জ্জের তাহাই ছিল। তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে কেহই চিরদিন নেতা থাকেন নাই—১৯২২ সাল হইতে লয়ড জর্জ্জের নেতৃত্বেরও অবসান হইয়াছিল। তাঁহার মত বক্তা ও কূটনৈতিক ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ—

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিমিটেডের অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ৯ই মার্চ্চ ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্রের অসাধারণ সংগঠন শক্তি ছিল। বঙ্গশ্রী কটন মিল প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁহার পরিকল্পনা ও কর্ম্মনিষ্ঠা ছিল। তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পল্লীতে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

নির্ম্মলকুমার সুর—

২৪ পরগণা নৈহাটী নিবাসী খ্যাতনামা কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ নির্ম্মলকুমার সুর সম্প্রতি মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঐ অঞ্চলের সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং স্থানীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলির তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতির স্মৃতি রক্ষায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল।
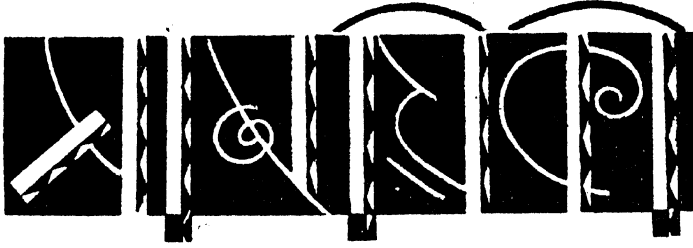
বাঙ্গালায় মন্ত্রী-সমস্যা—

গত ২৮শে মার্চ্চ বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সহসা এক অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। কৃষি মন্ত্রী বাজেটে বরাদ্দ এক ব্যয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে ঐ প্রস্তাব ভোটে দিতে বলা হয় ও ভোটের ফলে সরকার পক্ষ ৯৭-১০৬ ভোটে হারিয়া যায়। মন্ত্রীর প্রস্তাবের পক্ষে ৯৭জন সদস্য ও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১০৬জন সদস্য ভোট দিয়াছিলেন। মোট ১৮জন শ্বেতাঙ্গ সদস্য একযোগে গভর্ণমেণ্ট পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। ঐ দিনই সহসা ২১জন মুসলমান ও তপশীলী সদস্য মন্ত্রীপক্ষ ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগদান করিয়াছিলেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু অসুস্থ শরীর লইয়া সেদিন ষ্ট্রেচারে করিয়া পরিষদ কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মন্ত্রীদল ত্যাগ করিয়া যাঁহারা সেদিন বিরুদ্ধ দলে যোগদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঢাকার নবাব বাহাদুর, আবদুল হামিদ খাঁ, বরাত আলি, সৈয়দ আহমদ খাঁ, মুস্তাক আলি, রাজি-বুদ্দীন তরফদার, দেওয়ান মোস্তাফা আলি, এ-এম-এ-জামান, মসুদ আলি খাঁ পানি, আজহর আলি, খাঁ সাহেব হাসেম আলি খাঁ, গোলাম রব্বানি আহমদ, আমীর আলি মিয়া, গিয়াসুদ্দীন আমেদ চৌধুরী, জিলুর রহমন সা চৌধুরী, ধনঞ্জয় রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস ও কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল ছিলেন। পরদিন ৩০শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে স্পীকার নৌসের আলি ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালার আইন পরিষদে সার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার কোন অস্তিত্ব নাই। যতদিন না নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়, ততদিন পরিষদের কার্য্য চলিতে পারে না। বাজেটের একটি প্রধান দাবীর ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার অর্থই হইতেছে, মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ ও তাহা অনাস্থা প্রস্তাবেরই নামান্তর। কাজেই সেদিন স্পীকার পরিষদের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করিয়া দেন। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ আর-জি-কেসি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে প্রদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বর্ত্তমান অবস্থায় শাসন কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত লোকের অভাব সত্ত্বেও তিনি যথাযথভাবে কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবেন। ৩১শে জানুয়ারী গভর্ণর কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটের সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন এবং ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর ২রা এপ্রিল সোমবার গভর্ণর সরকারী দপ্তরখানায় যাইয়া (বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট) ২ ঘণ্টাকাল সকল ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ও বহু কাগজপত্র নিজে দেখিয়া আসিয়াছেন। ৩রা এপ্রিল মঙ্গলবার তিনি বিরুদ্ধ দলের নেতা মিঃ এ-কে-ফজলল হকের সহিত ৪৫ মিনিটকাল ও কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের সহিত এক ঘণ্টাকাল নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ব্যবস্থা পরিষদে সার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার পতনের সম্ভাবনা পূর্ব্ব হইতেই বুঝা গিয়াছিল। শাসন ব্যবস্থার গলদের জন্য দেশের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মন্ত্রিসভা দরিদ্র জনগণের দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। চাউলের দর কিছুতেই ১৬ টাকা ৪ আনার কম করা হয় নাই—বরং ভাল চাল পৃথক করিয়া তাহা ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় মধ্যবিত্ত লোকদিগকে ১৬।০ মণ দরে অতঃপর মোটা চাউলই খাইতে হইবে। বস্ত্র সমস্যা সম্বন্ধে মন্ত্রিসভা প্রথম হইতে কোন ব্যবস্থা করেন নাই—দেশে চোরাবাজার দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে—কেহই তাহাতে বাধা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। মন্ত্রিদল তাঁহাদের দল রক্ষার জন্য বহু অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সরকারী কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বহু নূতন বিভাগের সৃষ্টি করিয়া নূতন নূতন পদে লোক নিযুক্ত করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। গভর্ণর স্বহস্তে শাসন ভার লইয়া যদি পরিশ্রম করিয়া সকল বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে তদন্ত ও পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে বহু বিষয়ে ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হইবে এবং তদ্দ্বারা শুধু ব্যয় হ্রাস হইবে না, শাসন কার্য্যের গুণও বৃদ্ধি পাইবে। ৯৩ ধারা অধিক দিন বহাল রাখার পক্ষপাতী আমরা নহি, কাজেই সত্বর যাহাতে উহার অবসান ঘটে, সেজন্য গভর্ণরেরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য যদি ব্যবস্থা পরিষদের নূতন সদস্য-নির্ব্বাচনও প্রয়োজন হয়, তাহাতে বাধা না দিয়া গভর্ণরের পক্ষে বরং তাহা করাই সঙ্গত ও সমীচীন হইবে।

বস্ত্রাভাব—

১৯৪৩ সালের মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গালা দেশে যেমন চাউলের অভাব হইয়াছিল, আজ ঠিক তেমনই ভাবে কাপড়ের অভাব দেখা দিয়াছে। সে সময়ে যেমন পয়সা দিয়াও চাউল পাওয়া যাইত না, ৮০ টাকা ১০০ টাকা মণ দিয়া লোক চাউল কিনিতে বাধ্য হইয়াছিল, যাহারা তত অর্থব্যয় করিতে পারে নাই, তাহারা দুই বেলা দিনের পর দিন রুটী খাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, আজ কাপড়ের বেলাও তাহাই হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের মত ধনী ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিও শান্তিপুরে সম্প্রতি পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার সময় টাকা দিয়া কাপড় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই—সে

কথা তিনি সেদিন পরিষদের মধ্যে দাঁড়াইয়াই প্রচার করিয়াছেন। মফঃস্বলে লোক মাতাপিতার মৃত্যুর পর কাছা পরিবার কাপড় সংগ্রহ করিতে পারে না—কাপড়ের অভাবে বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইতেছে—ইহা আজ নিত্যকার ঘটনায় দাঁড়াইয়াছে। দরিদ্র বক্তিরা আর ছেঁড়া কাপড়ও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, মধ্যবিত্তগণের দুর্দ্দশার শেষ নাই। ৪ টাকা মূল্যের সাড়ী ১৬ টাকা মূল্য দিয়া আমাদের সম্মুখেই লোককে সংগ্রহ করিতে দেখিতেছি। কিন্তু কয়জনের সেভাবে কাপড় সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত অর্থবল আছে? কাজেই লোক যে আপন স্ত্রীকন্যার জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু আমাদের শাসকগণ এ কথা বিশ্বাস করিবেন না। বস্ত্রের এই অভাব একদিনে উপস্থিত হয় নাই—বহু দিন হইতে আমরা এই অভাব বোধ করিয়াছিলাম ও বহুদিন হইতে কাপড়ের বাজারে চোরাবাজার চলিতেছিল। কাজেই প্রথম অবস্থা হইতে গভর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যবস্থার প্রতীকারে মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের এই দুরবস্থা উপস্থিত হইত না। বিতাড়িত মন্ত্রীর দল সেদিনও আশ্বাস দিয়াছিলেন যে শীঘ্রই তাঁহারা কাপড়ের রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া সকলকে সমানভাবে বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের কার্য্যকালের আয়ু ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন গভর্ণর ও তাঁহার পরামর্শদাতারা এ বিষয়ে কি করেন, তাহাই দেখিবার বিষয়। গভর্ণর চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন না, এমন কথা আমরা বিশ্বাস করিব না। যুদ্ধের প্রয়োজনে যাঁহারা সর্ব্বদা অসাধ্যসাধন করিতেছেন, দেশের লোকের প্রয়োজনে তাঁহারা কি তাহার কিছুটাও করিবেন না? এখন দেশে ৯৩ ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছে—কাজেই দেশ শাসন ব্যাপারে গভর্ণর সর্ব্বশক্তিমান—কাজেই আমাদের বিশ্বাস, গভর্ণর এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া সত্বর দেশবাসীকে এই দারুণ বস্ত্র-সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বৃটেনে খাদ্য সমস্যা—

যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে বর্ত্তমানে বৃটেনে দারুণ খাদ্যসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে বৃটেনে চাউল যাইত এবং আমেরিকা হইতে দুধ ও মাংস আসিত। গত কয় বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে আর চাউল যায় নাই—কাজেই সকলকে আটার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তাহাও এখন আর পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় না। আমেরিকা হইতে দুধ প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে—মাংস আমেরিকাতেই ক্রমে দুর্লভ হইতেছে, এ অবস্থায় তাহারা বৃটেনে পাঠাইবে কি করিয়া। কাজেই বৃটেন কি করিয়া এই খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিবে, তাহার চিন্তায় বিব্রত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের বাজেট—

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার গভর্ণমেণ্টের ১৯৪৫-৪৬ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব গত ২৪শে মার্চ্চ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ব্যবস্থার জন্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করার পরও তাহাদের লক্ষাধিক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। মজার কথা, যে সকল প্রদেশে গভর্ণর কর্ত্তৃক শাসন-কার্য্য পরিচালিত হয়, সেই সকল প্রদেশে আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়। আর যেখানে মন্ত্রীরা আছেন, সেখানেই অর্থের অভাব। কথাটা শ্রুতিকটু হইলেও ইহা সত্য কথা।

চীনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ—

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় ২৬টি জেলায় শস্য-হানির ফলে ঐ অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে ও সেজন্য প্রায় ২ কোটি লোক বিপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৩ সালেও ঐ অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং বহু লোক ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বেশী দিন চলিলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে ও জগতের লোক-সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইবে।

বোম্বায়ে মহাত্মা গান্ধী—

গত ৩১শে মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধী সেবাগ্রাম হইতে বোম্বায়ে যাইয়া বিরলা গৃহে বাস করিতেছেন। গরমের সময় সেবাগ্রামে ১১০ ডিগ্রী উত্তাপ হয়—সেজন্য চিকিৎসকগণ গান্ধীজিকে গ্রীষ্মের সময় সেবাগ্রামে না থাকিয়া শীতপ্রধান কোন স্থানে বাস করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। গান্ধীজি বোম্বাই হইতে "জাতীয় সপ্তাহে দেশবাসীর কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। ১৯১৯ সালে প্রথম জাতীয় সপ্তাহ পালন আরম্ভ করা হয়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খদ্দরপ্রচার ও স্বরাজ লাভ চেষ্টা—এই তিনটি কর্ত্তব্যে গান্ধীজি সকলকে অবিচলিত থাকিতে বলিয়াছেন। ভারতের সকল লোক যদি কোনদিন সমবেতভাবে এ জন্য চেষ্টা করে, সেদিন আমাদের পক্ষে ঈপ্সিত ফল লাভ করা আদৌ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

পাঞ্জাবে পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ—

পাঞ্জাব ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশগুলিতে ব্যাপক জল সেচন, বন্যা প্রতিরোধ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য এক পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থায় ৫টি বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে—পৃথিবীর কোথাও এত দীর্ঘ বাঁধ নির্ম্মিত হয় নাই। বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে উত্তর ভারতের যে কয়টি বড় বড় নদীর জলের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, এই ৫টি বাঁধ নির্ম্মিত হইলে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি আয়ত্তাধীনে আনা যাইবে। এই বাঁধের ফলে যে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা দ্বারা এত বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে যে—সমগ্র ভারতের শিল্পগত রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

কৃষ্ণনগরে শিক্ষক সম্মিলন—

গত ৩১শে মার্চ্চ নদীয়া কৃষ্ণনগরে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষকগণ সাধারণত কম বেতন পাইতেন, কাজেই বর্ত্তমানে সেই বেতনে আর শিক্ষক পাওয়া যায় না—ফলে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলি অচল হইয়াছে। শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির জন্য সম্মিলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি ও সরকারী সাহায্য বৃদ্ধির দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে।

ভারতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা—

২৯শে মার্চ্চ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে—১৯৩৮ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে ম্যালেরিয়ায় ভারতবর্ষে ৯০ লক্ষ ৭৯ হাজার লোক মারা গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে গড়ে ২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হইত, এখন ৫ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন-জাতীয় ঔষধ ব্যবহার হয়। ১৯৪৪ সালে কত লোক ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়াছে, তাহার হিসাব দেখিলে আরও স্তম্ভিত হইতে হইবে। হয়ত ৫ বৎসরের সংখ্যা একত্র করিলে তাহার সমান হইবে।

বিলাত হইতে লোক আনয়ন—

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব সার ফ্রান্সিস মুডী সহসা বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। প্রকাশ, এদেশের শাসন কার্য্য চালাইবার জন্য বিলাত হইতে লোক আনয়ন করা প্রয়োজন—এখন বিলাতে প্রতিযোগী পরীক্ষা করিয়া লোক আনা সম্ভব নহে। সেজন্য কি ভাবে তথায় চাকরিয়া সংগ্রহ করা যায় সার ফ্রান্সিস তাহার ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন। শুনা যায়, যুদ্ধের জন্য বিলাতেও শাসন কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত লোকের অভাবে তথায় মহিলাদের দ্বারা কাজ চালান হইতেছে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, মেডিকেল সার্ভিস, পুলিস সার্ভিস প্রভৃতির জন্যও শেষে বিলাত হইতে মহিলা আমদানী করা হইবে?

পেশোয়ারে কালীবাড়ী সংস্কার—

পেশোয়ারবাসী খ্যাতনামা ডাক্তার ও প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা কলিকাতায় আসিয়া একটি বিষয়ে বাঙ্গালীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বাহিরের কালীবাড়ীগুলি বাঙ্গালীর সংস্কৃতি রক্ষার স্থান। সে সকল স্থানে শুধু কালী-মাতার পূজার ব্যবস্থা নাই, বাঙ্গালী অতিথি যাইলে তাহার আহার ও বাসস্থান দানের ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া সেগুলি প্রবাসী বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র এবং প্রত্যেক স্থানেই বাঙ্গালা পুস্তকের লাইব্রেরী আছে। বাঙ্গালীদের চেষ্টা ও যত্নে এক সময়ে এই কালীবাড়ীগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সার বি-এন মিত্রের চেষ্টায় সিমলার কালীবাড়ী সম্প্রতি নূতনরূপ ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালীদের চেষ্টার অভাবে জলন্ধর, মমতাজ ও ফিরোজপুরের কালীবাড়ীগুলি এখন অবাঙ্গালীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। পেশোয়ারের কালীবাড়ীটি রক্ষার জন্য এখন অর্থের প্রয়োজন, অথচ তথায় স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা এখন খুবই কম। এ অবস্থায় বাহিরের লোক অর্থ সাহায্য না করিলে পেশোয়ারের কালীবাড়ীটি সংস্কার করিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। ডাক্তার ঘোষ সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তি। বাঙ্গালী সমাজ এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য না করিলে আর কে করিবে? বর্ত্তমানে বহু বাঙ্গালীকে নানা কাজে ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে; তাঁহারা এ বিষয়ে একটু তৎপর হইলে আর পেশোয়ারের কালীবাড়ী রক্ষার অসুবিধা থাকিবে না।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান—

মাতৃভাষায় যাহাতে এদেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, সেজন্য মহাত্মা গান্ধী বহুদিন হইতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। এ বিষয়ে ওয়ার্দ্ধা কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ শ্রীনারায়ণ আগারওয়াল সম্প্রতি যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"শিশুর দেহের পুষ্টির জন্য যেমন মাতৃ-স্তন্যের প্রয়োজন, তেমনই মনের পুষ্টির জন্যও মাতৃভাষার প্রয়োজন। শিশুর মনকে গড়িয়া তোলার জন্য মাতৃভাষাকে বাহন না করিয়া অন্য ভাষা তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া আমি পাপ বলিয়াই মনে করি।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্গত সুধী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় মাতৃভাষা সকল অন্য ভাষার সহিত সমান সম্মানের আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন বলিয়া গৃহীত হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর নিতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যাপক হইলে দেশ তদ্বারা উপকৃত হইবে।

নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যাপীঠে দান—

ঝাড়গ্রামের জমীদার রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব সম্প্রতি নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করিতে যাইলে বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গবিবুধজননী সভা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বিশ্ববিদ্যাপীঠের প্রয়োজনের কথা বিবৃত করায় রাজা বাহাদুর তজ্জন্য ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ সময়ে জমীদার শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরীও বিদ্যাপীঠে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বাঙ্গালায় হিন্দুদের একটি নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন—উহা যাহাতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র নবদ্বীপে স্থাপিত হয়, তজ্জন্য সকলের সাহায্য করা উচিত।

সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান—

বোম্বায়ে গত ৩১শে মার্চ্চ নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনের স্থায়ী কমিটীর যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিতায় পরিচালিত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অভাব এদেশে সর্ব্বদা অনুভূত হইয়া থাকে। জাতীয় সংবাদ প্রচারের সেজন্য অসুবিধা অত্যন্ত অধিক। সভায় ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা করা হইয়াছে। সরকারী আবহাওয়ার বাহিরে যাহাতে সত্বর এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, সেজন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত।

ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি—

সার ফিরোজ খাঁ নুন ও সার রামস্বামী মুদেলিয়ার ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া সানফ্রান্সিসকো সম্মিলনে যাইতেছেন। ঐ ব্যবস্থায় প্রতিবাদ করিয়া গত ১লা এপ্রিল বিলাতের কেম্ব্রিজ সহরে প্রবাসী ভারতীয়গণের এক সভা হইয়া গিয়াছে ও সভায় উপরোক্ত দুই জনের স্থলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে ভারতের প্রতিনিধি করিয়া সানফ্রান্সিসকোতে পাঠাইতে বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দিলীপ সেন বিলাতে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত সুব্রত রায় চৌধুরী ভারতের দাবী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

মেডিকেল শিক্ষা সমস্যা—

গত ৩১শে মার্চ্চ কলিকাতা সহরে ডাঃ মনোহরলাল কাপুরের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মেডিকেল লাইসেন্সিয়েট-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় নিজে ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় দুই প্রকার (স্কুল ও কলেজ) মেডিকেল শিক্ষার প্রথা তুলিয়া দিয়া একপ্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী করিয়াছেন। এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে এদেশে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাস, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

আসামে নূতন মন্ত্রিসভা—

আসামে মন্ত্রিমণ্ডল লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী সার মহম্মদ সাদুল্লা বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বারদলৈ ও শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরীর সহিত আপোষ করিয়া ১০ জন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। নিম্নে ১০ জনের নাম প্রদত্ত হইল—(১) সার মহম্মদ সাদুল্লা প্রধান মন্ত্রী (২) খাঁ বাহাদুর সৈয়দুর রহমন (৩) মিঃ মুনওর আলি (৪) মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী (৫) খাঁ সাহেব মুদাবীর হোসেন চৌধুরী (৬) শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার চৌধুরী (৭) শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (৮) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস (৯) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বড়গোয়াইন (১০) শ্রীযুক্ত রূপনাথ ব্রহ্ম; সকল দলের সম্মিলিত মন্ত্রিসভা আসামে এই প্রথম গঠিত হইল। তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া লোক তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচার করিবে।

বিহার বাজেটে টাকা উদ্বৃত্ত—

বিহার গভর্ণমেন্টের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে দেখা যায় ব্যয় অপেক্ষা আয় ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। অথচ তথায় কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় নাই। যুদ্ধের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি সত্বেও তথায় এই বাড়তি বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই।

বস্ত্র বরাদ্দের অনুরোধ—

গত ৯ই চৈত্র শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাঙ্গালার দরুণ মাথা পিছু ১৮ গজ বস্ত্র বরাদ্দ করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিবার জন্য বাঙ্গালার গভর্ণরকে অনুরোধ করা হউক। বাঙ্গালার এই বস্ত্র সমস্যার দিনে কেহই ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন নাই। ইহাই একমাত্র সুখের কথা। ১৮ গজ কাপড়ও যে একজন মানুষের ১ বৎসরের ব্যবহারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহাও সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহর্ষির তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা—

গত ১৩ই চৈত্র মঙ্গলবার কলিকাতা বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক জমীদার সভা গৃহে উক্ত এসোসিয়েসনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কলিকাতা আর্ট সোসাইটীর পক্ষ হইতে উক্ত চিত্র উপহার দেওয়া হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব সভায় পৌরহিত্য করেন। যে সময়ে মহর্ষি উক্ত এসোসিয়েসনের সম্পাদক, তখন তথায় রাজনীতি চর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। সে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের কথা। মহর্ষির আত্মজীবনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অসাধারণ জীবনকথা অবগত আছেন। তাঁহার কথা এদেশে এখন বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

ডাঃ বি-এন-দে—

ডাঃ বি-এন-দে খ্যাতনামা এঞ্জিনিয়ার, তিনি বিলাতে মিউনিসিপাল এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিয়া তথায় বহুদিন কাজ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ এঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে ১৯৪৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর কর্পোরেশনে তাঁহাকে স্পেশাল অফিসার ও এঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। গভর্ণমেণ্ট এই নিয়োগ সমর্থন না করা সত্বেও কর্পোরেশন ডাঃ দে'কে কাজ করিতে দিয়াছিলেন। সম্প্রতি হাইকোর্টে এক মামলার ফলে ডাঃ দে'কে কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া হাইকোর্ট এক নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, কাজেই ডাঃ দে'র মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর কর্পোরেশনে কাজ করিতে পারিবেন না। এ ব্যাপারে শুধু আমাদের অসহায় অবস্থার কথাই মনে হয়।

গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন—

গত ১৭ই মার্চ্চ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এক অর্ডিনান্স জারি করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কতকগুলি বিভাগের সুপরিচালনার জন্য তাহাদের কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তাহার পর কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের সহিত গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিদের আলোচনার ফলে গত ৯ই চৈত্র কর্পোরেশনের সভায় এক আপোষ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে সরকারী ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় বটে, কিন্তু সরকারী নির্দ্দেশ প্রতিপালনের জন্য কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও চিফ এঞ্জিনিয়ারের উপর ভার দেওয়া হয়। এই আপোষের ফলে গভর্ণমেণ্ট যাহাতে কর্পোরেশনকে তাঁহাদের দেয় সমস্ত অর্থদান করেন, সেজন্যও গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় এইভাবে আপোষ না করা হইলে কলিকাতা সহরের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িত। নূতন ব্যবস্থায় কর্পোরেশনের কার্য্যের উন্নতি সাধিত হইলেই সহরবাসী তাহাতে আনন্দলাভ করিবে। গভর্ণমেণ্ট যে জরুরী অবস্থার সুযোগ লইয়া এইভাবে কর্পোরেশনের স্বাধীনতা হরণ করিতেছেন, তাহা সহ্য করা কোন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্মানজনক নহে।

শিশির কুমার ইনিষ্টিটিউট—

গত ১২ই চৈত্র সোমবার হইতে কয় দিন ধরিয়া বাগবাজার শিশির কুমার ইনিষ্টিটিউটের রজত জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনের সভায় কলিকাতার লর্ড বিশপ সভাপতিত্ব করেন এবং মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কয়দিনের সভাতেই বাঙ্গালা সংবাদপত্র সেবায় ও সাহিত্যে শিশির কুমারের দানের কথা আলোচিত হইয়াছে। ইনিষ্টিটিউটের উৎসব উপলক্ষে দেশবাসী একজন প্রকৃত দেশসেবকের কথাই আলোচনা করিয়াছেন।

জলধর স্মৃতিসংঘ—

রায় বাহাদুর স্বর্গত জলধর সেন মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে কলিকাতা ৩২বি ঘোষ লেনে 'জলধর স্মৃতি সংঘ' নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। জলধর সাহিত্যের আলোচনা করাই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সংঘের বর্ত্তমান বৎসরের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীভবানী সেনগুপ্ত —সভাপতি, শ্রীবলাইলাল চন্দ্র—প্রধান সম্পাদক, শ্রীসত্যকিঙ্কর সেন—সহকারী সম্পাদক ও শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন—কোষাধ্যক্ষ। সংঘের কয়েকটি সভায় জলধর সাহিত্য আলোচিত হইয়াছে।

বিদেশে ভারতীয় সৈন্য—

নয়া দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে এক প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে বিদেশে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহাদের সমগ্র ব্যয় বৃটীশ গভর্ণমেণ্টই বহন করিয়া থাকেন।

কাহারা দায়ী—

মিঃ বেভারলী নিকোলাস 'ভারতবর্ষ' সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়া আমেরিকায় তাহা বিতরণ করিতেছেন। উহাতে ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা অস্বীকার করিয়া ভারতে বৃটীশ শাসনব্যবস্থা স্থায়ী করার চেষ্টা আছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে মিঃ নিকোলাস দিল্লীতে আসিয়া ভারতসরকারের প্রচার বিভাগের এক নামজাদা কর্ম্মচারীর গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুস্তক লিখিবার জন্য ভারত সরকারের দপ্তর হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বোম্বায়ে তিনি তাঁহার পুস্তক ছাপিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রচুর কাগজও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সময়ে এদেশে কাগজের অভাবে স্কুল পাঠ্য পুস্তক ছাপাও কঠিন হইয়াছে, সেই যুগে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য মিঃ নিকোলাসকে কে কাগজ সরবরাহ করিয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন নহে। এই ভাবের কাজ যতদিন চলিবে, ততদিন কি করিয়া বৃটীশ জাতি বা গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর সহানুভূতি লাভ করিবেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র—

সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র সম্প্রতিভারত গভর্ণমেণ্টের এডভোকেট জেনারেলের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বরোদা রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে কলিকাতার এডভোকেট জেনারেল ও বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সদস্য ছিলেন। তাঁহার মত বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ বাঙ্গালীর বাঙ্গালার বাহিরে এই সম্মানজনক পদলাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

কলিকাতায় পুলিসের হানা—

গত ১১ই ও ১২ চৈত্র রবিবার ও সোমবার কলিকাতা পুলিশ সহরে বহু স্থানে হানা দিয়া বহু স্থান হইতে অন্যায় ভাবে রক্ষিত কাপড়ের গাঁট বাহির করিয়াছে। একটি নূতন বাড়ীর ভূগর্ভস্থ ঘর হইতে ৫ লক্ষটাকা মূল্যের সুতা পাওয়া গিয়াছে। যে সকল স্থানে বেআইনি কাপড় পাওয়া গিয়াছে সে সকল গৃহ শীল করিয়া গভর্ণমেণ্ট কাপড়গুলি নিজেদের জিম্মায় রাখিয়াছেন। এখন যদি ঐ সকল বস্ত্র সাধারণের মধ্যে বণ্টনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় তবে তাহাতে দেশবাসী উপকৃত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত ভূপেশমোহন সেন—

শ্রীযুক্ত ভূপেশমোহন সেন সম্প্রতি বিলাতের টেক্‌ষ্টাইল ইনষ্টিটিউটের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানে কেবল তুলা, পশম, রেশম প্রভৃতির বয়ন, রঞ্জন ইত্যাদির বিশেষজ্ঞদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এখন তিনি ভলকার্ট ব্রাদার্সের বোম্বাই অফিসে রঞ্জন বিভাগের লেবরেটারী-অধ্যক্ষরূপে কাজ করিতেছেন।

সংস্কৃত নাটকাভিনয়—

ডক্টর শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী ও ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর চেষ্টায় কলিকাতা ৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীটে যে প্রাচ্য বাণী মন্দির স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উদ্যোগে দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি মন্দিরের সদস্যগণ দুই দিন মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক সংস্কৃতে অভিনয় করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। দর্শকদের পক্ষ হইতে ৭ জন অভিনেতাকে পদক প্রদান করা হইয়াছে। দেশে সংস্কৃত নাটকাভিনয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রাচ্য বাণী মন্দির তাহার নূতন ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা—

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়ীতে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—সভাপতি—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস, সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন। আমাদের বিশ্বাস, নূতন কর্ম্মকর্ত্তারা বাঙ্গালায় হিন্দু জাগরণ আন্দোলন অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তুলিবেন।

বড়লাটের বিলাত যাত্রা—

গত ২১শে মার্চ্চ ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল হঠাৎ বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। প্রকাশ, ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা ও ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে বিলাত যাইতে হইয়াছে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বোম্বায়ের গভর্ণর সার জন কলভিলি বড়লাটের কাজ করিবেন। লর্ড ওয়াভেলের এই সহসা যাওয়ার কারণ এখনও জানা যায় না। তবে তিনি বিলাতে পৌছিয়াই ভারত সচিব মিঃ আমেরীর অফিসে বসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার ফল কি হয়, তাহাই জানিবার বিষয়।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

বোম্বাই ঃ ৪৬২ ও ১৬৪

হোলকার ঃ ৩৬০ ও ৪৯২

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই দল ৩১৪ রানে হোলকার দলকে হারিয়ে এবছরের রঞ্জিট্রফি বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে তাদের চতুর্থ বিজয়।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ৪ঠা মার্চ্চ থেকে ফাইনাল খেলা আরম্ভ হয়। বোম্বাই দল টসে জয় লাভ করে প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করে। বোম্বাইয়ের ওপনিং খেলোয়াড়দ্বয় ইব্রাহিম এবং মন্ত্রী খেলতে নামলেন। সূচনা বেশ ভাল হ'ল কিন্তু দলের ১৭ রানে মন্ত্রী ১০ রান ক'রে আউট হলেন। এর পর আর এস মোদী এসে ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগ দিয়ে খেলার গতি ভালর দিকে আনলেন। ইব্রাহিম নিজস্ব ৪৪ রান ক'রে দলের ১৪১ রানে আউট হলেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে দলের ৭ উইকেটে ৩৩৮ রান উঠল। আর এস মোদী ৯৮ রান করে মাত্র আর দু' রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারলেন না। আর এস কুপার করলেন ৫২ রান। উদয় মার্চ্চেণ্ট ৭৪ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

দ্বিতীয় দিনের নট আউট উদয় মার্চ্চেণ্ট এবং পলায়ানকার ব্যাটিং আরম্ভ করলেন। মার্চ্চেণ্ট ৭৯ রানে আউট হলেন। লাঞ্চের ঠিক আগে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস্ ৪৫৯ মিনিট খেলার পর ৪৬২ রানে শেষ হল। পলায়ানকরের ৭৫ রানই এই দিন উল্লেখযোগ্য। সি এস নাইডু ১৫৩ রানে ৬টা এবং নিম্বলকার ৮৮ রানে ৩টে উইকেট পেলেন। লাঞ্চের পর হোলকার দলের ভাণ্ডারকার এবং সারভাতে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন। চা পানের সময় কোন উইকেট না হারিয়ে হোলকার দলের ৯১ রান উঠল। চা পানের পর খেলার ভাঙ্গন ধরণ। আধঘণ্টার মধ্যে ভাণ্ডারকার এবং সারভাতে যথাক্রমে ৩৭ এবং ৬৭ রান করে আউট হলেন। দু' উইকেট হারিয়ে হোলকারের ১১৩ রান উঠল। মুস্তাক আলির জুটী হয়ে ডি কম্পটন খেলতে লাগলেন, কম্পটনের উইকেট তাঁর ২০ রানে পড়ে গেল। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে হোলকার দলের ৪ উইকেটে ১৯৭ রান উঠল।

তৃতীয় দিনের খেলায় হোলকার দলের পূর্ব্বদিনের নট আউট ব্যাটস্‌ম্যান্ মুস্তাক আলি এবং নিম্বলকার খেলা আরম্ভ করলেন। হোলকার দলের প্রথম ইনিংস ৩৫৮ মিনিট খেলার পর ৩৬০ রানে শেষ হ'ল। মুস্তাক আলি ১০৯, সি এস নাইডু ৫৪ রান এবং জগদ্দল ৪৩ রান করলেন। ফাদকার ৭৫ রানে ৫টী এবং তারাপুরা ৯৪ রানে ৩টে উইকেট পেলেন।

বোম্বাই দল ১০২ রানে অগ্রগামী থেকে ২-৫৮ মিনিটে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা পূর্ব্ববর্ত্তী ওপনিং খেলোয়াড় দিয়েই আরম্ভ করলে। এবার পূর্ব্বের থেকে আরম্ভ খুব ভালই হ'ল। চা পানের সময় কোন উইকেট না হারিয়ে ৬০ রান উঠল। দলের ৮০ রানে, ইব্রাহিম ২৬ রান করে আউট হলেন। মন্ত্রী চারবার আউট হতে বেঁচে গিয়ে ৬৩ রানে আউট হলেন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল বোম্বাই দলের ২ উইকেটে ১৬৫ রান উঠেছে। আর এস মোদী এবং ভি এম মার্চ্চেণ্ট যথাক্রমে ৫৯ ও ৯ রান ক'রে নট আউট রইলেন। হোলকার দলের নিকৃষ্ট ফিল্ডিংয়ের দরুণ বোম্বাই দলের মন্ত্রী একাধিকবার এবং মোদী একবার আউটের হাত থেকে বেঁচে যান।

চতুর্থ দিনের খেলায় তৃতীয় দিনের নট আউট খেলোয়াড় আর এস মোদী এবং ভি এম মার্চ্চেণ্ট খেলা পুনরায় আরম্ভ করলেন। মোট ২০৩ মিনিট খেলার পর দলের ২০০ রান উঠল। মোদীর রান তখন ৮০ এবং মার্চ্চেণ্টের ১৯ রান। ২৩৭ মিনিট খেলার পর মোদী ১০১ রান করলেন, তার মধ্যে ১১টা বাউণ্ডারী। দলের তখন ২৩১ রান। দলের অধিনায়কের তখন মাত্র ২৫ রান উঠেছে। ৯৫ মিনিট খেলার পর উভয়ের জুটীতে ১০০ রান উঠল। ১৫০ রান উঠল মোট ১৩৮ মিনিটে। বার বার বোলার পরিবর্ত্তন করেও হোলকারের অধিনায়ক কর্ণেল নাইডু কিছুই করতে পারছেন না। এরপর লাঞ্চের জন্যে খেলা বন্ধ রইল। ২ উইকেটে বোম্বাইয়ের তখন ২৮৬ রান। মোদীর এবং মার্চ্চেণ্ট যথাক্রমে ১৩০ এবং ৪৬ রান তুলে তখনও ব্যাট করছেন। লাঞ্চের পর বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে খেলা পুনরায় আরম্ভ হ'ল। মোট ২৯৬ মিনিট খেলার ফলে হোলকার দলের ৩০১ রান উঠল। মোদী এবং মার্চ্চেণ্টের রান তখন যথাক্রমে ১৩৯ এবং ৫৩। কিছুক্ষণ খেলার পরই আর এস মোদী এ বছরের রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তাঁর নিজস্ব ১০০০ রান পূর্ণ করলেন। ১৮৫ মিনিট খেলার পর "পাটনারসিপ খেলায় তাঁদের ২০০ রান পূর্ণ হ'ল। এ সময় তাঁর রান ১৪৬ এবং মার্চ্চেণ্টের ৬১।

২২৫ মিনিট উইকেটে খেলে তিনি নিজস্ব ১৫০ রান

পূর্ণ করলেন। এই রান সংখ্যায় তাঁর ১৪টী বাউণ্ডারী ছিল। এর পরই সি এস নাইডুর বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে মোদী ১৫১ রানে আউট হলেন। মোট ২০০ মিনিট পাটনারের সঙ্গে খেলে তিনি ২২৬ রান দলকে দিয়ে ছিলেন। বিজয় মার্চ্চেণ্টের তখন ৮২ রান উঠেছে, আর এস কুপার তাঁর জুটী হলেন। উভয়ের জুটীতে দ্রুত রান উঠতে লাগল। দলের ৩৩০ মিনিট খেলার পর ৩৫৩ রান উঠল। বিজয় মার্চ্চেণ্ট সি এস নাইডুর বলে লেট-কাট মেরে বাউণ্ডারী করে শত রান ২২৩ মিনিট খেলার পর পূর্ণ করলেন। মার্চ্চেণ্ট উইকেটের চারপাশে বল মেরে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রান তুলতে লাগলেন। চা পানের সময় দেখা গেল বোম্বাই দলের ৩ উইকেট হারিয়ে ৪৫৮ রান উঠেছে। মার্চ্চেণ্টের তখন ১৫৬ এবং কুপারের ৩৮। চা পানের পর বোম্বাই দলের খেলোয়াড়দ্বয় অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যাট চালিয়ে রান তুলতে লাগলেন। বিজয় মার্চ্চেণ্ট অতি সহজেই তাঁর দু'শত রান পূর্ণ করলেন। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে বোম্বাই দলের ৬ উইকেট হারিয়ে ৫৪৫ রান উঠল। অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট এবং আর এস কুপার যথাক্রমে ২০৪ এবং ৭৭ রান ক'রে নট আউট থাকলেন।

পঞ্চম দিনের খেলায় বোম্বাই দলের নট আউট খেলোয়াড় বিজয় মার্চ্চেণ্ট এবং কুপার ব্যাটিং আরম্ভ করলেন। কুপার নিজস্ব ১০৪ রান করে আউট হলেন। এর পর ফাদকার এসে মার্চ্চেণ্টের জুটী হলেন এবং ৭ রানে আউট হলেন। এদিকে দলের পাঁচটা পড়ে গিয়ে রান দাঁড়াল ৬১৮। বিজয় মার্চ্চেণ্টের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা উদয় মার্চ্চেণ্ট খেলার জুটী হলেন। বিজয় মার্চ্চেণ্ট ২৫০ মিনিট খেলে ২৫০ রান তুললেন, তার মধ্যে ১৪টা বাউণ্ডারী করলেন। দলের রান তখন ৬৪৪। স্কোর বোর্ডে রান বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে উঠতে লাগল এবং ৫৯০ মিনিট খেলাতে ৬৫০ রান উঠল। সি এস নাইডুর লাঞ্চের আগের শেষ ওভার বলে স্কোয়ার কাট মারতে গিয়ে বিজয় মার্চ্চেণ্ট একটা ক্যাচ তুললে পর জগদলে তাঁকে ধরে ফেললেন। বিজয় মার্চ্চেণ্ট ৪৮৫ মিনিট উইকেটে খেলে ২৭৮ রান তুললেন এবং খেলার এই দীর্ঘ সময়ে এই একবারই মাত্র আউট হবার সুযোগ দেন। খোট উদয় মার্চ্চেণ্টের সঙ্গে জুটী হয়ে খেলতে লাগলেন। ৩-১০ মিনিটের সময় বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৭৬৪ রানে শেষ হল। উদয় মার্চ্চেণ্ট ৭৩ রান করলেন। বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৬৭০ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল।

হোলকার দল ৮৬৬ রান পিছনে পড়ে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে এবং মাত্র ১১ রানে ভাণ্ডারকার এবং সারভাতে আউট হলেন। পঞ্চম দিনের খেলার শেষে হোলকার দলের দু' উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান উঠল। মুস্তাক আলি এবং কম্পটন যথাক্রমে ১০৬ এবং ৬৫ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

প্রতিযোগিতার ৬ষ্ঠ দিনে হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৪৯২ রানে শেষ হ'ল। মুস্তাক আলির ১০৯ এবং কম্পটনের নট আউট ২৪৯ রান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই দলের বিপুল রান সংখ্যার উত্তরে হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা খুবই প্রশংসনীয়। ৩৭৪ রানে বোম্বাই বিজয়ী হ'ল। ইতিপূর্ব্বে তারা ১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৩, এবং ১৯৪১-৪২ সালে রঞ্জি ক্রিকেট ট্রফি বিজয়ী হয়েছিল।

বোম্বাই দল: কে সি ইব্রাহিম, এম কে মন্ত্রী, আর এস মোদী, ভি এম মার্চ্চেণ্ট, আর এস কুপার, ডি জি ফাদকার, উদয় মার্চ্চেণ্ট, জে বি খোট, ওয়াই বি পালওয়ানকার, এম এন রায়জী, কে কে তারাপুর।

হোলকার দল: কে ভি ভাণ্ডারকার, সি টি সারভাতে, মুস্তাক আলি, ডি কম্পটন, বি নিম্বলকার, সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, জে এন ভায়া, এম জগদ্দাল, এইচ গিকোয়াদ, ও রাউল।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল: ১৯৩৪-৩৫ বোম্বাই; ১৯৩৫-৩৬ বোম্বাই; ১৯৩৬-৩৭ নওনগর; ১৯৩৭-৩৮ হায়দ্রাবাদ; ১৯৩৮-৩৯ বাঙ্গলা; ১৯৩৯-৪০ মহারাষ্ট্র; ১৯৪০-৪১ মহারাষ্ট্র; ১৯৪১-৪২ বোম্বাই; ১৯৪২-৪৩ বরোদা; ১৯৪৩-৪৪ পশ্চিম ভারতীয় রাজ্য।

হকি লীগ ঃ

মহমেডান স্পোর্টিং ২৭ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী হয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "শহর থেকে দূরে"—৩৲
শ্রীপাদ শিশুরাজ মহেন্দ্রজী প্রণীত "শ্রীশ্রীত্রয়োদশ দশা-মাধুরী"—১৲
ডক্টর রমা চৌধুরী প্রণীত "বেদান্ত ও সুফী দর্শন"—২৲
শৈলজানন্দ-প্রবোধকুমার প্রণীত উপন্যাস "নন্দিতা"—২॥৹
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত গল্পগ্রন্থ "গল্পের মতো"—১॥৹
আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রাতের অতিথি"—১৲
শ্রীআশুতোষ মিত্র প্রণীত "শ্রীমা"—২॥৹
শ্রীসতীকুমার নাগ প্রণীত "হাজার বছর পরে আমাদের কবি"—া/৹
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "নাট্য-ভারতী" ২য় পর্ব্ব—২৲
পূরবী পাবলিশার্স প্রকাশিত "New Life in New China"—২।৹
বাণী রায় প্রণীত গল্পগ্রন্থ "পুনরাবৃত্তি"—২৲
স্বামী আত্মানন্দ প্রণীত "জীবন-সাধনার পথে"—॥৹
স্বামী বিশ্বপ্রণবাশ্রম মহারাজ প্রণীত "সুন্দরী ব্রহ্মবাদিনী"—১৲
শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "দরদী বন্ধু"—১৲
নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো"—১॥৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সমাধান

নবকুমার পদ্মাবতীকে চিনিতে পারিল না কেন? আপনারা হয় তো বলিবেন—

প্রথম—পথে নবকুমার দস্যুদের লইয়াই ব্যস্ত ছিল; শিকারের দিকে দৃষ্টি চুরি করিবার আদৌ সময় হয় নাই।

দ্বিতীয়—বহু দিনের হারাণ ধনকে পথে খুঁজিয়া পাইবার আশা কি কেহ করিয়া থাকে!

তৃতীয়—অধুনা নবকুমার নব-জীবনের স্বপ্নে বিভোর কপাল-কুণ্ডলাই তাহার ধ্যান, রূপ ইত্যাদি।

চতুর্থ—পদ্মাবতী স্বামীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন।

পঞ্চম—স্বয়ং কবি বাদ সাধিয়াছেন, সরাইথানায় পঁহুছিতেই 'প্রদীপ নিভিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে'।

অতঃপর স্বীকার করিতেই হইবে নবকুমারের পদ্মাবতীকে না চিনিবার যথার্থ কারণ ছিল।

কিন্তু সেদিন প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকে পথের বুকের উপর মুখামুখী দাঁড়াইয়া বিশালাক্ষী কেন যে আমাকে চিনিতে পারিল না—আজও এই ধাঁধার মীমাংসা আমি করিতে পারি নাই। লোকে বলে আঙুল ফুলিয়া কখনও কলা গাছ হয় না, অথচ বিশালাক্ষী তাহার উল্টাটাই প্রমাণ করিয়া দিয়া আমাকে বোকা প্রতিপন্ন করিয়া দিল। কথাটি খুলিয়া বলি। আসলে তাহার নাম নলিনী; বহু দিন সহপাঠী ছিলাম বোধ হয় ৮।১০ বৎসর হইবে। তাহার চেহারার সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য মোটা মোটা টানা টানা চোখ দুইটি। এক দিন কি দুষ্টামি যে মাথায় খেলিয়া গেল তাহার নামকরণ করিলাম বিশালাক্ষী; অতঃপর ঐ নামেই সে আমাদের মহলে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এত যে বন্ধু ছিলাম—উক্ত ঘটনার পর সে আর আমার কাছেই ঘেঁসিত না। একদা হঠাৎ দুপুরের ছুটীতে পিছন দিক হইতে চিমটি কাটিয়া বলিল—নন্দন, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, মুড়কি খাওয়াবি? হাঁ দেখ, তোর দেয়া নামটি ওঁর পছন্দ হয়েছে। ওঁর বলিতে বিশালাক্ষী কাহাকে বুঝাইত কেবলমাত্র আমিই তাহা জানিতাম। আমি একটু হাসিলাম।

তারপর বহুদিন বিদেশে কাটিয়াছে। ৫।৬ বছরের ব্যবধানে সেদিন একেবারে দুজনে মুখামুখি দাঁড়াইয়া। যতই বলি, আমি তোর কৈশোরের বন্ধু চঞ্চল, সে কিছুতেই আমাকে চিনিবে না। কেবল বলে তা কেমন করে হবে, সে কি হয় ইত্যাদি। মহা মুস্কিলে পড়িলাম দেখিতেছি। আমি যে আমি নাও হইতে পারি এমন প্রশ্ন ভুলেও কখনও মনে জাগে নাই। রোজ কতবার এই মুখ আয়নায় দেখিতেছি, কখনও তো নিজেকে ভুল করি নাই—এমন কি অঘটন ঘটিল! হঠাৎ বুদ্ধি খুলিয়া গেল—পিছন ফিরিয়া মাথায় মস্ত কাটা দাগটি দেখাইয়া দিয়া বলিলাম—"দেখতো চেয়ে চিনিতে পারো কি না?" এবার অব্যর্থ সন্ধান। বিশালাক্ষী আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—"নন্দন, তুই! এত সুন্দর, কি মোটা-সোটা কি করে হলি? গম্ভীর স্বরে বলিলাম—মন্ত্র-বল—দুঃখ দারিদ্র্যের নির্ম্মল নিষ্পেষণে অসহায় দরিদ্রের একমাত্র সম্বল। তা যাক্, তোর কি খবর? সে যেন একটা দীর্ঘ শ্বাস চাপিয়া গেল; কি আর খবর ভাই ওঁর শরীর বড্ড খারাপ। ওঁর মানে—চন্দনার—চন্দনাকে তুই…দেখিলাম তাহার মুখে রক্তিম আভা খেলিয়া গেল—অধরের কোণে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। ওর কি হয়েছে? বিশালাক্ষী নীরব—একটু যেন সঙ্কোচ আর দ্বিধা। অনুমান বোধ হয় মিথ্যা হইল না। বলিলাম, "দেখ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করিস্ বাইরের দিকে কি একটুও নজর রাখবিনে? আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলি না—কি করে এই স্বাস্থ্য হলো? এর কারণ **'ভাইনো মল্ট'**। এটা মনে রাখিস যে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর অথবা দীর্ঘ দুশ্চিন্তাবশতঃ উৎপন্ন সকল প্রকার দুর্ব্বলতা, অবসাদ, ক্লান্তি দূর করে দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে এর মত অব্যর্থ টনিক আর দেখা যায় না।" তা ছাড়া মায়েদের পক্ষে 'ভাইনো-মল্ট' অমৃত তুল্য। নাঃ—রাস্তায় নয়, চল চন্দনাকে দেখে আসি।"

তুষারাচ্ছন্ন সিমলা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

কয়লার ব্যবহার

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ইতিহাস

পাথুরে কয়লার ব্যবহার ভারতবর্ষে খুব পুরাতন নয়। তবে ভারতবর্ষের বাহিরে বিশেষতঃ ইউরোপে ইহার পরিচয় খৃষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভের অন্ততঃ তিন শতকের পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃত ব্যবহার ইহার অনেক পরে সুরু হইয়াছে।

আরিষ্টটলের শিষ্য থিয়োফ্রাসটস্ কর্ত্তৃক লিখিত "The Book of Stones" পুস্তকে লিগুলিয়া বা বর্ত্তমান জেনোয়ায় এবং অলিম্পিয়ার পথে এলিস্ (Elis) নামক স্থানে দৃষ্ট একপ্রকার কাল পাথরের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ 'প্রস্তর' অগ্নিসংযোগে জ্বলে এবং কামার-শালায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উহাই যে বর্ত্তমানের (পাথুরে) কয়লা, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে জ্বালানী হিসাবে কয়লার নিয়মিত ব্যবহারের সুনিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। নিউ-ক্যাস্‌ল্‌-অন্‌-টাইনের (New Castle on Tyne) লোকদের প্রয়োজনে কয়লা ব্যবহারের জন্য ১২৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অষ্টম হেনরী এক সনদ প্রদান করেন।

ইহার পর আবার ১৩০৬ সালে সম্রাট প্রথম এডোয়ার্ড লণ্ডন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহকে গন্ধক ও দাহ্যমান কয়লার দুর্গন্ধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কয়লা দগ্ধ করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেন এবং তৎস্থানের অধিবাসীদিগকে কাঠ-কয়লা জ্বালাইয়া অগ্নি উৎপাদনের আদেশ দেন। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্ম্মাণীতে সাক্সনী প্রদেশে জুইক (Zwickau) অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম পাথুরে কয়লার ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া যায়। উহার পর ১২৯১ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে ডাম্‌ফারলিন গির্জ্জার পাদ্রীদের ব্যবহারের জন্য কয়লার ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ক্রমে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে কাচ প্রস্তুত করিবার জন্য ইংলণ্ডে কয়লার বহুল ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া যায়।

ব্যবহার—তাপ ও শক্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব ভাগে কেবল উত্তাপ সৃষ্টি ক[illegible] জন্য কয়লা ব্যবহৃত হইত। বৈজ্ঞানিকরা ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে [illegible] নাই। এই তাপকে কি ভাবে শক্তিরূপে ব্যবহার করা যায় [illegible] নানা জল্পনাকল্পনা চলিয়াছে। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে [illegible] Solomon de Caus তাঁহার পুস্তকে১ এবং [illegible] এক উপোৎপাদ্য [illegible] ...লক এ্যাসিড

কর্ত্তৃক (Marquis of Worcester,) ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত পুস্তকের পরবর্ত্তীকালের পরিবর্ত্তনের সূচনা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্যাপ্টেন টমাস স্যাভারি (Capt. Thomas Savery) এই অঙ্গারজাত শক্তিকে ব্যবহারিক জগতে স্থান দান করেন। তিনি (পাম্প) দমকলের মধ্যে বায়ুশূন্যতা (vacuum) অবস্থার সৃষ্টি করিয়া সেই সঙ্গে উত্তপ্ত বাষ্পের ব্যবহারের প্রবর্ত্তন করেন। কর্ণওয়াল (Cornwall) প্রদেশের ব্রিজ্ (Breage) পরগণা (Parish)র খনি হইতে জল উত্তোলনের জন্য যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া তিনি জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। বাষ্পীয় শক্তির নিয়ম অনুসরণ করিয়া ১৭০৫ সালে নিউকোমেন (Newcomen) তাঁহার ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন এবং ১৭৬৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া জেম্স্ ওয়াট্ (James Watt) ইঞ্জিনের বহুতর উন্নতি সাধনের জন্য গবেষণা চালাইতে থাকেন। বর্ত্তমান জগতে বৈদ্যুতিক শক্তির মূলে কয়লা নিহিত রহিয়াছে ; তাহা ছাড়া অবশ্য জলস্রোতের সাহায্য লওয়া হইতেছে।

নিউকোমেনের পূর্ব্বে এবং ক্যাপ্টেন স্যাভারির আবিষ্কারের পরে, আন্দাজ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাডলি (ডুড্‌ ডাড্‌লি) কয়লার অপর এক ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। লৌহ গলাইবার কার্য্যে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইবার পর কারবার নষ্ট হইয়া যাওয়ায় লর্ড ডাড্‌লির প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। পরে ১৭৩৫ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আব্রাহাম ডার্বি (পিতা ও পুত্র) ঐ বিদ্যা কাজে লাগাইতে সক্ষম হন এবং লৌহশিল্পের প্রসারের সুযোগ উপস্থিত হয়।

ব্যবহার—আলোক

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়লার আরও এক নূতন ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইল। ১৭৯২ সালে মার্ডক (Murdock) বলেন যে কয়লা হইতে প্রাপ্ত গ্যাস (বাষ্প) জ্বালাইয়া যে আলো পাওয়া যাইবে, তাহা নল সাহায্যে লোকের বাড়ীতে পৌঁছাইতে পারিলে তৈল-প্রজ্বলিত (ল্যাম্প) প্রদীপ বা আলোকাধার ও বাতির প্রয়োজন দূর করিবে। ক্রমে তাহা সকল সভ্যদেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ভারতে অপব্যবহার

এই সকল ব্যবহারের পরিচয় থাকিলেই খনিজদিগের মধ্যে কয়লার প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। কিন্তু এইখানেই ইহার শেষ নহে। কাঁচা কয়লা হইতে কোক (semi-coke) বা খনিজ গালাইবার উপযোগী কয়লা (metallurgical coal) করিবার সময় একটু ব্যবস্থা করিলে কয়লার কতকাংশ আলকাতরারূপে পাওয়া যায়। ইহার প্রক্রিয়া খুবই সহজ। সকল সভ্য দেশেই কোক কয়লা করিতেও বায়ুরুদ্ধ স্থান বা পাত্রের আশ্রয় লয়। ভারতবর্ষে কয়েকটী লৌহ ঢালাই কারখানা এবং গ্যাস কোম্পানীর কারখানা ছাড়া সমস্ত কয়লাই উন্মুক্ত স্থানে দগ্ধ করায় আলকাতরা ও অপরাপর বস্তু দগ্ধ হইয়া যায়। অবশিষ্ট জ্বলন্ত কয়লাতে জল ঢালিয়া আগুন নিবাইলে কোক পড়িয়া থাকে।

কয়লা ও কোক

এইরূপ কাজে যে কেবল বহুমূল্য বস্তু নষ্ট হয় তাহা নহে, ধূম্ররূপে কতকাংশ বর্ত্তমান থাকিয়া বায়ুতে মিশে এবং লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সেইজন্য বিশেষ চুল্লীতে কয়লা "দগ্ধ" (প্রকৃতপক্ষে ইহা সেঁকা) করিবার ব্যবস্থা আছে ; ইংরেজিতে ইহাকে 'Carbonisation of coal' বলে।

সাধারণতঃ ইহা বায়ুরুদ্ধ চুল্লি বা নালার মধ্যে "দগ্ধ" করা হয়। এই নালীগুলি উনান (oven) নামে পরিচিত ; মোটা এইগুলি ৪০ ফুট লম্বা, ১৫ ফুট গভীর এবং মাত্র দেড় ফুট চওড়া। ইহার দেওয়াল বা প্রাচীর উৎকৃষ্ট সিলিকা (silica) নির্ম্মিত ইট দ্বারা গঠিত। চুল্লীর উপর ভাগ সম্পূর্ণরূপে ঢাকা,মধ্যে মধ্যে কয়লা ঢালিয়া দিবার পথ আছে এবং যাহাতে কয়লা "দগ্ধ" হইবার সময় ধোঁয়া বাহির হইতে পারে, এইরূপ এক নল বা চিমনি আছে। সমস্ত চুল্লী কয়লা ভরা হইলে উহা ঢাকিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বাহির হইতে (দেওয়ালের) ইটগুলি উত্তপ্ত করা হয়। চুল্লীর গাত্রের তাপে কয়লা উত্তপ্ত হয় এবং তাহা হইতে সমস্ত গ্যাস নির্গত হইয়া নলপথে চলিয়া গেলে উহা কোকে পরিণত হয় ; চুল্লীগুলি সরাসরিভাবে (একটা অপরটার পাশে) অবস্থিত ; মধ্যে কেবল তাপ সরবরাহ করিবার জন্য কামরা (heating chamber) ব্যবধান। টাটার কারখানায় অন্যূন ১০০টী এইরূপ চুল্লী আছে। ১৬ হইতে ১৮ ঘণ্টা তাপ ভোগ করিবার পর উত্তপ্ত কয়লা চুল্লী হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং জল দিয়া তাপ দূর করা হয়। তখন ইহা লৌহগালাই চুল্লীতে ব্যবহারের উপযুক্ত কোকরূপে পরিণত হয়।

গ্যাসের ব্যবহার

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, খোলা বা উন্মুক্ত স্থানে কাঁচা কয়লাকে কোকে পরিণত করার সহিত পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোক-লাভ করার পার্থক্য কি ? পূর্ব্বে ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যে গ্যাস উন্মুক্ত স্থানে দগ্ধ হইয়া এবং বায়ুতে মিশিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহা এই প্রক্রিয়ায় একটুও অপচয় হইতে দেওয়া হয় না। চুল্লীসংযুক্ত নলের সাহায্যে কয়লার বাষ্পকে স্থানান্তরে লইয়া তাহা হইতে দূষিত অর্থাৎ লৌহ চুল্লীর ক্ষতিকারক সমস্ত অংশ দূর করিয়া লৌহগলন কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। বলা বাহুল্য, আলো-তাপ পাইবার জন্য যে গ্যাস (coal gas) ব্যবহৃত হয়, ইহা সেইরূপ ভাবে জ্বলে ; সুতরাং তাপউৎপাদন করে। সেই উদ্দেশ্যেই ইহা ব্লাষ্ট ফার্ণেস (blast furnace) বা লৌহ গালাই চুল্লীতে কয়লার সহিত ব্যবহৃত হয়।

কয়লার উপোৎপাদ্য বস্তু

উপরিউক্ত গ্যাস অন্যভাবেও কাজে নিয়োজিত হইতেছে। ইহা কোক-চুল্লী (coke-oven) হইতে লইয়া ভিন্ন স্থানে নীত হয় এবং

...s Raisons des Forces Mouvantes"

...ry of Inventions"

উহাকে ক্রমে শীতল হইতে দেওয়া হয়। দ্রুত প্রয়োজনে শীতল বস্তুর সংস্পর্শে বাষ্পাকার হইতে রূপান্তর গ্রহণের সহায়তা করিবার ব্যবস্থা আছে। এখন হইতে প্রকৃতপক্ষে কয়লার উপোৎপাদ্য বস্তু লাভ করিবার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। উত্তপ্ত বাষ্প শীতল হইলে কতকাংশ আলকাতরা-রূপ ধারণ করে। তাহার পর যে গ্যাস থাকে তাহাতে এ্যামোনিয়া (ammonia), বেনজল (benzol), ন্যাপথ্যালিন (naphthalene) ও জলীয় বাষ্প থাকে। এ্যামোনিয়াকে সলফিউরিক এ্যাসিডের সাহায্যে এ্যামোনিয়ম সলফেট (ammonium sulphate) রূপে উদ্ধার করিবার পর ন্যাপথ্যালিন ও তৎপরে বেনজল উদ্ধার করা হয়।*

ইহা ছাড়াও এই গ্যাস হইতে গন্ধক এবং তাহা হইতে সলফিউরিক এ্যাসিড, সায়েনোজেন (cyanogen) পাওয়া যায়।

আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির তালিকা দেওয়ার পূর্বে অন্যান্য যে কয়টী বস্তু carbonisation of coal প্রক্রিয়ায় পাওয়া যাইতেছে, তাহার বিষয় কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

এ্যামোনিয়া

এ্যামোনিয়া হইতে এ্যামোনিয়ম সলফেট উদ্ধার হয়, তাহা বলা হইয়াছে। ইহা একটী উৎকৃষ্ট সার এবং প্রতি বৎসর ইহার প্রচুর প্রয়োজন। জলে দ্রব এ্যামোনিয়া (Liq. ammonia) গবেষণাগারে এ্যামোনিয়ায় দ্রবণীয় বস্তু দ্রব করিবার উদ্দেশ্যে, মেঝে প্রভৃতি সাফ করিবার জন্য এবং বিশোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। স্বল্প ব্যয়ে তাপ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে এ্যামোনিয়া গ্যাস প্রয়োজন। চিকিৎসা বিদ্যায়, লৌহ-চাদরে দস্তা জমাইতে (in galvanising), ধাতব পদার্থে জোড়াই কার্য্যে, ক্যালিকো ছাপাই ও নানা রকম রঙ এবং কাচে দাগ করিবার জন্য যে এ্যামোনিয়ম ফ্লুরাইড (amm. flouride) প্রস্তুত করিতে এ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড (amm. chloride) প্রয়োজন। বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্য্যে এবং ছাপাই করিতে এ্যামোনিয়ম থিয়োসায়েনাইট (amm. thiocyanite) এবং স্মেলিং সল্ট (smelling salt), রুটী বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে 'বেকিং পাউডার' (baking powder), ঔষধ প্রস্তুত করিতে পশম রঞ্জন করিতে এবং সাধারণ রঞ্জন কার্য্যে এ্যামোনিয়ম নাইট্রেট (amm. nitrate) ব্যবহৃত হয়। এ্যামোনিয়া হইতে এই সকল লবণ বা সল্ট (salt) প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং এ্যামোনিয়া এবং তাহারও পূর্বে কয়লার গ্যাস ইহাদের এক হিসাবে মূল।

বেনজল

এ্যামোনিয়া ব্যতিরেকে বেনজল (benzol) পাওয়া যায় বলা হইয়াছে। বেনজল হইতে বিশুদ্ধ বেনজিন্ (benzene), টলুইন (toluene) মোটরের উপযোগী বেন্‌জিন (motor benzene) সলভেণ্ট ন্যাপ্‌থা (solvent naphtha) ও জাইলল (Xylol) পাওয়া যায়।

---

* William A. Bone and Godfrey W. Himus—*Coal Its Constitution and Uses*, pp 375-380.

আলকাতরা

যে আলকাতরা লোকে স্পর্শ করিতে ভীষণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে, হঠাৎ দেহে কোথাও লাগিয়া গেলে তাহা দূর করিবার জন্য সত্বর চেষ্টা করিবে, তাহা যে কত প্রকার অতীব প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ বস্তু প্রসব করিতে সমর্থ, তাহা এই সামান্য প্রবন্ধের পরিসরের মধ্যে লিখিয়া শেষ করা সম্ভব নহে।

প্রথমেই মনে হইবে কাষ্ঠের দ্রব্যাদিতে লাগাইতে কালো রঙ আর রাস্তা তৈয়ারী করিতে পিচ্ (pitch) বা ঐ জাতীয় বস্তুর কথা। আলকাতরা না থাকিলে আর ঘরের মেঝের মত ম্যাকাডাম করা রাস্তায় মনের আনন্দে এবং সামান্য ক্লেশে যান চড়িয়া বেড়াইবার সুযোগ ঘটিত না। পিচ্ হইতে pitch-coke briquettes, ছাদের জমানো 'টাইল' (roofing felts), ইলেকট্রোড্ (electrode) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আলকতরা-জাত তৈল

আলকাতরা 'ভাঙ্গিয়া' (fractional distillation) নানাপ্রকার তৈল, (Oil) যথা হাল্কা (light), মাঝারি (middle), ভারি (heavy), এ্যানথ্রাসিন (anthracene), এ্যানথ্রাসিন-ফ্রী (anthracene-free) প্রভৃতি তৈল পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেকটী হইতে যে আবার কত রকম বস্তু তৈয়ারী হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

"হাল্কা" তৈল

লাইট অয়েল (light oil) হইতে বেনজিন (benzene), এ্যানিলিন (aniline-indigo) ও ফুক্‌সিন্ (fuchsine) পাওয়া যায়। ফুকসিন্ হইতে রঙ, ঔষধাদি প্রস্তুতের রসায়ন, সুগন্ধি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। লাইট অয়েল হইতেই মোটরে ব্যবহারযোগ্য স্পিরিট ও বস্ত্রাদির দাগ উঠাইবার জন্য এক প্রকার তরল পদার্থ হয়। টলুইন (toluene) লাইট অয়েলের একটী অতি প্রয়োজনীয় উপোৎপাদ্য বস্তু এবং উহাই বিস্ফোরক (T. N. T. বা trinitrotolunol) ও ভেষজ প্রস্তুতের উপাদান, রঞ্জন পদার্থ ও স্যাকারিণ প্রভৃতি বস্তুর মূল। জাইলিন (Xylene), দ্রাবক ন্যাপথা, কুমারোন রেসিন (cumarone resin) প্রভৃতি দ্রব্যাদি লাইট অয়েলের অন্তর্ভুক্ত বস্তু।

রঞ্জন পদার্থ, সুগন্ধি এবং দ্রাবক মিলে xylene হইতে; আর রবার, রঙ, বার্নিস, দ্রব করিতে এবং অবিশুদ্ধ এ্যানথ্রাসিন্ পরিষ্কার করিতে দ্রাবক ন্যাপ্‌থা (solvent naphtha) ই মূল বস্তু।

"মধ্য" তৈল

মিড্‌ল অয়েল (middle oil) বা কার্ব্বলিক অয়েল (carbolic oil) হইতে ন্যাপথ্যালিন (naphthalene), থ্যালিক এ্যাসিড (phthalic acid) আর নীল পাওয়া যায়। রঙ, বিশোধক ও কীটাণু-নাশক এবং বিস্ফোরকের জন্য নাইট্রোজেন যুক্ত ন্যাপথ্যালিন এবং সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত "মৃৎ" পাত্রাদি (porous stone wares) প্রভৃতিতে ন্যাপথ্যালিন কোনও না কোনও রকমে সহায়তা করে। কার্ব্বলিক এ্যাসিড অয়েল (carbolic acid oil) মিড্‌ল্ অয়েলের অপর এক উপোৎপাদ্য

বস্তু। তাহা হইতে ফেনল (phenol), ক্রেসল (cresol) এবং জাইলেনল (xylenol) পাওয়া যায়। ফেনল হইতে পিক্রিক এ্যাসিড ও স্যালিসিলিক এ্যাসিড (salicylic acid) হয়। বিস্ফোরক ও রঞ্জন পদার্থ করিতে পিক্রিক এ্যাসিড লাগে এবং স্যালিসিলিক এ্যাসিড হইতে এ্যাস্পিরিন (aspirin) উদ্ধার করা যায়।

রঞ্জন পদার্থ, ঔষধ, যৌগিক আঠা (resins), 'বেকে লাইট' (bakelite), বিস্ফোরক, বিশোধক, ক্রেয়োলিন (creoline) প্রভৃতি জাইলেনলের উপোৎপাদ্য বস্তু। তাহা ছাড়া পিরিডিন (pyridine) ও ঘর্ষণরোধক তৈল (lubricating oil) জাইলেনলের অংশসম্ভূত। পিরিডিন হইতে ঔষধাদি সংক্রান্ত বস্তুও রঙ পাওয়া যায় এবং স্পিরিটের গুণান্তর ঘটাইতে (for denaturing of spirits) পিরিডিনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

"ভারি" তৈল

ভারি তেল বা হেভী অয়েল (heavy oil)এর অপর নাম ক্রিয়োসোট অয়েল (creosote oil)। ইহা হইতে অবিশুদ্ধ ন্যাপথ্যা- (crude naphthalene), যৌগিক রঙ ও ঔষধাদি প্রস্তুতের উপযোগী কুইনোলিন (quinolene), কাষ্ঠাদি সংরক্ষণের উপযোগী ক্রিয়োসোট অয়েল (creosote oil), গ্যাস হইতে বেনজল (benzol) উদ্ধারের উপযোগী 'ওয়াসিং অয়েল' (washing oil for washing out benzol from gas) এবং মোটর চালাইবার উপযোগী ডিসেল্ অয়েল (Diesel oil) পাওয়া যায়।

"এ্যান্থ্রাসিন্ অয়েল"

এ্যান্থ্রাসিন্ অয়েল (anthracene oil) হইতে অবিশুদ্ধ এ্যান্থ্রাসিন্ (crude anthracene), কারবাজল (carbazol), ফেনান্থ্রিন্ ও এ্যাক্রিডিন (acridine) আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবিশুদ্ধ এ্যান্থ্রাসিন্ বিশুদ্ধ এ্যানথ্রাসিনের আকর, আবার তাহা হইতে কার্পাস বস্ত্রাদি রঞ্জনের পাকা রঙ, ফটো সংক্রান্ত এবং ঔষধাদি প্রস্তুতের নানা-প্রকার রাসায়নিক পদার্থ লাভ করা যায়। তাহা ছাড়াও, ইহা "টার্কি রেড ডাই" (Turkey red dye) প্রস্তুতের নিমিত্ত এ্যালিজেরিন (alizarine) ও বিশুদ্ধ এ্যানথ্রাসিনের অঙ্গ।

এ্যানথ্রাসিন-মুক্ত তৈল (anthracene-free oil) হইতে ডিসেল অয়েল (Diesel oil), দ্রব্যাদি সংরক্ষণের উপযোগী তৈল (Impregnating oil), ঘর্ষণরোধক তৈল (lubricating oil) ও বিশোধক কার্বোলাইনিয়ম (carbolineum) পাওয়া যাইতেছে।

রঞ্জন পদার্থ

এই তালিকা নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আলকাতরা হইতে যতপ্রকার রঙের বাহার হইয়াছে, তাহা আর কোথাও নাই। আজ পর্য্যন্ত অন্যূন দুই সহস্র বর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে। এখন বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, মানুষের রুচি অনুযায়ী সকল প্রকার বর্ণ এক আলকাতরা হইতেই উদ্ধার করা চলিতে পারে।

"যানশক্তি"

এইখানেই কয়লার ব্যবহারের "গল্প" শেষ করা যাইতে পারিত; কিন্তু তাহা হইবার নহে। উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে আলকাতরা "ভাঙ্গিয়া" (fractional distillation) নানাপ্রকার "তৈল" পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা যন্ত্র চালনার সহায়ক। এই প্রথায় বহু সময় লাগিয়া যায়, সুতরাং তাহাতে মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। যাহাতে অতি শীঘ্র কয়লা হইতে মোটর চালাইবার তৈল অথবা পেট্রল পাওয়া যায়, তাহার জন্য অন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ইংরেজিতে ইহার চলিত নাম 'hydrogenation.' মূলতঃ, কয়লার মধ্যে নানা জৈব (organic) পদার্থের সমাবেশের মধ্যে সাধারণত শতকরা ৭০ হইতে ৯০ ভাগ কার্ব্বণ,৩ হইতে ৬ ভাগ হাইড্রোজেন,২ হইতে ২০ ভাগ অক্সিজেন, ১ হইতে ২ ভাগ নাইট্রোজেন ও সামান্য পরিমাণ গন্ধক, ফস্ফরাস্ আছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে ইহার উপাদানে "তৈল" জাতীয় ("bezenoid") বস্তুর প্রাধান্য রহিয়াছে এবং ইহার কার্ব্বণ সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোজেন পরিপুরিত (Saturated) বা পূর্ণসিক্ত নয়, অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্ব্বণে আরও অধিক পরিমাণ হাইড্রোজেন যোগ করা যাইতে পারে। সুতরাং উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে (৩০০ হইতে ৪৫০° সেন্টিগ্রেড তাপ এবং ২০০ হইতে ৩০০ বায়ু চাপ বা atmospheres) কয়লার জৈব পদার্থের বিয়োজন (decomposition) এবং হাইড্রোজেন যোগ (hydrogenation) ঘটে এবং বাষ্পরূপে অক্সিজেন, এ্যামোনিয়া রূপে নাইট্রোজেন, সলফিউরেটেড হাইড্রোজেন (sulphurated hydrogen) রূপে সল্ফর (গন্ধক) বিদূরিত হয় এবং পেট্রলে দৃষ্ট অপরাপর নানারূপ হাইড্রোকার্ব্বণ অণু (molecule) দৃষ্ট হয়।

এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া,রাসায়নিক উপযুক্ত পাত্রের মধ্যে মিহি চূর্ণ কয়লার সহিত উহার ওজনের প্রায় ৪০ ভাগ তৈল (middle oil) মিশাইয়া পেষ্ট বা প্রলেপের মত করিয়া লন। (বৈজ্ঞানিক এই তৈল পেট্রল নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার একাংশরূপ উদ্ধার করে)। ইহার সহিত সামান্য পরিমাণ দ্রুতক (catalyst) যোগ করিয়া উপযুক্ত তাপ ও চাপ প্রয়োগ করেন এবং সরাসরি ভাবে হাইড্রোজেন যোগ করিতে থাকেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এই যন্ত্র হইতে পেট্রল, ডিজেল অয়েল (Diesel oil) প্রভৃতি লাভ করা যায়। জার্ম্মাণী এইভাবে তাহার পেট্রলের অভাব বহুলাংশে মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইংলণ্ডেও পেট্রল নাই অথচ যুদ্ধকালে বাহির হইতে উহা আমদানী করিতে না পারিলে চলে না। সেই কারণে জার্ম্মাণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডও কয়লা হইতে পেট্রল ও অন্যান্য "তৈল" উদ্ধার করিতেছে।

কুইনিন

ডাঃ উডওয়ার্ড (Dr. Robertt Burns Woodward) এবং ডাঃ ডোরিং (Dr. William von Eggars Doering) হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই রাসায়নিক এখন জোর গলায় বলিতেছেন যে কুইনিনের

জন্য আর সিন্‌কোনা গাছের ত্বকের উপর নির্ভর করিতে হইবে না ; (কয়লার) আলকাতরা হইতে তাঁহারা "খাঁটী" কুইনিন আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বর্ত্তমানে উহা এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, যাহাতে পরিমিত ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে কুইনিন পাওয়া যাইতে পারে।

বহুমূল্য হীরক কয়লারই রূপান্তর ; তাহা প্রকৃতির এক লীলা। মানুষ ইহাতে সন্তুষ্ট নয় ; বহু বৎসর পরীক্ষা চলিতেছে, মানুষ চায় তাহার ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত সে কারখানায় হীরক প্রস্তুত করিবে। ফল সম্পূর্ণরূপে নিরাশাব্যঞ্জক নহে। কয়লা শেষ পর্য্যন্ত কতরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা এখন বলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

ভারতবর্ষের অবস্থা

ভারতবর্ষের আলকাতরা হইতে উপোৎপাদ্য বস্তু লাভ করিবার জন্য তিনটী কারখানা আছে ; তাহার মধ্যে বিহারে (কুসুণ্ডা) অবস্থিত কারখানা প্রধান। রঙ মোটেই প্রস্তুত হয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে আন্দাজ দশটি দ্রব্য প্রস্তুত হইত, তাহা অন্য দেশের তুলনায় কিছুই নহে। তন্মধ্যে বেনজল, এ্যামোনিয়া, ন্যাপথালিন, কার্ব্বলিক এ্যাসিড, ক্রিয়োজেট অয়েল প্রভৃতি প্রধান। বর্ত্তমান যুদ্ধের চাপে, যুদ্ধ সংক্রান্ত কয়েকটী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। এতকাল পরে এখন জমির সার হিসাবে প্রচুর এ্যামোনিয়ম সলফেট প্রস্তুত করিবার জন্য বড় কারখানা করিবার তোড়জোড় চলিতেছে। কিছু পরিমাণ এ্যামোনিয়ম সলফেট হয়, তাহার অন্যত্র উল্লেখ আছে। ১৯৩৮ ৬৪,০০০ টন আলকাতরা ও পিচ্ পাওয়া গিয়াছে।

একাকার

যত দিন যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই মনে হইতেছে এক দিন বিজ্ঞান স্থির নিশ্চিৎভাবেই বলিবে যে সমগ্র জগৎ মাত্র এক বস্তু দ্বারা গঠিত। আজই সেই বাণী উঠিয়াছে, বিজ্ঞান হিন্দুদর্শনের বাহন হইয়া সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন বাণী "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ" সাধারণ লোকের চক্ষুর সমক্ষে সপ্রমাণিত করিতে চলিয়াছে। একদিন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির যাহা নিজস্ব ছিল, বহু বিচার বহু সাধনা-তপস্যার ফলে মানস চক্ষে যাহা দেখিয়া ফুকারিয়া উঠিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা রূপ ধরিয়া জগতের সকল প্রাণীর নিকট প্রতিভাত হইতে চলিয়াছে। কয়লা হয়ত এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সহায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বানর-যূথ

জসীম উদ্‌দীন

গহন বনের মাঝে
বুড়ো বটগাছ শিকড়ে-বাকলে জড়ায়েছে নানা সাজে।
জীর্ণশীর্ণ বুকের পাঁজর গিয়াছে হইয়া ফাঁক,
তাহার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে কোকিল শালিখ কাক।
সাপের খোলস ঝুলে আছে কোথা, কোথাও শুকনো ডাল
মহাযোগী বট ধ্যানে নিমগ্ন কত যুগ কত কাল।

সেদিন প্রভাতে বেড়াতে বেড়াতে হেরিলাম তার তলে
বানরের দল ঘুমায়ে রয়েছে ধরিয়া এ ওর গলে।
কোন বা জননী, সন্তান মুখে চুমু দিয়ে দিয়ে আর
সাধ মেটেনাক, নানা ভাবে তারে আদরিছে বারবার।
কোন বা জননী ঘুমায়ে নিঝুম, সন্তানগুলি উঠে
স্বেচ্ছায় দুধ করিতেছে পান মার স্তন হ'তে লুটে।
কোন বা দুষ্ট সন্তান তার চোখে ঘুমন্ত মা'র
আঙুল বুলায়ে ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে জাগাবার।
ঘুমন্ত মাতা হয়ত এখনো স্বপ্ন জড়িত চোখে
ছেলেদের তরে কোন সুখ নীড় আঁকিছে বা আশা লোকে।
কোন কোন মাতা ছোটছেলেটিরে জাগায়ে দিতেছে মাই—
আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদে হিংসায় পাশে তায় বড় ভাই।
মাঘের প্রভাত, কনকনে হাওয়া বহিতেছে শীত করি
শুয়ে আছে ওরা আদরে সোহাগে কাছাকাছি জড়াজড়ি।

স্নেহ-মমতার এমন দৃশ্য নির্জ্জনে আঁকি আর—
শত ফুল আঁখি মেলিয়া ইহারে দেখিতেছে বার বার।
প্রভাতের রবি আসিতে আসিতে থেমে যায় পথ ধারে
কুয়াসা চাদরে রশ্মিরে ঢাকি রাখে যত'খন পারে।
বন তার শাখা-বাহু বাড়াইয়া দিনেরে আড়াল করে
হয়ত বাসনা ঘুমাক উহারা আরো কিছু'খন ধ'রে

শিশুর জননী এখানে আসিয়া দাঁড়াক গাছের তলে
বৃন্দাবনের যশোদা আসুক গোপাল লইয়া কোলে
ফাতিমা জননী আসুক বুকেতে ইমাম হোসেন টানি
দেখে যাক্ এই নির্জ্জন বনে মমতার ছবিখানি।

ধীরে ধীরে ধীরে কুয়াসা আঁধার মুছিল রবির গায়
বিহগকুসুম সহস্রসুরে ফুটিল বনের ছায়।
গাছের পাতার ফাঁকা পথ দিয়ে রবির আলোর ঢেলা
ঘুমন্ত এই স্নেহপুরী মাঝে জুড়িল নিঠুর খেলা।
ধীরে ধীরে তারা জাগিয়া উঠিল, ছেলেরে স্কন্ধে করি'
আহারের খোঁজে চলিল জননী শাখাপথগুলি ধরি।
চলে দম্পতী ডাল হ'তে ডালে হাতে ধরি পাকা ফল
এ ওরে খাওয়ায় গান করে আর নেচে ফেরে চঞ্চল।
বৃদ্ধ এ বট, শূন্য বুকেতে কত কি যে কথা ভ'রে,
উতল বাতাসে কারে কি কহিছে বুঝি ফিস ফিস ক'রে।

বাঙ্গালা নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ

অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ এম্-এ

পাশ্চাত্য নাটক সাধারণতঃ পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত, এই পাঁচ অঙ্কের নাম যথাক্রমে—১। সূচন (**Exposition**) ২। বিবর্ধন (**Growth or development**) ৩। সর্বোন্নয়ন (**Climax**) ৪। পতন (**Fall**) এবং সমাপন (**Catastrophe or denonement**)। অবশ্য আধুনিক যুগের যুগান্তকারী নাট্যকার ইবসেনের পর হইতে বর্তমান নাটকে এই পঞ্চাঙ্ক বিভাগ রক্ষিত হইতেছে না বটে, তবে সেক্সপীয়ারের কাল হইতে প্রাক-ইবসেনীয় যুগ পর্য্যন্ত নাটকের এই পঞ্চধা বিভাগ নাট্যকারবৃন্দ মোটামুটি মানিয়া চলিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে নাট্যকার ঘটনার (action) বীজ বপন করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ গতির আভাস দর্শককে জানাইয়া দেন, দ্বিতীয় অঙ্কে নাটকীয় ঘটনা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া দ্রুত অগ্রসর হয়, তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকলার চরমোৎকর্ষ উচ্ছ্বসিত ভাবের প্রবল সংঘাতে দর্শকের মন আবেগ কম্পমান হইয়া উঠে। চতুর্থ অঙ্কে ঘটনার দ্রুততা কমিয়া আসিয়া সুনিশ্চিত পরিণতির দিকে শ্লথগতিতে অগ্রসর হয় এবং শেষ অঙ্কে প্রত্যাশিত মিলন অথবা মরণ ঘটিয়া থাকে। নাটকের এই পঞ্চাঙ্ক ছাড়া ঘটনা বহির্ভূত আর একটী অঙ্গও কোনো কোনো নাটকের থাকে। ইহাকে প্রস্তাবনা (**Prologue**) বলা হয়, নাটকের গোড়ায় সংস্থিত হইয়া ইহা দর্শককে নাটকীয় বিষয়বস্তুর পূর্বাভাস জানাইয়া দেয়, পাশ্চাত্য নাটকের পঞ্চবিভাগের ন্যায় সংস্কৃতনাটকের মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি এই পঞ্চসন্ধি আছে। কিন্তু আমরা এই প্রবন্ধে কেবল পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসারেই আলোচনা করিব।

বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা এবং গভীর বিশ্লেষণের পর ইহা আমাদের মনে হইয়াছে যে বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসকে যদি একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটকের সহিত তুলনা করা যায়, তবে তাহা অভিনব হইলেও অসঙ্গত হইবে না। নাট্য-সাহিত্যের ধারা নাটকের ঘটনা (action) বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং ঐ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত এক একটী যুগকে এক একটী অঙ্ক রূপে মনে করিতে পারি। বাঙ্গালা নাটকের ঐতিহাসিক ধারা যে নাটকীয় ঘটনার মতই অগ্রসর হইয়াছে আমরা তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইব।

প্রস্তাবনা

নাটক বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি তাহা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না। সেই যাত্রা ও পাঁচালী মধ্যযুগের বাঙ্গালীদের নাট্য-রসপিপাসা মিটাইয়া আসিতেছিল, আধুনিক নাটকের উদ্ভব সেই সব হইতে হয় নাই। ইংরাজ আগমনের পর উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে রঙ্গালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি। কিন্তু নাটকের পূর্ণ এবং পরিণত রূপ আসিয়াছিল—অনেক পরে মাইকেল মধুসূদনের সময় হইতে। তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত যে সব নাটক রচিত হইয়াছিল, সেইগুলিকে নাটক না বলিয়া নাটকের আভাস বলাই সঙ্গত। সেই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে রাম-নারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং হরচন্দ্র ঘোষের নাম করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাদের নাটক কোনো অভিনব মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারে না। সংস্কৃত সৃতিকাগৃহের চিহ্ন ইহাদের অঙ্গে সুপরিস্ফুট। ইহারা ভোরের আকাশের ক্ষণস্থায়ী রক্তিমচ্ছটা মাত্র। সূর্যোদয়ের পর হইতেই ইহাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য নাট্যধারার প্রস্তাবনায় ইহাদের একমাত্র স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম অঙ্ক

সূচন (Exposition)

প্রথম গর্ভাঙ্ক (মাইকেল দীনবন্ধু যুগ)

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা নাটক যথার্থ আরম্ভ হইয়াছে মধুসূদনের সময় হইতে। মধুসূদন এবং তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন শক্তিশালী নাট্যকারের দ্বারা বাঙ্গালা নাটকের বিভিন্ন দিক আগ্রহশীল জনগণের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছিল। ইঁহাদের মধ্যে মাইকেল এবং দীনবন্ধু আদিমত নাট্যরচয়িতা এবং উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্ম খুব বেশি, সেজন্য আমরা উহাদিগকে একত্রে প্রথম গর্ভাঙ্কে সন্নিবেশিত করিলাম।

মধুসূদন বাঙ্গালা নাট্যভারতীর দুর্দশা দেখিয়া সখেদে বলিয়াছিলেন—

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়

এই দুর্দশা দূর করিবার জন্য তিনি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং রঙ্গালয়ের অভিনয়ের উপযোগী পাশ্চাত্য রীতিসম্মত নাটক লিখিয়া নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ পথ সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিয়া যান, মাইকেলের পরে অনেক নাট্যকার বঙ্গ রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের পুরোবর্তী পথিকৃৎরূপে মাইকেলের অশেষ দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কেবল নাটক নয়, প্রহসনের ক্ষেত্রেও মধুসূদন আদি প্রবর্তনের অকুণ্ঠিত সম্মানের অধিকারী। একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ এই দুই প্রহসনের মধ্যে যে সত্যনিষ্ঠ বাস্তব

বিশ্লেষণ এবং সুনিপুণ হাস্যরস সৃজন করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে সুলভ নহে।

দীনবন্ধুর নাটকের অনেক স্থলেই মাইকেলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু যেমন ইংরাজী সাহিত্যে সেকস্‌পীয়ার তাঁহার পূর্বতন নাট্যকার ক্রিষ্টোফার মারলোর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তেমনি দীনবন্ধু ও মাইকেলের ঋণ গ্রহণ করিয়াও শ্রেষ্ঠতর নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধু বাস্তব নাট্য-সাহিত্যের অগ্রদূত, বোধ হয় তিনিই বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। আধুনিক বস্তুপ্রিয় সমস্যা সন্ধিৎসু নাট্যকারদের কাছে 'নীলদর্পণও' এখনও আদর্শরূপে বিদ্যমান, প্রহসন-রচয়িতারূপে দীনবন্ধুর প্রভাব পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে মাইকেলকে আদর্শ করিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদনের নাটকের দোষত্রুটী দীনবন্ধুর নাটকেও সংক্রামিত হইয়াছে, সংলাপে দীর্ঘ এবং দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, সংস্কৃত উপমা অলংকারের বহুল এবং অসময়োচিত ব্যবহার, অহেতুক কবিতার সংযোজন ইত্যাদি দোষ উভয়ের নাটকেই লক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অপেরা ও গীতাভিনয় (মনোমোহন বসু)

বাঙ্গালীর প্রাণ স্বভাবতই কোমল এবং ভাবপ্রবণ, সেইজন্য তরল, উচ্ছ্বাসময় ভক্তিধারা বাঙ্গালীর অন্তরে যেমন সহজে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, এমন আর কিছুই পারে নাই। নাটকের আবির্ভাবের পূর্বে দেবলীলাবিষয়ক ভক্তিমূলক যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদি দেখিয়া বাঙ্গালী ভক্তিভাবকে পরিতৃপ্ত রাখিত। রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরে পার্থিব ঘাত-প্রতিঘাতমূলক দৃশ্যকাব্য দেখিতে পাইল বটে কিন্তু তাঁহাদের ভাবতন্ময়তা এবং ভক্তিবিহ্বলতার পরিপুরক বিষয়াদি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিত। সেইজন্য ধর্মমূলক, ভাবতরল যাত্রা ইত্যাদি কোনো কালেই বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া যায় নাই। বাস্তব ঘটনা ও দ্বন্দ্ববিষয়ক নাটকের প্রচলনের পরে দর্শকদের যাত্রারস তৃপ্ত করিবার জন্য একরকম নূতন ধরণের নাটক উদ্ভূত হইল। এই নাটকগুলি নাটকের রীতি অনুসরণ করিয়া লিখিত হইলেও গীতের প্রাধান্যে এবং অলৌকিক ভাবের প্রাবল্যে যাত্রার সমধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর নাটককে সাধারণতঃ অপেরা বা গীতাভিনয় বলা হইয়া থাকে। মনোমোহন বসুই প্রথম সতী, হরিশ্চন্দ্র ইত্যাদি নাটক রচনা করিয়া গীতাভিনয় রূপ বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের এক বিশাল শাখার সূত্রপাত করিয়া যান, তাঁহার পরে বহুতর অপেরা ও গীতাভিনয় রচিত হইয়াছে। বহুদিন পর্যন্ত বাঙ্গালী জনসাধারণ এই নাটকগুলিকে পরম সমাদর করিয়া আসিয়াছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ঐতিহাসিক নাটক (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটকের আদি প্রবর্তক নহেন বটে কারণ তাঁহার পূর্বেই মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে ঐতিহাসিক নাটকের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় কৃতিত্ব হইল এই যে তিনিই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়া স্বাদেশিক ভাবোদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিলেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি যাঁহারা পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই জাতীয় ভাব উদ্বোধন প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পথ নির্দেশকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বিবর্ধন (Development)

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অপেরা ও গীতাভিনয়ের প্রসার (রাজকৃষ্ণ রায়)

মনোমোহন বসু দ্বারা অপেরা ও গীতাভিনয় জাতীয় নাটক সূচিত হইয়াছিল ইহা প্রথম অঙ্কে আলোচিত হইয়াছে। মনোমোহনের পরে যাঁহারা এই সব নাটক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য, এই সব নাট্যকারদের অসংখ্য নাটকে বাঙ্গালা সাহিত্য প্লাবিত হইয়াছিল এবং জনগণের মধ্যে ইহাদের এত বেশি প্রসার ছিল যে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত এই নাট্যধারাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই।

যাত্রা-লক্ষণাক্রান্ত নাটক লিখিয়া সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়। মনোমোহন বসুতে যাহার আরম্ভ রাজকৃষ্ণ রায়ে তাহার পূর্ণ পরিণতি, রাজকৃষ্ণ রায়ের অনেক নাটক এককালে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল ; অপেরা, গীতাভিনয় প্রভৃতিকে একটু কঠোর ভাবে বিচার করিলে নাটক বলা চলে না এইজন্য, যে নাটকের মধ্যে পাত্র পাত্রীর ঘাত প্রতিঘাতে নাটকীয় রস পরিস্ফুরিত হয়, নাটকের ঘটনা-বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, কিন্তু গীতিনাট্য প্রভৃতিতে অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত ক্রিয়া প্রক্রিয়ার জন্য নাটকের চরিত্র বিকশিত হইতে পারে না, এবং ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি চরিত্রের অভ্যন্তর হইতে গড়িয়া উঠে না। কোন বিশেষ দেবমাহাত্ম্য কিংবা অলৌকিক লীলারহস্য ব্যক্ত করিবার জন্যই এই সব নাটক লেখা হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সব নাটকে ঘটনা সংস্থাপন এবং চরিত্র বিকাশনে কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দিবার সুযোগ নাই। অথচ ঐ দুইটী বৈশিষ্ট্যই নাটকের সর্বাপেক্ষা বেশি লক্ষিতব্য গুণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গিরিশ যুগ

অনেক প্রসিদ্ধ সমালোচকের মতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার, সুতরাং তাঁহাদের কথা মানিতে গেলে বলিতে হয় যে বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের পরাকাষ্ঠা (climax) তাঁহার সময়েই আসিয়া

গিয়াছে। এই বিষয়টী একটু ধীর এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করা দরকার। অবশ্য একথা ঠিক যে গিরিশচন্দ্রের সময়েই বাঙ্গালা দেশের নাটকীয় আন্দোলন (Dramatic movement) চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা, রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা এবং অভিনয় শিল্পের শিক্ষা দানে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমকক্ষ লোক বাঙ্গালায় কেহ জন্মায় নাই। নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের ইতিহাসের স্বর্ণময়যুগ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের এই পরিচালক, প্রযোজক, ব্যবস্থাপক এবং শিক্ষক গিরিশচন্দ্র আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি এমনি ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে তাহার নাট্যবিচারে আমাদের অপক্ষপাতী বিশ্লেষক দৃষ্টি সজাগ করিয়া রাখিতে পারি না। গিরিশচন্দ্র প্রায় আশীখানা নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব সৃষ্টির বহুলতায়, শিল্পের অনন্যসাধারণত্বে নয়। কারণ গিরিশচন্দ্র একমাত্র গৈরিশছন্দ ব্যতীত কোনো অভিনব নাট্যকলার প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। সামাজিক নাটকে তিনি দীনবন্ধুর প্রতিভাশিষ্য, ঐতিহাসিক নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবপুষ্ট, এবং ধর্মমূলক পৌরাণিক নাটকে মনোমোহনও রাজকৃষ্ণের আদর্শপ্রাপ্ত, সুতরাং বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাসের প্রথম অঙ্কে যে নাট্যশালাগুলির সূচনা হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র সেইগুলিকে পূর্ণতার দিকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক শিষ্যবর্গ অনেকেই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। হাস্যরস সৃজনে অমৃতলাল দীনবন্ধু প্রতিভার যোগ্য উত্তরাধিকারী। অমরেন্দ্রনাথ কয়েকখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি প্রসিদ্ধ উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণতা (দ্বিজেন্দ্রলাল— ক্ষীরোদপ্রসাদ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে জাতীয়ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহারই পরিপূর্ণ বিকাশ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ও ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম প্রভৃতি ২।৩ খানা নাটক ব্যতীত, অধিকাংশ নাটকই প্রচ্ছন্ন ধর্মভাবে আচ্ছন্ন। দ্বিজেন্দ্রলালই ঐতিহাসিক নাটকের বীররস ও স্বদেশী ভাবোদ্দীপনার দ্বারা বঙ্গরঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; নাটকের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিতে যদি কেহ সর্বাপেক্ষা বেশি সক্ষম হইয়া থাকেন, তবে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রকৃত বীররস সৃজনে এবং নাটকীয় দ্বন্দ্ব সমাবেশে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটক, গীতিনাট্য ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি কয়েকখানা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকের উপরেই নির্ভর করিয়াছে। তাঁহার আলমগীর, প্রতাপাদিত্য, পদ্মিনী, চাঁদবিবি প্রভৃতি রঙ্গালয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় ওজস্বিনীভাষা এবং বীররস সৃজনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, ঘটনার বাহুল্য অনেক সময়েই তাঁহার নাটকীয় সংহতি ও ঐক্য নষ্ট করিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক

সর্বোন্নয়ন (climax)

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা বাঙ্গালা নাট্যধারার climax লক্ষ্য করিয়াছি ইহা বলিলে হয়ত আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু সেই আপত্তি কখনো নিরপেক্ষ আলোচনাপ্রসূত নহে। গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি যে কারণে নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই কারণে নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। রঙ্গালয়ের তাড়নায় শুধু প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখেন নাই, নাটকের মধ্যে তাঁহার শিল্পী মানসের স্বাভাবিক বিকাশই হইয়াছে। একথা সত্য যে তাঁহার নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কোনোদিন তেমন জনপ্রিয় হয় নাই এবং দেশের মধ্যে তেমন কোনো আন্দোলনও সৃষ্টি করে নাই, কিন্তু সেই কারণে ইহার মূল্য একটুও কমিয়া যায় নাই। কারণ অতি বাজে নাটকও যে দেশের মধ্যে অদ্ভুত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে তাহা আমরা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটকও প্রায় লক্ষাধিক দর্শককে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং সেই দিক দিয়া বিচার করিয়া লাভ নাই। কিন্তু নাট্যশিল্পের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার নাটকে সেই শিল্পের চরমোৎকর্ষ হইয়াছে, নাটকের প্রাণ হইল ইহার সংলাপ, সংলাপের মধ্য দিয়া নাট্যকারকে দ্বন্দ্ব ও নাটকীয় রস সৃষ্টি করিতে হয়। ভাষা রাজ্যের শাহান শা বাদশা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকের পাত্রপাত্রীর কথার মধ্য দিয়া আবেগবান ও গতিমান ভাবের সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার নাটকের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ, মারামারি ইত্যাদি বাহ্য স্থূল ক্রিয়ার অভাব, কিন্তু কথোপকথনের চমৎকারিত্বে আভ্যন্তরীণ ঘাতপ্রতিঘাত সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা ও শেষরক্ষার মধ্যে তিনি যেমন পরিশুদ্ধ, সুনির্মল, সুমার্জিত হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অন্য কাহারো নাটকে দেখা যায় নাই। তাঁহার রূপক নাটকগুলি সম্বন্ধে নানা রকম মতামত আছে। প্রচলিত নাট্যাদর্শ অনুযায়ী হয়তো এই ধরণের নাটককে স্বীকার করা যায় না, কিন্তু ভবিষ্যতে দর্শকের দৃষ্টি অধিকতর সূক্ষ্ম ও কল্পনাপ্রবণ হইলে হয়তো রূপক নাটকের যথাযোগ্য সমাদর হইবে। আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যগুলিতে রূপকতত্ত্ব থাকিলেও বাহ্য ক্রিয়ার অভাব নাই, সুতরাং তত্ত্ব না বুঝিতে পারিলেও নাটকীয় রস সম্ভোগে ব্যাঘাত হয় না।

চতুর্থ অঙ্ক

পতন (Fall)

রবীন্দ্রোত্তর নাট্যধারা

রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহার নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার পরেই নাট্য-সাহিত্যের দুর্গতি সুরু হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পরে কোনো প্রথম শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার বিকাশ আমাদের দেশে হয় নাই। যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় নাট্যকার বর্তমানে নাটক রচনা করিতেছেন, তাঁহারা কোনো অভিনব এবং যুগান্তকারী নাট্যাদর্শ দেখাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রোত্তর নাট্যকারদের মধ্যে যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,বিধায়ক ভট্টাচার্য,প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায় প্রভৃতি যে সব পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে তাঁহারা পৌরাণিক নাটকের চিরচলিত ধর্ম ভক্তিভাব এবং অলৌকিক ঘটনা বর্জন করিয়াছেন। আধুনিক নাট্যকারদের দ্বারা পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি দ্বন্দ্ব ও ঘটনাবহুল মানবীয় চরিত্রের মত হইয়াছে। শচীন সেনগুপ্ত ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকে এবং বিধায়ক সামাজিক নাটকে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আধুনিক সামাজিক নাটকে সমাজের নানা যৌন ও রাজনৈতিক সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিতেছে। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আধুনিক নাট্যকারবৃন্দ সমধিক তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বর্তমানে নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রমথনাথ বিশী স্বীয় গুরু বার্ণাড শ'এর আদর্শে ব্যঙ্গাত্মক নাটক লিখিতেছেন।

বাঙ্গালা নাটকের এই চতুর্থ অঙ্কই চলিতেছে, ইহার পঞ্চম অঙ্ক কবে আসিবে বলা যায় না, কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ অঙ্ক সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায় বটে। রবীন্দ্রনাথের পর হইতে বাঙ্গালা নাট্যধারা বিশীর্ণ, মন্থরগতিতে অগ্রসর হইয়াছে ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালার রঙ্গালয়-গুলির শোচনীয় দুর্গতি ইহার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে নব নব নাট্যপ্রতিভার বিকাশ হইতে পারে ; সেই প্রয়োজন যখন ফুরাইয়া আসে, তখন নাট্যকারবৃন্দ আর নেহাত কলাচর্চার আনন্দে নাটক লেখার অনুপ্রেরণা বোধ করেন না। রঙ্গমঞ্চগুলির পরিচালনা এবং ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে অদূর ভবিষ্যতে যে ইহাদের অভ্যুত্থান সম্ভব হইবে তাহা মনে হয় না। বর্তমান রঙ্গালয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কলা কৌশলময়ী সিনেমা। আধুনিক দর্শকবৃন্দ সিনেমাতে পরিমিত সময়ের মধ্যে সর্বপ্রকার আমোদ ও রস উপভোগ করিয়া আর মধ্যযুগীয় ইন্দুর চামচিকা অধ্যুষিত থিয়েটারে যাইবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না, সেইজন্য নাট্যশিল্প এবং অভিনয়কলার আর উন্নতিও হইতেছে না। এই ভাবে চলিতে থাকিলে কিছুকালের মধ্যেই যে চার পাঁচটা থিয়েটার পুরাতন নাট্যলীলার সাক্ষ্য-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, সেইগুলিও নিভিয়া যাইবে। যে রঙ্গালয়ের ইতিহাসের সহিত কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অদ্বিতীয় নটলীলার স্মৃতিবিজড়িত সেই রঙ্গালয় হয়ত দেশ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং তখন অভিনেয় নাটকেরও প্রয়োজন থাকিবে না। হয়তো সিনেমা টেকনিকে নাটক লিখিত হইবে, তাহার সূচনা এখন হইতেই দেখা গিয়াছে, কিন্তু সেই সিনারিও ধরণের নাটককে নাটক বলা সঙ্গত হয় না। সুতরাং আমরা বিষণ্ণনেত্রে ভবিষ্যতের গর্ভে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি যে বাঙ্গালা নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি (catastophe) আসন্ন। যদি সৌভাগ্যক্রমে এমন কোনো কারণ উপস্থিত হয় যাহাতে নাট্যশিল্পের পুনরায় প্রসার এবং উন্নতি হইতে পারে, তবে নাট্যামোদী ব্যক্তিমাত্রই সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

অনাদি কালের প্রবাহ চলেছে

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

অনাদি কালের প্রবাহ চলেছে—কবে তার উন্মেষ
জানেনাকো কেউ, জানে না কখন হবে তার অবশেষ।

সুদূর অতীতে চেয়ে দেখি যবে আনন্দে উচ্ছলি
ভোরের আকাশ মাটিতে নামিয়া প্রথম পড়েছে ঢলি,

চারিদিক যেন চমকি চাহিল পাখীদের কলগানে !
আলোকে সবুজে গলাগলি করি কী যেন কহিছে কানে।

আমারো তখন নয়নে ভাসিছে অনন্ত বিস্ময় !
কী যেন পেয়েছি, আরো কত কিযে বুঝিবা আড়ালে রয় !

অতুল পুলকে দুলিতে দুলিতে ভেবেছিল কচি মন—
এমনি বুঝিবা আসিবে নিত্য আলোর নিমন্ত্রণ।

* * *

বাজালো বিষাণ বৈশাখী ঝড় দিনের প্রান্তে আসি,
আকাশে উড়িয়া ভাসিয়া চলিল ছিন্ন মেঘের রাশি ;
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ বাজিল রুদ্রতাল,
সৃজনধ্বংসলীলায় মেতেছে ভৈরব মহাকাল !
প্রলয়ঙ্কর মেঘডম্বরু, আকাশের বুক চিরে
কে যেন ধরার মুণ্ড ছিঁড়িতে অট্টহাস্যে ফিরে।
ছোট গৃহকোণে ভয়-বিহ্বল খুঁজেছিনু আশ্রয়,
চকিতে দেখিতে সোনালি আলোক কোথা পেয়ে গেল লয় !

* * * *

আজো সংশয় ফিরে ফিরে আসে, আসে মোর ভীরু মনে—
ভাঙা আর গড়া—এটা কার খেলা কেন কোন্ প্রয়োজনে !
চলেছে প্রবাহ অনাদি কালের—কোথা সুরু কোথা যতি ?
আমি মাঝখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজি তারি সঙ্গতি।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

ভোর হতেই ঘুম ভেঙে ডাক্তার বিনোদ—"একি মাণিকলাল কোথা! সতরঞ্চি খালি যে! মাণিকলাল—মাণিকলাল?"

"এই যে হুজুর" ব'লে মাণিক হাজির।

"একটু চায়ের কি হবে বল দেখি! বদ অভ্যাস যে অনেক, স্টেশনে সরাব্জি..."

"আপনি মুখটা ধুয়ে ফেলুন দিকি, চা তয়ের।"

"বলো কি, এত সকালে তো সরাবজি শয্যায় থাকেন, ঘরের 'স্ত্রীও' সাড়া দেন না—পাবে কোথা?"

"আপনি উঠুন তো।"

সঙ্গে সঙ্গে কেটলি ভরা চা, কাপ ও দুখানা রুটি আর গুড় হাজির।

বিনোদ অবাক—"কখন কি করলে? মেয়েদের হার মানালে যে!"

"সেটা কেউ পারেনি, পারবেও না হুজুর!"

"সেটি থাকতে আর দিচ্ছে কই—শুভানুধ্যায়ী শত্রুর অভাব নেই হে..."

"তা বটে, আমাদের পাড়াগাঁয়ে কিন্তু এখনো..."

"বেশ আছ, বেশ আছ।—আঃ বাঁচালে। বানিয়েছও সুন্দর—দু'কাপ মিলবে তো?"

"কেটলি ভরা আছে, যতটা ইচ্ছে খান না, আহারের তো ঠিকানা নেই, তাই দু'খানা রুটিও করলুম।"

"সত্যি মাণিক, কি সুন্দরই লাগছে। তুমিও খেয়ে নাও, আমাকে আবার স্টেশনে যেতে হবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—কাজ আরম্ভ ক'রে দিন, যার জন্যে আসা..."

"সে তো বটেই and to receive পিসি। তিনি এসে গেলেই নিশ্চিন্ত হই। কই মাছের উপায় চিন্তা করি—"

"সে কি মশাই—কলেরায় কথা যে কননা—"

"আহা সে তো আছেই। পিসিকে দেখলে যম পালায়, কলেরা তো যমের একটা চীনে-পটকা—খুদিরাম-সেপাই। পিসি বিলিতি বোডেসিয়ার ভগ্নী।"

উৎকর্ণভাবে অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায়—"হুইসিলের আওয়াজ না!" Train in হ'চ্ছে যে।" তখনো আধখানা রুটি হাতে। নাঃ এ জিনিস ফেলা যায় না। মুখে পুরে, "তুমি বসে বসে চালাও। আমার রাজবেশ আঁটাই আছে। জয় মা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী" বলতে বলতে চঞ্চলভাবে স্টেশনে ছুটলেন।

মাণিকলাল অবাক!—"ব্যাপার কি? এসে পর্য্যন্ত একদণ্ড মাথার ঠিক পেলুম না। এই তো কয়দিন নামে মাত্র আসা। দুদিন তো না কাজ, না স্নানাহার, না রুগীর খোঁজ খবর। দিল্লীও নয়, লাহোরও নয়, তিনটে স্টেশনের মাথায় কর্ম্মস্থান, এত চিন্তাই বা কিসের। এসেই পিসির জন্যে জরুরি টেলিগ্রাম। মা ঠাকরুণ অসুস্থ নাকি? আমরা কিনে দিয়ে এলুম তবে কার জন্যে! ওঃ, অরুচি নয়তো? না, তা কি ক'রে হবে! এই তো গত আষাঢ়ে বিবাহ করেছেন। যাক্—এখন কাজের দিকে ঝুঁকলে যে বাঁচি, কখন কে হঠাৎ inspection-এ এসে পড়বে তার তো ঠিক নেই। তাদের বাজার করতে আসা, আর Travelling Draw প্রধান হলেও আমাদের কাছে তো সেটা inspection—এসব কথা তো ভাবছেন না, শেষে এই গরীবও যে—

মাণিকলাল সব গুছিয়ে তুলে রাখলে, কেটলিতে এক কাপের মত চাও রাখলে, "কি জানি কি অবস্থায় আসবেন! বাসা থেকে চারটি চাল ডাল আর মশলা সঙ্গে ক'রে বেরিয়েছি, পিসি এলে কাজে লাগবে। কিন্তু হুজুরের অবস্থাটা না জানলে যে আমারও স্বস্তি নেই। শ্রীহরি ওঁর মঙ্গল করুন, আমি বাঁচি। এ যেন মিছে কাজে ঘুরছি আর বিড়ি ধ্বংস করছি। মায়া করে আর কি করবো, একটা ধরানই যাক।"

বিড়িও শেষ, বিনোদেরও প্রবেশ। হাসিমুখে উৎফুল্ল-চিত্তে—"কোথায় হে মাণিকলাল—"

"আজ্ঞে এই যে—"

"বুঝলে !—ভগবানের ভুল ধরে ফিরেছি।"

"সেকি মশাই, পিসিমার খবর পেলেন ?"

"Of course—খবর আবার কি—in body length and breadth পেয়েছি।"

"বাঁচলুম মশাই, আমি শ্রীহরির স্মরণ করছিলুম।"

"করবে বইকি—Thank you—হ্যাঁ এসে গেছেন with এক নাগরি খেজুরে গুড়। বড় ভুল হ'য়ে গেল, খানিকটা রাখলে—মুড়ির সঙ্গে মন্দ হত না। তাঁকে সংসারের কথা খুঁটিয়ে বোঝাতে গিয়ে সব ভুল হয়ে গেল হে। বড় চিন্তায় ছিলুম কিনা—"

"মা ঠাকরুণের অসুখ টসুখ নাকি—তাতো বলেন নি—"

"অসুখ তো বটেই, তবে তাঁর নয়—আমার, I mean সে রোগের ভোগটা আমাকেই ভুগতে হয়।"

"তা তো হয়েই থাকে মশাই, আপনি ছাড়া আর কে ভুগবে! অত ভাববেন না—সেখানে খোদ বড়কর্ত্তা রয়েছেন…"

"তোমাদের সকলেরি ঐ এক কথা! আরে বড় কর্ত্তারাই তো ছোট কর্ত্তাদের মনে প্রাণে বদ হাওয়া সৃষ্টির সর্দ্দার—"

"সেটা বোধহয় সাবধান করবার জন্যে।"

"তাই তো পিসিকে আনালুম হে।"

"বেশ করেছেন। কই তিনি কোথায় ?"

"সে ভারী সুবিধে হয়ে গেছে, তাই তো বলছিলুম—ভগবানের ভুল ধরে ফিরেছি, Quite unexpected—ফস্ ক'রে দয়া ক'রে ফেলেছেন। এমনটাতো করেন না। পিসি প্ল্যাটফরমে পা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তোত্‌লা নন্দ হে, দেখি পোঁটলা নিয়ে ঘুরছে! বললুম, 'কোথা হে ?'…বললে, 'কু-কু-কুটকুটে ও-ও-ওল্ ছেঁচকি আ-আর খেতে পারছি না—সেই কে-কে-কেষ্টা শালার বাড়ী পা-পা-পালাচ্ছি মু-মু-মুখটা বদলাতে, তাই কাঁ-কাঁ-কাঁকড়া কটা কি-নিয়ে যাচ্ছি। রো-রো-রোববার নি-নিরামিষ খাই কিনা…' কাঁ-কাঁকড়া তো মা-ম্না-মাছ নয়।"

"বললুম, আমার যদি একটি উপকার কর ভাই, পিসি এই ট্রেণে দেশ থেকে এলেন, নবান্নর একটু গুড় নিয়ে, ওঁকে আমার বাসায় পৌঁছে যদি দাও।"

"gla-gla-gladly sir—আ-আ-আসুন পিসিমা। গা-গা-গাড়ি দাঁ-দাঁড়িয়ে।"

"তাঁদের তুলে দিয়ে আসছি। ভগবানের এতো দয়া কোনদিন পাইনি মাণিকলাল। বাস্ এখন নিশ্চিন্ত—দেখাশোনার দুর্ভাবনা ঘুঁচলো, Time change.—এইবার—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সেই কথাই সর্ব্বক্ষণ ভাবছি—"

"আমিও কি ভাবছি না মাণিক, সে 'কই মাছ' খেতেই হ'য়েছে। 2nd classটা একবার হয়ে আসি—তারপর—"

মাণিক হতভম্বের মত বললে, "আজ্ঞে কলেরার কথা যে রয়েছে হুজুর।"

"আহা সে জন্যে ভেবনা—সে তো আছেই এবং থাকবে,—ও হাত লাগিয়েছি কি সাফ্। সেও তার কাজ করতে এসেছে, একটু করুক্ না। কাকেও বাধা দিতে নেই হে।"

"আজ্ঞে হাতটা লাগান তো। কি জানি কখন কে বাজার করতে এসে পড়বে, তারপর একটা খুঁত ধরে খোশনাম নেবে…"

একটু চিন্তিতভাবে—"কদিন অপার চিন্তায় কেটেছে মাণিক, আজকের দিনটে সামলে নিতে দাও, একবার চিন্তা মন্দিরটে ঘুরে plan ঠিক ক'রে আসি। এখন আর চা—"

"এই যে নিন না।" কেট্‌লি আর কাপ হাজির ক'রে দিলে।

বিনোদ অবাক! "তোমাকে পেয়ে—"

"আগে হয়ে আসুন"—মাণিক আর দাঁড়াল না।

বিনোদ চিন্তা-মন্দিরে পা বাড়ালো। মাণিকের যাতে ভালো হয় তা করতেই হবে। মা ক'রে দেবেন। অমন কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক বিরল।"

মাণিকলাল উদাসভাবে—"শ্রীহরিদয়া করুন, ডাক্তার-বাবু বড় সরল প্রাণের লোক, সব বোঝেন, কিন্তু কথা পেলে সময়জ্ঞান থাকে না—একেবারে মহাভারত সৃষ্টি করেন—মহাপ্রস্থানে না নিয়ে গিয়ে ফেলেন। বড়দের কখন কে পরের মুণ্ডে কমলালেবু নিতে আসবেন সে চিন্তা থাকে না। আমাদের এ ইমামবাড়ার পাশ দিয়ে গেলেও কেউ বুঝতে পারবেনা যে ডাক্তারবাবু এইখানে থাকেন। সিনেমার

দুখানা প্ল্যাকার্ড জুটিয়েছি, ওঁর নামটা লিখে বাইরে টাঙিয়ে রাখি।"

লিখতে বসলো :

Dr. Benodebehari Chakravarty
Medical Officer In charge
Cholera Camp.

একখানা ইংরিজি, একখানা হিন্দী।

"তাই তো, হিন্দীর 'হ'টা যে ভুলে যাচ্ছি। থাক—হরপের ভিড়ের মধ্যে অত কেউ দেখবে না। অনেকেই আমার মতো পণ্ডিত।"

"মনেরি বাসনা শ্যামা"—"কি হে মাণিক, কি পড়ছ, সমন নাকি!"

"আজ্ঞে না, ও একটা আপ্তসার ক'রে রাখছি, কখন কোন্ সুলতানের আবির্ভাব হবে, ডাক্তারবাবুর বাসা খুঁজে পাবে না, তাই।"

"তুমি 'কিন্তু' হচ্ছ কেনো। সে অপরাধ তো আমার। তখন কি আমার মাথার ঠিক ছিলো? বৈরাগ্য পেয়েছিলো। ভাগ্যে পিসি এসে গেছেন। এখন অট্টালিকা কে আটকায়! এ বাসায় তিনটি ছাড়া চারটি কাজ চলে না মাণিক। No one—পাগল হওয়া যায়, No two গলায় দড়ি চলে, No three সর্পাঘাত—finish দেখ না মাথা-মুড়্ খুঁড়ে "কই" মেলবার plan brain-এ আসছিলো না। যেই স্নান সেরে 2nd classএর গদাধরদের গদ্দিতে বসা, অমনি পিল্ পিল্ ক'রে plan মায় এণ্ডাবাচ্ছা মাথায় ঢুকে পড়লো, ওই সব গদ্দিতে বসে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁরা লোকের শুভ চিন্তায় ধ্যানস্থ থাকেন কিনা! আমার চারদিকে "কই" যেন লাফাতে লাগলো। এইবার নাওনা কত কই চাই।"

মাণিক স্তম্ভিত। "আর কলেরা! আপনি যে একবারও সে কথা…"

"আরে তিনি তো আছেনই, তাঁর দৌলতেই সব মিলবে। সাধনা একমুখী, ওইটে নিয়েই ছিলুম কিনা—"

"চাকরি থাকলে তো! কিছু বুঝতে পারছি না মশাই!"

"পারবে পারবে—অচিরেই পারবে। মিথ্যা থাকতে চাকরির মার নেই। দেখচ না দুনিয়া চলেছে কার জোরে। এখন একটা কাজ করো দেখি।—এতো কই supply করছে কে? কেমন লোক? একখানা দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি officer commandingএর নামে। লোকটাকে I mean, contractorটাকে দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস—mind—ফিরিয়ে নিয়ে আসা চাই। দ্বিতীয় কেউ না দেখে শোনে—বুঝলে? তারপর, কলেরা, সে তো হাত লাগালেই সাফ, বুঝেছ? বেটারা আমাকে Expert ধরেছে, সেটা দেখাতে হবে তো!"

"হুজুরের কাছে মিথ্যে কথা কইবনা, বুঝতে কিছুই পারছি না। তবে আপনি যা বলবেন তাই করবো। বাড়িতে খুড়ো-মশাই আছেন—উদ্দিকে সব গেলো, তিনিই দেখা শোনা করছেন। আমার শুভানুধ্যায়ী কিনা, পুকুরটা গেছে, এইবার কুঁড়েখানা। ভেবেছিলুম, ফিরে যা হয় করবো। তা আর—"

অবাক হয়ে—"অ্যাঁ, তোমারো শুভানুধ্যায়ী জুটেছে? দেশটা ছেয়ে গেল যে! কিছু ভেবনা মাণিক, মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিও।"

"ব্রহ্ম বাক্যে আমার বিশ্বাস আছে মশাই, কিন্তু চিঠি পেলুম—সাত বছরের ছেলেটা নিজের পুকুরে আঁচাতে গিয়ে তাঁর চড় খেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ী ঢুকেছে। কে আর দেখবে, খুড়ো দেশে থাকেন, ভিটে আগলান, সকলেই তাঁরি মুখ চেয়ে কথা কয়,…কইবেই তো—"

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ভেবনা দুটো মাস অপেক্ষা কর—এখন যা বললুম…মা আছেন—"

"আর আপনি আমার আছেন।—দিন কি দেবেন।"

"একখানা কাগজ দাও দিকি। বেশ করে একটা জবর report draft করে ফেলি।"

"Report কিসের মশাই?"

"আরে—কই মাছ কি আপনি পুকুর থেকে লাফিয়ে এসে ঝোলে পড়বে নাকি? কাগজ দাও—"

"কাগজ কোথায় পাব মশাই! আপনি যে বললেন—তারা প্রমোসন্ পেয়ে টাকা হতে যাচ্ছে—"

"আরে সেই কলচেটা আছে তো।"

"ওঃ, সেই কলচেটা? আপনি যে বলছিলেন, ওতে একটা ছাপ মারলেই লাখ টাকাও হয়।"

"সে কি তুমি মারলে হবে, না আমি মারলে হবে! হবে না কেনো···শ্রীঘর হবে।"

"আমার কাজ নেই মশাই লাক্ টাকায়।" কলচেটা এনে দিলে। ডাক্তার লেখায় মন দিলেন:

Commanding Officer of Resting Regiment :

Honourable revered Sir, The Demon of a fish contractor is playing havoc and spreading cholera daily in hundreds. The fish by name Koi is a dangerous creature. They live on filth and dirt in dirty ponds. Busty men and women wash the rags of infected patients in these infernal ponds and poison the water. Koi flourish fast by devouring the dirt and fetch high prices from market. Unless and until it is checked no Solomon can check the spread of cholera here. The whole locality will be cholera-ridden in no time. I am in wits end, particularly for safety of your Regiment and solicit your kind order and help to stop the sale of those hellish koi fish.

Your most obedient servant
Benode Chakravarty
The responsible Doctor in
charge of cholera calamity.

মাণিককে শোনালেন। সে বললে, "শুনেছি কাবুলী শম্ভু মুখুয্যে মশাই নাকি এই styleএ লিখতেন। আপনি Editor হননি কেন?"

"সে অনেক কথা, অন্য সময় বলব।"

মাণিক বললে, "মাপ করবেন হুজুর, এতে "কইয়ের" কিন্তু গয়া হয়ে যাবে যে, সে ফস্তুতে ডুব মারবে।"

"সেই কথাই ভাবছি—কলম ধরলে যে জ্ঞান থাকে না।"

"কিন্তু একবার হাত কেটে ফেললে যে আর জোড়বার রাস্তা রইবে না হুজুর। আমাদের accacio কাজ দেবে কি?"

বিনোদ সহাস্যে—"Thank you মাণিক—পর হস্তে নিয়ে পড়া হবে—"পরবশম্ দুঃখম্"। ওটা এখন থাক। ও একটা ব্রহ্মাস্ত্র বানিয়ে রাখলুম হে আপৎকালের জন্যে। এখন ছাড়ব না।"

"তাই বলুন।"

"এখন একটা নোটিস (Notice) লিখে দিচ্ছি—(সে ক্ষমতা আমার আছে) তুমি তাকে অর্থাৎ সপ্লায়ারকে পড়ে শোনাবে। কলেরা ক্ষেত্রে 'কই' সেলের বিক্রির মানে যে জেল, সেটা বুঝিয়ে দেবে। অবশ্য গোপনে, শুভানুধ্যায়ীর মতো। আর বলতে হবে?"

"আজ্ঞে না, মেয়ের বিয়ে তো নয়, অতো গাঁইগোত্র দরকার হবে না।"

"কিন্তু আসল কথাটা জেনে আসতে হবে, বুঝলে?"

"আজ্ঞে সেটা কি আর বলে দিতে হয়, ইঁদুর বললে তার ল্যাজটা ভুলতে পারি কি?"

"All right" বলে Notice লিখে দস্তখত ডাললেন—"V. Chakar—"

"V লিখলেন যে?"

"Vএ Victory কাগজ পড়না ওই তো দোষ। V এখন গাছে ঝোলে, Lightএ জ্বলে, মাটি মাড়ায় না। ওর মর্য্যাদা কতো! যাও, এখন তোমার 'হরি' বলে' বেরিয়ে পড়। কাল আর মুড়ি চিবুতে হবে না। মাড়ি রেহাই পাবে।"

মাণিক বেরিয়ে পড়ল।

"তাই তো এখন কি করি। মাণিক না থাকলে আমার একদণ্ড চলে না। বিড়ি খেতে মাণিক বারণ করে। বলে, ওটা আপনার positionএর opposition। আরে সাধে কি খাই! pocket যে vacate—করে ফেলেছি, ধোঁয়ার ঘূর্ণগতি দেখাই ভাল। শেষ সকলেরি ভাগ্য ধোঁ ছাড়ে। তখন নিজেরটা তো দেখতে পাব না।"

(ক্রমশঃ)

গীতার কথা

শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায়

(২)

৭। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ

দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের বিভূতি সকলের কথা এবং শ্রীভগবান্ যে তাঁহার একটী অংশেই এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন সেই কথাটিও শুনিয়া অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দেখার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি শ্রীভগবান্‌কে ঐ প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রার্থনা স্বীকার করিলেন এবং বিশ্বরূপ দেখার সামর্থ্য লাভের জন্য তাঁহাকে দিব্য চক্ষুও দিলেন। একাদশ অধ্যায় সমস্তই বিশ্বরূপের বর্ণনায় পূর্ণ। এই বর্ণনার কিয়দংশ শ্রীভগবান্ নিজেই করিয়াছেন, কিয়দংশ সঞ্জয় করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট অর্জ্জুন স্তুতিপূর্ণ বাক্য দ্বারা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার বিশ্বরূপের মধ্যে দেবলোকের দেবতাগণকে এবং মনুষ্যলোকের চরাচর সমস্ত জগৎ একত্রস্থিত দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে যুদ্ধের ফল দেখাইবার জন্য সংহার মূর্ত্তিও ধারণ করিয়াছিলেন। ফলে সেই বিশ্বরূপের মধ্যে সৌম্যমূর্ত্তি ও উগ্রমূর্ত্তি উভয়ই ছিল। শ্রীভগবান্ যখন এই বিশ্বটা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তখন এই বিশ্বটাই তাঁহার আংশিক রূপ। আমরা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা বিশ্বটা দেখিলে কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি এবং কতকটা কল্পনা করিতে পারি শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ কি? শ্রীভগবান্ ছাড়া যখন কিছুই নাই তখন সমস্তই তাঁহার রূপ। এই রূপ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করা যায়, ততই তাঁহার বিষয় উপলব্ধি হইতে থাকে। এই রূপের মধ্যে সৌম্যমূর্ত্তিও আছে, রুদ্রমূর্ত্তিও আছে। প্রকৃতির নানাবিধ কার্য্যে যথা ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে, অগ্নিদাহে, সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে, আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি নির্গমনে, প্রবল বায়ু প্রবাহে, মেঘ-গর্জ্জনে ইত্যাদি বিষয়ে এবং যুদ্ধ বিগ্রহেও শ্রীভগবানের সংহার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মনে রাখা আবশ্যক যে এ সকল ভগবানের নির্দ্দয়তার পরিচায়ক নহে। তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার দ্বারা কোন প্রকার অমঙ্গল হইতেই পারে না। এ সমস্তই আমাদেরই ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কর্ম্মের ফল। তাহাতেও মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছা রহিয়াছে, কারণ শ্রীভগবানের দ্বেষ্য কেহ নাই। অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কাহারও ভাগ্যে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দেখা ঘটে নাই। শ্রীভগবানের প্রতি অর্জ্জুনের অনন্য ভক্তি ইহার কারণ শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন। সে ভক্তি কিরূপ? অর্জ্জুন নাক টিপিয়া বসিয়া সমস্ত দিবারাত্র তাঁহার চিন্তা করিতেন না। তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল ছিল। তিনি ভিতরে বাহিরে সমান ছিলেন। কর্ত্তব্য পালনের জন্য তিনি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনিই তাঁহার সমস্ত আত্মীয় স্বজনের নাশের ও ধর্ম্ম লোপের কারণ। অতএব তাঁহার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়াই তিনি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া রথের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কোন প্রকার লোভ বা স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় আদৌ ছিল না। ইহাই প্রকৃত ভক্তি। তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই প্রথমে শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার মতভেদ হইয়াছিল এবং শ্রীভগবান তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলে তিনি শ্রীভগবানের উপদেশানুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন।

৮। শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত নামাবলী ও গুণ।

সৃষ্টির বিষয় জানিতে হইলে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্‌কে জানা প্রথম আবশ্যক। কিন্তু তিনি অনন্ত, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানা অসম্ভব। তথাপি যতদূর সম্ভব তাঁহাকে জানার চেষ্টা করা উচিত। শ্রীভগবানের নামাবলী মনোনিবেশ করিয়া বারংবার চিন্তা করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হয়।

১। অচ্যুত—ভগবান্ স্বরূপ বা অরূপ যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার অর্থাৎ কোন কারণই তাঁহাকে সেই স্বভাব হইতে চ্যুত বা ক্রোধাদি বিকারযুক্ত করিতে পারে না।

২। অরিসূদন—শত্রুবিমর্দ্দন।

৩। কৃষ্ণ—কৃষ = উৎপত্তি বা সত্তা + ন = নিবৃত্তি বা আনন্দ। যিনি জন্মজন্মান্তর নিবারণ কর্ত্তা অথবা যিনি নিত্য সত্তায় চির বিদ্যমান্ অথবা যিনি জীবের সমস্ত পাপ দুঃখ হরণ করেন সেই ভক্তদুঃখ বিনাশ-কারীই কৃষ্ণ।

৪। কেশব—ক = ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ = সংহর্ত্তা, এতদুভয়কে নিজ অনুগ্রহপাত্র বোধে যিনি জগতের রক্ষক—স্থিতিকারকরূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই কেশব। ক্ষয়োদয়রূপ বিকারের অস্থিরতার শান্তিকারক। অথবা ক = ব্রহ্মা, অ = বিষ্ণু, ঈশ = শিব—এই তিন যাঁহার ব = বপু অর্থাৎ স্বরূপ, তিনিই কেশব, পুরুষোত্তম বা ব্রহ্ম।

৫। কেশিনিসূদন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় কেশী নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন এইজন্য তাঁহার এই নাম।

৬। গোবিন্দ—ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক বা অধিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ। অথবা গরু বা পৃথিবীর পালক।

৭। জনার্দ্দন—নিজ নিজ বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য সকলে যাঁহার নিকট যাচ্ঞা করে তাঁহার নাম জনার্দ্দন। অথবা জন্মজন্মের কারণ অজ্ঞানকে যিনি নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা বিনাশ করেন, তিনি জনার্দ্দন।

৮। মধুসূদন—মধু নামক দৈত্যহন্তা।

৯। মাধব—মা = লক্ষ্মী, ধব = পতি—লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ।

১০। ভগবান্—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ছয়টাকে 'ভগ' বলে। যিনি এই ষড়্‌গুণসম্পন্ন তিনিই ভগবান্।

১১। যাদব—যদুবংশসম্ভূত।

১২। বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণিবংশসম্ভূত।

১৩। বাসুদেব—যিনি সর্ববিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন এবং যিনি সর্বভূতে বাস করেন, তিনিই বাসুদেব, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম। ইনিই অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ইনিই লীলাবশে ব্যক্ত স্বরূপে বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ।

১৪। বিষ্ণু—সত্ত্বগুণময় সর্বব্যাপী ভগবান্।

১৫। হরি—দুঃখনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ।

১৬। হৃষীকেশ—হৃষীক=ইন্দ্রিয়, ঈশ=নিবারণকর্ত্তা—সর্বেন্দ্রিয় নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণ।

গীতায় শ্রীভগবানের গুণবাচক শব্দাবলী

অজ, অক্ষর, পরম অক্ষর, পরম পবিত্র, পুরাণ পুরুষ, শাশ্বত পুরুষ, সনাতন পুরুষ, পুরুষোত্তম, আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, পরম ব্রহ্ম, সর্বগত ব্রহ্ম, বেত্তা, বেদ্য।

কিরীটী, গদী, চক্রহস্ত, কমলপত্রাক্ষ, চতুর্ভুজ, মহাবাহু, সহস্রবাহু, অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রম, অপ্রতিম প্রভাব, বিশ্বরূপ, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বতোমুখ, অনন্ত, অনন্তরূপ, সর্ব, স্বপ্রকাশ, অপ্রমেয়।

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি, ব্রহ্মার ও আদিকর্ত্তা, প্রপিতামহ, দেব, দেবদেব, আদিদেব, দেববর, দেবেশ, যোগী, যোগেশ্বর, মহাযোগেশ্বর, জগৎগুরু, গরীয়ান্ গুরু, ঈড্য, পূজ্য, প্রভু, বিভু, ভূতভাবন, মহাত্মন্, চরাচর লোকপিতা, জগৎপতি, জগন্নিবাস, ঈশ, ভূতেশ, ঈশ্বর, মহেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, পরমেশ্বর, পরম ধাম, বিশ্বের পরম নিধান, শাশ্বত ধর্মগোপ্তা।

৯। অর্জ্জুনের গীতোক্ত নামাবলী ও গুণ

—অর্জ্জুন, পাণ্ডব, পার্থ, কৌন্তেয়।

—কুরুনন্দন, কুরুসত্তম, কুরুশ্রেষ্ঠ, কুরুপ্রবীর

—ভারত, ভরতসত্তম, ভরতশ্রেষ্ঠ, ভরতর্ষভ

—পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষর্ষভ, দেহভৃতাম্বর।

—মহাবাহু, ধনুর্দ্ধর, সব্যসাচী, কপিধ্বজ, পরন্তপ

—গুড়াকেশ, ধনঞ্জয়, অনসূয়, অনঘ।

—প্রিয়, প্রিয়মান, দৃঢ়ইষ্ট, তাত।

অর্জ্জুনের নামাবলী ও সম্বোধন পদ হইতে কিঞ্চিৎ জানা যায় তাঁহার কতগুণ ছিল। তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল যে তাঁহার অসূয়া (দোষ দৃষ্টি) আদৌ ছিল না। এই জন্যই শ্রীভগবান তাঁহাকে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য ভক্তি তত্ত্বের কথা বলিয়াছিলেন। এক কথায় তাঁহার গুণরাশি ব্যক্ত করা হয় যে তিনি 'অনঘ' (নিষ্পাপ) ছিলেন। ইহার অর্থ ভাবিয়া দেখা উচিত। তিনি যে ২।৬ শ্লোকে বলিয়াছেন যে যাহাদিগকে বধ করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাহিনা সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা সম্মুখে রহিয়াছেন। এইরূপ উদার কথা কি কেহ আর কখন বলিয়াছে? এরূপ ক্ষমার উদাহরণ আর কি কোথায়ও দেখা যায়? ইহাই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। এই জন্যই শ্রীভগবান্ কেবল তাঁহাকেই বিশ্বরূপ দেখাইয়া ছিলেন।

১০। অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও প্রার্থনা

অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও প্রার্থনার আলোচনা সম্যক্‌রূপে করিলে গীতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। প্রথম প্রার্থনার উত্তরই সমস্ত গীতা। এই প্রার্থনার ফলেই সমগ্র মানব অশেষ কল্যাণকর এই গীতাশাস্ত্র লাভ করিয়াছে।

(১) যুদ্ধ করা বা না করা আমার পক্ষে কোন্‌টা মঙ্গলকর তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শরণাগত শিষ্য। আমাকে শিক্ষা দাও। ২।৭ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য একথা ভগবান্ পূর্ব্বে বলিলেও অর্জ্জুনের পুনরায় এ প্রশ্ন করার অর্থ এই যে, সেকথা তাঁহার মনে লাগিতেছিল না। তাই তিনি শরণাগত শিষ্য ও শিক্ষার্থী হইয়া নিশ্চয় করিয়া বলার কথা বলিলেন। ইহার উত্তরে ভগবান্ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সমত্ব বুদ্ধির সহিত নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করিলে ইহার কর্মফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে না, ইহা হইতেই বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। ইহাই অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

(২) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? ২।৫৪

বুদ্ধি বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত না হইলে কোন কর্ম্মই ঠিক হয় না। সেই বুদ্ধি কিরূপে বিশুদ্ধ হয় তাহা এই উত্তরে ১৮টী শ্লোকে বলা হইয়াছে। ২।৫৫-৭২

অর্জ্জুন কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ও তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন।

(৩) কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি যদি ভাল হয় তাহা হইলে আমাকে হিংসাত্মক কর্ম্ম করিতে কেন বলিতেছ? ৩।১-২

ইহাও বুঝাইয়া দিলে অর্জ্জুন তাঁহার চতুর্থ প্রশ্নে পাপ প্রবৃত্তির হেতু কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

(৪) কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোকে পাপ করে, অর্থাৎ পাপের উৎপত্তি কিরূপে হয়? ৩।৩৬

ভগবান বিশদরূপে দেখাইয়া দিলেন যে, কমই (বিষয় বাসনাই) পাপ প্রবৃত্তির একমাত্র হেতু। এই পরম শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় আত্মনিষ্ঠ বা শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহাতে যুক্ত হওয়া। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারাই তাহা সম্ভব। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথাই ভগবান বিবস্বানকে বলিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়াই অর্জ্জুনের পঞ্চম প্রশ্ন।

(৫) তোমার জন্ম সেদিন আর বিবস্বানের জন্ম বহু পূর্ব্বে। কি করিয়া জানিব যে তুমি তাঁহাকে এ কথা বলিয়াছিলে? ৪।৪

ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহাই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মনে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা দোষের কথা, সরলভাবে সন্দেহ দূর করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানযোগের কথা বলিয়াছেন। ইহাতে আবার অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং তিনি ষষ্ঠ প্রশ্ন করিলেন।

(৬) একবার কর্ম্মত্যাগের কথা আবার কর্ম্মযোগের কথা বলিতেছ। ইহার মধ্যে যাহা ভাল তাহা আমা[illegible] করিয়া বল। ৫।১

ইহার উত্তরে ভগবান্ বুঝাইয়া দিলেন যে, ফলে দুই এক, কেবল নামেই পার্থক্য। মন স্থির করিতে না পারিলে ভগবানে যুক্ত হওয়া যায় না। অতএব মন স্থির কিরূপে হইতে পারে তাহাই অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্ন।

(৭) সমতারূপ যোগের যে কথা বলিলে, মনের চঞ্চলতার জন্য ইহার স্থিরতা দেখিতেছি না। মন স্থির কি করিয়া হয়? ৬।৩৩

ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, ইহা অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই হইতে পারে। বিষয়ের প্রতি অনুরাগ অর্থাৎ বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া চঞ্চল মনকে কেবল ভগবানেই নিবিষ্ট করিতে হইবে। ইহাই গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধ্যানযোগ। ইহা হইতেই অর্জ্জুনের অষ্টম প্রশ্ন হইল।

(৮) শ্রদ্ধাযুক্ত যদি যোগভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার কিগতি হয়? ৬।৩৭।৩৯

এ কথার উত্তর দিয়া সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন ভগবানকে কিরূপে জানা যায় তাহা শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণরূপে সপ্তম অধ্যায়ে বলিলেন। ভগবান্‌কে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ এই সকল তত্ত্ব জানিতে হয়। এ গুলি কি তাহাই অর্জ্জুনের নবম প্রশ্ন।

(৯) ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কি? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কি? অধিযজ্ঞই বা কি ও কে এবং এ এই দেহে কি প্রকারে অবস্থিত? মৃত্যুকালে তোমাকে কিরূপে মনে করা যায়? ৮।১—২

এই তত্ত্বগুলি কি তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বুঝাইয়া দিয়া সৃষ্টি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে যে, যাহারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ভগবানকে লাভ করার তিনটি উপায় ৮।৯-১০, ৮।১১-১৩, ও ৮।১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে। ভক্তির দ্বারা কি প্রকারে ভগবান্‌কে অনায়াসে লাভ করা যায় তাহা নবম অধ্যায়ে বিশদরূপে বলা হইয়াছে। এই ভক্তিপথের কথা শুনিয়া ভগবানের বিভূতির কথা অর্জ্জুনের জানার ইচ্ছা হইল এবং তিনি এই প্রার্থনা দশম সংখ্যায় ভগবান্‌কে জানাইলেন।

(১০) তোমার আত্মবিভূতির কথা শেষ না রাখিয়া আমাকে বল। ১০।১৬-১৮

দশম অধ্যায়ে ভগবান্ আত্ম-বিভূতির কথা বলিয়াছেন। ভগবানের আত্মবিভূতির কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দেখার ইচ্ছা হইল এবং সেই প্রার্থনা একাদশ সংখ্যায় জানাইলেন এবং ভগবান্ তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইলেন।

(১১) আমি যদি তোমার বিশ্বরূপ দেখার যোগ্য হই তাহা হইলে তোমার বিশ্বরূপ আমাকে দেখাও।১১।৩—৪। বিশ্বরূপে সৌম্যমূর্ত্তি ও উগ্রমূর্ত্তি দুই ছিল। ঐ উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুনের দ্বাদশ প্রশ্ন।

(১২) উগ্ররূপধারী তুমি কে আমাকে বল। হে দেববর, তোমার পায়ে পড়ি, প্রসন্ন হও। আমি তোমার প্রবৃত্তি বুঝিতে পারিতেছি না। ১১।৩১

নির্ম্মল চরিত্রের জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে এত ভাল বাসিতেন যে, তাঁহার সকল প্রার্থনাই তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ভগবানের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলেন যে, সখা মনে করিয়া তাঁহাকে সবিনয়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা ভাল হয় নাই। আবার ভগবানের দেবমূর্ত্তি দেখার ইচ্ছা ত্রয়োদশ সংখ্যায় প্রকাশ করিলেন।

(১৩) তোমাকে সখা মনে করিয়া আমি সবিনয়ে তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছি সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তোমার এ ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। আবার তোমার সেই দেবরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ১১।৪১—৪৬

সে প্রার্থনাও ভগবান্ স্বীকার করিলেন এবং স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই তিনি এই প্রকারে জ্ঞাত হইতে, দৃষ্ট হইতে ও প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ১১।৫৪। অনন্য ভক্তি কিরূপে করিতে হয় তাহা ভগবান্ ১১।৫৫ শ্লোকে বলিয়াছিলেন। ইহার পরেই ভক্তিযোগের কথা লইয়া অর্জ্জুনের চতুর্দ্দশ প্রশ্ন।

(১৪) সততযুক্ত হইয়া যে ভক্তেরা তোমার উপাসনা না করে, আর যাহারা অক্ষর অব্যক্তের চিন্তা করে অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্তা করে—ইহাদের মধ্যে যোগবিত্তম কে? ১২।১

সৃষ্টি তত্ত্বের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি আসিতে পারে না। এইজন্য পঞ্চদশ প্রশ্ন।

(১৫) প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই সকলের তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন।১৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান্ প্রকৃতির গুণ কিরূপে কার্য্য করে এবং জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহা বুঝাইয়া ছিলেন। ইহা হইতেই অর্জ্জুনের ষোড়শ প্রশ্ন।

(১৬) ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ কি এবং ত্রিগুণাতীত কি প্রকারে হওয়া যায়? ১৪।২১

ইহার উত্তর ভগবান্ চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে দিলেন। অবশেষে বলিলেন যে, কেবল নিজের বিচারের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে। শাস্ত্রবিধিও দেখা আবশ্যক। ইহার পরই শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সপ্তদশ প্রশ্ন।

(১৭) যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করে তাহার শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক? ১৭।১

ইহার উত্তর সপ্তদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের অষ্টাদশ প্রশ্ন।

(১৮) সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য কি? ১৮।১

এই প্রশ্নের উত্তর ও গীতার সারকথা অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ত্যাগই গীতার সার কথা। পরমহংসদেব বলিতেন, 'গীতা' কথাটা বার বার বলিলে উহা 'ত্যাগী' হইয়া পড়ে। এই ত্যাগই গীতার সার কথা।

প্রথম প্রার্থনার উত্তরেই সমস্ত গীতা। অর্জ্জুনকে প্রথম কর্ম্মযোগের কথা বলা হইয়াছে। তাহা হইতেই জ্ঞানের কথা আসিয়াছে। বুদ্ধি স্থির না হইলে জ্ঞান হয় না, আবার মন স্থির না হইলে বুদ্ধি স্থির হয় না। ভগবৎ চিন্তাই এই মন স্থির করার প্রধান উপায়। ভগবৎ চিন্তার দ্বারা মন স্থির হইলেই ভক্তি আসে। জ্ঞান বিজ্ঞান যোগে ও অক্ষর-ব্রহ্ম যোগে

ভগবানের সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবেরই বর্ণনা শুনিয়া এবং নবম অধ্যায়ে ভক্তিযোগের কথা শুনিয়া ভগবানের বিভূতিসকল অর্জ্জুনের জানার ইচ্ছা হইয়াছিল। বিভূতির কথা শুনিয়া বিশ্বরূপ দেখার ইচ্ছা হইয়াছিল। বিশ্বরূপ দেখায় পর ভক্তের লক্ষণ এবং তাহার পর সৃষ্টি তত্ত্বের কথা—এই সকল জানার পর কর্ম্ম দ্বারাই যে ভগবানে যুক্ত হওয়া যায় তাহা বলা হইয়াছে। সেই কর্ম্ম কি, তাহা কিরূপে করা হয়, কিরূপ সাধনার দ্বারা 'মানুষ' হইতে পারে এই সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া ভগবান গীতার উপসংহার করিয়াছেন। অর্জ্জুনের এই সকল প্রশ্নের ফলে আমাদের গীতাশাস্ত্র লাভ। একটা কথা আছে 'চাকের মধু মিষ্টি কি হইত, মৌমাছিতে খোঁচা যদি না দিত।' সেইরূপ গীতা সম্বন্ধেও বলা আছে—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দন। পার্থো বৎস সুধী-র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥" অর্জ্জুন প্রশ্ন দ্বারা এই অমৃত বাহির করিয়াছেন। এ অমৃত শেষ হইবার নহে। লোকে এতকাল পান করিয়াছে, এখনও করিতেছে এবং চিরকাল করিবে।

ফুলধনু

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম্‌-এ

তৃতীয় দৃশ্য

উর্মিলার বাড়ীর বৈঠকখানা। বৃন্দাবন একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছেন, রবি প্রবেশ করল।

বৃন্দা। কাকে চান?

রবি। আমি শ্রীমতী রচনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বৃন্দা। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

রবি। আমি ক্যালকাটা কলেজ হোষ্টেল থেকে আসছি।

বৃন্দা। ও, আমাদের রচনার কলেজ?

রবি। হাঁ।

বৃন্দা। দেখুন, এ সব আমি ভালবাসি না, মোটেই ভালবাসি না। ছেলেমেয়েদের এতটা ফ্রি মিক্সিং আমি পছন্দ করি না। আপনি কি পড়েন?

রবি। আমি এবার বি-এস সি দেব।

বৃন্দা। তা ওতো এবার আই-এস সি দিয়েছে, তাছাড়া ওদের ক্লাস হয় আলাদা, আপনাদের আলাপ হল কি করে? এ সব বড়ই দুঃখের কথা, অত্যন্ত নিন্দনীয় কথা। জানেন, এর থেকে ব্যাপার কতদূর গড়াতে পারে, জানেন আপনি?

রবি। আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

বৃন্দা। শুধু আপনাকে লক্ষ্য করেই আমি বলছি না, বলছি যে এই সব ছেলেমেয়েদের হল কি! এর সূত্রপাত অতি সামান্য ভাবে হয় বটে, কিন্তু এর শেষ পুলিস পর্য্যন্ত গড়াতে পারে, তা জানেন? কথাটা ফাঁকা নয়, আজ পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এ কথা বলছি জানবেন পুলিসের কাজ বুঝেছেন, লোক দেখে দেখে চোখ খারাপ হয়ে গেল।

রবি। আমি বলছিলুম—

বৃন্দা। আপনি আর বলবেন কি, বলবার এতে কিছু নেই। কিছু বলে এর গুরুত্ব কমাতে পারবেন না। এ বিশেষ চিন্তার কথা, অর্থাৎ এ বিষয়ে বহু চিন্তা করা হয়েছে, তারপর বলা হচ্ছে। তারপর শুধু আমি একাই চিন্তা করিনি, ধরুন, বহু বিদ্বান ও বিবেচক লোক এ সম্বন্ধে চিন্তা করে যা বলেছেন, তা তো আর মিথ্যা হতে পারে না।

রবি। তাহলে আসি আমি।

বৃন্দা। হাঁ আসুন। তার আগে একবার না হয় চতুর—হাঁ রচনার সঙ্গে দেখা করেই যান। ওর শীগ্‌গির বিয়ে হচ্ছে। যথাসময়ে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যে অতি প্রয়োজনীয় কাজ, তা আমি জানি; তাহলেও পড়াশোনা করতে চাইলে এবং পড়াশোনাতে ও বরাবর ভালই ছিল, সেইজন্যে এতটা দেরী হল এবং তারই জন্যে. বোধ করি, আপনাদের মত দু'একজনের সঙ্গে চেনাশোনা হয়েছে।

বাহিরে থেকে কে ডাকলে, অপূর্ব, অপূর্ব!

রবি। (অতি বিস্ময়ে) কে?

বৃন্দা। কে? (শশব্যস্তে উঠে গিয়ে দরজায় বাইরে গোলোককে দেখে) তুমি! গোলোক! এস এস ভাই এস। কখন পৌছলে?

গোলোকের প্রবেশ

গোলোক। (হঠাৎ রবির দিকে নজর পড়াতে) অ্যা, তুই এখানে যে রে!

রবি প্রণাম করলে

এঁকে প্রণাম করেছিস্? (রবির বৃন্দাবনকে প্রণাম) বৃন্দাবন, এটি আমার ছেলে—তুমি চিন্‌লে কি কোরে আশ্চর্য্য!

বৃন্দা। (প্রায় স্তম্ভিত) অ্যা, বল কি! আমি তো বিন্দুবিসর্গ জানিনা। কি আনন্দের কথা, কি আনন্দের কথা! (জোর গলায়) অপূর্ব, অপূর্ব! উর্মিলা! দাঁড়াও ভাই, খবরটা দিয়ে আসি।

প্রস্থান

গোলোক। আমার বন্ধু বৃন্দাবনবাবু, একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি। তুই চিনলি কি করে? বড় ভালমানুষ, ওঁর মেয়েটির সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চান।

রবি। (আকাশ থেকে পড়ে গিয়ে) আমার!

গোলোক। হাঁ।

রবি। তার সম্বন্ধ হয়ে গেছে না?

গোলোক। কে বললে? আমাকে দেখবার জন্যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন, আর সম্বন্ধ হয়ে গেছে! এঁদের সঙ্গে তোর চেনাশোনা আছে নাকি?

রবি। না।

বৃন্দা। (কথা কইতে কইতে প্রবেশ) এস এস, দেখ।

অপূর্ব ও উর্মিলার প্রবেশ

ভায়া আমার একেবারে ছেলেকে নিয়ে—কি নামটি বললে গোলোক?

গোলোক। রবি।

বৃন্দা। হাঁ হাঁ রবি। কি আনন্দের কথা বলতো, কি আনন্দের কথা!

অপূর্ব। আপনি কবে বাড়ী থেকে এলেন?

গোলোক। স্টেশন থেকে সটান এখানে আসছি।

উর্মিলা। তাহলে তো খাওয়া দাওয়া কিছু হয়নি?

বৃন্দা। মায়ের আমার ঠিক নজর পড়েছে। তা তো বটে, তা তো বটে। খাবার টাবার দাও। বিশ্রাম কর ভাই আগে, তারপর সব।

গোলোক। খেয়ে দেয়েই তো বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, তার জন্যে চিন্তা নেই।

বৃন্দা। তাহলেও একটু খাবার—

গোলোক। খাবার টাবার থাক এখন, একটু চা হলেই হবে।

অপূর্ব। (রবির প্রতি হাসিমুখে) আপনাকেও একটু চা দিক?

উর্মিলা। চা খান তো?

রবি সলজ্জভাবে হাসল

বৃন্দা। নিশ্চয় নিশ্চয়, দাও।

উর্মিলার প্রস্থান

গোলোক। বৃন্দাবন, তুমি কবে পৌঁছলে?

বৃন্দা। কাল এসেছি ভাই। বাড়ী থেকে বেরোবার কি জো আছে, যে পেসেণ্টের ভিড়!

গোলোক। সে কি! বাড়ীতে কি অসুখ বিসুখ নাকি?

বৃন্দা। (হেসে ফেলে) না না, তা নয় ভায়া, তা নয়, সামান্য সামান্য ডাক্তারী করছি।

গোলোক। ডাক্তারী করছ? কিসের ডাক্তারী?

বৃন্দা। হোমিওপ্যাথি বড় ভাল জিনিস বুঝেছ, তবে আগে থেকে করলেই হত, এতটা বয়েসে আর ভাল করে মনঃসংযোগ করতে পারি না, পাঁচ দিকে পাঁচটা ক্যাচাং। তুমি কি করছ?

গোলোক। আমি 'রোপক' বলে একটু ওষুধের প্রচার করছি, মাদুলিতে ধারণ করতে হয়। যত বড় এবং যত ছোট এবং যে কোন রকমেরই পেটের অসুখ হোক না কেন, রোপক একেবারে অব্যর্থ।

বৃন্দা। হুঁ, আমাদের নাক্সভমিকা থারটি যা আর কি। মহামূল্য জিনিস বুঝেছ। সারা মেডিক্যাল ওয়ার্লড্ ঘুরলেও এমন দ্বিতীয়টি পাবে না।

অপূর্ব এসে রবিকে আস্তে আস্তে কি বলাতে রবি উঠে দাঁড়াল

কোথা যাচ্ছ?

অপূর্ব। এই পাশের ঘরে একটু গল্প করি।

গোলোক। আমরা বুঝি গল্পে বাধা দিচ্ছি? নিজেদের কথাতেই মত্ত, তোমাদের ফাঁক দিচ্ছি না, কি বল?

হাসতে লাগলেন

বৃন্দা। দেখ অপূর্ব, মা যেন আমাকেও একটু চা দেন, বলে দাও।

অপূর্ব। আচ্ছা, বলে দিচ্ছি।

বৃন্দা। মার আমার কোন কিছুতে কার্পণ্য নেই; উপরন্তু এটা খান, ওটা খান করে অস্থির, শুধু চা দিতে হলেই কিন্তু—কিন্তু।

গোলোক। সে চা-টা অধিকন্তু নিশ্চয়।

বৃন্দা। হাঁ, তা ঠিক।

গোলোক। তাহলে ভালই করেন, অভ্যেসটা কমান উচিত ভাই।

বৃন্দা। হু, রচনার বিয়েটা হয়ে গেলে দু কাপে দাঁড় করাব ভাবছি।

গোলোক। ভালই ভেবেছ। তামাকের সম্বন্ধেও আমি ওই কথাই ভাবছি, রবির বিয়ে হয়ে গেলে কমিয়ে দেব।

বৃন্দা। তুমি আবার তামাক ধরেছ নাকি? তাহলে শুধু আমি একাই নই। গিন্নীকে গিয়ে বলতে হবে।

গোলোক। আমার নিন্দে করবে বুঝি?

বৃন্দা। নিন্দে! এ তো প্রশংসা। গোলোক—বৃন্দাবনের নিন্দে করে কে? মনে পড়ে?

গোলোক। পড়ে না আবার? গোলোক বৃন্দাবন!

দু'জনে হাসতে লাগল

চতুর্থ দৃশ্য

গোলোকের বাড়ীতে রবির বিয়ের পর ফুলশয্যার রাত্রি। নহবতের সুর বাজছে, মাঝে মাঝে শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এক কক্ষে মায়া, নীলকণ্ঠ ও যোগেশ অপেক্ষা করছে।

যোগেশ। এখনও এল না যে?

নীল। ফুলশয্যার ব্যাপার, চট্ করে আসতে পারে?

যোগেশ। রবি নিয়ে আসতে পারবে তো?

মায়া। তা আর পারবেন না?

নীলকণ্ঠ। এখনও কি সেই লাজুক রবি আছে নাকি?

যোগেশ। পাশাপাশি কি সুন্দর দেখাবে দু'জনকে!

নীল। দু'জনেই সুন্দর, তা তো দেখাবেই।

বর ও বধূবেশে রবি ও রচনা প্রবেশ করল

মায়া। চিনতে পারছ দিদি?

রচনা। মায়া! (নীলকণ্ঠের প্রতি) আপনি কখন এলেন?

নীল। ঘণ্টা কতক আগে।

রবি। (যোগেশকে দেখিয়ে) ইনি আমার রুমমেট যোগেশ।

পরস্পরের নমস্কার

যোগেশ। প্রজাপতির চেষ্টা মিছে যায়নি দেখছি।

নীল। হাঁ, প্রজাপতি মায়ারূপ ধারণ করেছিলেন।

মায়া। একটা কথা বলা দরকার দিদি।

রচনা। কি?

নীল। একটা রহস্য, যেটা এই বিয়ের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে।

রচনা। (বিস্ময়ে) সে আবার কি!

মায়া। আগে বল, ক্ষমা করবে।

রচনা। কি বল শুনি।

মায়া। আগে বল করবে।

রবি। বল না, করব।

যোগেশ। হুঁ, বলতে বাধা কি।

রচনা। তা না হয় হবে, কিন্তু কি সেটা?

মায়া। (রবির প্রতি) আপনিই রহস্যের সমাধানটা করে দিন।

রবি। আমি?

বলে নীলকণ্ঠের দাড়ি ধরে টান দিতেই দাড়ি গোঁফ খুলে এল। বেরিয়ে পড়ল সুকুমার

রচনা। (দাড়ি টানতে দেখে) আহাহা!

সুকুমার। ভয় নেই, লাগেনি বৌদি।

রচনা। (অসম্ভব বিস্ময়ে) এ সব—!

সুকুমার। আগেই বলেছেন, ক্ষমা করবেন, মনে আছে তো? তবে শুনুন ব্যাপারটা। রবি, আমি এবং এই যোগেশ—আমার নাম সুকুমার—আমার সহপাঠী এবং হোস্টেলের এক কক্ষসাথী। এক সোভাগ্যে আপনাকে দেখে রবি ভাইটির বড় ভাবনা আসে; তাতে আমি বলি ভয় নেই, সাত রাজার ধন নিশ্চয় তোমার এনে দেব। রচনারাণী রবীন্দ্র ছাড়া কি অন্যের হাতে শোভমানা হতে পারেন, আপনিই বলুন। তারপর, তারপর কি রবি?

রবি। তুমিই বল, তোমার চেয়ে আর কে ভাল করে বলতে পারবে।

সুকুমার। তারপর স্বয়ং নীলকণ্ঠ সেজে আর এঁকে —ইনি আমার প্রিয়তমা শ্যালিকা শ্রীমতী পূর্ণিমা, রবির সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত—মায়া সাজিয়ে আপনাদের হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হই। তারপরের ব্যাপার সব আপনার জানা।

রবি। তারপরের ব্যাপারে তুমি যে শুধু সুকুমারই নও, তুমি সুচরিত্র, সুহাস ও সুভাষ, তাই প্রমাণিত হয়েছে।

সুকুমার। কথা শুনছ যোগেশ? শুনছ পুনু?

পূর্ণিমা। (হাসিমুখে) শুনছি।

যোগেশ। বিস্ময়ের বিরাম নেই।

সুকুমার। আপনার জন্যে কি না করা হয়েছে বলুন তো!

যোগেশ। কত ফন্দিই না তোমার মাথায় ছিল!

সুকুমার। ফন্দি মাথায় ছিল বটে, কাজে লাগত না প্রতিভাময়ী পুনুরাণী না থাকলে।

যোগেশ। তা সত্যি।

রবি। তা অতি সত্যি। সময় সময় ভয় হচ্ছিল, পুনুর ফাঁদেই না পড়ে যাই; ভাগ্যে বর্ণের তফাৎটা ছিল।

সুকুমার। বৌদি, কেমন রত্নলাভ হয়েছে বলুন তো।

যোগেশ। কেন, বৌদিই কি আমাদের সামান্য জিনিস নাকি?

সুকুমার। শুনছেন বৌদি, স্তুতি সুরু করেছে, পেটুক মানুষ কিনা, নেমন্তন্ন আশা করছে। কিন্তু কথা কইছেন না যে বড়, লজ্জা করছেন নাকি?

রবি। কইবেন, কইবেন; ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে নিচ্ছেন। তোমরা অনেক জট্ পাকিয়েছ, খুলতে সময় লাগবে।

সুকুমার। শোনো, শোনো যোগেশ, কথা শোনো রবির। এটা কি তাহলে ময়দান নয় পুনু?

পূর্ণিমা। তাই তো দেখছি।

সুকুমার। না, আর কথা নয়, রাত্রি হল, এবার যেতে হবে।

যোগেশ। হাঁ চল। আসি বৌদি।

সুকুমার। আসি বৌদি, এক্ষুণি আবার আপনার ডাক পড়বে।

রচনা। কে ডাকবে?

সুকুমার। আজকে কে ডাকবে বলছেন! আজ আপনি সর্বজনের মাঝে অধীশ্বরী, আপনাকে কেন্দ্র করেই তো আজ সব।

রবি। আর আমি বুঝি কিছু নয়?

সুকুমার। তুমি মহারাণীর স্বামী।

রবি। মহারাণীর স্বামী, মহারাজা নই?

সুকুমার। শোনো আব্দার যোগেশ।

যোগেশ। রাত্রি কত হল, খেয়াল আছে সুকুমার?

সুকুমার। ও, তাও তো বটে। চল চল। আসি বৌদি—

রচনা। আজ কিছুই কথা হল না,আর একদিন এস।

পূর্ণিমা। আসব।

সুকুমার। আমাদের আসতে বলছেন না বৌদি?

রচনা। (হাসিমুখে) আসবেন।

রবি। আসবে, নিশ্চয় আসবে, এই সাতদিনের ভেতরই আর একদিন সকলে এস।

যোগেশ। নেমন্তন্ন করছ?

রবি। করছি।

সুকুমার। বৌদির হাতের রান্না চাই কিন্তু, চপ্ কাটলেট্। মনে পড়ে বৌদি?

পূর্ণিমা। আর কিছু নয়?

সুকুমার। আর যত রকম মিষ্টি আছে সংসারে।

যোগেশ। তার ফর্দটা দাও।

সুকুমার। আহ্বানে মিষ্টি, বাক্যে মিষ্টি, ব্যবহারে মিষ্টি, মনোযোগে মিষ্টি, পরিবেশনে মিষ্টি, হৃদয়ে মিষ্টি।

যোগেশ। সাবাস্ ভাই! এবার বিদায়ে মিষ্টি কর।

সুকুমার। আসি রবি, আসি বৌদি—

সকলের নমস্কার

রবি। এস, চিরকাল এস, বারে বারে এস।

যবনিকা

বেদান্ত ও সূফীমতে সৃষ্টি

ডক্টর রমা চৌধুরী

গতমাসে বেদান্তসম্মত লীলাবাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। স্বয়ং স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও, হাল্লাজের মতবাদে বেদান্ত-প্রপঞ্চিত ঈশ্বরলীলাবাদের আভাস পাওয়া যায়। হাল্লাজের মতে, পরমাত্মার তিনটী অবস্থা ক্রম।

(১) প্রথম অবস্থা সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ-স্বরূপাবস্থা। এই অবস্থায় শুদ্ধসত্ত পরমেশ্বর নিজেই নিজের সহিত কথোপকথনে রত থাকেন, নিজেই নিজের স্বরূপ শোভা নিরীক্ষণ করেন এবং বিমুগ্ধ হন। এরূপ স্বরূপ বিমুগ্ধতার নামই 'প্রেম' অর্থাৎ, তৎকালে পরমাত্মা নিজেই নিজের নির্গুণ শুদ্ধস্বরূপের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হন। অতএব স্বাত্মপ্রেমই পরমাত্মার স্বরূপের স্বরূপ। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ। উক্ত প্রথম অবস্থা পরমাত্মার অনভিব্যক্ত অবস্থা এবং এই অবস্থায় তিনি নির্গুণ, স্বাত্মজ্ঞ, স্বাত্মপ্রেমিক, স্বাত্মানন্দী স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন।

(২) দ্বিতীয় অবস্থায়, পরমাত্মা তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দস্বরূপকে বিভিন্ন গুণ ও নামরূপে অভিব্যক্ত করেন। ইহাই তাঁহার আন্তর ও ও প্রথম বিকাশ।

(৩) তৃতীয় অবস্থায়, ঈশ্বর তাঁহার সেই নিরালা, নিঃসঙ্গ প্রেম ও আনন্দকে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন। অর্থাৎ, তিনি স্বীয় প্রেমানন্দঘনস্বরূপকে মূর্ত্ত প্রকাশ করিতে অভিলাষী হন, যাহাতে তিনি তাঁহার নিজেরই স্বরূপের প্রতিমূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাহার সহিত কথোপকথন করিতে পারেন। এই অভিলাষবশবর্ত্তী হইয়া, তিনি স্বীয় গুণ ও নাম সম্বলিত প্রতিমূর্ত্তি শূন্য হইতে সৃষ্টি করেন। ইহারই নাম 'মানব'। ঈশ্বরের পূর্ণ অভিব্যক্তি ও প্রতিচ্ছবি বলিয়া 'মানব' ঈশ্বর পদবাচ্য।

অতএব হাল্লাজের মতেও বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের প্রেম ও আনন্দের অভিব্যক্তি। আনন্দ হইতেই বিশ্বসৃষ্টি, অভাব হইতে নহে। হাল্লাজ বলিয়াছেন যে, পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের অভাব না থাকিলেও, তিনি প্রতিচ্ছবি ও সাথীরূপে মানব সৃষ্টি করেন। তিনি স্বাত্মজ্ঞানমাত্রে সন্তুষ্ট না হইয়া অপর এক দর্পণে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; স্বাত্মপ্রেমের একাকিত্বে তৃপ্ত না হইয়া অপর এক প্রেমিকের প্রেম কামী হইয়াছিলেন; নিঃসঙ্গ স্বাত্মানন্দে পরিতৃপ্ত না হইয়া আনন্দের অপর এক অংশীদার অন্বেষণে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি স্বীয় প্রতিচ্ছবিরূপে, স্বীয় প্রেম ও আনন্দের অংশীরূপে 'পূর্ণমানব' সৃষ্টি করেন। কিন্তু যদি পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও আপ্তকাম হন, যদি তিনি প্রথম হইতেই আত্মজ্ঞ, প্রেমস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ হন, তাহা হইলে তাঁহার অভাব থাকিবে কিরূপে? সুতরাং ঈদৃশ সাথী সৃষ্টি অভাবমূলক নহে, ক্রীড়ামূলক। জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের দিক হইতে কোনোরূপ অভাব না থাকিলেও, ঈশ্বর লীলাচ্ছলে মানব সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহাতে স্বীয় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহার প্রেমে তৃপ্ত হন, তাহাকে স্বীয় আনন্দের অংশী করেন। অতএব জগৎসৃষ্টি পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে উদ্ভূত প্রয়োজনশূন্য ক্রীড়াবিশেষ মাত্র। ইহা স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের অসম্পূর্ণতা অনিবার্য্য। অতএব, সম্ভবতঃ হাল্লাজের মতেও, প্রেম ও আনন্দের সাথীরূপে অভিব্যক্তি অথবা মানবসৃষ্টি প্রয়োজনশূন্য ক্রীড়া মাত্র।

হাল্লাজের উক্ত মতবাদ আমাদিগকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক বল্লভা-চার্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বল্লভের মতেও ঈশ্বর লীলাস্বরূপ। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি একাকী বিরাজ করিতেছিলেন, কিন্তু একাকী ক্রীড়া অসম্ভব বলিয়া তিনি ক্রীড়ার সাথীরূপে মানব সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ মানবরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নিজের সহিতই নিজে ক্রীড়ায় মত্ত হন।

বেদান্তের মতে ব্রহ্ম নিত্য-সত্য, অনাদি ও অনন্ত, নিত্য-পরিপূর্ণ। তিনি নিত্য সত্তা (Being) এবং নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় (Static)। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে এই মতবাদ গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত ঈশ্বর-লীলাবাদই জগৎসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। ঈশ্বর নিত্যপূর্ণ ও নিত্য অপরি-বর্ত্তনীয়, অথচ সৃষ্টিরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং প্রথমতঃ তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যটী অভাবমূলক কার্য্য নহে, আনন্দোচ্ছ্বাসমূলক, ক্রীড়ামাত্র। দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্ট জগতেও তিনি পরিবর্ত্তিত হন না। শঙ্করের মতে অবশ্য জগৎ ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম নহে, মিথ্যা 'বিবর্ত্ত' (১) মাত্র। কিন্তু অন্যান্য পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও সৃষ্টি ব্রহ্মার স্বশক্তি বিক্ষেপ মাত্র। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবজগৎ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎ শক্তিদ্বয় রূপে ব্রহ্মেই লীন থাকে; সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চিত হইয়া বিশ্বচরাচররূপ ধারণ করে। সৃষ্টির অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ম স্বীয় অংশবিশেষকে জগদাকারে পরিণত করেন এবং অন্যান্য অংশে অপরিণতই থাকিয়া যান। ব্রহ্ম নিরংশ, অখণ্ডনীয়, অবিভাজ্য সমগ্র সত্তা, তাঁহার অংশ বিভাগ নাই। তজ্জন্য শ্রুতিতে (মুণ্ডকোপনিষৎ ১-১-৭) ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যকে উর্ণনাভের তন্তুবয়নরূপ কার্য্যের সমতুল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উর্ণনাভ

---

(১) কারণ হইতে সত্য কার্য্যোৎপত্তি 'পরিণাম'; যথা দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি। কারণে মিথ্যা কার্য্য প্রতীতি 'বিবর্ত্ত', যথা রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষ।

স্বশক্তি দ্বারা তন্তুবয়ন করে, কিন্তু স্বয়ং তন্তুরূপে পরিণত হয় না। তদ্রূপ, ঈশ্বরও স্বয়ং অপরিণত অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়াই স্বশক্তি বিক্ষেপ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন।

স্থিতিবাদ গ্রহণ করিলে প্রথমতঃ বেদান্তসম্মত লীলাবাদই সৃষ্টিরূপ কার্য্যের উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, হয় শঙ্করের মতানুসারে ব্রহ্মের বাস্তব পরিণতি অস্বীকার করিয়া জগৎকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়; নয় পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের মতানুযায়ী জগতকে অপরিণত ব্রহ্মের শক্তি বিক্ষেপ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। হাবাজে অবশ্য 'বিবর্ত্তবাদ' অথবা 'শক্তিবিক্ষেপবাদের' প্রপঞ্চনা নাই। তাঁহার মতবাদকে 'পরিণামবাদ'ও বলা চলে না, কারণ তাঁহার মতে জগৎ শূন্য হইতে সৃষ্ট। অথচ, জগৎ ঈশ্বর স্বরূপের দর্পণ ও প্রতিচ্ছবিও বটে। ইহা অযৌক্তিক সন্দেহ নাই।

অবশ্য বেদান্ত-প্রপঞ্চিত লীলাবাদ ও শক্তিবিক্ষেপবাদও সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত নহে। লীলাবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের দিক হইতে জগৎ লীলামাত্র হইলেও, সৃষ্ট জীবের দিক্ হইতে ইহা পরম দুঃখের কারণ। ঈশ্বর যদি স্বপ্রয়োজনানুরোধেও নহে, কেবলমাত্র সামান্য ক্রীড়ার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অসংখ্য জীবগণকে এরূপ দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরমকরুণাময় বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি ঈশ্বরের দিক্ হইতে প্রয়োজনশূন্য হইলেও জীবের দিক্ হইতে তাহা নহে। সৃষ্টি জীবের কর্ম্মানুসারী। কর্ম্মফলের অমোঘবিধান এই যে, ফলভোগেচ্ছু হইয়া 'সকামকর্ম্মে' রত হইলে তাঁহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, বর্ত্তমান জীবনেই, অথবা পরবর্ত্তী জীবনে। কর্ম্মফলের ভোগ পরিসমাপ্ত না হইলে বারংবার জন্ম অনিবার্য্য, মুক্তিও নাই। তজ্জন্য কর্ম্মফলোপভোগের জন্যই ভোগাগার সংসার অত্যাবশ্যক। অতএব ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি করেন। এস্থলে পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরবর্ত্তী সৃষ্টি অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী অভুক্ত কর্ম্মোপভোগের জন্যই প্রয়োজন, কিন্তু সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টির কারণ কি? ইহার পূর্ব্বে ত কোনও সংসার সৃষ্ট হয় নাই এবং জীব-গণও সৃষ্ট হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহা হইলে, জীবগণের কর্ম্মক্ষয়ের কোনও প্রশ্নই তৎকালে ছিল না। তৎসত্ত্বে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈদান্তিকগণ "বীজাঙ্কুর ন্যায়ের" অবতারণা করিয়াছেন। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পুনরায় বীজ জন্মে। কিন্তু বীজই অঙ্কুরের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, অথবা অঙ্কুরই বীজের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, এবং সর্ব্বপ্রথম বীজের কারণ কি, তাহা বলা অসম্ভব। তজ্জন্য বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধকে অনাদি সম্বন্ধ বলা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। তদ্রূপ কর্ম্ম হইতে সংসার, সংসার হইতে পুনরায় কর্ম্মের সৃষ্টি হয়। কিন্তু, কর্ম্মই সংসারের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, অথবা সংসারই কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, এবং সর্ব্বপ্রথম সংসার সৃষ্টির কারণ কি, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কর্ম্ম ও সংসারের অনাদি সম্বন্ধ। অবশ্য, ইহা প্রশ্নের সমাধান নহে, অজ্ঞতা স্বীকার মাত্র। যাহা হউক, লীলাবাদেও এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। শক্তিপ্রপঞ্চবাদে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণে শক্তিমানের সত্তার বিকার বা পরিবর্ত্তন সাধিত হয় কিনা?

যাহা হউক, যদি স্থিতিবাদ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে লীলাবাদই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্ব্বোত্তম সমাধান বলিয়া মনে হয়। স্থিতিবাদ গ্রহণ করিলে জগৎ সৃষ্টির সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা একেবারেই সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্টই সন্দেহের অবকাশ আছে। এই গূঢ় প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার স্থান ইহা নহে।

স্থিতিবাদ(১) ব্যতীত পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় অপর একটী মতবাদ দৃষ্ট হয়। ইহার নাম গতিবাদ(২)। পাশ্চাত্য দর্শনে বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল ইহার প্রপঞ্চনা করেন। গতিবাদ মতে, পরম সত্তা (**The Absolute**) নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য-পরিপূর্ণ সত্তা নহেন; উপরন্তু নিত্য গতিশীল, পরিবর্ত্তনভাগী ও পরিণামশীল। ঈদৃশ নিত্য ঘটন-শীলতাই পরমসত্তার স্বরূপ। তিনি অপরিবর্ত্তনীয় সৎও (**Being**) নহেন; শূন্যগর্ভ অসৎও (**Non-Being**) নহেন, কিন্তু সৎ ও অসতের সমন্বয় স্বরূপ, অর্থাৎ, ঘটনশীল (**Becoming**)। ঘটনশীলতায় সত্তা ও অসত্তার পরস্পর বিরোধের সমন্বয় ঘটে, কারণ ঘটনশীল বস্তু কেবল সৎও নহে, কেবল অসৎও নহে, উভয়ের সমাহার। যথা, বীজ ঘটনশীল, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে অঙ্কুরে পরিণত হয়। এস্থলে বীজ বীজরূপে সৎ, অঙ্কুর-রূপে অসৎ। কিন্তু বীজ শুধু বীজই নহে, অঙ্কুরেও অচিরে পরিণত হইবে। অতএব ইহা কেবল বর্ত্তমান বীজ নহে, ভবিষ্য অঙ্কুরও; কেবল সৎ নহে, অসৎও। বর্ত্তমানের ভবিষ্যতে পরিণতিই ঘটনশীলতার মূল কথা। সুতরাং, ঘটনশীলতা বর্ত্তমান সত্তা ও অবশ্যম্ভাবী অসত্তার সমাহার। এইরূপে, পরমসত্তা নিত্য ঘটনশীল, নিত্য গতিমান, নিত্য-পরিণামী। ঈদৃশ গতিবাদ স্বীকার করিলে সৃষ্টি কার্য্যটী অনায়াসেই যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। অনভিব্যক্ত পরম সত্তা স্বভাবতঃই ক্রমান্বয়ে জগতে অভিব্যক্ত হন। ঈদৃশ অভিব্যক্তিই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া, ইহা তাঁহার অসম্পূর্ণতাদ্যোতক নহে। বীজ অন্তর্নিহিত শক্তি বলেই অঙ্কুরে স্বভাবতঃই পরিণত হয়। সুতরাং বীজের অঙ্কুরে অভিব্যক্তি বীজসত্তার অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক নহে, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বীজ বীজই নহে শুধু, ভবিষ্য অঙ্কুরও। অতএব বীজস্বরূপ বর্ত্তমান বীজও ভবিষ্য অঙ্কুর এই উভয়ের সমাহার বলিয়া বীজ হইতে অঙ্কুর সৃষ্টি স্বভাবজ কার্য্য মাত্র। এইরূপে, অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মা স্বভাববশেই স্থূল জগতে ক্রমান্বয়ে প্রপঞ্চিত হইতেছেন বলিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধ কোনো প্রশ্নই উঠে না। জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যারূপে, স্থিতিবাদ অপেক্ষা গতিবাদই শ্রেয়ঃ।

বিখ্যাত সুফী জীলী প্রপঞ্চিত মতবাদেও উক্ত গতিবাদের আভাস পাওয়া যায়। জীলীর মতেও সূক্ষ্ম অব্যক্ত পরমাত্মা স্বভাবতঃই

---

(১) **Static Conceftion of God as Being.**

(২) **Dynamic Conceftion of God as Becoming.**

ক্রমান্বয়ে স্থূল বিশ্বচরাচরে অভিব্যক্ত হন। অতএব, পরমাত্মার স্বভাবই সৃষ্টির কারণ, অভাব নহে। ইহা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ হইতে, জীলী ঈশ্বরের করুণাকেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন। করুণা অভাব অথবা প্রয়োজন নহে, কিন্তু ক্রীড়ার ন্যায় পূর্ণতারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র।

অতএব, সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সূফীগণ ভিন্নমত। সাধারণতঃ, পঞ্চবিধ উদ্দেশ্যের উল্লেখ বিভিন্ন সূফী মতবাদে পাওয়া যায়। যথা :—(১) মানবরূপদর্পণে স্বীয় প্রতিচ্ছবি দর্শন দ্বারা আত্মজ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দ লাভেচ্ছা। (২) আত্মজ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দের অভাব না থাকিলেও, মানবরূপ সাথীর দ্বারা পুনরায় ঈদৃশ জ্ঞান ও আনন্দ লাভেচ্ছা। (৩) পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বসিত ক্রীড়া। (৪) স্বভাবজ অভিব্যক্তি। (৫) করুণা।

চীনা ঐতিহ্য ও হ্সুন্‌ৎজু

শ্রীশিবকুমার মিত্র

চীন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বর্ত্তমান যুদ্ধের দৌলতে অনেকখানি বেড়ে গেছে। জাপান চীনকে আক্রমণ না করলেও তাড়াতাড়ি তা সম্ভব হোতো না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীনের দান অমূল্য এবং সে বিষয়ে আমাদের এতদিনকার পুঞ্জীভূত অজ্ঞতা লজ্জাকর। জাপানী বর্বরতা আমাদের সে লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে চীনা ইতিহাস আমাদের কাছে আর অজানা নেই, কিন্তু তার কৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা আগের মতোই রয়ে গেছে। অথচ এই প্রাচীন দেশ একদিন সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে ও ললিতকলায় সমগ্র পৃথিবীর অগ্রগণ্য ছিল। কন্‌ফিউসিয়াসের নাম অনেকেই শুনেছে, অনেকে হয় তো তাঁর দুএকটা বুলিও আওড়াতে পারে, কিন্তু তাঁর যে বিশিষ্ট চিন্তাধারা আজও চীনকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার খবর খুব কম লোকই রাখে। কত ভিন্নধর্মী জাতি চীনে এসেছে গেছে কিন্তু কন্‌ফিউসিয়াসের চীনকে মারতে পারে নি। অথচ চীন চিরকাল এক ছিল না। চীনের বর্ত্তমান ঐক্য জাপানী বর্বরতার অন্যতম দান। যিশুখৃষ্টের দু-তিনশো বছর আগে চীনে এমন এক সময় এসেছিল যখন চীন ছোট ছোট কয়েকটি কলহপরায়ণ রাজ্যে বিভক্ত। সমস্ত দেশের শান্তি তখন বিলুপ্ত। সমাজ জীবনেও গোলমাল। চীনারা তাদের আদর্শকে ভুলতে বসেছিল, ভেঙে যাচ্ছিল তাদের কনফিউসীয় সংস্কৃতির বুনিয়াদ; দুর্নীতির প্রলোভনে চীন তার বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছিল। মোত্তি, ইয়াংচু, হুইশিহ্‌, কুংসানলুং, চুয়াংৎজি এবং আরো অনেকে কনফিউসীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছিল। চীনের গোধূলিম্লান আকাশে এই সময় উদয় হোলো এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের। ভারতবর্ষে মনুর আবির্ভাবের মতো চীনেও এমন একজনের আগমন প্রয়োজনীয় ছিল এবং তিনি এলেন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর নিয়ে। সেই মনীষী হ্সুন্‌ৎজুর কথাই আজ বলছি।

কন্‌ফিউসিয়াস, মেন্‌সিয়ুস প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেছিলেন যে মানুষের প্রকৃতি স্বভাবতই ভালো। নিজের নিজের সামাজিক সম্বন্ধ অনুযায়ী নির্ধারিত কর্তব্যপালনই নৈতিক উন্নতির একমাত্র পথ। মানুষ স্বভাবতই জ্ঞান, বদান্যতা ও সাহসের অধিকারী। শিক্ষা দিয়ে আমরা তার ঐ প্রকৃতিকে শালীন করে তুলি। মানুষ যেন জ্বলন্ত প্রদীপ শিক্ষার তৈলে সে আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চরিত্র স্বর্গের দান। বৈদিক ঋষির মতো তাঁরা বললেন, যে শক্ত বিশ্বের নিয়ন্তা, তারই মূর্ত প্রকাশ মানুষে। মানুষ তাই স্বভাবতই ভালো।

হ্সুন্‌ৎজু এসে বললেন, না, মানুষ স্বভাবত ভালো নয়. বরং উল্টো, সে মন্দ। শুনে সবাই চমকে উঠলো। কন্‌ফিউসীয় সংস্কৃতির বিরোধীরা আনন্দিত হোলো শুনে, তারা ভাবলে তাদের দল পুষ্ট হোলো বুঝি এই নবাগতের দ্বারা। পরে তারা ভুল বুঝতে পারলে। সামাজিক ভাঙনের সময় হ্সুন্‌ৎজুর আবির্ভাব, মানুষের চারিত্রিক অবনতিই তাঁর চোখে পড়েছিল। তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। আর তাই তাঁর নৈরাশ্যবাদ। কিন্তু যুক্তিদ্বারা তিনি এগিয়ে চললেন অপরূপ সিদ্ধান্তে। কী সে সিদ্ধান্ত তা বলবার আগে মানুষ স্বভাবত কেন খারাপ তার যুক্তি শুনুন।

মানুষ যদি ভালোই হয় তো ভালোর পেছনে ছুটবে কেন, সেটা তো তার কাছেই আছে। অতএব মানুষ ভালোর পেছনে ছোটে বলেই সে প্রমাণ করে যে সে ভালো নয় অর্থাৎ সে খারাপ।

মানুষ যদি পারত্রিক চরিত্রের অধিকারী হয় তো কিসের প্রয়োজন রাজর্ষিদের এবং নৈতিক নিয়মের? কিন্তু আমরা

দেখি ইতিহাসে এ দুটি নিশ্চিত বর্তমান। অতএব মানুষ নিশ্চয় খারাপ।

মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনি পেয়েছিলেন তদানীন্তন চীনে; তাই গভীর ক্ষেদের সংগে বলেছিলেন, ধর্ম মানুষের স্বভাবজ নয়, তাকে ধার্মিক হতে হয়।

কিন্তু ধর্ম কী, নৈতিক উত্তম-অধম বিচারের মানদণ্ড কী? এইখানে তিনি কনফিউসীয় সংস্কৃতির মধ্যে আবার ফিরে গেলেন। তিনি বললেন, নৈতিক কর্তব্য দেশের শান্তি রক্ষায় চিরাচরিত প্রথা পালনে অর্থাৎ কনফিউসীয় নীতি পালনে। কিন্তু মানুষ যখন স্বভাবত ধার্মিক নয়, তখন তাকে ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। কনফিউসিয়াস বলেছিলেন শিক্ষা আত্মার বিকাশ; মানুষ ধার্মিক, শিক্ষা দ্বারা তা আরো বিকশিত হয়। হ্‌সুন্‌ৎজুর মতে মানুষ তা নয়, অতএব শিক্ষা যদি আত্মার বিকাশ হয় তো মানুষ কোনোদিন ধার্মিক হতে পারবে না, কারণ ধর্ম মানুষের আত্মিক নয়। কাজেই শিক্ষা হয়ে ওঠে আত্মার ওপর অনাত্মীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন চীনের লি-নীতিতে হ্‌সুন্‌ৎজু খুঁজে পেলেন ধর্মকে; বললেন, এই লি-নীতি পালন করার অভ্যাসই হবে শিক্ষা, তবেই গড়ে উঠবে চরিত্র। মানুষের প্রবৃত্তি স্বর্গের দান হতে পারে কিন্তু চরিত্র নয়। রাজর্ষিদের আদর্শ রেখে আমাদের শিখতে হবে লি-নীতি। কিন্তু শিক্ষা যখন আত্মিক বিকাশ নয়, তখন এটা জোর করে দিতে হবে। তাই লি-র সংগে যুক্ত হোলো ফ্রি: শিক্ষার জন্ত চাই রাষ্ট্র, চাই শাসন। এমনি করে নীতি পথে থাকতে থাকতে এমন এক সময় আসবে যখন ফ্রি-র প্রয়োজন হবে না। ধর্মটাই মানুষের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। রাজর্ষি হবে প্রত্যেকের আদর্শে। খারাপ হলেও শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেকেই হতে পারবে রাজর্ষির মতো। তখন আর দরকার হবে না বিদ্রোহের, কিংবা দেশের শান্তিভঙ্গের।

হ্‌সুন্‌ৎজুর মতবাদ কিন্তু একের সর্বৈব প্রভুত্বের রাস্তা খুলে দিলে। লি-ধর্মের অবশ্যপালনীয়তা রাষ্ট্রশক্তিপ্রসূত এবং রাষ্ট্র বলতে তখন অধিপতিকেই বোঝাতো। শিক্ষা যদি বাইরে থেকে জোর করে দেওয়া হয় তাহলে যে শেখাবে তার প্রভুত্ব অনস্বীকার্য। তাছাড়া শিক্ষা মানেই এক্ষেত্রে মানুষের চারিত্রিক দোষকে চেপে গুণের লালন এবং এই চাপার কাজটি হ্‌সুন্‌ৎজুর মতে, মানুষ নিজে করতে পারে না; তাকে চাপতে হয়। এখানেও তাই প্রভুত্বের ছিদ্র রয়েছে।

পরবর্তীকালে এই একচ্ছত্র প্রভুত্ব চীনে বাস্তবিকই দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম দেখা যায় ৎসিনবংশের প্রথম সম্রাটের রাজত্বকালে। হানফেই অবশ্য তার আগেই উপলব্ধি করেছিলেন যে লি-নীতির শক্তি নেই নিজের, রাষ্ট্রীয় আইনই সর্বশক্তিমান। আইনের ওপর শিক্ষা নির্ভর করলে তা হয়ে ওঠে পরগাছার মতো। আর হোলোও তাই। ৎসিন বংশের প্রথম সম্রাটের পর থেকে চীনের সাংস্কৃতিক উন্নতি বন্ধ হয়ে গেল এক হাজার বছরের জন্তে। বৌদ্ধধর্মের প্রাণবান আকর্ষণে চীনের জনগণ ভেসে গেল। সুঙ্‌বংশের সময় চীনের নবজন্ম হয়। সে নবজন্ম কিন্তু কনফিউসীয় কৃষ্টির দ্বারা পুষ্ট। আর তা সম্ভব হয়েছিল হ্‌সুন্‌ৎজুর মতবাদপ্রসূত সংকীর্ণতার জন্ত। নয় তো বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মের ধাক্কায় চীন তার জাতীয় ঐতিহ্য সামলে রাখতে পারতো না। হান্‌বংশের সম্রাট উতি শিক্ষার এই মতবাদে এমন বিশ্বাসী ছিলেন যে হ্‌সুন্‌ৎজুর কথামতো কনফিউসীয় মতবাদ ছাড়া অন্ত সব মতবাদের প্রচার আইনত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সমস্ত চীন আজ তাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

চিন্তার ক্ষেত্রে হ্‌সুন্‌ৎজুর দান হয় তো তেমন ধাঁধা-লাগানো নয়, কিন্তু তার ঐতিহাসিক মূল্য চীন আজ বুঝেছে। কনফিউসীয় মন্ত্রের শেষ বিশিষ্ট উদ্‌গাতা তিনিই। তাঁর চিন্তাধারার ওপর তাঁর পারিপার্শ্বিকের ছাপ অতি সুস্পষ্ট। তাঁর সমস্ত মতবাদটাই তখনকার সামাজিক দুর্নীতির প্রতিক্রিয়া দ্বারা গঠিত। অনাচারের পরিবর্তে তিনি হয়তো অজ্ঞাতে স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেমন করেছিলেন মনু; তাতে কিন্তু সুফলই হয়েছে। মনুর জন্ত হিন্দুরা বেঁচে আছে আজও, আর চীন বেঁচেছে হ্‌সুন্‌ৎজুর জন্ত। কনফিউসিয়াস, মেনসিয়ুস এবং হ্‌সুন্‌ৎজু, মহাচীনের ঐতিহ্যের উদ্‌গাতা এবং হোতা এঁরাই।

ভূমা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কাঞ্চনের শুদ্ধি লাগি অগ্নিদাহ দেয় স্বর্ণকার,
একাদশী ব্রতব্রত ত্যাগ তীর্থ মানুষের তরে,
মানুষ কাহার তরে তুষাগ্নির তপস্যা সে করে?
সঙ্কীর্ণ স্বল্পেরে ত্যজি—আরাধনা করে সে ভূমার।

আপেক্ষিক

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম্-এ

গল্প লিখব। একটা প্লট চাই। অনেক চেষ্টা করলাম। সব বৃথা।

উঠানে কাদা। বাইরে বৃষ্টি। আকাশে মেঘ। আম গাছগুলো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা বৃষ্টি-ভেজা কাকের অবস্থা শোচনীয়। কয়েক দিন আগে একটা ক্রুদ্ধ কাকের হিংস্র ঠোঁটের আঘাতে একটা নিরীহ শালিক রক্তাক্ত দেহে মারা পড়েছিল। এটা কি সেই কাকটা? কে জানে। পৃথিবী বহুরূপীর চিড়িয়াখানা। কাল যে ছিল দুর্দান্ত, আজ সে বেচারী। কাল মনে হয়েছিল কাকটা ভাগ্যবান, কত শক্তির অধিকারী; আর বেচারী শক্তিহীন দুর্বল শালিক। আবার এখন মনে হচ্ছে: নির্মিতনীড়ক্রোড়ে কী সুখী ওই শালিকমিথুন; আর বেচারী আশ্রয়হারা কাক! এমনি হয়। কে যে ভাগ্যবান, আর কে যে দুঃখী, তার বিচার-মীমাংসা অসম্ভব। হয় তো বা সবাই দুঃখী। সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্।

সশব্দে একটা মিলিটারী ট্রাক চলে গেল বাইরের পথ দিয়ে। চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

ছোট মফঃস্বল সহরটায়ও লেগেছে যুদ্ধের নিশ্বাস। মিলিটারী লরীর অবিরাম ধ্বনি। স্পেশ্যাল মিলিটারী ট্রেনের যখন-তখন যাতায়াত। ঘন ঘন সৈন্যদের আনা-গোনা। পথে পথে বুট-মার্চ।

জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে হু-হু করে। চার টাকা মণ দরের চাউল ন'টাকায় উঠেছে। তেল-নুনের অবস্থা ততোধিক। কাপড়ের বাজার আগুন।

মনে পড়ল: আজই বাড়ীর চিঠি পেয়েছি। বাবার চিঠি। যে-টাকা এতদিন মাসে মাসে পাঠিয়ে এসেছি, তাতে আর সংসার খরচ চলে না। অতএব—

কিন্তু আমি তো যে স্কুল-মাস্টার সেই। প্রয়োজন বেড়েছে বলে আমার মাইনের অংক তো বাড়ে নি। কি যে হবে।

নিজের কথাটা মনে আসছে। ভাদ্রের ঘন-বর্ষণের কৃপায় আজ রেনি-ডে। স্কুল ছুটি। ছেলেরা সব যার-যার মত আড্ডায় জমেছে। বোর্ডিং নির্জন। উঠানে কাদা। বাইরে বৃষ্টি। আকাশে মেঘ।

জীবনের ত্রিশটা বছর কী করলাম। উচ্চ আদর্শের দিকে ঝোঁক ছিল না। ছোট, সুস্থ, সুন্দর জীবনের প্রতি ছিল উদগ্র আকর্ষণ। কিন্তু কি পেলাম? মফঃস্বলের স্কুল-মাস্টার। পয়তাল্লিশ টাকা উপার্জন। বোর্ডিং-সম্বল। কু-গৃহে বাস। কদন্ন ভোজন। জীবনের চরম নিগ্রহ।

জানালায় কার ছায়া পড়ল। চোখ ফেরালাম। নারাইনা। কুলি বস্তীর ছেলেটা। বছর বারো বয়েস। মিশমিশে কালো রং। মাথায় একডালি চুল। একটা চোখ নাই। জন্ম-অপরাধী।

আমার বালক-ভৃত্যের অসুখের সময় কয়েকটা দিন আমার ছোটখাট কাজগুলো করে দিয়েছিল। কয়েকটা পয়সা দিয়েছিলাম। সেই থেকে মাঝে মাঝে আসে। পথে দেখা হলে অসংকোচে চেঁচিয়ে ওঠে: বাবু—

আহা বেচারী! বাবা নেই। মা অন্য কাকে বিয়ে করে অন্যত্র চলে গেছে। বিপুল ধরণীতে ও একা। কাকা আছে অনেকগুলি ছেলেপিলে নিয়ে। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান। কিন্তু ওখানে ওর ঠাঁই নেই। মাতৃ-পরিত্যক্ত বিশ্ব-পরিত্যক্ত।

বললাম: কি রে? এখানে কেন?

কথা বলল না। মাথা নীচু করল।

শুধালাম: কাজ পেয়েছিস্ কোথাও?

ঘাড় নাড়ল।

: কাকার কাছে যাস্'না কেন?

নিরুত্তর।

: কাকার কাছে না গেলে না খেয়ে বাঁচবি কেমন করে?

অতি কষ্টে জবাব দিল। কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ: গিয়েছিলম। কাকা খাইতেও বলল না, কিছু-ও না। তাই চইলে এলাম।

: চইলে তো এলম। কিন্তু এরকম করে কদিন তুই বাঁচবি?

নীরব। আম গাছের ডালে ভিজে কাকটা আবার ককিয়ে উঠল। বেচারী আশ্রয়হীন।

জানালার শিক ধরে নারাইনা দাঁড়িয়েই আছে। নির্বাক আনত মুখ। মাঝে মাঝে শুধু আমার দিকে চাইছে কাতর চোখে।

অনেকক্ষণ পরে বলল: সারাদিন কিছু খাইলম না বাবু—

কোন জবাব মুখে এল না। শিওরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

কয়েকটি ছোট ছোট পায়ের শব্দ এসে ঘরে ঢুকল। বোর্ডিং-এর ঝি-র ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। দুপুরের বাসন মাজতে এসেছে। আমার ঘরে অর্ধভুক্ত ভাতের থালা ছিল। তাই নিয়ে মহানন্দে কলরব করতে করতে ওরা বেরিয়ে গেল।

আহা বেচারীরা। দিন সাতেক আগে ওদের রুগ্ন বাবা মারা গিয়েছে। ঝি-গিরি করে মা ওদের পালন করে। কিন্তু পারে কি? যে দুর্দিন পড়েছে। চাউলের মণ ন'টাকা। তেল-নুন ততোধিক। কাপড়ের বাজার আগুন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস এসে কপালে লাগল। চমকে উঠলাম। নারাইনা আহত মুখে দাঁড়িয়ে। ওরি দীর্ঘ-নিশ্বাস। ও যে আমার অর্ধভুক্ত ভাতের থালার জন্যে এতক্ষণ নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করছিল, তাতো বুঝতে পারি নি।

কল-তলা হতে ঝি-র ছেলেমেয়েগুলোর আনন্দ কলরব ভেসে এল। বালিশের নীচ থেকে নারাইনাকে একটা পয়সা বের করে দিলাম। বললাম: এক পয়সার মুড়ি কিনে খাগে।

নারাইনা চলে গেল। বেচারী।

মনটা ভারী হয়ে গেল। ফাউন্টেন-পেনটা বন্ধ করে বালিশে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

গল্প লেখা হল না।

সত্যচরণ শাস্ত্রী

শ্রীসুবোধ কুমার রায়

(২)

কিশোর বয়স থেকেই অন্তরে প্রবলভাবে দেখা দেয় সংস্কৃতচর্চ্চার অনুরাগ। দিনে দিনে সেই অনুরাগ এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে একদিন বাড়ীতে না জানিয়েই গোপনে চলে যান কাশীতে; তখন বয়স তাঁর মাত্র ১৫ বছর, (১) বরাহনগর হিন্দুস্কুলের ছাত্র। পাছে দূরদেশে যেতে কেউ বাধা দেয় সেই ভয়ে নিজের মনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করতে পারেন নি। কাশীতে পৌঁছে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে কেদারবাবু লিখেছেন,—"যে সময়ের কথা বলছি সেটা বোধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ১৮৮০র প্রারম্ভ—১৮৮১।৮২ ও হতে পারে। ঐ সময়ে গ্রামের কয়েকটী বয়ঃজ্যেষ্ঠ যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বচঞ্চল উন্নতিকামী উৎসাহীদের আগ্রহ ও চেষ্টায় গ্রামে একটী লাইব্রেরী বা পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্য বৈকালে সেখানে আমাদের গতিবিধি থাকত। সত্যচরণ তখন 'ভুজি' নামেই আমাদের কাছে পরিচিত ছিল এবং বয়সেও বোধ করি আমার কিছু ছোটই ছিল। লাইব্রেরীতে তাকে নিয়মিত পাঠকরূপেই পেতাম। সে দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'কল্পদ্রুম' ও মনুসংহিতা পাঠেই নিবিষ্ট থাকত। হঠাৎ তার যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় খোঁজ নিয়ে শুনতে পাই—'কাশীতে সংস্কৃত পড়তে গিয়েছে'। আশ্চর্য্য হবার কারণ ছিল না, কখন কার মনে কি সঙ্কল্প ওঠে ও কাজ করায় তার কোন কৈফিয়ৎ নেই. বিশেষ ও বংশের অনেকেই ছিলেন adventurous (সাহসিক কার্য্যকরী)। প্রায়ই দেশ বিদেশ ঘুরতেন। তখনকার কাশী যাওয়া এখনকার মত এত সহজ ছিল না, বিশেষ ১৬।১৭ বছরের তরুণের পক্ষে। তাই কথাটা বললুম।' (২)

শাস্ত্রী মহাশয় নিজেও লিখেছেন—"কাশী পৌঁছিবার পর দিবস আমি কাশীর, কাশীর কেন ভারতের শ্রেষ্ঠতম আচার্য্য স্বামীজীর কাছে গমন করি। সেই সুপক্ক-কেশ পুরুষসিংহ যাঁহার কাছে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী,

---

(১) সত্যচরণবাবু যে ১৮[illegible]২ খৃষ্টাব্দে কাশী যান তার প্রমাণ পেয়েই ১৫ বছর লিখেছি।

(২) কেদারনাথের [illegible]

নির্ধন, রাজা, মহারাজ সমানভাবে দর্শিত হইত, তাহাদিগকে উপদেশ দিবার সময় যিনি যথার্থ বলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না সেই লোকপূজ্য মহাত্মার কাছে আমি স্নেহের সহিত গৃহীত হই।" তিনি আরও লিখেছেন, "স্বামীজী আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, আমার সকল প্রকার কুশলের জন্য তিনি সময় সময় একটু বেশী চিন্তা করিতেন। তাঁহার কাছে থাকিবার জন্য হিন্দুস্থানের অনেক রাজা মহারাজা ও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় হয়।" স্বামী বিশুদ্ধানন্দের সাহচর্য্যে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন, আলোচনায় ও স্বামীজীর কাছে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বহু উপদেশ পেয়ে নিজের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করেন। এই সময় দ্বারভাঙ্গা মহারাজার পাঠশালা ও কাশীর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ থেকে কিছু কিছু বৃত্তি লাভ করে' দূর করেন তাঁর আর্থিক অভাব। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও হ'য়ে ওঠেন সুপণ্ডিত। তিনি ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করেছেন স্বামীজীর সঙ্গে। একবার গিয়েছিলেন হরিদ্বার কুম্ভমেলা ও কাশ্মীর। স্বামীজীর সঙ্গে অনেকগুলি লোক গিয়েছিলেন হরিদ্বার যাবার সময়, কয়েকটী পাচক ভৃত্যও সঙ্গে ছিল। কাশী থেকে যাত্রা করে' প্রথমে সূর্য্যকুণ্ড ও পরে অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী—মুরাদাবাদ হ'য়ে উপস্থিত হন হরিদ্বার কনখলে।

কাশীতে অধ্যয়ন কালেই তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন ২৪ পরগণার বারাসত গ্রাম নিবাসী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে। ৮।১০ বৎসর পরে তাঁর প্রথমা পত্নীর অকাল মৃত্যু ঘটে। তাই বছর দুই পরে আবার বিবাহ করেন রিষড়া নিবাসী ভোলানাথ অধিকারী মহাশয়ের কন্যাকে। প্রথমা পত্নীর সন্তানাদি ছিল না, দ্বিতীয়া পত্নীর চারিটী পুত্র ও তিনটী কন্যা হয়।

কয়েক বছর পরে আপন অভীষ্ট লাভ করে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে শাস্ত্রী উপাধি গ্রহণ করে তিনি যখন আবার ফিরলেন দক্ষিণেশ্বর গ্রামে তখন লোকের মন থেকে সেকথা মুছে গেছে যে এই যুবকই একদিন কিশোর বয়সে প্রাণভরা আবেগ ও বুকভরা জ্ঞান-পিপাসা নিয়ে সবার অলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ছেড়ে দুর্জ্জয় মনের বল ও অসীম সাহসে নির্ভর করে' বেরিয়ে পড়েছিল আপন অভীষ্টসিদ্ধির আশায়। কেদারবাবু লিখেছেন—"যাক্—আলোচনার কিছুই ছিল না, ওকথা ভুলেই গিয়েছিলাম। 'ভুলি'কে যেমন একদিন হঠাৎ হারানো হয়েছিল, কয়েক বৎসর পরে তেমনি হঠাৎ একদিন আমাদের 'ভুলি'কে সত্যচরণ শাস্ত্রীরূপে পাই। মানুষের প্রবল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাই অভিষ্টলাভে চিরদিন সহায়। শুনিলাম কাশীর স্বনামধন্য সিদ্ধ সাধকদের অন্যতম বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট বিদ্যার্থীরূপে শিষ্যত্ব স্বীকার করে' সত্যচরণ ভায়া কয়েক বৎসর পরে অভিষ্ট লাভান্তে ফিরেছেন। তাঁকে আর পূর্ব্বের মত দেখতে পাই না।"

"যাদের কোন উদ্দেশ্য থাকে ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির যত্ন থাকে তারা নীরবেই কাজ করে। কিছুদিন পরে শুনতে পাই সত্যচরণ নিত্য কলিকাতায় যান ও ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে সারাদিন পুস্তকাদি পাঠে মগ্ন থাকেন। ইতিহাসের প্রতিই তাঁর বিশেষ আগ্রহ। সেটা বিদ্যানুরাগী লর্ড কার্জ্জন সাহেবের যুগ—তিনিই ছিলেন আমাদের বিখ্যাত বড়লাট। ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে তাঁর যাতায়াতও ছিল প্রায়ই। সত্যচরণ ভায়াকে মগ্ন পাঠকরূপে পাওয়ায় ভায়ার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে, কথাবার্ত্তাও হয়। বংশের বিশেষত্ব পূর্ব্বেই বলেছি—সকলেই প্রকৃতিগত **forward type**এর, কুণ্ঠা সঙ্কোচের ভাব তাঁদের ছিল না, তাতে লাটসাহেব প্রীত হ'য়ে একখানি সার্টিফিকেট বা প্রীতিপত্র লিখে দেন। এসব আমার শোনা কথা হলেও সন্দেহের কথা নয়। বোধ করি তারপর বা সেই সময়ে সত্যচরণ ভায়ার "নন্দকুমার" বলে বইখানি প্রকাশিত হয়।" (১)

শ্রীরামপুরে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত মেনওয়ারিং সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও শিক্ষা করবার সুযোগ পান এবং তাঁর কাছে শাস্ত্রী মহাশয় রুষ ভাষা শিক্ষা করেন এবং সাহেবকে সংস্কৃত ও কিছু কিছু বাংলা ভাষা শিক্ষা দেন। তারপর পিতার অনুরোধে শিবাজীর জীবনচরিত রচনা করার মানসে যাত্রা করেন বম্বাই অভিমুখে। বম্বাই যাওয়ার পথে কেদারনাথের সঙ্গে দেখা করেন সে কথাও কেদারবাবু পত্রে জানিয়েছেন। "আমি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে জব্বলপুরে চলে যাই। বোধ হয় ১৮৯৬।৯৭এর এক প্রত্যুষে (২) 'কেদারবাবু হায়' বলে হিন্দিতে এক সুউচ্চ হাঁক পেয়ে জামাটা গায়ে দিতে দিতে বাইরে বেরিয়ে দেখি—পাগড়ি ও অল্প দাড়িসহ মেরজাই আঁটা এক বলিষ্ঠ মূর্ত্তি। থপ্ করে হাত ধরে বাংলায় কথা কইলেন,—'এসো এসো, সময় কম, কথা কইতে কইতে যাই, এক ঘণ্টাও সময় নেই, ট্রেন ছেড়ে যাবে।' বুঝলুম সত্যচরণ ভায়া। 'ব্যাপার কি, কবে এলে, এত তাড়া কিসের, কোথায় যাবে?' বল্লেন 'পুণায় চলেছি, শিবাজী সম্বন্ধে একখানা বই লেখার ইচ্ছে, সরে জমিনে তথ্য না নিয়ে সেটা করতে চাই না,—ইত্যাদি।' জানি একদিন থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করা বৃথা, কোন ফল হবে না। বিশেষ ওরূপ উদ্দেশ্য যাঁর, তাঁকে বাধা দেওয়াও উচিৎ হবে না। আমার বাসা থেকে ষ্টেশন একমাইল বা কিছু ওপর হবে। ভায়া টেনে নিয়ে চল্লেন। তাঁর সঙ্গে মার্চ্চ করেই চলতে হ'ল। ওঁদের সবই বীরের ছন্দ। ভায়া বক্তা আমি শ্রোতা। সব কথা প্রবীণ-ভাবেরও উপদেশ সঙ্কুল। সবই ভাল কথা। আমি হুঁ হাঁ দিয়ে চল্লুম। যৌবনের নবোৎসাহে ভায়া ভরপুর। বল্লেন, এখানে রয়েছ—দেখাটা করে যাব না,—এই তো হয়ে গেল।" বললুম, তোমার তাড়া দেখেও উদ্দেশ্য শুনে একদিন থেকে যেতে বলতে পারলুম না।' বল্লেন 'থাকা থাকি কি একটা মহৎ কাজ নাকি;—আচ্ছা এখন ফিরতে পার। লিখতে যখন পার কিছু লিখছ না কেন? লিখো' ইত্যাদি। আমি

---

(১) কেদারনাথের পত্র।

(২) কেদারবাবু খৃষ্টাব্দগুলি স্মৃতিশক্তির সাহায্যে লিখেছেন কাজেই ঠিক ঠিক হয় নি, কেননা যে শিবাজীর জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সেই জীবন-চরিত লেখার বিষয় বস্তু সংগ্রহ ক'রতে নিশ্চয়ই তারও পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয় যাত্রা করেছিলেন।

ফিরলুম, ভায়া মহৎ কাজে চলে গেলেন। ভাবলুম এরূপ উৎসাহ, উত্তেজনা ও সাহস না থাকলে মানুষ কিছুই ক'রতে পারে না।"

"সেখানে পৌঁছে ভায়া নিজ বাক্‌শক্তি ও দক্ষতাগুণে মহারাষ্ট্রী সুধীজনের কাছে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং আশাতীত অভিনন্দন ও সম্মানাদি আদায় করে ফিরেছিলেন। তখনকার সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী ও মাসিক পত্রিকাদিতে ফটোসহ সে সংবাদ অনেকেই পেয়ে থাকবেন। মহারাষ্ট্রী স্বজন ও পণ্ডিতেরা তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির বহু উপকরণ নাকি সানন্দে সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমিও পত্রিকাদিতে বাঙালীর সে' গৌরবের কথা উপভোগ করেছিলাম।"

কেদারনাথের পত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রের একটা দিক বেশ পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু কতকগুলি সংবাদ সমর্থনের জন্যই যে পত্রখানি এই প্রবন্ধে যুক্ত করেছি তা নয়; চরিত্রের যে দিকটা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না—সেই দিকটিকে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই তা উদ্ধৃত করেছি, এবং সেই উদ্দেশ্যেই পত্রের শেষ অংশটুকুও পৃথকভাবে পাদটিকায় প্রকাশ করছি।(১)

(১) "তার পর কয়েক বৎসর কেটে গেছে। ভায়া ইতিমধ্যে 'ছত্রপতি শিবাজী,' 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি কয়েকখানি ঐতিহাসিক গবেষণাসহ পুস্তক প্রকাশ করেছেন। প্রতাপাদিত্যে উল্লেখ আছে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় নামে প্রতাপাদিত্যের যিনি প্রধান সৈনাধ্যক্ষ বা কমাণ্ডার ইন চিফ্ ছিলেন তিনি লেখক সত্যচরণ ভায়াদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। সে' সম্পর্কে প্রতিবাদের স্পর্শও দেখা দিয়েছিল, তার পরের কথা বা মীমাংসার কথা আমার জানা নেই, সম্ভবতঃ আমি তখন চীন রাজ্যে।"

"শাস্ত্রী মহাশয়দের বংশের সহিত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ও তৎপুর্ব্বে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল বা আছে শঙ্কর সম্বন্ধে কথাটা তাঁদের বিশ্বাস করতে বিশেষ ইতস্ততঃ ভাব না আসাই সম্ভব। কারণ যাঁদের আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শঙ্কর যদি সেই অসমসাহসী, দীর্ঘছন্দ, বীরপ্রকৃতি ও adventurous বলিষ্ঠ বংশের পূর্ব্বপুরুষ হন সে ক্ষেত্রে যশোহরাধীপের তাঁকে commander-in-chief নির্ব্বাচন করাটা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ করতে মন চায় না। তবে প্রমাণসহ কি না সে সব অতীত গবেষকদের অধিকারের কথা।"

[প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্ত্তী যে শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। 'শঙ্করের অধস্তন দশম পুরুষে পরম শ্রদ্ধেয় সত্যচরণ শাস্ত্রী।'

(যশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড)

মাননীয় সুবলচন্দ্র মিত্রের 'অভিধান,' শ্রদ্ধেয় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখক' প্রভৃতি গ্রন্থেও একথা সমর্থিত হয়েছে।

বারাসত 'শঙ্কর স্মৃতি' প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণ শঙ্কর সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের একজন পৃষ্ঠপোষক ও সভ্য ছিলেন।]

- বম্বাইএ একবার ডিটেকটিভ্ পুলিশ তাঁকে বন্দী করে রুষ চর বলে সন্দেহ করে'। জাষ্টিস্ রাণাডে, লোকমান্য তিলক প্রভৃতির চেষ্টায় অব্যাহতি পান।

হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে লেখার জন্য বিষয়বস্তু সংগ্রহের আশায় তিনি শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। **'Bataviaasch Nieuwsblad'** নামক ডাচ্ সংবাদপত্রে তাঁর সেই যবদ্বীপ যাত্রার সংবাদ বিস্তারিতভাবে প্রচারিত হয়েছিল। পরে সাহিত্য পত্রিকায় 'প্রাচী ভ্রমণ' নাম দিয়ে তিনি সেই ভ্রমণ কাহিনীটি প্রকাশিত করেছিলেন ধারাবাহিক ভাবে। ('সাহিত্য' ১৩১৯, আষাঢ়, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এই ভ্রমণ উপলক্ষ করে 'যবদ্বীপে হিন্দু' নামে একখানি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কাজেই এখানে সে' বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি।

"যাক্, শাস্ত্রীভায়ার সহিত জব্বলপুরে সাক্ষাতের পর দীর্ঘ কয়েক বৎসর আর দেখাশোনা হয় নাই। আমি যখন কানপুরে, খৃষ্টাব্দটা ১৯০৮ই হ'বে আবার সেই হিন্দি ডাক—'কেদারবাবু ঘরমে হায়।' 'হায়' বলে নেবে এসে দেখি সেই পাগড়ি দাড়ি ও মেরজাই, সত্যচরণ ভায়া উপস্থিত। 'আরে এসো এসো বসবে এসো ভাই।' তাঁর ভাষাটা ছিল সদাই ভ্রাম্যমান। বললেন 'বসবার সময় নেই, কান্যকুব্জ চলেছি, দেখাটা না করে কি যেতে পারি? এইত হয়ে গেল।' হর্ষবর্দ্ধন না শ্রীহর্ষ কি একটা বল্লেন, 'তাঁর সম্বন্ধে লিখছি। একটা রিসার্চে চলেছি, রামচন্দ্রের সময়ের স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহের আশা আছে,—' ইত্যাদি। তুমি আমার * * * ক্লাইব বলে বইখানা দেখেছ?' বললুম 'না।' একখানা তাঁর হাতে ছিল, দিলেন 'পোড়ো।' বললুম 'নিশ্চয়ই।' কিন্তু বইখানার কভার বা টাইটেল পেজখানা দেখেই চমকে গেলুম—'করেছ কি?' একমুখ হেসে বল্লেন 'যার প্রমাণ আছে তা লিখতে ভয়টা কি? ও কথাটা ঐ টাইটেল পেজে আর ভূমিকায় পাবে, ভেতরে সকল পৃষ্ঠাতেই 'ক্লাইব' পাবে। মিছে গোলমাল করে তো কভারটা বদলে দিলেই হবে।' ভায়া অকুতোভয়।

না বসা না জলখাওয়া—ভায়া কান্যকুব্জ যাত্রা করলেন। একেবারে ডবল মার্চ। পরে আমি ১৯০৯।১০এ, সময় না হতেই কার্য্যস্থল হতে অবসর লয়ে (retire করে) কাশী গিয়ে থাকি। সাল স্মরণ নেই, কাশী অবস্থানকালে শাস্ত্রী ভায়া দুইবার দেখা দেন। সেই ব্যস্ত ভাব। কথার মধ্যে 'গুড়ুক খাওয়াটা ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। এখন তো সময় আছে দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধেই কিছু লেখো' ইত্যাদি। বলেছিলুম 'প্রাণের কথাই বলেছ ভাই। কতবারই ভেবেছি—তোমাকে ঐ কথাটি বলব। তুমি ঐতিহাসিক গবেষণার পথ জেনেছ,তার 'টেক্‌নিক্ ও ফরমুলা' তোমার সড়গড়। আমি অন্ধ। বহুদিন হতে শুনে আসছি বাণরাজের সময় হ'তে দক্ষিণেশ্বরের 'দেউল পোতা' ও দীঘির বুকে বহু রহস্য গোপন রয়েছে। তার উদ্ঘাটন তুমি চেষ্টা পেলে কিছু ক'রতে পার, আশা করি —একদিন তুমি সে চেষ্টা পাবে। এখনও প্রাচীন লোক কেহ কেহ

বাল্যকাল থেকে যে দেশভ্রমণ স্পৃহা মনে অঙ্কুরিত হ'য়েছিল পরিণত বয়সে তা দিন দিন এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে জীবনের কোন দিনই স্থির ভাবে এক জায়গায় কাটাতে পারেন নি। ছেলে বয়সে যে হিমালয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে আবার সাড়া দিলেন সেই হিমালয়ের ডাকে। বাধা, বিপদ, প্রৌঢ়ত্বের দুর্ব্বলতা সমস্ত অতিক্রম করে' যাত্রা করলেন কৈলাসের পথে। এই ভ্রমণ কাহিনীটিও প্রথমে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে। 'কৈলাস ভ্রমণ' ভ্রমণকাহিনী হিসাবে বাংলা সাহিত্য-পাঠকের কাছে চির-আদরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারতবর্ষ সম্পাদক মহাশয় তাঁর পুস্তকাবলী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে "সত্যচরণ ইতিহাসে যেমন, ভ্রমণ বৃত্তান্তেও তেমনি নাটকোচিত ঘটনা সংস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেইজন্য ইতিহাসে ও ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে সজীবতার সঞ্চার করিতেন, তাহা ঐ সব রচনায় সর্ব্বত্র গাম্ভীর্য্যজ্ঞাপক বলিয়া বিবেচিত হয় না।"(১) তাঁর এই মন্তব্যটি সংক্ষিপ্ত হ'লেও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তিরই পরিচায়ক।

শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখেছেন—"ব্রাহ্মণবীর ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা আচারনিষ্ঠা এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত অনুসন্ধিৎসা লইয়া ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ ও শ্যাম প্রভৃতি পূর্ব্বদেশসমূহ পরিদর্শন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে ঐতিহাসিকের জন্য এক নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন।" (২)

১৯২৪ সালে হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে লেখার বাসনায় তিনি আর একবার শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণের উদ্যোগ আয়োজন করেন, পাশপোর্ট পর্য্যন্ত সংগ্রহ হয় কিন্তু নানা কারণে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

কৈলাস ভ্রমণের পরই শরীর তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৪২ সাল ৭০ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার অন্তর্গত: ত্রিবড়া গ্রামে পরলোক গমন করেন।

নির্ম্মলচরিত্র শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন বহুগুণের আধার। জীবনের বহু সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন ভারতের স্বাধীনতা ও কল্যাণ কামনায়। বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি ছিলেন হিন্দুমহাসভার একজন অন্ধ ভক্ত ও সভ্য। জীবনে বহু সভাসমিতিও পরিচালনা করেছেন। ১৯২৬ সালে তিনি মালব্যজীর 'শুদ্ধি' আন্দোলনে যোগ দিয়ে আন্দোলনের সক্রীয় অংশ গ্রহণ করেন। উড়িষ্যার জলপ্লাবনে অক্লান্তকর্ম্মী যুবকের মত সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করে' সুচারুরূপে সেবাকার্য্য সম্পন্ন করেন। হিন্দুমহাসভার প্রচার কার্য্যের জন্য শেষ বয়সে ভ্রমণ করেন সমস্ত দক্ষিণ ভারত।

১৩৩৫ সালে বরিশাল হিন্দু-সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করে' তেজস্বিনী ভাষায় তিনি যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন তার প্রতিটি ছত্র স্বাধীনতাস্পৃহা ও স্বদেশানুরাগে পূর্ণ। তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন,—"স্বরাজ বা মুক্তি প্রত্যেক হিন্দুর ঈপ্সিত বিষয়। এজন্য চরিত্রবান হইতে হইবে। নিজের মহিমায় বিরাজিত হইতে হইবে। তবে আমরা স্বরাজের অধিকারী হইব। ভ্রষ্ট চরিত্র ইহা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। স্বরাজ আমাদের ধ্যান ধারণার বিষয় হউক। স্বরাজ আমাদের জাগরণে চিন্তার বিষয় হউক, স্বরাজই আমাদের সকল অভিষ্ট পুরণের সহায়ক হইবে। ইহার প্রাপ্তিতে নানা বিঘ্ন আছে। দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে।...তবে আমরা স্বরাজলাভে সমর্থ হইব।"

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নানা মত ও আদর্শগত বিরোধ বর্ত্তমান থাকলেও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে সারা ভারতবর্ষের মত এক ও অভিন্ন। সে যাই হোক, রাজনৈতিক মতবাদ বা আদর্শগত বিরোধের প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্র এ নয়; সেই অক্লান্তকর্ম্মী, ঐতিহাসিক ও স্বদেশানুরাগী শাস্ত্রী মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভার যথাযোগ্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করে' তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাই এই প্রবন্ধ লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য।

থাকতে পারেন, কিছু সাহায্য হতে' পারে। ক্রমেই দীঘি মজে এলো, দেউলপোতার ইটে তারি বুকে লোকের ভিটে বাড়ছে' ইত্যাদি। ভায়া মোদককেই বারবার 'খোদকের' কাজ ক'রতে বলে গেলেন—'তুমি চেষ্টা করলেই পারবে, আমি অনেক কাজে ব্যস্ত।' ব্যস্ত তিনি সত্যই।

শাস্ত্রীভায়া যেমন অধ্যবসায়ী তেমনি পরিশ্রমী ও ভ্রাম্যমাণ ছিলেন। ক্লান্ত জীবন অকালেই শেষ করে' চলে গিয়েছেন। ঐ প্রয়োজনীয় কাজটি আর হয় নাই, আমার আশা অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে। তাঁর মত উদ্যমী পুরুষ বিরল, অল্পই দেখে থাকব। তাঁর সেই জোর কণ্ঠস্বর ও হিন্দি বুলি 'কেদারবাবু হায়?' আজিও ভুলি নাই। কেদারবাবু তো 'হায়'—কিন্তু বৃথা হায়।"

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ণিয়া, ১লা চৈত্র, ১৩৪৯

(১) ভারতবর্ষ—আষাঢ় ১৩৪২

(২) যশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড।

বিদায়

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

বিদায় বেলায় মায়া-ডোরে বেঁধে
বৃথা কর ক্রন্দন।

জীবনে মরণ নিত্য সত্য
ছিঁড়ে ফেল বন্ধন॥

সাদা পাথরের দেশে

শ্রীঅমিয়া দাস

ভারতবর্ষের মানচিত্র খুললে দেখা যায় বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তের আরাকান পর্ব্বতমালার গা ঘেঁসেই আরম্ভ হয়েছে ব্রহ্মদেশের তথা আরাকান বিভাগের বিস্তৃত সবুজ সমতলভূমি।

এই আরাকান বিভাগটী (**Arakan Division**) আকিয়াব (**Akyab**) স্যাণ্ডোয়ে (**Sandoway**) এবং কক্‌পিউ (**Kyaukpyu**) এই তিনটী জেলা (**district**) নিয়ে গঠিত এবং উক্ত তিনটী জেলার প্রধান শাসনকর্ত্তারা আকিয়াব, স্যাণ্ডোয়ে ও চক্‌পিউ নামে এই তিনটী সহরে বাস করেন। সহর তিনটীর অবস্থা বাঙ্গালাদেশের কোন কোন মফঃস্বল সহরের মতই, কিংবা আভিজাত্য গৌরবে তার চাইতেও ছোট।

১৯৪১ সালের শেষের দিকে আমরা একবার আকিয়াব থেকে চক্‌পিউ যাবো ঠিক হলো। আকিয়াব থেকে চক্‌পিউ যাবার দু'টো রাস্তা—একটী হচ্ছে সমুদ্রপথে রেঙ্গুনগামী বড় জাহাজে ১২ ঘণ্টার পথ এবং অন্যটী নদী পথে লঞ্চএ ২৪ ঘণ্টার পথ। সমুদ্র যাত্রার অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল বলে নদীপথই ধরবো ঠিক করা হল।

যাবার দিনে ভোর বেলায় আমরা লঞ্চঘাটে গিয়ে হাজির হলাম এবং বেশ একটুখানি ভীড় ঠেলেই আমাদের ডাঙ্গা আর লঞ্চের মাঝখানকার সেতু স্বরূপ সরু একফালি তক্তা পারাপার কর্তে হোলো। পূর্ব্বাকাশের কুয়াসার আবরণ ভাল করে না মিলাতেই আমাদের লঞ্চ ডক ছেড়ে তার বিদায়-বার্ত্তা ঘোষণা করলে। সময়টা ছিল নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি।—আমরা যে জায়গা থেকে লঞ্চ-এ উঠ্‌লাম সেটা হচ্ছে সমুদ্র থেকে কেটে নেওয়া একটী খাল মাত্র। বর্ষার কয়েকটী মাস এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেড়ে যায় নৌ-ব্যবসায়ীদের কাছে। কারণ নদী-মুখের স্থায়ী ঘাটে তখন জল এত বেড়ে যায় যে ওখানে লঞ্চ, নৌকা কিংবা সি-প্লেন ইত্যাদি বেঁধে-রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ে।

...লঞ্চ ঘাট ছেড়ে কিছুদুর আস্‌তেই তার গতি বাড়িয়ে দেওয়া হল। ততক্ষণে সুর্য্যের-তাপও বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। খালের দু'তীরে সারি সারি ধানের কলের চিম্‌নী আর কাঠ চেরাই করার কারখানা—এইভাবে কিছুক্ষণ চল্‌বার পর আমরা এসে পড়লাম মোহনায় অর্থাৎ যেখানে মায়ু নদী (**mayu river**) এসে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে—সেই জায়গাটীতে। খালের ঘোলাটে জল এবারে নীল হয়ে গেছে। শীতের দিনের সমুদ্র পুকুরের মতই স্থির, শান্ত। লঞ্চখানা হেল্‌তে দুল্‌তে নদীর সীমার মধ্যে ঢুকে পড়লো। পাহাড়ী নদী বলে এ নদীটী বেশ চওড়া এবং বারমাসই প্রচুর জল থাকে। নদীর এক তীরে সবুজ রঙের পাহাড় শ্রেণী, অন্যতীরে সোনালী রংএর ধানক্ষেত...মাইলের পর মাইল এ ভাবে যে কতদুর চলে গেছে তার ঠিক নেই। এসব জমির বেশীর ভাগ মালিকই হচ্ছেন ভারতীয় তথা পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙ্গালী এবং বোম্বে, গুজরাটী না-খোদা মুসলমান জমিদারগণ ...দূরে দিক্‌চক্রবালের প্রান্তে গাঢ় সবুজের রেখা শীতের কুয়াসা ভাঙা রোদ লেগে অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে।...আরো কিছুদুর এগোবার পর দেখা গেল দু'তীরে সবুজে ঢাকা পাহাড় শ্রেণী আর জলের ধারে তাল গাছের মত অথচ তাল গাছের মত উঁচু নয় বরং তারই বামন আকারের এক রকম গাছের ঝোপ।...এদেশে অর্থাৎ আরাকানে এ গাছের পাতার ব্যবসায় বেশ লাভ-জনক। এই পাতাগুলিকে কেটে শুকিয়ে নিয়ে সরু একটী লম্বা কাঠিতে সাজিয়ে তা দিয়ে ছাউনীর কাজ চালান হয়। বাঙ্গালাদেশের খড়ের মতই এদেশের এ পাতা অপেক্ষাকৃত কম খরচে ঘরের চাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।...ঘরের ছাউনি হিসেবে পাতাগুলির যে আকারের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম—এখন সত্যিকারের পাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌তে গিয়ে বেশ একটু মজাই লাগ্‌ল।

...বেলা চারটে নাগাদ একটী অপেক্ষাকৃত বড় ষ্টেশনে লঞ্চ নোঙর ফেল্‌ল। এখানে যে সব যাত্রীরা ওঠানামা করলে—তাদের প্রায় সকলেই গ্রাম্য আরাকানীজ। প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক এখানে লঞ্চটা অপেক্ষা কর্‌ল এবং এই সময়টুকু লঞ্চের অন্য একটী সিঁড়ি দিয়ে শটীপাতা মোড়া বেতের ঝুড়ি ভর্ত্তি কয়েক মন 'নাপ্পি' বোঝাই হল—রপ্তানী হিসেবে।...তীর থেকে লঞ্চের মোটা মোটা দড়িগুলি খুলে দেওয়া হল—আবার লঞ্চ এগিয়ে চল্‌ল। ...লোকালয়ের সীমা ছাড়াতেই আবার আরম্ভ হলো সেই সবুজ কার্পেটে ঢাকা পাহাড়ের সারি, আর নাম না জানা (তালগাছের বামন-আকার) গাছের ঝোপ।...সবুজ পাহাড়ের রং ঘন নীল এবং তারপর হাল্‌কা নীল হয়ে ক্রমে আকাশের রংএর সঙ্গে মিশে গেছে যেন।—কখনো কখনো দেখ্‌লাম সরু নালার আকারে স্বচ্ছ একটী জলধারা কে জানে কোত্থেকে এসে বড় নদীতে পড়ছে।

...পশ্চিমাকাশের বর্ণ-বৈচিত্র্য মিলিয়ে যেতে না যেতেই দূরের পাহাড়ের পেছন থেকে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ হাসিমুখে বেরিয়ে এল। আমাদের লঞ্চের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাঁদও ছুটে চল্‌ছিল যেন, কিন্তু মাঝে মাঝে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে পড়ে বেচারী চাঁদ বড্ড কাবু হয়ে পড়ছিল। ...কখনো কখনো মনে হলো এক একটী নক্ষত্র যেন বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, কিন্তু এগিয়ে আস্‌তেই সে ভুল ভেঙ্গে যাচ্ছিল। মনে হলো দূরে পাহাড়ের চূড়ায় কোথায় যেন প্রদীপ জ্বলছে। জ্যোৎস্না রাতের রহস্যভরা আধো-আলো আধো-ছায়ায় সে আর এক—অদ্ভুত অনুভূতি। এযাবৎ যতটুকু পথ আমরা অতিক্রম করেছি তার সবটাই অদ্ভুত রকম নির্জ্জনতায় ভরাট। ...মাঝে মাঝে দু এক জায়গায় কলা গাছের বন দেখে মনে হয়েছে ওখানে নিশ্চয় মানুষ বাস করে—কিন্তু সঙ্গীরা বল্লেন—"দূর পাগল—এ পাহাড়ের ভেতরে কে আবার মানুষ থাকতে যাবে?" কিন্তু পরে দেখেছি সত্যিই ছোট ছোট কয়েকটী আরাকানীজ বালক নদীর তীরে বসে বসে আমাদেরই

লঞ্চটার দিকে জল ছুঁড়ে কৌতুক আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌ছে। অদূরেই তাদের ছোট্ট জীর্ণ মাচার মত ২।১ খানা কুটীর, আর ঘাটে বাঁধা জীর্ণ শীর্ণ ২।১ খানা নৌকা।

…শুন্‌লাম রাতে কয়েক ঘণ্টার জন্যে লঞ্চ চল্‌বে না—কারণ সম্মুখে বঙ্গোপসাগরের কিছুটা অংশ অতিক্রম কর্ত্তে হবে এবং তাতে রাতের আঁধারে যে দিক্ ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে—তা থেকে বাঁচ্‌বার জন্যেই লঞ্চ কোম্পানীর এই ব্যবস্থা।

…গভীর রাতে এক সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল।…দেখ্‌লাম আমাদের লঞ্চটা স্থির হয়ে নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তারই গায়ে ছোট ছোট ঢেউগুলি আছাড় খেয়ে পড়ছে। সাম্‌নে অদূরেই বঙ্গোপসাগরের গাঢ় সবুজ জলকে মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট হ্রদ।…ভোর বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্‌লো তখন দেখ্‌লাম লঞ্চের বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেওয়ার মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।…আবার আর একটা নদীর মুখে আমাদের লঞ্চটা ঢুকে পড়লো এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চক্‌পিউর (kyaukpyo) ঘাটে এসে নোঙর ফেল্‌ল।…দূর থেকে এক সারি নারকেল গাছ চোখে পড়ছিল—এখন কাছে আসতেই দেখ্‌তে পেলাম—নারকেল গাছগুলি যেন নেহাৎ অযত্নে এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া ভাবেই বেড়ে উঠেছে। কোন দিনই কেউ তাদের প্রতি যত্ন নেয় নি, আর তারাও তার দাবী না করে নিজের প্রাণ শক্তির প্রাচুর্য্যে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।…জেঠী থেকে নেমে রাস্তায় পা দিতেই দেখি অন্যান্য সহরের রাস্তার মত এখানকার রাস্তায় পীচ্ তো দূরের কথা সুরকী পর্য্যন্ত নেই—তার বদলে দেখা গেল—অসংখ্য সাদা রংএর ছোট, বড়, মাঝারি—প্রভৃতি নানা আকৃতির পাথর।

নারকেল গাছের সারিটা যেখানে শেষ হয়ে গেছে—সেখান থেকে রাস্তাটা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তার একটা শাখা সোজা চলে গেছে বাজারের দিকে এবং তারই অন্যান্য গুটিকয়েক ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা গেছে জন-বসতিপূর্ণ পাড়াগুলির দিকে এবং অন্য বড় রাস্তা গেছে স্থানীয় আপিস কোয়াটার্সে'র দিকে অর্থাৎ থানা, হাসপাতাল, কোর্ট, পোষ্ট আপিস ইত্যাদি ছাড়িয়ে একেবারে শেষ হয়েছে সমুদ্রের তীরে।

চক্‌পিউ এসে আমরা যাঁদের বাড়ীতে উঠ্‌লাম—তাঁদের বাড়ীর ছোট্ট উঠোনে পা দিয়েই মনে হলো সমস্ত উঠোনটাতেই যেন মাছের আঁশ ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা নোংরা মনে হলেও চুপ করে থাকাটা ভদ্রতা হবে ভেবে চেপে গেলাম—তখনকার মত।…কিন্তু বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে আমার ভুল ভেঙে গেল। পথে বেরিয়ে দেখি সমস্তটা রাস্তা ভর্ত্তি ইঁট, পাথর ভাঙা ইত্যাদির বদলে সাদা রংএর এবং মসৃণ নানা আকারের অজস্র পাথর। এসব রাস্তায় তাড়াতাড়ি হাঁটতে যাওয়াটাই দেখ্‌লাম বোকামী, কারণ মসৃণ পাথরের ওপর খসখসে রবার সোলের জুতো না হলেই পা পিছ্‌লাবার ভয় থাকে যথেষ্ট।…সুন্দর সুন্দর কয়েকটা পাথর চোখে পড়ায় কুড়াতে সুরু করেছিলাম—এমন সময় সঙ্গের ছেলেটা বল্লে—"পিসিমা—ও আপনি কুড়িয়ে শেষ করতে পারবেন না। সমস্ত দেশটাই সাদা পাথরে তৈরী—তাই তো দেশটার নাম হচ্ছে 'চক্‌পিউ' অর্থাৎ "সাদা পাথরের দেশ।"…তিনদিন ছিলাম ওখানে—তখন প্রমাণ পেলাম সত্যি সত্যিই সাদা পাথরের দেশই বটে। মসৃণ পাথর, করকরে বালি আর সবুজ ঘাস এবং অন্যান্য গাছপালার অত্যাশ্চর্য্য সমাবেশ দেখে প্রথমটায় একটু বিস্মিত হতে হয়।

এখানে এসে অভিজ্ঞতা হলো গরুর গাড়ী চড়ার। ছোট্ট একটা দ্বীপের মত জায়গায় সহরটী অবস্থিত। এর প্রায় তিন দিকেই বঙ্গোপসাগরের উত্তালতরঙ্গমালা অহোরাত্রি সতর্ক প্রহরীর মত মোতায়েন রয়েছে। নগণ্য আয়তনের দরুণ কোন রকম দ্রুতগামী যান বাহনের প্রয়োজনীয়তা সহরবাসীরা বোধ হয় অনুভবই করে না। বাইসাইকেল কারো কারো আছে তা দেখেছি বটে, তবে তাও নিতান্ত বড়লোকী সখ ছাড়া অন্য কোন বিশেষ কাজে আসে বলে মনে হোলো না।

শুনেছিলাম সহর থেকে মাইল খানেক দূরে একখানা মাত্র পাথরে বুদ্ধদেবের নানা রকম মূর্ত্তি খোদাই করা কয়েকটা মন্দির আছে। চক্‌পিউ যাবার দ্বিতীয় দিন গরুর গাড়ীতে করে আমরা সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। ভেবেছিলাম মাইলখানেক পথ হেঁটেই চলে যাবো, কিন্তু সকলেই বললেন পথের দূরত্ব বেশী না হলেও বালি আর পাথরে মেশান রাস্তায় কষ্ট হবে এবং তাতে সময়ও লাগ্‌বে অনেক। কাজেই অগত্যা বাধ্য হয়েই চড়ে বস্‌লাম গরুর গাড়ীতেই। সূর্য্যাস্তের প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে গিয়ে আমাদের গাড়ী মন্দির সীমার মধ্যে পৌঁছুল।…কে যে কোন যুগে এ মন্দিরাবলীর এমন রূপ দিয়ে গিয়েছিলেন—সে ইতিহাস আমরা জানতে পারিনি সুযোগের অভাবে। কিন্তু মনে মনে সেই অজানা ভক্তটীকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারলাম না। ভাব্‌লে বিস্মিত হতে হয় চারিদিকের ঐরকম অজস্র সবুজের বুকে কি করে একটীমাত্র রুক্ষ কাল পাথরের পাহাড় গড়ে উঠ্‌ল? এ যেন সুন্দর একটী মুখের ওপর ছোট্ট কাল একটা তিল—এমনই অপূর্ব্ব তার সৌন্দর্য্য।…পাথরটার উচ্চতা একটা দোতালা বাড়ীর মতই হবে। দেখলাম মন্দিরের শেওলাপড়া দেওয়ালের গায়ে আমাদেরই মত কত কৌতূহলী কিংবা ভক্ত দর্শকের নাম আর ঠিকানা লেখা রয়েছে। মন্দিরের ভেতরে বুদ্ধদেবের ধ্যানরত মূর্ত্তির সম্মুখে পাথরের বেদীমূলে রয়েছে ভক্তের অর্ঘ্য নিবেদিত জ্বালিয়ে দেওয়া মোমবাতির গলিত অংশ।

মন্দিরাবলীর শিল্পগৌরব বিশেষ না থাক্‌লেও প্রাচীনতার আভিজাত্যের দাবী তারা অনায়াসে কর্ত্তে পারে। পাথর কেটেই মন্দির এবং মূর্ত্তিগুলি গড়া বলেই বোধ হয়; প্রত্যেকটা বুদ্ধমূর্ত্তিরই মাথা কিংবা পীঠের দিকটা মন্দিরের ছাদ এবং দেওয়ালের সঙ্গে জোড়া লাগান।

মন্দির থেকে যখন বেরুলাম তখন দেখি সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন। শুন্‌লাম ঐ মন্দিরের পেছনেই রয়েছে সীমাহীন সমুদ্র। অনেককেই দেখলাম পাথরটার ঢালু গা বেয়ে একেবারে মন্দিরগুলির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্ত দেখতে লাগলেন। আমার বেশ একটু খারাপ লাগল এই ভেবে যে—যে মূর্ত্তির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মাথা নীচু করে সমস্ত প্রাণের চাঞ্চল্যকে সমাহিত করবার শক্তি সঞ্চয় করলাম সেই পাথরের দেব-মূর্ত্তির মাথার উপর (যদিও পাথরের ছাদের আড়াল ছিল) দাঁড়াবো

কি করে? · তবুও শেষ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রেরণার কাছে সামরিক সংস্কারের আবেদন টিক্‌লো না। উঠে দেখি—সত্যিই অপূর্ব্বই বটে! সমুদ্রের সূর্য্যাস্ত দেখার সুযোগ আমাদের জীবনে এই প্রথম নয়, কিন্তু সমতল ছেড়ে একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে এমন সুন্দর সূর্য্যাস্ত আর আগে কোন দিন দেখিনি। দেখলাম মন্দিরগুলোর ঠিক পেছন থেকেই আরম্ভ হয়েছে ধূ ধূ করা বালির চর। তখন ছিল ভাঁটার টান—তাই সমুদ্র ছিল একটু দূরে—পড়ন্ত রোদের আভায় সমস্ত চরটা চিক্ চিক্ করছে···সে এক দৃশ্য বটে! মনে হচ্ছিল—না জানি বর্ষার দিনে এ জায়গাটার রূপ আরো কত সুন্দর হয়েই না ওঠে!

এবার বাড়ী ফেরার পালা।···তার আগে জায়গাটার চারপাশে একটু বেরিয়ে দেখবো বলে ডাইনে ফিরতেই চোখে পড়ল একটা কাঠের দোতালা মঠ-বাড়ী। এমনি এক একটা মন্দিরকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠ গড়ে ওঠে—এ আমাদের জানা ছিল। এই মঠ বাড়ীগুলি সাধারণতঃ কাঠ, টিন দিয়ে তৈরী হলেও এ বাড়ীগুলির চূড়ার বিশেষত্বপূর্ণ গড়নই তাদের পরিচয় দিয়ে দেয় সহজেই। কাছে গিয়ে গলা বাড়াতেই চোখে পড়ল দু'টা এগার বারো বছর বয়সের মুণ্ডিত-মস্তক আরাকানীজ ছেলে পড়া নিয়ে ব্যস্ত।···মনটা একটু নাড়া দিল এই ভেবে—কি পায়, কি শিখ্‌তে পারে ওরা এ বয়েসে এ রকম কঠোর সংযম পালন করে? যদিও সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আরাকানীজ গৃহস্থদের এটা একটা অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যার আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের তীর ধরে আমাদের গাড়ী চল্‌তে সুরু করল। পথে কোন কোন জায়গায় গাড়ী সমুদ্রতীর ছেড়ে গ্রামের মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তার ধুলো উড়িয়ে ছুটছিল। এ সময় একটা দৃশ্য আমাদের বড় আরাম দিয়েছিল।···এখানকার গ্রামবাসীরা সত্যিই বড় গরীব অথচ সরল এবং সেই সঙ্গে বলা চলে নোংরা; কিন্তু তাদের ঘরে এমন একটা শিশু দেখিনি যাকে সুস্থ এবং হৃষ্টপুষ্ট শিশু না বলে অন্য কোন বিশেষণে অভিহিত করা যায়।···এক জায়গায় দেখলাম একটা পাঁচ ছয় বছর বয়সের মেয়ে তার বছর দেড়েকের ভাইটাকে কোলে নিয়ে একপাশে কাৎ হয়ে হাঁটুতে ভর করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়ীর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে।···আরো একটা জিনিষ মনকে নাড়া দিয়েছিল—তা হচ্ছে এদেশের লোকের ফুল-প্রীতি। এমন একটা কুঁড়ে দেখিনি যার আঙ্গিনায় দু'একটা নিতান্তই যেমন তেমন গোছের ফুলের চারা নেই।

···সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যা হতেই সমুদ্রের গর্ভ থেকে হাসিমুখে চাঁদ বেরিয়ে এল। এবার যে রাস্তা আরম্ভ হল তার একদিকে ধানক্ষেত অন্যদিকে সমুদ্র। চাঁদের আলোতে প্রায় কেটে আনা শূন্য ধানের ক্ষেত আর ধূ ধূ বালুময় চর ও নীলবারিধি যেন একাকার হয়ে গেছে। যদিও পূর্ণিমার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলও ফুলে ফুলে ক্রমেই তীরের দিকে এগিয়ে আসছিল তবুও ইচ্ছা হচ্ছিল গাড়ী ছেড়ে চরে নেমে হাঁটতে সুরু করি। কিন্তু বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হবে ভেবে সঙ্গীরা প্রায় সবাই আপত্তি জানালেন।

···পরদিন আমার চক্‌পিউ থেকে ফিরবার কথা। আগে ঠিক ছিল আমরা সমুদ্রগামী বড় জাহাজেই যাবো কিন্তু কি কারণে ঐ দিন বড় জাহাজ আস্‌বে না খবর পাওয়ায় আমাদের লঞ্চেই অর্থাৎ নদীপথেই যাওয়ার ঠিক হল। পথে নূতনত্ব কিছু থাক্‌বে না ভেবে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল—কিন্তু বড় জাহাজের জন্য অপেক্ষা করারও আমাদের উপায় ছিল না।

খুব ভোরবেলা চক্‌পিউর ঘাট থেকে আমাদের লঞ্চ ছাড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওখানকার ঘাটের জনতা, তীরের নারকেল গাছের সারি ···আর তারই মাঝখানে মাঝখানে খাপছাড়াভাবে মাথা তুলে দাঁড়ান কয়েকটা কুঁড়ে ঘর···সবই ধীরে ধীরে একটা কালো রেখায় একাকার হয়ে গেল।···এবার লঞ্চে ভীড় অনেকটা কম ছিল···তাই রেলিং ধরে কায়েমীভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরের ক্রমবিলীয়মান সবুজ সীমা রেখার দিকে তাকাবার সুযোগ করে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।···চক্‌পিউর সমুদ্রতীর থেকে দেখেছিলাম—তীর থেকে কয়েক গজ মাত্র দূরে ছোট্ট দ্বীপের মত একটুখানি সবুজ ভূখণ্ড—তার মধ্যে তেমনি ছোট্ট একটা খেল্‌নার পাহাড় যেন এবং সেই সঙ্গে খানিকটা সবুজ ঝোপ জঙ্গল।··· শুনেছিলাম ছুটীর দিনে সখ করে কেউ কেউ নৌকো করে ওখানে গিয়ে পাখী শিকারের আনন্দ উপভোগ করতে যায়। এ ছাড়া শুধুমাত্র বনভোজন উপলক্ষে ও অনেকে যায়!···এবার লঞ্চ থেকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম—ছোট্ট একটা কাল বিন্দু ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না ঐ দ্বীপটাকে।

পথে এবার অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রামের ঘাটে আমাদের লঞ্চ থেকে দু'একজন করে যাত্রী ওঠা নামা করল। বেশীরভাগ ঘাটেই দেখলাম লঞ্চ তীরে ভীড়াবার কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত নেই। তাই তীর থেকে গ্রামবাসীরাই কয়েকজনে মিলে একটা চেরাই তক্তা লঞ্চএর পাটাতনের দিকে ঠেলে এগিয়ে দিল এবং তারই সাহায্যে দু'একজন গ্রাম্য যাত্রী তাদের যৎসামান্য বাক্স বিছানা নিয়ে ওঠা নামা করলো। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের দুগ্ধপোষ্য ভাইবোনদের কোলে নিয়ে লঞ্চ-যাত্রীদের দেখছিল। সরল তাদের জীবন, উজ্জ্বল তাদের চাহনি। হয়তো তাদের জানতে ইচ্ছে জাগে—"রোজই এত লোক কোথায় যাওয়া আসা করে?" বড় হলে তাদের জীবনেও আস্‌তে পারে এমনি চাঞ্চল্যময় দিন···কিন্তু সেদিন যে এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে।

···মাইলের পর মাইল কেটে গেল একটানা সবুজ পাহাড়ের সারি দেখে দেখে—কেবল কদাচিৎ কোন পাহাড় চূড়ায় একটা সাদা বিন্দু অর্থাৎ কোন ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর কীর্ত্তি সমুজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা।···একটা পাখী পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না···শুধু আমাদের লঞ্চটাই জল কেটে কেটে এগিয়ে চলার একঘেঁয়ে একটা শব্দ।

সন্ধ্যেবেলায় আমাদের লঞ্চ 'মেইবোন' (**Myebon**) নামে একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের ঘাটে নোঙর ফেল্‌ল। এখানে যাত্রীরা প্রায় সকলেই নেমে গেলেন কারণ এই রাতটা লঞ্চ এখানেই থাক্‌বে এবং পরের দিন ভোরের আগে ছাড়বে না।···পূর্ব্বপরিচিত এক ভদ্রলোক আমাদের নিতে আসায়

আমরাও জিনিষপত্র সব কেবিনেই তালাচাবী লাগিয়ে নেমে গেলাম। এ গ্রামটীতেও গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। পথগুলি খুবই সরু—এমন কি দু'খানা গরুর গাড়ীও পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারে না। তবে সুবিধা এই যে ঘাটের কাছাকাছি ঘিঞ্জিপাড়ার ভেতরে আর গাড়ীর দরকার বড় একটা হয় না।

আমাদের পরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী স্থানীয় একজন নামকরা ব্যবসায়ী। বাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে পথ চল্‌বার সময় চোখে পড়ল ওদের সৌন্দর্য্যবোধের একটী দৃষ্টান্ত। আসল গ্রাম্য আরাকানীজদের কাছে গিয়ে দেখা—এই আমাদের প্রথম।...সদর অন্দর বলে গরীব গৃহস্থ-ঘরে কোন বালাই-ই নেই। বাঁশের মাচার ওপর তিন দিকে বাঁশের বেড়া এবং সামনের দিকটায় বাঁশের ঝাঁপির ব্যবস্থা করা। দিনের বেলায় ঐ ঝাঁপি বাঁশের খুঁটির সাহায্যে তুলে রাখা হয়।... সামনেই হয় তো মুদী দোকানের উপযুক্ত কতকগুলি মালমসলা—আর একটী মেয়ে বসে আছে জিনিষপত্র বিক্রয় করার জন্য ; সে এক হাতে পাশেই ঝুলান একটী বেতের অথবা কাপড়ের দোলনায় শোয়ান শিশুটীকে দোল দিতে দিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ক্রেতার সঙ্গে জিনিষের দরদস্তুর করছে। এ সব বাড়ীর আঙ্গিনা বল্‌তে সদর রাস্তাকেই বোঝায়। পথে যেতে দেখা গেল, কতকগুলি বাড়ীর সামনে কাঁচা রাস্তার কালো মাটীতে সাদা রংএর পাথর রকমারি করে সাজান। যাঁদের বাড়ীতে আমরা যাচ্ছিলাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—চকপিউর মত ওঁদের এ দেশটীও সাদা পাথরের কিনা—তখন তিনি বল্লেন যে—ওগুলো পাথর নয় সামুদ্রিক ঝিনুক।

রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা লঞ্চেই ফিরে এলাম। রাত প্রায় দশটায় ঘাটে এসে দেখি ভাঁটার জন্যে আমাদের লঞ্চটাকে মাঝ নদীতে নিয়ে নোঙর করে রাখা হয়েছে। অতএব নৌকার সাহায্যে আমাদের ওখানে যেতে হবে। শীতের রাতের কুয়াসা-ঢাকা জ্যোৎস্নায় সম্মুখের নদী, লঞ্চ এবং অসংখ্য জেলে ডিঙ্গি—সবই এক হয়ে গেছে যেন। কেবল কদাচিৎ দু' একটী ক্ষীণ-শিখা কেরোসিন লণ্ঠনের আলো অধ্যবসায়ী মৎস্যব্যবসায়ীদের কর্ম্মপটুতার নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করছে।

শুনলাম এখানে খুব মাছ পাওয়া যায় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বেশীর ভাগই মাছের ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে থাকে সারাটী বছর। এই গ্রামটীতে মাছ বেশী বলে নাপ্পির (ব্রহ্মদেশের একটী প্রধান খাদ্য হিসেবে পরিগণিত) ব্যবসায়টাও ভালই চলে।

পরদিন খুব ভোরেই ভেঁপু বাজিয়ে লঞ্চ পথ চল্‌তে সুরু করলে। আবার আরম্ভ হলো অবিচ্ছিন্ন সবুজ পাহাড়ের সারি—তার কোথাও নেই এতটুকু ছেদ, এতটুকু বৈচিত্র্য, এতটুকুও বিশৃঙ্খলা।...আর এই যে নদীটী—একে যেন মনে হচ্ছে বিশ্রামরত বিরাট এক অজগর।...পাহাড়ী নদীর নিয়মই বোধ হয় এই—তাই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এরা খেয়ালী মেয়ের মত পথ বদলায়—প্রাণের অদম্য আবেগকে যেন আর বেঁধে রাখতে পারছে না—তাই এখানে ওখানে কেবলই বাঁকের সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। লঞ্চ যখন চলতে থাকে তখন কেবলই মনে হতে থাকে—আর একটু এগুলেই বুঝি এক্ষুণি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে যাবে—কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যায় আরও খানিকটা পথ রয়েছে চল্‌বার মত।

একস্রোতা নদী বলেই বোধহয় ঢেউ নেই মোটেই।—জোয়ার ভাঁটারও বিশেষ বালাই নেই। বারমাসই জল থাকে প্রচুর—কেবল গ্রীষ্ম, বর্ষায় জল বাড়ে কমে এই যা। জলের ধারের ঝোপগুলি লক্ষ্য করলে জানা যায় বর্ষায় নদী কতখানি ফেঁপে উঠেছিল কারণ গাছের গুঁড়িতে সীমা নির্দ্দেশের প্রাকৃতিক চিহ্নস্বরূপ একটী শুক্‌নো কাদার দাগ রয়ে গেছে।

সমস্ত পথের বেশীর ভাগটাই বড় নির্জ্জন আর এক ঘেঁয়ে মনে হয় এক এক সময়। কারণ পাহাড়ের সীমা ছাড়িয়ে দৃষ্টি আর বেশী দূর যেতে পারে না বলে শীগ্‌গিরই দেখার আনন্দে ক্লান্তি এসে পড়ে।

এই দিন বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ আকিয়াবের অতিপরিচিত ঘাটে এসে লঞ্চ নোঙর ফেল্‌ল।......

......চক্‌পিউ ছেড়ে এসেছি অনেক দিন, কিন্তু আজো পুরোণো স্মৃতিকে স্মরণ করে আনন্দ ব্যথায় মনটা থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে পড়ে ওখানকার অগুন্তি রকমারী আকারের সাদা সাদা চক্‌চকে পাথর কুড়ানোর কথা—ভাবি, যদি পছন্দসই সব পাথরগুলোই নিয়ে আস্‌তে পারা যেত তাহ'লে কি মজাটাই না হোতো। সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে চকপিউ যাওয়ার পথের অফুরন্ত সবুজে ঢাকা নির্জ্জন পাহাড়, চূড়ায় বৌদ্ধ-মঠবাসী সংসারত্যাগী কঠোর সন্ন্যাসব্রতধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের কথা। জগতের কোন খবরই তাঁরা রাখেন বা পান বলে মনে হয় না। কত সহজ অনাড়ম্বর তাঁদের চাল চলন—অথচ কঠোর তাঁদের সাধনা।

অচ্ছেদ্য ভীড়ের মধ্যে আমরা বাস করি, আমাদের কল্পনা করতেও কষ্ট হয়—কি করে এত নির্জ্জন জীবন যাপন করেন এঁরা ?

কবি গিরিজাকুমার স্মরণে

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

কবি তুমি নাই, মানিনাক মোরা শূন্য আলয় দ্বারে
হানি করাঘাত মাধবী প্রভাত ফিরে যাবে বারে বারে,
পিক্ পাপিয়ার বারতা বোঝাতে বকুল চাঁপার বনে
যে আলোক জ্বলে অলস বেলায় গোধূলীর শুভক্ষণে ;

যে বাণী জানায় রজনীগন্ধা রাত্রির ছায়াতলে
ছন্দে গাঁথিয়া অর্থ তাহার তুমি কি দিবে না বলে ?
আছ তুমি জাগি আমাদেরি লাগি অপলক দুই আঁখি
অচিন পুরীর পান্থ চিনায়ে বেলাশেষে নিও ডাকি।

বাসুদেব ঘোষের "গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস" পদাবলী

অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় এম্‌-এ

প্রেমাবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূত-জীবন এক অপূর্ব মহাকাব্য বিশেষ। দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া তাহা কত কবি ও ভক্তের কল্পনা এবং আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার উপাদান যোগাইয়া আসিতেছে। দেবচরিত্রব্যাখ্যানে অনন্যচিত্ত কবিগণ এই প্রথম মনুষ্যচরিত্রে দেবত্বের ছায়াপাত লক্ষ্য করিলেন;—মনুষ্য জীবনী রচনার সূচনা হইল তাঁহারই মহিমান্বিত চরিত্রকে আদর্শ করিয়া। চৈতন্যদেবের সমসাময়িককালে তাঁহার জীবনলীলা বর্ণনা করিয়া যে কয়টি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তন্মধ্যে "শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চার" উল্লেখ এবং কতিপয় উধৃতিমাত্র "চৈতন্যচরিতামৃতে" দৃষ্ট হয়। কবিকর্ণপুরের "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" মুখ্যত চৈতন্যদেবের জীবনের নাট্যরূপ। সুতরাং চৈতন্য চরিতাবলীর মধ্যে মুরারিগুপ্তের কড়চাই আদিগ্রন্থ। চৈতন্যের বাল্যজীবন ইহার অবলম্বিত বিষয়। এই তিনখানিই সংস্কৃতে রচিত। মুরারি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও চৈতন্যের সহপাঠী এবং প্রতিবেশী ছিলেন। এই কারণে প্রত্যক্ষদর্শীরূপে মুরারির কড়চার স্থান অনেক উচ্চে। কিন্তু কল্পিত অলৌকিক কাহিনীর দ্বারা চৈতন্য চরিত্রকে তিনি এমনই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন যে ঐতিহাসিকের তাহাতে নির্ভর করা চলে না। গোবিন্দদাস কর্মকার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন কিনা এবং তদ্‌রচিত "কড়চা" সত্যই প্রমাণিত কিনা এই দুই বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকেও হিসাবে আনা যায় না। সুতরাং চৈতন্য সমসাময়িক যুগের নির্ভর যোগ্য তথ্যবিরলতার মধ্যে তদীয় লীলাসহচর ভক্তবৃন্দের বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ বর্ণনাদি যথার্থই চৈতন্য জীবনের উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়া থাকে। একাধিক কবি এই সময়ে গৌরাঙ্গবিষয়ক বাঙ্গালা পদ রচনা করেন। তন্মধ্যে বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ—এই তিন ভ্রাতাই পদকর্তা এবং গৌরাঙ্গগঠিত সঙ্কীর্তনদলের মূল গায়করূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তিনজনেই প্রত্যক্ষীভূত মহাপ্রভুর জীবন লীলাকে কাব্যরূপ দিয়া গিয়াছেন।

তন্মধ্যে বাসুদেবের গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পদ অতুলনীয়। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ৺সতীশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, বাসুদেব "গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিতেন; তাই গৌরলীলার বর্ণনা করিতে যাইয়াও প্রায় সর্বত্রই তিনি পূর্বযুগের কৃষ্ণলীলার সহিত তাঁহার বর্ণিত গৌর-লীলার বিষয়গত ও ভাব-গত সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নবদ্বীপলীলায় যে ব্রজগোপীদের অভাব ছিল, নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার অনুকরণে বাসুদেব নিজেকেও অন্যান্য গৌরভক্তগণকে সেই "নদীয়া-নাগরী" কল্পনা করিয়া "নাগরী" ভাবের পদ নামক এক স্বতন্ত্রশ্রেণীর পদেরও সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ব্যাপারের সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের অন্তর মথিত এমন এক বেদনা-করুণ ভাব জড়িত হইয়া আছে যে আজও সেই কাহিনী শ্রবণে কীর্তনে বাঙ্গালীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। বাসুদেব ঘোষ সেই নবীন সন্ন্যাসীর অভিনিষ্ক্রমণ আনুপূর্বিক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, দরবিগলিত ধারায় প্লাবিত বক্ষে সেই বিয়োগবেদনা সহিয়াছেন, আবার বর্ণনা করিয়া সান্ত্বনাও পাইয়াছেন। সারল্য ও গভীর আর্তিতে পরিপূর্ণ সেই সন্ন্যাসের পদাবলী কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল চৈতন্য-চরিত্রকে অপূর্ব মহিমা দান করিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন—

> বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
> কাষ্ঠ পাষাণ দ্রব হয় যাহার শ্রবণে॥—(চৈ-চ-আদি। ১১শ)

একটি কথা এইখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। বাসুদেব আজিকার দিনের সংবাদপত্র প্রতিনিধির মত অবিচলিতভাবে বেদনাদায়ক ঘটনারও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করিতে বসেন নাই। ব্যথিত চিত্তের উচ্ছ্বাস এক একটি অশ্রুবিন্দুর মত কবিতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সরল কবিত্বের পটভূমিকায় ফুটিয়াছে সন্ন্যাসের করুণ চিত্র, নাই বা হইল তথ্যের প্রতিলিপি! তবু বাসুদেব ঘোষের পদাবলীর ঐতিহাসিক মূল্য কে অস্বীকার করিবে?

পিতৃভক্ত সন্তান গৌরাঙ্গ পিতৃপিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়ায় গেলেন। কিন্তু তথায় ঈশ্বরপুরীর ভগবদ্‌ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পাণ্ডিত্যাভিমানী যুবক গভীর ভগবদ্ প্রেরণায় অন্তরে অন্তরে বৈরাগ্য বরণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। সংসার সেই জীবন্মুক্ত পুরুষকে আর বাঁধিতে পারিল না। বাসুদেব সেই কৃষ্ণপ্রেমতন্ময়তার বর্ণনা দিতেছেন:—

> আজু কেনে গোরাচাঁদের বিরস বয়ান। কে আইল কে আইল বলি ঝরয়ে নয়ান॥
> সে মুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে। কত সুরধুনী ধারা আঁখিযুগে ঝরে।
> হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস। শিরে কর হানে বাসু গদগদ ভাষ॥

আবার অন্যত্র—

> রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ণ-নাম-মধু। অমিয়া বরিখে যেন নিরমল বিধু॥
>
> তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গ তেজি॥ ছাড়িয়া সকল সুখ ভেল অশকতি।

তাঁহার—"শতকুম্ভ কলেবর ভাব বিভূতি"—অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণদেহে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব-সম্পদের বিচিত্রপ্রকাশ দেখিয়া নদীয়ার লোকের চিত্ত কি স্থির থাকিতে পারে? বিরলে বসিয়া হরিনাম জপিতে জপিতে তাঁহার—

> সুগন্ধি চন্দন মাখা গায়। ধূলা বিনু আন নাহি তায়॥
> ছাড়ি পহুঁ লখিমী বিলাস। এবে ভেল তরুতলে বাস॥

এই 'লখিমী' নিশ্চয়ই গৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী নহেন ; কেননা, চৈতন্যের গয়াযাত্রার পূর্বেই তিনি সর্পদংশনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি দ্বিতীয়া পত্নী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই হইবেন। বৃন্দাবনদাসও লিখিয়াছেন ; শচীমাতা—

লক্ষ্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন ॥ (চৈঃ ভাঃ—আদি)

চৈতন্যের এই দিব্যোন্মাদে কি কৃষ্ণ-পাগলিনী রাধিকার ভাব-বিহ্বলতা প্রতিফলিত হয় নাই ?

সিংহদ্বার তেজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সুধায় ॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। দীঘল শরীর গোরা পড়ি মুরছায় ॥
উত্তান-শয়নে মুখে ফেনা বাহিরায়। বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায় ॥

ভাবী ঘটনার ছায়াপাত নানা লক্ষণের দ্বারা হইয়া থাকে, শংকিত মন তাহা সহজেই বুঝিতে পারে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বাভাসও যেন বিষ্ণুপ্রিয়া পাইতেছে। ঘাট হইতে আর্দ্র বস্ত্রে পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে শচীমাতাকে বলে—

—কি কর জননী। চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণী ॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর। ভাঙিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর ॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে বাম আঁখি। দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি ॥

সরলা বধূতো জানেন—তার সুখের কপাল ভাঙ্গিতে আর দেরী নাই। নিয়তির সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবও যেন কাঁদিয়া বলে—"ওগো সতী, আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি।"

তারপর সেই বিচ্ছেদের কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিল। গৌরাঙ্গ নিভৃতে গৃহত্যাগ করিলেন। স্নেহময়ী মাতা, তন্বী বধূ পিছনে পড়িয়া রহিল। সন্ন্যাসের পূর্বরাত্র গৌরাঙ্গদেব বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরে ছিলেন না, ইহাই ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু বাসুদেব বর্ণনা করিতেছেন ; শেষরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া—

শুধা ঘাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।

এই আশঙ্কা করিয়া শচীমাতার কক্ষদ্বারে বিষণ্ণ বদনে আসিয়া বলিতেছেন—

শয়ন মন্দিরে ছিলা নিশিভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।

সন্ন্যাসের রাত্রে নিজ পত্নীর সহিত এক কক্ষে বাস করা কি এতই অসম্ভব যে তাহা কল্পনা বা বর্ণনা করিতে বিচলিত হইতে হইবে? বৃন্দাবন দাস সে ঘটনা হয়ত বা এড়াইয়া গিয়াছেন। লোচনদাস তাঁহার অপূর্ব কল্পনাভঙ্গিতে সন্ন্যাস-রাত্রে দম্পতির শেষ দীর্ঘ-প্রিয়সম্ভাষণের যে মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাহুল্যপূর্ণ ও অসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু বাসুদেবের বর্ণনা যে হুবহু সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বৈরাগ্যপ্রবণ গৌরাঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠায় একে পূর্ব হইতেই শচীমাতার চোখের ঘুম উবিয়া গিয়াছিল, তার উপর—

আউদর কেশে ধায় বসন না রহে গায়,
শুনিয়া বধূর মুখের কথা।

অবিলম্বে বাতি জ্বালাইয়া সর্বত্র খুঁজিলেন, "নিমাই নিমাই" বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সহ আকুল ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করিয়া পথ চলিলেন। নদীয়ার লোক জাগিয়া শুনিল—নদের চাঁদ নাই। নবদ্বীপে শোকের বাণ ডাকিল, পথ দিয়া একটি পথিক যাইতে পারে না, গভীর উৎকণ্ঠায় একসঙ্গে দশজন তাহাকে গৌরাঙ্গের কথা শুধায়, কে একজন বলিল—কাঞ্চননগরের পথে সঙ্গীহীন গৌরাঙ্গকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছে।

প্রতিদিনের মত আজ প্রভাতেও স্নানান্তে শুচি হইয়া ভক্তেরা গৌরাঙ্গ দর্শনে আসিয়াছে, কিন্তু—

গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি— বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে।

শচী বিলাপ করিয়া নিতাইকে এই বেদনার কথা বুঝাইতেছেন ; শোক-বজ্রাহত বধূ নিস্পন্দ পড়িয়া আছে, আর বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশান শিরে করাঘাত করিয়া শুধুমাত্র ইঙ্গিতে সকলকে জানাইতেছে—"গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া।" এ শোকদৃশ্য সত্য ছবি আঁকিয়া লইবার যোগ্য।

এদিকে কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষশাখায় গিয়া গৌরাঙ্গদেব বসিলেন। এই অপূর্বদৃষ্ট যুবকের গৌর অঙ্গের কাঞ্চনদীপ্তি দেখিয়াই সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। এইখানে একটি পদে বাসুদেব বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ নারীর পতিনিন্দা ও রূপমুগ্ধতার ঈষৎ অবতারণা করিয়াছেন। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে এই বিষয়ের মনোজ্ঞ বর্ণনা বাসুদেবের স্মৃতিপথে আসিয়াছিল কি? গৌরাঙ্গকে ঘিরিয়া আলোচনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কেশবভারতী সেখানে উপনীত হইলেন। তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া গৌরাঙ্গ প্রার্থনা জানাইলেন—

কৃষ্ণদাস কর গোসাঞি দেহ ভক্তিরস।

কেশব-ভারতীর কৃপা হইল। দীর্ঘ চাঁচর চুল মুড়াইয়া গঙ্গাজলে স্নান করিয়া গৌরাঙ্গ গৈরিক বস্ত্র চাহিলে ভক্তেরা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, ক্রন্দনে আকাশ ভরিয়া তুলিল। কেশবভারতী তাঁহাকে কৌপীন ও দুইখণ্ড গৈরিক বস্ত্র পরিধানের জন্য দিলেন। গৌরাঙ্গ ভক্তবন্ধুদের নিকট হইতে গদগদভাবে বিদায় লইলেন—

করিলাম সন্ন্যাস— নহে যেন উপবাস
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে।

এই বলিয়া গৌরাঙ্গ পুনরায় সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

এদিকে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ তড়িৎগতিতে আসিয়া সকলকে শোকার্ত করিয়া তুলিয়াছে। নবদ্বীপবাসী ভক্তদের প্রাণ তো গৌরাঙ্গের জন্য ব্যাকুল হইবেই, কেননা—

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া॥
আকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কাঁদিয়া। গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া॥

সাধারণ লোকের মন তো বোঝে না—তাহাদের নয়নের নিধি গৌরাঙ্গকে সংসার ছাড়াইল বলিয়া পরম বৈষ্ণব কেশবভারতীকে পর্য্যন্ত গালি পাড়িতে ছাড়িল না। কিশোর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ কাহারই বা সহ্য হয়! সমবেদনায় নারীরাও বলে—

আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি,
কেমনে বাঁচিবে বিষ্ণুপ্রিয়া।

চৈতন্যের কৈশোর-লীলার নিত্যসহচর শ্রীবাস, মুকুন্দ, গদাধর ভূমে গড়াগড়ি দিয়া উচ্চরোলে শিশুর মত কাঁদিতেছে। হরিদাস সকলকে প্রবোধ দিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইতেছে। এ বেদনা কি ভুলিবার? তাহারা তো কল্পনাই করিতে পারে না—

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ।

* * * *

জ্বলন্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগিতেছিল তার লেহ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের ভাষাও বাসুদেব দিয়াছেন। নব-যৌবনা পত্নীর প্রতি গৌরাঙ্গের নির্দয়তা যে তাহার ধারণারও অতীত, কিন্তু সন্ন্যাসের প্ররোচনাদাতা কেশবভারতীকে সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না, কেশবভারতীর তুলনায় অক্রুর যে তত ক্রুর নয়; কেননা—

অক্রুর আছিল ভাল রাজ-বলে লৈয়া গেল
রাখিল সে মথুরা নগরী।
নিতি লোক আইসে যায় তাহাতে সম্বাদ পায়
ভারতী করিল দেশান্তরী॥
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
ধরণীরে মাগয়ে বিদরি।

পুত্রবিয়োগবিধুরা শচীদেবী একরাত্রে বড় অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন। নিমাই যেন অঙ্গনে দাঁড়াইয়া মা মা বলিয়া উচ্চরবে ডাকিতেছেন। সাড়া পাইয়া শচীদেবী ঘরের বাহির হইতেই নিমাই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥

শচীমাতা রোরুদ্যমান পুত্রকে সাগ্রহে বুকে লইতে গিয়া দেখেন—এ যে নিদারুণ স্বপ্ন! কিন্তু এই স্বপ্নও একদিন সত্য হইল।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণপ্রেম উন্মাদনায় বৃন্দাবন অভিমুখে চলিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে ছলনায় ভুলাইয়া তিনদিনের জন্য নবদ্বীপে লইয়া আসেন। নদীয়ায় সেদিন আনন্দের বান বহিয়া গেল। বর্ণনা করিতেছেন—

ধাওল নদীয়া-লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে॥
চিরদিনে গোরাচাঁদ বদন দেখিয়া।
ভুখিল চকোর-আঁখি রহয়ে মাতিয়া॥
আনন্দ ভকতগণ দেখিয়া বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে কোর॥

এই অপূর্ব সৌভাগ্যলাভের আনন্দ আবার 'নদীয়া-নাগরী' ভাবে ভাবিত হইয়াও বাসুদেব বর্ণনা করিতেছেন—

এতদিনে সদয় হইল মোরে বিধি।
আমি মিলায়ল মোরে গোরা গুণ-নিধি॥
এতদিনে মিটল দারুণ দুখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদ-মুখ॥
চির-উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর॥
বাসুদেব ঘোষে গায় গোরা-পরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ॥

এই ভাবের পদ রচনার সময় বিদ্যাপতির—"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর"—এবং—"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ পেখলুঁ পিয়ামুখ চন্দা"—ভাব-সম্মিলনের এই প্রসিদ্ধ পদ দুইটি কবির সমস্ত মন যে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি।

গভীর বেদনাদায়ক বলিয়া ইহার পরে গৌরাঙ্গদেবের পুনরায় দীর্ঘ-কালের জন্য গৃহত্যাগ বাসুদেব আর বর্ণনাই করেন নাই।

বিচার

(কবীর)

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

দেবতা পূজারী সুনিপুণ অতি কসা'য়ের ব্রত-ধারী
দুর্ব্বল ছাগে বধিতে তাহার ঝরে না নয়ন বারি।
প্রাতঃস্নান সারি তিলক ধরিয়া দেবী পূজিবার ছলে,
পূজা-প্রাঙ্গণ ধুয়ায় নিজেরে রক্ত-নদীর জলে।
অতি উঁচু কুলে জনম বলিয়াগৌরব করে কত,
এরাই মোদের দীক্ষা-গুরু গো আধেক দেবতা মত।
কহে পাপ কথা করে নীচ কাজ ঠিকানা এদের নাই,
গো-বধ করিলে বলিবে যবন! এরা কিসে কম ভাই?

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

বিদ্যা-সমুদ্দেশ—প্রথম প্রকরণ

বার্ত্তা স্থাপনা ও দণ্ডনীতি-স্থাপনা—চতুর্থ অধ্যায়

(৭)

মূল :—কৃষি পাশুপাল্য ও বণিজ্যা—বার্ত্তা ; ধান্য পশু হিরণ্য-কুপ্য-বিষ্টি-প্রদানহেতু (উহা) উপকারক। উক্ত (বার্ত্তা জনিত) কোশ ও দণ্ড দ্বারা (রাজা) স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বশীভূত করিয়া থাকেন।

সঙ্কেত :—কৃষি—ক্ষেত্রে বীজবপনাদি-বিষয়ক শাস্ত্র—পরশরাদি-প্রণীত (গঃ শাঃ)। পাশুপাল্য—গবাদি-পশুপালন-শাস্ত্র—গৌতম-শালিহোত্রাদি-প্রণীত। বাণিজ্যা—বাণিজ্যশাস্ত্র—ক্রয়-বিক্রয়াদি-ব্যবহার-শাস্ত্র—বিদেহরাজ-প্রণীত। কুপ্য—স্বর্ণ-রজতাতিরিক্ত তৈজস-ধাতুদ্রব্য (যথা তাম্রাদি) ; কাষ্ঠ-বেণু-লতা-বল্কলাদি অতৈজস দ্রব্যও কুপ্যের অন্তর্গত (গঃ শাঃ) ; **forest-produce (SH)**। 'কুপ্য'-শব্দটির অর্থ অমরকোষে প্রদত্ত হইয়াছে—স্বর্ণ-রজত-ব্যতিরিক্ত তাম্রাদি ধাতু। মনুসংহিতায় (৭।৯৬ ও ১০।১১৩) 'কুপ্য-পদটির প্রয়োগ দেখা যায়—মেধাতিথি অর্থ করিয়াছেন—"শয়নাসনে তাম্রভাজনাদি," ; কুল্লুক অর্থ করিয়াছেন—'সুবর্ণরজত-ব্যতিরিক্তং তাম্রাদিধনং', 'সুবর্ণরজতব্যতিরিক্তং ধান্যবস্ত্রাদি'। কিরাতে (১।৩৫) কুপ্য-শব্দের যে প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তাহার টীকায় মল্লিনাথও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। **Forest-produce**—এ অর্থ শ্যাম শাস্ত্রী কোথায় পাইলেন? **Apte** অর্থ করিয়াছেন—**base metal, any metal but silver and gold.** বিষ্টি—কর্ম্মকর (গঃ শাঃ) ; নির্ম্ল্য কর্ম্মকরণ (মুকুট) ; অভৃতিক ক্লেশ ; **unpaid labour (Apte)** ; **free labour (SH)**। কোশ—ধন। দণ্ড—সেনা। বার্ত্তা-দ্বারা উৎপাদিত ধন ও সেনা (কোশ-দণ্ড) সাহায্যে রাজা স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বশীভূত করেন। **'Treasury and army oltained solely through Narta (SH).**

মূল : আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী-বার্ত্তার যোগক্ষেম সাধন—দণ্ড। তাহার নীতি দণ্ডনীতি—অলব্ধলাভার্থা, লব্ধ পরিরক্ষণী, রক্ষিত বিবর্দ্ধনী ও বৃদ্ধিপ্রাপ্তের তীর্থে প্রতিপাদনী।

সঙ্কেত : দণ্ড—সাম-দান-ভেদ-দণ্ড—এই চারিটি উপায় ; এই উপায়-চতুষ্টয়ের প্রধানভূত 'দণ্ড'। এই দণ্ড রাজার প্রয়োজন-সাধক—সর্ব্বভূতরক্ষক, ধর্ম্মস্বরূপ ও ব্রহ্মতেজোময়—ইহা প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল—ইহা মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে (৭।১৩)। এই দণ্ডই যথার্থ রাজা, উহাই যথার্থ 'পুরুষ'-পদ-বাচ্য, উহাই যথার্থ নেতা ও শাসিতা, আশ্রম-চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের উহাই প্রতিভূ (মনু ৭।১৭)। সকল লোক দণ্ডজিত—দণ্ড-দ্বারা নিয়মিত—দণ্ড-দ্বারা সন্মার্গে প্রবর্ত্তিত। স্বভাবশুচি মানুষ অতি দুর্লভ। দণ্ড-ভয়েই সকল জগৎ আবশ্যক ভোগে সমর্থ হইয়া থাকে (মনু ৭।২২)। কেহ কেহ 'দণ্ড'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—রাজা। দণ্ডধারী, দণ্ডের অধিষ্ঠানভূত, দণ্ড-প্রয়োগ-কর্ত্তা বলিয়া রাজাই দণ্ড—"দণ্ডস্থত্বাৎ রাজা দণ্ডঃ" (গঃ শাঃ)। দণ্ড-ভয় আছে বলিয়াই ত লোক আন্বীক্ষিকী ইত্যাদিতে সম্যগ্‌ভাবে প্রবৃত্ত হয়—নতুবা হইত না। এই কারণেই বলা হইয়াছে—আন্বীক্ষিকী ইত্যাদির যোগক্ষেম-সাধন দণ্ড—"দণ্ডস্য হি ভয়াৎ কৃৎস্নং জগদ্ ভোগায় কল্পতে" (মনু ৭।২২) (গঃ শাঃ)। যোগক্ষমসাধনঃ—যোগ—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ; ক্ষেম—প্রাপ্তের পরিরক্ষণ। শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ অদ্ভুত—**"That sceptre on which the well-being and progress of......depend is known as Danda (punishment)." Danda is the means of new acquisition and preservation of......** বলিলেই ভাল হইত। তাহার নীতি—নীতি অর্থে প্রণয়ন—অনুষ্ঠান অর্থাৎ তাহার উপদেশ-শাস্ত্র। শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ এক্ষেত্রেও অদ্ভুত—**"That which treats of Danda is the law of punishment or science of government." "The code treating of it is the science of Government"**—বলিলে হইত।

ইহার পর দণ্ডনীতির ফল বলা হইয়াছে—দণ্ড-দ্বারা অলব্ধ বস্তু লব্ধ হয়, লব্ধ বস্তু পরিরক্ষিত হয়, রক্ষিত বিষয় বর্দ্ধিত হয় ও বর্দ্ধিত বস্তু তীর্থে প্রদত্ত হয়। গণপতি শাস্ত্রী 'তীর্থ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—পুণ্যক্ষেত্র, অধ্বর (যাগ) ইত্যাদি। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় তীর্থ অর্থে উপযুক্ত পাত্র—সম্মানের যোগ্য পাত্র। এ অংশে শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ মন্দ নয়—**"It is a means to make acquisitions, to keep them secure, to improve them and to distribute among the deserved the prafits of improvement."** It has its uses in—**the acquisition of what was** not acquired, **preservation of the acquired,** increase of the **preserved and the offering of the increased to the deserving (honoured).**

মূল :—উহাতে লোকযাত্রা আয়ত্ত। অতএব, লোকযাত্রার্থী নিত্য উদ্যত-দণ্ড হইবেন।

সঙ্কেত : উহাতে—দণ্ডনীতিতে। উহাতে আয়ত্ত···উহার অধীন। "It is on this science of government that the course of the progress of the world depends (SH); on it (Dandaniti) is dependent the course of worldly life (affairs)—বলা উচিত। অতএব—যেহেতু লোক-ব্যবহার দণ্ডনীতির অধীন। লোকযাত্রার্থ—যিনি যথাযথভাবে লোকযাত্রায় উৎসুক। লোকযাত্রা—লোকব্যবহার, লোকবৃত্ত। এস্থলে লোকযাত্রার্থী বলিতে নিখুঁতভাবে লোক-ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক রাজাকেই বুঝিতে হইবে; কারণ যে কোন লোকের পক্ষে দণ্ড-প্রয়োগ করা সম্ভব নহে। এ হেতু শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—"Hence", says my teacher, "Whoever is desirous of the progress of the world"—মূলানুগ নহে। (A king) desirous of worldly progress—বলা উচিত। উদ্যতদণ্ডঃ স্যাৎ—"shall hold the sceptre raised" (SH); দণ্ডপ্রণয়নে উদ্‌যোগী (গঃ শাঃ)। মোট অর্থ—যথাযোগ্যভাবে লোক-ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক রাজা নিত্য দণ্ডপ্রয়োগ করিতে উদ্‌যুক্ত থাকিবেন।

মূল :—দণ্ড যেরূপ, ভূতগণের এরূপ বশীকরণ-সাধন (আর) নাই—ইহাই আচার্য্যগণ (বলিয়া থাকেন)।

সঙ্কেত :—বশোপনয়ন—অনায়ত্তকে আয়ত্ত করিবার সাধন (গঃ শাঃ); instrument to bring under control (SH)। আচার্য্যাঃ (মূল)—এস্থলে আচার্য্যাঃ—বহুবচন—গৌরবেও হইতে পারে—আমার পূজনীয় আচার্য্যদেব—শ্যাম শাস্ত্রীর ইহাই আশয়। আচার্য্যাঃ—ইহার অনুবাদ শ্যাম শাস্ত্রী পূর্ব্ব-বাক্যের সহিত অন্বিত করিয়াছেন। অথবা, আচার্য্যগণ—এ অর্থও হইতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী মূলাংশ-দর্শনে বেশ মনে হয় দ্বিতীয় অর্থটিই এস্থলে প্রযোজ্য। কারণ গৌরবান্বিত নিজ আচার্য্যের মত খণ্ডন করার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। "older teachers of Polity" (Tolly).

মূল :—না—ইতি কৌটিল্যের (অভিপ্রায়)। তীক্ষ্ণদণ্ড (রাজা) ভূতগণের উদ্বেগকর। মৃদুদণ্ড পরিভূত হইয়া থাকেন। যথার্হদণ্ড(ই) পূজ্য। যেহেতু সুবিজ্ঞাত প্রণীত দণ্ড প্রজাগণকে ধর্ম্মার্থকাম-যুক্ত করিয়া থাকে। কামক্রোধহেতু (বা) অজ্ঞানবশতঃ দুষ্প্রণীত (দণ্ড) বানপ্রস্থ-পরিব্রাজকদিগকেও কোপযুক্ত করে—গৃহস্থগণকে (যে করিবে)—এ আর এমন কি? (আর) অপ্রণীত হইলে মাৎস্যন্যায় উদ্ভাবিত করে। দণ্ডধরের অভাবে বলীয়ান্ অবলকে গ্রাস করে। তাঁহার (উহার) দ্বারা রক্ষিত (দুর্ব্বলও) প্রভুত্বলাভে (সমর্থ) হয়।

সঙ্কেত :—তীক্ষ্ণদণ্ড—উগ্রদণ্ড-প্রয়োগকারী রাজা। Whoever imposes severe punishment (SH); whoever না বলিয়া the king who imposes বলাই উচিত। উদ্বেজনীয়ঃ (মূল) উদ্বেগজনক (অপাদানে অনীয়র্-প্রত্যয়); repulsive (SH); cause of anxiety. পরিভূত হন—অভিভূত হন—becomes contemptible (SH); is disregarded. যথার্হদণ্ডঃ—যোগ্যদণ্ড-প্রয়োগকারী; দেশ-কাল-অপরাধানুযায়ী দণ্ড-প্রযোক্তা; punishment as deserved (SH)। পূজ্য—লোকমান্য হইয়া থাকেন। সুবিজ্ঞাত-প্রণীত—শাস্ত্র হইতে সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত ও যথাযথভাবে প্রযুক্ত (গঃ শাঃ); punishment awarded with due consideration (SH); punishment duly imposed (or inflicted) after consultation (of the codes)—বলা উচিত ছিল। রাজা শাস্ত্রালোচনা-দ্বারা যথাযোগ্য-দণ্ডস্বরূপ-নির্দ্ধারণ ও যথাযথভাবে উহার প্রয়োগ করিবেন—ইহাই তাৎপর্য্য। কামক্রোধাভ্যামজ্ঞানাৎ (মূল)—কামবশে, ক্রোধবশে অথবা অজ্ঞানবশতঃ। দুষ্প্রণীত—অযথাবৎ প্রযুক্ত; ill-awarded (SH)। কাম-ক্রোধ-অজ্ঞানবশে যথাযথভাবে প্রযুক্ত দণ্ড সংযতেন্দ্রিয় বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদিগকেও যখন কোপান্বিত করিয়া তুলে, তখন উহা যে অসংযতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণকেও কোপযুক্ত করিবে—এ আর এমন কি কথা! (গঃ শাঃ)। অপ্রণীত—প্রযুক্ত না হইলে—when the law of punishment is kept in abeyance (SH); punishment if not imposed বলাই সরলতর। মাৎস্যন্যায়—বৃহৎ মৎস্য (রাঘব-বোয়াল ইত্যাদি) যখন ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে, তখন মৎস্যরাজ্যে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তাহার সহিত তুলনায় দেশের অরাজক অবস্থাকে বলা হয় মাৎস্যন্যায়—proverb of fishes (a great fish swallows a small one (SH)। বলবান্ শত্রুকর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পীড়নই মাৎস্যন্যায় (গঃ শাঃ)—a state of anarchy. The rule of fish consists of the big fish swallowing the small ones; as of the powerful roasting the weak, like fish on a spit. See Mame VII. 20, Nar. XVII. 15, M6p XII. 15, 30, kamasutra 21. 2. (Jolly) দণ্ডধর—রাজা; magistrate (SH)। বিচারক রাজার প্রতিনিধি বলিয়াই দণ্ডধর—রাজাই মুখ্যতঃ 'দণ্ডধর'-পদ-বাচ্য। তেন গুপ্তঃ (মূল)—তাঁহার (রাজার) দ্বারা অথবা তাহার (দণ্ডের) দ্বারা রক্ষিত। যিনি দণ্ডের সুপ্রয়োগ করেন, সেই রাজার দ্বারা রক্ষিত—এইরূপ অর্থ শ্যাম শাস্ত্রী করিয়াছেন—under his protection (SH); being protected by him—বলা উচিত। তেন সুপ্রণীতেন দণ্ডেন রক্ষিতঃ—সুপ্রণীত দণ্ডদ্বারা রক্ষিত (গঃ শাঃ)। প্রভবতি—অর্থাৎ দুর্ব্বলঃ বলযুক্তো ভবতি—দুর্ব্বল বলযুক্ত হয় (গঃ শাঃ)। "The weak resist the strong" (SH); prevails, predominates, attains power—বলা ভাল।

মূল :—চতুর্ব্বর্ণাশ্রম (বিভাগান্তর্গত) লোক রাজ কর্ত্তৃক দণ্ড-দ্বারা পালিত হইলে স্বধর্ম্মকর্ম্মাভিরত (অবস্থায়) নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করে।

সঙ্কেত :—চতুর্বর্ণাশ্রম—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এই চারি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম। এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চতুরাশ্রম বিভাগে লোক বিভক্ত। দণ্ড-দ্বারা—সুপ্রণীত (সুপ্রযুক্ত) দণ্ড-দ্বারা (রক্ষিত)। স্বধর্ম্মকর্ম্মাভিরতঃ—নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর ; ever devotedly adhering to their respective duties and Occupations (S H)। বর্ত্ততে স্বেষু বেশ্মসু (মূল)—নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করে অর্থাৎ স্বস্থভাবে অবস্থান করে (গঃ শাঃ) ; will keep to their respective paths (SH)। এ অনুবাদও মূলানুগ নহে—remain in their respective abodes বলা উচিত।

গণপতি শাস্ত্রী তাৎপর্য্য দিয়াছেন—দণ্ড-দ্বারা পালনের অভাবে লোকের নিজ গৃহেও স্বস্থভাবে অবস্থান দুর্ঘট।

শ্যাম শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'দণ্ড'-শব্দটি এই প্রকরণে তিনটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—রাজার হস্তধৃত দণ্ড (sceptre), রাজ-বিহিত দণ্ড (punishment) ও সেনা (army)। যে স্থলে যে অর্থটি সঙ্গত ও শোভন তথায় সেটি প্রযোজ্য।

"This passage has been conjectured by some scholars to contain a punning allusion to king Chandragupta, the powerful patron of Kanti'ya. It seems preferable, however, to give the text its natural meaning" (Jolly).

ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে বিদ্যাসমুদ্দেশ-নামক প্রথম প্রকরণে বার্ত্তা-স্থাপনা ও দণ্ডনীতি-স্থাপনা নামক চতুর্থ অধ্যায় ॥

"The Vidyasamuddesa...is quoted as an independent work in...Vatsyayana's Nyayabhashya" (Jolly).

॥ বিদ্যাসমুদ্দেশ-নামক প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত ॥

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র

দিগন্ত জুড়িয়া আজি প্রলয়ের ঘন দুর্বিপাক ;
সসাগরা এ পৃথিবী ভীত ত্রস্ত হতাশে নির্বাক !
কোথা' পথ ! কই আলো ?
আকাশ কালোয় কালো,
এরি মাঝে কী আশায় এলি ফিরে পঁচিশে বৈশাখ ?

দিকে দিকে তার স্বরে বাজে ওই রুদ্রের বিষাণ ;—
বাত্যাক্ষুব্ধ পৃথিবীতে গীত হ'বে আজি কোন্ গান ?
কবির এ জন্মদিনে
কী সুরে বাজাবে বীণে ?
কোন্ মহামিলনের মন্ত্রে আজি জাগাইবে প্রাণ !

মেঘে মেঘে ঢাকা সূর্য অন্ধকারে ম্লান নভতল ;
তবু দীপ্ত রহিবে কি ভারতের আজও পূর্বাচল !
ঝটিকার উর্ধ্বে থাকি'
আজও সে সবারে ডাকি'
দেখাবে মুক্তির পথ সত্য-শিব-সুন্দরে উজ্জ্বল !

সশস্ত্র জগত আজি অস্ত্রে অস্ত্রে করে আস্ফালন,
এক প্রান্তে পড়ে রহে এ ভারত বিষাদে মগন।
নীরবে সবার পাছে
সে আজি বসিয়া আছে,
ভাবিতেছে :—ধ্বংস-যজ্ঞে কোন্ ব্রত হ'বে উদযাপন !

শক্তি নাই ব'লে সে কি দূরে আছে রণাঙ্গন হ'তে ?
বলশালী বলী নাই আজিকার এ মহাভারতে ?
শৌর্যহীন—বীর্যহীন
এ ভারত আজি ক্ষীণ ?
নহে ! নহে !! এত দীন ভাবিয়ো না তা'রে কোনমতে !
ভারতের শৌর্য-বীর্য-প্রেমে তা'র শ্রেষ্ঠ পরিচয় ;
কবির কণ্ঠের এই শুভ বাণী—হউক্ অক্ষয়।
অস্ত্র জয়ে নহে তা'র
পরিচয় প্রতিভার,
জীব হ'তে তৃণাবধি ঐক্যে তা'র জয় চিরজয় !!
ভ্রান্ত জগতেরে ডাকি' বলো আজি পঁচিশে বৈশাখ ;
মদমত্ত রে দাম্ভিক, মারণাস্ত্র উঠাইয়া রাখ্ !
দুর্বলে চরণে দলি'
আজি বটে তুই বলী,
অন্য বলবান্ আসি' কালি তোর ঘটাবে বিপাক।
এক শক্তি ইতিহাসে আজি গর্বে লেখে রক্তলেখা,
অন্য উচ্চতর শক্তি পুনরায় কালি দিবে দেখা !
এই প্রতিযোগিতায়
খেলা চলে বার বার,
চূড়ান্ত পরীক্ষা কবে কে টানিবে তা'র শেষ রেখা !
হিংসা নহে চিরজয়ী আজিকার এ মহাভারত,
সমগ্র পৃথ্বী রে ডাকি দেখাইছে অহিংসার পথ।
তোমার সঙ্গীতে কবি
এই ভারতের ছবি
বন্দিত দেখিয়া শান্ত হোক্ রণ উন্মত্ত জগৎ।
পঁচিশে বৈশাখে আজি পূর্ণ হোক্ এই মনোরথ।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"বহুদিন পরে ডায়েরীর পাতা খুলিলাম।"

মলাটের উপরে ধূলা জমিয়াছে, পাতাগুলির রঙ্ ক্রমশ হলদে হইয়া আসিয়াছে। লিখিতে গেলে অক্ষরগুলি জাবড়াইয়া যায়। যেন বলিতে চায়, ওর কাজ ফুরাইয়াছে, এতদিন পরে আবার ওকে আলোতে টানিয়া আনা ওর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের উপরে খানিকটা উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই নয়। মনটাও আজ আর কিছু ভাবিতে চায় না—নিরুত্তাপ ও নিরুত্তেজ শান্তিতে ঝিমাইয়া পড়িতে চায়—মনের প্রতিলিপিও বুঝি তেমনি করিয়া মুছিয়া যাইতে চায় স্মৃতির পাণ্ডুলিপি হইতে। যা গিয়াছে, তাহাকে যাইতে দাও। যে তুমি আজ আর বাঁচিয়া নাই, নতুন করিয়া ডায়েরী লিখিতে বলিলেই কি আজ আবার তাহাকে পুনর্জীবন দিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? কোন লাভ হইবে না, কেবল অনর্থক হতাশায় ভরিয়া যাইবে সমস্ত।

ডায়েরীর পাতা খুলিয়া লেখাগুলি পড়িতেছি। সেই আমি—পশ্চাতের আমি। কত কল্পনা, কত আশা, কত আত্মবিশ্লেষণ। এই ডায়েরীর পাতায় নিজের মধ্যে যেন একটা আলাদা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলাম। সেই জগতে আমি স্রষ্টা, আমি সর্বময়, সেখানে আমার একচ্ছত্র রাজত্ব। কত সহস্র রূপে নিজেকে বিচার করিয়াছি, রচনা করিয়াছি, ভাঙিয়া ফেলিয়াছি। সেই আমি কি এই? আজ আমার সমস্ত কিছু সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বৃহত্তর ভাবনা নাই, মহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া মনের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রয়াস নাই। আমার মধ্যে সেদিন কত অসংখ্য কাহিনীর নায়ককে পাইয়াছিলাম, কত অগণ্য সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সেদিনের আমি আজ কী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। ভাবিতে ভয় পাই। জীবনের এই নির্দিষ্ট গতিপথ ছাড়া চলার যে আর কোনো দিক আছে, এটা কল্পনা করিতেই মন আতংক এবং আশংকাগ্রস্ত হইয়া ওঠে।

মপাসাঁর একটা উপদেশ মনে পড়িতেছে: **No man should read his old letters**; পুরানো চিঠি পড়িলে একান্ত সার্থক জীবনেও মূল্যহীন এবং মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, সমগ্রব্যাপী একটা শোচনীয় ব্যর্থতার সুস্পষ্ট রূপ তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় আত্মহত্যার পথে। কিন্তু আত্মহত্যা আমি করিব না—অতখানি মনোবিলাস বা মনের প্রবণতা আমার নাই। শুধু পিছনে ফেলিয়া আসা জীবনটার দিকে চাহিয়া কৌতুহল আর বিস্ময়বোধ হইতেছে। আমি কী হইতে পারিতাম—কী হইয়াছি।

কেন এত সব কথা মনে পড়িল? মনে পড়িল এই চর ইসমাইলে আসিয়া। জীবনের সব চাইতে মূল্যবান অভিজ্ঞতা আর সব চাইতে বিস্ময়কর অনুভূতি আমি এখানেই লাভ করিয়াছি। সেই মেয়েটি—সেই বর্মী মেয়েটি। নাম ভুলিয়া গিয়াছি। কী হইবে তাহার নাম দিয়া? সে যেন এখানকার আদিম প্রকৃতির মূর্ত প্রতীক। এখানকার ঝড় আর হিংস্র সৌন্দর্যের উচ্ছল তরঙ্গ লইয়া আমাকে গ্রাস করিয়াছিল, আবার তেমনিভাবেই রিক্ত গম্ভীর ঔদাসীন্যে আমাকে পিছনে ফেলিয়া সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

কী হইত সেদিনের স্রোতে ভাসিয়া পড়িলে? কী হইত সেদিন সেই বন্য সৌন্দর্যের করাল গ্রাসে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিলে? পশ্চাতের আমি লোভ দেখাইতেছে। বলিতেছে: তাহা হইলে সহস্র সংঘাতের মধ্য দিয়া তুমি বাঁচিয়া থাকিতে—নিজেকে সহস্র সত্তায় বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিতে, অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া সার্থক হইতে পারিতে। এমন করিয়া জীবনের একমুখী আলস্য মন্থরগতির মধ্য দিয়া তোমার সমস্ত সত্তার মৃত্যু ঘটিত না।

না, না, এভাবে নিজেকে লোভ দেখাইয়া লাভ নাই। দশবছর বয়স বাড়িয়াছে, পদোন্নতি হইয়াছে, উন্নতির শীর্ষ শিখর তো এখন সম্মুখেই পড়িয়া। তা ছাড়া পাশেই রাণী ঘুমাইতেছে। ওর শান্ত কোমল মুখের উপরে আলো পড়িয়া অপরূপ শ্রীতে ওকে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ও যেন পূর্ণ বিশ্রাম—সমস্ত সংগ্রাম ও ক্লান্তির একান্ত শান্তিময় অবসান। নীড় আর ভালোবাসা। ঝিণ্টুর মুখখানা ওর মায়ের বুকের মধ্যে লুকাইয়া আছে। আমার সন্তান আমার সজীব দেহ ও মনের ধারাবাহক। এই ভালো। যা পথে ফেলিয়া আসিয়াছি পথের ধূলাতেই তাহার শেষ চিহ্নটুকু মিলাইয়া যাক। চর ইসমাইল আজ আর আমার রক্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না—তাহার ডাকিনীমন্ত্রকে আমি জয় করিয়াছি।"

৪

চর ইসমাইলের বাহিরে বৃহত্তর পৃথিবী ঘুরিয়া চলিয়াছে। দিগ্‌দিগন্ত জুড়িয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মানচিত্রের রেখাগুলি

প্রত্যেকদিন বদলাইয়া চলিয়াছে নূতন করিয়া—ইয়োরোপে, চীনে, প্রশান্ত মহাসাগরে, ভারতবর্ষে। চর ইসমাইল কি তাহার স্পর্শ পায় নাই? পাইয়াছে বই কি? মাথার উপর দিয়া বিমান ওড়ে—নদীর জলে ফেনিল তরঙ্গ জাগাইয়া সৈন্যবাহী জাহাজ ভাসিয়া যায়। ভারত মহাসাগরে জাপানী মালোয়ার হানা দিয়া ফিরিতেছে। বর্মা, আরাকান শত্রুপক্ষ গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। আসামের সীমান্তে কামান গর্জন—থাসিয়া, জয়ন্তী, লুসাই পাহাড়ের চূড়াগুলি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কাঁপিয়া উঠিতেছে। চট্টগ্রামে বোমা পড়িতেছে।

উন্মাদ ডি সুজাকে লইয়া গিয়াছিল গঞ্জালেস। লিসিকে তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবে—উদ্ধার করিবে। যেমন করিয়া হোক, যতদিনেই হোক্। কতটুকু এই পৃথিবী, কতখানিই বা এই মহাসাগরের ব্যাস? তাহাদের দিগ্বিজয়ী জলদস্যু পূর্বপুরুষেরা একদিন সাতটি সাগর চষিয়া বেড়াইত, তাহাদের ড্রাগন আঁকা রক্তপতাকা সমুদ্রের নীল জলে রক্তের ছায়া ফেলিত। সন্ধান সুরু হইল। চট্টগ্রাম হইতে আরাকান খুব বেশি দিনের পথ নয়—ডি-সুজাকে লইয়া গঞ্জালেস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইল সমস্ত। কিন্তু লিসির সন্ধান পাওয়া গেলনা—না পাওয়া গেল বর্মীদের কাহাকেও। তারপর একদিন সকালে উঠিয়া গঞ্জালেস দেখিল ঘরের চালে একটা দড়ি ঝুলাইয়া তাহার সঙ্গে ডি সুজাও ঝুলিতেছে। গলাটা সারসের গলার মতো লম্বা হইয়া পড়িয়াছে,মানুষের জিভ যে অতখানি বড় হইতে পারে, এর আগে সেটা কোনোদিন কল্পনাই করিতে পারে নাই গঞ্জালেস। নাকের ফাঁক দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িয়া বুকের উপরে কালো হইয়া জমিয়া আছে। আত্মহত্যা করিয়াছে ডি-সুজা। এতবড় বীর, এমন দুঃসাহসী পুরুষ। তাহার অমিত শক্তিমান জীবনকে সে আর কাহারো হাতেই শেষ করিতে দেয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যুকেও মানিয়া লয় নাই। যে আলো সমস্ত জীবন ধরিয়া সে সহস্র ছটায় জ্বালাইয়া দিয়াছিল—নিজের হাতেই সে আলোকে সে নিবাইয়া দিয়া গিয়াছে।

তারপরেই ক্রমে কেমন একটা প্রতিক্রিয়া আসিয়া দেখা দিল গঞ্জালেসের মনে। লিসির জন্য সে উদ্দামতাটা যেন আস্তে আস্তে শান্ত হইয়া আসিল। ডি সুজার মৃত্যুটা একখণ্ড পাথরের মতো হইয়া চাপিয়া বসিল তাহার চেতনায়। মনে হইল, তাহারও শেষ পরিণতি হয়তো বা এমনি করিয়াই ঘনাইয়া আসিবে। তাহার শিরায় শিরায় অতীতের সেই সংস্কারবাদী হিন্দুরক্ত ক্রিয়া করিল।

গঞ্জালেস্ ফিরিয়া আসিল বাড়িতে।

কাজ কারবারে মন দিল, কিন্তু মন বসিল না। জীবনটা যেন দুইটা ভাগে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেছে। যে বিদ্রোহী বহু দিনের ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, সে কিছুই করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই অস্বস্তির একটা তীব্র জ্বালায় নিজেকে যেন জ্বালাইতে থাকে। অথচ, কাজ কারবারও দেখিতে হইবে। জোর করিয়া মনটাকে বাঁধিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে পুরাণো অভ্যাসগুলিকে ঝালাইয়া লইতে সুরু করিল। তারপরে মদ টানিতে লাগিল অশ্রান্তভাবে। ডেভিড্ গঞ্জালেসের মতো বেপরোয়া হইবার ক্ষমতা তাহার নাই, কিন্তু কপালে বাপের দেওয়া সেই কাটা চিহ্নটার জয়তিলক বহন করিয়া সে পূর্ণ উদ্যমে নেশার সেবায় লাগিয়া গেল। ভাব সাব দেখিয়া পাকা হুইস্কিখোর বন্ধু পেরিরাও তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

একদিন পেরিরা ঠাট্টা করিয়া মন্তব্য করিল: হ্যাঁ, বাপের নাম রাখতে পারবে বলেই ভরসা হচ্ছে।

আরক্ত চোখ দুইটা পাকাইয়া গঞ্জালেস্ পেরিরার দিকে তাকাইল: বাপের নাম। বাপকে ছাড়িয়ে যদি যেতে না পারি, তা হলে আমার নাম স্যামুয়েলই নয়। সে ব্যাটা ধেনো পেলে ধেনোই টানত, আমি হুইস্কির নীচে নামব না—এ তোমাকে বলে রাখলাম।

পেরিরা খুসি হইয়া গঞ্জালেসের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া কহিল: সাবাস ভাই সাবাস। বুকের পাটা আছে তোমার।

অবশ্য খুসি হইবার কারণ আছে তাহার যথেষ্টই। নেশার জন্যে অনেকগুলো কাঁচা পয়সা তাহার বাহির হইয়া যাইত, সেগুলি বাঁচিয়া গেল আপাতত। তা ছাড়া গঞ্জালেসের কারবারে সেও অংশীদার; লোকটা যতদিন নেশার মধ্যে তলাইয়া থাকিবে, ততদিনই সে নিজের জন্য কিছু করিয়া লইবার সুযোগ পাইবে। অবশ্য, কৃতঘ্নতা বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু ব্যবসা করিতে বসিয়া যখন দুনিয়া শুদ্ধ লোককেই ঠকানো চলিতেছে, তখন অংশীদারকেও কিছু ঠকাইলে তাহাতে পাপের মাত্রাটা এমন ভয়ঙ্কর কিছু বাড়িয়া উঠিবে না। মাতা মেরী তো আর একেবারে হৃদয়হীনা নন; একটা গতিও তিনি করিয়া দিবেনই পেরিরার। সংসারে নিজের কাজ নিজে গুছাইয়া না নিলে তোমার জন্যে কে আর হাত বাড়াইয়া বসিয়া আছে বলো।

গঞ্জালেস্ তলাইয়া গেল মদের বোতলের মধ্যে, তলাইয়া গেল তাহার রক্ষিতা সেই মেয়েমানুষটার মধ্যে। বাহিরের ব্যর্থ সন্ধান যেন অন্তরের মধ্যে আসিয়া তাহার অবলম্বন খোঁজে। মদের বোতলের মধ্যেই কি সে তাহার উদগ্র জ্বালাকে নির্বাপিত করিতে চায়? পণ্য-নারীর ভ্রূ ভঙ্গির মধ্য দিয়াই কি গঞ্জালেস্ খুঁজিয়া পায় লিসিকে।

আর তাহারি আড়ালে আড়ালে স্রোতের মতো দিন বহিয়া চলে—বয়স বাড়িয়া চলে গঞ্জালেসের। ছয়—সাত—আট—নয় দশ বৎসর। (ক্রমশঃ)

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্

১১

রবার্ট নাইটের মোকদ্দমা

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র একটি চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমায় অসাধারণ আইনজ্ঞানের ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু ষ্টেট্সম্যানের তৎকালীন সম্পাদক রবার্ট নাইট বর্দ্ধমানের অন্যতম রাজ-সচিব ডাক্তার
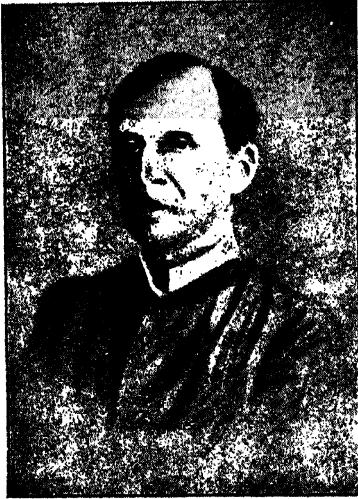
রবার্ট নাইট

যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত তথ্যাবলম্বনে তৎসম্পাদিত পত্রে বর্দ্ধমানাধিপতির তৎকালীন য়ুরোপীয় ম্যানেজার টমাস ডি বরা মিলার-এর বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ প্রকাশ করেন, যথা,

(১) তিনি বর্দ্ধমান রাজকোষ হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বা রাজসংসারের সাধারণ ব্যয়ের জন্য গ্রহণ করিয়া পরে ইংলণ্ডে কোন ব্যবসায়ীকে দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া বিল প্রদর্শনাদি করত প্রভূত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন।

(২) স্যর এশলি ইডেনের নিকট হইতে নূতন মহারাজাধিরাজের খিলাত আনাইবার খরচ বলিয়া ৪ লক্ষ টাকা রাজকোষ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩) রাজ্য পরিচালনায় অনেক গলদ আছে; যতদিন বর্ত্তমান ম্যানেজার থাকিবেন বোর্ডের পক্ষে যথার্থ সংবাদ পাওয়াও সুকঠিন।

(৪) মেসার্স মেনার্ড ও হ্যারিস নামক কোম্পানীকে প্রায় ১০০০০ পাউণ্ডের য়ুরোপীয় দ্রব্য পাঠাইতে আদেশ দেওয়া হয়, তাহার মূল্য অত্যধিক, অর্থাৎ মিলার সাহেব বর্দ্ধমানাধিপতিকে ঠকাইয়াছেন।

(৫) এরূপ অর্থলুণ্ঠনকারী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে অনেক ছিলেন, কিন্তু আশা করা গিয়াছিল এখন তাহাদের অস্তিত্ব নাই।

(৬) তিনি তরুণ মহারাজার প্রতি একপ্রকার বল-প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার বেতন বর্দ্ধিত করাইয়াছেন এবং রাজকোষ হইতে তাঁহার ও তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পত্নীর পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিষ্টার মিলার ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক রবার্ট নাইট ও মুদ্রাকর মিষ্টার বার্লোর নামে মানহানির মোকদ্দমা করিলেন। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এফ্-জে-মার্সডেন এই মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ করেন। ইতোমধ্যে মিলারসাহেব হঠাৎমৃত্যুমুখে পতিত হন এবং রবার্ট নাইট তাঁহার কাগজে শোকপ্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি যে মানহানিকর কথা সাধারণের হিতার্থ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সম্পাদকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া তাহা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু মিলারের মৃত্যুতে এবং রবার্ট নাইটের প্রকাশ্য ত্রুটী স্বীকারেও ব্যাপারটা মিটিল না। হাইকোর্টে বিচারপতি ওকিনিলির নিকট গবর্ণমেণ্ট মিলারের হইয়া রবার্ট নাইটের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইলেন। সরকার পক্ষে ব্যারিষ্টার মিষ্টার গ্যাম্পার (এটর্ণি ডিগন্যাম ও রবিন্সন), মিষ্টার নাইটের পক্ষে ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ও আপকার (এটর্ণি মেসার্স ব্যারো ও অর), মিষ্টার বার্লোর পক্ষে ব্যারিষ্টার মিষ্টার অ্যালেন (এটর্ণি মেসার্স ব্যারো এণ্ড অর)। দাঁড়াইয়াছিলেন, কোর্টে দর্শকের অসম্ভব ভীড় হইয়াছিল। দিনের পর দিন উমেশচন্দ্র এরূপ সওয়াল জবাব এবং যুক্তি-

তর্কপূর্ণ আইনজ্ঞানের পরিচয় দেন যে সকলে চমৎকৃত হন। সরল বিশ্বাসে এবং সাধারণের হিতার্থে মিষ্টার নাইট ঐ সকল অভিযোগ আনিয়াছিলেন কিনা জুরীকে তাহাই বিচার করিতে বলিলে অধিকাংশ জুরী উমেশচন্দ্রের যুক্তি মানিয়া লইয়া রবার্ট নাইটকে নির্দ্দোষ স্থির করিলেন। বিচারপতি নূতন জুরী দ্বারা পুনর্বিচারের নির্দ্দেশ দিলেন। বিচারপতি ট্রেভেলিয়ানের কোর্টে পুনর্বিচার হয়। ইতোমধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন—কি জন্য একজন মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত মানহানির জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয়-বহুল মোকদ্দমা চালাইতেছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বলিলেন এ বিষয়ে তাঁহারা কিছুই অবগত নহেন, সরকারী উকীলরা মোকদ্দমা চালাইতেছেন। আসল কথা, কয়েকটি ব্যাপারে বোর্ড অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুনাম রক্ষার্থ বর্দ্ধমানের ম্যানেজারের কার্য্য নির্দোষ প্রতিপাদিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে জর্জ্জ ইউলের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট এই মোকদ্দমা তুলিয়া লন এবং নাইট ষ্টেটসম্যানে একটি ত্রুটী স্বীকার সূচক পত্র প্রকাশিত করেন।

দাদাভাই নৌরোজী

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন

পূর্ব্ববর্ষের অবধারণ অনুসারে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। উমেশচন্দ্র প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে এবারে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ৪৩৬ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন এবং প্রবীণ দেশনায়ক দাদাভাই নৌরোজী এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার রাজা
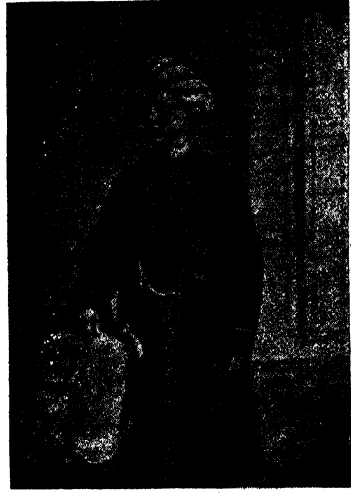
রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি-রূপে বলিয়াছিলেন :—

"আমার বিক্ষিপ্ত স্বজাতীয়গণ একদিন মিলিত ও একাত্ম হইবেন, কেবল ব্যক্তিগত জীবন যাপন না করিয়া আমরা একদিন এক মহাজাতিরূপে বাস করিব, ইহাই আমার জীবনের স্বপ্ন। এই সভায় সেই মহামিলনের সূচনা দেখিতেছি। আমি আশা করি—সে মিলন বেশী দূরবর্ত্তী নহে। হয়ত আমি সে দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইব না, কিন্তু আমরা যে এস্থলে সমবেত হইয়াছি ইহা আমার পক্ষে অতীব আনন্দজনক—দেশের কল্যাণের জন্য উদীচি হইতে, দাক্ষিণাত্য হইতে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রদেশ হইতে, প্রতিনিধিগণ এক জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া আগ্রহের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন।

উৎপত্তিতে, ধর্ম্মে, ভাষায়, আচারে ও ব্যবহারে আমরা পৃথক হইলেও আমরা তথাপি একই জাতির অন্তর্গত। আমরা একই দেশে বাস করি, একই সাম্রাজ্ঞীর প্রজা এবং দেশের যে সকল বিধি ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত করেন আমাদের সকলেরই ইষ্টানিষ্ট তাহার উপর নির্ভর করে।

যাহা হিন্দুদের কল্যাণকর তাহা সমভাবে মুসলমানগণেরও কল্যাণকর, যাহা হিন্দুদের অকল্যাণকর তাহা মুসলমানগণেরও কল্যাণকর। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের লইয়া বিভিন্ন জাতি গঠিত হয় না, এক রাজনীতিক বন্ধনে আবদ্ধ সম্প্রদায়সমূহ লইয়া জাতির সৃষ্টি হয়। আমরা সকলে এক রাজনীতিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং সেইজন্য আমরা এক জাতি।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, জানি না কাহার ইঙ্গিতে, মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান না করেন তাহার এক বিপুল চেষ্টা হইতেছিল। উমেশচন্দ্র চাহিয়াছিলেন যে ভেদবুদ্ধিপরিহারপূর্ব্বক ভারতবাসী মাত্রেই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রতম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও এই প্রতিষ্ঠানে সম্মানের আসন প্রাপ্ত হন। দাদাভাই নৌরোজী দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া উমেশচন্দ্র তাঁহাকে এই অধিবেশনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যদিও পার্শী সম্প্রদায় মুসলমানগণের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি সংখ্যা

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২।১।৮৭ তারিখ সম্বলিত এক পত্রে তাঁহার এক পুত্রকে এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"কয়েকদিন কোন সম্বাদপত্র পড়ি নাই। আজ পড়িয়া দেখিলাম যে ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে; দাদাভাই নৌরোজী সভাপতি হইয়াছিলেন, বক্তৃতাগুলিতে ধৈর্য্য এবং সুবুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে। আবদুল লতিফ এবং আমীর আলির নেতৃত্বে বঙ্গীয় মুসলমানেরা এবারও পৃথক রহিয়া গেলেন। অযোধ্যা, হাইদরাবাদ এবং অন্যত্রের মুসলমানগণ ইহাঁদের অপেক্ষা অধিকতর দেশভক্তি এবং সকল ভারতবাসীর সহিত সম্মিলনের পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। আবদুল লতিফ প্রভৃতি যে আলাদা থাকিতে চাহিতেছেন, তাহাও স্বজনের সুবিধার জন্য নহে—অতটা ক্ষুদ্র উঁহারা নহেন। ইহাতে মুসলমানদিগের সাধারণ ভাবে সুবিধা হইবে এই আশা করিতেছেন। কিন্তু উঁহারা স্মরণে রাখেন নাই যে এক সময়ে হিন্দুদিগকে জলপানি ও চাকুরী দিয়া উৎসাহ দেওয়া হইত। তাহার পর যখন দলে দলে মহা আগ্রহে উহারা ইংরাজী শিখিতে লাগিল এবং ইংরাজদিগের সকল কথার, কার্য্যের এবং ব্যবস্থার ভক্ত হইয়া পড়িল, তখন আর সেরূপ আদরের প্রয়োজন থাকিল না। সে যাহা হউক, ক্ষুদ্র পারসি সমাজের দাদাভাই নৌরোজীকে সভাপতি করায় সুবুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে; সভাপতিত্ব লইয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঈর্ষার কারণ রাখা হয় নাই। সভাপতিও সুবুদ্ধির সহিত বলিয়াছেন—কংগ্রেস রাজনৈতিকক্ষেত্রে একমত গঠনের জন্য সভা; উহাতে সমাজ-সংস্কারের কথার আলোচনা অসঙ্গত। কংগ্রেসের পরিচালনা সুন্দররূপেই হইতেছে। আমার মতে ভারত সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তিকা ইংলণ্ডে ছাপাইয়া তথায় এবং এদেশে প্রচার করা ভাল। আমার বক্তৃতাশক্তি থাকিলে আমি উহাতে গিয়া কার্য্য করিতাম :—যাহা নাই সেজন্য ক্ষোভ করা অনাবশ্যক—আমার উপযোগী ক্ষেত্রেই আমি জন্মভূমির সেবা করিতে থাকিব।"

৬।১।৮৭ তারিখে ভূদেব লিখিয়াছেন :—

"ইংলিসম্যান এবং পাইওনিয়ার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লিখিতেছে। যাহারা কোন একটা দলের, তাহাদের সেই দলের মতের পোষক কোন উক্তিতে লোকে ভোলে না, এবং অপর মতের অপ্রশংসায়ও বিচলিত হয় না। নিরপেক্ষ ভাল লোকের মতই সকল দলের লোককে সযত্নে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। মিঃ আমীর আলির যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে লোকে বলিতেছে তাহা জষ্টিস কনিংহামের লেখা, এবং ইহাও শুনা যাইতেছে যে তিনি হাইকোর্ট জজের পদপ্রার্থী। এরূপ ভাবে দুদশজন শক্তিমান ব্যক্তির

বিরূপতা আনিয়া কোন জাতীয় কার্য্যের প্রতিবাদ করায়, বিশেষতঃ সকল কথা জানাজানি হইয়া গেলে জাতীয় কার্য্যের সুবিধাই হইয়া থাকে।"

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৺ মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেবের পুত্র মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ ও বিনয়কৃষ্ণ, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তদীয় পুত্র (পরে রাজা) প্যারীমোহন, মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ, সশিষ্য সুরেন্দ্রনাথ

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগ্মী কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অম্বিকাচরণ মজুমদার, গুরুপ্রসাদ সেন, মতিলাল ঘোষ, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদের চারুচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি দেশ-প্রেমিক বাঙ্গালী ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। 'ভারত-সঙ্গীতে'র মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশন উপলক্ষে 'রাখিবন্ধন' নামক কবিতা রচনা করিয়া "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতকে তন্মধ্যে জাতীয় সঙ্গীতের স্থান প্রদান করেন এবং তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য অন্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়েরই প্রস্তাবে দাদাভাই নৌরোজী সভাপতি পদে বৃত হন। দাদাভাই নৌরোজী বক্তৃতায় প্রথম অধিবেশনের সভাপতি উমেশচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করেন। Poverty and un-British Rule in

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

British Indiaর রচয়িতা নৌরোজীর বক্তৃতায় ভারতীয়ের দারিদ্র্য একটি প্রধান বিষয় ছিল। উমেশচন্দ্র এই অধিবেশনে 'জুরী প্রথা' এবং 'বিভিন্ন প্রদেশে স্থায়ী কংগ্রেস সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে দুইটি প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন।

তখনও কংগ্রেস রাজপুরুষগণের বিরাগভাজন হয় নাই এবং লর্ড ডাফরিণ কতিপয় সদস্যকে 'দর্শন' দিয়াছিলেন এবং কাহাকেও কাহাকেও উদ্যান সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ

মোর প্রেম থাক্

লতিকা ঘোষ

মোর প্রেম থাক্ সব মানবের লাগি—
ব্যথা সবাকার থাক্ আঁখি মাঝে জাগি,
কামনা আমার শুভ্র সরোজসম—
ত্যাগ হ'য়ে ফুটে থাক্ হিয়া মাঝে মম!

মোর দুই বাহু প্রীতি-ভালবাসা ভরে—
সবারে সেবিতে থাক্ আপনার ক'রে;
সবাকার সুখে গাহি যেন জয়গান—
আপন অন্তর সবে করি আমি ম্লান!

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

(২)

কলেজ বারটায়।

উড়িয়া ঠাকুরের বিস্বাদ রান্না মহাতৃপ্তির সঙ্গে খাইয়াই অমল উপরে উঠিয়া আসিল। মাত্র দশটা বাজিয়াছে। এত সকালে কেমন করিয়া কলেজে যাওয়া যায়! যাহা হউক মনে মনে একটা অজুহাত ঠিক করিয়া ফেলিল—লাইব্রেরীতে পড়া যাইবে।

লাইব্রেরীর প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া বারবার রাস্তার দিকে চাহিয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষা করিতেছিল কিন্তু অপর্ণা আসে নাই। হয় ত একেবারে ক্লাসেই যাইবে, হয়ত আজ সে নাও আসিতে পারে, তাকাইয়া তাকাইয়া তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। প্রতীক্ষাচঞ্চল অন্তর লইয়া পড়া সম্ভব নয়, সে পাতা উল্টাইতেছিল মাত্র।

অপেক্ষা করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বারটার আর বিলম্ব নাই—একটি একটি করিয়া সোপান অতিক্রম করিতে করিতে সে নানা কথা ভাবিতেছিল, 'হয়ত' সিঁড়িতে দেখা হইবে, হয়ত সে প্রশ্ন করিবে, হয়ত করিবে না; তাহাকেই যাহা হয় বলিতে হইবে—

অমল হঠাৎ চাহিয়া দেখে অপর্ণা তিনতলার বারান্দা দিয়া যাইতেছে, কিন্তু দূরত্বটা কথা বলিবার মত নয়। বেশ তাহার আজ উল্লেখযোগ্য—অতি মিহি এবং জরিদার শাড়ী, ঘন নীলরংএর গভীর পটভূমির সাম্‌নে তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি সুন্দরতর দেখাইতেছে—

অপর্ণা ফিরিয়া চাহিল কিন্তু কথা বলিবার কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিয়াই সে তাহাদের কমন-রুমে চলিয়া গেল। অমল দুঃখিত হইয়াছিল, গত কালের অকুণ্ঠ ও আগ্রহপূর্ণ আলোচনার পর আজকার এ উপেক্ষা খুব স্বাভাবিক নয়। শঙ্কা ও দ্বিধার মাঝে অমল ভাবিল—তাহার সম্বন্ধে সামান্য কৌতূহল হয়ত তাহার পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার ব্যক্তিগত অবস্থার সহিত তাহার অনেক তফাৎ, এখানে তাহার পক্ষে বন্ধুত্বের লোভ করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

অমল ক্লাসে বসিয়াছিল—অধ্যাপকের বক্তৃতাও শুনিতেছিল। অদূরে অপর্ণা বসিয়া আছে তাহা স্পষ্ট না দেখিলেও দৃষ্টি-পথের প্রান্তভূমির মাঝে তাহার মুখখানি মাঝে মাঝে দেখা যায়।

চারটা পর্য্যন্ত পর পর ক্লাস করিয়া অমল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বার বার সে নিজেকে বুঝাইয়াছিল—অপর্ণার ওই ক্ষুদ্র কথা কয়েকটিকে এত মূল্য দিবার, এত বড় করিয়া ভাবিবার কোন কারণই নাই, তবুও অপর্ণার পরিচয় ও কথা কয়েকটিকে সে কিছুতেই মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই। মানুষের মনের যে এত বড় দুর্ব্বলতা আছে অমল তাহা পূর্ব্বে ভাবে নাই—

চা খাইয়া সে ভাল ছেলের মত পড়া আরম্ভ করিবে মনস্থ করিল। মনকে সে কিছুতেই আর বিমনা হইতে দিবে না।

অতএব চা পানান্তে সে হন্ হন্ করিয়াই লাইবেরীতে যাইতেছিল। কে যেন তাহাকে ডাকিল—অমলবাবু।

ফিরিয়া চাহিয়া দেখে—অপর্ণা!

—ও—নমস্কার—কি ব'লছেন?

অপর্ণা রুমালে মুখ আড়াল করিয়া একটু ব্যঙ্গ করিল,—কি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন যে জ্যান্ত মানুষ, এমন কি মেয়েমানুষগুলোও চোখে পড়ে না?

—ও আপনাকে লক্ষ্য করিনি, ক্ষমা করবেন। লাইব্রেরীতে যাচ্ছি।

অপর্ণা পুনরায় হাসিয়া বলিল—বলা বাহুল্য মাত্র!

—আপনি যাবেন না?

—যাবো চলুন।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল, অমল বলিল—আপনাকে আজ যেন একটু কেমন দেখাচ্ছে?

—কেমন অর্থাৎ ভাল না মন্দ?

—সম্ভবতঃ ভালই।

—ও চোখও খারাপ হ'য়েছে, ভালমন্দ বুঝতে পারেন না!

—না ঠিক তা নয়, চোখে স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু মনে ঠাহর ক'রতে পাচ্ছি না।

—আটপৌরে মিলের কাপড় পরলে ভাল হতো?

—সে বেশে দেখ্‌লে বিবেচনা ক'রতে পারি।

—বেশ। আপনার বিদ্রূপ বুঝ্‌লাম।

—বিদ্রূপ?

—হ্যাঁ, এ কাপড়খানা যে আপনার চক্ষুশূল সেটা বুঝ্‌তে পেরেছি কিন্তু কি ক'রবো; আমার চোখে ত ভালই লাগ্‌লো—তাই। যাকগে—

অমল হাসিয়া কহিল—যাক্‌গে ব'ল্‌লেই ত যায় না। আমি বল্‌তে চাই যে এখানা আপনাকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু ভাষা আমাকে প্রতারিত ক'রেছে—

—আপনিও করেছেন। যাক্‌, আমাদের একটা ক্লাব আছে, নাম হ'চ্ছে নিও কালচারাল সোসাইটি। আপনাকে মেম্বার হ'তে হবে। মাসিক চাঁদা দু' টাকা। কেমন? নামটা তুলে নেব ত?

অমল বলিল—সেখানে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা আলোচনা হয় না ত!

—তার মানে?

—আমার বড্ড ভয় করে ও শুন্‌লে? আর ক্লাসিক গান হয় না ত?

—ভয় নেই।

—ভরসাটা কি পরিষ্কার করে বলুন। সাদা কাগজে নাম সই করাটা হঠকারিতা নয় কি? অমলের ভয় প্রশমিত হয় নাই—প্রকৃত ভয়টা তাহার ছিল চাঁদার ব্যাপারে। মাসিক দুই টাকা চাঁদা দিলে বৈকালের চা ও টোষ্ট খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে—সেটা খুব সহজসাধ্য ও স্বাস্থ্যকর নয়।

—আমি ওই ক্লাবের সেক্রেটারী, তা জেনেই কি আপনার মেম্বার হওয়া সম্ভব নয়?

—খুব সম্ভব ছিল কাল, কিন্তু আজ নেই; কারণ আজ মনে হচ্ছে আপনি ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে জড়িত।

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল। হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া চোখের দৃষ্টিটা অমলের মুখের উপর হানিয়া বলিল—বাইরে দেখে মনে হয় আপনি নেহাত বেচারী কিন্তু আপনার পেটে এত!

—পেটে নয় মুখে। স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন, যা হয় করি। একটা অপ্রিয় স্বীকারোক্তি করি—আমি একটু দেরীতে বুঝি এটা মনে রাখবেন।

—তবে শুনুন, এ ক্লাবে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থ-নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সকলে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পড়েন। যার বাড়ীতে সভা হয় তিনি কিছু জলযোগের বন্দোবস্ত রাখেন—

—বটে! তবে—তবে ত সভ্য হ'তেই হবে।

—জলযোগের জন্য?

—হ্যাঁ, নইলে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান-সঞ্চয়ের মত মহৎ অভিপ্রায় আমার নেই। আমি পড়ি ডিটেকটিভ বই, দেখি অভিযানের ফিল্ম, আর থিয়েটারের নাচ গান—কারণ আমার মতে থিয়েটার সিনেমায় যেয়ে যারা হিতোপদেশ শুন্‌তে চায় তাদের মত ভণ্ড পাষণ্ড আর নেই।

—থিয়েটার সিনেমার ওপর আপনার রাগ কেন?

—রাগ নয়, অনুরাগ আছে—তাই বিশ্রামের সময় বিজ্ঞাপনগুলি আমি ভাল ক'রে দেখি, ছবির থেকে সেগুলো আমার আরও ভাল লাগে—

অপর্ণা বলিল—বেশ, ভগবৎ কৃপায় আপনি বিজ্ঞাপনই দেখুন। কাল থেকে আপনি তাহ'লে সভ্য।

অমল বলিল—আপনি যে এই সৌভাগ্যলাভের অবলম্বন একথা কোন দিনও ভুলবো না। মিস্‌-ডেজি—

—ডেজি, ডেজি আবার কি? মনে রাখবেন আমাদের ক্লাবের মেম্বার ইচ্ছা ক'রলেই হওয়া যায় না। কোন মেম্বার কাউকে উপযুক্ত মনে ক'রলে তবে তার মারফৎ তাকে সভ্য করা হয়। তেমনি ইচ্ছে ক'রলেই ডেজি নাম ধরে ডাকা যায় না।

উত্তরের অবসর না দিয়াই অপর্ণা লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া গেল—এমন ভাবে চলিয়া গেল যেন অমলকে সে কোন দিনও চিনে না।

অপর্ণার ছন্দময় কথাগুলিতে অমলের মনের মেঘ

কাটিয়া গিয়াছিল—মনে মনে সে গর্ব্বে এবং অনাগত সৌভাগ্যের আশায় পুলকিত হইয়াছিল। অপর্ণার সহিত পরিচয় ও এই সামান্য ঘনিষ্ঠতা তাহার জীবনে মহা মূল্যবান সামগ্রী—জন্মাবধি অসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধন অনটন ও অসচ্ছলতার মধ্যে তাহার মন মুমূর্ষু মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আজ তাহা যেন শতদলের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ লইয়া আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলিয়াছে।

রাস্তায় দেবদারু গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে, স্বল্প কিশোর পত্রের সমাবেশে বৃক্ষের শ্যামলতা যৌবনের সাধনা আরম্ভ করিয়াছে। অমল ভাবিল—রমলার সহিত হয়ত সাক্ষাৎ হইবে, সে হয়ত তাহাকে তাহার একনিষ্ঠ ভগ্নহৃদয় উপাসক রূপে চাহিবে। মন্দ কি, সে তাহারই অভিনয় করিবে—এ অভিনয়ে যদি সে আনন্দিত হয় ক্ষতি কি ?

ছাত্র তারস্বরে এ, বি, সি, ত্রিভুজের বাহু ও কোণের পরিমাণ ও সমতা সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিতেছে। অমল ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—তোমার অঙ্ক হ'য়েছে—

ছাত্র ভীত চিত্তে অর্দ্ধভুক্ত ত্রিভুজকে ত্যাগ করিয়া বীজগণিত আরম্ভ করিল। অমল আশ্চর্য্য হইল নিজেরই দুর্ব্বলতা দেখিয়া—যাহার সহিত সে মাত্র অভিনয় করিতেই চাহিয়াছে, তাহার আগমন পথের দিকেই সে বারবার চাহিতেছে।

রমলা আসিল এবং বিনা ভূমিকায়ই প্রশ্ন করিল—কতক্ষণ এসেছেন মাষ্টার মশায় ?

—অল্পক্ষণ, মিনিট দশেক হবে। আপনি ভুলে গেছেন, বাপমার দেওয়া নামটা হ'চ্ছে অমল। মাষ্টারিটা আমার বৃত্তি।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, অমলবাবু, চা খাবেন ?

—প্রয়োজন নেই, তবে খেতে পারি। হ্যাঁ, আপনি সেই বইটা পেয়েছেন ?

—কলেজের পত্রিকা—হ্যাঁ। আচ্ছা দেব'খন, আপনি ভুলে যান নি তা হ'লে ?- রমলার চোখে মুখে একটু আনন্দের অভিব্যক্তি ধরা-পড়ার-মত-ভাবেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

অমল হাসিয়া বলিল—আপনার স্মৃতিশক্তির অভাবের জন্যে কেবলমাত্র সমবেদনাই জানানো যায়।

—আপনি আমার নামটাই ভুলে গেলেন, আর আমি কতদূর মনে ক'রে আছি ভাবুন ত!

রমলা হো হো করিয়া ক্ষণিক হাসিয়া বলিল—ভুলি নি, অভ্যাসবশতঃ মুখে আসে—

—আমিও ত মিস্ মিত্র না বলে খোকার দিদি বল্‌তে পারি।

—তা'তে ত অসম্মান হয় না কিছু, ইচ্ছে হ'লে ব'লবেন। আচ্ছা বসুন আমি আসি।

অমল বীজগণিতের সূত্র বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতেছিল কিন্তু মনের মধ্যে এ ও বি পরস্পর মিশিয়া যেন গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে। চাকরের মারফতে চা আসিতে না আনিতে রমলা আবার আসিয়া উপস্থিত হইল—সঙ্গে তাহার ম্যাগাজিন।

অমল চা খাইতে খাইতে অত্যন্ত আগ্রহেই পৃষ্ঠা উল্টাইতেছিল। কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়িয়া সে হাসিতেছিল—কবিতার ত্রুটি বা অক্ষমতাই তাহার কারণ নয়। কবিতাটি তাহার সুপরিচিত এবং বি-এ পড়িবার সময় তাহার যে কবিতাটি কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই আজ বেমানান একটি নাম লইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। অমলের হাসি আত্ম-গোপন করিতে পারে নাই তাই রমলা বলিল—হাস্‌ছেন যে!

অমল আর একটু হাসিয়া বলিল—চমৎকার, চমৎকার হ'য়েছে!

—ঠাট্টা করবেন না।

—ঠাট্টা! বলেন কি, আপনার মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে তাকে উপেক্ষা ক'রবেন না, বা অকারণ বিনয়ে ও আত্মনির্ভরতার অভাবে তার অনাদর ক'রবেন না। অবশ্য আমি কাপালিক, তবুও ব'লতে পারি যে কাপালিকের অন্তরকে এ কবিতা দোল দিয়েছে—

রমলা এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় খুশী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সে বলিল—কবিদের মধ্যে কিপলিংকে আমার বড্ড ভাল লাগে, তার যথেষ্ট প্রভাব আমার মাঝে রয়েছে; তাই এ সব কবিতা ঠিক সাধারণ পাঠকের জন্যে নয় তারা বোঝে না। আপনার মধ্যে অন্ততঃ পাঠক হিসাবে যথেষ্ট অসাধারণত্ব রয়েছে—আপনার মত সমালোচক আমার যথেষ্ট উপকার ক'রবে।

—হ্যাঁ সাধ্যমত উপকার ক'রতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত কিন্তু যে কিপলিংএর প্রভাব আপনার মাঝে রয়েছে তার অভাব ঘটলে আপনি যে নিরুপায় হ'য়ে পড়বেন—মানে, প্রভাবটা কাটিয়ে উঠ্‌লে কবিতা যদি এমন সুন্দর আর না থাকে?

—প্রথম প্রথম তরুণ লেখক লেখিকার মধ্যে কারও না কারও প্রভাব দেখা যাবেই, অতএব ও ব্যঙ্গ আপনি না ক'রলেও পারতেন।

অমল গম্ভীর হইয়া বলিল—আমাকে একেবারেই ভুল বুঝেছেন মিস্ মিত্র, ব্যঙ্গ নয় ওটা স্তুতি—বড় ভাবকে আয়ত্ত ক'রতে হ'লে জগতের ভাবরাজ্যের সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক।

রমলা বলিল—ঠিক তাই।

—আপনার মারফতে সেই ভাবরাজ্যের অস্পষ্ট আলোক লাভ ক'রেছি বলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো।

রমলা স্মিতহাস্যে বলিল—থাক্, আপনার বিনয় বৈষ্ণব-বিনয়ের মত শোনাচ্ছে। আচ্ছা উঠি, খোকা রাগ ক'রছে—কাল আলোচনা হবে, কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাদকতাপূর্ণ একটা চাহনি হানিয়া বলিল—আপনার হাসি সর্ব্বদাই দ্ব্যর্থক—ভেবে পাই না, ওটা ব্যঙ্গ না কি?

—বিধাতা আমাকে যথেষ্ট কার্পণ্য ক'রেছেন সেটা আজ বুঝেছি। (ক্রমশঃ)

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

ভারতসরকারের নূতন অর্থ-সচিব

ভারতসরকারের সাধারণ অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটাইয়া স্বনামধন্য অর্থসচিব সার জেরেমী রেইসম্যান বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ঘটনা পরম্পরায় যুদ্ধের জালে জড়াইয়া পড়া ভারতের রাজকোষ সম্মিলিত যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্যের নামে যদেচ্ছ ব্যবহার করিবার কীর্ত্তি ত সার জেরেমীর স্বদেশবাসীর দ্বারা পরম সমাদৃত হইবে, কিন্তু যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের তীব্র পেষণে মুমূর্ষু ভারতবর্ষ তাঁহার এই অবিমৃষ্যকারিতার মাশুল যোগাইতে আগামী সম্ভাবনাময় দিনগুলিতেও যে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই ব্যর্থ থাকিয়া যাইবে, এমন দুর্ভাবনা আজ এদেশের হিতৈষী অনেকের মনে জাগিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থসচিব নূতন নূতন করভার স্থাপন করিয়া ভারতের রাজস্ব তহবিল বাড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতেও সর্ব্বগ্রাসী সামরিক ব্যয়ের যে অংশ মিটান সম্ভব হয় নাই, তাহা মিটাইয়াছেন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া। কিন্তু এই ঋণের বোঝা হইতে একদা যে ভারতবর্ষকে মুক্তি দিতে হইবে, একথা অস্থায়ী অর্থসচিব তাঁহার কার্য্যকালের কর্ম্মব্যস্ততার আভিজাত্যে স্বীকার করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। সার জেরেমীর এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত একচক্ষুতার জন্যই বলিতে গেলে ভারতসরকারের যুদ্ধকালীন বাজেটসমূহে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বা ভারতের শিল্পপ্রসার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন আগ্রহই দেখা যায় নাই। অথচ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যাঁহারা নিতান্ত অল্প সংবাদও রাখেন তাঁহারা জানেন যে, এদেশে সামান্য সরকারী সহযোগিতা হইলেই যথেষ্টসংখ্যক অত্যাবশ্যক শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে এবং এখানকার প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও সুলভ শ্রমসম্ভার ভারতকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশরূপে গড়িয়া তুলিবারও সম্পূর্ণ উপযোগী। তাছাড়া যুদ্ধের অবশ্য প্রয়োজনে যে নগণ্য শিল্পপ্রগতি এদেশে সম্ভব হইয়াছে এবং জোগানদার ও ব্যবসাদারদিগের সাময়িক সাফল্যে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনের হাতে এখন কিছু টাকা আসিয়াছে, তাহাদের দৌলতে স্বাভাবিকভাবে ভারতসরকারের আয়করজনিত আয় পূর্ব্বের অনূর্দ্ধ ২০ কোটি টাকার স্থানে বর্ত্তমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ২ শত কোটি টাকায়; এদেশে যথেষ্ট পরিমাণ শিল্পাদি প্রসারিত হইলে এবং সেই শিল্পজাত সামগ্রীসমূহের বাজার গড়িয়া উঠিবার জন্য অর্থের অন্তর্দেশীয় প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইলে ভারতসরকারের আয়কর বা অন্যান্য খাতে আর কেবলমাত্র এখনই বাড়িয়া যাইত না, রাজস্ব তহবিলে স্থায়ী আয়বৃদ্ধির একটা ব্যবস্থা হওয়াও সম্ভব ছিল।

যাহা হউক, অতীতকে টানিয়া আনিয়া তাহার আলোচনায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। সার জেরেমী রেইসম্যানের কার্য্যকাল অন্তে সার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস ভারতসরকারের অর্থসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন এবং এখন তিনি কিভাবে ভারতসরকারের অর্থনীতি পরিচালনা করিবেন তাহার উপরও ভারতের শুভাশুভ বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। অবশ্য অনেকের বিশ্বাস যে, সামরিক অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ রক্ষণশীল সার আর্চিবল্ড সামরিক স্বার্থরক্ষায় সার জেরেমীর পদাঙ্কই অনুসরণ করিবেন এবং ভারতের বেসামরিক সমৃদ্ধি সাধনের যে সকল

সাহস ও ঔদার্য্যসাপেক্ষ পথ আছে, সেগুলি গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহার দিক হইতে এই যুদ্ধের সময় উল্লেখযোগ্য কোন সাড়াই পাওয়া যাইবে না।

অবশ্য কার্য্যকলাপ না দেখিয়া এখন হইতে নূতন অর্থসচিবের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া লাভ নাই। যুদ্ধ এখন প্রকৃতপক্ষে শেষ হইতে চলিয়াছে, সার আর্চ্চিবল্ডের সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধকালীন অর্থসচিব না হইয়া যুদ্ধোত্তর কালেও কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ যখন অর্থসচিব থাকিবার আশা আছে, তখন তিনি সেই যুদ্ধোত্তরকালের আর্থিক জগতের অনিবার্য্য মন্দাভাব অতিক্রম করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজন করিবেন, ইহা আশা করা মোটেই অন্যায় নহে। আমরা প্রকৃতই বিশ্বাস করি যে, দায়িত্ব-সম্পন্ন পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সার আর্চ্চিবল্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং সেইরূপ অনুমানে করিয়াই আমরা কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

অর্থসচিবকে বর্ত্তমানে ভিতর ও বাহির উভয় দিক হইতে সংস্কারসাধন করিয়া ভারতের আর্থিক ভারসাম্য রক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। বাহিরের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলা যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার লণ্ডন অফিসে সঞ্চিত ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটির কথা। সার জেরেমীর আমলেও এই ষ্টার্লিং পাওনা আদায় সম্পর্কে এদেশে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের দাবী বলিষ্ঠ না হওয়ায় সেই আন্দোলন কার্য্যতঃ ব্যর্থ হইয়াছে। এই পাওনা টাকার বিনিময়ে ভারতে শতকরা তিন টাকা সুদে ঋণপত্র বিক্রীত হইয়াছে, এদেশে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, সরকারী আর্থিক সঙ্গতি স্বর্ণাভাবে বিপন্ন হওয়ায় জনসাধারণের নিকট ভারতসরকারের মর্য্যাদাও কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাছাড়া এই পর্ব্বতপ্রমাণ পাওনা টাকার বিনিময়ে ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে যদি যথেষ্ট পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী হইত, তাহা হইলেও ভারতে শিল্পপ্রসার সম্ভব হইয়া নূতন যুগের সূচনা হইতে পারিত। সার আর্চ্চিবল্ড যদি এদেশের অর্থ নৈতিক ভিত্তি সত্যই দৃঢ় করিতে চান, তাহা হইলে ভারতের পাওনা এই টাকা আদায় করিবার চেষ্টা তাঁহাকে করিতেই হইবে। তবে আর্থিক হীনতার জন্য ব্রিটেন যদি একান্তই এখন দেনা শোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে এবং পাওনা টাকার অধিকতর সুদ সংগ্রহের ব্যাপারে অর্থসচিবের অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ট্রেজারী বিলে লগ্নী হইয়া শতকরা ১ টাকা হারে সুদ লাভ করিতেছে, অথচ এখনও ব্রিটেনে শতকরা ২ টাকা সুদের অনেক স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ঋণপত্র বাজারে বিক্রীত হইতেছে। যে টাকার জন্য ভারতসরকারকে ভারতে সুদ দিতে হইতেছে গড়ে শতকরা ৩ টাকা হিসাবে, তাহার জামিন স্বরূপ গচ্ছিত অর্থের শতকরা ১ টাকা হারে সুদ আদায় মানে ভারতের বাৎসরিক বহু কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতসরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল ১২ শত কোটি টাকার সামান্য বেশী, এইভাবে ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক খরচ মিটাইবার উপলক্ষে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ সালের শেষে ২ হাজার ২ শত কোটি টাকায় পৌঁছাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই ঋণ শোধ দেওয়াই শুধু বিবেচনার বিষয় নহে, ইহার জন্য বৎসরের পর বৎসর সুদের দরুণ ভারতের যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও অর্থসচিবের অবশ্য বিবেচনা করা উচিত।

ইহার উপর ভারতে এখন অন্তর্দেশীয় যে অর্থ-নৈতিক ক্ষতি হইতেছে তাহাও উপেক্ষার বস্তু নয়। বর্ত্তমানে সরকারী সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগেই বিপুল পরিমাণ খরচ হইতেছে, অথচ সেই খরচের সবটাই যে ন্যায্য হইতেছে এমন কথা সত্যই জোর করিয়া বলা যায় না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইউরোপীয় দলের দলপতি মিষ্টার টাইসনের বেসামরিক বিভাগের ব্যয়বাহুল্য কমাইবার যে ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সরকারী বেসামরিক বিভাগের অযথা ব্যয়বাহুল্য সম্পর্কে সচেতন আছেন এবং তাঁহারা সত্যই চান যে, দরিদ্র ভারতের রাজকোষের এই অপব্যয় বন্ধ হউক। সামরিক বিভাগের অন্যায় খরচ সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ সরকারীভাবে জানানো হয় নাই সত্য, কিন্তু ভারত-সীমান্ত হইতে যুদ্ধ সরিয়া গিয়া যখন প্রকৃতই ভারতকে বিপদমুক্ত করিয়াছে, তখন আকণ্ঠ ঋণভারে জর্জ্জরিত ভারতের স্কন্ধে এখনো বৎসরে ৪ শত কোটি টাকার বেশী সামরিক ব্যয় চালাইবার যৌক্তিকতা কি? ভারত যে আত্মনির্ভরশীল নহে একথাতো সকলেই জানে, এখন সিঙ্গাপুর, মালয় বা প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের কবল হইতে মুক্ত করিবার যে যুদ্ধ চলিবে তাহার ব্যয়ভারের একাংশ বহনের আর্থিক দায়িত্ব হইতে মিত্রশক্তি যাহাতে ভারতকে রেহাই দেন, সেবিষয়েও চেষ্টা করিতে আমরা সার আর্চ্চিবল্ডকে অনুরোধ জানাইতেছি।

সব শেষে আমরা আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অর্থসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতের যুদ্ধকালীন সামরিক ব্যয়বাহুল্য মিটাইতে ভারতসরকারকে নিত্যনূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিতে হইতেছে এবং তাহার জন্য উপযুক্ত সুদ দানেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে। এইভাবে চলতি ঋণপত্র সমুদয় এবং নূতন ঋণপত্রগুলির উপর দেয় সুদের পরিমাণ বহু কোটি টাকায় পৌঁছাইয়াছে এবং আমাদের মনে হয় সার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ চেষ্টা করিলে এই সুদের দরুণ একটি মোটা টাকা বাঁচাইয়া দিতে পারেন। অবশ্য ১৯৩১ সালে ভারতসরকার যেখানে শতকরা ৬ টাকা ৪ আনা হারে সুদ দিতেন, সেখানে বর্ত্তমানে সাধারণতঃ ৩ টাকা হারে সুদ প্রদানের ব্যবস্থা অর্থসংগ্রহনীতিতে সাফল্যেরই পরিচায়ক, কিন্তু এই সাফল্য স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, যে যুগ বর্ত্তমানে চলিতেছে তাহা সস্তা টাকার (Cheap money) যুগ এবং আগে যেখানে শতকরা ২ টাকা সুদের প্রতিশ্রুতি দিয়াও সাধারণ দেশীয় ব্যাঙ্কে চলতি আমানত জুটিত না, এখন শতকরা মাত্র ৪ আনা সুদ দিয়াই যে কোন ব্যাঙ্ক অনায়াসে প্রভুত পরিমাণ আমানত জমা নিতেছে। মাঝারি শ্রেণীর দেশী ব্যাঙ্কে পর্য্যন্ত এখন এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের সুদের হার শতকরা ২ টাকা ৮ আনায় নামিয়া আসিয়াছে, এই বাজারে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে শতকরা ৩ টাকা

হারে ঋণপত্র বিক্রয় মোটেই কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে এবং এইজন্য যে আর্থিক ক্ষতি হইতেছে তাহাও ভারতবর্ষের স্বীকার করিবার কথা নহে। তাছাড়া গভর্ণমেন্টের উপর দেশবাসীর যে বিশ্বাস আছে তাহাতো শতকরা বার্ষিক ৫।৩ আনা সুদে সাপ্তাহিক ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় দেখিলেও বুঝা যায়। শতকরা ৩ টাকা ৮ আনা সুদের যে কোম্পানীর কাগজ আছে, তাহার মূল্য প্রত্যর্পণের জন্য নূতন অল্প সুদের ঋণপত্র বাহির করিলেও গভর্ণমেন্টের সুদের দরুণ অনেকগুলি টাকা প্রতি বৎসর বাঁচিয়া যাইবে। অবশ্য এই সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের উপর আমাদের দেশের বহু হাঁসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠান চলিতেছে এবং এই কাগজ পরিশোধ করার সময় গভর্ণমেন্টের অবশ্য উচিত এই সকল প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

যাহা হউক, মোটের উপর আমরা আশা এবং বিশ্বাস করি, নূতন অর্থসচিব তাঁহার নিজের সহিত ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিবের কার্য্যকালের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন এবং মনে রাখিবেন যে, যুদ্ধ যে কোন দিন শেষ হইয়া যাইবার পর তাঁহাকে যুদ্ধোত্তর কালের অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। সার জেরেমী আর যাহাই করিয়া থাকুন, যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি একদিক হইতে দক্ষতার সহিত যুদ্ধকালীন সামরিক অর্থনীতি পরিচালনা করিয়াছেন এবং যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূল হইয়া উঠায় সম্মিলিত সামরিক প্রচেষ্টায় তাঁহার সাহায্য আশাতীত স্বীকৃতি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই দেশব্যাপী অর্থাভাব ও বেকার-সমস্যার সম্মুখীন হইবেন। এই অনিবার্য্য দুর্বিপাক হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে তাঁহার আশু কর্ত্তব্য —ভারতে নূতন নূতন শিল্পাদি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া কর্ম্মচ্যুত এই সকল লোকের মোটামুটি কর্ম্মসংস্থান করিয়া দেওয়া এবং এইভাবে উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া পাইলে ইহারা এবং শিল্পপতিগণ দেশের বা গভর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সক্রিয় সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

ভারতের কাপড়ের কলে উৎপাদন সমস্যা

১৯৪৩ সালের বাংলা, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি প্রদেশের ভীষণ লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতেই ১৯৪৫ সালে ভারতে মারাত্মক বস্ত্রাভাব দেখা দিয়াছে। ভারতের শিল্পবিপ্লবের অন্যতম সার্থক নিদর্শন হিসাবে আমরা বস্ত্রশিল্পের কথা বলিয়া থাকি এবং যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ বস্ত্রের দিক হইতে প্রায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ভারতের কাপড়ের কলগুলির সাফল্যই এই আত্মনির্ভরশীলতার কারণ এবং এদেশের ৪০১টি কাপড়ের কলে এখন যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে না হইলেও বহুলাংশে আমাদের বস্ত্রাভাব মিটাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধকালীন অন্যান্য বহু অসুবিধার মত কাপড়ের অভাবও আজ আমাদের সম্মুখে দারুণ সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে এবং নানা কারণে ভারতের মিলজাত কাপড় (যাহার দাম উপরে লেখা থাকে এবং ক্রেতারা যাহা ন্যায্যমূল্যে পাইবার দাবী করিতে পারে) বর্ত্তমানে শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, প্রকৃতপক্ষে অপ্রাপ্য পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতে এখন কাপড়ের এই যে টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সরকারী বণ্টননীতিই বলিতে গেলে বেশী দায়ী। একে তো সময়মত কয়লার জোগান না পাওয়ায় ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে অনেক সময় কাপড় তৈয়ারী বন্ধ রাখিতে হইয়াছে, তাহার উপর ভারতের কাপড় হইতে সামরিক বিভাগের জন্য বৎসরে ৯০ কোটি গজ এবং বাহিরে রপ্তানীর জন্য বৎসরে ৬০ কোটি গজ বস্ত্র বরাদ্দ করায় এদেশের আমদানী বন্ধ-জনিত বস্ত্রাভাব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাছাড়া মোটামুটি মাথাপিছু বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও সামরিক বিভাগের লোকেরা এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা বাজারে কাপড় কিনিতে পাইয়াছে বলিয়াও খোলা বাজারে সামান্য পরিমাণ কাপড় শেষ পর্য্যন্ত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ক্রেতাদের সময় ও সুবিধার অপেক্ষায় পড়িয়া থাকিতে পায় নাই।

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার মিলজাত বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন এবং মিলের কাপড়ের উপর দরের ছাপ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু মিলজাত বস্ত্রের যথেষ্ট জোগানের ব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এদিকে মিলের কাপড়ের অভাবের সুযোগে তাঁতের কাপড়ের ব্যবসাদারগণ রাতারাতি রাজা হইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, কারণ তাঁতের কাপড়ের কোন নিয়ন্ত্রিত মূল্য নাই এবং চাহিদা ও জোগানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে যে কোন দামে তাহা বিক্রয় করিলেও বর্ত্তমানে প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই। অবস্থা যখন এইরূপ, তখন সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার সুতা জোগানের ব্যাপারে মিলগুলির উপর সমূহ অবিচার করিয়া তাঁতের জন্য অধিকতর সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এইরূপে তাঁতের কাপড় তৈয়ারীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সুতা পাওয়া গেলে এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্য সম্বলিত মিলের কাপড় বাজারে পাওয়া না গেলে তাঁতের কাপড় খোলা বাজারেই এমন অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতে থাকিবে যাহা স্পর্শ করা প্রকৃতই সাধারণ দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব নহে।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম দিকে টেক্সটাইল কমিশনার মিলগুলিকে একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়া দেন যে, ১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর মিলে যতগুলি তাঁত কাজ করিয়াছিল, এখন তাহার চেয়ে বেশী তাঁত কাজ করিতে পারিবে না এবং উক্ত দিন পর্য্যন্ত এক বৎসরে মাসে গড়ে মিলগুলি যত ঘণ্টা কাজ করিয়াছিল এখন মাসে তদপেক্ষা বেশী সময় কাজ করিতে পারিবে না। এইভাবে সুতা ব্যবহার বা কাপড় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারত সরকার যে আদেশ দেন তাহার প্রতিবাদে সমগ্র দেশে তীব্র আন্দোলন দেখা যায় এবং সকলেই বলেন যে, মিলের কাপড় দরে সস্তা এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্য হওয়ায় মিলে বস্ত্র উৎপাদন বেশী হইলেই দরিদ্র জনসাধারণের অধিকতর সুবিধা হইবে। এই প্রতিবাদ লক্ষ্য করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য ভারত সরকার মতের পরিবর্ত্তন করেন এবং গত ৩১শে মার্চ্চের গেজেট অফ ইণ্ডিয়ায় এই পরিবর্ত্তিত সিদ্ধান্তের

উপর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তবে এই পরিবর্ত্তিত সিদ্ধান্তও যে দেশবাসীর সম্পূর্ণ দাবী পূরণ করিয়াছে এমন কথা মনে করাও ভুল, কারণ, এই নূতন বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ব্বেকার নির্দ্দেশগুলিই কার্য্যতঃ বজায় আছে এবং যে নূতন বিধানটি সংযোজিত হইয়াছে তাহা এই যে, যে সকল মিলে সুতা তৈয়ারীর এবং কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা আছে তাহারা ১৯৪৪ সালে যে পরিমাণ সুতা বাহির হইতে কিনিয়াছিল, এ বৎসর তাহার এক চতুর্থাংশ ভাগ মাত্র কিনিতে পারিবে এবং ১৯৪৪ সালে যে পরিমাণ সুতা বাজারে বিক্রয় করিয়াছিল, এ বৎসর তাহার একচতুর্থাংশ বিক্রয় করিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, এই নূতন নির্দ্দেশের দ্বিতীয়ার্দ্ধটুকু বড় বড় সুতা তৈয়ারী ব্যবস্থা সম্বলিত কাপড়ের কলের উৎপাদন বৃদ্ধির কতকটা পরিপূরক, কিন্তু প্রথমার্দ্ধে সুতা ক্রয়ের ব্যাপারে মিলগুলির উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে তাহাতে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের কিছু সুবিধা হইবার আশা থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত সুতার অভাবে মিলের কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ অবশ্যই হ্রাস পাইবে।

আসল কথা, ভারতবাসীর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং এখন ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ব্যাপারে তাহাদের কিছু কিছু সুবিধা না দিলে তাহারা শেষপর্য্যন্ত কোনক্রমে প্রাণধারণেও সমর্থ হইবে না, একথা ভারতসরকার সম্যকভাবে জানিয়াও ইচ্ছা করিয়া স্বীকার করেন না। বাস্তবিক মিলের কাপড় বেশী উৎপন্ন হইলে ভারতবাসীর সুবিধা কত এবং মিলের নিয়ন্ত্রিতমূল্যের কাপড় বাজারে না থাকিলে অনিয়ন্ত্রিত তাঁতের কাপড় বাজারে কিরূপ মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ যেন জানিয়াও না জানিবার ভান করেন। গত ১২ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতসরকারের বাণিজ্যসদস্য সার আজিজুল হককে প্রশ্ন করা হয় যে তাঁতের কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ হয় নাই, অথচ তাঁতের কাপড়ের জন্য সুতা জোগানোর সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, ইহার ফলে ভারতবাসীকে প্রয়োজনীয় বস্ত্রক্রয়ে কি নূতন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না? ইহার উত্তরে মাননীয় সদস্য পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন যে সরকার কাপড় যোগানোর ভার লইতেছেন, প্রয়োজনমত ন্যূনতম পরিমাণ কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের দায়িত্ব, সেই কাপড় মিলে বা তাঁতে কি ভাবে উৎপন্ন হইতেছে তাহাও দেখা তাঁহাদের কাজ নহে। সার আজিজুলের জনসাধারণের আর্থিক স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। মিলের জন্য সুতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া যখন ভারতসরকার মিলজাত বস্ত্রের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, তখন ভারতবাসী কি আশা করিতে পারে না যে তাঁতের কাপড় যাহাতে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন মূল্যে বাজারে বিক্রীত হইতে পারে, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁতের কাপড়ের উপরও নির্দ্দিষ্ট মূল্য লিখিয়া দিবেন এবং বস্ত্র রেশনিং করিয়া যে কোন উপায়ে সকলের পক্ষে বরাদ্দ বস্ত্র সহজলভ্য করিয়া তুলিবেন। বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালী সিদ্ধান্তে জনসাধারণের স্বাভাবিক কষ্ট যদি বাড়িয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে আহা কী নিতান্ত দুঃখের কথা হইবে না? ৪-৫-৪৫

পোড়ো মন্দির

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, কাব্যভারতী

সেই যে প্রভাতে যাত্রা আমার জগতে ক'রেছি সুরু ;
অজানার ভয়ে শঙ্কিত-চিত কাঁপিয়াছে দুরু দুরু।
চলার পথেতে কত হাসি গান,
কুড়ায়েছি যত বেদনার দান,
স্মৃতির পিছনে তারা অবসান ;
বাণী যত অতিথির,
নদীর কিনারে প'ড়ে আছে দেখি ভাঙ্গা পোড়ো মন্দির।

জীবনের পথে এসেছিল যারা ফেলে আসি কতদূর !
সুমুখের পথে আমি শুধু চলি কানে বাজে নবসুর।
কত সন্ধ্যায় কত যে সকালে,
কত সাথী মোরে হাসালে কাঁদালে,
আমার মাঝেতে কত যে জ্বালালে,
দীপশিখা আরতির ;
পশ্চাতে রয় বেদনার ভারে ভাঙ্গা পোড়ো মন্দির।

উৎস যে মোর—যাত্রাপথের মিলাল আঁধার মাঝে,
ভবিষ্যতের আলো আর ছায়া আনে মায়া সবি কাজে ;
জীবনের পথে যত মোর স্মৃতি,
গাহে তারা সবে অতীতের গীতি,
বিগতের মাঝে রহে পরিচিতি ;
আলো ছায়া সন্ধির,
অতীতের বুক ভ'রে আছে শুধু ভাঙ্গা পোড়ো মন্দির।
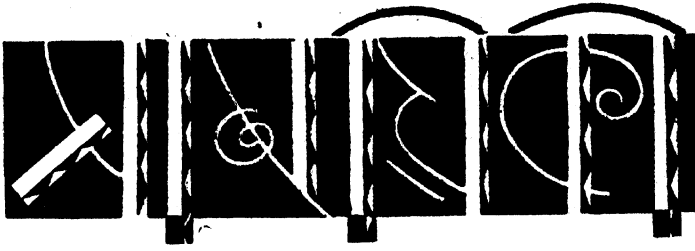
যুদ্ধের শেষ—

গত ৭ই মে সোমবার সন্ধ্যায় খবর পাওয়া গিয়াছে যে জার্ম্মানীর সকল সৈন্য বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কাজেই গত প্রায় ৬ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ইউরোপে যে ধ্বংসলীলা চলিতেছিল তাহার শেষ হওয়ায় দেশের সর্ব্বত্র উল্লাস দেখা দিয়াছে। ভারতেও বিজয়-উৎসবের আয়োজন হইয়াছে, তদুপলক্ষে ২।৩ দিন সকল সরকারী অফিস-আদালত বন্ধ করা হইয়াছে ও সরকারী বাড়ীসমূহ পতাকা ও আলো দ্বারা সাজান হইয়াছিল। গত প্রায় ৬ বৎসর কাল আমরা যে দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে বাস করিতেছি, তাহার অবসান হইবে, এই আশায় আমরাও আশান্বিত হইয়াছি। কিন্তু এই বিজয়-উৎসরের সহিত পরাধীন ভারতবাসীর আন্তরিক যোগ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? যুদ্ধান্তের পূর্ব্বে ভারতবাসীরা তাহাদের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করে নাই এবং আজও তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। লর্ড ওয়াভেল বিলাতে যাইলে লোকে এ বিষয়ে বহু আশা পোষণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই। কাজেই যুদ্ধ বিরতি বিজয়ী জাতির মধ্যে যতই জয় ও উল্লাসের কারণ হউক না কেন আমাদের মত পরাধীন নিগৃহীত জাতির তাহাতে কোন আনন্দ নাই।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—

গত ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার বাঙ্গালার সর্ব্বত্র কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৫ তম বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি রক্ষা সমিতির সভাপতি সার তেজবাহাদুর সাপ্রু ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আবেদন-মত গত ১লা মে হইতে ১৫ দিন দেশের সর্ব্বত্র রবীন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্পাদক সুরেশবাবুর চেষ্টায় ইতিমধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে—এই এক পক্ষ কালের মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন। ২৫শে বৈশাখ সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে মহাসভা হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় সকল সুধী ব্যক্তিই সমবেত হইয়াছিলেন। স্মৃতি সমিতি সংগৃহীত অর্থে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোস্থ পৈতৃক গৃহটি বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে ক্রয় করিয়া তথায় একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে স্থির হইয়াছে। সুরেশ-বাবুর মত উৎসাহী কর্ম্মীর চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব হইবে না বলিয়াই সকলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের দানের কথা আমরা প্রতি বৎসর এই দিনে স্মরণ করিলেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। আমরা এই পবিত্র দিবসে রবীন্দ্র-নাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতায় কাপড় আটক—

গভর্ণমেণ্টের লোকে ৫।৬ দিনে কলিকাতার ১৫ শতেরও অধিক দোকানে ও গুদামে হানা দিয়া সকল কাপড় শীলমোহর দ্বারা আটক করিয়াছিল। গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে সে কাজ ৫।৬ দিন চলিয়াছিল। তাহার পর ২রা এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তাহারা মোট ১৪৩৬টি দোকান বা গুদামের শীল খুলিয়া দিয়া প্রায় কোটি টাকার কাপড় ব্যবসায়ীদের হাতে দিয়াছে। কিন্তু ঐ কাপড় কোথায় গেল, লোক তাহার সন্ধান পায় না! গত এক মাসেরও অধিককাল টাকা দিয়া বাজারে ক্রয় করিবার কাপড় নাই।

ফ্রিস্কোয় ভারতীয় সাংবাদিক—

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনের পক্ষ হইতে ৩ জন ভারতীয় সাংবাদিককে সান্‌-ফান্সিস্‌কো

সম্মিলনে পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইলে প্রথমে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে ও নিম্নলিখিত ৩ জন সাংবাদিক গত ২০শে এপ্রিল করাচী হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম (১) শিবরমণ্ (দিনমণি পত্রিকা) (২) সারবল্ল (বোম্বাই ক্রনিকেল) ও (৩) অমৃতলাল শেঠ (জন্মভূমি)। এক সময়ে বাঙ্গালার সাংবাদিকরা সকল ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিত। আজ এই দলে একজনও বাঙ্গালী নাই। ইহা কম পরিতাপের বিষয় নহে। যাহা হউক, ইহারা ফিরিয়া আসিলে দেশ ফ্রিস্‌কো সম্মিলন সম্বন্ধে সত্য ঘটনা জানিতে পারিবে।

ভারতের প্রতিনিধি—

তিন জন ভারতীয় নেতা ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে ফ্রিস্‌কো সম্মিলনে যোগদান করিতে গিয়াছেন—(১) সার রামস্বামী মুদালিয়ার (২) সার ফিরোজ খাঁ নুন (৩) সার ভি-টি কৃষ্ণমাচারী। ইঁহারা যে ভারতের প্রতিনিধি নহেন ও ভারতবাসীর পক্ষ হইতে কোন কথা বলিবার অধিকার যে তাঁহাদের নাই, সে কথা মহাত্মা গান্ধীও সকলকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও মৌলনা আবুল কালাম আজাদকে যদি আজ ফ্রিস্‌কো সম্মিলনে প্রেরণ করা হইত, তাহা হইলে সকলে তাহাদের ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিত। যে ৩ জন গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বৃটীশ সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী ও কৃপাপ্রাপ্ত—কাজেই তাঁহারা প্রভুদের মনোরঞ্জন করিয়া কথা বলিতে ক্রটি করিবেন না।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন—

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য সার জন উড্‌হেডকে সভাপতি করিয়া যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ দিল্লীর দপ্তরে পেশ করা হইয়াছে। কমিশন সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ৩ পক্ষকেই তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছে—(১) ভারত গভর্ণমেণ্ট—তাঁহারা খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর রাখেন নাই—এবং প্রথম দিকে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তাঁহাদের অবহিত হইতে বলিলেও তাঁহারা দায়িত্ব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (২) বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের দোষ ক্রটির সীমা ছিল না—যতপ্রকার অন্যায় কার্য্য আছে, তাহার সকলগুলিই বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পরিচালকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (৩) অতিলোভী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—তাহারা যখন অতিরিক্ত লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন গভর্ণমেণ্ট তাহাতে কোনরূপ বাধা দেন নাই। কাজেই দেশের ব্যবসায়ীরা দেশবাসীকে খাইতে না দিয়া হত্যা কার্য্যে সাহায্য করিয়াছে। কমিশনের মত, বাঙ্গালায় ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে ২০ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। কমিশন এক খণ্ড রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিয়াছেন উহা প্রথম খণ্ড। তাঁহারা সকলে এখন কয়েক মাস কুন্নুরে বাস করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রস্তুত করিবেন। এই বিবরণ প্রকাশিত হইলে গভর্ণমেণ্ট যদি অপরাধীদের ক্রমে ক্রমে সন্ধান করিয়া তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তবেই কমিশন নিয়োগ করা সার্থক হইবে। নচেৎ এত অর্থ ব্যয় করিয়া বিবরণ সংগ্রহ, প্রস্তুত ও প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হইবে না।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী—

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াও চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ৯৩ ধারা জারী করিয়া গভর্ণর শাসনভার নিজের হস্তে গ্রহণ করায় মন্ত্রীত্ব যাওয়ার পর তিনি চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দেন। তাঁহার স্থানে গত ২৭শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বিনা বাধায় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শৈলবাবু হাওড়া সালিখার সুপরিচিত স্বর্গত রামলাল মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ও স্বর্গত আশুতোষের পুত্র। তিনি ১৯১৯ সালে বি-এ পাশ করিয়া ১৯২৬ সাল হইতে এটর্ণী হইয়াছেন। গত ৪০ বৎসর কাল তাঁহাদের বাড়ীর কোন না কোন ব্যক্তি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার আছেন। শৈলবাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩৬ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্ত্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান মিঃ মহম্মদ সরিফ খাঁ সর্ব্বপ্রথমে শৈলবাবুর নির্ব্বাচনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

জগত্তারিণী স্বর্ণপদক—

খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর ভারতবর্ষের পাঠকগণের নিকট নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার উপন্যাস পাঠ করেন নাই বাঙ্গালা দেশে এমন কোন পাঠক নাই, তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতার নূতন মেয়র—

গত ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় হিন্দু মহাসভা দলের নেতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বতন্ত্র মুসলেম দলের নেতা মিঃ সামসুল হক যথাক্রমে মিঃ ডি-জে কোহেন ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষকে

মেয়র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরাজিত করিয়া মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবুর বয়স ৫৮ বৎসর, তিনি আলিপুরের উকীল। ১৯৪০ সালে তিনি ১নং ওয়ার্ড হইতে কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। বর্ত্তমানে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক। তিনি আলিপুর উকীল সভার পূর্ব্বে সম্পাদক ছিলেন, এখন সহকারী সভাপতি। কিছুদিন তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ২৪ পরগণা বসিরহাটের নিকটস্থ ধলতিথায় তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি। ডেপুটী মেয়র মিঃ সামসুল হকের বয়স ৬৮ বৎসর—তিনি ১৪নং ওয়ার্ড হইতে গত ২১ বৎসর কাল কাউন্সিলার আছেন। মিঃ হক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমীদার। তাঁহার বাড়ী খুলনা জেলার বাগেরহাটের কান্দারপাড়া গ্রামে।

অধ্যাপক দাশগুপ্তের দান—

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিজ্ঞানের 'পঞ্চম জর্জ্জ' অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সি-আই-ই মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের লাইব্রেরী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী গবেষণাগারে দান করিয়াছেন। ১৯১৬ হইতে আজ পর্য্যন্ত অধ্যাপক দাসগুপ্ত ঐ লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সময় তিনি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের উদ্যোগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত লাইব্রেরী পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হইবে।

শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি দাবী—

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিয়া বিলাতে কমন্স সভার বিরোধী দলের নেতা মিঃ আর্থার গ্রীণউডের নিকট নিম্নলিখিত নেতাদের স্বাক্ষরিত এক তার প্রেরণ করা হইয়াছে—(১) এ-কে-ফজলুল হক (২) কিরণশঙ্কর রায় (৩) সন্তোষকুমার বসু (৪) সামসুদ্দীন আহমদ (৫) হেমচন্দ্র নস্কর। গত ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাস হইতে শরৎবাবু জ্বরে ও বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছেন। উক্ত ৫ জন নেতা বাঙ্গালার সমগ্র অধিবাসীদের মনের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

শিক্ষক সমিতির রজত-জয়ন্তী—

গত ১লা বৈশাখ হইতে কলিকাতায় এবং বঙ্গের অন্যান্য নানা স্থানে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির রজত-জয়ন্তী উৎসব সপ্তাহ প্রতিপালিত হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সমিতি স্থাপিত হয়—স্বর্গীয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন ইহার প্রথম সভাপতি। বাঙ্গালা দেশে শিক্ষকগণের অবস্থা উত্তরোত্তর হীন হইয়া আসিতেছিল, সমিতি স্থাপনাবধি শিক্ষকগণের অবস্থা, চাকুরির স্থায়িত্ব, বেতন প্রভৃতি বিষয়ে কতকাংশে উন্নত হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। কলিকাতায়

সপ্তাহকালব্যাপী উৎসবের সভাগুলিতে বিচাপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক মিঃ হুমায়ুন কবির, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এবং অন্যান্য বহু জননেতা ও শিক্ষাব্রতী শিক্ষার আদর্শকে নানা দিক দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূল কয়েকটী বিষয়ে সকলের অভিভাষণেই একটা সুন্দর মিল দেখা গেল। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয় বিদেশীয় শাসকবর্গ দ্বারা আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে। সুতরাং এই পদ্ধতি জাতি-গঠনের পরিপোষক

শিক্ষক-সম্মিলন

হইতে পারে না। অথচ গত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া এই পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করিয়া সকলেই পরীক্ষায় পাশ করা ও চাকুরি খোঁজা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে না।

প্রশ্ন এই যে স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা কি অপেক্ষা করিয়াই থাকিব? ইহার উত্তরের ইঙ্গিত পাই, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের বক্তৃতায়। তিনি বলিয়াছেন—শক্তিমান (Dynamic) শিক্ষক শিক্ষার সমস্ত অপূর্ণতাকে শিক্ষাদানের গুণে পূর্ণ করিতে পারেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহনও বলিয়াছেন—পূর্ব্বে ছাত্রেরা শিক্ষা পাইত সাক্ষাৎ গুরুর নিকট হইতে, আর বর্ত্তমানে ছাত্রেরা শিক্ষা পায় পুস্তক হইতে—শিক্ষক সেই পুস্তকের পশ্চাতে থাকিয়া কত সহজে উহা আয়ত্ত করিয়া পাশ করা যায় তাহাই বলিয়া দেন মাত্র।

শিক্ষকের দায়িত্ব তাহা হইলে কত বেশি! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শিক্ষককে আমরা কৃপার পাত্র করিয়া রাখিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে দেখে না—ইহা নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বহির্ভূত। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের কাছে শিক্ষক অপেক্ষা পুলিশ বড়—সুতরাং শিক্ষকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। সমাজ ভাবে, আমরাই দরিদ্র—সুতরাং শিক্ষার জন্য যাহা দিতেছি ইহার অতিরিক্ত আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। হতভাগ্য শিক্ষক দেশপ্রেম বা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবশতঃই হউক বা অন্য কোনও কারণেই হউক, এতদিন কোনও রূপে শিক্ষার বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন।

আজ মহাযুদ্ধের ফলে দেশে যে নিদারুণ অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছেন দেশের শিক্ষক। ইহার ফলে বহু প্রবীণ অভিজ্ঞ শিক্ষক আজ অন্নসমস্যা সমাধানে অক্ষম হইয়া শিক্ষকতা বৃত্তি পরিহার করিয়া চাকুরি-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উপযুক্ত নূতন শিক্ষক সংগ্রহ করাও আজ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা পূরণ করিবে কে?

শিক্ষকগণের দুর্দ্দশা—

উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের দুর্দ্দশার শেষ নাই। গভর্ণমেণ্ট সকল বিভাগের কর্ম্মচারীদের জন্য যে সময়ে মাসিক ১৮ টাকা মাগ্‌গী-ভাতার ব্যবস্থা করিলেন, সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের দরিদ্র শিক্ষকগণের জন্য মাত্র মাসিক ৫ টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাও শিক্ষকগণ মাত্র ১ বৎসর কাল পাইয়াছেন। সকলেই আশা করিয়াছিল, এ বৎসর ঐ ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। উপযুক্ত শিক্ষক দেশে দুর্লভ হইয়াছে—পূর্ব্বে যে বেতনে শিক্ষক পাওয়া যাইত, এখন আর সে বেতনে শিক্ষক পাওয়া সম্ভব নহে। অথচ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়সমূহের আয় এমন বাড়ে নাই যাহা দ্বারা তাহারা অধিক বেতনের শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারে। সে জন্য শিক্ষকের অভাবে বহু বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যাইতেছে ও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যে কোন কর্ত্তব্য আছে, তাহা বোধহয় কেহ চিন্তা করেন না। মাগ্‌গী ভাতা বাড়াইয়া যদি সরকারী কর্ম্মচারীদের সমান করিয়া দেওয়া

হয়, তাহা হইলেও কতকটা উপকার হইতে পারে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির গত রজত জুবিলী উৎসবে অনেকেই বার বার এই সকল কথা বলিয়াছেন। এখন দেশ শাসনের ভার স্বয়ং গভর্ণর গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

বঙ্গীয় অধ্যাপক সম্মিলন—

গত ১৪ই এপ্রিল কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে নিখিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বন্ধুবিহারী ভট্টাচার্য্য ঐ সম্মিলনে সভাপতি হইয়া বলিয়াছেন—"আমাদের স্কুল ও কলেজসমূহে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহার সাহিত্যিক দিকটা প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক দেখা হয়। উহা অবাস্তব ও পুঁথিগত—সে জন্য ছাত্রদের সহিত প্রকৃত জগতের কোন পরিচয় হয় না। সে জন্য শিক্ষা লাভের পর ছাত্ররা তাহা দ্বারা নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না। সে জন্য গতানুগতিক শিক্ষার জন্য সাধারণের কোন আগ্রহ নাই। এই শিক্ষা প্রথা পরিবর্ত্তন করা না হইলে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই।" এই কথা সর্ব্বদা সকল বক্তৃতা মঞ্চ হইতে বলা হইতেছে, কিন্তু কে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবে?

আড়িয়াদহ পাঠাগারে স্মৃতিউৎসব—

১৬ই চৈত্র শুক্রবার ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে ২৪ পরগণা আড়িয়াদহ পব্‌লিক্ লিটারারি এসোসিয়েসনে ৭৫তম বার্ষিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হন। সভায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত "নাটক" সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী "সাহিত্যের উপাদান" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায় লাইব্রেরীর ইতিহাস ও কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। আবৃত্তি, সঙ্গীতাদির পর রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনীত হয়। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

প্রচারে বিপত্তি—

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হওয়ার পর হইতে লেখক, পুস্তক ব্যবসায়ী ও ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন অসুবিধা হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন ব্যবসায়িগণের বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্র প্রকাশেরও অসুবিধা হইয়াছে। ফলে ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের নানারূপ সামগ্রীর বিজ্ঞাপন টিনের প্লেট কাটিয়া কালি দিয়া দেওয়ালে আঁকিয়া দেওয়া সুরু করিয়াছেন। প্রচারপত্র হিসাবে যখন কেবলমাত্র কাগজের পোষ্টার আঁটা হইত তখন ঐ সকল বিজ্ঞাপনে গৃহের শ্রী নষ্ট করিত বটে, কিন্তু রৌদ্রে ও বর্ষায় তাহা কিছুদিন বাদে আপনা হইতেই উঠিয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে টিনের প্লেট কাটিয়া যে বিজ্ঞাপন দেওয়া সুরু হইয়াছে তাহা স্থায়ীভাবে গৃহের শ্রী ত নষ্ট করিতেছেই অধিকন্তু নানারূপ ঔষধের বিজ্ঞাপন কদর্য্য ভাষায় দেওয়ালের উপর স্থায়ীভাবে লিখিয়া দেওয়ার ফলে স্ত্রীপুত্র পরিজনসহ পথে হাঁটা লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল ব্যবসায়ী কদর্য্য ভাষায় এইরূপ প্রচার কার্য্য চালাইয়া থাকেন তাঁহাদের লজ্জা ও সম্মানের ভয় আছে বলিয়া আমরা মনে করি না; কিন্তু সরকার অথবা কর্পোরেশন কি এ বিষয় কিছু করিতে পারেন না?

আসাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন—

বিগত ১৩৫১ সালের ৩০শে চৈত্র হইতে ১৩৫২ সালের ২রা বৈশাখ পর্য্যন্ত তিন দিবস ধরিয়া নিখিল আসাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হইলেও আসাম প্রদেশ, অন্ততঃ আসামের অনেকাংশ, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক দিয়া যে বঙ্গদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত তাহা নিঃসন্দেহ। সংখ্যানুপাতের দিক দিয়া আসামপ্রদেশে যে বাঙ্গালীরই সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। এ অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া আসাম প্রদেশে যে এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিল ইহা পরম আনন্দের বিষয়। আমরা বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতের বাঙ্গালী সমাজের পক্ষ হইতে সম্মেলনের উদ্‌যোক্তৃগণকে অভিনন্দিত করিতেছি।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ৩০শে চৈত্র অপরাহ্নে। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশ সম্মেলনের উদ্বোধন করিলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সোম তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর মূল সভাপতি মিঃ ওয়াজেদ আলি সাহেব তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলে সন্ধ্যায়

সেদিনকার কর্ম্ম সমাপ্ত হয়। ১লা বৈশাখ সাহিত্য ও ইতিহাস শাখার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ডাঃ পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে ঐ দুই শাখার সভাপতিত্ব করেন।

২রা বৈশাখ পূর্ব্বাহ্নে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে লোকসাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়। তাহার পর শিশুসাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এই শাখায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-শাখার অধিবেশন হয়।

আসামবাসী বাঙ্গালীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে উক্ত অধিবেশনে যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তন্মধ্যে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক আগ্রহের দ্বারা এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয় প্রথম অধিবেশনের সম্পাদক ছিলেন। সম্মেলনের স্থায়ী সম্পাদকের পদেও তিনিই নির্বাচিত হইয়াছেন।

কবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—

খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ বার-এট-ল মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা ছোট আদালতের

কবি শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম-এ পাশ করিয়া তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে গিয়াছিলেন। গত কয়েক মাস তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগে এক উচ্চপদে কাজ করিয়াছিলেন। দেশ সেবার জন্য তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দুইবার কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সাহিত্য-বাসরের সম্পাদক এবং বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমাজের সম্মান বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা অবহিত।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী—

কলিকাতার খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়সমাত্র ৪৫ বৎসর এবং তিনি অবিবাহিত। তিনি সুদীর্ঘকাল 'ক্যালকাটা উইক্‌লি নোট্‌স' নামক আইন-বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার

বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

আইন-জ্ঞান ও তাহা লিখিয়া প্রকাশের শক্তির জন্য তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। তিনি বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় সাংবাদিক জগৎ প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ফণিভূষণবাবুর কর্ম্মশক্তিও যথেষ্ট এবং আমাদের বিশ্বাস, বিচারপতির কার্য্য করার সহিত তিনি দেশের সেবা করিয়া দেশবাসী সকলকে নানাভাবে উপকৃত করিবেন।

বাবাজী ব্রজমোহন দাস—

গত ৯ই এপ্রিল শ্রীধাম নবদ্বীপে খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত ও বৈষ্ণব ভক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহাশয় সাধনোচিতধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভু প্রচারিত ধর্ম্মের প্রসারের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। উচ্চশিক্ষিত ধনীর পুত্রের পক্ষে সর্ব্বস্ব ত্যাগ

করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের মাহাত্ম্য প্রচারে এইভাবে জীবন পণ করিতে অতি অল্প লোককেই দেখা যায়। তিনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয় করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সাফল্যলাভ করেন। সম্প্রতি বাগবাজারের শতংজীব বৈষ্ণবাচার্য শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যা ভূষণের সভাপতিত্বে এক সভায় তাহার গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে।

বাবাজী ব্রজমোহন দাস

রসিক জয়ন্তী—

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বয়স ১০৬ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বাঙ্গালা দেশের সুধীবৃন্দের পক্ষ হইতে সম্প্রতি তাঁহার জয়ন্তী উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। উৎসবে কলিকাতার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া রসিক মোহনকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতা ২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটের গৃহেই উৎসব হইয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহার জীবন কথা ও তাঁহার কার্য্যাদি সম্বন্ধে বহু সুধী ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধ সম্বলিত এক পুস্তক ঐ দিন তাঁহাকে উপহার প্রদান করা হইয়াছে। এই বয়সেও তাঁহার স্মরণশক্তি, চক্ষু ও কর্ণের স্বাভাবিকতা, বাকশক্তি প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

যতীন্দ্রনাথ বসু—

বালীগঞ্জ হাজরা রোড নিবাসী খ্যাতনামা সামাজিক ও রসিক সুধী যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত ১৭ই এপ্রিল ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি যশোহর নড়াইলবাসী উকীল যোগেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র। বাল্যে শিক্ষালাভের পর তিনি সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র সন্তান উমারাণীকে বিবাহ করেন। তিনি কিছুদিন ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্যের শাসন পরিষদে কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতেন। জীবনের শেষ ১৫ বৎসর তিনি হিন্দুস্থান সমবায় বীমা কোম্পানীর প্রচার বিভাগে উপদেষ্টার কাজ করিতেন। সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, সাহিত্য প্রভৃতিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নাটোরের মহারাজা ৺জগদিন্দ্রনাথ, কৃষ্ণনগরের মহারাজা ৺ক্ষৌণীশচন্দ্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার সহজ, সরল ও অমায়িক ব্যবহারে ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাঁহার মত সামাজিক লোক এযুগে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

যতীন্দ্রনাথ বসু

যুদ্ধে হতাহত ভারতীয়—

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৮৬ জন ভারতীয় হতাহত হইয়াছে। মোট নিহত—১৯৪২০, নিখোঁজ—১৩৩২৭, আহত- ৫১০৩৮, যুদ্ধে বন্দী ৭৯৭০১ (ইহার মধ্যে ২১১৮১ জন নিখোঁজকে যুদ্ধে বন্দী আছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে)।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বাইটন কাপ ফাইনাল ঃ

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ৬১তম ফাইনাল খেলায় বি এন রেলদল (এ) ৩-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে উপর্যুপরি তিনবার কাপ বিজয়ী হ'ল।

প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বি এন রেলদল ১-০ গোলে ই আই রেলদলকে (জামালপুর) হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে জামালপুর দলই ভাল খেলেছিল, তারা মন্দ ভাগ্যের জন্যেই হেরেছে। অপরদিকে মহমেডান সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ২-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে দিয়ে ফাইনালে রেলদলের সঙ্গে মিলিত হয়।

ফাইনাল খেলার সূচনাতেই মহমেডান দল আক্রমণ ক'রে খেলতে থাকে ফলে তাদের কোয়াম খেলার প্রথম দিকে একটি গোল করে। এই গোলের দুমিনিট পর রেলদল গোল পরিশোধ করার সুযোগ পায়, অল্পের জন্যই সে গোল বেঁচে যায়। কিন্তু তাদের আক্রমণের ধারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শীঘ্রই গোলটি শোধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভের আট মিনিট পর রেলদলের সি টাপসেল সর্ট কর্ণার থেকে গোল করে ২-১ গোলে দলকে অগ্রগামী করে। রেলদলের লিনোন খেলার ২১ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন।

বি এন রেলদল (এ): ডেভিড, ট্যাপসেল ও ওয়েন-রাইট, ওয়াটসন, পিনটো ও গ্যালিবার্ডি, হিল, রোচী, গ্ল্যাকেন, বুনিয়ান ও লিনোন।

মহমেডান স্পোর্টিং: করিম; নাসিম ও মহম্মদ দীন, ইরাসীন, মোইন ও ওসমান; মুনীর, সাইক, জাফর, জাকী ও কুয়াম।

এ বছরের বিভিন্ন হকি খেলায় নিম্নলিখিত ট্রফিগুলি বিতরণ করা হয়।

বি এন রেলদলকে বাইটন কাপ বি এই এ চ্যালেঞ্জ কাপ এবং রাসমণি গোল্ড কাপ দেওয়া হয়।

মহমেডান দলকে হেডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জ শীল্ড দেওয়া হয়।

হকি প্রথম বিভাগের লীগ: লীগের প্রথম স্থান অধিকারী মহমেডান ক্লাব লোম্যান মেমোরিয়াল কাপ পেয়েছে। লীগে রানার্স কাপ: মোহনবাগান ক্লাবকে কার্ণোবিস কাপ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিভাগের লীগ: লীগ চ্যাম্পিয়ান ক্যালকাটা পাশা ক্লাবকে ললিত চ্যালেঞ্জ কাপ দেওয়া হয়।

তৃতীয় বিভাগের লীগ: লীগ চ্যাম্পিয়ান ওয়াই এম সি একে (ওয়েলিংটন ব্রাঞ্চ) বি এইচ স্মিথ চ্যালেঞ্জ কাপ দেওয়া হয়।

কাইভন কাপ দেওয়া হয়েছে গ্রেস ক্লাবকে। স্যার আশুতোষ চৌধুরী কাপ পেয়েছে বিদ্যাসাগর কলেজ।

বেঙ্গল চ্যালেঞ্জ শীল্ড পেয়েছে ক্যালকাটা রেঞ্জার্স। রানার্স-আপ কাপ দেওয়া হয়েছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে। **বাইটন কাপের পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল ঃ**

১৮৯৫-৯৬—নেভাল ভি এ সি, ১৮৯৭-৯৮—এস পি ভি মিসন, রাঁচী, ১৮৯৯—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব, ১৯০০—সেণ্ট জেমস স্কুল, ১৯০১-২—রয়েল আইরীস রাইফেলস, ১৯০৩—এস পি ভি মিসন, রাঁচী, ১৯০৪—হর্নেস এসি, ১৯০৫—বি ই কলেজ শিবপুর, ১৯০৬-৭—এস পি জি মিশন, রাঁচী, ১৯০৮-৯-১০—কাষ্টমস এ সি, ১৯১১—ক্যালকাটা রেঞ্জাস, ক্লাব, ১৯১২—কাষ্টমস, ১৯১৩—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স, ১৯১৪—এম এণ্ড কলেজ, আলীগড়

১৯১৫—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স, ১৯১৬—বি ওয়াই এসোঃ লক্ষ্ণৌ, ১৯১৭—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স, ১৯১৮—বি ওয়াই এসোঃ লক্ষ্ণৌ, ১৯১৯—সেণ্ট জেভিয়ার্স, ১৯২০—আসানসোল রিক্রিয়েশন ক্লাব, ১৯২১—বি ই কলেজ শিবপুর, ১৯২২—ই বি আর স্পোর্টস ক্লাব, ১৯২৩—লক্ষ্ণৌ ওয়াই এস এ, ১৯২৪—ক্যালকাটা এফ সি, ১৯২৫-২৬—কাষ্টমস, ১৯২৭—জেভিরিয়ান ক্লাব, ১৯২৮—টেলিগ্রাফ রিঃ ক্লাব, ১৯২৯—ই আই রেল স্পোর্টস ক্লাব, ১৯৩০-৩১-৩২—কাষ্টমস, ১৯৩৩—ঝান্সী হিরোজ, ১৯৩৪—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব, ১৯৩৫—কাষ্টমস, ১৯৩৬—বোম্বাই কাষ্টমস, ১৯৩৭—বি এন আর, ১৯৩৮—কাষ্টমস এস সি, ১৯৩৯—বি এন আর, ১৯৪০—ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স, ১৯৪১—ভগবত ক্লাব ও ভূপাল ওয়াণ্ডার্স, ১৯৪২—রেঞ্জার্স, ১৯৪৩-৪৪—বি এন আর।

ফুটবল খেলা ঃ

গত ১লা মে থেকে ক'লকাতার মাঠে সরকারীভাবে ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়েছে। ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা দিয়েই কলকাতা ফুটবল মরসুমের সূচনা। গত কয়েক বছর লীগের সকল বিভাগেই উঠা নামা বন্ধ, সকলেই ভেবেছিলেন লীগ খেলার জৌলুষ উপে যাবে, খেলার মাঠে জনসমাগম আগের মত আর হবে না। লীগে উঠা নামা বন্ধ হওয়াতে লোকের উৎসাহের কোন অভাব দেখছি না বরং বেড়ে গেছে। 'লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ' নিয়েও রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে; অবশ্যি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আগের তুলনায় অনেকখানি পড়ে গেছে। বিলাতের পেশাদার খেলোয়াড়দের খেলা আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের প্রভাম্বিত করিতে পারে যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁরা লীগ খেলার সূচনা থেকে হতাশ হয়েছেন। লীগ খেলার আরম্ভের পূর্ব্বে যে অনুশীলন খেলার প্রয়োজন তার কথা খুব কম খেলোয়াড়ই ভেবেছেন। সবে মাত্র লীগ খেলা আরম্ভ হয়েছে এখনও হ'তে যথেষ্ট সময় আছে, খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে হ'লে নিয়মিত অনুশীলন খেলার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করি।

ভারতীয় হকি খেলা ঃ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় এবং হকি খেলার যাদুকর ধ্যানচাঁদ সম্প্রতি হকি খেলার খ্যাতনামা সমালোচক মিঃ গিরী এ গ্রীনের নিকট এক বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে এক বিবৃতি দান করেছেন। ধ্যানচাঁদ পৃথিবীর তিনটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রেছিলেন সুতরাং বিদেশের হকি খেলা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার মূল্য যথেষ্ট। তাছাড়া গত পঁচিশ বছর কাল ভারতবর্ষের হকি খেলার সঙ্গেও পরিচিত আছেন। সম্প্রতি সার্ভিসেস স্পোর্টস সার্কাস ভ্রাম্যমাণ দলে থেকে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হকি দলের সঙ্গে খেলেছেন। 'ন্যাশালিষ্ট' দৈনিক পত্রিকায় তাঁর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, ভারতীয় হকি দলের ফরওয়ার্ডের খেলোয়াড়রা ষ্টিক দিয়ে বল সুট করা একেবারে ভুলে গেছে। ধ্যানচাঁদের থেকে ভারতীয় হকি খেলা সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ খেলোয়াড় এবং সমালোচক কেউ নেই সুতরাং তাঁর এ বিবৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ক'লকাতার হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড একেবারে পড়ে গেছে সে সম্বন্ধে তিনি দ্বিমত নন। তবু তিনি পোর্ট কমিশনারের খেলোয়াড় জনসেনের খেলার উপর আস্থা রাখেন। তাঁর মতে, মিঃ জনসেন যদি নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে সত্যই একজন উঁচুদরের খেলোয়াড় হতে পারবেন। তিনি আশা করেন, বিগত অলিম্পিক খেলার পর ভারতীয় হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বর্ত্তমানে যে অবস্থায় নেমে এসেছে তার থেকে যদি আর বেশী খারাপ না হয় তাহলে আরও দু'বার ভারতীয় দল অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হকি খেলায় জয়ী হতে পারবে।

খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নিকৃষ্টতার কারণ সম্বন্ধে ধ্যানচাঁদ নিম্নলিখিত অভিমত দিয়েছেন (১) তাঁর মতে যদিও প্রাদেশিক হকি এসোসিয়েসনগুলি হকি খেলার পরিচালনার দিক থেকে সাফল্য লাভ করেছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া হকি খেলার উন্নতির দিক থেকে সত্যিকারের কাজ দেখাতে পারে নি। খেলোয়াড়দের দিকটা তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। এছাড়া দর্শকবৃন্দের উৎসাহের অভাবেও খেলার প্রসার লাভ হয়নি।

(২) বর্ত্তমানে নিখুঁত 'stick work'এর একান্ত অভাব খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা গেছে; বর্ত্তমানের Gallary showকে stick work বললে মস্ত ভুল করা

হবে। এই fancy খেলার গতি বেশীক্ষণ থাকে না এবং অপর খেলোয়াড়ের কাছে পরাজিত হলেই ষ্টিক চালিয়ে খেলোয়াড়রা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে। এই ভাবের ষ্টিক চালিয়ে খেলাকে ধ্যানচাঁদ 'লক্‌ড়ি মার' বলেছেন।

(৩) হকি খেলার রক্ষণভাগের খেলা বরং ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন, আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা সুট করতে একেবারে ভুলে গেছে। গোল এরিয়া অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে বল সুট করার অভ্যাস এবং দক্ষতা যদি আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের না থাকে তা হলে বিশেষ কিছু সাফল্যলাভ করা সম্ভব হবে না। তিনি বিদেশী হকি দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, সেখানে ব্যক্তিগত ভাবে গোল দেবার চেষ্টা রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের পদ্ধতির কাছে কোন কাজের হবে না। এই প্রসঙ্গে ধ্যানচাঁদ বলেছেন যে, এক সময়ে তিনিও খুব selfish খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু সে সময় ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়ের stick work খুবই উন্নত ছিল এবং রক্ষণদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বল ড্রিবল করে নিজের পথ তৈরী করে নিতে পারত সুতরাং অল্প বিস্তর এই ধরণের selfish খেলাতে খেলার ক্ষতি হ'ত না। বর্ত্তমান সময়ে selfish খেলোয়াড় অতি সহজেই বিপক্ষের rough and tough খেলোয়াড়ের কাছে ধরাশায়ী হয়।

(৪) ধ্যানচাঁদ বলেছেন, বর্ত্তমানের খেলার সম্মিলিত খেলার (team-work) একান্ত অভাব লক্ষিত হয়, খেলায় ব্যক্তিগত চাতুর্য্যই প্রাধান্য লাভ করেছে। ফরওয়ার্ডের খেলোয়াড়রা বুঝতে পারে না খেলার ধারা কোনদিকে ঘুরবে; তাদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব এত বেশী যে, তারা খেলার একটা সম্মিলিত ধারা অবলম্বন করতে পারে না। কিন্তু তাঁদের সময়ে ফরওয়ার্ডের প্রত্যেক খেলোয়াড়ই বুঝতে পারতো বলটি কোন দিকে যাবে; সেই অনুযায়ী খেলোয়াড়রাও প্রস্তুত থাকতো, অযথা বল নষ্ট হ'ত না। খেলোয়াড়দের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং শারীরিক অক্ষমতার জন্যও হকি খেলা অনেকখানি নীচে নেমেছে এইরূপ অভিমতও তিনি প্রকাশ করেছেন। শরীর চর্চ্চা এবং অনুশীলনা খেলার অভাবেও খেলা নিম্নস্তরের হবার কারণ বলে তিনি অভিমত দিয়েছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ব্যোমকেশের কাহিনী"—২৲
শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "সায়াহ্নিকা"—১৲
সুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "পদধ্বনি"—৩॥৹
বাণীকুমার প্রণীত নাটক "সন্তান"—৩৲
রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"—১০৲
শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত উপন্যাস "বেণুমতীর তীরে"—২৲
প্রবোধ সরকার প্রণীত উপন্যাস "বাস্তবতার ইতিহাস"—৩৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "গল্প ভারতী" ১ম গ্রন্থ—১॥৹
শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত "পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ"—১৸৹
শ্রীনবগোপাল দাস প্রণীত উপন্যাস "নিঃসহ যৌবন"—৩৲
ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত"—১।৹
গিরীন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ইতিহাসের গল্প" (১ম ভাগ)—১।৹
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় অনুদিত "ফণ্টামারা"—২৲

আগামী আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ

গত দ্বাত্রিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' কি ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। মহাযুদ্ধের জন্য নানা দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও আমরা ভারতবর্ষের চাঁদার হার বৃদ্ধি করি নাই। আশা করি, সকলে আমাদের সহিত পূর্ব্বের মতই সহযোগিতা করিয়া আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬॥৹, ভি পি ৬৸৵৹, ষাণ্মাষিক ৩৹, ভি-পিতে ৩।৵৹। ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি-পির টাকা অনেক সময় বিলম্বে পাওয়া যায়, ফলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকগণই দয়া করিয়া মণিঅর্ডার কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন।

মণিঅর্ডার পাঠাইবার ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ—**ভারতবর্ষ**

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

সূচীপত্র

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১-১৩৫২

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র সূচী

আষাঢ়—১৩৫

প্রথম খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | ... সংখ্যা

কোকামুখ তীর্থ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এই্চ-ডি

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত দামোদরপুর নামক স্থানে গুপ্তবংশীয় তিনজন সম্রাটের রাজত্বকালীন পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। "উহার একখানিতে সম্রাট্ বুধগুপ্ত, তাঁহার অধীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি বা উত্তর বাংলা প্রদেশের উপরিক (শাসনকর্ত্তা) মহারাজ জয়দত্ত এবং জয়দত্ত কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোটিবর্ষ বিষয় বা দিনাজপুর অঞ্চলের আযুক্তক (শাসনকর্ত্তা) গণ্ডকের নাম উল্লিখিত দেখা যায়! গণ্ডকের শাসনকালে নগরশ্রেষ্ঠী ঋভুপাল, সার্থবাহ বসুমিত্র, প্রথম-কুলিক বরদত্ত এবং প্রথম কায়স্থ বিপ্রপাল শাসনকার্য্যে বিষয়পতির সহায়ক ছিলেন। শ্রেষ্ঠী ঋভুপাল একদিন অধিষ্ঠানাধিকরণ অর্থাৎ নগরের শাসনসভায় নিম্নোদ্ধৃত আবেদন উপস্থিত করেন—"হিমবচ্ছিখরে কোকামুখস্বামিনঃ চত্বারঃ কুল্যবাপাঃ শ্বেতবরাহস্বামিনো পি সপ্তকুল্যবাপাঃ অস্মৎফলাশংসিনা পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে ডোঙ্গাগ্রামে পূর্ব্বং ময়া অপ্রদা অতিসৃষ্টকাঃ। তদহং তৎক্ষেত্রসামীপ্যভূমৌ তয়োরাস্ত কোকামুখস্বামিশ্বেতবরাহস্বামিনো নামলিঙ্গমেনং দেবকুল-দ্বয়ম্ এতৎ কোষ্ঠিকাদ্বয়ঞ্চ কারয়িতুমিচ্ছামি। অর্হথ বাস্তু না সহ কুল্যচাপান্ যথা—ক্রয়মর্য্যাদয়া ছাতুমিতি।" এই আবেদন পরীক্ষা করিয়া পুস্তপাল বিষ্ণুদত্ত, বিজয় নন্দী এবং স্থাণুনন্দী মত দিলেন যে, শ্রেষ্ঠী মহাশয়কে তিনদীনার মূল্যের কয়েক কুল্যবাপ ভূমি বিক্রয় করা যাইতে পারে; কারণ সত্যই "অনেন হিমবচ্ছিখরে তয়োঃ কোকামুখস্বামি-শ্বেতবরাহস্বামিনোঃ অপ্রদাঃ ক্ষেত্রকুল্যবাপা একাদশ দত্তকাঃ। তদর্থঞ্চ ইহ দেবকুল কোষ্ঠিকাকরণে যুক্তমেতদ্ বিজ্ঞাপিতং তৎ ক্ষেত্রসামীপ্যভূমৌ বাস্তু দাতুমিতি।" এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপরে আমি তাম্র-শাসনের কিঞ্চিৎ সংশোধিত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি। শাসনের ব্যাখ্যায় আমি পূর্ব্বে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে নূতন প্রমাণাবলীর সাহায্যে তদুপরি নবীন আলোকপাতের চেষ্টা করিব।

হিমবচ্ছিখর শব্দের অর্থ হিমালয় পর্ব্বতের চূড়া। কিন্তু

যে ডোঙ্গাগ্রামে পূর্ব্বে ভূমিদান করা হইয়াছিল এবং যে স্থলে নূতন ভূমি প্রার্থনা করা হইল, উহা দামোদরপুরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ কুমার-গুপ্তের সময়কালীন ১২৪ গুপ্তাব্দের দামোদরপুর শাসনেও ডোঙ্গাগ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। আবার ২২৪ গুপ্তাব্দের দামোদরপুর শাসনে দেখিতে পাই, অযোধ্যা হইতে আগত কুলপুত্র অমৃতদেব কোটিবর্ষের তৎকালীন বিষয়পতি স্বয়ং-ভূদেবের শাসনকালে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয়ের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, "অত্রারণ্যে ভগবতঃ শ্বেতবরাহস্বামিনো দেবকুলে খণ্ডস্ফুটিত প্রতিসংস্কারকরণায় বলিচরুসত্রপ্রবর্ত্তন গব্য ধূপপুষ্পপ্রাপণমধুপর্কদীপাদ্যুপযোগায় চ অপ্রদাধর্ম্মেন তাম্রপট্টীকৃত্য ক্ষেত্রস্তোকং দাতুমিতি।" এই আবেদনের ফলে ভগবান্ শ্বেতবরাহস্বামীর উদ্দেশ্যে পাঁচ কুল্যবাপ ভূমি উৎসর্গ করা সম্ভব হয়। প্রদত্ত ভূমির অবস্থানপ্রসঙ্গে স্বচ্ছন্দপাটক, লবঙ্গসিকা, সাটুবনাশ্রম, পরম্পতিকা, জম্বুনদী এবং পূরণবৃন্দিকহরির উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, পূরণবৃন্দিকহরি দামোদর-পুরের চৌদ্দ মাইল উত্তরে অবস্থিত আধুনিক বৃন্দাকুড়ির সহিত অভিন্ন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এখানে যে অঞ্চলে ভূমি অবস্থিত ছিল উহাকে অরণ্য বলা হইয়াছে। বুধগুপ্তের সময়কালীন ১৬৩ গুপ্তাব্দের দামোদরপুর শাসনে বায়িগ্রাম অর্থাৎ বগুড়া জেলার অন্তর্গত বৈগ্রাম বা বাইগ্রামের উল্লেখ আছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, দামোদরপুরের নিকটবর্ত্তী ডোঙ্গা-গ্রামটি যে অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, উহারই নাম হিমবচ্ছিখর কিনা, অথবা হিমবচ্ছিখর বলিতে ঐ স্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী হিমালয় পর্ব্বতের কোন শৃঙ্গবিশেষ বুঝিতে হইবে কিনা। দ্বিতীয় অর্থটিই অধিকতর সঙ্গত বোধহয়। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে, স্বীকার করিতে হয় যে, হিমালয় পর্ব্বতের গাত্রে কোন স্থানে কোকামুখ এবং শ্বেতবরাহ সংজ্ঞক দেবতাদ্বয়ের মন্দির অবস্থিত ছিল এবং দেবভক্ত ক্ষ্মাভূপাল ও অমৃতদেব উহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুরের দামোদরপুর অঞ্চলে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ভূমি দান করিয়া-ছিলেন। এখন অপর প্রশ্ন এই যে, হিমালয়ের যে অংশে ঐ মন্দিরদ্বয় অবস্থিত ছিল, তাহা কোটিবর্ষ বিষয় বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল কিনা। কেহ কেহ সত্যই বিশ্বাস করেন যে, আধুনিক বাংলার উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চল প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থক কোনই প্রমাণ নাই। আসল কথা এই যে, এ পর্য্যন্ত কেহই হিমালয়ের অন্তর্গত কোকামুখ মন্দিরের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

মহাভারত ও পুরাণাদিতে কোকামুখ বা বরাহক্ষেত্র নামক তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। কতকগুলি তীর্থস্থানের অবস্থিতি নির্ণয় করাও কঠিন। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে, কোকামুখ বা বরাহক্ষেত্রের অবস্থিতি নিঃসন্দেহে নির্ণীত হইতে পারে।

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কোকামুখ তীর্থপ্রসঙ্গে ব্রহ্মপুরাণের ২১৭তম এবং ১২৯তম অধ্যায়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। এই পুরাণে হিমালয়ের পাদদেশস্থিত কোকানাম্নী নদী, উহার তটবর্ত্তী কোকামুখ সংজ্ঞক তীর্থক্ষেত্র এবং ঐতীর্থে বরাহরূপী বিষ্ণুর অবস্থিতির উল্লেখ আছে। যথা—"কোকেতি প্রথিতা লোকে শিশিরাদ্রিসমাশ্রিতা" (১১৯।১৭); "বরাহদংষ্ট্রাসংলগ্নাঃ পিতরঃ কনকোজ্জ্বলাঃ। কোকামুখে গতভয়াঃ কৃতা দেবেন বিষ্ণুনা॥" (১১৯।৩৯); "কোকা-পদীতি বিখ্যাতা গিরিরাজসমাশ্রিতা। তীর্থকোটি মহাপুণ্যা মদ্রূপপরিপালিতা॥" (১১৯।১০৬); "এবং ময়োক্তং বরদস্তু বিষ্ণোঃ কোকামুখে দিব্যবরাহরূপম্" (১১৯।১১৬), ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, ব্রহ্মপুরাণ হইতে 'কোকানদী বা কোকামুখ তীর্থের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নহে। উহার জন্য আমাদিগকে পুরাণান্তরের আশ্রয় লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমি বরাহপুরাণের প্রতি পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

বরাহপুরাণের ১৪০তম অধ্যায়ের নাম কোকামুখ মাহাত্ম্য বর্ণন। এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে ভগবান্ বরাহ পৃথিবীকে বলিতেছেন, "তব কোকামুখং নাম যন্ময়া পূর্ব্বভাষিতম্। বদরীতি চ বিখ্যাতং গিরিরাজশিলাতলম্॥ স্থানং লোহার্গলং নাম ম্লেচ্ছরাজসমাশ্রিতম্। ক্ষণমাপি ন মুঞ্চামি এতমেতন্ন সংশয়ঃ॥" (১৪০।৫) অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রধান ক্ষেত্র এই পৃথিবীতে তিনটি মাত্র—প্রথম কোকামুখ, দ্বিতীয় বদরী এবং তৃতীয় লোহার্গল। ১৪১তম

অধ্যায়ের নাম বদরিকাশ্রম মাহাত্ম্য বর্ণন ; উহাতে উল্লিখিত হিমকূটশিলাতলস্থিত বদরীতীর্থের বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণে বদরিকাশ্রম ক্ষেত্রের অন্তর্গত ব্রহ্মকুণ্ড, অগ্নিসত্যপদ, ইন্দ্রলোক, পঞ্চশিখ, চতুঃস্রোতঃ, বেদধার, দ্বাদশাদিত্যকুণ্ড, লোকপাল, পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী স্থলকুণ্ড, মেরুবর, মাপসোদ্ভেদ, পঞ্চশিরঃ, সোমাভিষেক, সোমগিরি, উর্ব্বশীকুণ্ড প্রভৃতি পবিত্র স্থানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বরাহপুরাণের ১৫১তম অধ্যায়ের নাম লোহার্গল মাহাত্ম্য বর্ণন। উহা বলা হইয়াছে—"ততঃ সিদ্ধবটেগত্বা ত্রিংশদ্ যোজনদূরতঃ। ম্লেচ্ছ মধ্যে বরারোহে হিমবন্তং সমাশ্রিতম্॥ তত্র লোহার্গলে ক্ষেত্রে নিবাসো বিহিতঃ শুভঃ। গুহ্যং পঞ্চদশায়ামং সমন্তাৎ পঞ্চ যোজনম্॥ * * * তত্র তিষ্ঠাম্যহং ভদ্রে উদীচীঃ ত্রিশমাশ্রিতঃ। হিরণ্যপ্রতিমাং কৃত্বা জাতরূপাং ন সংশয়ঃ॥" (১৫১।৭-১০) লোহার্গলের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ঐ ক্ষেত্রের অন্তর্গত অনেকগুলি পবিত্র স্থানের উল্লেখ দেখা যায় যথা—পঞ্চসরঃ, নারদকুণ্ড, বশিষ্ঠকুণ্ড, পঞ্চকুণ্ড (এ স্থলে হিমকূট বিনিঃসৃতা পঞ্চধারা পড়িয়াছে) সপ্তর্ষিকুণ্ড (এস্থলে হিমবৎ পর্ব্বস্থিত সপ্তধারা পড়িয়াছে), শরভঙ্গকুণ্ড ("তত্রধারাপতত্যেকা শরভঙ্গাশ্রিতা নদী") অগ্নিসরঃকুণ্ড, বৃহস্পতিকুণ্ড (এস্থলে হিমকূটসমাশ্রিতা ধারা পড়িয়াছে), বৈশ্বানরকুণ্ড ("ধারা ঠেকা পতত্যত্র দৃশ্যতে হিমসংক্ষয়াৎ"), কার্ত্তিকেয়কুণ্ড (এস্থলে হিমপর্ব্বত হইতে পঞ্চদশ ধারা পড়িয়াছে), উমাকুণ্ড, মহেশ্বরকুণ্ড (এস্থলে হিমবৎপর্ব্বত হইতে তিনটি ধারা পড়িয়াছে), ব্রহ্মকুণ্ড (এস্থলে হিমালয় হইতে চারিটি ধারা পড়িয়াছে), ইত্যাদি।

বরাহপুরাণের ১৪০তম অধ্যায়ে বরাহক্ষেত্র কোকামুখতীর্থের যে বিবরণ পাওয়া যায়, উহাতে ঐ ক্ষেত্রের অন্তর্গত বহু পবিত্র স্থানের উল্লেখ আছে। ইহাদের অনেকগুলির অবস্থান সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"কোকায়াং মম মণ্ডলে।" কোকামুখের অন্তর্গত তীর্থস্থান :—১। জলবিন্দু ; ২। বিষ্ণুধারা ; ৩। কোকামুখাশ্রিত বিষ্ণুপদ ; ৪। বিষ্ণুসরঃ ; ৫। সোমতীর্থ—"যত্র পঞ্চশিলাভূমির্ব্বিষ্ণুনাম্নাতথাঙ্কিতা" ; ৬। তুঙ্গকূট ; ৭। অগ্নিসরঃ—"পঞ্চধারা পতন্ত্যত্র গিরিকুঞ্জ সমাশ্রিতাঃ" ; ৮। ব্রহ্মসরঃ ; ৯। ধেনুবট ; ১০। ধর্ম্মোদ্ভব —"গিরিকুঞ্জাৎ পতত্যেকা ধারা ভূমিতলে শুভা" ; ১১। কোটিবট ; ১২। পাপপ্রমোচন ; ১৩। যমব্যসনক ; ১৪। মাতঙ্গ—"স্রোতো বহতি তত্রৈব আশ্রিতং কৌশিকীং নদীম্" ; ১৫। বজ্রভব—"স্রোতো বহতি তত্রৈকমাশ্রিতং কৌশিকীং নদীম্" ; ১৬। কোকাশিলাতলস্থিত শক্ররুদ্র ; ১৭। দংষ্ট্রাঙ্কুর—"যত্র কোকা বিনিঃ সৃত্রা." ; ১৭। বিষ্ণুতীর্থ—"ততঃ পর্ব্বতমস্যাত্তু কোকায়াং পততিজলম্ ; ১৮। সর্ব্বকামিকা—"অস্তিরুদ্রবরং স্থানং সঙ্গমং কৌশিকীকোকয়োঃ। সর্ব্বকামকেতি বিখ্যাতা শিলা তিষ্ঠতি চোত্তরে॥" ; ১৯। মৎস্যশিলা—"অস্তি মৎস্যশিলা নাম গুহ্যং কোকামুখে চরম্। ধারাঃ পতন্তি তিস্রো বৈ কৌশিকীমাশ্রিতা নদীম্॥" ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত কোকামুখ তীর্থ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে—"পঞ্চযোজন বিস্তারং ক্ষেত্রং কোকামুখং মম", "তস্মিন্ কোকামুখে রম্যে তিষ্ঠামি দক্ষিণামুখঃ" "বরাহরূপমাদায় তিষ্ঠামি পুরুষাকৃতিঃ", "বামোন্নতমুখং কৃত্বা বামদংষ্ট্রা সমুন্নতম্", ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে দেখা যায়, কোকামুখতীর্থে কোকাকৌশিকী নাম্নী দুইটি নদী প্রবাহিত হইত এবং ঐ নদীদ্বয়ের পবিত্র সঙ্গম স্থলও তীর্থটির অন্তর্গত ছিল। ভারতবর্ষে কৌশিকী নামের একাধিক নদী আছে। কিন্তু বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী কৌশিকী বা কুশী নদী ব্যতীত অপর কোন কৌশিকীর সহিত বরাহক্ষেত্র এবং কোকা নদীর সংশ্রব প্রমাণ করা সম্ভব নহে। এই কৌশিকী নদীর নেপালের অন্তর্গত অংশ সুন কোশী (সম্ভবতঃ স্বর্ণ কৌশিকী) নামে পরিচিত ; উহার কতিপয় উপনদী দুধকোশী, অরুণকোশী প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কোকামুখ বা বরাহক্ষেত্র অধুনা বরাহছত্র নামে প্রসিদ্ধ। 'ছত্র' শব্দটী সংস্কৃত 'ক্ষেত্র' শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। হরিহরক্ষেত্র নাম হইতে পাটনার নিকটবর্ত্তী শোনপুরের মেলার নাম "হরিহর ছত্রের মেলা" হইয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

দুঃখের বিষয়, নেপালের অন্তর্গত বরাহক্ষেত্র বা বরাহছত্র এবং কোকাসী নদী অধিকাংশ মানচিত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য মানচিত্রে সাধারণতঃ তীর্থাঞ্চলের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত ধনকুটা এবং পূর্ব্বদিকস্থিত বিজাপুরের উল্লেখ থাকে। E. Thomson কর্ত্তৃক সঙ্কলিত Gazetteer of Iadia (London, 1886) গ্রন্থে Varaha chatra স্থলে ভ্রমক্রমে Vardha chatra ছাপা

হইয়াছে এবং স্থানটির সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "Town in Nepal state; situated on the left bank of the San Kusi river, 124 miles east-south.east of Khatmandu. Lat. 26° 57', long 4'." গুপ্তপ্রেশ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকাতে ভারতীয় তীর্থ বিবরণ প্রসঙ্গে বরাহছত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ভগবান্ নারায়ণের তৃতীয় অবতার বরাহদেবের প্রতিমূর্ত্তি নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত ভূটান রাজ্যের নিকট ধবলাগিরিতে প্রতিষ্ঠিত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে প্রতি বৎসর মেলা হয়। কলিকাতা হইতে যোগবাণী (অর্থাৎ Jogbani, B & A Ry) ৩৩১ (রাণাঘাট ও লালগোলা ঘাট হইয়া) ৬/১০। তথা হইতে কুশী নদীর কিনারা দিয়া ২০ মাইল ধবলা গিরি-শৃঙ্গের পাদদেশ ও তথা হইতে ২০ মাইল বরাহদেবের মন্দির।" যদিও সুপরিচিত ভূটানি রাজ্য এবং নেপালের অন্তর্গত বিখ্যাত ধবলাগিরি বরাহছত্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত, তাহা হইলেও উদ্ধৃত বিবরণে তীর্থটির অবস্থান মোটামুটি ঠিকই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একখানি পুরাতন গ্রন্থে বরাহছত্র এবং তৎসংলগ্ন কোকা নদীর উল্লেখ দেখা যায়। উহা An Account of the Kingdom of Nepaul (being the substance of observations made during a Mission to that country in the year 1793) by colonel Kirkpatrick, London, 1811. এই গ্রন্থের ৩২৪-২৫ পৃষ্ঠায় কাঠমণ্ডু হইতে বিজাপুরের পথ বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ওধং ঘাট হইতে অরুণ এবং সোম কুশী নদীর সঙ্গমের দূরত্ব ৭ ঘড়ি; তথা হইতে অথরিয়া ঘাট (দ্বিতীয়) ৫ ঘড়ি; তথা হইতে তাম্বর, অর্থাৎ তাম্রফেরী নামক স্থানে তাম্বর ও সেনেকুশীর সঙ্গম ২৬ ঘড়ি; তথা হইতে কোকাকোলা ২৮ ঘড়ি; তথা হইতে বরাহছত্র ২৮ ঘড়ি; তথা হইতে কুশীর তীরস্থিত ছত্রঘাট ৫ ঘড়ি; তথা হইতে বিজাপুর ১৬ ঘড়ি। গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত মানচিত্রটিতেও বরাহছত্র এবং কোকাকোলার উল্লেখ আছে। কোলা (সংস্কৃত কুল্যা) শব্দটির অর্থ ক্ষুদ্র নদী। কোকাকোলা নামের অর্থ কোকা নাম্নী ক্ষুদ্র নদী। এক ঘড়িতে সাড়ে বাইশ মিনিট। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে ঘড়ি অনুসারে যে দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহার উপরে নির্ভর করা চলে না; কারণ পার্ব্বত্য পথে পথিকেরা সর্ব্বত্র সমবেগে চলিতে পারে না।

যাহা হউক, আমরা হিমালয়স্থিত প্রাচীন কোকামুখ বা বরাহক্ষেত্র এবং তদন্তর্গত কোকা নদী খুঁজিয়া পাইলাম। এই স্থানের দূরত্ব দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্তর্গত দামোদরপুর অঞ্চল হইতে আকাশ পথেও প্রায় ১৫০ মাইল। সুতরাং উপযুক্ত প্রমাণাভাবে কোকামুখতীর্থ প্রাচীন কোটি বর্ষ বিষয়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে করা কঠিন। অবশ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইতে পারে; কিন্তু ইহা সমর্থক প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। উত্তর বিহারের অধিবাসিগণের নিকট বরাহছত্রের তীর্থ মর্য্যাদা অসীম। বাংলার উত্তরভাগে মোঙ্গোলীয় প্রভাব বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতি যে উত্তর বিহারের অনুরূপ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং গুপ্তযুগের দিনাজপুর-বাসিগণ কোকামুখ বা বরাহক্ষেত্রে তীর্থ পর্য্যটনে যাইবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শ্রেষ্ঠী ঋভুপাল বরাহক্ষেত্রস্থিত দুইটি বরাহ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বদেশে বহু বিঘা জমি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূমির লভ্যাংশ নিয়মিতভাবে সুদূরবর্ত্তী মন্দিরে প্রেরণ করা অবশ্যই সুবিধাজনক ছিল না। তাই তিনি আরও ভূমি ক্রয় করিয়া স্বদেশে ঐ দুই দেবতার নামে দুইটি মন্দির এবং দুইটী প্রেষ্ঠিকা নির্ম্মাণ করিতে সচেষ্ট হন। এই মন্দিরদ্বয়কে নকল কোকামুখ এবং নকল শ্বেতবরাহের মন্দির বলা যাইতে পারে। নকল দেবতা হইতে পৃথক্ করিবার জন্যই তাম্রশাসনে বরাহক্ষেত্রস্থিত কোকামুখ ও শ্বেতবরাহ দেবতাকে "আদ্য" (অর্থাৎ, আসল) বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তাম্রশাসন হইতে উদ্ধৃত দ্বিতীয়াংশে "হিমচচ্ছিখরে" এবং "ইহ" কথা দুইটি বিভিন্ন স্থান বোধক বলিয়া স্পষ্ট বুঝা বুঝা যায়। ঋভুপালের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে অমৃতদেব শ্বেত-বরাহ দেবতার উদ্দেশ্যে তদীয় মন্দির সংস্কারাদির জন্য ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ঋভুপাল কর্ত্তৃক স্থাপিত পূর্ব্বোক্ত মন্দির, কোকামুখ ক্ষেত্রস্থিত আসন শ্বেতবরাহের মন্দির নহে। কারণ, অপর তাম্রশাসনের ন্যায় এই শাসনটিতে দেবতার প্রসঙ্গে হিমবচ্ছিখর শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

দক্ষিণ দিনাজপুর অঞ্চলে অনুসন্ধান করিয়া কেহ যদি ঋভুপালের স্থাপিত দেবকুলদ্বয় বা উহার ধ্বংসাবশেষ অধিকার করিতে সমর্থ হন, তিনি বাঙালী ঐতিহাসিকের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মাণিকলালের প্রবেশ সহ স্বর্ণকার, অর্থাৎ contractor…তিনি এসেই—

"হুজুর মা বাপ, দাস মজুর মাত্র"—বলতে বলতে একেবারের হুজুরের চরণ স্পর্শ।

ডাক্তার চমকে উঠে। হরি হে, কর কি। তুমি আমার ছোটো কিসে? ওঠো, ওঠো, সব মানুষই আমার কাছে সমান। তায় শুনেছি তুমি স্বর্ণকার, বাড়ীতে আমাদের শান্তির কর্ণধার। ঠাকরুণদের মুখভার ঘোচাও, সত্যটা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নাই,—ওঠো ওঠো। একটু স্থির হয়ে শোনো। কি জানি এ কাজে কত টাকা ফেলেছ, শেষ অনিষ্ট ক'রে বসতো! তাই Noticeটা প্রচারের পূর্ব্বে ভাবলুম—duty হলেও, হিঁদুর ছেলে—ধর্ম্মও তো আছেন। সবদিক সামলাতে হয় যে। তায় আমরা প্রভুপাদের ফ্যাকড়া, ন্যাকড়া ঢাকা থাকতে হয়—তাতেই আনন্দ। কারুর কথায় অভিমান রাখি না। দিন কাটলেই হ'ল। হরি নিয়ে যেন থাকতে পারি, অপরাধ না ক'রে ফেলি। মানুষের ভুলচুক আছেই। সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকি। অবস্থা তো এই, পেটের দায়ে চাকরি। এখন কি করবে বল দিকি? একদিকে duty লোকের প্রাণ নিয়ে কথা। অন্যদিকে অন্যের অপকার। সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। বড় রকমের ক্ষতির ভয় আছে কি?"

Contractor—"হুজুর, একেবারে ফকির হ'য়ে যাবার কাজ করে' ফেলেছি। লোভে পাপ। সর্ব্বস্ব ফেলে, মায় গোয়ালের গরু, পরিবারের খাড়ু খুইয়ে—একচেটে contract নিয়ে ফেলেছি। সাত সাতটা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে পথের ভিখিরী হ'তে হবে। আপনি বাঁচাবার উপায় না করলে আঁচাবার উপায় আর থাকবে না।" (পা জড়িয়ে পড়া)।

"ছাড়ো ছাড়ো, আমরা কাকেও পা ছুঁতে দিই না, কড়া নিষেধ। তাই তো এমনটা ক'রে বসেছ! কই মাছ যে কলেরার বাহন,—জানতে না? সেই তো ওকে নিয়ে বেড়ায়,—জানতে না?"

"না হুজুর, মুখ্যু মানুষ। জানলে আর এমন মারাত্মক কাজ করি।"

"শ্বশুরের অবস্থা কেমন? নিবাস কোথা?"

"আজ্ঞে যশোরের নিকটেই। অবস্থা ভালোই ছিলো। ডাকাতের দৌরাত্মে দুটো ডালকুত্তো রাখতেন। এই লোভে পড়ে তিনশো টাকায় মুন্সীদের বেচে দিয়েছেন। নতুন বাজার এখন তাঁর একচেটে।"

"তাই তো ভাবালে যে। আমি আবার Cholera Expert আমার report একবার বেরুলে যে সর্ব্বত্র ঘা পড়বে। (চিন্তাকুলভাবে) মাণিকলাল মাথায় কিছু আসে?"

মাণিকলাল। বিদেশী সাহেবরাও ও fishটির গুণের কথা জানে না, নইলে military majorরা এতক্ষণ হুলুস্থুল বাধাতো। এখনো এটুকু বাঁচোয়া আছে। ওদের দেশে ও বিষাক্ত black fish নেই বোধ হয়।"

বিনোদ। কিন্তু এদেশে বদ লোকের তো অভাব নেই। কে কখন কানে তুলবে তাতো জানি না, ভয় যে খেতাব কাঙালদের।

মাণিক। Medical Journal তো নভেল (Novel) নয়, কেই বা পড়ে। statesmanখানা নিতে হয় তাই নেয়, মোড়োক খোলে না শুনেছি—"

বিনোদ। তাও জানি। কিন্তু কাজটি যে বড় riskq তাই তো এ লোকটি দেখছি সত্যিই বিপন্ন—ওর দুকুল ডুবতে বসেছে। ঐ সঙ্গে আরো কত ডুববে তা কে জানে। (চিন্তাকুলভাবে) দেখো মাণিক, আমাদের বংশে ধর্ম্মের চেয়ে বড় কিছু নেই। হরিকে না ভুললেই হ'ল। এখন যেমন চলছে চলুক, কি বলো?"

মাণিক। আমার মনে হয় Expert ভিন্ন এ আর কারুর মাথায় আসবে না,—

বিনোদ। আচ্ছা তুমি এখন যাও স্বর্ণকার। এসব কথা কেউ না শোনে—wifeও নয়। ওর মধ্যে উভয় পক্ষের life রইলো। দেখো—সেরটা যেন এক টাকার

ওপর না যায়। যাও, আমার জপের সময় হ'ল। মাণিকলাল আমার মন্ত্র শিষ্য। কথাবার্ত্তা যা যখন কইবার—ওঁর কাছেই কয়ো। আমার কাছে না ডাকলে এস না। বড় সঙ্গিন কাজ বুঝেছ ?

Contractor—আর বলতে হবে না প্রভু, বাপেও এত দয়া করেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। নিজের মৃত্যুবাণের পাত্তা অপরকে কি কেউ বলে হুজুর। আমি কৃতার্থ হলুম, দেবদর্শন ক'রে চললুম। আমিও হিন্দু-পূজা আমার যৎসামান্য হলেও গ্রহণ করতেই হবে দেবতা, আমার রক্ষক আর কেউ নেই।

বিনোদ কানে আঙুল দিয়ে উঠে পড়লেন। (সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত প্রণমে ক'রে মাণিকলালকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণকারও চলে গেল।)

বিনোদের ধুম্-জপ চল্‌তে লাগলো। প্রভুপাদের বংশ বিড়ি ধ্বংসে মন দিলেন। চিন্তাও চলতে লাগলো—

(১) স্বর্ণকার কাজ বাগাতে জানে। ইংরিজি পড়েছে কিনা! বিদ্যে শেখা আর কিসের জন্যে···কাজ হাসিলের জন্যে তো,—সত্য গোপনে sanat বানিয়ে দেয়।

(২) কইমাছ তো এলো বলে—কোটা হবে কিসে ? অস্ত্রের মধ্যে সেই ডগা ভাঙা স্প্যাচুলা খানাই ভরসা। কুটিয়ে আনতে বল্‌লেই হোতো, কিন্তু আগে থেকে লঙ্কা ভাগ তো আর চলে না। আবার বলে বসেছি অদ্বৈত বংশ। আচ্ছা—আসে আসুকই।

(৩) ও বাবা! এতো my dear মুড়ি নয়, আবার রাঁধা চাই, রান্নার কথায় যে কান্না আসে। মাণিক আবার 'সরকার' হয়ে মরেছে। তায় পরিচয় দিয়েছি—আমি প্রভুর বংশ। মাথা খেলে দেখছি। কোন্ দিন স্বর্ণকার এসে পড়তেও তো পারে—একটা antidote যে ভেবে রাখা চাই।

(৪) সরকারের চেয়ে বড় জাত কেউ আছে নাকি ? পাচক গুণবাচক হওয়াই তো দরকার। প্যারীচরণ সরকারের দৌলতেই তো চাকরি,—রঘুবংশের বিদ্যেতে তো ঘুঘু চরতো;—রামদুলালের কথা তো ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কটা শোনাবো! খোদ সরকারের গুণের কথা রুণমুণ্ড না হলে কারো তুণ্ডে কুলুবে না, থাক—এইতেই হবে।

(৫) মাণিক রাঁধলেই হবে—খুব হবে—ডুশোবার হবে—মিছে দুর্ভাবনায় দরকার নেই। রেঙ্গুণে আমার কোন মাসিমা রেঁধে দিতেন! মিছে সংস্কারের পিছে আত্মসংহার করব নাকি! যতো সব···

(জপে বাধা পড়লো। একটা চুপড়ি হাতে মাণিকের প্রবেশ।)

বিনোদ। Hallo, ওতে কি ?

মাণিক। আপনার চিত্ত-চিন্তামণি সাধনের ধন—Great grandfather of কই dynasty. দেখাতে পারলুম না—এক একটি আধ হাতের ওপর ছিল।

বিনোদ। (দমে গিয়ে) ছিল যে past tesne হে,—দেখাতে পারলুম না মানে ? গেলো কোথায় ?

মাণিক। (চুপড়ির চাপা খুলে) এই যে দেখুন না, একেবারে বৈষ্ণবী অস্ত্রে বানিয়ে অর্থাৎ কাটিয়ে কুটিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে এনেছি। আমরা ও বাবা কই বাগাতে পারতুম না হুজুর।

বিনোদ। Bravo মাণিকলাল, আমি ভেবে মরছিলুম, আমাদের সম্বল তো ওই ডগা ভাঙা স্প্যাচুলাখানা।

মাণিক। রামো, ও লম্বুয়ে fish skinnish ছাড়া প্রাণ দেয় না। কায়দা করতে তিন রকম অস্ত্র দরকার হয়েছে।

বিনোদ। (উৎফুল্ল মুখে) You a spotless মাণিক, genuine jewel তারপর ?

মাণিক। সে হচ্ছে। আগে একটা ধরাণ দিকি।

(পকেট থেকে Gold Flakeএর একটা আভাঙা টিন্ বার করে ডাক্তারবাবুর হাতে দিলে)

বিনোদ। একি, একদম Gold Flake যে! কোথায় পেলে ?

মাণিক। স্বর্ণকারের গদিতেই gold জন্মায়, আর আমাদের ভূমিষ্ঠ হন মেয়ে। তারাই gold দেখায়, অবশ্য বাড়ি বাঁধা দিয়ে সেটা দেখতে হয়।

বিনোদ। আর বলতে হবে না মাণিক—বিড়ি ছেড়ে Gold Flake সইবে তো!

মাণিক। থাক ও অলুক্ষুণে কথা। Gold এখন আমেরিকায় পাঁচ সিকের sold হচ্ছে। তারা সোনার কুড়ুল বানাচ্ছে—যুদ্ধের জড় মারবে। চালান্—খুব সইবে।

বিনোদ। এই যে, সব খবর রাখো দেখছি। হবে না! আমদের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবি স্বর্ণচন্দ্র I mean হেমচন্দ্র বলে গেছেন—

"......................নব অভ্যুদয়

পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়।"

মাণিক। আচ্ছা, আপনি এখন একটা 'হাসিতে হাসিতে' ধরাণ তো দেখি, আমার চক্ষু জুড়ুক। আপনাকে যে ও মর্য্যাদা হানিকর বিড়ি টানতে আর দেখতে পারি না স্যার! দিন ওগুলো ফেলেদি।

মাণিক বিড়িগুলো নিয়ে নিজের পকেটে—"চুলোয় যাক্" বলে ফেলে দিলে। বল্লে, caseটা আপনি আজ যে ভাবে conduct করলেন তাতে বড় বড় রক্তবীজ ভক্ত বনে যায়—গেছেও। ভেবেছিলুম কড়া সুর ভাঁজবেন, কিন্তু যা ভাজলেন তা বৈষ্ণব বিনয়কে হটিয়ে দিয়েছে। আমার চোখে জল এসেছিল মশাই।"

"ওহে কাজ নিতে হলে পুরবীই ব্যবস্থা। দীপকে দিল্ বিগড়ে দেওয়া হয়। তাতে শেষরক্ষা হয় না। সে ট্যাকসই হয় না।"

মাণিক পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে—"খুব কাজ হয়েছে মশাই—এই নিন (একতাড়া নোট) এটা advance, হপ্তায় হপ্তায় আসবে। বল্লে, "দেবতাকে তো ঘুষ দিতে পারব না। এখন থেকে সের করা সামান্য যেটা বাড়ানো হবে সেটা আমার নয়, দেবতার পূজোর জন্যে রইলো।" বললুম, "খবরদার, এমন কথা তাঁর কানে না পৌঁছয়। তিনি ছোঁবেন না, সব বিগড়ে যাবে। মানুষ দেখলে তো, অদ্বৈতবংশ। মাইনে বাদ যদি কিছু অজ্ঞাতে এসে পড়ে—দেখেছি কিনা—নবদ্বীপে মোচ্ছবে পাঠিয়ে দেন। ওসব হবে না, করতে যেও না।"

শুনে যুধিষ্ঠির বল্লে, যাঁর ধর্ম্মে গড়া দেহ তিনি অন্যের ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারেন না। আমারো তো ছিটে ফোঁটা থাকতে পারে। আমাকে পতিত করবেন কেনো। আমার দেবতার জন্যে দেওয়া, দেবতা যা ইচ্ছা করতে পারেন। নবদ্বীপে মচ্ছবেই দিন বা বিন্দাবনের কচ্ছপকেই খাওয়ান।"

—এর ওপর আমি আর কথা কইতে পারিনি ডাক্তারবাবু।"

বিনোদ। তুমি ঠিক করেছ। কারো ধর্ম্মে বা কোনো ধার্ম্মিকের প্রাণে আঘাত দিতে নেই। শোনোনি, বড় বড় মাতব্বররা এই বিপদে পড়ে কি দুর্ভাবনাই না ভোগ করছেন। লোকে ছাড়ে না, শেষ জ্বালাতন হয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজেদের শিক্ষিত মণ্ডলীর সম্মতিক্রমে ওই sloganই মঞ্জুর করে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। "যদি না দিয়ে ছাড়বে না তো গোপনে ধর্ম্মার্থে দাও, ধর্ম্ম ঢাক বাজিয়ে করতে নেই—শাস্ত্রে কোরাণে নিষেধ ইত্যাদি—যুধিষ্ঠির না কি নাম বললে, নিশ্চয়ই সে সাধুসঙ্ঘের সভ্য বা agent হবে। ওরা চারদিক ঘিরে ছড়িয়ে আছে। লোকের ধর্ম্মেকর্ম্মে সাহায্য করছে। টাকা আর যাবে কোথা, জগতের মাল জগতেই থাকবে। সকলেই তো ভাই কেউ না কেউ ভোগ করবে। কি high sloganই বেরিয়ে পড়েছে। শিক্ষায় অন্তর্দৃষ্টি এসে গেছে।—আমাদের বিষ্ণু শর্ম্মার মাথায় ঢোকেনি—কলা তাঁরাও যথেষ্ট খেতেন কিন্তু স্কলার হতে পারেন নি—

এখন আমাদের যে বিপদে ফেললে মাণিক, I mean বন্দী করলে! ওকে আশ্রয় দেব কোথায়। বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে যে। লেপের মধ্যে চেপে শুলে safeএ থাকবে না কি।"

মাণিক—"না মশাই, ও মেয়েলি ফন্দি পচে গেছে—কাজ দেবে না। লাভে হতে এই শীতে ওস্তাদেরা লেপগুলো ছিঁড়ে ছড়িয়ে রেখে যাবে। দিন রাত তো আর চেপে শুয়ে কাটাবার জন্যে আসা নয়!"

"তাও তো বটে,—উপায়?"

"চলুন,—খাকি plus খাকির অন্তর দেওয়া ছুটো হাফ্ প্যান্টের অর্ডার দিয়ে আসা যাক্। শীতটাও চেপে পড়েছে, কেউ সন্দেহ করবে না।"

বিনোদ। very wise suggestion কিন্তু মালের প্রবেশ পথ চাই তো?"

"সে বাড়িতে বসে বানিয়ে নেব।"

"Splendid—কোনো শিক্ষাই যে বাকি নেই? কিন্তু কত দিক সামলাবে? কই আছেন, হুলো আছেন, চুলোআছেন"—

"আপনার আশীর্ব্বাদে সে আমি সামলাতে পারব। আপনি কেবল"—

"বুঝেছি, মিলিটারি টেলারের সঙ্গে আলাপও আছে। আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি, আজই চাই।" দু'পা গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে—"খোলআর ঝাল দিয়ে—বুঝলে।" বেরিয়ে গেলেন।

মাণিক—পাকে মন দিলে। (ক্রমশঃ)

আধি-দৈবিক

'চন্দ্রহাস'

পুলিনবিহারী পালের নাম অল্প লোকেই জানে। অথচ তাঁহার মত প্রগাঢ় পণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জ্ঞানী পুরুষ বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। দেশী ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব তাঁহার এত ছিল যে তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের নামের পিছনে ময়ূরপুচ্ছ রচনা করিতে পারিতেন। জ্ঞানমার্গের পাকা সড়কের কথা ছাড়িয়া দিই, সমস্ত গলিঘুঁজির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; অতিবড় গূঢ় বিদ্যার আলোচনা করিয়াও কেহ তাঁহাকে ঠকাইতে পারিত না। কেবল একটি বিদ্যা তাঁহার ছিল না—ঘানিযন্ত্র হইতে কি করিয়া তৈল বাহির করিতে হয় তাহা তিনি শিখিতে পারেন নাই। এই জন্যই বোধ করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার খোঁজ রাখে না।

ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল; ভক্তিভরে তাঁহাকে পুলিন্দা বলিয়া ডাকিতাম। বিপদে আপদে অর্থাৎ বিদ্যাঘটিত কোনও সঙ্কটে পড়িলে তাঁহার শরণাপন্ন হইতাম। কখনও নিরাশ করেন নাই, তাঁহার ভাস্বর বুদ্ধির প্রভায় মনের সমস্ত সংশয় ঘুচাইয়া দিয়াছেন। মানুষ হিসাবে তাঁহাকে হয়তো সহজ ও স্বাভাবিক বলা যায় না, সাধারণে তাঁহাকে খামখেয়ালী বলিবে। কিন্তু এমন পরিপূর্ণ রূপে আত্মস্থ, একান্তভাবে নিরভিমান মানুষ আর দেখি নাই। বিবাহাদি করেন নাই; পয়সার পিছনে দৌড়িবার মত মানসিক দীনতা যেমন তাঁহার ছিল না, পয়সার প্রয়োজনও তেমনি খুব কম ছিল। উচ্চ অঙ্গের দুই একটা ইংরেজী ও মার্কিন পত্রিকাতে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া কিছু কিছু টাকা পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার অনাড়ম্বর একক জীবন চলিয়া যাইত।

বছর দুই পুলিন্দাকে দেখি নাই; মাঝে মাঝে ডুব মারা তাঁহার অভ্যাস। একদিন খবর পাইলাম, তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে বজবজ লাইনের একটি জনপদে বাস করিতেছেন এবং একাগ্রচিত্তে বাংলা ভাবাতত্ত্বের গবেষণা করিতেছেন। বিস্মিত হইলাম না, কারণ অকস্মাৎ ডুব মারিয়া অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত স্থানে আবির্ভূত হওয়া পুলিন্দার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক কার্য্য।

একদিন বৈকালে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। অনেকদিন তাঁহাকে দেখি নাই সেজন্যও বটে, তা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। কয়েক মাস হইতে একটা আধ্যাত্মিক সংশয় আমার মনকে পীড়া দিতেছিল; বোধ করি ত্রিশের কোঠা পার হইলে সকলেরই এইরূপ হয়। আধ্যাত্মিক সংশয়টি আর কিছুই নয়, সেই আদিম সংশয়—জন্মান্তর আছে কিনা, মরিবার পর আত্মা থাকে কিনা, ভূতপ্রেত আছে কিনা। প্রাচীন মুনি ঋষি অবতারগণের সহিত আধুনিক মুনি ঋষি ও চিন্তাবীরগণের এ বিষয়ে এত অধিক মতদ্বৈধ, যে মনটা একেবারে গুলাইয়া গিয়াছিল। খাঁচায় ধরা পড়া ইঁদুরের মত আমার বুদ্ধি একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল কিন্তু কোনও দিকেই পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এইরূপ মানসিক সঙ্কটের মধ্যে পুলিন্দার খবর পাইয়া ভাবিলাম তাঁহার কাছেই যাই, এ সমস্যার একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সন্তোষজনক সমাধান যদি কেহ দিতে পারে তো সে পুলিন্দা।

তাঁহার আস্তানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ছোট ষ্টেশনের নিকটে প্রকাণ্ড এক তামাকের গুদামে তিনি বাস করিতেছেন। দ্বিতল বাড়ীর উপর তলায় তামাকের পাতার বস্তা ঠাসা আছে, নীচের তলায় দুটি ঘর লইয়া পুলিন্দা থাকেন। উপর তলার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই, অধিকাংশ সময়ই উপর তলাটা বন্ধ থাকে।

এই দুই বৎসরে পুলিন্দার বয়স যে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মাথাটি স্বভাবতই ডিম্বাকৃতি; লক্ষ্য করিলাম, ডিম্বের উপর হইতে চুল ঝরিয়া গিয়া শীর্ষস্থানটি বেশ চক্‌চকে হইয়াছে; নাকের উপর একযোড়া চালশে'র চশমা বসিয়াছে। কিন্তু স্বভাব বিন্দুমাত্র বদ্‌লায় নাই; তেমনি মেঝেয় মাদুর পাতিয়া চারিদিকে পুঁথি কাগজপত্র ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে চশ্‌মার উপর দিয়া দেখিয়া সাগ্রহে আহ্বান করিলেন, 'এই যে এসেছ।' এবং এক টিপ নস্য লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা সুরু করিয়া দিলেন।

বলিলেন,—'ছাখো, বাংলা ভাষাটা দিন দিন বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে—আর সে তেজ নেই, ধমক নেই, বড় বেশী বিনয়ী বড়বেশী মিহি হয়ে যাচ্চে। ঐ যে আমাদের সাহিত্যে ব্রাহ্ম সংস্কৃতি ঢুকেছিল এটা তারই ফল। এমন দিন ছিল যখন বাঙালী রেগে গেলে দু'চারটে গরম গরম কথা বলতে পারত, শব্দের তাল ঠুকে বাহবা কোট করতে পারত; কিন্তু এখন বাঙালীকে জুতো পেটা করলেও তার মুখ দিয়ে গোঙানি আর কাৎরাণি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ বেরুবে না। বেরুবে কোত্থেকে? ভাষার সে হুঙ্কার, শব্দের সে দাপট থাকলে তো! বাঙালী জাতটাও তাই দিন দিন মিইয়ে যাচ্চে মেদিয়ে যাচ্চে। বাঙালীকে আবার চাঙ্গা করে

তুলতে হলে নতুন নতুন জোরালো শব্দ আমদানি করতে হবে—সংস্কৃত ইংরিজি ফারসী পুস্তকে যেখানে যত জবরদস্ত শব্দ আছে সব বাংলা ভাষার পেটের মধ্যে পুরে দিয়ে তাদের হজম করাতে হবে। ছাখো, বাংলা ভাষাটা অপভ্রংশের ভাষা। অপভ্রংশের দোষ এই যে সে শব্দকে মোলায়েম ক'রে ফেলে, সহজ ক'রে ফেলে। ও আর চলবে না। এখন থেকে ইয়া বড় বড় গোব্দা গোব্দা মৌলিক শব্দ ব্যবহার কর। নৈলে নিস্তার নেই।'

আমি ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম—'কিন্তু ক্রমাগত সাধু ভাষায় কথা বলা—'

পুলিন্দা বলিলেন—'তুমি একটি পুঙ্গব।'

চমকিয়া বলিলাম—'সে কি?'

তিনি বলিলেন—'মানে ষাঁড়। আমার কথাটা ভাল করে বোঝো—'

অতঃপর দুই ঘণ্টা ধরিয়া বঙ্গবাণীর শিরাধমনীতে নূতন রক্ত সঞ্চারের প্রসঙ্গ চলিল; বাংলা ভাষা তথা বাঙালীর যে নিদানকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং অচিরাৎ নাদব্রহ্মরূপী বিষ-বটিকা প্রয়োগ না করিলে রোগীর কোনও আশাই নাই একথা পুলিন্দা অত্যন্ত মজবুত-ভাবে প্রমাণ করিয়া দিলেন। উদ্বিগ্নভাবে শ্রবণ করিলাম। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত প্রশ্নটি ভুলি নাই; তাই অন্ধকার হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি যখন আলো জ্বালিতে উঠিলেন, তখন আমি তাক্ বুঝিয়া আমার আধ্যাত্মিক সমস্যাটি পেশ করিয়া দিলাম।

পুলিন্দা আলো জ্বালিয়া আবার মাছুরে আসিয়া বসিলেন; নাকের মধ্যে ডবল-টিপ নস্য গুঁসিয়া দিয়া সজলনেত্রে বলিলেন,—ভূত প্রেত আত্মা পরমাত্মা পরলোক জন্মান্তর অসিদ্ধ—কারণ প্রমাণাভাব।

এইভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়া পুলিন্দা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন; ক্রমে প্রসঙ্গ জমিয়া উঠিল; আমিও মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করিবার স্থান নাই; কিন্তু যুক্তির ধাপে ধাপে প্রমাণের সোপান রচনা করিয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত আমার বুদ্ধিকে যে স্থানে লইয়া উপনীত করিলেন সেখানে ভূতপ্রেত নাই জন্মান্তরও নাই। দেখা গেল আসলে ওগুলি বাসনা প্রণোদিত অলীক ভাবনা—wishful thinking! চার্ব্বাক হইতে বাট্রাণ্ড রাসেল পর্য্যন্ত সমস্ত মনীষীর উক্তি তাঁহার যুক্তিকে সমর্থন করিল—শরীরই সর্ব্বস্ব, মন বুদ্ধি-আত্মা সমস্তই দেহের বিকার মাত্র, সুতরাং শরীর নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?

রাত্রি অনেক হইয়া গেলেও আলোচনার শেষে মনে বেশ শান্তি অনুভব করিলাম; যাহোক তবু পাকা রকম একটা কিছু পাওয়া গেল। আত্মার দেহবিমুক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যদি নাই থাকে তবে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া ভাল। দু'নৌকায় পা দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার কোনও মানে হয় না।

আর একদিন আসিব বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি হঠাৎ মাথার উপর ভীষণ দুম্‌দাম্ শব্দে চমকিয়া উঠিলাম; যেন উপরের গুদাম ঘরে অনেকগুলা পালোয়ান যৌথভাবে মল্লযুদ্ধ সুরু করিয়া দিয়াছে। উপরে কেহ থাকে না শুনিয়াছিলাম, তামাক পাতার আড়তে মানুষের থাকা সম্ভবও নয়; তবে এত রাত্রে কাহারা বন্ধ ঘরের মধ্যে এমন দুর্দ্দান্ত দুরন্তপনা আরম্ভ করিয়া দিল?

বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম—'ও কী?'

পুলিন্দা নিশ্চিন্তভাবে নাকের চশমা খাপে পুরিতে পুরিতে বলিলেন—'ও কিছু নয়। এগারোটা বেজেছে তো! রোজ রাত্রে ঐ রকম হয়। ওপরে কয়েকটা ভূত আছে, তারাই এমন সময় দাপাদাপি করে।'

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। উপরে দাপাদাপি চলিতে লাগিল। বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উপরের ঘরে সত্যই যদি ভূতের পাল কুস্তি লড়িতেছে তবে এতক্ষণ ধরিয়া কী শুনিলাম?'

পুলিন্দা বলিলেন—'ভয়ের কিছু নেই, ওরা কোনও অনিষ্ট করে না। দশ মিনিট পরে সব চুপচাপ হয়ে যাবে।'

আমি বলিয়া উঠিলাম,—'পুলিন্দা! সত্যিই ওরা ভূত? আপনি বিশ্বাস করেন?'

তিনি বলিলেন—'হ্যাঁ, আমি খুব ভাল করে অনুসন্ধান করেছি, জ্যান্ত জীব হতে পারে না। ইঁদুর বেড়াল তামাকের ধার ঘেঁষে যাবে না, আর মানুষও নয়। সুতরাং ভূতই বটে।'

'কিন্তু—কিন্তু—এতক্ষণ ধরে এই যে আপনি প্রমাণ করলেন—'

পুলিন্দা বলিলেন—'তুমি একটি ইর্ম্মদ—মানে হাঁদা। প্রমাণের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্বন্ধ কি? ভূত আছে এটা ন্যায়শাস্ত্রমতে প্রমাণ করা যায় না, তাই ব'লে বিশ্বাস করব না? ঐ যারা ওপরে হুটোপাটি করছে ওরা কি প্রমাণের তোয়াক্কা রাখে? জেনে রাখো, বুদ্ধির সঙ্গে বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। আচ্ছা, রাত হয়েছে, আজ এস তাহলে—'

উপরে ভূতের নৃত্য চলিতে লাগিল। আমি চলিয়া আসিলাম।

'ডি-হাইড্রেসন'

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

আধুনিক যুদ্ধ সেরা বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। ধ্বংসলীলার তাণ্ডবনৃত্যের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক অতি উচ্চস্তরের সুর বাজাইতেছেন। বিজ্ঞানে কল্পনাতীত উন্নতি দৃষ্টে মানুষ বিস্ময়ে পুলকে নির্ব্বাক প্রায়! এই যে প্রচণ্ড গবেষণার ঢেউ উঠিয়াছে তাহার পেছনে আছেন রাসায়নিক, পদার্থবিদ্, ইন্‌জিনিয়ার প্রভৃতি ধুরন্ধরগণ। এস্থলে রসায়নে একটি দান সম্বন্ধে আমি সামান্য আলোচনা করিব।

বহুপূর্ব্ব হইতেই অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে এমন দিন আসবে যেদিন মানুষ একটি সামান্য বড়ি গলাধঃকরণ করিয়াই একদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিবে। সেদিন যেন খুবই নিকটবর্ত্তী। যুদ্ধক্ষেত্রে আহার্য্য সরবরাহ ব্যাপারে ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে বিজ্ঞানীর বুদ্ধি এদিকে ধাবিত হয়। অল্প বাহনের সাহায্যে প্রচুর খাদ্য চলাচলের ব্যবস্থা করা যায় কিনা ইহাই উহাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়। জার্ম্মেনীর ইউ-বোট আমেরিকার শত শত জাহাজ সমুদ্রগর্ভে প্রেরণ করার ফলে এ ভাবনা আমেরিকাবাসীকে বিশেষ করিয়া চিন্তিত করিয়া তুলে। এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে যাইয়া মার্কিন রাসায়নিক প্রথমেই জল-নিষ্কাশন দ্বারা উদ্ভিজ খাদ্যের অবয়ব ছোট করিতে চেষ্টা পান। উক্ত প্রণালীতে আলুকে অতি ক্ষুদ্রাকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেখা গিয়াছে, ঐ আলুর খাদ্যগুণের কোন অবনতি হয় নাই স্থায়িত্বের দিক দিয়া বরং উন্নতি হইয়াছে। এইরূপ তৈয়ারী আলুকে উহারা ডিহাইড্রেটেড্ (Dehydrated) পটাটু বলে। ডিহাইড্রেটেড, অর্থাৎ জলমুক্ত কফি, টমেটো, সুপ্, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি বহু খাদ্যদ্রব্য টেবলেট বা চাক্‌তির আকার পাইয়া মিত্রপক্ষের যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুনা যায়, ১৯৪৩ সনের ১৭ই মার্চ্চ যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ ষ্টেটিনাস, ওয়াসিংটনে একটি ভোজসভা আহ্বান করেন। মিত্রপক্ষের ৮০০ বিশিষ্ট ব্যক্তি সে ভোজে উপস্থিত ছিলেন এবং ভোজ্য দ্রব্য ছিল সবই ডিহাই-ড্রেটেড খাদ্য। যাঁহারা ভোজসভায় যোগ দিয়াছিলেন সকলেই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া খাদ্যদ্রব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আমেরিকার ফেডারেল গবর্ণমেন্টগুলি ১৯৪২ সনে ১২০টী ডিহাই-ড্রেটেড খাদ্যকারখানা খুলিয়াছে এবং ঐ সনে ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড খাদ্য সরবরাহ করিয়াছে। ১৯৪৩ সনে কারখানার সংখ্যা ৮০০তে দাঁড়াইয়াছে এবং প্রস্তুতের পরিমাণ ৮০০,০০০,০০০ পাউণ্ডে উঠিয়াছে। প্রত্যেক খাদ্যের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ১০—৯০ ভাগ জল থাকে। ঐ জলভাগ হইতে উহাদের মুক্ত করিতে পারিলে হাজার হাজার টনের স্থান জাহাজের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৩ সনে দেখা গিয়াছিল যে শতকরা ৪০ ভাগ জাহাজের স্থান খাদ্যের দ্বারা ভর্ত্তি থাকিত, কাজেই অন্যান্য জিনিষের স্থান ইচ্ছামত পাওয়া যাইত না। খাদ্যের স্থান সঙ্কুচিত করিয়া যুদ্ধের অস্ত্র মসলা ও সৈন্যসংখ্যা বেশী পাঠাইবার সুবিধা করার জন্য ডিহাইড্রেসন একটা বড় অবলম্বন।

যুক্তপ্রদেশের আর্মি কোয়ার্টার মাষ্টার কোর (Army Quarter Master Corp)এর লক্ষ্য এদিকে ধাবিত হইলে তাহারা প্রধান প্রধান চাপ উৎপাদক কোম্পানীগুলিকে সাহায্য করিতে আহ্বান করেন। দেখা গেল সকল চাপযন্ত্র সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেখানে যেটা দরকার সেখানে সেটাকে নিয়োগ করা হইল। আবার নূতন নূতন রসনিষ্কাশন যন্ত্র তৈয়ারী হইতে লাগিল। Army Quarter Master Corpএর তত্ত্বাবধানে যাবতীয় খাদ্যগুলির তালিকা প্রস্তুত হইল, কোন্ খাদ্য শুষ্ক করা যায় নির্দ্ধারিত হইলে তাহারা যথাস্থানে প্রেরিত হইল—ফলে ভারে ভারে তৈয়ারী মাল উহাদের হাতে আসিতে লাগিল। খাদ্যসমষ্টিকে মোটামোটি দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১। চূর্ণ খাদ্য—যেমন চূর্ণ দুগ্ধ, চূর্ণ ডিম, চূর্ণ সুপ, শাকসব্জি ইত্যাদি। ২। টুকরা খাদ্য—যেমন শাকসব্জি, ফল, মাংস ইত্যাদি। ১৯৪৩ সনের মার্চ্চের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ কার্য্য তালিকা ঠিক হইয়া যায়, কিন্তু সমস্ত বিষয়েই গবেষণাগারে প্রথমতঃ ক্ষুদ্রাকৃতিতে পর্য্যালোচনা হয়।

আমেরিকাতে সর্ব্বপ্রথম যাহার মাথায় এ বিষয়টী আবির্ভূত হয় তাঁহার নাম ডোনেলী (Donnelly)। তাঁহার মতে তিনটী প্রধান ব্যবস্থার উপর জল নিষ্কাশন নির্ভর করে। ইহারা তাপ, চাপ এবং সময়। কতকগুলি খাদ্য হইতে জল দুরীকরণে তাপের প্রয়োজন হয়, কতকগুলি আবার ঠাণ্ডায় সুবিধা হয়। দেখা গিয়াছে, প্রত্যেকটী খাদ্যবস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গবেষণার বিষয়। চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কয়েক শত পাউণ্ড হইতে কয়েক টন, পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। কোন কোন খাদ্যপ্রস্তুতে সময় বেশী লাগে, কোন কোন ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ে কাজ সমাধা হয়। মিঃ ডোনেলী বলেন যে কেবলমাত্র আয়তন খর্ব্ব করিলেই কাজ সম্পূর্ণ হয় না, দেখা দরকার যে প্রক্রিয়ার ফলে খাদ্যটী অখাদ্যে পরিণত না হয়। ইহা তৃপ্তিকর ও হজমী হওয়া দরকার। যাহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের গবেষণা দিনের পর দিন চলিয়াছে। প্রত্যেকটী বস্তুর জন্য নূতন নূতন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হইতেছে। জল, বায়ু উভয়ই নিষ্কাশন প্রয়োজন।

ডোনেলীর কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনার বিষয়। তিনি ১৯৩৬ সনে এ ব্যাপারে লিপ্ত হন। প্রথমতঃ তাঁহার কাজ ছিল খাদ্যসামগ্রী প্যাক্ করা। তিনি লক্ষ্য করেন যে প্রত্যেক জিনিষের প্যাকিংএ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দরকার। একপ্রকার মাখন প্যাক করিতে যাহাতে তৈলটা ঠিক্ থাকে তাহা দেখিতে হয়, চূর্ণ দুগ্ধ প্যাক করিতে জলীয় বাষ্প হইতে এইটাকে রক্ষা করিতে হইবে। চূর্ণ কফিকে প্যাক্ করিতে

যাইয়া তাহার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। প্যাকেটটী শেষ হওয়া মাত্র ইহা ভীষণ শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। প্রায় ১০ বৎসর ইহার পেছনে পরিশ্রম করিয়া তিনি ইহাকে আয়ত্তে আনেন। প্যাকিং ব্যাপার হইতে ক্রমে তিনি জল বায়ু নিষ্কাশনে মনোনিবেশ করেন। এজন্য অবসর সময়ে তাঁহাকে রীতিমত পড়াশুনা করিতে হইত। নিউ ইয়র্কের (New york) পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে তাঁহাকে প্রায়ই নিমগ্ন দেখা যাইত। ১৯৩৫-১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত পাউণ্ডের পর পাউণ্ড কফি ক্রয় করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। ক্রমে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার রচিত ১ পাউণ্ড চূর্ণ কফি প্রায় ১০ পেয়ালা অতিরিক্ত কফি তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছে, ডোনালী এই ক্ষুদ্র প্যাকেটটী নিয়া প্রথমে নিউইয়র্কের একটি দোকানে যান, কিন্তু দোকানদার ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কারণ তাহার মতে মেয়েরা ইহা পছন্দ করিবে না। তখন তিনি তাঁহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি জমান খাদ্য রক্ষণ ষ্টোরে ইহা প্রেরণ করেন এবং দোকানের সম্মুখে একটি বোর্ডে "টাট্‌কা জমান কফি" বলিয়া লিখিয়া রাখেন। প্রথম দিন ১ পাউণ্ড বিক্রয় হয়, দ্বিতীয় দিনে ৫ পাউণ্ড, তৎপর রোজ ১০ পাউণ্ড করিয়া বিক্রয় হইতে থাকে। গ্রাহকগণ অতি আগ্রহের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ ইহা কিনিতে লাগিলেন, সঙ্গে বহু প্রশংসা পত্র আসিয়া জুটিল। একজন মহিলা ১ পাউণ্ড দ্বারা ৮০ পেয়ালা তৈয়ার করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। ইহাই হইল ডোনেলীর সর্ব্বপ্রথম প্রেরণা। ইহার পরে মিসেস্ ডোনেলীর জনৈক বন্ধু তাঁহাকে অন্যান্য ডি-হাইড্রেটেড খাদ্য তৈয়ার করিতে উৎসাহিত করিলেন। ডোনেলীর মনে ডিহাইড্রেসন ব্যাপারে এরূপ ঝোঁক চাপিয়া গেল যে তিনি অন্যান্য সমস্ত কাজ ফেলিয়া দিবারাত্রি ইহাতেই জমিয়া থাকিতেন। সকলেই দেখিত ডোনেলী হয় গবেষণাগারে নতুবা লাইব্রেরীতে। নিজের তৈয়ারী জিনিষ স্বামীস্ত্রীতে আস্বাদ করিতেন। ডোনেলী বলিতেন ঠিক্ হইয়াছে, স্ত্রী 'না' বলিয়া ফেরত পাঠাইতেন, ডোনেলীর কাজ বাড়িয়া যাইত। ১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি জানিতে পারিলেন যে Auto ordinance Company, Wall street, New York, এ সমস্ত ব্যাপারের জন্য একটি গবেষণাগার খুলিবে। প্রায় ৪ মাস তিনি উক্ত কোম্পানীর কর্ত্তাদের পেছন পেছন ছুটিলেন। অবশেষে তাঁহাদের সঙ্গে সর্ত্তে বদ্ধ হইয়া নিজের ইচ্ছামত লেবরেটরী খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অধীনে ১০ জন বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত হইল—ইহাদের মধ্যে রাসায়নিক, পদার্থবিদ, জীবাণুবিদ্, ইন্‌জিনিয়ার ইত্যাদিও ছিলেন। কোম্পানী এদিকে সেলোফেন নামক অতি সুন্দর আবরণ-দ্বারা খাদ্য প্যাক্ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ডোনেলী জীবনে সফলকাম হইলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা ধরিয়া আমেরিকাবাসী পৃথিবীর খাদ্য-বাজারে যুগান্তর সৃষ্টি করিবে।

ডিহাইড্রেসন দ্বারা আকার সঙ্কোচন কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি তাহার সাক্ষ্য দিবে। গাজর—শতকরা ৬৫ ভাগ, বিট—শতকরা ৬৫ ভাগ, কফি—শতকরা ৮২ ভাগ, পিঁয়াজ—শতকরা ৬৫ ভাগ, মিষ্ট আলু শতকরা৬০ ভাগ, ডিম শতকরা ১৪ ভাগ, ইত্যাদি। বিষয়টীতে আমেরিকার টেক্সদাতাদের আর্থিক সুবিধা কতটুকু হইতে পারে তাহারও মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ডে নিম্নলিখিত সুবিধা দেখা যায়। পাত্র—৩৪৮৪০০ ডলার, শ্রমিক...১৩,৩০০ ডলার, দেশের মধ্যে যাতায়াত খরচ...৪২,৫০০ ডলার, সমুদ্রে যাতায়াত খরচ...২,৩১০,০০ ডলার ও ষ্টোরেজ (storage)—৩৯,৩০০ ডলার।

ক্ষুদ্রাকারে ডিহাইড্রেসন আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু তাহার এত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। শুঠ্‌কী—শুষ্ক পাটপাতা, আম্‌সি, আমসত্ব, শুঁট্‌কী মৎস্য ইত্যাদি এদেশের বহুপ্রচলিত জিনিষ। বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিপুষ্ট হইলে উহারা কত সুন্দর ও মনোজ্ঞ হয় তাহার প্রমাণ এই রাসায়নিক নব অবদান। শুনিতেছি আমাদের দেশের দুই একজন বড় বৈজ্ঞানিক ডিহাইড্রেসনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য যুক্তরাজ্যে গিয়াছিলেন। আশাকরি আমাদের পুরাতন পাটপাতা এবার নূতন রূপ ধারণ করিবে।

সেই অলস-ধোঁয়া

শ্রীজনরঞ্জন রায়

সেই নির্জ্জীব অলস ধোঁয়া...পল্লীর কোলে-কোলে যাহা জন্মায়...যাহা হইতে আগুন জলিয়া ওঠে নাই কোনো দিন...যাহা রাত্রের আকাশে ধীরে ধীরে বিসর্পিত হইয়া তার আলো-বাতাসকে চিরদিন রুদ্ধ করিয়া তোলে। আজও সেই ধোঁয়া তার আকাশে জমাট বাঁধিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় জমিদারবাবুর কাছারীর বৈঠকে নায়েব মধুসূদন জোয়াদ্দার রায় দিলেন—পাঁচ টাকা জরিমানা...আর কাল সকালে দিতে না পারিলে পেয়াদার লাঠি। হরিচরণ বাগ্দী তার অপরাধ খুঁজিয়া পাইতেছে না...সে ভাবিতেছে এই দিদিমণিকে সে কত কোলে-পিঠে

করিয়াছে…তার কপাল মন্দ যে তারই বিবাহে সে মাছের জোগাড় করিতে পারিল না, বিল খাল যে সবই শুকাইয়া উঠিয়াছে। সে যে মাছ দিতে পারে নাই তা' নয়…তবে দিবার কথা ছিল প্রায় তিন মণ…এতো পোনা মাছ যে সে এ তল্লাটে খুঁজিয়া পায় নাই।

জরিমানার টাকা হরিচরণ জোগাড় করিতে পারিল না। পরের দিন দুপুরেই গরীবদের পাড়ায় জমিদার বাড়ির পেয়াদাদের হুঙ্কার…হরিচরণের পিঠের চামড়ার ঘনত্ব তাদের লাঠির আঘাতে চৌচির…সে গোঙাইতেছে…বৃদ্ধা মঙ্গলা বেড়ার চিৎকার পাড়া কাঁপাইয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে।…পশ্চিমার দল রণে শেষে ভঙ্গ দিল। মঙ্গলা চিৎকার করিতে করিতে আসিতেছে—জমিদারের পোষা গুণ্ডারা মেরে ফেললে মালো ছেলেটাকে…কোথাও কি কেউ নেই? মঙ্গলার কাতর ধ্বনি পাড়ার জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতাকে ভেদ করিতে পারিতেছে না…ঘরে ঘরে সে শব্দ কিন্তু আঘাত করিল…কে জানে এ আঘাতের প্রতিঘাত হইবে কি-না?

হরিচরণ, তার স্ত্রী ও শিশুসন্তান আজ তিন দিন উপবাসী…ভয়ে কেহ তাদের একটা পোড়া মুড়ি দিয়াও সাহায্য করিতে পারিতেছে না। গরীবের দল গুমরাইয়া মরিতেছে।

হরিচরণের স্ত্রী পেটের দায়ে মরিয়া হইয়া বাহির হইয়াছে।…তার কোলে শিশু…মাথায় ঝুড়ি।…সোমত্ত স্ত্রীলোক…ছেঁড়া শত গিঁটবাঁধা খাটো কাপড়খানিতে লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না।…মাঠে ঘুঁটে কুড়াইতে বাহির হইয়াছে…তাহা বেচিয়া চাল আনিয়া সে রাঁধিবে।…নহিলে সবাই যে মারা যায়।

বৃদ্ধ মনোহর সাঁই দাওয়ায় বসিয়া কাশিতেছিল…সে হাঁপের রোগী…সকালে তামাক টানিতে বসিলেই একটা দমকা কাশি আসে। মালোদের সোমত্ত বৌটিকে এমন ভাবে দৌড়িতে দেখিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল…পারিল না।…কাশির আবেগে হাত কাঁপিয়া কলিকাটা হুঁকা হইতে পড়িয়া গেল তার তাঁতের খুটিগুলার উপর। রমনা বেনে মুদিখানার দোকান হইতে মুচকি হাসিয়া উঁকি মারিল…একটা রসের টপ্পা গানের এক কলি গাহিয়া উঠিল। হরিচরণের স্ত্রী লজ্জায় চোখ ঢাকিয়া দ্রুত পলাইল মাঠের দিকে। মাঠের মাঝে মিঠে-পুকুরের বাগানে জমিদারের মেয়ে ও নূতন জামাই বেড়াইতেছিল। হরিচরণের স্ত্রীকে দেখিয়া মেয়েটি চিৎকার করিয়া ডাকিল—মালো বৌ…মালো বৌ…আয় না…আমরা পিকনিক্ করছি…খেয়ে যা' না। এইভাবে সম্মুখে বাধা পাইয়া হরিচরণের স্ত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইল…পুনরায় দৌড়িল।…এবার দৌড়াইতেছে যে বাড়ির দিকে তাহা যেন সে বুঝিতে পারিতেছে না…সে দৌড়াইতেছে সামনে ধাক্কা খাইয়া বিপরীত পথে। তৃতীয় প্রহর…বৃদ্ধ রতন বেড়া লাঙলখানি কাঁধ হইতে নামাইয়াছে…তার স্ত্রী মঙ্গলা, স্বামীকে স্নানে যাইবার জন্য তেলের বাটিটি আগাইয়া দিতেছিল…হরিচরণের স্ত্রীকে সামনে দিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া মঙ্গলা ডাকিল—কালিদাসী…কালিদাসী এদিকে আয়। হরিচরণের স্ত্রী কালিদাসী থমকিয়া দাঁড়াইল…সে আবার ছুটিবার উদ্যম করিতেছিল।…মঙ্গলা দৌড়াইয়া গিয়া তাহার নড়া চাপিয়া ধরিল…বলিল—আয় বলছি নিয়ে যা…নিয়ে যা কাঁসিশুদ্ধ আমাদের ভাত ক'টা…তা'তে ফাঁসী-শূলী হয় হবে এই মঙ্গলা বেড়ার!

মঙ্গলার দুঃসাহসে গরীব শূদ্রের দল চমকিয়া উঠিল।…কে জানে এই চমকে বিদ্যুৎ আছে কি-না…অপমানের জমাট বাঁধা ধোঁয়ার বুক বাহিয়া অগ্নিপ্রবাহ দেখা দিবে। কি-না? এই ফাটলধরা সমাজের মাথায় সে বজ্র হানিবে কি-না?…আর তার দহনে এই সব মুখোসধারী-ভীরু-পা-চাটার দল পুড়িয়া ছারখার হইবে কি-না? আর সেই আগুন ও রক্তে স্নান করিয়া আত্মসম্ভ্রমশীল নতুন মানুষের দল জাগিয়া উঠিবে কি-না?…

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্রোতের মতো দিন বহিয়া চলে—বহিয়া চলে বৃহত্তর পৃথিবীর বিবর্তনশীল দিনগুলি। তারপরে শোনা গেল বোমা পড়িয়াছে রেঙ্গুনে। তারপর একদিন চট্টগ্রামের আলো নিভিল। অজানা আশংকা এবং ভবিষ্যতের একটা অনিবার্য মৃত্যু তরঙ্গ যেন দিকে দিগন্তে তাহার সুনিশ্চিত আবির্ভাবের সংকেত জানাইল। পালাও—পালাও। উদীয়মান সূর্যের পাখা মেলিয়া জাপানী বোমারু আসিতেছে। আরাকানের পাহাড় হইতে তাহাদের কামানের বজ্র গর্জন।

মুহূর্তে পৃথিবীর রঙ বদলাইয়া গেল। সহরে মিলিটারী আসিয়া বাঁধিয়াছে আস্তানা। বিমানধ্বংসী কামানগুলি ঢেকে, পাহাড়ের টিলায় মাথা উঁচু করিয়া শত্রুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর দিয়া বিমান ঘুরিতেছে চক্রাকারে। এ-আর পির অসংখ্য সতর্ক বাণী। শ্লিট-ট্রেঞ্চের সমারোহ। বাংলার ফ্রন্ট লাইন।

সমস্ত মানুষগুলির মুখ লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। আশা নাই, আনন্দ নাই, একটা আতংকের কালো ছায়া আসিয়া ভিড় করিয়াছে সকলের মুখে। যখন তখন তীব্র স্বরে কাঁদিয়া ওঠে সাইরেন। ট্রেনে ষ্টিমারে আশ্রয় লইয়া উর্ধশ্বাসে পালাইতেছে মানুষ। সময় নাই—সময় নাই। তাহারা আসিয়া পড়িল।

সারাটা রাত নেশা করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল গঞ্জালেস্। পেরিরা আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল।

—এখনো চুপ্ করে পড়ে আছো যে?

গঞ্জালেস্ পাশ ফিরিয়া বলিল, কী করতে হবে?

—প্রাণে বাঁচতে হলে এইবেলাই সরে পড়তে হবে। চাটি বাটি এবারে তোলো।

গঞ্জালেস্ যেন এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিল কথাটা। কেন, কী হয়েছে?

পেরিরা চটিয়া উঠিল: হয়েছে মাথা আর মুণ্ডু। আচ্ছা লোক তো তুমি। ওদিকে যে কী কাণ্ড ঘটছে খেয়াল নেই বুঝি? জাপানীরা যে এসে পড়ল।

—বেশ তো, আসুক না।

—আসুক না? বিস্ফারিত চোখে পেরিরা বলিল: ভেবেছ কি তুমি? ওরা কি তোমার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসছে নাকি? বোমা দিয়ে সব পুড়িয়ে যে ছারখার করে দেবে। শোনোনি, বর্মা যে বে-হাত হয়ে গেল। এখনো সময় আছে, চলো—কলকাতার দিকে সরে পড়ি।

—আর কাজ কারবার?

—কাজ কারবার? প্রাণে বাঁচলে ওসব ঢের হবে। এখন মানে মানে তো প্রাণ নিয়ে সরে পড়ো আগে।

—ধ্যাং—ধ্যাৎ! অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে গঞ্জালেস্ বলিল, এইজন্যে তুমি আমার নেশাটা চটিয়ে দিলে! যে জাহান্নামে খুশি তুমি যেতে পারো, আমি এখান থেকে নড়ব না।

—মরবার বুদ্ধি হয়েছে, তাই না?

—তাতে তোমার কী? আমি মরলে তো আর তোমাকে চ্যাংদোলা করে কবর দিয়ে আসতে হবে না। যে চুলোয় ইচ্ছে যাও, আমাকে খামকা জ্বালাতন কোরো না।

—বটে বটে। পেরিরা চটিয়া আগুন হইয়া গেল: ভালো কথা বললে মন্দ হয় কিনা। আচ্ছা, তুমি থাকো এখানে। বোমা খেয়ে যদি উড়ে না যাও তো—

—হুইস্কি খেয়ে তো ঢের উড়লাম, একবার বোমা খেয়েই দেখি না—গঞ্জালেস্ বোকার মতো দাঁত বাহির করিয়া হাসিল: একটা নতুন রকমের নেশার স্বাদ অন্তত পাওয়া যাবে। শুনেছি হুইস্কির চাইতে বোমার ঝাঁজটা অনেক বেশি, নয় কি?

—চুলোয় যাও। তোমার আত্মাটা শয়তানে একেবারেই খেয়ে ফেলেছে দেখছি—পাদরী সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া এবং সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পেরিরা বাহির হইয়া গেল। এখন একটা পাড় মাতালের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া তর্ক করা নিছক সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পিছন হইতে গঞ্জালেস্ ডাকিয়া বলিল, পারো তো যাওয়ার আগে বোতল তিনেক হুইস্কি বিদায়ের উপহার দিয়ে যেয়ো বন্ধু। আমার ত ঢের খেয়েছ, এখন—

পেরিরা জবাব দিল না, বাকীটা শুনিবার জন্যে দাঁড়াইলও না। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা নিজের যথাসর্বস্ব গুছাইয়া লইয়া সে কলিকাতার ট্রেণ ধরিল।

কিন্তু গঞ্জালেস্ও আর বেশিদিন নিজের নির্বিকার ঔদাসীন্যের মধ্যে ঘুমাইয়া থাকিতে পারিল না। বাহিরের অতি বাস্তব

পৃথিবীর স্পর্শ সেও অনুভব করিল একদিন। দোকানে গিয়া মদ পাওয়া গেল না—চালান বন্ধ। প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া এক বোতল ধেনো সে সংগ্রহ করিল, তারপরে চলিল তাহার প্রিয়তমার সন্ধানে। কিন্তু সেখানে গিয়াও আজ তাহাকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। শুধু তাহার প্রিয়তমারই নয়, সমস্ত অন্তরের দরজাই বন্ধ। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে যাহারা এই দূর বিদেশের রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে আসিয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনটা সকলের চাইতে বেশি এবং এ ক্ষেত্রেও তাহাদের দাবী অগ্রগণ্য। গঞ্জালেস্ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সব কিছু বিস্বাদ আর নিরর্থক হইয়া গেছে। আজ সে প্রথম অনুভব করিল যুদ্ধ আসিয়াছে—দিকে দিকে তাহার বাহু বাড়াইয়া দিয়াছে। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিয়া খানিকটা আগুন জ্বলিয়া গেল। মদের বোতলটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তারপর লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটিয়া চলিল।

যুদ্ধ আসিয়াছে। সমস্ত শহরটা অন্ধকার। শুধু মাথার উপরে অনেকগুলি লাল নীল আলো মৃদু গর্জনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিমান।

গঞ্জালেস্ চলিতে লাগিল। অন্যমনস্কভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে একটা ল্যাম্প পোষ্টে ধাক্কা খাইল সে, একটা নেড়ী কুকুরের লেজ মাড়াইয়া দিল—কুকুরটা আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া সমস্ত শহরটা যেন মাথায় করিয়া তুলিল। তীব্র আলোর জোয়ারে চারিদিক ভাসাইয়া দিয়া ছোটখাটো একটা লোহার ঝড়ের মতো মিলিটারী ট্রাক নক্ষত্রবেগে বাহির হইয়া গেল—একটুর জন্যে চাপা পড়িল না গঞ্জালেস্।

চলিতে চলিতে কখন যে পথ শেষ হইয়া আসিয়াছে সে নিজেও টের পাইলনা। যখন টের পাইল, তখন আর আগাইয়া আসিবার উপায় নাই। কালো অন্ধকারের টানা স্রোতের মতো সামনে কর্ণফুলী বহিয়া চলিয়াছে অবিশ্রাম কলচ্ছন্দে। হাওয়ায় তীরের নারিকেল বীথি মর্মরিত হইতেছে। অনেক দূরে ডকের একরাশ অস্পষ্ট আলো। জাহাজ নোঙর করিয়া আছে। গঞ্জালেস্ চুপ করিয়া নদীর ধারে বসিয়া রহিল।

সত্যিই যুদ্ধ দেখা দিয়াছে—যুদ্ধ প্রবেশ করিয়াছে রক্তে। কোনোদিক হইতেই তাহার হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই। সব কিছুতেই সে তাহার দাবী জানাইতেছে নিষ্ঠুর ভাবে, মর্মান্তিক ভাবে। নদীর বাতাসে অনেকদিন পরে যেন গঞ্জালেসের উত্তপ্ত মাথাটা প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিল। মনে পড়িয়া গেল: গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সহরের পথে দুটি একটি করিয়া মড়া ছড়াইয়া থাকে আজকাল। শুধু মদ নয়, চাল-ডাল-আটা নুন-তেল সব কিছুই দিনের পর দিন হাওয়া হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। আজ একমাত্র যুদ্ধটাই সত্য এবং তাহার চাইতেও কঠিনতর সত্য যুদ্ধের নির্মম দাবী, অনিবার্য প্রয়োজন।

গঞ্জালেসের চেতনা নিজের মধ্যে নাড়া খাইয়া যেন জাগিয়া উঠিতেছে। এতদিন কোথায় ছিল, কিসের মধ্যে তলাইয়া ছিল সে? সে তো এমন ছিলনা। ডেভিড্ গঞ্জালেস্‌কে তাহার মধ্যে কে জাগাইয়া দিল? বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়িল ডি-সুজাকে, মনে পড়িল লিসিকে। ডি সুজা। গলায় দড়ি আঁটিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছিল—তাহার জিভটা দু হাত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। আর লিসি? কোথায় সে? কোন্ সাতসমুদ্রের ওপারে সে চিরদিনের মতো হারাইয়া গেছে?

ঘাসের জমির সামান্য নীচেই কর্ণফুলীর কালো জল কলকল করিয়া বহিতেছে। মৃত্যুর প্রবহমান করাল ধারার মতো কালো। নারিকেল বীথি যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। ওখানে বনের মাথায় খানিকটা রক্ত মাখাইয়া দিল কে? চাঁদ উঠিতেছে নাকি ওখানে? সমস্ত পৃথিবীটা যেন মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

অসহ্য তৃষ্ণায় যেন পুড়িয়া যাইতেছে গলাটা। গঞ্জালেস জলের কাছে নামিয়া গেল। আঁজলা আঁজলা করিয়া জল খাইতে সুরু করিল। কী ঠাণ্ডা জলটা—নেশা হয় না, জুড়াইয়া যায় শরীরটা।

হঠাৎ কান্নার মতো একটা তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক আর্তনাদ উঠিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে সমস্ত শহরটাকে যেন চকিত করিয়া দিল। নদীর জল শিহরিয়া উঠিল। এখানে ওখানে যা দু একটা ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে দপ্ দপ্ করিয়া অতল অন্ধকারে তাহারা নিবিয়া গেল। বনের প্রান্তে যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল চাঁদটা।

এর আগে আরো অনেকবার বাজিয়াছে, কিন্তু আজকের এই দীর্ঘায়ত অবিশ্রাম কান্নার মধ্যে কিসের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন আছে। গঞ্জালেস্ ঘাসের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া পড়িয়া রহিল নিঃসাড় হইয়া। কতক্ষণ? এক মিনিট, দুই মিনিট, হয়তো বা পাঁচ মিনিট। তারপরেই শোনা গেল দূরের আকাশে এক ঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জন। উপরের তারকা-খচিত পটভূমির নীচে লাল আলোক-বিন্দু দিয়া গড়া একটা তীরের ফলার মতো 'ভি' রচনা করিয়া শত্রু-বিমান উড়িয়া আসিতেছে।

সার্চ লাইটের তীব্র আলো আকাশকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল—পাহাড়ের টিলা হইতে গর্জন করিল অ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট। অন্ধকারের শূন্যতায় আলোর ফুলঝুরি ছড়াইয়া দিয়া শেল্ ফাটিয়া পড়িল। বোঁ-ও-ও। মৌমাছির ঝাঁকটা বাজ পাখীর মতো ছোঁ দিয়া নীচে নামিল, আবার সার্চ লাইটের তীব্র আলো প্রলয়ের বিদ্যুৎ চমকের মতো উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল সমস্ত।

বুম্ বুম্—কট্-কট্-কট্—

বিদ্যুৎ চমক—মাথার উপরে আলোকের ফুলঝুরি। অ্যান্টি-এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট অবিশ্রান্ত গর্জন করিতেছে। পেটের নীচে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে মাটিটা—যেন মুহূর্তে হাঁ করিয়া গিয়া গোটা শহরটাকেই তলায় টানিয়া লইবে। কর্ণফুলীর জলে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ—অন্ধকারের মধ্যেও দেখা গেল অনেকটা জুড়িয়া একটা শাদা ফেনার বিশাল ঘূর্ণি জলস্তম্ভের মতো দাঁড়াইয়া উঠিল। কট্ কট্ বুম্ বুম্। মাটিটা কি চড়্ চড়্ করিয়া ফাটিতেছে নাকি? হঠাৎ ডকের দিক হইতে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিয়া সব কিছুকে যেন ডুবাইয়া দিল। একটা বিরাট আগুনের শিখা আকাশকে ছাড়াইয়া আরো উপরে লক্ লক্ করিয়া উড়িয়া গেল—গঞ্জালেসের চোখের সামনে নামিল মূর্ছার অন্ধকার।

টলিতে টলিতে সে বাড়ি ফিরিল—সে একটা নরকের মধ্য দিয়া। আগুন—রক্ত। ধ্বংসস্তূপ। এই জাপানী বোমা! হুইস্কির চাইতে কড়াই বটে, একটু বেশি পরিমাণেই কড়া। গঞ্জালেসের মতো পাঁড় মাতালেরও অতটা বরদাস্ত হইবে না।

একবার—দুইবার—তিনবার। শহরে আর মানুষ নাই। দোকানপাট প্রায় বন্ধ—খাবার মেলেনা। চাকরটা পালাইয়া বাঁচিয়াছে। শ্মশানের একটা প্রেতের মতো এভাবে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগেনা। গঞ্জালেস্ ভাবিল, এইবারে এখান হইতে সত্যিই সরিয়া পড়া দরকার।

কিন্তু কোথায় যাইবে সে? কলিকাতায়?

না, কলিকাতায় নয়। চোখের সামনে একটা অপরিস্রুত তটরেখা ভাসিয়া উঠিতেছে। যেখানে পর্তুগীজদের ভাঙা গীর্জাটার তলা দিয়া খরস্রোতে নোনা গাঙের জল বহিয়া চলিয়াছে; বালির মধ্যে পুঁতিয়া থাকা লোহার কামান আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনশো বছর আগেকার স্বপ্ন দেখিতেছে; জোয়ার ভাঁটার সন্ধিক্ষণে গাঙের জল যেখানে জ্যোৎস্না রাত্রিতে থাকিয়া থম্‌থম্ করিতেছে আর তাহার উপর চিত্র-বিচিত্র ডানার ছায়া ফেলিয়া বুনো হাঁসের দল উড়িয়া চলিয়াছে—সেইখানে।

সে চর ইস্‌মাইল।

ক্রমশঃ

শিশু-চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

শিশুচিত্র সম্বন্ধে আমাদের দেশে আগ্রহ দেখা যায় নাই। আনন্দের বিষয় সম্প্রতি এ বিষয়ে কিশোর আলেখ্য সম্মেলন ঔৎসুক্য দেখাইতেছেন। এঁদের কর্মী শ্রীমান্ ধীরেশ ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় শিশুচিত্র প্রদর্শনী সম্ভব হইয়াছে। এই শিশুচিত্র প্রদর্শনীর পৃষ্ঠপোষক হইলেন অনারেবল্ স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় কে-সি-আই-ই, সভাপতি অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইতিমধ্যে যে কয়েকটি প্রদর্শনী হইয়াছে, তাহাতে শিশুদের আগ্রহ দেখা গিয়াছে; শুধু কলিকাতা নহে, কলিকাতারও বাহির হইতেও প্রদর্শনীতে চিত্র আসিয়াছে।

ইউরোপে শিশুদের চিত্র সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখা যায়। এবিষয়ে তাহাদের সচিত্র পুস্তক পাওয়া যায়; সমগ্র ইউরোপের শিশুদের চিত্র সম্বন্ধে তাহা হইতে জ্ঞান লাভ হয়। শিশুদের চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী করিয়া তাহাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম আমাদের দেশেও ঐরূপ বাৎসরিক প্রদর্শনী করিয়া ছেলেদের উৎসাহিত করা হউক। সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শনী করিতে খরচ পড়িবে ১০০০৲ হাজার টাকা; পুরস্কার ও প্রদর্শনীর খরচ বাবদ এই টাকা লাগিবে। এই ব্যাপারে একটি সচিত্র ক্যাটালগ ছাপাইতে হইবে। প্রদর্শনীতে ছবি দিতে ছেলেদের কোনো ফি লাগিবেনা; কিন্তু এই টাকা কলিকাতার স্কুলসমূহ দিবে। প্রত্যেকটি স্কুল ৫০৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিলে অনায়াসে এই টাকা উঠিয়া যাইতে পারে।

ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আমরা নানা বিষয়ে ভাবিয়া থাকি। চিত্রশিল্পও একটা বিষয়—আমাদের সেজন্য ভাবা উচিত। এ বিষয়ে অভিভাবক এবং বিদ্যালয় উভয়েরই দৈন্য আছে। কেহই তাহাদের ছবি আঁকিতে উৎসাহ দেন না। মনে করেন ছবি আঁকা শিখিয়া কি করিবে? আজকাল সঙ্গীত এবং অনেক স্থলে নৃত্য শিক্ষা দিবারও আগ্রহ দেখা যায়। সে রকম মেয়েদের চিত্র অবশ্য-শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। আলপনা, সূচিকর্ম্ম প্রভৃতি পারিবারিক কর্ম্মে ডিজাইনের প্রয়োজন হয়। চিত্রকর্ম্মে আগ্রহ থাকিলে এ সব কাজ সহজসাধ্য হইবে। অবসর সময়ে চিত্র বিশ্লেষণ করার জন্য চিত্র একটি অতি আবশ্যকীয় বিদ্যা।

শিশুরা যদি শৈশব হইতেই চিত্রে আগ্রহ দেখায় তবে ভবিষ্যতে আর্টিষ্ট হইতে তাহাদের সাহায্য করিবে। আজকাল আর্টিষ্টদের চাহিদা আছে। কমার্শিয়াল কাজে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হয়। আর্থিক কারণ ছাড়িয়া দিলেও মানসিক চর্চ্চার জন্য চিত্রের স্থান আছে।

শিশুদের শিক্ষা' সম্বন্ধে মণ্টেসরি সিস্‌টেম, ডালটন প্ল্যান প্রভৃতি আছে। ইউরোপে শিশুশিক্ষায় চিত্র একটি বিশেষ অঙ্গ। ছবি সম্বন্ধে শিশুদের একটি স্বাভাবিক আগ্রহ আছে; আমরা তাহা জোর করিয়া নষ্ট করি। ছবির ন্যায় মাটির কাজেও শিশুদের আগ্রহ দেখা যায়। শিশুরা মাটী লইয়া খেলা করিতে চায়। প্রতি বিদ্যালয়ে চিত্রের ন্যায় ক্লে মডেলিং শিক্ষা দেওয়া উচিত।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

কয়েকদিন পরের কথা—

অমল লাইব্রেরীতে পড়িতেছিল—কেবল বই খুলিয়া বসিয়া থাকাই নয়, সত্যই পড়িতেছিল। অপর্ণার জন্য মন তার এখন আর প্রতীক্ষাচঞ্চল হয় না। সে জানে, অপর্ণা সকলের সম্মুখে তাহাকে না চিনিবার ভান করিলেও অন্তরীক্ষে সে তাহাকেই ঘনিষ্ঠভাবে চায় এবং সভ্যতার ও আভিজাত্যের মুখোস ত্যাগ করিয়া অসঙ্কোচেই কথাবার্ত্তা বলে। নিজেকে লুকাইবার এবং নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও আগ্রহহীন করিয়া রাখিবার সচেষ্ট যত্ন এখন আর নাই।

সেদিন শুক্রবার। সন্ধ্যা হইতে দেরী নাই—লাইব্রেরী কক্ষের উন্মুক্ত জানালা দিয়া অদূরের মেঘ দেখা যায়। অপর্ণা চলিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময়ে অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে যেন ডাকিয়াই গেল—

অমলও বাহির হইয়া আসিল। লিফ্‌টের গোড়ায় দাঁড়াইয়া অপর্ণা বোধ হয় তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। অমল বলিল—নমস্কার, আজ এত তাড়াতাড়ি উঠ্‌লেন যে!

—আপনি পড়ুন, যতক্ষণ ইচ্ছা। আমার আর ধৈর্য্য নেই। কিন্তু আপনি যে পিছু পিছু উঠে এলেন।

—আপনি ডাক্‌লেন বলে!

—আমি ডেকেছি?

—ডাকেন নি, তা হ'লে?

—আপনি বুঝলেন কি ক'রে?

—আপনি যে ভাবে চেয়ে এলেন তাতেই মনে হ'ল আমাকে ডাক্‌ছেন, অবশ্য সেটা ভুলও হ'তে পারে। অসম্ভব নয়—

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া প্রশান্ত দৃষ্টিতে অমলের মুখখানা দেখিয়া লইয়া বলিল—না ভুল করেন নি—নীরব ভাষাও তা হ'লে মানুষে বুঝতে পারে, কেমন? বুঝলাম আপনি নীরব-ভাষা-বিদ।

—আপনিও ত নীরব-বচনবিদ তা হ'লে।

অপর্ণা বিনা ভূমিকাতেই বলিল—কাল, অর্থাৎ শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতেই ক্লাবের মিটিং হবে, আপনাকে সেই দিনই উপস্থিত চাই। অতএব আজ টাকা দু'টো দিন ত, আপনার নাম তুলে রাখবো, ওই মিটিংএই আপনাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেব, কেমন?

—ধন্যবাদ। অমল দ্বিধা করিতেছিল, পকেটে মাসের সম্বল মাত্র দুইটি টাকাও সামান্য কয়েক আনা পয়সা আছে—বাকী কয়েকদিন কি হইবে, কে জানে। অমল যন্ত্রচালিতের মত টাকা দুইটি তুলিয়া অপর্ণার হাতে দিয়া বলিল—পুনরায় ধন্যবাদ জানাই যে জীবনে আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের মহার্ঘ সুযোগ আপনি দিয়েছেন, নইলে জীবনের একটা দিক খালি থেকে যেত?

—কেন? অকস্মাৎ পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল কিসে?

—আপনাদের মত মহিলাদের বন্ধুত্বে?

—কেবলমাত্র এই!

—আর কি?

—আরও কত সম্ভাবনা থাকতে পারে, সে কল্পনাও কি ক'রতে পারেন না ছাই!

অপর্ণা চলিয়া যাইতেছিল, অমল ডাকিয়া বলিল—একটা বড় ভুল ক'রেছেন, আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা ত জানাননি, পৌছব কি ক'রে?

অপর্ণা ব্রীড়া ভঙ্গিসহকারে একটু বিলোল কটাক্ষে চাহিয়া বলিল—ডেজি নামটা আবিষ্কার ক'রলেন, আর ঠিকানাটা সংগ্রহ ক'রতে পারেন নি? আপনার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়—

—আপনি আলোক দান ক'রলে উজ্জ্বল হতে পারে, বিনালোকে উজ্জ্বল হওয়াটা ত অসম্ভব ভাগ্য।

অপর্ণা বলিল—বিধাতা আর যেদিকেই আপনাকে বঞ্চিত করুন, অন্ততঃ ভাষায় বঞ্চিত করেন নি। আচ্ছা নমস্কার—আসি। কাল যাওয়া চাই—ঠিক সাতটায়। ভয় নেই আধ্যাত্মিকতত্ত্ব আলোচনা হবে না—

অপর্ণা চলনছন্দে অঞ্চল আন্দোলিত করিয়া, অনবদ্য সুন্দর একটা ছন্দের তরঙ্গ ও যতিতে, সমস্ত দেহকে গতি

দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। পিঠের উপর শাড়ীর পাড়, নিবিড় পাদক্ষেপ চঞ্চল নিতম্বের নীচে ঘনকুঞ্চিত শাড়ীর ভাজ একসঙ্গে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে,—অমল মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে অপস্রয়মান দেহটির সৌন্দর্য্যকে সুরাপাত্রের মত নিঃশেষে পান করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল,—আজ কয়েকদিন সে ত রঙীন শাড়ী পরিয়া আসে না, আটপৌরে মিলের শাড়ী পরিয়া আসে—কেন? কয়েকদিন আগের একটা কথা মনে পড়িয়া সে ব্যথিত হইল। হয়ত তাহার ব্যঙ্গেই সে আহত হইয়াছে—

অমল অত্যন্ত দ্রুতপায়ে অগ্রসর হইয়া একটু উচ্চকণ্ঠেই ডাকিল,—মিস্ রায়।

অপর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আবার কি হ'ল? ঠিকানা ভুলে গেলেন বুঝি?

—না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে ক'রবেন না? বলুন, মনে ক'রবেন না।

অপর্ণা বলিল,—কি কথা? আচ্ছা ক'রবো না বলুন—

—আজ কয়েকদিন আপনি সাধারণ শাড়ী পরে আসেন কেন? রঙীন শাড়ী পরেন না কেন?

—রঙীন শাড়ী আমাকে মানায় না তাই। অপর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহা যে একান্তই কষ্ট-প্রকাশিত তাহা বুঝিতে অমলের দেরী হইল না। অপর্ণা একটু ব্যথিত ভাবেই মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

—যে বলেছে, সে হয় মিথ্যা কথা ব'লেছে না হয় ঠাট্টা ক'রেছে।

অপর্ণা প্রশান্ত আঁখি মেলিয়া বলিল,—আপনিই ত বলেছেন।

—না, আপনি ভুল বুঝেছেন। সে নীল শাড়ীর পটভূমিকে আজও আগ্রহে আপনাকে দেখ্‌তে চাই।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—না পরলে ক্ষতি কি? এতে কি খুব কুচ্ছিৎ দেখায়?

—না, তবে আমার অনুরোধ, আপনাকে সাম্‌নের হপ্তায় সেই শাড়ীখানা পরতেই হবে।

অপর্ণা বলিল,—তাই হবে, কিন্তু আপনার অনুরোধের এত মূল্য আপনি দেন কেন?

উত্তরের সময় না দিয়াই অপর্ণা চলিয়া গেল। অমল নিজের ব্যবহার, অতি নগ্ন প্রশ্ন ও অনুরোধের কথা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিল, যেন একটু অশোভন আগ্রহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মনে মনে সে এই অসংযমের জন্য অনুশোচনা করিল না, বরং মনে মনে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে বলিয়া খুসীই হইল।

(ক্রমশঃ)

কয়লার ব্যবহার

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

২

আকস্মিক ঘটনার প্রভাব

কয়লার উপোৎপাদ্য বস্তুর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানে আকস্মিক ঘটনার প্রভাব সম্বন্ধে দুইটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত রঙ এখন প্রাকৃতিক প্রায় সমস্ত রঞ্জন পদার্থকে অপসারিত করিয়া সেই স্থান দখল করিতেছে। আলকাতরা হইতে যে রঙ পাওয়া যাইতে পারে তাহা ১৮৫৭ সালে অষ্টাদশবর্ষীয় বালক পার্কিন (Perkin) আবিষ্কার করেন। তাহার পর নানা অনুসন্ধান চলিতে থাকিলেও বিশেষ কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। তাহার পর ১৮৬৮ সালে গ্রেব্ (Graebe) ও লাইবারমান্ (Libermann) আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত অ্যানথ্রাসিন্ (anthracene) হইতে এ্যালিজারিন (alizarine) আবিষ্কার করেন। ইহাই ভারতের নীলের প্রধান শত্রু; প্রকারান্তরে ধ্বংসের মূল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত আকস্মিক ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আলকাতরা হইতে নীল প্রস্তুত প্রক্রিয়ার এক অধ্যায়ে ন্যাপ্‌থ্যালিন (naphthalene) কে থ্যালিক এ্যাসিড (phthalic acid) এ পরিণত করিতে হয়। ইহা কেবলমাত্র উত্তপ্ত সলফিউরিক এ্যাসিড-এর সাহায্যে সম্পন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু এই প্রণালীতে

বহু সময় লাগে। এত মন্থরভাবে কাজ চলিলে পরীক্ষাগারের উদ্দেশ্য সফল হইলেও বাণিজ্যক্ষেত্রে তাহা কার্য্যকর নয়। সুতরাং কার্য্য দ্রুত করিবার জন্য বহু চেষ্টা চলিতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল পাওয়া যায় না। গবেষণা কার্য্যের সরঞ্জামের সহিত সল্‌ফিউরিক এ্যাসিডের উত্তাপ পরিমাপের জন্য একটী যন্ত্র (thermometer) সংলগ্ন থাকিত। একদিন দৈবক্রমে ঐ তাপমান যন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহার পারদ সলফিউরিক এ্যাসিডের মধ্যে পড়ে। ফলে দেখা গেল, এতদিন যে কার্য্য সম্ভব হয় নাই, তাহা নিমেষে হইয়া গেল। সলফিউরিক এ্যাসিডের ক্রিয়া অত্যধিক শক্তিশালী ও দ্রুত হইয়া উঠিল এবং রঙ প্রস্তুতের মোট সময় হ্রাস পাইল। ইহাই প্রাকৃতিক নীলের ধ্বংসের কারণ।

স্যাকারিণ আবিষ্কার

এই প্রসঙ্গে আরও একটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার জন্ হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের (John Hopkins University) কর্ম্মী ফলবার্গ (Fahlberg) গবেষণাগারে সমস্ত দিন গুরুপরিশ্রমের পর পরিশ্রান্ত অবস্থায় নৈশ ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। একটুকরা রুটী মুখে দিয়া দেখিলেন যে উহা অত্যন্ত মিষ্ট স্বাদযুক্ত। রুটীতে পূর্ব্ব হইতেই এত চিনি দেওয়া হইল কেন—বলিয়া তিনি পত্নীর নিকট অনুযোগ করিলেন। গৃহিণী অবাক্; কেবল মৃদুভাবে সেই অভিযোগ অস্বীকার করিলেন। ফল্‌বার্গ পুনরায় একটুকরা রুটী মুখে দিলেন, তাহার ফলও অনুরূপ হইল। তখন রুটী ভাঙ্গিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দিলেন। স্বামীর স্পর্শিত রুটী যখন তাঁহার মুখে অত্যন্ত মিষ্ট লাগিল, ফলবার্গের মুখে প্রণয়িণী প্রদত্ত রুটীর কোনও স্বাদের পরিবর্ত্তন হইল না। তখন নিজের অঙ্গুলি মুখে দিয়া দেখিলেন, উহাই মিষ্টস্বাদযুক্ত। ফলবার্গ মহা বিস্ময়ে সকল কথা ভাবিতে লাগিলেন। কি ঘটিল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অলৌকিক ঘটনার যুগের অবসান হইয়াছে; সম্রাট মাইডাস্ (King Midas) বরলাভ করিয়াছিলেন, তিনি যাহা স্পর্শ করিবেন, তাহাই স্বর্ণে পরিণত হইবে। ফলবার্গের নিজের সম্পর্কে এরূপ কিছুই ত ঘটে নাই। ভারতবর্ষ হইলে, ফলবার্গ ভোজ্যবস্তু স্পর্শদ্বারা উহাতে মিষ্ট স্বাদ দানে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া যাবজ্জীবন সুখে কালাতিপাত করিতে পারিতেন। যাহাই হউক, তিনি কিছুতেই স্বস্তিলাভ করিতে পারিলেন না। সমস্তদিন ধরিয়া যে সকল দ্রব্যাদি নানাচাড়া করিয়াছেন, তাহাই কেবল মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন সম্ভবতঃ চিনি স্পর্শ করিয়া থাকিবেন; তাহাও নহে। তাহা ছাড়া চিনি অপেক্ষা এই মিষ্টত্বের স্বাদ আরও তীব্র; সুতরাং ইহা কি!

অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে তিনি সারাদিনই আলকাতরা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন; তাহা ছাড়া আর কিছুই মনে আসিল না। তখন পরীক্ষাগারের মধ্যে কোথায় কি ঘটিয়াছে, ইহা লইয়া পরদিন গবেষণা চালাইলেন, দেখিলেন কোন সময় তাঁহার অজ্ঞাতসারে, মিষ্টস্বাদ-যুক্ত এক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে ইহাই স্যাকারিণ (saccharine); অনুরূপ পরিমাণ চিনির তুলনায় ইহা বহুগুণ মিষ্ট। ফলবার্গ প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া আজ স্যাকারিণ বাণিজ্যক্ষেত্রেও স্থান পাইয়াছে। ইহা চিনি অপেক্ষা মিষ্ট হইলেও, দেহের মধ্যে চিনির তাপ বা শক্তি উৎপাদনকারী গুণ স্যাকারিণে নাই। অনেক দেশে স্যাকারিণের আমদানী আইনের দ্বারা বন্ধ করা আছে।

বহুমূত্র-রোগীর পক্ষে চিনি অহিতকর; সুতরাং চিকিৎসকে উহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন। অথচ যাঁহারা সারাজীবন মিষ্টাস্বাদে অভ্যস্ত তাঁহাদের মিষ্ট একেবারে না হইলে চলে না; তখন স্যাকারিণের ব্যবস্থা দিয়া চিকিৎসক নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকেন।

ভারতে কয়লা ব্যবহারের সূত্রপাত

ভারতীয় কয়লা ব্যবহারের কথা এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৯ সাল হইতে উৎখাত কয়লার হিসাব পাওয়া গেলেও কয়লা ব্যবহারের যে বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ভারতীয় শিল্পের পরিচয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৭৫ হইতে ১৯০০ সালের মধ্যে ভারতীয় কয়লা ব্যবহারের বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৮৭৫ সালেও ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে শতকরা ৭১ ভাগ কয়লা আমদানী করিতে হইত, ১৯০৪ সালে তাহা এক ভাগে দাঁড়ায়; ভারতীয় কয়লা সমস্ত ক্ষেত্র দখল করিয়া লয়। ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে ভারতীয় কয়লার মহা-চাহিদা উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি নূতন খনি চালু হয়, পরে কিন্তু মন্দা পড়ায় ইহাদের কয়েকটী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ১৯০৮-৯ সালে কয়লা হইতে কিছু কিছু উপোৎপাদ্য বস্তু লাভ করিবার জন্য গিরিডিতে নূতন ব্যবস্থা হয় এবং প্রথম দফায় ১৮টী বদ্ধ চুল্লী (ovens) ১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাসে কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। ১৯১০ সালে আরও ১২টী চুল্লীর গঠনকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহার সাহায্যে আলকাতরা ও এ্যামোনিয়া উদ্ধার করা হইত। এই সময় ঐ দুই দফা চুল্লী হইতে বৎসরে ৪০,০০০ টন কোক ও ৩৬০ হইতে ৪০০ টন এ্যামোনিয়ম সলফেট পাওয়া যাইত এবং ক্রেতার অভাবে প্রায় সমস্ত সল্‌ফেটই জাপানে রপ্তানী করা হইত। ১৯১৪-১৫ সালে (বা তাহার কিছু পূর্ব্বে) ভারতীয় খনিতে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োজিত হইতে থাকে। এই সময় ঝরিয়া রাণীগঞ্জ অঞ্চলে আন্দাজ ১২টী বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্র ছিল; যুদ্ধের মধ্যে আরও দুইটী বৃদ্ধি পায়। কয়লা কাটা, খনি হইতে তোলা প্রভৃতি কাজের জন্য নানা প্রকার যন্ত্রাদির প্রবর্ত্তন হইতে থাকে।

রপ্তানীতে বাধা

প্রকৃতপক্ষে ১৯০০ সাল হইতে ভারতীয় কয়লার রপ্তানী আরম্ভ হয় এবং ১৯২০ সালে রেলের উপর কয়লা চলাচলের চাপ কমাইবার জন্য রপ্তানীর উপর বাধানিষেধ স্থাপিত হয়। খনি হিসাবে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট (rationing) করিয়া দিয়া পরীক্ষা চলিতে থাকে। ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান ছিল, তাহার উপর খনি হইতে উৎখাত কয়লার পরিমাণ দারুণ হ্রাস পাওয়ায়, ১৯২২ সালে বন্দরগুলিতে কয়লা লইয়া যাওয়ার উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হয় এবং ১লা জানুয়ারী ১৯২৩ হইতে পূর্ব্ব আইন রদ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯২৩

সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারী উহা বড়লাটের অনুমোদন লাভ করে এবং ১লা জুলাই ১৯২৪ হইতে বলবৎ হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য খনির মজুরদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা করা। ১৯২৬ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর কয়লার খনি নিয়ন্ত্রণ (Coal Mines Regulations) বিধিগুলি ১৯২৩ সালের আইনের ২৯ ধারা মতে সৃষ্টিলাভ করে এবং ১৩ই মে ১৯২৯ সালে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালের ৭ই মার্চ্চ তারিখের ইস্তাহারে মৃত্তিকাগর্ভে খনির মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের কাজ করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ হয়।

গুণবিভাগ সমিতি

১৯২৪ সালের ২০শে অক্টোবর ভারতীয় কয়লা সমিতি (Indian Coal Committee) ভারত সরকারের ইস্তাহারের বলে সৃষ্টিলাভ করে এবং ১৯২৫ মার্চ্চ মাসে তাঁহাদের রিপোর্টে রপ্তানীর উৎসাহ ও ভারতীয় কয়লার গুণবিভাগ ও সর্ব্বসাকুল্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বা উৎসাহদান প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করেন। তাঁহাদের মতে রেল কোম্পানী ও পোর্ট কমিশনার কয়লা চলাচল, মাশুল হ্রাস, মাল বোঝাই প্রভৃতি বিষয়ে সুব্যবস্থা করিলে কয়লা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা হইতে পারে। তাঁহাদের সুপারিশ অনুযায়ী কয়লা গুণ বিভাগ সমিতি (Coal Grading Board) ১৯২৫ সালের ৩১ সংখ্যক (Act XXXI of 1925) আইনে জন্মলাভ করে। রপ্তানীযোগ্য কয়লার গুণ বিভাগ * এবং তাহার সার্টিফিকেট দান করা ইহাদের প্রধান কাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বোর্ড প্রদত্ত সার্টিফিকেট পাইলে তবে খনির মালিকরা পোর্ট ট্রাষ্ট ও রেল কোম্পানী প্রদত্ত সুবিধা লাভ করিবে।

* বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মান :

Low Volatile

Selected Grade...Upto 13% ash and over 7,000 calories or 12,000 B. T. U.'s

Grade I — Upto 15% ash and over 6,500 Calories or 11,700 B. T. U.'s

Grade II — Upto 18% ash and over 6,000 calories or 10,800 B. T. U.'s

Grade III — All coals inferior to above

High Volatile

Selected Grade...Upto 11% ash ; over 6,800 calories or 12,240 B. T. U.'S and under 6% moisture.

Grade I...Upto 13% ash ; over 6,300 calories or 11,340 B. T. U.'s ; under 9% moisture.

Grade II...Upto 16% ash ; over 6,000 calories or 10,800 B. T. U.'s ; under 10% moisture.

Grade III...All coals inferior to above.

সেস্ (cess)

১৯২৯ সালের ৮ সংখ্যক আইন (Act VIII of 1929) অনুযায়ী, লৌহ প্রভৃতি কারখানায় ব্যবহারের অনুপযোগী কোক (Soft coke, i.e. all coke which is unsuitable for metallurgical purposes) বাঙ্গালা বা বিহার হইতে নানা অঞ্চলে রেল কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতি টনের উপর দুই আনা করিয়া সেস্ (cess) বা শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। সেস্ (cess) কমিটির কার্য্য পরিচালন ও কয়লার খনি সংক্রান্ত নানা উন্নতি বিধানের জন্য যে সকল ব্যবস্থা দান করিবেন সেই সম্পর্কে এই শুল্ক ব্যয়িত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

পুরাতন প্রসঙ্গ

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯২৯ সালে বা তাহারও পরে, যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে সে বিষয়ে ১৯২০ সালে রীজ (Mr. Treharne Rees) এক রিপোর্ট দাখিল করেন। তাহাতে সমস্ত কয়লার খনির সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও কয়লার ব্যয় সংরক্ষণ ও খনির কাজে অপচয় নিবারণ খনির প্রয়োজনানুযায়ী মালগাড়ী সরবরাহ এবং উৎখাত প্রদেশ বাধ্যতামূলকভাবে বালুদ্বারা ভরিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা দেন। ইহার জন্য তিনি প্রতি টন কয়লার উপর আট আনা হিসাবে শুল্ক আদায় করিবার সুপারিশ করেন এবং রেল কোম্পানী ভাড়ার সহিত এই শুল্ক আদায় করিয়া উপযুক্ত কমিটির বা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবার ব্যবস্থা দেন। পরে বালুদ্বারা খনির মধ্যে খালি স্থান ভর্ত্তি করিবার রীতি সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

অপচয়

ভারতের দুর্ভাগ্য সকল ব্যাপারেই প্রচুর অপচয় আছে। বড় বড় কমিশন আসিয়াছে, মহা মহা সুপারিশ বা নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে, কিন্তু ফল যে কি হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে, টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন নাই। মিঃ নরম্যান ব্যারাক্লফ (Mr. Norman Barraclough) এককালে খনির কার্য্যের পরীক্ষক (Inspector of Mines) ছিলেন। তাহার মতে, যদি পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা হইত তাহা হইলে ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জ খনিসমূহে পুড়িয়া গিয়া এবং উপর হইতে ধ্বসিয়া পড়ায় যে পরিমাণ কয়লার ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দশভাগের এক ভাগের অধিক হইত না। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিবার লোক নাই। প্রথম প্রথম বৈদেশিক কোম্পানীতে কাজ করিয়াছে, তাহারা যথাসম্ভব দ্রুত লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিদেশী শাসন তাহাতে সাহায্যই করিয়াছে, খনিতে যে অপচয় হয় তাহাতে তাহার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই ; উপরন্তু এ সকল অপচয়ের ফলে জাতির একটী বিরাট সম্পত্তি ও শক্তি নষ্ট হইয়া গেলে গৌণতঃ তাহার যথেষ্ট লাভ আছে।

ভারতে কয়লার ব্যবহার

ভারতীয় কয়লার ব্যবহারের অনুপাত এইরূপ :

ব্যবহার	শতকরা	ব্যবহার	শতকরা
রেল	৩২	সামরিক জলযান	·৭
লৌহ শিল্প ও অপরাপর কারখানা	২১	পোর্ট ট্রাষ্ট	·৮
		চা-বাগান	১·০
কার্পাস শিল্প	৭·৫	কয়লার খনি ও অপচয়	১০·০
পাট শিল্প	৩·৫	অপরাপর কারখানা ও বেসরকারী ব্যবহার	১০·৯
জাহাজী কয়লা	৫·৫		
ইট ও অন্যান্য মৃৎশিল্প	৩·২	দেশীয় জলযান	৩·০
কাগজ শিল্প	·৯		

পৃথিবীতে কয়লার ব্যবহার

ইকেলের (**Edwin C. Eckel**) মতে পৃথিবীর উৎখাত কয়লা নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহৃত হয় :

নানা শিল্প কার্য্যে (**manufacturing purposes**)	...	৪৩%
গৃহাদি গরম রাখিতে (**heating buildings**)	...	২০ „
যান (**locomotive fuel**)	...	১৮ „
কোক (**coke**)	...	১২ „
জলযান (**steamer full**)	...	৬ „
আলোকের জন্য গ্যাস (**illunimating gas**)	...	১ „

রাজ-ঈশ্বর

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

কত রাজা রাজপুত্র গেল চলি' রাজত্ব করিয়া
কত দেশে—ইতিহাসে নাম তার রয়েছে ভরিয়া
পাতে-পাতে—ভালো মন্দ কেহ-বা মাঝারি—
পরিচয়-রক্ষীরূপে অক্ষরের সাক্ষী সারি সারি !
লক্ষ লক্ষ সৈন্যদল সমুদ্রের তরঙ্গের মত—
হয়-হস্তী-পদাতিক-অশ্বারোহী, সাধ্য শক্তি যত,
তত অস্ত্র জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ভরি যন্ত্রে-যানে,
কণ্ঠে-কণ্ঠে মৃত্যুনাম জপে যারা অন্তিম শয়ানে !
কত সন্ধি-অভিসন্ধি, কত যন্ত্র-ষড়যন্ত্র করি'
দিকে-দিকে দেয় হানা ধরণী শ্মশানে দিতে ভরি'।
—ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব কীর্ত্তি এসেছে গিয়েছে কালে-কালে
রাখিয়া বিচিত্র চিত্র জীবধাত্রী ধরিত্রীর ভালে।

কারও স্মৃতি রক্তে লেখা, কারও শুধু জলের অক্ষরে,
কারও বা মহতী কীর্ত্তি সমুৎকীর্ণ ধাতু ও প্রস্তরে—
চিহ্ন যার আঁকা আছে রাজ্যময় মৃত্তিকার বুকে ;
কারও নাম নিত্যখ্যাত—জীবন্ত যা মানবের মুখে।
কারও দান বেঁচে আছে বাঁচাইয়া প্রজার জীবন,
স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্বত্যাগী কেহ-বা সন্ন্যাসে সঁপি' মন !

—কিন্তু কে শুনেছে, বলো, পিতৃসত্য পালনের লাগি'
পুত্র যায় বনবাসে, আপনি যেন-বা অংশভাগী
কবে কার বাক্যে তাঁর—যৌবনের আত্মহারা দিনে !
রক্ষিতে তাহারই মান কর্ত্তব্যের পুণ্যপথ চিনে' ;
যে বাক্য নিজের নহে, পালনে কি তার ছিল দায় ?
জগৎ বুঝিতে নারে এ সত্যের অর্থ যে কোথায় !

প্রজার সন্তোষতরে কে করেছে আত্মবিসর্জ্জন
নিজ হস্তে ছেদি' মর্ম্ম—রক্তে যার সীতার তর্পণ !
অরণ্যের শাখামৃগ, বনবাসী অন্ত্যজ চণ্ডাল
কার মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মে দীপ্ত করে দেবত্বের ভাল ?
সর্ব্ব জীবে সমদৃষ্টি ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্মকথা
কে দেখা'ল আচরণে—অপূর্ব্ব সে আদর্শ-বারতা ?

পৃথ্বী জানে, "বীর্য্য কা'র ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে নিয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম ?"

—মানুষ দেবতা হয়ে দেবত্বেও করেছে মহৎ—
এ আদর্শ কে দেখা'ল, মুগ্ধ যাহে নিত্য ত্রিজগৎ ?
কোন্ রাজ-ইতিহাসে ইষ্টমন্ত্র ঈশ্বরের নাম
মানবের নিত্যসঙ্গী—হরেকৃষ্ণে গাঁথা হরেরাম !

নবতর পর্য্যায়ে নন্দলাল

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

সেদিন হঠাৎ নন্দলালের সঙ্গে দেখা হ'ল। স্বর্গীয় মনীষী ডি এল রায় মহাশয়ের বর্ণনায় নন্দলালের সঙ্গে আমার যতটা পরিচয় ঘটেছিল তার চাইতে তাঁর সম্বন্ধে কৌতুহল জাগ্রত হয়েছিল বেশি। আমার প্রচুর আনন্দও জন্মেছিল সেই সঙ্গে ; যাঁরা কীর্ত্তির মাঝে অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁরা নমস্ত নিশ্চয়ই ; কিন্তু যিনি কিছুই না করে, কেবল বেঁচে থেকে কবির লক্ষ্যবস্তু হিসাবে রূপ ও রসের সঙ্গে অমরত্ব অর্জ্জন করেছেন, তিনি অধিকাংশ মানুষের একটা জীবন্ত বিজ্ঞাপন বলেই, তাঁকে আমরা তারিফ করি—বিদ্রূপ না করেও নমস্কার করি।

বলেছি, সেদিন হঠাৎ নন্দলালের সঙ্গে দেখা হ'ল। কথাটা অসম্পূর্ণভাবে বলা হয়েছে, কারণ, তাঁর সঙ্গে কেবল দেখাই হয় নাই, তাঁকে আরো বেশি করে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল—তিনি আমার নিকটবর্ত্তী হ'য়ে খানিক্ বসেছিলেন।

কিন্তু এতবড় একটা ঘটনা, নন্দলালের আমার কাছে এসে খানিকক্ষণ বসার মতো ধন্যবাদার্হ ব্যাপার, কেবল দৈবচালিত ক্রিয়া, অর্থাৎ যোগাযোগ, হ'তেই পারে না ; মানুষের হাত তাতে ছিল, প্রায় ষোল-আনাই ছিল, এমন কথাই বলা চলে।

এই ওস্‌মানপুরে নতুন এসেছি। কি কাজে এসেছি তা বল্‌ব না, কারণ, কাজটা সরকারের পক্ষে দরকারী, প্রজার পক্ষে আপত্তিজনক। কাজটা কি তা বল্‌লেই আচম্‌কা গাল. খেতে হবে—তবে সেটা খাদ্যশস্য-সম্বন্ধীয়, হিসাবের কূট কৌশল। আর, এ-কাজে না এসে জল নিকাশের পথ করে' দিতে কিংবা ঐ শ্রেণীর কি অন্য শ্রেণীর অন্য কোনো কাজে এলেও তা ঘটত যা ঘটেছে, অর্থাৎ নন্দলালের সঙ্গে আমার দেখা হতই—তিনি এসে বসতেনও ; তার মানে এই যে, আমি যে কাজই করিনা কেন, অথবা কোন কাজ না করলেও, চা আমি খাবই।

এই চা খেতে খেতেই নন্দলালকে সেদিন দেখ্‌লাম—নন্দলাল, জনপ্রিয় নন্দলাল, আহূত হয়ে দেখা দিলেন আমার চায়ের মজ্‌লিশেই।

বারান্দায় একখানা বেঞ্চি এবং দু'খানা চেয়ার এবং ছোট্ট একটা টেবিল পেতে প্রথম দু'দিন চা খাওয়া একাই শুরু করে একাই শেষ কর্‌লাম, কিন্তু তৃতীয় দিনে অতিথির আবির্ভাব হ'ল। সাম্‌নের অদূরবর্ত্তী কাঁচা রাস্তায় খড়মের শব্দ করে' যেতে যেতে একটি ভদ্রলোক, খালি-গা আধা-বয়সী ব্যক্তি, হঠাৎ এদিকে তাকিয়ে, আমায় দেখেই বোধ হয়, থম্‌কে দাঁড়ালেন। অনুমান করি, তাঁর মনে হ'ল, এ আবার কে এলো দেখি। বেশিক্ষণ তিনি থম্‌কে থাক্‌লেন না, চল্‌তে শুরু কর্‌লেন, কিন্তু এবার যেদিকে সোজা চলেছিলেন সেদিকে নয়, বাঁক ঘুরে' আমার দিকে। ধীরে-সুস্থে এগিয়ে এসে আমার সাম্‌নেই তিনি দাঁড়ালেন। এ অবস্থায় যা' বল্‌তেই হবে তাই বল্‌লাম ; বল্‌লাম, আসুন…

—বেরিয়েছি এই সকালেই একবার পঞ্চাননের কাছে যাব বলে'। দেখ্‌ছেন ত' কাপড়ের ছিরি ! পঞ্চানন হ'চ্ছে জনৈক রজকের নাম। আমার কাপড় কাচে। কাচে খারাপ, দাম নেয় বেশি, আর, সময় মতো দেয় না। এই তেরশপর্শ ঘুচিয়ে দিতে পারেন ?—বলে' ভদ্রলোক সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপের ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

আমি তাঁর কথার ধরণে একটা হাসির কারণ পেয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লাম ; বল্‌লাম, তা' পারিনে।

—সরকারী লোক সব পারে। আপনি বেসরকারী লোকের মতো কথা বল্‌ছেন। বলে তিনি আরো খানিকটা উঠে এসে বেঞ্চির ওপরেই বস্‌লেন।

আমি বল্‌লাম,—কিন্তু জনৈক রজকের ত্রুটি সংশোধন ত' সরকারী লোকের কাজের ভেতর নয় !

—হ'তে কতক্ষণ ! আপনি কাপড় কাচাবেন না ?

—তখন সেটা হবে আমার নিজের কাজ, সরকারী কাজ ত' তাঁকে বলা যাবে না !

হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ভদ্রলোক জান্‌তে চাইলেন, আপ্‌নি কি সস্ত্রীকই এসেছেন ?

—না।

—চা ইত্যাদি করে কে ?

—চাকর আছে।

—জলচল নিশ্চয়ই ?

—নিশ্চয়ই। আনাবো এক কাপ্ ?

—আনান্, খাই। পঞ্চানন মুলতুবী থাক্।

দু'জনাই হাস্‌লাম—

এবং আমি হরিপদকে ডেকে' চা করতে বল্‌লাম। পঞ্চাননকে মুলতুবী রেখে', দেশস্থ, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, ইত্যাদি অন্যান্য ত্র্যহস্পর্শের, অর্থাৎ অশুভ সংযোগের এবং সংস্পর্শের, নানান্ গল্প করতে করতে চা এল…ভদ্রলোক চা খেলেন এবং তারপর, আবার দেখা করবেন বলে' প্রতিশ্রুতির আনন্দ দিয়ে তিনি উঠ্‌লেন। নন্দলালের সঙ্গে গ্রহের যে-যোগে দেখা হ'বার কথা কপালে লেখা ছিল সেই গ্রহ এতদিনে প্রসন্ন হ'লেন…

ভদ্রলোক পরদিন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন, করলেন তিনি সুদ সমেত, অর্থাৎ একটি সঙ্গীকে নিয়ে এলেন…

প্রতিশ্রুতির আনন্দ এবং আমার প্রতি নিষ্ঠা একটা ব্যাপকতা লাভ করে' আমার চা-পানের প্রাত্যহিক এবং প্রাতঃকালীন সহচর যখন পাকা

চারজনে দাঁড়িয়ে গেল তখন হরিপদ আমাকে চা দিতে লাগ্‌ল' কাঁসার গ্লাসে…

তা' দিক্ ; ওদিকে আমার লাভও হ'ল কম নয় ; চা খেতে খেতেই আমার জ্ঞানসঞ্চয় হ'ল অনেক—জানা হ'য়ে গেল, এখানে কে বেজায় আম্‌লাবাজ, কে নদীর এপার থেকে রোজ সন্ধ্যায় ওপারে যায়, গাঁজা টান্‌তে, এখানকার কোন্ জুয়াড়ি বর্ত্তমানে জেলে আছে, কার উঠ্‌তি এবং কার পড়্‌তি অবস্থা ; দুধের দর পূর্ব্বে অবিশ্বাস্যরকম সস্তা ছিল—ওপারে কে একজন দীনবন্ধু স্বদেশীওয়ালা বক্তৃতা দিয়ে বলে গেলেন, ওরে নির্ব্বোধ, গরু পাল্‌বি তোরা, আধ দুধ খাবে ওরা! দেড় পয়সায় এক সের! ছোঃ! দুধ তোরাও খা—আর দাম নে দু' আনা সের… চড়াৎ করে দাম দেড় পয়সা থেকে দু' আনায় উঠে গেল, তার সঙ্গে মাছ তরকারীরও ; খবরের কাগজে যে খবর থাকে তার বারো আনা অতিরঞ্জিত, সাড়ে তিন আনা মিথ্যে, আধ আনা এমন যা সত্য বলে' মনে করা যেতে পারে…ইত্যাদি অনেক তথ্য সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল হ'লাম—কাঁসার গ্লাসে চা খাওয়ার অসুবিধাটা তেমনভাবে অনুভূতই হ'ল না।

যেদিন নন্দলালের সঙ্গে দেখা হবে, সেই শুভক্ষণ আস্‌বে, সেদিন অন্যান্য কথার পর বসন্ত বল্‌ছিলেন, ভারী আনন্দের কথা হে ; এখানকার নিরঞ্জন দত্ত বেশ বিখ্যাত হয়েছে।

এই কথার উত্তরে যোগেশ বল্‌লেন, এখানে বিখ্যাত হওয়ার কথা আর বলে' কাজ নাই। জ্বর এলে যে লেপ নিয়ে শোয় না সে-ও বিখ্যাত। অমর অধিকারী কবে মরে' ভূত হ'য়ে গেছে—সে কোন্ জন্মে পুরো পেট লুচি পোলাও খাওয়ার পর আঠারো গণ্ডা রসগোল্লা খেয়েছিল, তাইতেই সে এখনো বিখ্যাত হয়ে আছে। নিরঞ্জন হঠাৎ বিখ্যাত হ'ল কিসে?

—তোমাদের তল্লাস ঐ লেপ আর রসগোল্লা পর্য্যন্তই। তোমাদের কাছে অন্য কথা পাড়্‌তে ভয়ই হয়। বলে বসন্ত বিরক্তভাবে অন্য দিকে চেয়ে থাক্‌লেন…

নীরদ বল্‌লেন, রাগ করো না, বলো।

—বই লিখেছে একখানা ; উপন্যাস ; খুব ভালো হয়েছে। যাবতীয় কাগজে তার প্রশংসা ছাপা হয়েছে।

—তদ্বিরে সব হয়।—বলেই যোগেশ দাঁতে জিব্ কাটলেন।

—পড়েছেন? আমি বল্‌লাম।

—পড়েছি। মুরারির ঠেঙে চেয়ে নিয়ে।—বসন্ত স্বীকার করলেন।

—কি নাম বইয়ের?

—নামটা নতুন রকম ; "জন্ম তার কুটীরে"…

আমারই পাশ থেকে অপূর্ব্ব হঠাৎ তুমুল শব্দ করে' হেসে' উঠ্‌লেন আর তৎক্ষণাৎ বসন্ত গেলেন চটে ; বল্‌লেন, হঠাৎ চিঁহি শব্দে ডেকে' উঠলে যে?

অপূর্ব্ব বল্‌লেন, ডেঁপোমি যতদূর কটু হ'তে পারে ঐ নামেই তা' হয়েছে। বুঝেছি ব্যাপার। নিরঞ্জনকে চিনি আমি—বিদ্যে খুব সামান্যই…

—বিদ্যের দরকার বেশি হয় না ; দেখার চোখ থাক্‌লেই লেখা যায়।

—তা' যায় ; কারো কারো কালি কলমও লাগে না।

বসন্ত এবার খোঁটা খোঁচা একসঙ্গেই দিলেন—

বল্‌লেন, ঈর্ষায় তোমার বুক জ্বল্‌ছে তা' বুঝেছি। তুমিও ত' কৃষিকর্ম্ম নিয়ে এক নাটক লিখেছিলে ; প্রতিভার সঙ্গে বলে বেড়া'তে, কৃষকের দুঃখ এতেই ঘুচ্‌বে। সেই খাতার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খোঁড়া বোষ্টম তামাক বেচলো অনেক—কৃষকের দুঃখ তা'তেও ঘুচ্‌লো না…

—সাট্ আপ্।—বলে অপূর্ব্ব লাফিয়ে উঠ্‌তেই ব্যাপারে আমি তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ কর্‌লাম ; বল্‌লাম,—আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। দয়া করে' রাগারাগি করবেন না। খোসগল্পের আমোদ মাটি করার মতো পাপ আর নাই।—বলে' মানুষকে তুষ্ট করার মতো একটু মিষ্ট হাসি হাস্‌লাম…

অপূর্ব্ব বসে পড়্‌লেন—

আমি বসন্তকে বল্‌লাম, বইয়ের গল্পাংশটা একটু বলুন ত' শুনি।

—আপ্‌নি যখন শুন্‌তে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তখন বল্‌ব। এক অতি গরীব ছুতোরের মেয়ে—জন্ম তার কুটিরে ; নাম কম্‌লি। কম্‌লি খুব রূপবতী—অসামান্য রূপ। দশ বছরে তার বাপ তার বিয়ে দিল ; ঠিক এগার বছর বয়সে সে বিধবা হ'ল। তারপর, বছর পাঁচেক পরে… বছর পাঁচেক পরে সে গৃহত্যাগ করলো এক পরম রূপবান্ বিদেশী শিল্পীর সঙ্গে…

নীরদ প্রশ্ন করলেন, খোট্টা?

—না, বাঙালীই, তবে—

—যাক্, তারপর?

—শিল্পী মনোময় সেন তাকে নিয়ে তুল্‌লো তার কলাভবনে—ছবির পর ছবি আঁক্‌তে লাগ্‌ল তাকেই নানা ভঙ্গীতে নানান্ পোজে নানান্ এ্যাংগেলে নানান্ সজ্জায় শুইয়ে, দাঁড় করিয়ে, বসিয়ে…

অপূর্ব্ব গলার ভিতর অদ্ভুত একটা শব্দ করলেন, হুঁ হুঁ করে' সুর ভাঁজার মতো ; আমার মনে হ'ল, পরস্ত্রী কম্‌লিকে মডেল করে' মনোময়ের ছবি আঁকার পদ্ধতি আরো উদ্ঘাটিত করতে যেন তিনি ঐ অব্যক্ত শব্দের দ্বারা নিষেধই করলেন।

বাধার দরুণ একটুখানি থেমে বসন্ত বল্‌তে লাগ্‌লেন,—অত্যন্ত পুলকের সঙ্গে ক্যাম্বিসের গায়ে তুলি বুলাতে বুলাতে শিল্পীর হঠাৎ একদিন অভাবনীয় বিতৃষ্ণা এল—সে চায় আরো রূপ, আরো নবীনতা, আরো সরসতা, আরো তীব্রতা—শিল্পীর তুলি অচিরেই অবশ হয়ে গেল…

—এ কি সব বইয়ের ভাষা বল্‌ছেন?

আমি কৌতূহল প্রকাশ কর্‌লাম।

বসন্ত বস্‌লেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার সাধ্যি কি যে অমন সব কথা মুখস্থ না করলে বল্‌তে পারি! মনোময়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার সময় কম্‌লি যে কথাগুলো বলেছিল তা সত্যিই মনে রাখার মতো…

—গাল একেবারে ভরে উঠ্‌লো যে!—অপূর্ব্ব ঠাট্টা করলেন।

কিন্তু বসন্ত বোধ হয় মনে মনে শপথ করেছিলেন, আর রাগ্‌বেন না ;

তিনি বলতে লাগলেন,—তারপর কমল, তখন তার নাম কমলমালা দেবী, ঢুক্‌লো থিয়েটারে; সেখানে তার বিচিত্র প্রেমাকাঙ্ক্ষীদের রকমারি কায়দা কি! নিরঞ্জন যে এত ঢং আর কথার বাঁধুনি জানত' তা' তার বই না পড়্‌লে আমি বিশ্বাসই কর্‌তাম না—

যোগেশ বলে' উঠ্‌লেন—আমি এখনো কর্‌ছিনে; যারা ইংরেজী বই ঘাঁটে…

আমি বললাম, পরে বলবেন সে-সব কথা; গল্পটা শেষ হোক্।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। অরসিকে রস নিবেদন করা হ'চ্ছে বই ত নয়! সংক্ষেপেই বলি।—বলে' বসন্ত সংক্ষেপে শেষ করতে হ'চ্ছে বলে' যেন দুঃখিত হয়েই আমার দিকে তাকা'লেন; বললেন, তারপর সে ঢুক্‌ল' টকিতে—এক মুহূর্ত্তেই দাঁড়িয়ে গেল একটা দুর্নিরীক্ষ্য নক্ষত্রে। শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্ বলে না! কিন্তু কমল শনৈঃ শনৈঃ নয়, একটি লম্ফে উঠে বস্‌লো একেবারে চূড়ায়…

—আর তার কনকাঞ্চলের এক মুড়ো ধরে' ঝুলে থাক্‌লেন প্রোডোউসার, আর-এক মুড়ো গলায় বেঁধে ম'লো—

বলে' অপূর্ব্ব থেমে থাক্‌লেন…

—কে?—নীরদ জান্‌তে চাইলেন।

—তা' জানিনে; নিশ্চয়ই একজন মরেছে। নিরঞ্জনকে ত' কা'লও দেখেছি, আজ আকাশে…আজ বলেছি, চোখ। আর, বসন্ত ত' এখানেই বসে'…আরে, ও কে যায়? নন্দলাল না?

আমাকে চমৎকৃত করে' এক মুহূর্ত্তেই উল্‌টে গেল সব—বিখ্যাত নিরঞ্জন আর চূড়াবলম্বিনী নক্ষত্র কমলমালা দেবী যুগপৎ অন্তর্হিত হলেন—সবারই চোখ ছুটলো রাস্তার দিকে—আমারও…

—তা-ই ত', নন্দলালই ত'! কখন্ এলে? এস, এস।—বসন্ত পথবর্ত্তী ব্যক্তিকে সাদরে আহ্বান করলেন।

কিন্তু আমি দেখে বিস্মিত হ'লাম যে, যাঁকে দেখে এঁদের এত উৎসাহ তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার—খুব অবিচলিতভাবে আর আলস্যের সঙ্গেই তিনি এদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, অর্থাৎ আমরা কেউ ডেকেছি তা' লক্ষ্য করলেন…

আমার পার্শ্বস্থ অপূর্ব্ব খুব নিম্নস্বরে আমাকে জানা'লেন, ডি এল্ রায়ের নন্দলাল, সেই ভীষণ পণওয়ালা।

হাসি পেল, কিন্তু হাস্‌লাম না, উদ্‌গ্রীব হ'লাম।

নন্দলাল এসে পৌঁছলেন খুব ধীর গতিতে, এমন ধীর গতিতে যেন নেহাত্ অনিচ্ছার সঙ্গে অনুগ্রহ করছেন, না এলেও ক্ষতি ছিল না।

নন্দলালকে বসিয়ে এঁরা প্রশ্নবৃষ্টি করতে লাগ্‌লেন, কিন্তু তা' বৃষ্টিরই মত যেন মরুভূমির বালির উপর টপাটপ্ শুকিয়ে উঠে' বৃথা হ'তে লাগ্‌ল'—নন্দলাল একটি প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। কখন্ এলে, কেমন আছ, হা'লচা'ল কি রকম, দেশের অবস্থা কি, স্বাধীনতা কতদূর, ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এঁদের অজ্ঞাতই র'য়ে গেল।

নন্দলালকে লক্ষ্য করলাম—

আবিষ্কারক কবির কবিতায় চেহারার বর্ণনা কিংবা ইঙ্গিতও নাই। আমি তাঁর 'পণের বিভীষিকা বিস্মৃত হ'য়ে চেহারাটা লক্ষ্য করলাম। রং এমন যা' কখনো কখনো ফর্সা দেখায়, যথা, স্নানের পরই দুপুরের রোদের আভায় দাঁড়ালে, কিংবা যখন তোয়ালে দিয়ে খুব করে' মুখ ঘষে' বৈকালিক রোদের আভার ভিতর নিজের মুখ আয়নায় দেখা যায়; তা' ছাড়া নন্দলালের রং কালোই; কপাল মসৃণ, রেখাঙ্কিত নয়; নাক উঁচু নয়—ডগাটা একটু মোটা বলে' বেশি ঝকঝকে মনে হয়; টিকি যেখানে রাখা হয় সেই স্থানটার চুলগুলি খাড়া খাড়া, অবশিষ্ট চুলের সাম্‌নের দিক্‌টা পাত্‌লা, পিছন দিক্‌টা ঘন; কানের যে অংশ ঝুলে থাকে নন্দলালের সেটা ভারি পুরু; শরীর এককালে স্বাস্থ্যবানের মতই ছিল, এখন অনেক টস্‌কে গেছে, বয়সের দরুণ বা দুর্ভাবনায়। পোষাক সাধারণ, পাঞ্জাবী ইত্যাদি—সেনাপতির পরিচ্ছদের মতো একটুও নয়।

কিন্তু আমাকে বিভ্রান্ত করল তাঁর চেহারা বা বেশ নয়, তাঁর কঠোর নিঃশব্দতা আর স্থির প্রসারিত দৃষ্টি। এতগুলি লোকের জীবন্ততা একেবারেই অনুভব না করে' নন্দলাল একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সম্মুখের দিকে…তারপরই আমার মনে হ'ল, নন্দলালের এ-দৃষ্টির অর্থাৎ আমাদের প্রতি অমনোযোগের কারণ ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা নয়—তিনি অন্যত্র অবস্থিত একটা-কিছুর প্রতি অবহিত হ'য়ে আছেন; অনতিস্বচ্ছ আবরণের ওদিকে কি আছে তা' দেখ্‌তে সচেষ্ট হ'লে মানুষের দৃষ্টি যেমন ভৌতিক-ভাবে দুর্ব্বোধ্য আর তীক্ষ্ণ এবং কষ্টকরভাবে নির্নিমেষ হ'য়ে থাকে, নন্দলালের এখনকার এই দৃষ্টি ঠিক্ তেমনি…

নন্দলালের সাম্‌নে রয়েছে খানিকটা দূর্ব্বাবৃত পতিত স্থান, যাকে বলা চলে উঠান্; ঐ উঠানের এক প্রান্তে আছে দু'টি দুর্ব্বল খর্জ্জুর বৃক্ষ, অন্য প্রান্তে নিম্ববৃক্ষ একটি, তার পাশেই একটা বকফুলের গাছ, তার উত্তরে খড়ের পালুই একটা, তার উত্তর হইতে দক্ষিণের খানিকটা স্থান আখের ক্ষেতে অন্ধকার, ক্ষেত ঘেঁষে ভাঙা বেড়ার অভ্যন্তরে কয়েকটি বেণুকুলের ঝাড়…এ-সকলের মাথার উপর বিরাজ করছে দূরের একটি সুবৃহৎ বটবৃক্ষ—এখন সূর্য্য ঐ বটবৃক্ষের আড়ালেই আছেন; আর ঊর্দ্ধে দেখা যাচ্ছে আকাশ—

নন্দলালের দৃষ্টির পরিধি ঐ দৃশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক্‌তে বাধ্য; এক সূর্য্যই নিত্য নূতন—তাঁর ঔজ্জ্বল্য আর সমারোহ লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিংবা তাঁর দৈনন্দিন আবির্ভাবের ভিতরেও প্রিয় বস্তুর নৈমিত্তিক আবর্ত্তনের যে আনন্দ-আবেদন আছে সে-বিষয়ে একাগ্রচিত্তে এবং গভীরভাবে চিন্তা করা কারো কারো পক্ষে সম্ভব; কিন্তু তার দরুণ দৃষ্টি চক্রবালে বিলীন বা দূরতম কল্পিত একটা স্থানে বিদ্ধ হ'য়ে থাকার কথা নয় ত'! নন্দলালের দৃষ্টি মাঝে মাঝে কেমন যেন অর্থহীনও মনে হ'চ্ছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মনে পড়ল' পূর্ণ চ্যাটার্জ্জির বিষয়ে একটা পরমাশ্চর্য্য কথা। একদা কাজ করতাম পূর্ণর সঙ্গে…এবং তারই সঙ্গে একদিন দেখতে গেলাম 'টকি'; তখন বৈজ্ঞানিক ঐ ব্যাপারটা খুবই নূতন। দু'জনে বসে দেখ্‌তে লাগলাম এবং মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতে

লাগলাম পূর্ণর রকম—দেখা গেল, তার দৃষ্টি সম্মুখস্থ সব-কিছুকে অতিক্রম করে' যেন দৃষ্টির অতীত একটা বিন্দুতে নিমগ্ন হ'য়ে গেছে।

টকি দেখা শেষ হ'ল—

পথে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেমন দেখলে প্লে অথবা পালা ?

পূর্ণ যেন চমকে উঠল ; বলল,—কি বলছ ? প্লে, পালা ? কিছু দেখিনি।

—তবে চেয়ে চেয়ে দেখছিলে কি ?

—আমি দেখছিলাম, ছায়াগুলো নড়ছে আর কথা বলছে ! অবাক্ হ'য়ে কেবল তা'-ই দেখছিলাম…

বুঝা গেল, পূর্ণ প্লট অভিনয় প্রভৃতি কিছুই লক্ষ্য করে নাই—দৃষ্টির অতীত স্থানেই তার মন আর চক্ষু বিচরণ করছিল পরম বিস্ময়ের ঘোর লেগে, আর, অচিন্তনীয় আবিষ্কারের তারিফ করে' করে'…ছায়া নড়ছে আর কথা বলছে—এটা কেমন করে' হ'ল !

নন্দলালের এই দৃষ্টির মূলে তেম্নি অবাক্-ভাব কিছু আছে কি !

নন্দলাল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না দেখে এঁরা সবাই কিছু হতোদ্যম হয়েছিলেন ; কিন্তু বসন্ত করলেন নন্দলালের এই আচরণের স্পষ্ট প্রতিবাদ ; বললেন,—নন্দ, আমাদের সঙ্গে কথা কইছ না ; নূতন একজন ভদ্রলোক, গাঁয়ের অতিথি তিনি, তাঁর কাছে তোমাকে ডেকে' আন্‌লাম—তাঁর সঙ্গেও আলাপ করবার আগ্রহ নাই ; এ কেমন আচরণ তোমার ? অথচ তুমি দেশের এমন খাঁটি একটা মাতব্বর লোক যে গল্পেও তুমি অধিনায়কত্ব করবে এই আশাই আমরা করি।

নন্দলালের দৃষ্টি বিচলিত কিংবা তার প্রকারের ব্যতিক্রম হ'ল না, কিন্তু কথা তিনি বললেন ; অপরিসীম খেদের সঙ্গে ম্লান কণ্ঠে বললেন,—কি দুর্গতি মানুষের !

অপূর্ব্ব বললেন,—চিরকাল লাগাই আছে…

কিন্তু আমি নন্দলালের জগদতীত দৃষ্টির অর্থ যেন উপলব্ধি করলাম ; পূর্ণ চ্যাটার্জ্জির মতোই তিনি প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা ত্যাগ করে' ঘটনার মূল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন ; কিংবা মূল একটা পেয়ে তারই দিকে চেয়ে বসে আছেন, আর মনে মনে অবিশ্রান্তভাবে বলছেন, এ কি দেখছি, এ কি ব্যাপার !…এই মুহূর্ত্তে সম্মুখস্থ উদ্ভিদ খর্জ্জুর বৃক্ষের মতো আমরাও অস্তিত্বহীন…

যোগেশ বললেন, খুলেই বলো না, বাপু, যদি কাউকে না বলার পণ তোমার সত্যিই না থাকে।

সবারই মুখে একটা হাসির ভঙ্গী দেখা দিল ; নন্দলাল তা' দেখলেন না ; বললেন,—রূপনগর থেকে এখন আসছি। সেখানকার বিনয়ভূষণ রায়ের মেয়ের বিয়ে কা'ল…

—বটে ! দুর্গতি ত' তা' হ'লে আমাদের খুব পিছু নিয়েছে !—বলে' নীরদ হাসতে লাগলেন।

যোগেশ বললেন,—নেমন্তন্ন বাগিয়েছ কিনা তা'-ই বলো…

বলার সঙ্গে সঙ্গেই যা' ঘটল' তা' অপ্রত্যাশিত, এবং তা' নন্দলালের অভিনয় কি সত্যকারের মনোগত ভাবের অভিব্যক্তি তা' জানিনে…

নন্দলাল হঠাৎ তীরের মতো সোজা হ'য়ে তীরবেগে উঠে' দাঁড়ালেন—ভ্রূভঙ্গী করে' থাকলেন, আর, রুখে রুখে তীব্রকণ্ঠে বলতে লাগলেন,—তোমরা খুঁজছ নেমন্তন্ন, কিন্তু নন্দলাল তা' খোঁজে না—কস্মিন্‌কালেও না—সে বেহায়া নয়, নির্ম্মমও নয়। বিনয় রায়ের ভাঙা চাল—ভাত ভিক্ষে জোটে না—মেয়ের বিয়ে দেবে—শাঁখা কেনার কড়ি নেই। এই নন্দলাল তাকে দিয়ে এল নগদ পাঁচটি টাকা—বুঝলেন, মহোদয়গণ, তহবিল থেকে নগদ পাঁচটি টাকা—ধারণা করতে পারেন !—ব'লে নন্দলাল লাফিয়ে বারান্দা থেকে উঠোনে নামলেন ; তারপর চলতে চলতে বলে গেলেন—নীরবে অভাবীর দুঃখ ঘুচানো, অর্থাৎ পরোপকার করাও, আমার একটা পণ। যত পারেন ঠাট্টা করুন, আর, কূপমণ্ডুকের মতো কুয়োর ভেতরেই লাফালাফি করুন।

আমরা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম—

কথা উচ্চারণ করার একটা দিশে পাওয়ার পর অপূর্ব্ব এক সময় ধীরে ধীরে বললেন,—রূপনগর গাঁয়ে আমার শালীর বাড়ী ; বিনয়ভূষণ রায় নামে কোনো লোক সেখানে নাই…

কিন্তু নন্দলাল ততক্ষণে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন।

শতাব্দীর অভিশাপ

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্-এ

শতাব্দীর অভিশাপ স্তূপীকৃত হ'লো থরে থরে—
অনেক অনেকদিন ঘুরে গেছে কালের প্রহরে।
অতীতের ইতিহাস যেন আজ হারানো স্বপন—
আমরাও হ'য়ে গেছি মিশরের 'মমির' মতন !
কোথায় স্বপন আজ, দেহে মনে নেমেছে অসুখ—
দাসত্ব-জীবন-ক্লিষ্ট, নিভে গেছে জীবনের সুখ :

সোনার মৃগের আশে বৃথা ঘুরি আজো বারম্বার—
আমাদের আছে জানি মরণের শুধু অধিকার !
ত্রিশঙ্কু জীবন আর শুধু ব্যথা বেদনা সংশয়—
সংসার-সমর-যোদ্ধা—আমাদের এই পরিচয় !
আমরা মানুষ তবু—মানুষের নেই অধিকার ;
স্থবীর জীবন ঘিরে এলো নেমে মৃত্যুর আঁধার।

মৃত্যুঞ্জয়

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

এই নাটকখানি রচনায় একটী ইংরেজী বই ও কয়েকটী "মেডিক্যাল জার্ণালের" সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

পরিচয়-লিপি

আব্দুল রেজা	...	জেল ফেরত আসামী
প্রতুল চৌধুরী	...	এমেচ্যার কেমিষ্ট
জনার্দ্দন	...	প্রতুলের ভৃত্য
ডাঃ নিরঞ্জন গুপ্ত	...	বিখ্যাত সার্জ্জন
মল্লিকা বসু	...	ব্যারিষ্টার দ্বিজেন বসুর একমাত্র কন্যা
ডাঃ সুবোধ রায়	...	উদীয়মান সার্জ্জন
গিরীন পাত্র	...	অল ইণ্ডিয়া ষ্টীল কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী
খগেন দত্ত	...	ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর
রামটহল	...	কনষ্টবল
লোকেন চাটুজ্জে	...	পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট
দ্বিজেন বোস	...	ব্যারিষ্টার ও এম এল এ
ফণীভূষণ ঘোষ	...	অল ইণ্ডিয়া ষ্টীল কর্পোরেশনের কেশিয়ার
শোভা সিং	...	ব্যাঙ্কের ভ্যান ড্রাইভার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রতুল চৌধুরীর বাড়ী। ঘরটা বসিবার ও পড়িবার এবং কিছু গবেষণা করিবার। পাশে একটী ছোট দরজা দেখা যাচ্ছে, তাতে লেখা আছে "Laboratory"। ঘরে কয়েকটী বড় বড় জানলা আছে। একটী জানলার কাছে ঈজেলে একটী প্রায় সমাপ্ত মল্লিকা বসুর অয়েল পেন্টিং। তার পাশে ছোট টেবিলে রং, পেন্সিল, ব্রাশ ইত্যাদি ছবি আঁকবার সরঞ্জাম। প্রতুল শুধু গায়, কালো ফুল প্যাণ্ট ও চোখে কালো চশমা পরে একটী টুলে বসে। তার নগ্ন গায়ের ওপর "আল্ট্রা ভায়োলেট রে" এসে পড়ছে। 'রে'র যন্ত্র পিছনের দেয়ালে ফিট করা। আব্দুল রেজা ঘড়ি ধরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সোফার ওপর প্রতুলের ড্রেসিং গাউন পড়ে আছে।

রেজা। পিঠ একেবারে লাল হয়ে গেছে স্যর।

প্রতুল। আরও পনেরো সেকেণ্ড।

রেজা। আচ্ছা—পাঁচ দশ, তেরো, পনেরো—

প্রতুল। (ঘুরে পাশটা আলোর দিকে দিয়ে) ঘড়িটা টিপে দাও।

রেজা। দিয়েছি।

প্রতুল। আবার টেপ। ষ্টার্ট—তিন মিনিট, বুঝলে?

রেজা। (ঘড়ি টিপে) হ্যাঁ স্যর। এ একরকম সূর্য্যের আলো, না?

প্রতুল। হ্যাঁ। আল্ট্রা ভায়োলেট্ রে।

রেজা। আজকে আমার একটু বচসা হয়ে গেছে—

প্রতুল। কার সঙ্গে?

রেজা। আপনার চাকরের সঙ্গে।

প্রতুল। জনার্দ্দনের সঙ্গে? কেন?

রেজা। সে বলছিল—'নেহাৎ বেশী মাইনে পাই তাই আছি। আমাদের বাবু সাধারণ মানুষের মত ন'ন। খাওয়া, দাওয়া—

প্রতুল। (বিরক্ত ভাবে) জনার্দ্দনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে তুমি ভবিষ্যতে কোন দিন আলোচনা করবে না।

রেজা। তাতে আমি বললুম—"তোমার মাইনে পাওয়া নিয়ে দরকার। কর্ত্তা কি খান, কি করেন তাতে তোমার কি?"

প্রতুল। আর কখনও ওর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক কোরো না। সে একটা সামান্য চাকর বই তো নয়। তুমি অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখেছিলে—

রেজা। হ্যাঁ স্যর। মিড্‌ল্ অবধি পড়েছিলুম, কিন্তু খারাপ সঙ্গে—

প্রতুল। যাক, সে সব কথা। জনার্দ্দনকে নাই দিও না।

রেজা। না স্যর। আপনার ওষুধ পত্তর, আলো—ঐ ঘরটা—

প্রতুল। ল্যাবরেটরী?

রেজা। সে ঐ সম্বন্ধে আমায় একদিন প্রশ্ন করছিল।

প্রতুল। রেজা, তুমি আমার কাছে কেন আস সে কথা কি তাকে কোন দিন বলেছ?

রেজা। না স্যর।

প্রতুল। তোমার আগেকার ইতিহাস—

রেজা। না স্যর, সে কি কখনও বলতে পারি। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল বটে—

প্রতুল। তুমি কি জবাব দিলে?

রেজা। আমি বলেছি যে আগে এক সাহেবের চাকর ছিলুম। তিনি বিলেত চলে যেতে আপনার কাছে এসেছি। ভাবভঙ্গীতে মনে হয় সে আমার কথা বিশ্বাস করে নি।

প্রতুল। হুঁ।

রেজা। যদি সে শোনে যে আমি শ্রীঘর ফেরত—তবে ভবিষ্যতে আর অসৎ পথে যাব না।

প্রতুল। এবার তো ওপথ তোমার ছাড়া সম্ভবপর হবে।

রেজা। হ্যাঁ স্যর। আপনার সঙ্গে আল্লা সাক্ষাৎ না করিয়ে দিলে

হয়ত' আরও অধঃপতন হ'ত। আপনি আমায় যা দেবেন তাতে আমি দেশে গিয়ে একটা ছোটখাটো দোকান করে ভদ্রভাবে বসবাস করব। আপনার কাছে চিরজীবন আমি ঋণী হয়ে থাকব।

প্রতুল। মোটেই না। তুমি আমার কাজ করবে আমি তার দরুণ টাকা দেব। এতে ঋণ কোথায় ?

রেজা। (একটু পরে) যদি কিছু না মনে করেন স্তর, একটা কথা জিগেস করব ?

প্রতুল। কি ?

রেজা। কাজ কবে থেকে আরম্ভ হবে ?

প্রতুল। আজ সন্ধ্যার পরে হয়ত' কিছুটা আরম্ভ করা যেতে পারে।

রেজা। যাঁদের আসবার কথা আছে, তাঁরা এলে।

প্রতুল। হ্যাঁ।

রেজা। ওঁরা কবে নাগাদ কাজটা—

প্রতুল। এই দিন কয়েকের মধ্যে। তোমার ভয় করছে না তো ?

রেজা। না স্তর। পাঁচশো টাকা, বড় চারটীখানি কথা নয়। (একটু পরে) আচ্ছা স্তর, লাগবে না তো ?

প্রতুল। না। ক্লোরোফর্ম করে—

রেজা। তবে আর কিসের ভয়।

প্রতুল। কিছু না। পাঁচ মিনিটর ব্যাপার।

রেজা। (ঘড়ি টিপে) তিন মিনিট হয়ে গেছে স্তর।

প্রতুল। বেশ। আলোটা নিভিয়ে দাও।

রেজা আলো নিভিয়ে দিলে। প্রতুল উঠে ড্রেসিং গাউন পরলে

রেজা। আচ্ছা, স্তর গ্ল্যাণ্ড না কি ক'দিন বললেন তা বদলালে মানুষ বাঁচে।

প্রতুল। হ্যাঁ। বাঁচে।

রেজা। গ্ল্যাণ্ড দিয়ে কি হয় ?

প্রতুল। জীবনীশক্তি। রেজা, তুমি ডাক্তার নও, এসব ঠিক বুঝতে পারবে না।

রেজা। ভারী শক্ত ব্যাপার, না ?

জনার্দ্দনের প্রবেশ

জনার্দ্দন। হুজুর—

প্রতুল। কি জনার্দ্দন—

জনার্দ্দন। একজন ভদ্রলোক এসেছেন— কার্ড দিল

প্রতুল। (কার্ড দেখে) যাও, ওঁকে এইখানে নিয়ে এস। তারপর তোমার ছুটী। আজ আর কোনো দরকার হবে না।

জনার্দ্দন। যিনি এসেছেন, তাঁর যদি কোনো—

প্রতুল। রেজা রইল।

জনার্দ্দন। কিন্তু হুজুর এখনও ঘড়ী বাজে নি, সবে পাঁচটা—

প্রতুল। (বিরক্ত ভাবে) তা হোক্। আজ একটু সকাল সকাল

জনার্দ্দন। আচ্ছা হুজুর।

জনার্দ্দনের প্রস্থান

প্রতুল। ঐ গেলাসে যে জলটা আছে নিয়ে এস।

রেজা। দিচ্ছি স্তর।

জলের গেলাস এনে দিল

প্রতুল। (গেলাস নিয়ে) ঐ ষ্ট্রং আলোটা একবার জেলে দাও।

রেজা। দিচ্ছি স্তর।

আলো জ্বাললে

প্রতুল আলোর সামনে জলের গেলাসটা ভাল ভাবে পরীক্ষা করলে। পরে টেবিলের একটা দেরাজ খুলে একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা লাল ওষুধ মিশিয়ে পান করলে। শিশিটা আবার দেরাজে রেখে চাবী বন্ধ করে দিলে। ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত ঘরে ঢুকলো। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। প্রতুল এগিয়ে গিয়ে তাকে রিসীভ করলে।

প্রতুল। তার পর নিরঞ্জন, ভাল তো ?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। (রেজাকে দেখিয়ে) উই ক্যাণ্ট টক বীফোর হিম্।

প্রতুল। তোমার লাগেজ—

নিরঞ্জন। নীচে, সিঁড়ির কাছে—

প্রতুল। রেজা, ওপরে যে ঘরটা এঁর থাকবার জন্য ঠিক করে রেখেছি, সেইখানে এঁর জিনিসপত্তর সব রেখে এস।

নিরঞ্জন। খুব সামলে নিয়ে যেও। তিনটে স্যুটকেশ, একটা বেডিং—

রেজা। আচ্ছা স্তর।

প্রস্থান

নিরঞ্জন। কে বলবে যে তুমি আমার চেয়ে পনেরো বছরের বড় ? পঁয়ত্রিশের একদিন বেশী দেখায় না। দিস ইজ এ মিরাক্‌ল্। সাত বছর আগে যেমনটী তোমায় লাষ্ট দেখেছি, আজও ঠিক সেই রকমই আছ।

প্রতুল। থ্যাঙ্ক ইউ। বস। তোমাকেও তো ভালই দেখছি।

নিরঞ্জন। ষাটের ওধারে মানুষ যে রকম থাকতে পারে আমি সেই রকম আছি। স্বাস্থ্য এবং চেহারা দুইই সেই বয়সের ওজনে ভালই আছে। কিন্তু আশী বছরের কাছাকাছি গিয়ে পঁয়ত্রিশের শরীর, চেহারা—

প্রতুল। লাইক এ ড্রিঙ্ক।

নিরঞ্জন। ডোণ্ট মাইণ্ড। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই বয়সে এত লম্বা জার্নী ফ্রম বম্বে টু ক্যালকাটা, ননষ্টপ।

প্রতুল। (একটা গেলাসে মদ ঢেলে) সোডা দেব ?

নিরঞ্জন। খুব কম। একটা "পিক্-মী আপ" দরকার।

প্রতুল। (সামান্য সোডা মিশিয়ে নিরঞ্জনকে মদের গেলাস দিয়ে) এই নাও।

নিরঞ্জন। (এক চুমুক খেয়ে) আঃ। তারপর, এই লোকটী যে ঘরে ছিল, সেই বুঝি তোমার নিউ ভিক্‌টিম ?

প্রতুল। ভিক্‌টিম্‌ বোলো না। পয়সা দিয়ে কাজ নিচ্ছি।

নিরঞ্জন। তা দিচ্ছ, কিন্তু এর ফলাফল—

প্রতুল। পয়সার জন্য লোকে খুনও করে থাকে।

নিরঞ্জন। কিন্তু আত্মহত্যা জেনে শুনে করে না।

প্রতুল। তাও করে।

নিরঞ্জন। স্পেসিমেন কিন্তু ভাল নয়। স্বাস্থ্যটা খারাপ—

প্রতুল। গ্রুপ দেখতে হবে। গ্রুপ মিলে গেলে একে দিয়েই কাজ চলবে। আগে পরীক্ষা করে ভাখো—

নিরঞ্জন। আজ আর হবে না। কাল সকালে—

প্রতুল। বেশ তো। তাড়াতাড়ি কিসের। আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। এত কষ্ট করে এসেছ, এর জন্য যে আমি তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ—

নিরঞ্জন। সাত বছর পরে দেখা—

প্রতুল। আমি খুবই দুঃখিত যে ষ্টেশনে যেতে পারলুম না—

নিরঞ্জন। তুমি যে সূর্য্যের আলো কমে গেলে বাড়ী থেকে বেরোতে পার না, তা আমি জানি। আচ্ছা, এর কি কোন প্রতীকার নেই?

প্রতুল। বোধ হয় না। আমি তো যত কিছু নতুন এবং পুরানো বই পেয়েছি সব তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু নো গুড। কোন উপায়ই বার করতে পারি নি। এ ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে পড়ছে।

নিরঞ্জন। রেডিয়াম ওয়াটার খাওয়া ছাড়লে—

প্রতুল। ছাড়বার উপায় নেই। ছাট ইজ এসেনশিয়াল। নইলে টিস্যুজ কাজ করবে না। এ অনেকটা এক্সটার্নাল ফোর্সের মত। আমায় দেখছ—

নিরঞ্জন। দেখছি! এবং যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। জগতে তুমি একটা অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার করেছ—

প্রতুল। তোমার মত বন্ধু পেয়েছিলুম বলেই এই জীবন মরণের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে সাহস করেছিলুম—

নিরঞ্জন। যুগ যুগান্তর ধরে মানুষ অমর হবার স্বপ্ন দেখেছে, কালের করাল গতিকে আটকে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছে, স্বাস্থ্য, যৌবন সময়কে ঠেকিয়ে অটুট রাখবার চেষ্টায় বিফল মনোরথ হয়েছে। মর জগতে সশরীরে অমর হওয়া অসম্ভব, কিন্তু বন্ধু, তুমিই প্রথম পৃথিবীর সমস্ত নিয়ম চূর্ণ করে অমরত্বের পথে পা দিয়েছ। বৎসরের পর বৎসর ধরে তুমি নিজেকে পঁয়ত্রিশ বছরে আবদ্ধ রেখেছ—

প্রতুল। সবই তোমার জন্য সম্ভবপর হয়েছে—

নিরঞ্জন। চেষ্টা করলে তুমি বোধহয় মৃত্যুকেও ঠেকিয়ে রাখতে পার।

প্রতুল। হয়ত' পারি, কিন্তু বাধা বিঘ্নও অনেক আছে।

নিরঞ্জন। তোমার সেগুলিকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা আছে।

প্রতুল। আজ হতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই কার্য্যে প্রথম হাত দিই—সুদূর দিল্লীতে। তখনকার স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে। কালের করাল গতিকে আমি অগ্রাহ্য করেছি। আমার শরীর, স্বাস্থ্য, চেহারার ওপর তার কোন ছাপ সে আঁকতে পারে নি।

নিরঞ্জন। এবং আশা করি ভবিষ্যতেও পারবে না। ভগবান তোমার উদ্দেশ্য ও সাধনা সফল করুন। দেবতার অমরত্ব মর জগতে তুমি প্রথম লাভ করেছ। ঋষি দুর্লভ অমূল্য রত্ন তুমি অর্জ্জন করেছ।

প্রতুল। এখন অবধি ভাগ্য আমার ওপর সুপ্রসন্ন আছে।

নিরঞ্জন। আশা করি ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আমি আর থাকব না। বোধহয় এইবারই আমার শেষ। এর পর যখন সাত বছর পরে আবার আমাকে তোমার দরকার হবে, তখন হয়ত' আমি ইহজগতে থাকব না।

প্রতুল। আমার অত্যন্ত ক্ষতি হবে। সে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবে কিনা কে জানে? তোমার ওপর আমার যা বিশ্বাস এবং নির্ভরতা, তোমার অবর্ত্তমানে সে রকম সুযোগ্য লোক কি আর পাওয়া যাবে?

নিরঞ্জন। যে নতুন ডাক্তারের কথা তুমি লিখেছিলে—

প্রতুল। ডাক্তার সুবোধ রায়। আমার সঙ্গে এখনও তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি—

নিরঞ্জন। যাক্, তা'র কথা পরে হবে। সে এলে দেখা যাবে পারবে কিনা? (একটু পরে) কোথায় করবে? এইখানে?

প্রতুল। না। একটু নিরিবিলি স্থানে। কোথাও দূরে, কোন বাগান বাড়ীতে—

নিরঞ্জন। তোমার নিজের কোন ল্যাবরেটরী নেই?

প্রতুল। (ল্যাবরেটরীর দরজার দিকে দেখিয়ে) ঐ ঘরটায় একটা ছোটখাটো ল্যাব করেছি, কিন্তু ওতে কাজ হবে না।

নিরঞ্জন। দেখতে হবে।

প্রতুল। নিশ্চয়ই দেখবে। তবে ওটা ঠিক ল্যাব নয়। ওষুধপত্তর কেনবার জন্য একটা ওজুহাত দরকার, তাই ওটা রেখেছি।

নিরঞ্জন। (প্রতুলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে) এখনও সব জিনিষ জোগাড় হয় নি? কেন, হাতে টাকা নেই?

প্রতুল। না। তবে শীঘ্রই যাতে আসে তার বন্দোবস্ত করেছি।

নিরঞ্জন। সেই আগেকার মত।

প্রতুল। হ্যাঁ। ঠিক সেই আগেকার মত।

নিরঞ্জন। লোকটা? (প্রতুল চুপ করে রইল) প্রতুল, আমি জিগ্যেস করছি লোকটার কি হবে?

প্রতুল। তাকে সরিয়ে ফেলা হবে।

নিরঞ্জন। বার বার—

প্রতুল। এছাড়া আর কোন পথ নেই। আমায় নিরাপদে থাকতে হবে তো। যদি সে বেঁচে থাকে, এবং কোনদিন সব কথা প্রকাশ করে ফেলে, তাহলে আমার সমূহ বিপদ।

নিরঞ্জন। লোকটা কে? যে ঘরে ছিল সে নয় তো?

প্রতুল। না। এ অন ইণ্ডিয়া ষ্টীল কর্পোরেশনে কাজ করে। সেখানকার একজন ক্যাশিয়ার।

নিরঞ্জন। তার জন্য আমি দুঃখিত।

প্রতুল। আমি কি সুখের জন্য এসব করি? [illegible]

যাতে তাদের কোন কষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা করি। তারা জানতেও পারে না—

নিরঞ্জন। যে তারা সকল জানার বাইরে চলে গেছে। (একটু থেমে) ন্যায়পথে কি টাকা জোগাড় করা যায় না?

প্রতুল। হয়ত' যায়, কিন্তু আমার এই সাধনা গবেষণার সঙ্গে টাকা রোজগার করা সম্ভবপর নয়। দু'চার বছর পরেই আমাকে স্থানান্তরিত হতে হয়।

নিরঞ্জন। তা বুঝি। এক জায়গায় বেশী দিন থাকলে লোকে দেখতে পাবে যে তোমার বয়স বাড়ে না, তুমি বদলাও না।

প্রতুল। আমার এই বৈজ্ঞানিক তপস্যার জন্য এ সবই প্রয়োজন। শেষ অবধি যদি অগ্রসর হতে পারি তবে জগত থেকে মৃত্যুকে বিদায় নিতে হবে।

নিরঞ্জন। কিন্তু তার পুর্ব্বে এতগুলি মৃত্যু—

প্রতুল। একটু বৈজ্ঞানিকের চোখ দিয়ে জিনিষটাকে দেখে বিচার কর।

নিরঞ্জন। এক এক সময় মনে হয় যা করছ তা সত্যই মহৎ আবার কখনও কখনও সন্দেহ হয় সমস্তই অপরাধ, পাপ। লোকগুলির জন্য দুঃখ হয়, মায়া হয়—

প্রতুল। চিকিৎসা শাস্ত্রে যত কিছু নতুন ওষুধ অথবা তথ্য আবিষ্কার হয়েছে তার পিছনে অনেকগুলি জীবন ত্যাগের ইতিহাস আছে। স্যাকরিফাইস ফর এ নোব্‌ল কজ। আমি যে অমূল্য রত্ন জগৎকে দান করব তার তুলনায় এ কয়েকটী প্রাণের দাম কতটুকু?

নিরঞ্জন। তা ঠিক—তবে যদি দান হয়?

প্রতুল। কেন, তোমার কোন সন্দেহ আছে?

নিরঞ্জন। যদি সন্দেহ হয়ও, সে কথা তোমায় এখন জানাব না। তবে একটা কথা বলতে ইচ্ছা হয়—

প্রতুল। কি কথা?

নিরঞ্জন। একটা প্রাণ অমরত্ব লাভ করবে অনেকগুলি প্রাণকে বিনষ্ট করে।

প্রতুল। এখন তাই বটে। কিন্তু যদি আমি অমরত্ব লাভ করতে পারি, কিম্বা যদি আরও কিছুদিন সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে পারি, তবে চেষ্টা করব অন্য মনুষ্যের সাহায্য না নিয়ে এ কাজ সম্ভব কিনা সেই তথ্য আবিষ্কার করতে। কিন্তু যদি আমি যাই তবে এসায়েন্সটা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। আমি ছাড়া এ লাইনে আর কেউ এতদূর অগ্রসর হয়েছে বলে জানি না।

নিরঞ্জন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে তুমি যা বলছ তা উচিত এবং যথার্থ। (একটু পরে) তারপর এসব কাজকর্ম চুকে গেলে তুমি আবার এখান থেকে সরে পড়বে, কেমন?

প্রতুল। যেতেই হবে। মাসখানেকের মধ্যে—

নিরঞ্জন। সেই [illegible] আমাদের শেষ বিদায় হবে। যাক্, সে সব কথা পরে [illegible]। [illegible] চল, তোমার ল্যাবরেটরী দেখি গে।

প্রতুল। বিশেষ কিছু নেই—

ল্যাবরেটরীর দরজার চাবী খুলতে খুলতে

অনেক জিনিষই করবার আছে, কিন্তু এখানে উপযুক্ত স্থান ও মেটিরিয়ালের অভাবে করে উঠতে পারছি না।

ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত উঠে ল্যাবের দিকে যাচ্ছে এমন সময় ঈজেলে রাখা ছবিটার দিকে নজর পড়ল। এতক্ষণ সেটা দেখে নি, কারণ জানালার পাশে থাকবার জন্য তার ওপর আলো পড়ে নি। ছবিটার কাছে গিয়ে আলো জ্বাললে।

নিরঞ্জন। চমৎকার! এ কে?

প্রতুল। (চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে) অ্যাঁ! ওঃ, এই ছবিটার কথা বলছ? একটী মহিলা। নৈনীতালে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

নিরঞ্জন। বাঙ্গালী মনে হচ্ছে।

প্রতুল। হ্যাঁ। কলকাতায়ই থাকেন।

নিরঞ্জন। সেই জন্য কি তুমি এবার কলকাতায়—

প্রতুল। না, ঠিক সেইজন্য নয়। ডাক্তার সুবোধ রায়ের সঙ্গে তিনিই আলাপ করিয়ে দেবেন বলেছেন। তাই—

নিরঞ্জন। (ছবির দিকে চেয়ে) খুব ভাল হয়েছে। কত দিন পরে তুলি ধরেছ?

প্রতুল। বহুদিন পরে। পছন্দ হয়েছে?

নিরঞ্জন। সেই আগেকার মত রঙ ব্যবহার করেছ। দিল্লীতে আর্ট প্রদর্শনীতে তোমার অঙ্কন পদ্ধতি বিশেষ করে রঙের কাজ দেখে ধন্য ধন্য পড়ে গিছল, মনে আছে। সে আজ প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা।

প্রতুল। এ রঙ, বাজারে পাওয়া যায় না। আমি নিজে তৈরী করি। রঙ তৈরী করা হ'ল কেমিষ্ট্রির অঙ্গ।

নিরঞ্জন। বন্ধু, আমি তোমার সম্বন্ধে ক্রমেই সন্দিহান হয়ে পড়ছি।

প্রতুল। কেন?

নিরঞ্জন। এই ছবির মুখের ভাব দেখে।

প্রতুল। খারাপ হয়েছে?

নিরঞ্জন। না, ভাল হয়েছে, অপুর্ব্ব হয়েছে। কিন্তু মুখের ঐ হাসি, চোখের ঐ নীরব ভাষা—কোথায় পেলে তার সন্ধান? তোমার মনে। ও জিনিষ শুধু চোখে ধরা যায় না, হৃদয়ের অন্তরতম কোণে অনুভব করতে হয়।

প্রতুল। মানে?

নিরঞ্জন। অত্যন্ত সোজা। তুমি প্রেমে পড়েছ। সাধনা আর প্রেম এক সঙ্গে হয় না। বড় বড় জিতেন্দ্রিয় মুনি-ঋষিরাও নারীর প্রলোভনে পড়ে তপস্যাচ্যুত হয়েছেন।

প্রতুল। (হেসে) না, না, তুমি একেবারে ভুল বুঝেছ। ব্যাপারটা কি জান? আমি স্বাস্থ্য, যৌবন বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ায় ধরে আটকে রেখেছি, কিন্তু মনটাকেও তো সেই রকম রাখতে হবে। তাই আমার দরকার একটু মেলামেশা, আমোদ, স্ফূর্ত্তি—

নিরঞ্জন। (হেসে) ভাল!

প্রতুল। ঠাট্টা নয়। শরীরের ওপর মনের আধিপত্য কতখানি তা তো জান।

নিরঞ্জন। নিজের সঙ্গে বঞ্চনা কোরো না প্রতুল।

প্রতুল। আমি সত্য কথাই বলছি।

নিরঞ্জন। আমি এই ভয়ই চিরকাল করে আসছি। আশী বছরকে পঁয়ত্রিশে আবদ্ধ রাখতে গিয়ে কোন দিন মনটাকে সেই বয়সের চাঞ্চল্যে মাতিয়ে ফেলবে।

প্রতুল। বিশ্বাস কর, আমি প্রেমে পড়ি নি।

নিরঞ্জন। তোমার অঙ্কিত এই ছবিই তোমার মনের আসল পরিচয় দিচ্ছে। তুমি দু' নৌকায় পা দিয়েছ। পতন অনিবার্য্য। এখনও পথ বেছে নেবার সময় আছে, নইলে দুইই হারাবে।

প্রতুল। তুমি অনর্থক মন গড়া বিপদ সৃষ্টি করে ভয় পাচ্ছ।

নিরঞ্জন। নিজের জন্য নয় তোমার জন্য। প্রতুল, তুমি আমার বন্ধু। বাড়িয়ে বলছি না, আমার মতে তুমি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। সেই জন্য তোমার শত অপরাধ আমার মনুষ্যত্বকে আঘাত করলেও আমি নীরবে সর্ব্ব কাজে তোমায় সাহায্য করে এসেছি। আমি তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি, আগুন নিয়ে খেলা কোরো না। নারী পৃথিবীতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান, কিন্তু আবার সেই নারীই সবচেয়ে সর্ব্বনাশী। হেলেন, সীতা, পদ্মিনী, এদের কথা ভুলে যেও না। সাবধান বন্ধু, এখনও সময় আছে।

প্রতুল। জানি—

নিরঞ্জন। তোমার এই সাধনা, গবেষণা সব জলাঞ্জলি দিতে হতে পারে।

প্রতুল। না। তা অসম্ভব।

নিরঞ্জন। এতটা আত্মপ্রত্যয় ভাল নয়।

প্রতুল। এ শুধু আত্মপ্রত্যয় নয়, এ আমার জীবন। এতখানি এগিয়ে আজ যদি আমি বন্ধ করি, দেখতে দেখতে আমার শরীরে জরা আক্রমণ করবে এবং তার পর মরজগতের যা একমাত্র নিশ্চিত, সেই মৃত্যুর—

নিরঞ্জন। কয়েকদিনের সুখের জন্য হয় ত তুমি মৃত্যুবরণ করতেও পেছপাও হবে না।

প্রতুল। ভুল, বন্ধু ভুল। আমার সাধনা আর আমার জীবন একসূত্রে গাঁথা। যে মৃত্যুকে জয় করবার জন্য এত পাপ অর্জ্জন করেছি সে মৃত্যুকে অবাধে আলিঙ্গন করে আমি আত্মঘাতী, ধর্ম্মঘাতী হব না। তাহলে আমার অতীত ক্রাইমসের কোন জাষ্টিফিকেশনই থাকবে না।

নিরঞ্জন। শুনে সুখী হলুম। আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করছি। তুমি লোকচক্ষে সাধারণ মানুষ। শরীর, স্বাস্থ্য, যৌবন তোমার আছে। কিন্তু কোনটাই সত্যিকারের নয়। আজ যদি, ভগবান না করুন, আমাদের কাজে কোন ভুল হয়ে যায়, কাল তাহলে তুমি আর এ মানুষ থাকবে না অতএব তোমার ভালবাসার অধিকার নেই। একটী সরলা বালিকার তাতে সর্ব্বনাশ হবে।

প্রতুল। একথা আমার স্মরণ আছে এবং চিরদিন থাকবে।

(ক্রমশঃ)

ঝড়ে আর জলে

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ঝড়ে জলে বিজলীতে আর অন্ধকারে
লাগিয়াছে মারামারি বিষম হুঙ্কারে—
কেহ নাহি হারে আর কেহ নাহি জেতে।
এ ওরে ঝাপটি' ধরি' খালি যায় মেতে

দেখাতে আপন শক্তি। গাছে ডালে ডালে
চলে সেই মারামারি তালে ও বেতালে,
কভু কমে, কভু বাড়ে।
দুর্দ্দান্ত প্লাবন,
আজি এই বরষার গর্জ্জন, নর্ত্তন

আমারে চঞ্চল করে। বিনিদ্র নয়নে
মত্ত ক্ষুব্ধ প'ড়ে আছি শীতল শয়নে
কভু কম্পমান আর কভু হর্ষবান।
মনে হয়—আকাশ ও ধরণীর প্রাণ
আমারি প্রাণের মত উদ্বেল কাতর।
হোথা নীলাকাশ আছে মাথার উপর,
আর নীচে ধরাখানি—উভয়ের মাঝে
মেঘে-রচা চলে দ্বন্দ্ব দানবীর সাজে।
জলে আর প্রভঞ্জনে দুরন্ত, উদ্দাম,
অবারিত, ভয়ঙ্কর, ভীম, অবিরাম,—
তারি মাঝে তুচ্ছ আমি স্বল্প-পরিমাণ
কেঁপে উঠি, কেঁদে উঠি প্রমত্ত-পরাণ।
কত অসহায় মোরা কত ক্ষুদ্র দীন,
জানায় নিয়ত আজি এই বর্ষাদিন।

পথনির্দ্দেশ ও পরিণীতা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পথনির্দ্দেশ—নরনারীর সম্পর্কের অনাবিষ্কৃত শাখায় এবং বহু স্বল্পপরিচিত হৃদয়ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র নব নব বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াছেন। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই সত্যের গভীর রসানুভূতিতে মণ্ডিত কলাসুন্দর বাণী-রূপই তাঁহার সাহিত্য।

যে সকল বিধিবিধান ও সংস্কারের মধ্য দিয়া আমাদের সামাজিক জীবনধারা প্রবাহিত, সেগুলিকে মানিয়া লইয়াই শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে নর-নারীর জীবনের বৈচিত্র্য অবলম্বনে কথা-সাহিত্য রচিত হইত। যাহাকে সমাজের ভিত্তি বলিয়া মনে করা হইয়াছে...তাহার দৃঢ়তা, সারবত্তা বা সবলতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কেহ তুলিত না। চির প্রচলিত বাঁধা আদর্শের মানদণ্ডেই মানবচরিত্রের বিচার করা হইত। শরৎচন্দ্র সমাজের ও প্রচলিত নীতিধর্ম্মের ভিত্তি ধরিয়া টান দিয়া তাহার শক্তি, মূল্যবত্তা ও সত্যাধিকারের পরীক্ষা করিয়াছেন। তাই শরৎচন্দ্রের পরিকল্পিত বহু চরিত্র প্রচলিত সমাজধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ অসংযমের বিদ্রোহ নয়—নিমে দত্ত দেবেন দত্তের বিদ্রোহ নয়। সংকীর্ণ সংস্কারান্ধ গতানুগতিক নীতিধর্ম্মের মধ্যে যে অসত্য, অসারতা ও ভ্রান্তিমোহ আত্মগোপন করিয়া আছে এই বিদ্রোহী চরিত্রগুলি সেগুলিকে সত্যের আলোকে নিরাবরণ করিয়া দেখাইয়াছে এবং তাহার স্থলে বিশ্বজনীন সত্যে সমুজ্জ্বল নীতিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। শরৎচন্দ্র রসশিল্পী, বলা বাহুল্য, ভ্রান্ত সংস্কারের বিলোপ সাধন এবং বিশ্বজনীন সত্যের প্রতিষ্ঠাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যব্রত নয়। শরৎচন্দ্র সমাজসংস্কারক নহেন। তিনি কেবল দেখাইয়াছেন—জনবলে বলীয়ান ভ্রান্তসংস্কার ও দেশজোড়া অসত্যের সহিত একেশ্বর সংগ্রাম করিতে গিয়া সত্যানুব্রতীর কি শোচনীয় পরিণাম হয়! হতভাগ্য সত্যানুব্রতীর প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর সহানুভূতিই সাহিত্যের রূপ ধরিয়াছে। ইহার পরোক্ষ ফল যাহাই হউক, শরৎচন্দ্রের মতে সাহিত্যে ইহার বেশী কিছু করিবার নাই।

অন্ধ গতানুগতিক সংস্কারের সহিত সত্যনিষ্ঠার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই শরৎচন্দ্রের বহু রচনার উপজীব্য। প্রচলিত সামাজিক ও পারিবারিক বিধিবিধানের অতীত সার্ব্বজনীন নীতিধর্ম্মের ব্যাপার আমাদের কাছে অন্ততঃ সাধারণ পাঠকের পক্ষে যেমন অনাবিষ্কৃত—তেমনি অপ্রত্যাশিত। শরৎচন্দ্র এই অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গের সহসা উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে চমকিত করিয়াছেন—এই অনাবিষ্কৃত অথবা উপেক্ষিত রাজ্যের কথা তুলিয়া আমাদের চিত্ত ও চিন্তাকে আলোড়িত করিয়াছেন। অপ্রত্যাশিতের চমক, অনাবিষ্কৃতের আবরণ উন্মোচন, বৈচিত্র্যের অবতারণা ও গূঢ় সত্যের উদ্বোধন আমাদের অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দ দিয়াছে। এই আনন্দ অবশ্য অবিমিশ্র নয়—কারণ, আমাদের চির-পোষিত চির-পূজিত আদর্শের ভাঙ্গা ভাঙ্গার আঘাতে আমাদের চিত্তকে বিচলিতও করিয়াছে। কিন্তু নবোন্মেষিতসত্যের পক্ষে শরৎচন্দ্রের আবেগময় যুক্তি পরম্পরা ও সরস রচনাভঙ্গী আমাদের ক্ষুব্ধ চিত্তকে শেষ পর্য্যন্ত প্রশান্ত করিয়া দিয়াছে। এই শ্রেণীর রচনায় আমরা যে আনন্দ পাই তাহার সবটাই অনুভূতিমূলক (Emotional) নয়, কতকটা বুদ্ধিমূলক (Intellectual)। অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব ও অনাবিষ্কৃতের প্রকটনে যে আনন্দ পাই—তাহা অনেকটা হৃদয়-বিস্ফারক অদ্ভুত রসের কাব্য পাঠের আনন্দ। ইহা রসানন্দ, ইহার সহিত রচনাভঙ্গীর অপূর্ব্বতার উপভোগের আনন্দ আছে, তাহাও রসানন্দ। আর সত্যের ক্রমোন্মেষের দ্বারা যে আনন্দ, তাহা বোধানন্দ।

শরৎচন্দ্রের পথনির্দ্দেশের কথাই ধরা যাক। নিরাশ্রয়া জননী সুলোচনা ও কন্যা হেমকে আশ্রয় দিল ব্রাহ্ম গুণীন্দ্র। গুণীন্দ্রের স্নেহ ভালবাসা দয়া ক্ষমা তিতিক্ষা—সর্ব্বোপরি সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বে মুগ্ধ হইয়া হেম স্বভাবতই তাহার অনুরাগিণী হইল। গুণীন্দ্রের প্রথম যৌবনের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় পাইল। হেম তাহার প্রতি করুণা ক্রমে স্নেহে, স্নেহ ক্রমে প্রেমে পরিণত হইল। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহা ঘটিল হৃদয়-ধর্ম্মের নির্দ্দেশে ও আমন্ত্রণেই। প্রচলিত সমাজ বিধান তাহাদের মিলনের পরিপন্থী। এই সমাজ-বিধান জননী সুলোচনাকেই আশ্রয় করিয়া বাধার সৃষ্টি করিল। সুলোচনা উপলক্ষ মাত্র। সে অপরাধিনী নয়, প্রচলিত সমাজ ধর্ম্মেরই সে [illegible] অনুসারিকা মাত্র। ফলে, জননী হইয়াও একমাত্র সন্ততি হেমের জীবনটা সে [illegible] বারে ব্যর্থ ও অন্ধকারময় করিয়া দিল। সংস্কারের সহিত [illegible] সত্যের দ্বন্দ্ব ও [illegible]র শোচনীয় পরিণতি দেখাইয়া শরৎচন্দ্র সত্যাসত্য-বিচারের 'পথ নির্দেশ' করিয়াছেন। ইহার বেশি শরৎচন্দ্রের মত রসশিল্পীর আর কিছু করিবার নাই।

সুলোচনা তাহার কন্যা হেমকে বলিল—"বিয়ে না দিলে জাত যাবে যে রে।"

হেম বিনা বাধায় বলিল—গেলেই বা! আমরা দুটি মায়ে ঝিয়ে থাক্‌ব, দুঃখ ক'রে খাব, আমাদের জাত থাকলেই বা কি গেলেই বা কি? পৃথিবীতে আরো অনেক জাত আছে মেয়ের বিয়ে না দিলে তাদের জাত যায় না। আমরা না হয়, তাদের মত হ'য়ে থাকব।

তেরবছরের বাঙালী মেয়ে হেমের মুখে একথা অপ্রত্যাশিত! বলা বাহুল্য একথা শরৎচন্দ্রের নিজেরই কথা। ইহা যুগপৎ জাতিমোহের অন্তঃস্থ অসত্য ও তাহার অতীত বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি ইঙ্গিত। ইহা হেমের মুখের কথা মাত্র নয়। এই কথাগুলিতে যে সত্য নিহিত আছে হেম সেই সত্যেরই জীবনে অনুসরণ করিতে গিয়া পরম দুঃখ বরণ করিয়াছে।

হেম ব্রাহ্ম গুণেন্দ্রের পাতে বসিয়া খাইল। সুলোচনা অবাক হইয়া

চাহিয়া রহিলেন। গুণীও তিরস্কার করিল। হেম উত্তর করিল, "তোমার পাতে ব'সে খেলে মা দুঃখ পান—না খেলে মার চেয়ে যিনি বড়, তাঁকে দুঃখ দেওয়া হয়।" এ কথাও শরৎচন্দ্রের। মা'র চেয়ে বড় সে ভগবান নয়, এখানে প্রেম অর্থাৎ সত্য।

সাধারণ হিন্দু পাঠকেরাও সুলোচনার মত অবাক হইবে, কিন্তু গুণীর মতই আমরাও এই অপ্রত্যাশিত সত্যের অবতারণায় আনন্দই পাই।

সুলোচনা হেমের কাছে গিয়া নবদ্বীপে থাকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া হেমকে পত্র লিখিল। হেম উত্তরে লিখিল—'তুমি যে বাড়ীতে আছ—সে বাড়ীর হাওয়া লাগলেও সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার হ'য়ে যেতে পারে। ওখান থেকে তোমার যদি পুণ্য সঞ্চয় না হয়, তবে বৈকুণ্ঠে গেলেও হবে না।'

গুণী আদর্শচরিত্রের যুবক। তাহার অনন্যসাধারণ মনুষ্যত্বের কাছে পুণ্যতীর্থের প্রভাবও নিষ্প্রভ। মনুষ্যত্বই যে পরম সাধনার বস্তু, শরৎচন্দ্র হেমের মুখ দিয়া সেই কথাই বলিয়াছিলেন। গুণীর সংসর্গ পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপ হইতেও বড়, একথা শুনিয়া সুলোচনা আরও বিস্মিত হইয়াছিল। এ দেশের হিন্দুপাঠকেরও সেই বিস্ময় জাগিয়াছিল। কিন্তু এই সুলোচনাই মৃত্যুর আগে সদ্যবিধবা হেমকে বলিতেছে—

"কথাটা কোনদিন ভুলিস না মা। ওসব মানুষের বুকের ব্যথা স্বয়ং ভগবানের বুকে গিয়ে বাজে। তার যা ধর্ম্ম, তোর ধর্ম্মও তাই। এ আমার আদেশ নয় হেম, এ তাঁর আদেশ, যাঁর আদেশে তোরা একদিনের দেখাতেই চিরকালের মত এক হ'য়ে গিয়েছিলি। যিনি অন্তর্য্যামী, তিনি বুকের ভিতর লুকিয়ে ব'সে কথা ক'ন, তাঁকে অস্বীকার ক'রো না।" সুলোচনার কণ্ঠে সত্যের অনুভূতির এই অকুণ্ঠ প্রকাশ—আমাদিগকে চমকিত করে। কিন্তু ইহাই ত স্বাভাবিক। সুলোচনা যেমন শেষ পর্য্যন্ত সংস্কারমুক্ত সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে—সাধারণ হিন্দুপাঠকও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের চিরপোষিত সংস্কারের অঙ্গে বারংবার আঘাত সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে জাতীয়সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। গুণীর মুখেও শরৎচন্দ্র যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাও তাঁহার নিজেরই কথা। এসকল কথায় তিনি এই অসত্যনিষ্ঠ সমাজের ভিত্তি ধরিয়াই টান দিয়াছেন। গুণী বলিতেছে—"জাত আর ধর্ম্ম এক জিনিস নয়। একটা দেশাচার, লোকাচার, শুদ্ধমাত্র ইহকালের বস্তু। কিন্তু অপরটা ইহকাল পরকাল দুই কালেরই বস্তু। কিন্তু তাই ব'লে ধর্ম্ম মেনে চল্‌লেই যে জাত মেনে চলা হয়—তাও না। আবার জাত মেনে চল্‌লেই যে ধর্ম্ম মানা হয় তও নয়।"

আবার আর একস্থলে গুণী বলিতেছে—"কর্ম্মফল যদি সত্য হয়। স্বামী-স্ত্রীর চির-সম্বন্ধটা কোনমতেই সত্য হ'তে পারে না। এ সংসারে কত পাষণ্ড স্বামীর সতীসাধ্বী স্ত্রী থাকে, স্বামীটা হয় ত ম'রে গরু হ'য়ে জন্মায়। এ তোমাদের শাস্ত্রের কথা। তুমি কি এই কামনা কর হেম সতীসাধ্বী স্ত্রী তার সারা জীবনের সুকর্ম্মের অন্তে সেই গরুর সঙ্গে গোয়ালে গিয়ে বাস করে?"

এসব বাবালির মুখের কথার মত। এ যুগের প্রাচীনপন্থীরা এগুলোকে "অইতাম্ যুক্তিরিয়ম্" বলিয়া নিস্কর মুখ ফিরাইবেন।

এসব তত্ত্ব বিচারের কথা। শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে ইহাই চরম কথা নয়। সচেতন শিল্পী শরৎচন্দ্র বেশ বুঝিতেন, ইহাতেই তাঁহার সৃষ্টি রসোত্তীর্ণ হইতে পারে না। তিনি যুক্তির পথে সত্যের বিজয় ঘোষণা করিয়া আপনার শুদ্ধ চিত্তকে ব্যর্থ প্রবোধে আশ্বস্ত করেন নাই। রচনাটিকে রসোত্তীর্ণ করিবার জন্য হেমের চিত্তে দুর্জ্জয় অভিমানের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অভিমান হেমকে কঠোর আত্মনিগ্রহে প্রনোদিত করিয়াছে। এই আত্মনিগ্রহই অসত্য শাসনের উদ্দেশে দারুণ ধিক্কার। পথনির্দ্দেশ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে ইহাতেই। গুণীর সহিত হেমের শেষ পর্য্যন্ত মিলন ঘটিলে সত্য আশ্বস্ত হইত মাত্র, কিন্তু সত্য বিজয়ী হইয়াছে হেমের স্বয়ংকৃত আত্মনিগ্রহে, ইচ্ছাকৃত ব্যবধানে ও বিচ্ছেদে, হেমের বুকের রক্তের জয়টীকা লাভ করিয়া। শরৎচন্দ্রের রসসৃষ্টির চিরন্তন টেক্‌নিক ইহাই।

অসত্য সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত হেম গুণীন্দ্রকে ধরা দিল না—মাতৃ-আজ্ঞাও পালন করিল না—গুণীর অগাধ প্রেমের যথাযোগ্য প্রতিদান দিল না। ইহাতেও আমরা বিস্মিত হই। এই বিস্ময়ই ক্রমে বোধানন্দে পরে রসানন্দে পরিণত হয়।

হেম গুণীকে ভালবাসিয়াছিল—সুলোচনা তাহা জানিত। গুণী ত জানিতই। প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া গুণী ও সুলোচনা সমাজ-শাসনের তাড়নায় হেমকে অন্যত্র বিবাহ দিল। সে অল্পদিনের মধ্যে বিধবা হইল। হেম সংস্কারমুক্ত—গুণীও তাই—মৃত্যুশয্যায় সুলোচনা যে ইঙ্গিত করিয়া গেল তাহাতে মুমূর্ষুর কণ্ঠে সত্যেরই গভীরতম অভিব্যক্তি। কিন্তু হেমের দুর্জ্জয় অভিমান তাহাকে আত্মনিগ্রহে প্রণোদিত করিল। এখানে দারুণ অভিমানই অন্তরের সত্যকেও গ্রাস করিল। সে কঠোর বৈধব্য ও ব্রহ্মচর্য্যে মন দিল। কিন্তু এ সমস্তও আত্মবঞ্চনা মাত্র। হেম এ সমস্তকে অসত্য বলিয়া জানিয়াও যেন সত্যের অবমাননার প্রতিশোধ দিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র কেবল বলিলেন—"যেমন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ জেলের মধ্যে বেষ্টনের পর বেষ্টন তুলিয়া তাহার বড় বড় কয়েদীগুলির পরিসর ছোট করিয়া আনিতে থাকে হেম যেন ঠিক তেমনি সতর্ক হইয়া তাহার হৃদয়বাসী কোন এক গভীর দুষ্কৃতকারীর চলাফেরার পথ সংকীর্ণ করিয়া আনিতে লাগিল।" বলা বাহুল্য, ইহা প্রেমরূপী সত্যেরই পথ। হেমের মত শরৎচন্দ্রও অভিমানভরে ইহাকে "গভীর দুষ্কৃতকারী" আখ্যা দিলেন।

শরৎচন্দ্র এই গল্পে দেখাইয়াছেন—দৈহিক সংযোগটাই প্রেমের পক্ষে বড় কথা নয়। হেম দৈহিক সংসর্গ এড়াইয়া গিয়াছে—কিন্তু গুণীর উপর যে অধিকার স্থাপন করিয়া সে কর্ত্রীত্ব করিয়াছে তাহা গভীর প্রেম ছাড়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল দৈহিক সম্পর্ক ঘটিয়াছিল তাহার সহিত; প্রেম সম্পর্ক ঘটে নাই বলিয়াই বিবাহটা মিথ্যা অভিনয় মাত্র। শরৎচন্দ্রের এই সকল গল্পে প্রধানতঃ মানুষের হৃদয়-লীলারই বৈচিত্র্য দেখানো হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বৈচিত্র্য সত্যের সহিত অসত্যের, সংস্কারের সহিত স্বাধীন চিন্তার সংগ্রাম হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের আলোকে আমরা একদিকে যেমন সহস্র লোকাচার দেশাচারের আবর্জ্জনার অন্তরালে বিশ্বজনীন সত্যকে

প্রতীক্ষমাণ দেখিয়া পুলকিত হই—অন্যদিকে তেমনি মানবমনের গহনতম প্রদেশের সমস্তটুকু দেখিতে পাইয়া চমকিত হই। ইহার সঙ্গে রচনাভঙ্গীর কলা-কৌশলের রসানন্দ ও সত্যের পরমায়কে কর্পূরবাসিত করিয়াছে।

পরিণীতা—পরিণীতা শরৎচন্দ্রের একখানি মধ্যম শ্রেণীর বড় গল্প। একটি বৈচিত্র্যময় প্রেমলীলাই ইহার উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রভাব ইহাতে বিদ্যমান। পিতৃশাসনে অবস্থিত পিতৃসংসারে সুখে লালিত শিক্ষিত যুবকের পক্ষে প্রেম করা যত সহজ—প্রেমানুগৃহীতাকে (?) বিবাহ করা তত সহজ নয়। প্রথম-যৌবনের আবেগে নির্বিচারে একজনকে ভালবাসিয়া শেষ পর্যন্ত মাতাপিতার অবাধ্য হইয়া—পিতার সুখশান্তিময় গৃহ ও সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া, তাহাকে বিবাহ করার সাহস ও তেজস্বিতা সাধারণ শিক্ষিত যুবকের থাকে না। ইহা সম্পূর্ণ স্বভাবসম্মত ব্যাপার।

তরুণ যুবক কোন বালিকাকে বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু সে স্বাধীন নয়, উপার্জ্জনক্ষম নয়, পিতার সম্পদের লোভ সে ত্যাগ করিতে পারে না। প্রেমের সঙ্গে পিতৃশাসনের দ্বন্দ্ব বাধে। ফলে দুদিনের Romance উবিয়া যায়, নয়ত একটা অনর্থ ঘটে। বাংলা কথাসাহিত্যে ইহা একটি সাধারণ উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্পের আখ্যানবস্তু এইরূপ। গল্পের নায়ক শেখর একদিন দরিদ্রা অনাথা কন্যা ললিতার সঙ্গে মালা-বদল করিয়া তাহার ওষ্ঠাধরে প্রণয়ের মুদ্রাঙ্ক রোপণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু বিবাহ-সংকল্পের দৃঢ়তা তাহার মনে ক্রমে লোপ পাইল। "তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল—জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল, গলায় মালা দুলিয়াছিল, প্রিয়তমার বক্ষস্পন্দন নিজের বুক পাতিয়া সেইমাত্র প্রথম অনুভূতিসঞ্জাত প্রাপ্ত মোহ ছিল এবং প্রণয়ীরা যাহাকে অধরসুধা বলিয়াছেন তাহাই পান করিবার অতি তীব্র নেশা ছিল। তখন স্বার্থ ও সাংসারিক ভালমন্দ মনে পড়ে নাই, অর্থলোলুপ পিতার রুদ্রমূর্ত্তি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে নাই।"

ললিতাকে বিবাহ করা সম্ভব নয় মনে করিয়া শেখর অন্যত্র বিবাহের সম্মতি দিল। কিন্তু শেখরের পক্ষে যাহা লীলামাত্র, ললিতার বক্ষে তাহা শিলা। সে নারী—বাঙ্গালী হিন্দু ঘরের নারী—সে শেখরের প্রণয়-বিলাসকে সাময়িক রসাবেশ বলিয়া উড়াইতে পারিল না। সে প্রণয়ের মুদ্রাঙ্ককেই পরিণয়ের মুদ্রাঙ্ক বলিয়া ধরিয়া লইয়া নৈরাশ্যের সহিতই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শেখরও তাহা যে বুঝিত না তাহা নয়। সে ললিতাকে বেশ চিনিত—তাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে। শেখর জানিত, একবার যাহা সে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছে—কোন মতেই সে তাহা ত্যাগ করিবে না।

শরৎচন্দ্র কিন্তু শেখরকে একেবারে অমানুষ করেন নাই—তিনি শেষ রক্ষা করিয়াছেন। শেখরের চরিত্রের মধ্যে মনুষ্যত্বের যথেষ্ট উপাদান না পাইয়া তিনি বাহিরের সহায়তা লইয়াছেন। শেখরের পণলুব্ধ পিতাকে সরাইয়াছেন, ব্রাহ্ম গুরুচরণকেও সরাইয়াছেন—গিরীনকে মহান ও উদার করিয়া তুলিয়াছেন এবং আর ললিতাকে করিয়াছেন একনিষ্ঠা প্রেম-ধর্ম্মানুরক্তা। ললিতার একনিষ্ঠ অনুরাগ শেখরকে বিচলিত করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ললিতার প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। অরক্ষণীয়ার অতুলের চেয়ে শেখরের মনুষ্যত্বের আশ্রয়ে প্রত্যাবর্ত্তন অধিকতর স্বাভাবিক ও বাস্তব-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের বহু গল্পেই দেখা যায়—যে সংসারে লক্ষ্মী আছেন—সে সংসারে গৃহলক্ষ্মীও আছেন। ভুবনেশ্বরী নবীন রায়ের সংসারে গৃহলক্ষ্মী। এইরূপ গৃহলক্ষ্মীর স্নেহচ্ছায়া পরিজনগণের মনুষ্যত্বসাধনার সহায়ক।

দত্তা পড়িয়া যাঁহারা মনে করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের বিদ্বেষ ছিল ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি—তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের তরুণ যুবক গিরীনের কথা পড়িয়া ধারণার পরিবর্ত্তন করিবেন আশা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মবিদ্বেষ ছিল না। ছিল বৃদ্ধ বিদ্বেষ।

এই গল্পে শরৎচন্দ্র অর্থ সম্বন্ধে একটু বেশি মুক্তহস্ত হইয়াছেন। যৌবনে শরৎচন্দ্রের চিত্তবলের তুলনায় বিত্তবলের অভাব ছিল। অর্থের অপ্রতুলতার ক্ষোভ তিনি তাঁহার রচিত সাহিত্যে প্রাণ ভরিয়া মিটাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের কল্পিত যুবকরা প্রায় সকলেই অর্থসম্বন্ধে উদাসীন ও মুক্তহস্ত। তাহাদের চিত্তবলের অভাব আছে কিন্তু বিত্তবলের অভাব নাই। সাহিত্যের রসসৃষ্টির প্রয়োজনের দিক হইতেও ইহার একটা ব্যাখ্যা দিতে পারা যায়।

অন্নবস্ত্রেরই যাহার অভাব—তাহার প্রেম করা শোভা পায় না—জঠরে যাহার ক্ষুধা—হৃদয়ে তাহার সুধা থাকিবার কথা নয়, তাহার প্রেমবিলাসের অবসরও নাই। বোধ হয় এই কথা ভাবিয়া শরৎচন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রেমিক যুবকদের ধনিসন্তানই করিয়াছেন। আর একটি দিকে শরৎচন্দ্রের খর দৃষ্টি ছিল। 'সুবর্ণের' প্রতি আসক্তি ও 'সুবর্ণার' প্রতি অনুরাগ পরস্পর বিসংবাদী, ইহাও তিনি অনুভব করিতেন। তাই তাঁহার প্রেমিকরা ধনীর সন্তান—সেই সঙ্গে অর্থ সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ। অর্থের প্রতি মমতা প্রেমের ব্যাপারে রসাভাস ঘটায় বলিয়া তিনি নিস্পৃহতার সমাবেশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে প্রেমিকরা শুধু নিঃস্পৃহ নয়—মুক্তহস্ত—এমন কি সর্ব্বস্ব পণ করিতেও প্রস্তুত। অবশ্য এ গল্পটিতে বাস্তবতার ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। গল্পটিতে Romanceএর আধিক্যই বেশি।

পরিণীতায় শরৎচন্দ্র একটি চমৎকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই চিত্রে একটি পরম সত্যেরও ইঙ্গিত আছে।

আন্নাকালীর পুতুলের বিয়ে। পাঁজি দেখিয়া বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির করা হইয়াছে। শেখরদাদা আন্নাকালীকে একটা মালা দিতে চাহিয়াছিল। ললিতার মারফতে সেই মালা সে পাঠাইল। ললিতা কৌতুকচ্ছলে সেই মালা পিছু দিক হইতে শেখরকে পরাইয়া দিল। শেখর এই মালা পরানো ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল না। সে অন্যমনস্ক ললিতার পিছন দিকে গিয়া ঐ মালা পিছন হইতে পরাইয়া দিল। ললিতা কাঁদিয়া বলিল—"আমার কেউ নেই ব'লেই তুমি এমন করে অপমান করছ।" শেখর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহজভাবে বলিল…"এখন একটু ভেবে দেখলেই টের পাবে। আজকাল বড় বাড়াবাড়ি করছিলে ললিতা, আমি বিদেশে যাওয়ার আগে সেইটেই বন্ধ ক'রে দিলুম।" ললিতা আর প্রত্যুত্তর করিল না—মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-

তলে দুজনেই শুরু হইয়া ছিল। শুধু নীচে হইতে আন্নাকালীর মেয়ের (পুতুলের) বিয়ের শাঁখের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাইতেছিল। এই ত খাঁটি বিবাহ! শরৎচন্দ্র রসের ইঙ্গিতে বলিতে চাহিয়াছেন—শেখর ও ললিতার প্রকৃত বিবাহ শুভ দিনে শুভ লগ্নে মাল্য-বিনিময়ে শঙ্খধ্বনির মধ্যেই হইয়া গেল। পুরোহিতের মন্ত্রপড়া অনুষ্ঠানটার মূল্য ইহার কাছে কিছুই নয়। হৃদয়ের বিনিময়ই প্রকৃত বিবাহ—লৌকিক অনুষ্ঠানটাই বিবাহ নয়। শেখর ইহা ভুলিয়া যাইতে পারে—ললিতা তাহা ভুলিতে পারে না। হিন্দু পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারে—হিন্দু নারী দুইবার বিবাহ করিতে পারে না। ললিতা তাই শেখরের আশা ত্যাগ করিয়াও অবিবাহিতাই ছিল।

অকারণ

শ্রীজয়ন্তকুমার চৌধুরী

জাপানী বোমার ঠ্যালা-সামলাতে একদিন অতি ভোরে
চাবি দিয়ে ঘর-দোরে
কলকাতা ছেড়ে চলিয়া এসেছি নেহাতই শুকনো মুখে—
এঁদো পল্লীর জ্যাঞ্জালশূন্য খাঁটি প্রকৃতির বুকে।
লাগিছে কেমন? চাও তা জানিতে? কঠিন সে কথা বলা;
কবিতার ছলা-কলা—
—প্রসাধন যত ফেলিয়া এসেছি সহরের বাড়ীটাতে,
সাজান যাইত যাতে
মনের গরিব কথাটাকে আজি আপন-ইচ্ছামত।
ঝুটা-গহনার জৌলুসে সে যে হোতো সুন্দর কত!
উপায় যখন নেই,
সরল মনের সহজ কথাটা বলে ফেলি সহজেই।
এখানে আসিয়া বুঝিয়াছি খাঁটি, ভুল নেই এক তিল,
প্রকৃতির সাথে মানব-মনের আগাগোড়া গরমিল।
হিসাবী মানুষ যাহা কিছু ভাবে, যাহা কিছু করে আর,
আছে পশ্চাতে তার
হিসাবের পাকা খতিয়ান্-খাতা; পাইটুকু জমা তাতে,
খরচের কানা-কড়িটিও লেখা আছে খরচের পাতে।
প্রকৃতি-রাণীর রাজ্যটা জুড়ে দানছত্রের মেলা;
সব কিছু যেন বেহিসেবী সেথা, সবি যেন হেলাফেলা।
নেই হেথা বিকিকিনি,
সব কিছু নিয়ে চলিতেছে যেন অকারণ ছিনিমিনি।
'বউ কথা কও'-পাখীটা সেদিন সারারাত্তির ধরে
ডেকে মরেছিল কারে!
কে যে তার বউ, কোথা বা সে থাকে, কেবা খোঁজ রাখে তার!
সাড়া দিলে কিনা, আদৌ শোনেনা, ডেকে মরে যায় বার বার।
শুধু ডেকে মরা ডাকার নেশায়, সারারাত ডেকে যাওয়া;
নেই কোনো দাবি-দাওয়া।
জমা-খরচের হিসাবের তরে রাখেনি একটি পাতা,
আগাগোড়া শুধু গান টুকে টুকে ভরেছে সবুজ-খাতা।
সেদিন বিকেলে সহসা কখন্ সারা দুপুরের পরে,
পচা-দুপুরের গেঁজে-ওঠা সুরা ভরপুর পান করে
ক্ষেপে উঠেছিল কালবৈশাখী, করেছিল টলাটলি;
কোথায় যে পড়ে টলি
কিছু ঠিক নেই, নেশার ঝোঁকেতে শুধু হুল্লোড় করা;
যেখানে-সেখানে যার-তার গায়ে অকারণে টলে পড়া।
উৎসব-রাতি কালেভদ্রেতে আসে মানুষের ঘরে;
কটা দিন চাপা পড়ে
ফুলের গন্ধে, গানে-উৎসবে হিসাবের খেরো-খাতা;
পুরাতন মান্ধাতা
ভুলে যায় তার গতানুগতিক অচল বনেদীয়ানা;
বাসরের সাজ অঙ্গে চড়ায় বর্ব্বর মুদিখানা।
তার পরে আসে আবার ফিরিয়া একঘেয়ে গোনা-দিন,
ভাত-কাপড়ের চিন্তার ভারে মন্থর গতিহীন।
ফুল ঝরে যায়, গন্ধ শুকায়, আলো নিভে যায় ঘরে,
তেলে-নুনে আর চালে-ডালে ফের মুদিখানা উঠে ভরে।
চলে আরবার কাজ-কারবার একঘেয়ে বিকিকিনি,
মুদির দোকানে হাল্-খাতা আসে বছরে একটা দিনই।
প্রকৃতিরাণীর বাসর-ঘরেতে চির-উৎসব-রাতি
ফুলের গন্ধে গানে-উৎসবে বারোমাসই উঠে মাতি।
বারোমাসই জ্বলে লক্ষ প্রদীপে জোনাকির রোশ্‌নাই—
হিসাব-নিকাশ নাই।
লক্ষ ফুলের বাসর-শয্যা প্রতিদিনই হয় পাতা;
প্রকৃতির হাল্‌খাতা
প্রতিদিনই আসে সাথে নিয়ে তার উচ্ছ্বল উল্লাস।
উৎসব গান ফুলের গন্ধ লেগে আছে বারোমাস।

"যেতে নাহি দিব"

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

মানব হৃদয়ের চিরন্তন আকূতি—"যেতে নাহি দিব"! এই আকূতি কোথাও স্ফুটবাক্ বেদনে অভিব্যক্ত, কোথাও বা অন্তরের অন্তস্তলে নিরব রোদনের ফল্গুধারায় তরঙ্গায়িত। হয়তো নিখিল বিশ্বের সৃজন দিনে স্রষ্টার হৃদয়ের যে আবেগ অখিল সৃষ্টিকে বাহিরে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দিনই বিধিকণ্ঠ ভেদ করিয়া সৃষ্টি-সহজাত সেই আবেগেই এই মর্ম্মান্তিক সুর ধ্বনিত হইয়াছিল—যেতে নাহি দিব। অথবা কবির কথাই সত্য। "ধরণীর প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ত তীর" আকুলিত করিয়া "এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্ত" ছাইয়া "সবচেয়ে পুরাতন" এই কথা—"সবচেয়ে গভীর" এই ক্রন্দন চিরকাল অনাক্রন্তরবে ধ্বনিত হইতেছে "যেতে নাহি দিব"। সত্যই ইহার আদি অন্ত নাই।

সাকল্পিতায় এই কবিতাটীর তারিখ দেখিলাম ১২৯৯ সাল ১৪ই কার্ত্তিক। তাহা হইলে এই কবিতা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। "যেতে নাহি দিব" সোনার-তরীতে স্থান পাইয়াছিল। কি প্রাচীন—কি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এই কবিতার দ্বিতীয় নাই। নাই। বৈষ্ণব কবির মর্ম্মমথিত অশ্রুধারার সঙ্গে ইহার তুলনা করিব না। অন্ধকারাচ্ছন্ন ত্রিযামা যামিনী বিগত-প্রায়। বিগত-চেতন বিশ্বে নবদ্বীপের নিরালা কুটীরে এই এখনো বিষ্ণুপ্রিয়া জাগিয়াছিলেন। প্রিয়তমের প্রসন্ন সোহাগে সুগভীর বিশ্বস্ততায়—নিশ্চিন্ত নির্ভরতার বাহু বেষ্টনে বন্দিনী তন্দ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন, হয়তো দণ্ডেক মাত্র! জাগিয়া দেখিলেন শয্যা শূন্য। আর্ত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—মা! শচীদেবী জাগিয়াই ছিলেন, স্বর শুনিয়াই বুঝিলেন সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বিস্রস্ত বেশ-বাসে বাহির হইয়া আসিলেন রাজপথে। সূচীভেদ্য অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া, নবদ্বীপের নৈশ নিস্তব্ধতাকে উন্মথিত করিয়া জননী হৃদয়ের আকুল হাহাকার আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল—

> "হেদেরে নদীয়াবাসি কার মুখ চাও।
> বাহু পশারিয়া গোরা চাঁদেরে ফিরাও॥"

বহুকাল পূর্ব্বের—অতীতের স্মরণাতীত বাসরের আরো একদিনের কাতর কণ্ঠ আজিও বাঙ্গালার বক্ষে বেদনা জাগায়। অক্রুরের রথ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতেছে, ধুল্যবলুণ্ঠিতা সর্ব্বস্বহারা গোপীকার বিলাপধ্বনি রথচক্রের ঘর্ঘরে বিলীন হইয়া গেল!—সেই মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন আজিও বাঙ্গালার হৃদয়-যমুনায় প্রতিধ্বনিত হয়—

> "উভ হাতে শঙ্কর বোলে।
> রথ রাখ যমুনার কূলে॥"

কিন্তু সে পৃথক বস্তু।

হয়তো কবির জীবনে সত্যই এ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কবির প্রবাস যাত্রার দিনে তাঁহার চারি বৎসরের কন্যা হয়তো সত্যই তাঁহাকে বলিয়াছিল "যেতে নাহি দিব"। অথবা বিশ্রামরত কবি একদিন কোন্ অভিনব কল্পলোকে যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, লোক হইতে লোকান্তরের যাত্রী ধ্যানবিহ্বল কবিকে তাঁহার মানস দুহিতাই বলিয়াছিল "যেতে নাহি দিব"। সেই একদিনের মুহূর্ত্তোচ্চারিত একটি মাত্র কথাকে, অথবা সেই মানস-কন্যার ক্ষণিকের ইঙ্গিতকে কবি অনবদ্য শব্দে ছন্দে চিরন্তন রূপ দান করিয়া গিয়াছেন। তুচ্ছ ঘটনা, কেরাণী জাতির জীবনে নিত্যই এ ঘটনা ঘটে। কিন্তু মুহূর্ত্তকে মহাকালের বক্ষে চিহ্নিত করিতে পারে কয়জন?

কবি বলিতেছেন—

> "দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী বেলা দ্বিপ্রহর।
> মধ্যাহ্নের রৌদ্র ক্রমে হ'তেছে প্রখর।
> জনশূন্য পল্লী পথে ধূলি উড়ে যায়—
> মধ্যাহ্ন বাতাসে। স্নিগ্ধ অশথের ছায়
> ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
> ঘুমায়ে পড়েছে, যেন রৌদ্রময়ী রাতি
> ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম।
> শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ধুম।
> গিয়াছে আশ্বিন। পূজার ছুটীর শেষে
> ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূর দেশে
> সেই কর্ম্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হ'য়ে
> বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে।
> হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এঘরে ওঘরে।
> ঘরের গৃহিণী চক্ষু ছল ছল করে,
> ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার
> তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
> একদণ্ড তরে। বিদায়ের আয়োজনে
> ব্যস্ত হয়ে ফিরে। যথেষ্ট না হয় মনে
> যত বাড়ে বোঝা। * *
> * * * *
> তাকালু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
> চাহিনু প্রিয়ার মুখে, কহিলাম ধীরে
> "তবে আসি"। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
> নত শিরে চক্ষু 'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি,
> অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।
> বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন

কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হ'য়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখি পাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে, আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে। এত বেলা হ'য়ে যায়,
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়া প্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছ ঘেঁসে ঘেঁসে
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্ত দেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কি জানি কি ভেবে
চুপি চাপি বসেছিল। কহিনু যখন
"মাগো আসি", সে কহিল বিষণ্ণ নয়ন,
ম্লান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায়"।
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার
প্রচারিল "যেতে আমি দিব না তোমায়"।
তবুও সময় হোলো শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হোলো।"

কবিতার এমন সহজ সুন্দর রূপ, এমন অনবদ্য প্রকাশ ভঙ্গী, অথচ, ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই। ইহার সমগ্রতার যে সৌন্দর্য্য, বিশ্লেষণে তাহার ভগ্নাংশ লইয়া আশা মিটে না, তৃপ্তি হয় না। কবির অধিকাংশ কবিতার ব্যঞ্জনাই এমনই অপূর্ব্ব। বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিতাটী সম্পূর্ণ নূতন। আপাতদৃষ্টিতে হয়ত মনে হইতে পারে বাঙ্গালা কোন কোন কবিতা বা গীতি কবিতার সঙ্গে ইহার যেন কোথায় একটা আংশিক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সামান্য অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে সহজেই সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবে।

কবি রামবসু বাঁধিয়াছেন—

"যখন হাসি হাসি সে আসি বলে
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়ন জলে
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে
মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁয়ো না"॥

চিত্রটী সুন্দর। কিন্তু আলোচ্য কবিতাটীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নাই।

শারদ নবমী প্রভাতে বাউলের একতারায় যেদিন ঝঙ্কৃত হয়—

"গিরি যায় হে লয়ে হর প্রাণ কন্যা গিরিজায়
পারতো রাখ প্রাণের ঈশানী
বাঁচে পাষাণী গিরি যা'য়—

অথবা ভিখারিণী আসিয়া গৃহদ্বারে যেদিন তান ধরে—"

"ওহে গিরিবর হে ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল
দ্বারে বসি মহাকাল
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ এ দেহে পাষাণ প্রাণ
এই হেতু এতক্ষণ হলো না বিদায়।"

বাঙ্গালার সেই বিজয়া দশমী দিনের সঙ্গে এই আশ্বিনের পূজার ছুটী শেষের দিনের সম্পূর্ণ পার্থক্য সুস্পষ্ট।

একদিন বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে ক্ষণ-বিচ্ছেদ-বিধুরা বঙ্গজননী আকুল আকুতি ধ্বনিত হইয়াছিল—

"বলরাম তুমি নাকি— শ্রবণে শুনিনু এ কি
(আমার) পরাণ লইয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া মরি দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ।
বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের পোয়ে বনেরে বিদায় দিয়ে
দৈবে মারিবে বুঝি মায়॥
কত জন্ম তপ করি আরাধিয়া হর গৌরী
তাহে পাইনু এ দুধ পাসরা।
কেমনে ধৈরয ধরে মা'য়ে কি বলিতে পারে
বনে যাউক এ দুধ কোঙরা॥
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে ঘরে যাইতে পথ ভুলে
দুটি হাত মুখে দিয়ে কান্দে।
আউলাইয়া কটির ধরা দু' চরণে লাগে বেড়া
আপনা আপনি পড়ে ফান্দে॥
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
শুন তোমরা যতেক রাখাল।
বংশীবদনের বাণী কান্দি কহে নন্দরাণী
আজু রাখি যাওরে গোপাল॥"

চারিশত বৎসর পরে আর একজন বাঙ্গালী কবির কণ্ঠে ইহারই বিপরী একটী সুর সম্পূর্ণ অভিনব ছন্দে উতরোল হইয়া উঠিল—

"চারিদিক হ'তে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যা কণ্ঠস্বরে শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হলো না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটীর মত
অক্ষুণ্ন প্রেমের গর্ব্বে কহিছে সে ডাকি
যেতে নাহি দিব। ম্লানমুখ অশ্রু আঁখি

দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব।
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়
যেতে নাহি দিব। যতবার পরাজয়
ততবার কহে আমি ভালবাসি যারে
সে-কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে?
আমার আকাঙ্ক্ষা সম এমন আকুল
এমন সকল বাড়া এমন অকুল
এমন প্রবল বিশ্বে কিছু আছে আর।
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
যেতে নাহি দিব। তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে যায়
একটা নিশ্বাসে তার আদরের ধন,
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটী নয়ন,
ছিন্ন মূল তরু সম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব্ব নতশির। তবু প্রেম বলে
সত্য ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির অধিকার লিপি। তাই স্ফীত বুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে "মৃত্যু তুমি নাই" হেন গর্ব্ব কথা
মৃত্যু হাসে বসি। মরণ পীড়িত সেই
চিরজীবি প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার। বিষণ্ণ নয়ন পরে
অশ্রু বাষ্প সম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির কম্পমান।
আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ কুয়াসা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে
দু'খানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে শিরে
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,
অশ্রু বৃষ্টি ভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।"

কবি যখন বলিতেছেন—'অতি ক্ষুদ্র তৃণকেও বক্ষে বাঁধিয়া মাতা বসুমতী প্রাণপণে বলিতেছেন "যেতে নাহি দিব" যখন বলিতেছেন—বায়ু তরঙ্গাভিহত আয়ুক্ষীণ দীপমুখের নির্ব্বাপিত প্রায় শিখাকে আঁধারের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য কে টানিতেছে—তখন তিনি মরণ পীড়িত চিরজীবি প্রেমের কথাই বলিয়াছেন। তখন তিনি ভারতের ঋষি কণ্ঠোচ্চারিত বাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।

আজ কবি নাই। তাই তেরশত পঞ্চাশের কথাই বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে। প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক নরনারী যেদিন পল্লী জননীর স্নেহ-নীড় পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাধ্য হইয়াছিল, সেই চলমান কঙ্কালের দল যেদিন মুষ্টি ভিক্ষার প্রত্যাশায়—এক অঞ্জলি ফ্যান লাভের লালসায় অজানা পথে বাহির হইয়াছিল—সেদিন কি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবার কেহ ছিল না—"যেতে নাহি দিব"। সেদিন কি মাতা বসুমতীর চির স্নেহাতুরা পল্লী জননীর কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত হয় নাই "যেতে নাহি দিব"? সেদিনও কি মেঠো সুরে অনন্তের বাঁশী বিশ্বের প্রান্তর মাঝে কাঁদিয়া ফিরিয়া ছিল? আর সেই ক্রন্দন শুনিয়া উদাসী, বসুন্ধরা বসিয়া ছিলেন এলো চুলে, দূরব্যাপী শস্য ক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে, একখানি রৌদ্র পীত হিরণ্য আকল বক্ষে টানি দিয়া? তাঁহার স্থির নয়ন যুগল কি দূর নীলাম্বরে মগ্ন ছিল? তাঁহার মুখে কোন বাণী ছিল না?

সেদিনের সেই কঙ্কালমালিনীর অশ্রুহীন নয়নের বহ্নিজ্বালা কি কোন ঋষি দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে নাই? তাঁহার মূক মুখের ভাষা কি কোন কবিকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইবে না?

চারিখানি ফটোগ্রাফ্

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

(১)

পাতা-ঝরঝর শাল:
একলা মাঠের বিজন হাওয়ায় বাজায় করতাল।

(২)

নীল দিগন্তে নিশান ওড়ায় সবুজ কলার বন:
কালো মেঘের কোলে আলো: রাজ্য ওটা কোন্?

(৩)

মাঠের পারে হিঙুল-নদী নীলচে এঁকেবেঁকে:
ঠিক যেন কার মেঘল চুলের একটী সীঁথির রেখা।

(৪)

উঁচুনীচু, উঁচুনীচু—
হাট পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে কালোমাটীর পথ দিয়েছে ছুট।
—আর ধ'রেছে পিছু
শিশুবনের একটানা সার যেন মরুর মিছিল করা উট।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

দ্বিতীয় প্রকরণ—বৃদ্ধসংযোগ

পঞ্চম অধ্যায়

মূল :—অতএব তিনটি বিদ্যা দণ্ডমূলক। দণ্ড বিনয়মূলক—প্রাণিগণের যোগক্ষেমাবহ।

সঙ্কেত :—বৃদ্ধসংযোগ—আন্বীক্ষিকী ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ বিদ্যাতে প্রবীণ (গঃ শাঃ); তাঁহাদিগের সহিত সংযোগ—শিষ্যাচার্য্য-সম্বন্ধ; **association with the aged (S H); aged** না বলিয়া **advanced (in age and learning)** বলা উচিত।

অতএব (তস্মাৎ—মূল)—যেহেতু বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ে বিভক্ত লোক সুবিজ্ঞাত-প্রণীত দণ্ড-দ্বারা পালিত হইলে স্বধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান-প্রবণ হইয়া থাকে, অতএব—(গঃ শাঃ)। তিনটি বিদ্যা—আন্বীক্ষিকী'-ত্রয়ী-বার্ত্তা। দণ্ডমূল—দণ্ডাধীন-স্থিতিক। দণ্ড থাকিলে আন্বীক্ষিকী-ত্রয়ী-বার্ত্তা থাকে, নতুবা নহে; **are dependent for their well-being on the science of Government (S H); 'for their well-being'**—এ অংশ কোথা হইতে পাওয়া গেল? বিনয়—গণপতি শাস্ত্রীর মতে ইহার অর্থ 'শাস্ত্রবিজ্ঞান', শ্যাম শাস্ত্রীর মতে—**discipline.** বিনয় কি—তাহা কৌটিল্য স্বয়ং পরে বুঝাইবেন। যোগক্ষেমাবহ—যোগ-ক্ষেমের প্রাপক; **can procure safety and security of life (S H)**—ইহা মূলানুগ নহে; যোগ—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি; ক্ষেম—প্রাপ্তের পরিরক্ষণ, **acquisition of what was not previously attained and preservation of what is acquired.**

মূল :—বিনয়—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। ক্রিয়া দ্রব্যকে বিনীত করে—অদ্রব্যকে নহে। শুশ্রূষা শ্রবণ গ্রহণ-ধারণ-বিজ্ঞান ঊহাপোহ তত্ত্বাভিনিবেশ (গুণ)-বিশিষ্ট বুদ্ধিযুক্ত (জনকে) বিদ্যা বিনীত করে—অন্যকে নহে।

সঙ্কেত :—কৃতক (মূল)—কৃত্রিম—ক্রিয়া-দ্বারা উৎপাদিত। ক্রিয়া—অভিযোগরূপ ক্রিয়া (গঃ শাঃ); অভিযোগ—পুনঃপুনঃ অনুশীলন, অভ্যাস, **application,** কৃতক—**artificial (S H);** স্বাভাবিক—ক্রিয়া ব্যতীত বাসনাবশে সিদ্ধ (গঃ শাঃ); অকৃত্রিম; **natural (S H)।** ক্রিয়া হি দ্রব্যং বিনয়তে নাদ্রব্যম্—একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন গণপতি শাস্ত্রী—সংস্কারের উপযোগী ক্রিয়া (শাণযন্ত্রে ঘর্ষণ-পালিশ করা ইত্যাদি।) যেমন দ্রব্যকে (খনিজাত রত্নকে) বিনীত (অর্থাৎ সংস্কৃত—উজ্জ্বল) করে—পক্ষান্তরে অদ্রব্যকে (যে কোন প্রস্তরকে) সংস্কৃত করিতে পারে না, সেইরূপ বিদ্যাভ্যাসরূপ ক্রিয়া স্বতঃসিদ্ধ শুশ্রূষাদি-বুদ্ধিগুণ-সম্পন্ন জনকেই সংস্কৃত (বিনীত) করে—উক্ত গুণরহিত ব্যক্তিকে বিনীত করিতে পারে না (গঃ শাঃ)। **Instruction can render only a docile being conformable to the rules of discipline, and not an undocile being (S H). Training disciplines a fit and proper person (object)**—বলিলেই চুকিয়া যায়। হিতোপদেশে অনুরূপ বাক্য আছে—"নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিৎ ক্রিয়া ফলবতী ভবেৎ"। "ক্রিয়া হি বস্তূপহিতা প্রসীদতি" (রঘু ৩।২৯)। "পাত্রবিশেষন্যস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ" (মালতী-মাধব ১।৬)। "দ্রব্যং জিগীষুমধিগম্য জড়াত্মনোঽপি নেতুর্যশস্বিনি পদে নিয়তা প্রতিষ্ঠা। অদ্রব্যমেত্য তু বিশুদ্ধনয়োঽপি মন্ত্রী শীর্ণাশ্রয়ঃ পতিত কূলজবৃক্ষবৃত্ত্যা" ॥—। মুদ্রারাক্ষস ৭।১৪)। শুশ্রূষা—শ্রবণেচ্ছা; **obedience (S H);** যাঁহাদের বচন শ্রবণের যোগ্য, তাহাদিগের বচন শ্রবণে ইচ্ছা (গঃ শাঃ); **desire to. listen to** শ্রবণ—আসেবা (গঃ শাঃ); **hearing;** শ্রবণেচ্ছার পর শ্রবণ কর্ত্তব্য। গ্রহণ—শ্রুত বিষয়ের জ্ঞান (গঃ শাঃ); **grasping (S H);** অথবা—'গ্রহণ' অর্থে কণ্ঠস্থীকরণও হয়—**memorising,** ধারণ—গৃহীত বিষয়ের অবিস্মরণ (গঃ শাঃ); **retentive memory (S H).** বিজ্ঞান—ধারিত বিষয়সমূহে সাধ্য-সাধনাদি-স্বরূপ-বিবেক জ্ঞান (গঃ শাঃ); **discrimination (S H), Determinate knowledge** ঊহ—শব্দতঃ উক্ত না হইলেও হেতু-দ্বারা অনুমান (গঃ শাঃ); **conjecture, arguing**—বলা চলে। অপোহ—যুক্তি-বিহীনের পরিত্যাগ (গঃ শাঃ); শ্যাম শাস্ত্রী ঊহাপোহ—এক সঙ্গে—**inference** বলিয়াছেন। অপরের তর্ক নিরাসের নিমিত্ত কৃত বিপরীত তর্ক—অপোহ—ইহা ঊহের বিপরীত। ঊহাপোহ—**full discussion; consideration of the pros and cons (Apte).** তত্ত্বাভিনিবেশ—বস্তুর যাথাত্ম্য-জ্ঞান (গঃ শাঃ); **deliberation (S H); intentness, close application to truth**—বলা উচিত।

মূল :—আর বিদ্যাসমূহের যথাযথভাবে আচার্য্য-প্রামাণ্যানুসারে বিনয় ও নিয়ম (শিষ্যপক্ষে বিহিত)।

সঙ্কেত : যথাস্বম্ (মূল)—যথাযথভাবে; **strictly observed (S H); duly** বলিলেই চলিত। আচার্য্যপ্রামাণ্যাৎ—যে বিদ্যার যিনি আচার্য্য বা উপদেষ্টা, সেই বিদ্যার অধ্যয়নকালে সেই আচার্য্য তত্তৎ বিদ্যায় অধ্যেতা শিষ্যের প্রতি উপদেশদানে সমর্থ বলিয়া (গঃ শাঃ)

under the authority of specialist teachers (S H); যেহেতু আচার্য্য বিদ্যাদানে প্রমাণভূত (পূর্ণ সামর্থ্যযুক্ত) অতএব—। আচার্য্য বিদ্যার উপদেশে প্রমাণভূত (**authority**) বলিয়া তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন না করিয়া যথাযথ বিধি অনুসারে বিদ্যা-শিক্ষা ও তাহার আনুষঙ্গিক নিয়ম-পালন কর্ত্তব্য—ইহাই তাৎপর্য্য। বিনয়—শিক্ষা (গঃ শাঃ); **study**; অথবা বিদ্যা-গ্রহণকালীন নানারূপ আচার-পদ্ধতি (যথা, গুরুর আগমনে গাত্রোত্থান, অভিবাদন-প্রক্রিয়া ইত্যাদি)। নিয়ম—ব্রহ্মচর্য্যাদি, গুরু-পরিচর্য্যা-ব্রত ইত্যাদি (গঃ শাঃ); **precepts (S H); rules of conduct (e. g. celibacy) during the period of study**—বলা উচিত।

মূল :—কৃতচূড় (বালক) লিপি ও সংখ্যা (শাস্ত্রের) (যথা-শাস্ত্র নিয়মপূর্ব্বক) উপযোগ করিবে।

সঙ্কেত :—বৃত্তচৌলকর্ম্মা—চৌল = চৌড় (ড় = ল); যাহার চূড়াকরণ সংস্কার হইয়াছে এমন বালক। গণপতি শাস্ত্রী বলিয়াছেন—পঞ্চবর্ষ অথবা ত্রিবর্ষ। মনু বলিয়াছেন শ্রুতিবচনবশে চূড়া প্রথম অথবা তৃতীয় বর্ষ বয়সে কর্ত্তব্য। চূড়া (**tonsure**)—(S H). লিপি—অক্ষর-পরিচয়; **alphabet** (S H) সংখ্যান—গণিত; **arithmetic** (S H)। উপযুঞ্জীত—উপযোগ করিবে অর্থাৎ যথানিয়মে শিখিবে (গঃ শাঃ); **shall learn (S H).**

মূল :—কৃতপোনয়ন (বালক) শিষ্টগণের নিকট হইতে ত্রয়ী ও আন্বীক্ষিকী (শিখিবে); অধ্যক্ষগণের নিকট হইতে বার্ত্তা (শিখিবে); বক্তা ও প্রয়োক্তৃগণের নিকট হইতে দণ্ডনীতি (শিক্ষা করিবে)।

সঙ্কেত :—শিষ্ট—সম্যগরূপে তত্তৎ শাস্ত্র যাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন; ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে শিষ্টের লক্ষণ দিয়াছেন—যাঁহারা সদাচারী, বেদাধ্যায়ী ও সংস্কৃতভাষাভাষী—তাঁহারাই শিষ্ট। **Teachers of acknowledged authority** (S H); **men of highest erudition and culture** বলা যায়। অধ্যক্ষ—দ্বিতীয় অধিকরণে নানা শ্রেণীর অধ্যক্ষগণের কথা বলা যাইবে। বক্তৃপ্রয়োক্তৃভ্যঃ (মূল)—যাঁহারা বচনে ও প্রয়োগে কুশল তাঁহাদিগের নিকট হইতে (গঃ শাঃ); **under theoretical and practical politicians** (S H)।

মূল :—ব্রহ্মচর্য্য—ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত। ইহার পর গোদান ও দারকর্ম্ম।

সঙ্কেত :—আ ষোড়শাদ্ বর্ষাৎ—ষোড়শ বর্ষ ব্যাপিয়া (গঃ শাঃ)—ইঁহার মতে অভিবিধি অর্থে 'আ'র প্রয়োগ—মর্য্যাদা অর্থে নহে। তেন বিনা মর্য্যাদা (**exclusion**); তৎসহিতোঽভিবিধিঃ (**inclusion**); কিন্তু আমাদিগের মনে হয়—এ স্থলে 'আ'র অর্থ মর্য্যাদা। ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—পঞ্চদশ বর্ষ ব্যাপিয়া। প্রচলিত চাণক্য-শ্লোকেও ইহার সমর্থন আছে—'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ'॥ শ্যামশাস্ত্রীও এই মতানুসারী—**till he becomes sixteen years old.** গোদান—ব্রহ্মচর্য্যাবসানে কেশান্ত-সংস্কার; **tonsure (SH)**। প্রাচীন যুগে দুইবার কেশ-সংস্কার করিতে হইত। চূড়াকরণের সময় মধ্যে মধ্যে কেশচ্ছেদন করিয়া চূড়া বাঁধা হইত। চূড়ার পর বিদ্যারম্ভ। অনন্তর উপনয়ন, বেদাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যান্তে গোদান—পূর্ণ মস্তক-মুণ্ডন। তারপর বিবাহ (দারকর্ম্ম)।

মূল :—ইহার (পক্ষে) বিনয় বৃদ্ধ্যর্থ বিদ্যা-বৃদ্ধ-সংযোগ নিত্য (কর্ত্তব্য); যেহেতু বিনয় তন্মূলক।

সঙ্কেত :—এই প্রকরণটির নাম বৃদ্ধসংযোগ; এই 'বৃদ্ধ' বলিতে যে বিদ্যা-বৃদ্ধই বুঝাইতেছে—এস্থলে কৌটিল্যের উক্তিই তাহার প্রমাণ। বিদ্যা-বৃদ্ধ-সংযোগ—বিদ্যাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরিচয় বজায় রাখা; **keep company with aged professors of sciences** (SH); aged না বলিয়া—**specialists in sciences** বলিলেই ভাল হইত। বিনয়-বৃদ্ধির নিমিত্ত—**for maintaining efficient discipline (SH)**; **for advancement of discipline**—বলা উচিত। বিনয়—শাস্ত্র-সংস্কার (গঃ শাঃ); শিক্ষা, সংস্কার, ইন্দ্রিয়জয়—এক কথায় **culture, discipline**—এ সকলই বিনয়ের অন্তর্গত। নিত্য—দার গ্রহণানন্তরও কর্ত্তব্য (গঃ শাঃ)— **invariably (keep company) (SH)**; **compulsory, obligatory,** তন্মূলক—বিদ্যাবৃদ্ধ-সংযোগ-মূলক (গঃ শাঃ) **in whom has its firm root (SH)**; শ্যামশাস্ত্রীর অভিপ্রায়—'তৎ' পদের অর্থ—বিদ্যাবৃদ্ধ—বিদ্যাবৃদ্ধ-সংযোগ নহে। কিন্তু তদপেক্ষায় অন্য অর্থটি ভাল।

মূল :—পূর্ব্ব অহর্ভাগে হস্তি অশ্ব রথ প্রহরণাদি বিদ্যাসমূহে বিনয় প্রাপ্ত হইবে। পরবর্ত্তী (অহর্ভাগ) ইতিহাস-শ্রবণে (যাপন করিবে)। পুরাণ, ইতিবৃত্ত আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র—(ইহাই) ইতিহাস।

সঙ্কেত :—পূর্ব্ব অহর্ভাগ—পূর্ব্বাহ্ণ। বিনয়প্রাপ্ত হইবে—মূলে আছে—বিনয়ং গচ্ছেৎ—শিক্ষালাভ করিবে, **receive lessons in (SH)**। প্রহরণ-বিদ্যা—অস্ত্রবিদ্যা। পশ্চিম অহর্ভাগ—অপরাহ্ণ; তৃতীয় অহর্ভাগ (গঃ শাঃ); **afternoon (SH)**। পুরাণ—সৃষ্টি-প্রলয়-বংশ মন্বন্তর-বংশানুচরিত—এই পঞ্চ-বিবরণ-সমন্বিত বেদব্যাস-রচিত গ্রন্থ। অষ্টাদশ মহাপুরাণ—বিষ্ণু ইত্যাদি। অষ্টাদশ উপপুরাণ—কল্কি ইত্যাদি। ইতিবৃত্ত—রামায়ণমহাভারতাদি (গঃ শাঃ); **history**; অতীত ঘটনার বিবরণ; **past incidents.** আখ্যায়িকা—সত্য জীবনী—দিব্য-মানুষাদি-চরিত (গঃ শাঃ)—যথা বাণভট্টের হর্ষচরিত; শ্যামশাস্ত্রীর **tales** মূলানুগ নহে। উদাহরণ—ন্যায়োপন্যাসশাস্ত্র—মীমাংসাদি (গঃ শাঃ); কিন্তু আমাদিগের মনে হয়—এই শব্দটির ভাষান্তর শ্যামশাস্ত্রী সুন্দরভাবে করিয়াছেন—**illustrative stories**; দৃষ্টান্তমূলক আখ্যান। ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি—মন্বাদি-প্রণীত। অর্থশাস্ত্র—ঔশনস-বার্হস্পত্য-কৌটিলীয়াদি।

মূল :—অবশিষ্ট অহোরাত্র ভাগে অপূর্ব্ব-গ্রহণ ও গৃহীত পরিচয় করিবে। আর অগৃহীতের পুনঃ পুনঃ শ্রবণও (করিবে)।

সঙ্কেত :—শেষমহোরাত্রভাগম্—অহোরাত্রভাগের অবশিষ্ট অংশ; **during the rest of the day and night (SH)**; গণপতি শাস্ত্রী পাঠ ধরিয়াছেন—শেষমহর্ভাগম্। 'শেষ' অর্থে বুঝিয়াছেন—মধ্যম ভাগ। পাঠান্তর—অহোরাত্রভাগ—ইহার অর্থ করিয়াছেন—অবশিষ্ট (মধ্যম) অহর্ভাগ ও নিদ্রাদি কার্য্যান্তরে প্রযুক্ত রাত্রিভাগের অবশিষ্ট অংশ। অপূর্ব্ব-গ্রহণ—যাহা পূর্ব্বে পঠিত, অভ্যস্ত ও আয়ত্ত হয় নাই—এরূপ নূতন বিদ্যা; **receive new lessons (SH)**। গৃহীত-পরিচয়—গৃহীত (পঠিত ও আয়ত্তীকৃত) অংশের ধারণার্থ অনুশীলন—পুরাতন-পাঠাভ্যাস; **revise old lessons (SH)**। অগৃহীতের—গণপতি শাস্ত্রীর অর্থ—ঈষৎ গৃহীত অংশের সম্যগ্‌রূপে মনঃপ্রবেশার্থ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ—**hear over and again what has not been clearly understood (SH)**। অপূর্ব্ব ও অগৃহীতের মধ্যে পার্থক্য এই যে—অপূর্ব্ব তাহাই যাহা মোটেই পড়া হয় নাই—সম্পূর্ণ নূতন পড়া, আর অগৃহীত—যাহা পড়া হইলেও কণ্ঠস্থ হয় নাই বা (ভাল) বুঝা যায় নাই। আভীক্ষ্যশ্রবণ—আভীক্ষ্য—পুনঃ পুনঃ।

মূল :—যেহেতু শ্রুত হইতে প্রজ্ঞা জন্মে; প্রজ্ঞা হইতে যোগ; যোগ হইতে আত্মবত্তা—ইহাই বিদ্যার সামর্থ্য।

সঙ্কেত :—শ্রুত—শ্রবণ (গঃ শাঃ) **learning (SH)**, শাস্ত্রশ্রবণ। প্রজ্ঞা—ত্রৈকালিকী বুদ্ধি (গঃ শাঃ); **knowledge (SH)**; **wisdom** বলা ভাল। যোগ—শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা (গঃ শাঃ); **steady application (SH)**; একাগ্রতা—অর্থই ভাল। আত্মবত্তা—মনস্বিতা (গঃ শাঃ); **self-possessiou**; আত্মস্থতা। বিদ্যাসামর্থ্য—বিদ্যাশক্তি-জনিত ফল। **Jolly** পাঠান্তর হইয়াছেন—যোগাদাত্মবিদ্যাসামর্থ্যম্—**From application comes the capacity for understanding the science of the Supreme Spirit. This reading is perhaps peraferble**; ইহার অর্থ—যোগ (সমাধি) হইতে আত্ম-বিদ্যার সামর্থ্য জন্মে।

মূল :—বিদ্যা-বিনীত রাজা—প্রজাগণের বিনয়ে রত (ও) সর্ব্বভূতহিতে রত (থাকিয়া) অনন্যা পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন।

সঙ্কেত :—বিদ্যা-বিনীত—বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত; **(well) educated and disciplined (SH)**; বিদ্যা-দ্বারা বিনীত অর্থাৎ—সংস্কারযুক্ত—এ অর্থও করা চলে। বিনয়ে—শিক্ষায়; **good government of (SH)**। অনন্যা—একনাথা (গঃ শাঃ); **unopposed (SH)**; একচ্ছত্রা—অর্থই ভাল।

। ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে বৃদ্ধসংযোগ-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

পানিহাটি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল

দু-দণ্ড বিশ্রাম করো হে শ্রান্ত পথিক, এই বটবৃক্ষ মূলে,
গৌরাঙ্গ পরশ পূত এই সেই মহাতীর্থ সুরধুনী কূলে।
সার্দ্ধ চারিশতবর্ষ একে একে নির্ব্বাপিত মহাকাল বুকে,
স্মৃতি তার বক্ষে ধরি' বৃদ্ধ বনস্পতি এই তোমার সম্মুখে।
পুরী হ'তে প্রত্যাগত মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ হেথা অবতরি'
এই বৃক্ষতলে বসি' পথশ্রান্তি বিনোদিলা, ঘাটে রাখি' তরী।

এই সেই গঙ্গাঘাট, জীর্ণ ভগ্ন দীর্ণ বুকে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
কালের অনন্ত স্রোত জানে তার ব্যথাহত ব্যর্থ অভিলাস:
"আর কি আসিবে ফিরে প্রাণের ঠাকুর মোর কোনো শুভক্ষণে,
শত জনমের আমি সাধনার অশ্রু দিয়া ধোয়াব চরণে?"
শ্রীচৈতন্য রজঃ-পূত পানিহাটি ধন্য হ'ল প্রেমের বন্যায়,
সামান্য মৃত্তিকা নহে, ধূলি এর তীর্থরজঃ, স্পর্শ-মহিমায়!

হেথা হ'তে চলো সেই রাঘব পণ্ডিতগৃহে—মাধবীলতায়,
ঘিরিয়াছে আজিনাটি শতবাহু বিস্তারিয়া শ্যামল শোভায়।
বর্ষে বর্ষে বহু ভক্ত সঙ্গোপনে অশ্রু অর্ঘ্য করিছে বর্ষণ,
প্রেমানন্দে বৈষ্ণবের বেড়েছে প্রাণের ক্ষুধা, অনন্ত-ক্রন্দন।

দণ্ড-মহোৎসবে আজো লক্ষ লক্ষ নরনারী মিলিছে শ্রদ্ধায়,
চক্ষুহীন মহা অন্ধ, তর্কে বস্তু নাহি মিলে বিশ্বাসে মিলায়।

শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালার একমাত্র প্রাণমন্ত্র পরম বৈভব,
গঙ্গাতীরে পানিহাটি অতীতের সাক্ষ্যরূপে বাড়ায় গৌরব।
যক্ষ সম বক্ষে করি বিরাজিছে গ্রন্থাগার গৌরাঙ্গ মন্দির,
বহু স্মৃতি বিজড়িত বহু যুগ পুঞ্জীভূত পূত অশ্রুনীর।

হের সন্ন্যাসীর কন্থা, এর চেয়ে পবিত্র কি মর্ত্ত্যে কিছু আছে?
সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শ্রীঅঙ্গের আবরণ হেথায় বিরাজে।
প্রভুর পাদুকা অংশ ভক্তের ভূতলে স্বর্গ, হেথা বিদ্যমান্।
সম্ভ্রমে নোয়াও শির, নয়ন মেলিয়া হের দিব্য অভিজ্ঞান।

পানিহাটি পরিক্রমা শ্রেষ্ঠ তীর্থ ভ্রমণের সম বলে মানি,
কৃষ্ণ-প্রীতি উপজিলে ভক্তে নিজে ভগবান্ বুকে লন টানি।
ধন্য হ'ল তনু মন চৈতন্যপরশপূত ভ্রমি পানিহাটি
সাধ যায় বঙ্গদেশে সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি আমি মাখি ধূলি মাটি।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্

১২

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত মুসলমান নেতা, স্যর সৈয়দ আহম্মদ পেট্রিটিক এসোসিয়েশন নামক এক সভা স্থাপন পূর্ব্বক মুসলমানগণকে কংগ্রেস বর্জ্জন করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানগণ যে কংগ্রেসকে বর্জ্জন করেন নাই তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে উমেশচন্দ্র তাঁহার সতীর্থ বদরুদ্দীন তায়েবজীকে এই অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা মীর হুমায়ুন শা ও য়ুরেশিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা মিষ্টার হোয়াইট এই অধিবেশনে যোগদান করেন। এই সময়ে স্যর অকল্যাণ্ড কলভিনের ন্যায় য়ুরোপীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বেনামীতে পুস্তকাদি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং লর্ড ডাফরিণ প্রকাশ্য সভায় কংগ্রেসকে এক অজ্ঞাত ভূমিতে লম্ফপ্রদান করিতে উদ্যত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। হিউম ও ব্যারিষ্টার নর্টন কংগ্রেসের পক্ষ লইয়া প্রতিবাদ করিয়া পুস্তকাদি প্রচার করেন।

বদরুদ্দীন তায়েবজী

ইংলণ্ডে প্রচার কার্য্য

এই সময়ে উমেশচন্দ্র ডায়েবিটিস রোগে আক্রান্ত হন এবং বায়ু-পরিবর্ত্তনের ও বিশ্রামের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে বিশ্রামসুখ উপভোগ ছিল না। তিনি মিষ্টার হিউম, মিঃ ডিগবী, মিঃ নর্টন প্রভৃতির সহযোগে ইংলণ্ডের নানাস্থানে ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডীয়দিগের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ওয়েনব্রীটে ডাক্তার জব্রের সহিত উমেশচন্দ্র ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে এক বহুতথ্যপূর্ণ চিন্তাগর্ভ মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, ভারত সম্বন্ধে সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ যখন বক্তৃতা করেন তখন সভাগৃহে প্রায় কেহই থাকেন না, ভারতবাসী রাজভক্ত, তাহাদিগকে কঠোর হস্তে শাসন করিবার প্রয়োজন নাই। বড়লাটের সভায় সরকারী ব্যতীত কয়েকজন বেসরকারী মনোনীত সদস্য আছেন তাঁহাদের কেহ কেহ ইংরাজীভাষাই জানেন না অথচ ইংরাজীতে সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। কংগ্রেস প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে বলা হয়, 'তোমরা উপযুক্ত হও নাই', কিন্তু যদি জলে না যাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে কি করিয়া সন্তরণ শিক্ষা দেওয়া যায়? ব্রিটিশ জনসাধারণকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।
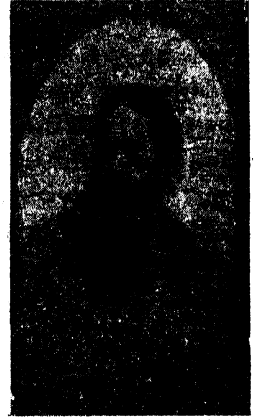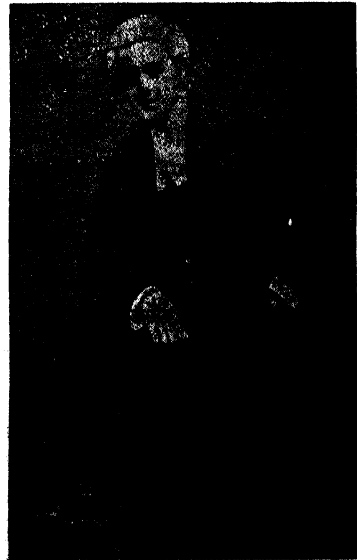
উমেশচন্দ্র

আর্ড্লি নর্টন

উক্ত বৎসর ২১শে অগষ্ট নর্থাম্পটন সহরে টাউনহলে একটি বিরাট সভা আহুত হয়, উহাতে পার্লিয়ামেন্টের সদস্য চার্লস ব্রাড্‌ল, দাদাভাই নৌরোজী ও উমেশচন্দ্র বক্তৃতা করেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতায় বলেন যে, আমাদের দুঃখের প্রধান কারণ এই যে আমাদের দায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট নাই। সপারিষদ সেক্রেটারী অব ষ্টেট ইংলণ্ড হইতে একপ্রকার ভারতশাসন করেন, কিন্তু অনেক সময়েই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পার্লিয়ামেন্টের বেসরকারী সদস্যরা অবগত আছেন তাহাও তিনি জানেন না। সেদিন কমন্স সভায় আমি ভারত সম্বন্ধে বিতর্ক শুনিতে গিয়াছিলাম। যে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহারই উত্তরে আণ্ডার সেক্রেটারী বলেন"সরকারী ভাবে তাঁহারা কিছু জ্ঞাত নহেন।" মনে হয়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন সংবাদই সেক্রেটারী অব ষ্টেট রাখেন না। তাহার পর যে টুকু তথ্য তিনি ভারতবর্ষ হইতে আনাইয়া দেন তাহারও সত্যতা পরীক্ষা করিবার তাঁহার কোন উপায় নাই। সরকারী তথ্যে সকল সময়ে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। বিচার বিভাগেও অনেক গলদ আছে। একজন আসামী মারাত্মকভাবে আঘাত করিবার জন্য অভিযুক্ত হয়। এসেসররা তাহাকে নির্দ্দোষ বলেন, বিচারক তাহাকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। সে হাইকোর্টে আপীল করায় বিচারপতি তাহাকে হত্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার ফাঁসীর আদেশ দেন। হাইকোর্টের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট ক্ষমা প্রদর্শন করা অনুচিত বিবেচনা করিলেন। তাহার পর যে এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রচলিত হইয়াছে উহাতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বহু পূর্ব্বে প্রাপ্ত দণ্ডাজ্ঞা তাহার বিরুদ্ধে প্রদর্শিত হইতে পারে, অর্থাৎ, মনে করুন, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কেহ অপরের পকেট মারিয়াছে, আদালতে তাহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সে পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিল!!

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর ক্রয়ডনে ললনা-সমিতিতে ডাক্তার অব্রের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়, উহাতে ক্রয়ডনের নগরবাসী এবং ভারতের প্রতিনিধিরূপে তিনি একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। এই সময়ে ব্র্যাডলর প্রস্তাবানুসারে ভারত-শাসন সম্বন্ধীয় যে আইন লর্ড ক্রস বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন তৎসম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের সভায় যে বেসরকারী মনোনীত সদস্য লইবার ব্যবস্থা হয় তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। উচ্চ পদ ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া এমন সদস্য মনোনীত করা হইয়াছে যাঁহাদের কেহ কেহ ইংরাজী ভাষা জানেন না এবং সভার কার্য্যে কোন অংশ লইতে অক্ষম। একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কিরূপে কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। উত্তরে তিনি বলেন বড়লাট দয়া করিয়া আমাকে পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন সুতরাং সকল সময়ে গবর্ণমেন্টের পক্ষে ভোট দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। বড়লাটের ইঙ্গিত দেখিয়া তিনি প্রস্তাব সম্বন্ধে 'হাঁ' বা 'না' বলিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করেন! এরূপ বেসরকারী সদস্য বড়লাটের সভায় থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি?

চতুর্থ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য এণ্ড্ ইউল কোংর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান অংশীদার মিষ্টার জর্জ্জ ইউলের নাম প্রস্তাবিত হয় এবং ইংলণ্ডে উমেশচন্দ্রকে তাঁহাকে সম্মত করাইবার ভার প্রদান করা

জর্জ্জ ইউল
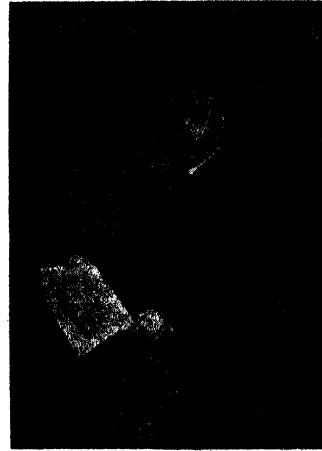
হয়। উমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, তিনি ইউলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি সহানুভূতি ও শিষ্টাচারের সহিত তাঁহার কথা শ্রবণ করেন এবং কংগ্রেস
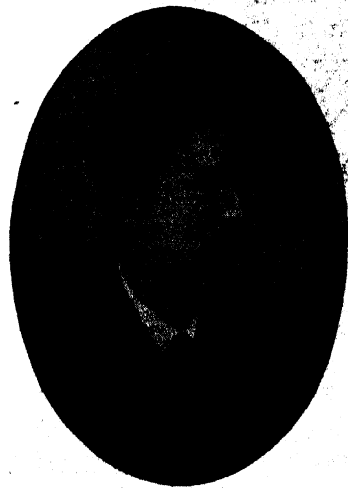
স্যর উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার

সম্বন্ধীয় পুস্তিকাদি পড়িতে চাহেন। তাঁহার নিকট গত তিন বৎসরের কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণী ছিল, সেগুলি জর্জ্জ ইউলকে পাঠাইয়া দিলে, জর্জ্জ ইউল উমেশচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর উমেশচন্দ্র এলাহাবাদে চতুর্থ কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য মিষ্টার নর্টনের সহিত ভারতবর্ষে ডিসেম্বরের প্রারম্ভেই প্রত্যাগমন

করেন। ইংলণ্ডে তিনি ভারতবর্ষের জন্য যে গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা সকলেই কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি কেবল সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতেন না, উচ্চপদস্থ ইংরাজগণের সহিত নির্জ্জনেও ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করত তাঁহাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতেন। স্কীন প্রণীত স্যর উইলিয়ম উইলসন হণ্টারের জীবনচরিতে (৩৮৮ পৃষ্ঠা) মহামাননীয় স্যর রিচার্ড গার্থকে হণ্টার ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৮৮ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় উমেশচন্দ্র, ডিগবী প্রভৃতি কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের সহিত হণ্টার ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে ইংলণ্ড বা আমেরিকার মত ভারতবর্ষ প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র লাভের যোগ্য হয় নাই, তবে য়ুনিভারসিটী, বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে পারে।

দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের জন্য উমেশচন্দ্র সাধারণের নিকট হইতে প্রশংসা বা সংবর্দ্ধনা লাভ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বরের 'রেইস এণ্ড রায়ত' পত্র পাঠে প্রতীত হয় যে ইংলণ্ডে বক্তৃতাদি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে তিনি শিশিরকুমার ঘোষকে পত্র লিখিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়া ছিলেন যে যেন তাঁহার সংবর্দ্ধনা প্রভৃতি হাস্যাস্পদ অনুষ্ঠান করা না হয়। সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছিলেন এ বিষয়ে তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও অনেক স্থলে ছোট ছোট দল তাঁহাকে অভিনন্দন লিপি দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিল, এবং ডাকবিভাগের মধ্যবর্ত্তিতায় অসংখ্য পত্র ও কবিতা তাঁহার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্ম্মী আর্ডলি নর্টনকে উদ্দেশ করিয়া একজন কবিযশঃ প্রার্থী লিখিয়াছিলেন :

Welcome to Messrs. Eardley Norton and Womesh Chunder Bonnerjee, Bar-at-law

"All hail to you, my country's faithful friends,
From Britain's isle, on which our weal depends,
And where you worked so well for Bharat land,
That we can, sure, achieve a success grand.

You 've shown you are my country's trusty stays,
This wide extensive land rings with the praise
Of you, who served her in the time of need,
And proved yourselves her champions true indeed."

আর একজন লিখিয়াছিলেন :—

"Hail, meek and able Hindu mild !
Our peerless Norton, come !
Come back, Great England's worthy child !
Our Bonnerjee, come home !

A nation's gratitude and love
Await you in this place,
Naught can our thankfulness remove,
We are a grateful race.

Ye, India's sons, rejoice ! Arise,
To welcome Bonnerjee
And Norton, from that land where lies,
The home of all that's free !

With shouts of joy, come, let us meet
Our friends, returning here !
With cheerful looks, come, let us greet
The men we hold so dear !

Just England has begun to know
Our people's woes aright ;
These two did labour much to show
Things in their proper light.

May we receive more rights so just,
As righteous Ripon gave !
Our hopes in England's justice rest,
And in our Congress brave.

May He, the Wise Almighty Lord,
Show'r bliss upon these shores !
May He His help to us accord.
And aid us in our course !

Our end and aim is freedom true,
Our watch-word peace to all !
We wish each man should have his due !
We wish for no one's fall !"

এই সকল কবিতায় কবিত্ব না থাকিলেও উহাতে জনসাধারণের যে কৃতজ্ঞতা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা যে আন্তরিক ও অকৃত্রিম, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন হয়। জর্জ্জ ইউল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং এলাহাবাদ হাই-কোর্টের খ্যাতনামা উকীল পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, যাঁহাকে উমেশচন্দ্রই কংগ্রেসে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন, অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক হন। বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী চারুচন্দ্র মিত্র মহোদয় তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন কংগ্রেস যাহাতে এলাহাবাদে না হইতে পারে তজ্জন্য

দুনিয়ার-অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

উডহেড কমিশনের রিপোর্ট

কাগজে-কলমে বাংলার সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এই ১৯৪৫ সালের জুন মাসেও ১৯৪৩ সালের ক্ষুধাতুর বাংলার মর্ম্মভেদী হাহাকারের মূর্চ্ছনা একেবারে শেষ হয় নাই। দুর্ভিক্ষ শুধু লক্ষ লক্ষ অসহায় হতভাগ্য নরনারীর জীবন দক্ষিণা লইয়াই খুসী হয় নাই, তাহার পিছনে আসিয়াছে দেশব্যাপী ব্যাধি, আর প্রচণ্ড সমাজ বিপ্লব। স্বাস্থ্যের হীনতা বা আর্থিক নিঃস্বতাই বাংলাকে দুর্ভিক্ষের একমাত্র দান নয়, এই সুতীব্র অন্নাভাব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে বাংলার হাজার বছরের সমাজ-শৃঙ্খলা ; ক্ষুধাতুর নরনারী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে পথে, একমুঠো ভাতের বিনিময়ে নারী বিক্রয় করিয়াছে তাহার সম্ভ্রম,তাহার সর্ব্বস্ব ; পুরুষ বরণ করিয়া লইয়াছে চরম আত্ম-অসম্মান, ভুলিয়া গিয়াছে তাহার মনুষ্যত্ব। দীনতার লাঞ্ছনায় শুভ্রসুন্দর জীবনের পটভূমিকায় গড়িয়া উঠিয়াছে হীনতার অভ্রভেদী কলঙ্ক সৌধ।

অসংখ্য লোকক্ষয়কারী এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের পশ্চাতে যে বিশেষ কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ছিল না একথা প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রকৃত ঘটনার সহিত পরিচিত সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাসমূহ ছাড়াও শ্বেতস্বার্থপোষক ষ্টেটসম্যানের মত কাগজ পর্য্যন্ত এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ বিশ্লেষণ সম্পর্কে খোলাখুলি ভাবে বলিয়াছেন, "As we have often observed, India has been lucky that her man-made famine has so far remained uncomplicated by any failure of the monsoon"* অবশ্য ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে যে ঘূর্ণিবাত্যা সংঘটিত হয়, তাহার ফলে ধান্যাদি শস্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিপুল বিপর্য্যয়ের তুলনায় তাহা এত নগণ্য যে এই ঘূর্ণিবাত্যাকে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণগুলির অন্যতম ধরা যায় না। বলিতে গেলে যুদ্ধকালীন পণ্যাদি সরবরাহের অব্যবস্থা ও ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের লজ্জাস্কর-অকর্ম্মণ্যতাই এই সর্ব্বনাশের মূল কারণ। এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ বার্ত্তা-সমূহ নানাভাবে দেশে দেশে প্রচারিত হইবার ফলে এদেশের শাসক-সম্প্রদায়ের অবিমৃষ্যকারিতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দও শেষ অবধি কতকটা সচেতন হন এবং বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের চাপে বাংলার এই দুর্ভিক্ষের কারণ ও আনুসঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অনুসন্ধানাদি চালাইবার জন্য ভারতসরকার একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিতে বাধ্য হন। এই কমিশনে সভাপতিত্ব করেন স্যার জন উডহেড এবং তাঁহার নামানুসারেই কমিশনের নাম হইয়াছে উডহেড কমিশন। উডহেড কমিশনের সদস্যরূপে স্যার জনকে সাহায্য করেন মিষ্টার রামমূর্ত্তি, মিষ্টার আফজল হোসেন, ডাক্তার মণিলাল নানাভাতি এবং ডাক্তার এ্যাক্রয়েড। কমিশন দুর্ভিক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট ও পরিচিত বহু ব্যক্তির সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করেন এবং এই সম্পর্কে অনেক পুঁথিপত্র পাঠ করেন।

সম্প্রতি এই দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে দুর্ভিক্ষের কারণাদি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহাতে কোথাও কোথাও সদস্যগণের চিন্তাশীলতা ও সত্যানুবর্ত্তিতার পরিচয় থাকিলেও মোটের উপর দুর্ভিক্ষের পরিণাম হিসাবে যে সকল ক্ষতির কথা বলা হইয়াছে তাহাতে ইচ্ছা করিয়া সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। উডহেড কমিশন বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষে নাকি মোটের উপর ১৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং উহার দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দশ লক্ষ মরিয়াছে ১৯৪৩ সালের প্রকৃত দুর্ভিক্ষে এবং ৫ লক্ষ লোক মরিয়াছে ১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষোত্তর মহামারী ও স্বাস্থ্যহীনতার চাপে। সকলকেই জানেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ দুর্ভিক্ষের কারণাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইয়াছেন এবং তাঁহাদের রিপোর্টে দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা দেখানো হইয়াছে প্রায় ৩৫ লক্ষ। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মতামতের ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব আছে বলিয়া প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা কথা বলেন। দুর্ভিক্ষের মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত গ্রহণ-যোগ্য সন্দেহ নাই। কলিকাতার মত সমৃদ্ধ সহরে, যেখানে অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আর সরকারী শৃঙ্খলা রক্ষার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, যেখানে চাকুরীজীবী আর ব্যবসায়ীদের ভিড়, ভারতের যে বৃহত্তম সহরে প্রাসাদপুঞ্জের বৈদ্যুতিক আলোর ধারার সঙ্গে দরিদ্রের প্রাণ বাঁচিবার মত উদ্বৃত্ত খাদ্য স্বভাবতঃই পথে নামিয়া আসিয়াছে, সেখানে নিরন্ন নর-নারীর যে মৃত্যুমিছিল চলিয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্থ অফিসারের বিবৃতিতেই দেখা যায়, সাধারণ সময়ের সাপ্তাহিক ছয় শতের কম মৃত্যুর স্থানে দুর্ভিক্ষের সময় কয়েকটী সপ্তাহে নিম্নোক্ত সংখ্যক নরনারী : কলিকাতার রাজপথে অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে :—

সপ্তাহ	শেষের তারিখ		মৃত্যু সংখ্যা
১১ই	সেপ্টেম্বর,	১৯৪৩	১২৯২
১৮ই	সেপ্টেম্বর,	১৯৪৩	১৩১৯
২৫শে	সেপ্টেম্বর,	১৯৪৩	১৪৯২
২ রা	অক্টোবর,	১৯৪৩	১৫৩৬
৯ই	অক্টোবর,	১৯৪৩	১৯৬৭
১৬ই	অক্টোবর,	১৯৪৩	২১৫৪
২৩শে	অক্টোবর,	১৯৪৩	২১৫৫

* ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

ভারতসচিব মিষ্টার আমেরি তাঁহার ইচ্ছামত পার্লামেণ্টে বাংলার দুর্ভিক্ষে মৃতের যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, উডহেড কমিশনের রিপোর্টের এই সংখ্যাও অনেকটা তাহার সহিত এবং বাংলাসরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। মিষ্টার আমেরি বলিয়াছিলেন যে, বাংলার দুর্ভিক্ষে মারা গিয়াছে মোট ৬ লক্ষ ১৪ হাজার লোক এবং জনস্বাস্থ্যবিভাগ বলিয়াছিলেন ১৯৪৩ সালে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ও ১৯৪৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ৪ লক্ষ ২২ হাজার, অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৪৪ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ১১ লক্ষ এবং ১৯৪৪ সালের বাকী ছয়মাসের সংখ্যা এই অনুপাতে হিসাব করিলে তাঁহাদের সংখ্যাও প্রায় ১৫ লক্ষেই গিয়া পৌঁছায়। প্রকৃত নিরন্ন-মৃত্যু সংখ্যা যে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী তাহা বলাই বাহুল্য। ১৯৪৩ সালের ১৪ই অক্টোবর ভারতসচিব পার্লামেণ্টে সমগ্র বাংলাপ্রদেশের এই ভাবে মৃত্যুর যে সাপ্তাহিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন, প্রকৃতপক্ষে ১৬ই অক্টোবরে সমাপ্ত সপ্তাহে একমাত্র কলিকাতার নিরন্ন মৃত্যু সংখ্যা তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। এই দুর্ভিক্ষের পরই বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া ও কলেরার কবলে নিপতিত হইয়াছিল। একমাত্র ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয় বাংলার প্রায় ২ কোটি নরনারী এবং স্বাস্থ্যহীনতার জন্য এই সকল রোগে যে লক্ষ লক্ষ নিরুপায় হতভাগ্য মৃত্যুবরণে বাধ্য হয় তাহাদের জীবনদানও দুর্ভিক্ষের অনিবার্য্য মাশুলরূপে হিসাব করা উচিত।

আগেই বলা হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের পরিণাম সম্বন্ধে সঠিক সাংবাদাদি সংগ্রহ করিতে না পারিলেও উডহেড কমিশন দুর্ভিক্ষের অনেকগুলি প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় চাহিদা বৃদ্ধির সহিত পণ্যজোগানের অসামঞ্জস্য ঘটা স্বাভাবিক এবং বাংলাদেশেও ১৯৪৩ সালের প্রথম হইতেই খাদ্য কম পড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছেন যে, বাংলার যে খাদ্য কম পড়ে তাহা এই প্রদেশবাসীর তিন সপ্তাহের উপযোগী। অসাধু ব্যবসাদারদের কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকার যদি স্বল্প পরিমাণ খাদ্য সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে খাদ্যাভাব হয়তো ঘটিত, কিন্তু ৩০।৩৫ লক্ষ লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ ঘটিবার কারণ থাকিত না। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আসা বন্ধ, মেদিনীপুরের ঝড়ে ১৯৪২ সালের শস্যউৎপাদন ব্যাহত, ব্রহ্মপ্রত্যাগত ও সামরিক বিভাগের চাহিদাবৃদ্ধি—সবই সত্য কথা, কিন্তু এইজন্য আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইলে দেশবাসীকে মরিতে যে হইত না ইহা সবার চেয়ে বড় সত্য। উডহেড কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে ১৯৪৩ সালের প্রথম হইতেই বাংলার বিভিন্ন জেলার সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাগণ জেলার খাদ্যাভাব সম্বন্ধে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে সচেতন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বাংলাসরকার বা ভারতসরকার তাঁহাদের সাবধানবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া এই প্রদেশের চরম দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজনীতির সহিত সকল সম্পর্কশূন্য এই দুর্ভিক্ষ-সৃষ্টির কলঙ্কে শাসনযন্ত্রকে কলঙ্কিত হইতে দেখিয়া কলিকাতার ষ্টেটসম্যান পত্রিকা বারবার ভারতসরকার ও বাংলাসরকারকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিতে সচেষ্ট হন। কলিকাতায় তখন দুঃস্থদের ভিড় শুরু হইয়াছে, ৪ঠা আগষ্টের "State of a City শিরোনামায় তাঁহারা বলেন—**Already Calcutta for a variety of reasons has been reduced this summer to a Parlous plight. Misfortunes of nature are added to conspicuous administrative inefficiency—and the later has not been confined only to her scandalowsly incompetent corporation. Her ministers and permanent officials are also blamoworthy for multifarious forms of inaptitude, as well as the government of India, whose lack of foresight and bewildering shifts of policy over the food problem have heavily contributed to the present ills,"**…এবং ইহার চেয়ে তীব্রভাবে তাঁহারা আর চারদিন পরে অর্থাৎ ৮ই আগষ্ট—বাংলার দুর্গতি সম্পর্কে ভারতসরকারের নিরুৎসাহজনক মনোভাবকে আক্রমণ করিয়া "Plight of a province প্রবন্ধে বলেন—The condition of Bengal is now conspicuously bad as to call for heroic remedies. New Delhi must, bessir itself, must think less on terms of N. W. India's easier condition and take due cognizance of bitter realities in the war-threatened eastern areas, where what may fairly now be called famine prevails.

শুধু এদেশে নয় বাংলার শোচনীয় খাদ্যাবস্থার সংবাদ বিদেশে এমন কি বিলাতে বহুপূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিল। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসের ২৩ তারিখে 'টাইমস' পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশিত হয় এবং তাহার প্রথমেই লিখিত হয়—"**The Government of India is embarking on a policy which will prodnce a famine and cost many thousands of lives,** কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব সতর্কবাণী সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয় নাই এবং দুর্ভিক্ষ কমিশনও দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে কর্ত্তৃপক্ষ সত্যকার দুর্ভিক্ষ শুরু হইবার দীর্ঘকাল পরে পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশে খাদ্য কম পড়িয়াছিল মাত্র তিন সপ্তাহের, সরকারী পরিচালনানীতি বা বণ্টন ব্যবস্থা ভাল হইলে তজ্জন্য দুর্ভিক্ষ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা এখন যাহা বলিতেছেন, দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ভারতে আসিয়া বিশ্বভ্রমণকারী মার্কিন সেনেটর দলের অন্যতম রাফল ব্রুষ্টার সেই কথা বলিয়াছিলেন। ব্রুষ্টারও বলেন যে, ব্রহ্মের চাউল যদি শতকরা ১০ ভাগও হয়, তাহা হইলে ১০ ভাগ চাউল না থাকার জন্য একজন লোকের মৃত্যুরও কোন যুক্তি থাকতে পারে না ; কিন্তু বলিতে গেলে অযোগ্য কর্ত্তৃপক্ষের দুর্নীতির জন্যই আতঙ্কগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও স্বচ্ছল জনসাধারণ বাজারের খাদ্যশস্য ঘরে তুলিয়া স্বল্প পরিমাণ পণ্যসামগ্রী বাজার হইতে অদৃশ্য করিয়া দিয়াছিল। সরকারের অবিমৃষ্যকারিতা ও অস্থিরমতিত্ব, দায়িত্বশীল

ব্যক্তিদের সাবধান বাণী, জনসাধারণের আতঙ্ক প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া এই দুর্দ্দিনে ব্যবসাদারগণ নিজেদের পকেট ভর্ত্তি করিবার দিকে অমানুষিক লোভ দেখাইয়াছেন এবং ফলে কালাবাজারের দৌরাত্ম্যে খাদ্যাদি খোলা বাজার হইতে উপিয়া গিয়া গোপনে যে মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, তাহা স্পর্শ করা দুঃস্থ জনগণের সাধ্যাতীত হইয়াছিল বলিয়া নিরন্ন নরনারীর সম্বল হইয়াছিল ভিক্ষা এবং যখন ভিক্ষাও জুটিল না, তখন নিরুপায় মৃত্যুবরণ। দুর্ভিক্ষ কমিশন মৃতের সংখ্যায় সম্ভবতঃ ভুল করিয়াছেন, কিন্তু ভুল করিয়াও অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এইভাবে মৃত ১৫ লক্ষ লোকের জীবনের বিনিময়ে দুর্ভিক্ষকালীন ব্যবসায়ীবৃন্দ লাভ করিয়াছে প্রায় দেড়শত কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রত্যেকটি নরবলি দিয়া তাহারা হিসাবে এক হাজার টাকা পকেটস্থ করিয়াছেন। সরকার তাঁহাদের স্বাভাবিক উদাসীন্য দ্বারা সমস্ত ভালমন্দই চোখ বুঁজিয়া অস্বীকার করিয়া যাইতেছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর করিতে এত বিলম্ব করিয়াছিলেন যাহাতে অনেকের মনে হইয়াছিল যে এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পশ্চাতে তাঁহাদের হয়তো কোন উদ্দেশ্য আছে। যদিও শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়া তাঁহারা দুর্ভিক্ষ বিদূরিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি প্রথম দিকে তাঁহাদের নিদারুণ অকর্ম্মণ্যতার জন্যই অবস্থা প্রতীকারের অতীত হইয়া পড়ে। দুর্ভিক্ষ প্রকাশ হইবার পরও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এমন এক লজ্জাস্কর ব্যাপার ঘটে যাহার সহিত বাংলা সরকারের সম্পর্ক না থাকিলেও তাঁহাদের সংযোগ অনুমান করিয়া বহুলোক ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পরিষদের জনৈক জাতীয়তাবাদী সদস্য দেশবাসীর অসহায়তার কথা উল্লেখ করিয়া সরকারী সাহায্যের দাবী জানাইলে ইউরোপীয় দলের একজন সদস্য অতি অভদ্রভাবে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—তোমাদের বন্ধু তেজোর কাছে যাও। ১৯৪২ সালের আগষ্ট হাঙ্গামার পর হইতে ভারতবাসীর জাপানী-প্রীতি সম্বন্ধে মিথ্যা অনেক কিছু অনুমান করিয়া সরকার এদেশের নেতৃবৃন্দকে ও জনসাধারণকে অনেক কষ্ট দিয়াছেন; সেই জাপানী-প্রীতির নজীর দেখাইয়া এই শ্বেতাঙ্গ সদস্য বিদ্রূপ করিলে অনেকের মনে হয়—বুঝি এদেশের লোকের জাপানীদের প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সরকার তাহাদের দুঃখের দিনে সাহায্য করিতে উৎসাহ দেখাইতেছেন না। অবশ্য এই শ্বেতাঙ্গপ্রবরের উক্তি কোনক্রমেই শ্বেতাঙ্গজাতির উক্তি নয় এবং বাংলা সরকারের স্কন্ধেও ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ার জন্য এত বড় কলঙ্ক চাপান সমীচীন নয়। সুখের কথা, ১৯৪৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রিকায় ষ্টেটসম্যান সম্পাদক এই দুর্ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং একজন শ্বেতাঙ্গের ব্যক্তিগত কটূক্তির জন্য সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত না করিবার আবেদন জানান। তিনি বলেন—"A member of the European group in Bengal Assembly did interrupt an Indian member of the House in a recent debate with the words "Go to Tojo, your pal." The interrupter was not the leader of the group, who, we are sure, was as distressed as any member of it at the discourtesy, nor it is right or accurate to imply that Europeans as a class, or olive street Europeans are indifferent to the terrible sufferings they see."

সরকার বাংলায় ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ধান চাষের জমি কমিয়া যায় এবং ফলে শস্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। এইভাবে প্রায় ৯ লক্ষ একর ধানচাষের জমি পাট চাষের জমিতে রূপান্তরিত করিবার যে ব্যবসায়িক যুক্তিই থাক, ব্রহ্মদেশ হাতছাড়া হইয়া যাইবার পর এইভাবে ধান্যউৎপাদন কমাইবার ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষের অযোগ্যতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। অন্যদিক হইতে তৎকালীন গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট যত ভাল কাজই করিয়া থাকুন, দুর্ভিক্ষের মূলে যে তাঁহার বিচারবোধ এবং চিন্তাশীলতার অভাব ঘটিয়াছিল একথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ যখন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তখন খাদ্যদ্রব্য চলাচলের উপর খেয়াল ও খুসীমত বিধিনিষেধ আরোপ এবং প্রত্যাহার করিয়া তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ জনসাধারণকে কেবলমাত্র উদ্‌ভ্রান্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করিয়াছেন এবং সেই জন্যই বাজারের স্বল্পপরিমাণ খাদ্যশস্য বাজার হইতে বণিক ও ধনিকের ঘরে কার্য্যতঃ পচিবার জন্য গুদামজাত হইয়া অসংখ্য বিত্তহীন নরনারীর অনশনে মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার উপর অন্তর্দ্দেশীয় মুদ্রাস্ফীতিও দুর্ভিক্ষের সম্প্রসারণে নিঃসন্দেহে ইন্ধন জোগাইয়াছিল। অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি দুর্ভিক্ষের মূল কারণের সহিত সংযুক্ত করিতে দুর্ভিক্ষ কমিশন ইতস্ততঃ করিয়াছেন এবং ফলে তাহাদের রিপোর্ট সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বাংলার এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এবং বাংলার গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট যে অস্থিরমতিত্ব এবং ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন এবং সময় ও সুবিধা থাকিতেও উদ্বৃত্ত প্রদেশ হইতে বাংলায় খাদ্যশস্য আনিয়া অথবা বাংলাকে অতিথি অভ্যাগতদের ভরণপোষণের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিতে লজ্জাস্কর কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৮৭৩—৭৪ সালে বাংলার সত্যকার বড় একটি দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়, কিন্তু তৎকালীন গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল অসীম সহানুভূতির সহিত খাদ্যনীতি পরিচালনা করিয়া সেই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করেন এবং ইহাতে বলিতে গেলে কোন লোককেই অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে হয় নাই। দুর্ভিক্ষ কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে যদি সার রিচার্ড টেম্পল বা লর্ড নর্থব্রুকের সহিত সার জন হার্বার্ট ও লর্ড লিনলিথগোর কঠোর তুলনামূলক সমালোচনা করিতেন, তাহা হইলে আমরা সত্যই আনন্দিত হইতাম। মোটের উপর সমগ্র দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টটিতে সরকারী ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ এড়াইয়া যাইবার যে চেষ্টা আছে তাহা যে কোন অবধানী পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়িবে। তাঁহারা ভারতসরকার বা বাংলাসরকারকে দুর্ভিক্ষের জন্য কতকটা দায়ী করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বেশীভাগ দায়িত্ব চাপাইয়াছেন উৎপাদন হ্রাস, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, ব্রহ্মপতন ও ব্যবসাদারদের

কালাবাজারের আশ্রয় গ্রহণের উপর ; অথচ একথা সকলেই জানেন যে প্রবলপ্রতাপ সরকার বাহাদুরের নজর থাকিলে উৎপাদন বা শস্য জোগানের দিক হইতেও যেমন উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল তেমনি ব্যবসাদারদের চোরাবাজারী দৌরাত্ম্য বন্ধ হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। ভারতসরকার বা বাংলাসরকার—"ডিনায়েল পলিসি" প্রবর্ত্তন করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত বঙ্গবাসীর নিদারুণক্ষতি সাধন করিয়াছেন ; সুন্দরবন ও পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে এই নীতি অনুসারে নৌকাদি অপসারিত হওয়ায় মাছের ব্যবসা ও মৎস্যভোজনে ক্ষুন্নিবৃত্তির সুযোগ নষ্ট হইয়াছে ; ভারত হইতে ইরাক, ইরাণ, সিংহল প্রভৃতি দেশে খাদ্য রপ্তানী হইয়াছে অথচ বাংলার লোক দলে দলে মরিয়াছে অনাহারে। পাঞ্জাবের গম ১১ টাকা ৪ আনা দরে কিনিয়া সরকার বাংলায় সেই গম বেচিয়াছেন ১৭ টাকা মণ দরে এবং যে কল্যাণকর উদ্দেশ্যই তাঁহাদের থাক, মোটের উপর শেষ পর্য্যন্ত এইভাবে লাভের ব্যবসা চালাইয়া তাঁহারা জনসাধারণের দুর্গতি করিয়াছেন বৃদ্ধি, অথচ উডহেড কমিশনের রিপোর্টে এই সকল কার্য্যের তেমন কোন কঠোর সমালোচনা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ কমিশনের এই রিপোর্টটিতে সরকারের গুণকীর্ত্তনের অব্যাহত সুর ধ্বনিত হয় নাই সত্য এবং বলিতে গেলে সাহসের সহিত সরকারী কার্য্যের কিছু কিছু সমালোচনাও করা হইয়াছে ; কিন্তু ৩০।৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য যাহাদের ভুয়ো সম্মানবোধ, অদূরদর্শিতা এবং অযোগ্যতা দায়ী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব অবলম্বনের উল্লেখযোগ্য কোন নির্দ্দেশ এই রিপোর্টে দেখিতে পাই নাই বলিয়া এবং দুর্ভিক্ষের ফলে ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পরিবেশিত না হওয়ায় অনেক তথ্যথাকা সত্ত্বেও আমরা এই রিপোর্টটিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

ভারতের সাম্প্রতিক বস্ত্রাভাব

মণিপুরের যুদ্ধের মাত্র কয়েক মাস ছাড়া প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সংঘাতে ভারতকে বেশিদিন বিপন্ন হইতে হয় নাই এবং আপাত-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের বিপজ্জনক এলাকার অন্তর্বর্ত্তী ভূভাগ হইলেও এই দেশের বেসামরিক অধিবাসীগণ আধুনিক সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ দক্ষিণা হইবার সৌভাগ্য হইতে ভাগ্যক্রমে রেহাই পাইয়াছে। কিন্তু ভারতের মধ্যে যুদ্ধ না চলিলেও বিগত ছয় বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষকে যুদ্ধের যে মাশুল জোগাইতে হইতেছে তাহাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে এবং বর্ত্তমান মহাসমরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাবিধ চাপে ভারতের আর্থিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন দুর্দ্দশার শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই চাপ এমনি মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে যে, কৃষিজীবী ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়কারী দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং শিল্পজীবনের দিক হইতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্থক নিদর্শন বস্ত্রশিল্প এদেশবাসীর সম্ভ্রমরক্ষার মোটামুটি কোন ব্যবস্থাও করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অন্ন ও বস্ত্র যদি প্রয়োজনমত পাওয়া যায়, অভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিবিধ প্রয়োজনীয় পণ্যোৎপাদনের উৎসাহ তবু মানুষের থাকে, কিন্তু শুধু কাপড়ের জন্য মাথা ঘামাইতে বা হা হুতাশ করিতেই যদি সারাদিন যায় তাহা হইলে শিল্প সংগঠন সম্পর্কে মনের ইচ্ছা মনে থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

মহাসমর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কাপড়ের দিক হইতে ভারতবর্ষ অনেকটা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ এবং মুষ্টিমেয় সহরবাসী ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের বাদ দিলে এদেশের অধিকাংশ লোকই এখনও আধুনিক সুসভ্য জীবনযাপনের উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করে না। মোটের উপর ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ যে বৎসর বিশেষ সামরিক প্রয়োজনে এক গজও বস্ত্র ব্যবহৃত হয় নাই, সেই বৎসর ভারতের মিল ও তাঁতগুলিতে উৎপন্ন কাপড়েই এদেশের শতকরা ৯০ ভাগের বেশী অভাব মিটিয়াছিল। উক্ত বৎসর ভারতে কাপড়ের কলসমূহে ৪ শত কোটি গজ এবং তাঁতে দেড় শত কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয় এবং ৭০ কোটি গজ কাপড় জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হয়। এই ৬ শত ২০ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ২০ কোটি গজ কাপড় সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী নির্ভরশীল দেশে রপ্তানী করিয়া ভারতে উদ্বৃত্ত থাকে পুরো ৬ শত কোটি গজ এবং ইহাই কিঞ্চিদধিক ৩৭ কোটি নরনারীর লজ্জানিবারণ করে। পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহের তুলনায় অবশ্য এইভাবে কমবেশী মাথাপিছু ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নহে, কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল সহজ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলিয়া এবং বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের আমলে তাহার আর্থিক অবস্থা ক্রমে হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া এই সামান্য পরিমাণ কাপড়েই ভারতবাসীর মোটামুটি চলিয়া গিয়াছিল।

তারপর ১৯৩৯ সালের শেষদিকে যুদ্ধ বাঁধে এবং স্বভাবতঃ নিষ্ক্রীয় ভারত সরকার অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া ভারতের সামরিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। ১৯৪১ সালের শেষে জাপান যুদ্ধে নামিলে এদেশের সমরায়োজন আরও আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠে এবং ক্রমে সামরিক স্বার্থ সাধারণ স্বার্থ অপেক্ষা অনেক উপরে স্থান পাইবার ফলে অন্যান্য নানা পণ্যসামগ্রীর মত বেসামরিক দেশবাসীর জন্য বস্ত্রের জোগানও ক্রমেই কমিতে থাকে। যুদ্ধকালে সমুদ্রপথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠায় আমদানী-রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাইবার জন্যও ১৯৩৮-৩৯ সালের ৭০ কোটি গজ বস্ত্র আমদানী ১৯৪২-৪৩ সালে শূন্যে আসিয়া পৌঁছায়। এই বৎসর ভারতের বস্ত্র উৎপাদন যুদ্ধের আগেকার সমান হইলেও এই ৫ শত ৫০ কোটি গজ কাপড় দেশবাসীর অভাব মিটাইবার পক্ষে একান্ত অপ্রচুর হইয়া উঠে ; কারণ, ইহার মধ্যে ১ শত ১০ কোটি গজ বস্ত্র সামরিক বিভাগ গ্রহণ করেন এবং মধ্যপ্রাচ্য, (ইরাক, ইরাণ প্রভৃতি দেশসমেত) ও সিংহলে ভারতকে পাঠাইতে হয় প্রায় ৭০ কোটি গজ কাপড়। এদিকে ভারতে মৃত্যু অপেক্ষা জন্মহার বেশী হওয়ায় এদেশে প্রতি বৎসর প্রায় অর্দ্ধ কোটি লোক বৃদ্ধি হইতেছে। এই সব নানা কারণে ১৯৩৮-৩৯ সালে যেখানে ৬ শত কোটি গজ কাপড়ে ভারতবাসীর কায়ক্লেশে চলিয়াছিল, ১৯৪২-৪৩ সালে সেখানে ৩ শত ৭০ কোটি গজ কাপড়ে বর্দ্ধিত সংখ্যক ভারতবাসীর অভাব সঙ্কুলন না হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত

যতই দিন গিয়াছে ভারতের বস্ত্রাভাব হ্রাস না পাইয়া ক্রমেই তত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

কাপড়ের দিক হইতে ভারতের দুরবস্থা যে বর্ত্তমানে চরমে উঠিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্ত্রের জোগান ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবনতি ভারত সরকারকে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বস্ত্র বরাদ্দ করিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছে এবং জোড়াতালি দেওয়া এই বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা সকল প্রদেশের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে অধিকাংশ স্থান হইতেই প্রতিবাদ আসিয়াছে বিস্তর। ইহার উপর সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, বরাদ্দ ব্যবস্থানুযায়ী সরবরাহকৃত কাপড় যে চোরাবাজারের কোন অন্ধকার পথ দিয়া জনসাধারণের আয়ত্ত ও দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, তাহা দেশবাসী অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না; দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলার কথা ধরিলে দেখা যায় যে, বাংলায় নাকি মাথাপিছু ১০ গজ হিসাবে বস্ত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং ইহার উপর মারাত্মক অভাব লক্ষ্য করিয়া অনুগ্রহ হিসাবে ভারতসরকার বাংলাকে আরও কিছু কাপড় প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা কেবলমাত্র আজ নয়, সুদীর্ঘদিন যাবৎ বাংলার খোলাবাজারে মিলের নির্দ্ধারিত মূল্যের কাপড় মোটেই পাওয়া যাইতেছে না এবং জনসাধারণকে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই সরকারী বরাদ্দ ও বণ্টনের ভুয়ো সমতাসাধনের বাকচাতুরী শুনিয়া ভবিষ্যতে প্রয়োজন মিটাইবার স্বপ্ন দেখিতে হইতেছে। কাপড় চালচিনির মত রেশনিং হইলে তবু কাপড় পাওয়া যাইবে এমনি একটি আশা বাংলার নরনারীকে কতকটা আশান্বিত করিতেছে সত্য, কিন্তু রেশনিং ব্যবস্থার আংশিকতা শেষ পর্য্যন্ত এই প্রদেশের সত্যকার অভাব নিরশনে কতখানি সক্ষম হইবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে এখনও কিছুই বলা যাইতেছে না। কাপড়ের মারাত্মক অনটন লোকের সম্ভ্রম এখনই যথেষ্ট ক্ষুণ্ন করিয়াছে, অবস্থা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিলে শুধু সম্মান নয় কাজকর্ম্ম নষ্ট হইয়া দেশে সর্ব্ববিধ বিশৃঙ্খলারও যে সৃষ্টি হইতে পারে এমন ধারণাও আজকাল অনেকের মনেই জাগিয়াছে।

অথচ এই সুতীব্র সমস্যার সমাধান হইবে কি উপায়ে, তাহা এখনও কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। ইয়োরোপে যদিও যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, তথাপি সেখানকার শিল্পাদি পুনর্গঠিত হইয়া এদেশে কাপড় আমদানীর আশা এখনই করা যায় না; পূর্ব্ব রণাঙ্গনে জাপানী যুদ্ধের অবস্থা যেরূপ তাহাতে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিতে এখনও কিছু সময় লাগিবে বলিয়া কাপড়ের উপর হইতে সামরিক চাহিদা অবিলম্বে কমিবার বিশেষ ভরসা নাই; এ সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ যদি প্রকৃত সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টি লইয়া বস্ত্রবরাদ্দ ও বস্ত্র-বণ্টনের ব্যবস্থা করেন এবং ভাল ব্যবহারের দ্বারা দেশবাসীর সহযোগিতা আদায় করিতে পারেন তবেই সমস্যার জটিলতা কিছুটা হ্রাস পাইতে পারে! ভারতে বর্ত্তমানে কাপড়ের উৎপাদন নানা কারণে লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না, বরং এখনও কয়লার অভাবে নানাস্থানে মিলগুলির কার্য্যপরিচালনার যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিতেছে। বাংলার এই সুতীব্র বস্ত্রসঙ্কটের দিনেও সম্প্রতি কয়লার অভাবে ঢাকেশ্বরী ১নং ও ২নং কলসমেত বাংলার তিনটি কাপড়ের কলে কাজ বন্ধ ছিল। তাছাড়া গত জানুয়ারী মাস হইতে আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলির কার্য্যপরিচালনায় কয়লার অভাব একটি প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সামরিক বিভাগের ও চীন, সিংহল, জাপমুক্ত ব্রহ্ম প্রভৃতি নির্ভরশীল প্রতিবেশী দেশসমূহের চাহিদা ক্রমেই বাড়িতেছে, এখন আমদানীর সম্ভাবনা যতই সুদূরপরাহত হইবে ততই আমাদের হতাশ হইবার কথা। এ সম্পর্কে যাহারা খোঁজ খবর রাখেন তাঁহারা এ পর্য্যন্ত আশার কথা শুনাইতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে ভারতের কাপড় উৎপাদন এখন সাড়ে পাঁচ শত কোটি গজ হইতে পাঁচ শত কোটি গজে নামিয়া আসিয়াছে এবং সামরিক প্রয়োজনে ও বিদেশে রপ্তানীতে কাপড় লাগিতেছে যথাক্রমে ১ শত কোটি গজ ও ৬০ কোটি গজ, অর্থাৎ বৎসরে বেসামরিক ভারতবাসীর ব্যবহারের জন্য মাত্র ৩ শত ২০ কোটি গজ আন্দাজ কাপড় পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা এখন ৪০ কোটির কিছু বেশী, ইহার মধ্যে বিদেশীর দল আছে, আশ্রয়প্রার্থী আছে, বনেদী ধনী সম্প্রদায় ও যুদ্ধের ফাঁপা বাজারে দুপয়সার মুখ দেখা স্বচ্ছল ব্যক্তিবর্গ আছেন; কাজেই কর্ত্তৃপক্ষের সুনিয়ন্ত্রণ না থাকিলে মোটামুটি মাথাপিছু ৮ গজ হারের কাপড় কোটি কোটি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নরনারীর অভাব মিটাইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের আয়ত্তের মধ্যেই যে নামিয়া আসিবে না, ইহা তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কথা। কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালনা নীতিতে শৈথিল্যের জন্য চাহিদা ও জোগানের প্রভূত অনামঞ্জস্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে চোরাবাজারের ব্যবসায়ীবৃন্দ, যুদ্ধের মাশুল যোগাইতে নিঃস্বতার রিক্তপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন অসংখ্য লোকের সম্ভ্রমমূল্যে তাহাদের তহবিল হইয়া উঠিতেছে ভারি, অথচ শাসন করিবার মালিক এদেশের সরকার সমস্ত চোখে দেখিয়াও কোন এক অজ্ঞাত স্বার্থে দেশবাসীর তীব্র প্রয়োজন উপেক্ষা করিতেছেন। গত বৎসর ব্রিটিশ সরকারের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী সার হেনরি ফ্রেঞ্চ যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি এক প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রিটেনে বেসামরিক দেশবাসীকে রণাঙ্গনের সম্মুখবর্ত্তী ভূমিভাগের সৈন্য (Forces on the front line) মনে করা হয় এবং তাহাদের উপর যুদ্ধরত সৈন্যদলের সুখস্বচ্ছন্দ্য ও জীবনমরণ নির্ভর করে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অভাব হইতে নিষ্কৃতি দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। অন্য বিষয়ে ভারতসরকার ব্রিটিশসরকারের আস্থাভাজন হইবার কঠোর সাধনায় নিয়োজিত থাকিলেও এই বিশেষ ব্যাপারে কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নরূপ এবং এই পার্থক্যের চরম প্রমাণ তেরোশো পঞ্চাশী মহামন্বন্তরের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুর নরনারীর নিরুপায় অপমৃত্যু ও ১৩৫১-৫২ সালের এই ঐতিহাসিক বস্ত্রসঙ্কট।

৪।৬।৪৫
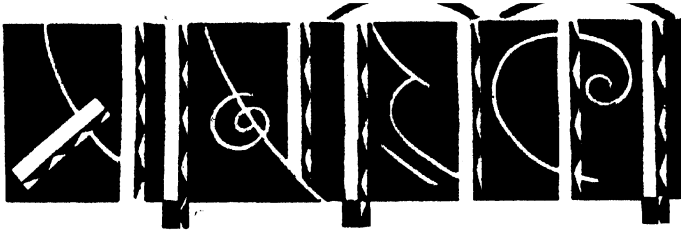
নোবেল প্রাইজ—

১৯৪৫ সালে একজন চীনা রসায়নশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ডাঃ চাউ-হাউ-ফু নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভের পর চীনে ফিরিয়া ১০ বৎসর চেকিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর মাত্র। ১৯৪৩ সালে তিনি পুনরায় বিলাত যান ও গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ফিরিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন চীনদেশীয় লোক নোবেল প্রাইজ পান নাই। বর্ত্তমানে ডাঃ ফু অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় একটি গ্রামে এক ভাঙ্গা ঘরে বাস করিতেছেন। বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার সময় সম্পূর্ণ অর্থহীন অবস্থায় তিনি কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন ও বন্ধুগণের দান লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। গত বৎসর হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন পান না। একটিমাত্র ঘরে স্ত্রী ও ৬টি সন্তান লইয়া চুংকিং হইতে বহু দূরে তাঁহাকে এখন বাস করিতে হইতেছে। নোবেল প্রাইজের মূল্য ২০ হাজার মার্কিণ ডলার হওয়া উচিত—কিন্তু চীনের বর্ত্তমান বাট্টার দামে তিনি মাত্র ১০০ মার্কিণ ডলার পাইবেন ও অতি কষ্টে এক বৎসর তাহাতে তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। চীন দেশে বর্ত্তমানে যে দারুণ আর্থিক দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য তথায় সকলকেই কষ্ট পাইতে হইতেছে। অধ্যাপক ফু তাঁহার বেতনে বঞ্চিত হইয়াই এই কষ্টে পড়িয়াছেন।

পার্লামেণ্টের সদস্যগণের পত্র—

মিঃ উইলিয়ম ডিবি, মিঃডি-এন-প্রিট, মিঃ জনহিন্দ প্রভৃতি বৃটীশ পার্লামেণ্টের ১৫জন সদস্য প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের নিকট এক পত্র লিখিয়া ভারতের দাবীর কথা জানাইয়াছেন—ঐ পত্রে বলা হইয়াছে, "কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকার পক্ষ পর পর ১৩ বার পরাজিত হইয়াছে; ইহাতে দেখা যায় যে ভারতের জনগণ বৃটীশের বর্ত্তমান শাসন নীতির সমর্থন করেন না। কাজেই তাহার পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতির মত নেতাদের মুক্তিদান করা না হইলে ভারতে অপর কেহ নূতন শাসন নীতি প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিয়া কেন্দ্রে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর মত লোকের উপদেশ অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। ভারতকে স্বাধীনতা না দিলে জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইতে পারে না।" মিঃ চার্চ্চিল কি তাঁহার দেশবাসী ১৫জন নেতার এই সকল কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করিবেন?

প্যালেষ্টাইন ও ভারতবর্ষ—

যুদ্ধের সমাপ্তির পর বিজয় উৎসবের দিন প্যালেষ্টাইনের হাই-কমিশনার লর্ড গর্ট সকল রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দান করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিক বন্দীদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই করা হয় নাই। চার্চ্চিল আমেরী কোম্পানী বোধহয় এখন সজাগ নাই।

রাজবন্দী শরৎচন্দ্র—

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—"শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বহুদিন যাবৎ জ্বর ও তৎসহ বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছেন এবং তাঁহার অবস্থা উদ্বেগের কারণ হইয়াছে বলিয়া কর্পোরেশন তাঁহার আশু মুক্তির জন্য গভর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।" গত ১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর শরৎ বসুকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য দেশের সকল দলের খ্যাতনামা নেতারা, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারগণ ও নানা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তাঁহার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যহানির কথা বিবেচনা করিয়া কি তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া যায় না?

মার্কিণ ও ভারতবর্ষ—

ডাক্তার জেরোম ডেভিস ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। তিনি ১৪ই মে তারিখে নিউইয়র্কে এক জনসভায় বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষ বর্তমান সভ্যতায় অনেক দান করিয়াছে; কাজেই তাহার নিকট মার্কিণের ঋণও কম নহে। অথচ ভারতের জনগণের বার্ষিক আয় মাথা পিছু মাত্র ৬৫ টাকা। ভারতে হাজার জন শিশুর মধ্যে ১৬৭ জন এক বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মারা যায়। যে দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের দুর্দ্দিনে সকলের তাহাকে সাহায্য করা উচিত।" ভারতের দুর্ভিক্ষ সাহায্যে আমেরিকায় ১২ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, তৎসম্পর্কে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বস্তি অঞ্চলের উন্নতি—

বাঙ্গালার গবর্ণর মিঃ কেসির চেষ্টায় কলিকাতার বস্তিগুলির স্বাস্থ্য, আলো ও জল সরবরাহ, পয়প্রণালী ব্যবস্থার উন্নতিসাধন প্রভৃতির জন্য একটি আইনের খসড়া তৈয়ার করা হইয়াছে। উক্ত আইন দ্বারা যে কোন বস্তির মালিককে উন্নতিমূলক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের জন্য গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিতে পারিবেন। বস্তি অধিবাসীদের বসবাস ব্যবস্থার পুনর্গঠন, বস্তি অঞ্চলের আবর্জ্জনা পরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর বাড়ীর উচ্ছেদ এবং তাহার স্থলে স্বাস্থ্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ উক্ত আইনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। আইনের খসড়া শীঘ্রই জনমত সংগ্রহের জন্য সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হইবে।

খাদি ও গ্রাম্য শিল্প—

ওয়ার্দ্ধাগঞ্জে জনৈক পত্র-লেখকের প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী খাদি সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নলিখিতরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—খাদিই একমাত্র ব্যাপক কুটীর শিল্প। আমি ইহাকে সূর্য্য ও অন্যান্য শিল্পকে তাহার গ্রহপুঞ্জের মত মনে করি। বর্তমানে আপনারা যদি হাতে তৈয়ারী কাগজ, উদুখলে ভাঙ্গা চাল, ঘানির তেল, মৌচাকের মধু, তালের গুড়, মৃত পশুর চামড়ার দ্রব্য প্রভৃতি বিষয়ে মন দেন, তবেই যথেষ্ট হয়। কৃষিও গ্রাম শিল্প, সুতরাং খাদ্যশস্য, ফল ও তজ্জাত দ্রব্য এবং গ্রাম্যশিল্প বিবেচিত হইতে পারে। অর্থাৎ গ্রাম যেখানে আত্মনির্ভরশীল, সহর সেখানে গ্রামের উপর নির্ভরশীল হইবে।

স্বদেশী গ্রহণ—

গত ৩০শে বৈশাখ কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্সিয়াল মিউজিয়ামের দশম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উপলক্ষে এক জনসভায় খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় বর্তমান সময়ে দেশবাসী সকলকে স্বদেশী গ্রহণের সঙ্কল্প করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যুদ্ধের পর বহু বিদেশী দ্রব্য এদেশে চালাইবার চেষ্টা করা হইবে, সে সময়ে তাহার প্রতিরোধ করিতে হইলে আমাদের স্বদেশীব্রত গ্রহণ ছাড়া অন্য পথ নাই। এ বিষয়ে আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিব না।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান—

সাপ্রু কমিটীর প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানে মোট ১৬০ জন সদস্য লওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থ এইরূপ আসন সংখ্যা পাইবে—হিন্দু ৫১, মুসলমান ৫১, তপশীলী সম্প্রদায় ২০, শিখ ৮, ভারতীয় খৃষ্টান ৭, এংলো ইণ্ডিয়ান ২, ইউরোপীয়ন ১, পার্শী ১, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি বিশেষ স্বার্থ ১৬ ও অনুন্নত সম্প্রদায় ৩। শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানে যাহাতে কোন সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য না থাকে, সেইজন্যই হিন্দু ও মুসলমানকে সমান সংখ্যক আসন দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ডাঃ এম-আর-জয়াকর ও শিখ সদস্যদের প্রভাবেই সাপ্রু কমিটী পাকিস্থানের প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন—

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৪৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, আলোচ্য বর্ষে মিশনের মোট আয় ছিল ৩৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা এবং ব্যয় ছিল মোট ৩৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। ৬৫টি মঠ ও ১১টি সাধারণ কেন্দ্র হইতে মিশনের কাজ পরিচালনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ও উত্তর ত্রিবাঙ্কুরে দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য কার্য্য করা হইয়াছে। বোম্বাই ও ভুবনেশ্বরে

বন্যা সাহায্য কার্য্য করা হইয়াছে। মিশনের শিক্ষা বিস্তার কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি কলেজ (ছাত্রগণের বাসস্থান সমেত), ৩টি বিদ্যালয় (ছাত্রদের বাসস্থান সমেত), ২৫টি হাই স্কুল, ১১টি মধ্য ইংরাজী স্কুল ও ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিশনের কর্ম্মীরা চালাইয়া থাকেন। ২টি শিল্প বিদ্যালয়ে ৬৬৯ জন ছাত্র শিক্ষা লইয়াছে। মিশনের অধীনে ৩৩টি ছাত্রাবাস, ১৬টি নৈশ বিদ্যালয় ও ৪টি কারিগরী বিদ্যালয় আছে। ২৪ পরগণা রহড়ায় সম্প্রতি একটি বালকাশ্রম খোলা হইয়াছে। কাশী সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগ ও অকর্ম্মণ্য স্ত্রীলোকদের বিভাগ, কলিকাতা ও টাকীর মাতৃমঙ্গল আশ্রম, পুরীর বিধবা আশ্রম, মাদ্রাজের সারদা বিদ্যালয়, কলিকাতার নিবেদিতা স্কুল প্রভৃতি হইতে মিশনের কর্ম্মীরা বিশেষ বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করিয়া থাকেন। এখনও ভারতের বাহিরে ১৭টি কেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করা হইতেছে। সারা জগৎব্যাপী মিশনের কার্য্য সকলের আদর লাভ করিয়া থাকে। মিশন যাহাতে কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে বাড়াইতে পারে, সে বিষয়ে সকল ধনী দাতার অবহিত থাকা প্রয়োজন। মিশন বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার গৌরবের বস্তু। সেই গৌরব বৃদ্ধির জন্য সকলের সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত।

যশোহর জিলা শিক্ষক সম্মেলন—

গত ২৯শে এপ্রিল যশোহর জিলা শিক্ষক সম্মিলনীর দশম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির অভিভাষণে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুণ উল্লেখপূর্ব্বক একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সমুন্নতিকল্পে কতিপয় অত্যাবশ্যক ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করেন। (১) শিক্ষক ও ছাত্রে ব্যবধান দূরীকরণ ও নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা। ভারতের নিজস্ব গুরুশিষ্য সম্পর্ক সর্ব্বতোভাবে অব্যাহত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। (২) শিক্ষক নিয়োগের সময় শিক্ষকের উদারস্বভাব, পরোপকার-সাধনে প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ—সচ্চরিত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য ; কেবল, পরীক্ষায় সাফল্য প্রকৃত শিক্ষকতার প্রমাণ কিছুতেই হইতে পারে না। (৩) শিক্ষকদের চিরন্তন ছাত্রাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানস্পৃহা বাঞ্ছনীয় ; আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শিক্ষক নিত্যনূতন বিদ্যার্জ্জনে বীতস্পৃহ। (৪) ছাত্রদের চিন্তাশক্তির সমধিক বর্ধনের প্রতি শিক্ষকদের প্রখর দৃষ্টি থাকা দরকার, কেবল গ্রন্থপাঠ বিষয়ে নহে। (৫) প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে বিশিষ্ট গ্রন্থাগার স্থাপন অত্যাবশ্যক। গ্রন্থাগার ব্যতীত শিক্ষক ও ছাত্রদের সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টিপ্রসারণ বা বিষয়বিশেষে সমধিক অন্তর্দ্দৃষ্টি একান্ত অসম্ভব। (৬) ভারতীয় নারীরা বৈদিক সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষায় সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন ; নারী-শিক্ষা এদেশের অস্থিমজ্জাগত। নারীদের শিক্ষার সর্ব্ববিধ সুযোগ বিধান একান্ত প্রয়োজন। (৭) আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষাবিভাগের লোকদের অনেক সময় সমাদর হয় না। শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষকদের স্থানই সর্ব্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। পরিশেষে ডক্টর চৌধুরী বলেন—যদিও আমাদের দেশের শিক্ষকদের অবস্থা সর্ব্ব দিক হইতেই অতি শোচনীয় সন্দেহ নাই, তৎসত্ত্বেও শিক্ষকেরাই যে জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ ; তজ্জন্য সকল দুঃখদৈন্যের মধ্যেও হতাশ না হইয়া তাঁহাদেরই এ মহৎ ব্রত পালনে যথাসাধ্য তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য।

ভারত ও যুদ্ধের ব্যয়—

যুদ্ধের জন্য প্রতি বৎসর যুদ্ধ ব্যয় বাবদ ৫ শত কোটি টাকা করিয়া ঋণের বোঝা ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর চাপান হইতেছে বলিয়া সকলে মনে করেন। সে জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য—শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, মানু সুবেদার, হোসেন ইমান, পি-এন-সাপ্রু, এম-এ-আয়েঙ্গার, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, টি-টি কৃষ্ণমাচারী, শ্রীপ্রকাশ, এন-এম-যোশী, সত্যনারায়ণ সিংহ ও সর্দ্দার শান্ত সিং এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ভারতের পক্ষ হইতে যে ঋণ করা হইতেছে, তাহার হিসাব পরীক্ষার জন্য পরিষদদ্বয়ের বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্যের উপর ভার দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতের পক্ষ হইতে ঋণের পরিমাণ স্থির করার ভার বেসরকারী লোকদের স্থির করিতে দিলে ভারত গভর্ণমেণ্টও পরে কতকটা দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে পারিবেন।

মধ্যপ্রাচ্যর অবস্থা—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ আবদার রহমন সিদ্দিকী সম্প্রতি মধ্যপ্রাচী ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"মিশর,

প্যালেষ্টাইন, ইরাক ও ট্রান্স-জোর্ডিনাতে বৃটীশ সর্ব্বেসর্ব্বা। সিরিয়া ও লেবাননে ফ্রান্সের অপেক্ষা বৃটীশের আধিপত্য অধিক। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বৃটীশের তাঁবে যে আরব রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, আবার সে বিষয়ে কাজ চলিতেছে। ওদিকে রাশিয়া তুরস্কের কিয়দংশ লইয়া তুরস্ক সোভিয়েট রাজ্য গঠন করিয়া তাহা বলকানের মধ্যে রাখিবার চেষ্টায় আছে। ঐ অঞ্চলে মোটের উপর শ্বেত-সাম্রাজ্য গঠনের ব্যবস্থা চলিতেছে। নিকটপ্রাচী ও মধ্যপ্রাচীর লোক ভারত সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না। ঐ সকল দেশে ভারত কথা প্রচারের কোন ব্যবস্থা নাই।" মিঃ সিদ্দিকীর এই উক্তির পর ভারতের মুসলমান নেতাদের কি এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত নহে ?

বাঙ্গালা ও অষ্ট্রেলিয়া—

কলিকাতার খ্যাতনামা ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ জৈন ভারতীয় বণিক প্রতিনিধি দলের সহিত অষ্ট্রেলিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—"বাঙ্গালার গভর্ণর বাঙ্গালা দেশে ৯৩ ধারা প্রয়োগ করায় সে সংবাদ অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচারিত হইলে সেখানকার লোক বলিয়াছে—একজন লোক ৬ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের শাসন করিবে—ইহা সত্যই বিস্ময়জনক ব্যাপার। অষ্ট্রেলিয়ার লোক ভারতের প্রকৃত অবস্থার কথা জানে না। সে জন্য ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচারক প্রেরণ করা উচিত। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা ভারতবাসীদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চায়। সেখানে কালা-আদমীর স্থান নাই—নূতন অধিবাসী হিসাবে এখনও তাহারা শুধু শ্বেতকায়দিগকে স্থান দিতে প্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি ভাণ্ডার—

নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ঘোষণা করিয়াছেন যে গত মে মাসে স্মৃতি ভাণ্ডারে দেড় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ভাণ্ডারে ৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা ছিল—এখন উহা ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য সমিতি যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আগামী ২২শে শ্রাবণ তাঁহার মৃত্যুর দিন; আশা করি, তাহার পূর্ব্বেই ঐ ভাণ্ডারে ২৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে।

ঢাকায় কাপড়ের কল বন্ধ—

গত ৩১শে মে হইতে কয়লার অভাবে ঢাকার তিনটি কাপড়ের কলে কাজ বন্ধ হইয়াছে। ঐ ৩টি কলে প্রত্যহ ২৪ হাজার খানা ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হইত। মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকু ও ২ হাজার ৮শত ৮০টি তাঁত বন্ধ হইয়া গেল। ১১ হাজার শ্রমিক ৩টি কলে কাজ করিত। ভাওয়ালের জঙ্গল হইতে কাঠ আনাইয়া কয়েক মাস কাপড়ের কলগুলি চালু রাখা হইয়াছিল—এখন আর তাহাও পাওয়া যায় না। ৩টি কলের নাম—ঢাকেশ্বরী ১নং ও ২নং এবং চিত্তরঞ্জন কটন মিল।

চীনে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন—

চীনের কুওমিংটন গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী কমিটীর প্রধান মন্ত্রী মার্শাল চিয়াং কাইসেক পদত্যাগ করিয়াছেন ও মিঃ টি-ভি-সুং তাঁহার স্থানে নূতন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। মার্শাল চিয়াং ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত এবং পুনরায় ১৯৩৯ হইতে প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিয়াছেন। চীন দেশকে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিঃ সুং আমেরিকা হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া দুর্গত চীনকে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। ইহার সহিত মিঃ সুংএর রুশিয়া প্রীতির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা কে জানে ?

বৃটেনে মন্ত্রিসভায় ভাঙ্গন—

বিলাতে পার্লামেণ্টে শ্রমিক দলের চাপে গত ২৩শে মে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল পদত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৪০ সালের ৭ই মে মিঃ চেম্বারলেন পদত্যাগ করিলে ১০ই মে মিঃ চার্চ্চিল প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। ১৫ই জুন পার্লামেণ্টের আয়ু শেষ হইবে ও সাধারণ নির্ব্বাচনের পর নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। ইতিমধ্যে মিঃ চার্চ্চিলই দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা—

৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় ই-আই-রেলের হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে বেগমপুর ও মণিরামপুর ষ্টেশনের মধ্যে মণিরামপুরের নিকট-হাওড়া হইতে মাত্র ১৭ মাইল দূরে হাওড়া হইতে সাহারাণপুরগামী ৮৩নং আপ পার্শ্বেল একস্প্রেস ট্রেণ এক মালগাড়ীর পিছনে গিয়া

ধাক্কা মারায় ১৩জন নিহত ও ৭৩জন আহত হইয়াছে। ১২জন ঘটনাস্থলেই মারা যায় ও ১জন হাসপাতালে যাইবার পথে মারা গিয়াছে। আহতদের মধ্যে ৪০জনের আঘাত বেশী ছিল। নিহতদের মধ্যে কলিকাতা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য অন্যতম। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পুত্র (দেওঘর মিউনিসিপালিটির কমিশনার) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তিনি আহত হইয়াছেন। ই, আই, রেলে যত অধিকসংখ্যক দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়, অন্য কোন রেলে তত দেখা যায় না। এই সকল দুর্ঘটনা স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার জন্য কি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না ?

বাঙ্গালায় বস্ত্রসঙ্কট—

বাঙ্গালার বস্ত্রসঙ্কট সম্বন্ধে এখন প্রতিদিন নানা স্থানে সভা ও আলোচনাদি হইতেছে। তাহাতে জানা যায় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ২৫শে মার্চ্চ হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ৮৬ হাজার গাঁট মিলজাত বস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে যে ১৫ হাজার গাঁট বস্ত্র গভর্ণমেণ্ট আটক করিয়াছেন, তাহাও গভর্ণমেণ্টের হেপাজতেই আছে। কিন্তু প্রশ্ন—এই পরিমাণ বস্ত্র কোথায় রহিয়াছে ও তাহা দ্বারা কি করা হইতেছে ? অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের হাতে মজুদ সমুদয় বস্ত্র জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনার্থ ছাড়িয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের নিকট এখন অন্ততঃ ৯০ হাজার গাঁট বস্ত্র আছে। অথচ প্রায় প্রতিদিন বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এখন ঐ বস্ত্র গুদামে পড়িয়া থাকিতে দিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা অত্যন্ত নিন্দার বিষয় হইবে।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দাস—

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য তেওতার জমীদার কুমারশঙ্কর রায় মহাশয় পরলোকগমন করায় পূর্ব্ববঙ্গ অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে ঢাকার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দাস (হিন্দু মহাসভা) সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঢাকা মুড়াপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৈমনসিংহ অথারিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পরাজিত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রবাবু পূর্ব্বে রাষ্ট্রীয় পরিষদের মনোনীত সদস্য ছিলেন।

ভারত মার্কিণ বাণিজ্য—

আমেরিকার ওয়াশিংটন হইতে খবর আসিয়াছে যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে যে পরিমাণ বেসামরিক মাল আসিত, গত ৩ বৎসর তাহার ১০গুণ বেসামরিক মাল মার্কিণ হইতে এ দেশে পাঠান হইয়াছে। গ্রেটবৃটেন হইতে ভারতে যে সকল মাল আসিত এখন তাহার অর্দ্ধেক মাল আসিতেছে। বৃটেনের কারখানাগুলি যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ব্যাপারে নিযুক্ত থাকায় মাল প্রস্তুত করিতে পারে না। এই সংবাদ ভারতীয় শিল্পপতিগণের নিকট কি ভাবে গৃহীত হইবে, তাহার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিবে।

বাঙ্গালাদেশে যক্ষ্মা—

বাঙ্গালাদেশে যক্ষ্মার প্রকোপ দিন দিন যেভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। যাদবপুরে যে যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে তাহাতে মাত্র ৩শত রোগী রাখা যায় ও কার্সিয়াংএর হাসপাতালে ৪৫ জন রোগী রাখা চলে। সে জন্য যাদবপুরে নূতন ৪৫ বিঘা জমি লইয়া আরও ২ শত রোগী রাখার আয়োজন চলিতেছে—সেজন্য ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ আর-পি-সাহা আড়াই লক্ষ টাকা, মৈমনসিংহের মহারাজ কুমারগণ ১ লক্ষ টাকা ও এটর্ণী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু সম্প্রতি ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। যাদবপুর হাসপাতালের পরিচালকগণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের জন্য দেশের ধনীরা মুক্ত হস্তে অর্থ দান করিবেন।

চালের দাম—

কলিকাতা ও সহরতলীর রেশন অঞ্চলে যখন চালের মণ ১৬ টাকা ৪ আনা, তখন মফঃস্বলে ৫ টাকারও কম মূল্যে একমণ ধান বিক্রীত হইতেছে। ১৬ টাকা মণ দিয়াও সহরাঞ্চলের লোক ভাল চাল পায় না—অধিকাংশ সময় এখনও পর্য্যন্ত অখাদ্য চাউল দেওয়া হইতেছে। সহর ও মফঃস্বলে চালের দামের এই পার্থক্যের জন্য কাহারা লাভবান হইতেছে ? গরীব লোককে ভাতে বঞ্চিত

করিয়া কি ধনী ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা লাভ করিতে দেওয়া হইতেছে ?

মিঃ আসফ আলি—

পাঞ্জাব গুরুদাসপুর জেলে সাংঘাতিক পীড়িত হওয়ায় গত ২৭শে মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য মিঃ আসফ আলি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার দেহের ওজন ছিল ১২৬ পাউণ্ড, এখন তাহা ৯৮ পাউণ্ড হইয়াছে।

ধর্ম্ম ও জাতি—

২৭শে মে তারিখে মেজর লংডেন মহাবালেশ্বরে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আলোচনার সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নিকট বলিয়াছেন—"যে সমস্ত হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের জন্য স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবী করিতে পারে না।" মুসলমান সমাজের সকল নেতার এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ইউরোপে কম্যুনিষ্ট প্রাবল্য—

মিসেস্ ক্লেয়ার বুথ নিটস খ্যাতনামা মার্কিণ রাজনীতিক ও লেখক। তিনি সম্প্রতি ইউরোপ ঘুরিয়া গিয়াছেন। তিনি নিউইয়র্কে ফিরিয়া গিয়া গত ৩০শে মে জানাইয়াছেন ভারতবর্ষের লোক সোভিয়েটের সাহায্যের দিকে চাহিয়া আছে। ভারতের অধিকাংশ লোক সোভিয়েট নীতি সমর্থন করে ও তাহার পক্ষপাতী। ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই এখন সোভিয়েট প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। গ্রীস ও ইটালীতে শীঘ্রই সোভিয়েট নীতি অনুসৃত হইবে। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে এখনই কম্যুনিষ্টরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। চীনেও কম্যুনিষ্ট দল প্রবল। এমন কি মাঞ্চুরিয়া, মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে কম্যুনিষ্টরা সংখ্যায় কম নহে। জগৎ কোন দিকে চলিতেছে ?

চীনে কাপড় রপ্তানী—

চুংকিংএর এক সংবাদপত্রে প্রকাশ—সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে ৫ হাজার টন কাপড় চীনে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সময়ে ভারতের লোক বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইতেছে সে সময়ে এ দেশ হইতে চীনে বস্ত্রপ্রেরণ কেহই সমর্থন করিতে পারে না। সংবাদটি বিশ্বাস না করারও কোন কারণ নাই। কি ভাবে গোপনে চীনে পূর্ব্বে বস্ত্র প্রেরণ করা হইতেছিল তাহা প্রকাশিত হওয়ার পর সকলেই এ সংবাদে মর্ম্মাহত হইবেন। পরাধীন জাতির এই সকল গ্লানি সহ্য করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

ব্রহ্মদেশের অবস্থা—

ব্রহ্মদেশ যখন জাপানের অধিকারে ছিল, তখন বৃটেন ব্রহ্মবাসীদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহ দান করিয়াছিল। কিন্তু জাপানী বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা দান করা দূরে থাক, তাহাদের যুদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তী শাসনাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। জাপানীদের সময়ে তাহারা যে সকল অস্ত্র পাইয়াছিল, তাহা এখন বৃটীশের হাতে ফিরাইয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অনেক ব্রহ্মবাসী তাহাতে বাধা দিতেছে, ফলে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হইতেছে। ব্রহ্মদেশে যে সকল মার্কিণ সৈন্য আছে, তাহারা শুধু দর্শক হইয়া আছে। ব্রহ্মদেশের সকল স্থান এখনও জাপানী-মুক্ত হয় নাই। কাজেই সেখানকার অবস্থা এখনও সঙ্গীন বলা যায়।

বিলাতে ভারতীয় প্রার্থী—

মিঃ রজনী পামী দত্ত গ্রেট বৃটেনে কম্যুনিষ্ট দলের একজন নেতা ; তিনি এবার পার্লামেণ্টের সাহায্য পদপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি বার্মিংহামে ভারতসচিব মিঃ আমেরীর সহিত ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতীয় স্বাধীনতার দাবীর কথা সকলকে জ্ঞাপন করাই মিঃ দত্তের এই ভোটযুদ্ধে নামার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আশা করেন যে শ্রমিক দল তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী খাড়া করিবেন না। তিনি এবারকার নির্ব্বাচনে একমাত্র ভারতীয় প্রার্থী।

সতীশচন্দ্র স্মৃতি উৎসব—

গত ১১ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে বসুমতীর স্বর্গত স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম বার্ষিক স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রধান অতিথির আসনগ্রহণ করেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, মৃণালকান্তি বসু প্রভৃতি সতীশচন্দ্রের বিভিন্ন গুণের কথা

বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের ইতিহাসে সতীশচন্দ্রের দানের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল।

ডি-ভ্যালেরা ও মিঃ চার্চ্চিল—

যুদ্ধ জয় উপলক্ষে বেতার বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল ডি-ভ্যালারাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন—"ডি-ভ্যালেরার কার্য্যের দরুণ আয়র্লণ্ড আক্রমণ করার প্রয়োজন দেখা গিয়াছিল। কেবলমাত্র অপরিসীম বৃটীশ ধৈর্য্যের জন্যই তাহা হয় নাই।" মিঃ ডি-ভ্যালেরাও মিঃ চার্চ্চিলের উত্তর দিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—"আয়র্লণ্ডকে আক্রমণ করিলে বিশ্ব ইতিহাসের আর একটা অধ্যায় রক্তস্নাত হইত। আয়র্লণ্ড একক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে, সীমাহীন দুঃখদারিদ্র্য বরণ করিয়াছে।" কথাগুলি মিঃ চার্চ্চিলকে অবশ্যই বিব্রত করিবে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও যক্ষ্মা চিকিৎসা—

সকলেই জানেন যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার পক্ষ হইতে কলিকাতার মধ্যেই পাতিপুকুরে কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতিতে একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল পরিচালিত হইতেছে। আজ বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পাতিপুকুরের হাসপাতালে বহু দরিদ্র রোগী চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু অর্থাভাবে উক্ত হাসপাতালের প্রসার বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতেছে না। এজন্য বাঙ্গালা দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সাহায্য কলিকাতা ১৭০ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালের সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমরভূষণ রায় মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

সচ্চিদানন্দ সমাধি মন্দির—

গত ২৭শে মে তারিখে বর্দ্ধমান জেলার আমোদপুরে যাইয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজের (কলিকাতা বৈঠকখানার ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) সমাধি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উৎসবে পৌরহিত্য করিয়া আসিয়াছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বসাধারণের উপাসনার জন্য একটি মন্দির এবং পীড়িত সন্ন্যাসীদিগের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হইবে। উৎসবে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বামী প্রেমানন্দ গিরি প্রভৃতি কলিকাতা হইতে এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, শ্রীকুমার মিত্র, প্রভাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি বর্দ্ধমান হইতে যাইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ দরিদ্রের দুঃখে দরদী ছিলেন। তিনি হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেন—কাজেই তাঁহার সমাধি মন্দির হইতে যাহাতে উক্ত উভয় প্রকার কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সকলের নিকট বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছেন। স্বামীজি যে সেবার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, স্বামীজির সকল শিষ্যকে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

যুদ্ধ শেষ হয় নাই—

২০শে মে আয়র্লণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডি-ভ্যালেরা ঘোষণা করিয়াছেন যে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে অপেক্ষা করিতে হইবে। যুদ্ধ সবেমাত্র দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রবেশ করিতেছে। বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে জাতিই টিকিয়া থাকিতে চাহিবে, তাহাকে দেশরক্ষার ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে।

পরলোকে রামগোপাল মুখোপাধ্যায়—

গত ২৬শে মে শনিবার কলিকাতা খিদিরপুর বাকুলিয়া হাউসের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মেসার্স জি-ডি-ব্যানার্জি এণ্ড কোং লিঃএর অন্যতম ডিরেক্টার ছিলেন। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। সুদূর বদরিকাশ্রমে তিনি যাত্রীনিবাস করিয়া দেন ও দ্বারকা তীর্থে জলাভাব দূর করার ব্যবস্থা করেন। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে তিনি পিতার নামে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ধনী হইয়াও বিলাসী ছিলেন না। তাঁহার বিধবা পত্নী ও একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। যুদ্ধের অবস্থা জার্ম্মানীর প্রতিকূল হইয়া উঠিবার পর হইতেই সে মিত্রশক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হয়; বৃটেন্ ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থীদের নিকট সে নানাভাবে আবেদন জানায়—বলশেভিক বন্যা রোধ করিয়া ইউরোপকে বাঁচাও।

মধ্যপথে জার্ম্মানীর সহিত মীমাংসা করিবার জন্য মিত্রপক্ষীয় শিবিরের কেহ কেহ যে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু বৃটিশ ও মার্কিণ জনমত জার্ম্মানীর সম্পূর্ণ পরাজয় চাহিয়াছে; তাহাদের দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া চার্চ্চিল, ইডেন্ প্রভৃতি বৃটিশ রাজনীতিকরাও জার্ম্মানীর সহিত আপোষ করিবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের ফ্যাসিবিরোধী মনোভাব ইহার কারণ নয়—তাঁহাদের আশঙ্কা এই ছিল যে, স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে জার্ম্মানী যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে আবার সে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে।

কূটনৈতিক সংগ্রাম

ইউরোপে ট্যাঙ্ক ও কামানের সঙ্ঘর্ষ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে বলা চলে না। বরং প্রকৃত যুদ্ধ এখন আরম্ভ হইয়াছে। ক্লস্উইৎসের বিখ্যাত উক্তি—**War is the continuation of politics by other means.** অর্থাৎ অন্য উপায়ে রাজনীতির অনুসরণই যুদ্ধ। সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ চলিবার সময় যুদ্ধের এই রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট থাকে না—তখন সকলের অখণ্ড মনোযোগ শত্রুর প্রতি নিবদ্ধ। সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ শেষ হইবার পরই যুদ্ধের রাজনৈতিক দিকটা বড় হইয়া ওঠে। নাৎসী জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর স্বভাবতঃ ইউরোপে এখন কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে। মিত্রপক্ষের শিবিরে যাহারা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এক নয়। কেবল ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের সামরিক পরাজয়ের প্রয়োজনীয়তাই তাহাদের সকলের নিকট সমান। এই প্রয়োজন মিটিবার পর এখন পরবর্ত্তী প্রশ্নগুলি মাথা উঁচু করিয়াছে।

খাস জার্ম্মানীতে দেখা যাইতেছে—নাৎসী রাষ্ট্রের সামরিক পরাজয়ের পরও সেখানে নাৎসীবাদ বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রথমে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ডোয়েনিৎস্কে দিয়া তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চলের শাসনকার্য্য চালাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এখন ঝুনা নাৎসীরা বৃটিশের নিকট অত্যন্ত সুব্যবহার পাইতেছে। যে সব অত্যাচারী নাৎসী যুদ্ধাপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের শাস্তি বিধান সম্পর্কে দীর্ঘসূত্রতাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সর্ব্বোপরি, বৃটিশ বন্দিশিবিরে লক্ষ লক্ষ আন্‌কোরা নাৎসী জিয়ানো আছে। রুশিয়ার যুদ্ধের বন্দীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাদের প্রতিনিধিদের দ্বারাই "ফ্রি জার্ম্মাণ কমিটী" গঠিত হয়। কিন্তু বৃটেনে জার্ম্মান বন্দীরা পুরাপুরি নাৎসী রহিয়া গিয়াছে। মনে করা অন্যায় নয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের বন্দী নাৎসী সেনাবাহিনীকে অবিকৃত রাখিয়াছেন।

সোভিয়েট রুশিয়া নাৎসীবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চায়। কিন্তু জার্ম্মাণ জনসাধারণের সহিত তাহার কোন বিরোধ নাই। বরং নাৎসী প্রভাবমুক্ত জার্ম্মান জনসাধারণকে স্বপ্রতিষ্ঠ করাই তাহার নীতি। জার্ম্মানীর সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের নাৎসী প্রভাবমুক্ত জনসাধারণ সোভিয়েটের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে—এই আশঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদীরা জার্ম্মানীর অন্য দিকে নাৎসীদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। রুশিয়ায় জার্ম্মান বন্দীদিগকে সংশোধন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়াও বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের বন্দী সম্পর্কে সেরূপ কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইহার কারণ—সোভিয়েটের প্রভাবাধীন জার্ম্মান বন্দীদের বিরুদ্ধে তাঁহারা তাঁহাদের শিবিরের বন্দীদিগকে ব্যবহার করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন। এখন সেই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে। এখন সোভিয়েট রুশিয়ার অধিকৃত জার্ম্মাণ অঞ্চলের বিরুদ্ধে ছোট বড় সব নাৎসীকে প্রয়োগ করিবার সুকৌশলী আয়োজন দেখা যাইতেছে।

পোল্যাণ্ডের সমস্যা

পোল্যাণ্ডের সমস্যা আবার নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে। ইয়াণ্টায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, পোল্যাণ্ডের বাহিরের ও পোল্যাণ্ডের ভিতরের বিশিষ্ট লোকদিগকে পোলিস্ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঐ গভর্ণমেণ্ট আরও প্রসারিত করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা লইয়া মতবিরোধ ঘটে। সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট প্রসারিত করা ইয়াণ্টার সিদ্ধান্ত; সে তাহাই করিতে চায়। অন্য পক্ষে বলা হইতেছে যে, পোলিস্ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে নূতন করিয়া গড়া ইয়াণ্টার সিদ্ধান্ত।

এই বিতর্কের সময়ে লণ্ডনের পিঞ্জরাপোল্ হইতে স্বয়ম্ভু পোলিস্ নেতারা আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে যে, ১৬ জন পোলিস্ নেতাকে সোভিয়েট রুশিয়া গুম্ করিয়াছে। ওয়াশিংটনে মঃ মলোটভকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি স্পষ্ট বলেন যে, লালফৌজের সামরিক তৎপরতায় বাধা দিবার অপরাধে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাতে মিঃ ইডেন ও ষ্টেটিনিয়াস্ পোল্যাণ্ড সম্পর্কিত আলোচনা স্থগিত রাখিয়া এই সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ জানিতে চান। ইহার পর মার্শাল ষ্ট্যালিন্ জানাইয়া দিয়াছেন যে, ধৃত ১৬ জন সামরিক তৎপরতায় বাধা দিয়া অপরাধ করিয়াছে। তাহাদের সহিত পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনার কোন সম্পর্ক নাই; আলোচনা করিবার জন্য তাহাদিগকে কেহ আমন্ত্রণও করে নাই।

প্রকৃত কথা এই—লণ্ডনের প্রতিক্রিয়াপন্থী পোলদিগকে—অন্ততঃ

আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবার নূতনভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ১৬ জন পোল্ উপলক্ষ মাত্র। তবে, ইহাও ঠিক যে, সোভিয়েট রুশিয়া একটুও দমিবে না। শেষ পর্য্যন্ত সে পোল্যাণ্ডের জনমতের নিকট আবেদন জানাইতে বলিবে। এই আবেদনের ফল নিশ্চয়ই তাহার অনুকূল হইবে।

ত্রিয়েস্ত প্রসঙ্গ

যুগোশ্লেভিয়ার টিটোকে মিত্রশক্তি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু প্রগতিপন্থীদের প্রভুত্বাধীন যুগোশ্লেভিয়াকে তাঁহারা শক্তিশালী হইয়া উঠিতে দিতে পারেন না।

আড্রিয়াতিকের তীরে ত্রিয়েস্ত বন্দর লাভ করিলে যুগোশ্লেভিয়ার বিশেষ সুবিধা হয়। ইহার কারণ ডাল্মেসিয়ান উপকূল পার্ব্বত্য; সেখানে ভাল বন্দর নাই। অবশ্য মার্শাল্ টিটো জোর করিয়া ত্রিয়েস্ত অধিকার করিতে চান নাই; তিনি বলিয়াছিলেন—যুগো-শ্লাভ সৈন্য ত্রিয়েস্তকে শত্রুর কবলমুক্ত করিয়াছে; কাজেই শান্তিবৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রিয়েস্ত যুগোশ্লোভিয়ার হাতে থাকুক। ইহাতে মার্শাল আলেকজাণ্ডার উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সেনা-বাহিনীর উদ্দেশ্যে এক "যুদ্ধংদেহী" বাণী প্রদান করিয়াছিলেন। মিঃ চার্চ্চিলও কৌশলে গরম গরম কথা শুনাইয়াছেন। কিন্তু কৌতুহলের বিষয় যে, ত্রিয়েস্ত যুগোশ্লেভিয়ার হাতে থাকায় যদি আপত্তির কারণ থাকে, তাহা হইলে বৃটিশ সৈন্যের অধিকারভুক্ত উহা থাকে কেমন করিয়া? এই অঞ্চলে বৃটেনের কোন্ নৈতিক অধিকার আছে?

অথচ, ত্রিয়েস্তে যুগোশ্লেভিয়ার দাবীই সঙ্গত। রোম্যান সাম্রাজ্যের আমলে ত্রিয়েস্ত ইতালীর ছিল। তাহার পর কিছু দিন ত্রিয়েস্ত স্বাধীন ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভেনিস্ এই বন্দরটি অধিকার করে। ইহার পর প্রায় দুই শত বৎসর ত্রিয়েস্ত ও ভেনিসের মধ্যে বিরোধ চলে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ত্রিয়েস্ত অষ্ট্রিয়ার হাতে যায়। তদবধি—কেবল নেপোলিওঁর আমলে ১৭ বৎসর ছাড়া—ত্রিয়েস্ত অষ্ট্রিয়ারই ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটেন্ ইতালীকে এই মর্ম্মে গোপন প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে যুদ্ধান্তে দক্ষিণ টাউরোল্ ও ত্রিয়েস্ত তাহাকে দেওয়া হইবে। যুদ্ধের পর অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কতক অঞ্চল সার্ব্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর সহিত সংযুক্ত করিয়া যখন যুগোশ্লেভিয়া রাজ্য গঠিত হয়, তখন শ্লোভেন্ জাতির পক্ষ হইতে ত্রিয়েস্ত দাবী করা হয়। এদিকে ইতালীয়রা তাহাদিগকে প্রদত্ত গোপন প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জিদ্ করিতে থাকে।

এই পরস্পর-বিরোধী দাবী সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার ভার পড়ে মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উইল্সনের উপর। তিনি বৃটেনের প্রদত্ত গোপন চুক্তি উপেক্ষা করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, ত্রিয়েস্তে সঙ্গত দাবী যুগোশ্লেভিয়ার। তখন ইতালী বলপূর্ব্বক ত্রিয়েস্তের নিকটবর্ত্তী ফিউম অধিকার করে। মিত্রশক্তি সেখান হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করেন নাই। ক্রমে ইতালীয়রা ফিউম ও ত্রিয়েস্ত সহ সমগ্র ইষ্টিরিয়া উপদ্বীপ অধিকার করিয়া বসে।

এইভাবে ত্রিয়েস্ত ইতালীয়দের হাতে আসিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালীর স্বাধীনতার ঋষি ম্যাৎসিনি ত্রিয়েস্ত পর্য্যন্ত ইতালীর সীমানা কখনও দাবী করেন নাই। ভেনিসের নাবিকরাই ত্রিয়েস্তকে ইতালীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন করে। সে যাহা হউক, মার্শাল টিটোকে যদি বর্ত্তমান ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া ত্রিয়েস্ত সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে এই ব্যাপারের সঙ্গত মীমাংসা হইয়া যাইত।

প্রকৃত কথা এই—যুগোশ্লেভিয়াকে আড্রিয়াতিকের শ্রেষ্ঠতম বন্দরটি দেওয়ায় বৃটেনের আপত্তি আছে; আড্রিয়াতিকের তীর পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিস্তৃতি ঠেকাইবার জন্য সে শেষ চেষ্টা করিতেছে। বৃটেন আশা করে—ইতালীকে সে সায়েস্তা রাখিতে পারিবে; গ্রীসে বামপন্থীদিগকে দাবাইয়া রাখা অসম্ভব হইবে না; স্পেনে ফ্রাঙ্কোকে সরাইতে হইলেও সেখানে একটা গোঁজামিল দেওয়া চলিবে। এই ভাবে বৃটেন্ তাহার ভূমধ্যসাগরের পথটি নির্ব্বিঘ্ন রাখিবার কথা ভাবিতেছে। কম্যুনিষ্ট-প্রভাবান্বিত যুগোশ্লেভিয়াকে আড্রিয়াতিকে প্রবেশপথ দিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই সংযোগসূত্রের নূতন বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। কেবল প্রবেশপথই বা বলি কেন—ইষ্টিরিয়া উপদ্বীপ ও ত্রিয়েস্ত-ফিউম্ যাহার হাতে থাকিবে, সমগ্র আড্রিয়াতিক সাগরেই তাহার প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে।

সীরিয়া ও লেবানন্

১৯৪৩ সালের হাঙ্গামার পর সীরিয়া ও লেবানন্ স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইলেও ফরাসী স্বার্থ রক্ষার জন্য সেখানে কিছু সৈন্য রাখা হইয়াছিল। এই সব সৈন্য ক্রমে ক্রমে সরাইবার কথা। কিন্তু গত মে মাসে ফরাসী সরকার সীরিয়া ও লেবাননের সৈন্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব তীরে আবার আগুন জ্বলিয়া ওঠে। স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বহু সীরিয়াম্ ও লেবানীজ গত কয়েক দিনে প্রাণ দিয়াছে।

বৃটেন্ মহানুভবতা দেখাইয়া সীরিয়া ও লেবাননের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহার ফলে ফরাসী সেনাবাহিনী এখন সরাইয়া লওয়া হইয়াছে; সীরিয়া ও লেবাননে কতকটা শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

বৃটেন চাহিতেছে—মধ্য প্রাচ্যের ব্যাপারে তাহার ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মোড়লী করিবার অধিকার থাকুক। এইজন্য সে তাড়াতাড়ি সীরিয়া ও লেবাননের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু দ গল্ তাহা হইতে দিবেন না—তিনি সোভিয়েট রুশিয়াকে আহ্বান করিবেন। একলা ফ্রান্সের মধ্যপ্রাচ্য হইতে সরিয়া আসিবার হিতকথা দ গল্ বৃটেনের নিকট হইতে শুনিবেন না। তিনি চাহিবেন—মিত্রপক্ষের প্রধান শক্তি-গুলি একত্র হইয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করুক; সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবিহীন সোভিয়েট রুশিয়ার উপরই তিনি এই সম্পর্কে বেশী নির্ভর করিবেন।

৩।৬।৪৫

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
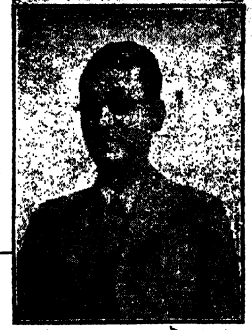
ফুটবল লীগ ঃ

কলকাতার মাঠে আবার ফুটবল মরসুম ফিরে এসেছে। আবার মাঠে সেই জনসমুদ্রের জোয়ার ভাটা, পরিশ্রান্ত দেহ মনে আশা নিরাশার উঠানামা। লীগ খেলায় গত কয়েক বছর উঠানামা স্থগিত কিন্তু লীগ চ্যাম্পিয়নসীপ নিয়ে জল্পনা কল্পনা এবং উত্তেজনার কোন অভাব নেই। বলতে কি আগের তুলনায় যে বেড়ে গেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় চ্যারিটি খেলায় টিকিটের চাহিদা দেখে।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় গত দু'বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। ১১টা খেলায় তাদের পয়েণ্ট উঠেছে ১৯। একটা খেলাতেও হারেনি। মোহনবাগানের দুর্ভাগ্য যে লীগের খেলার গোড়াতেই নবাগত দু'জন খেলোয়াড় গুরুতর আহত হয়ে খেলা থেকে ঐ দিন থেকেই অবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন। ওদিকে বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা খেলোয়াড় বুচি রাঁচিতে মকফাইট করতে গিয়ে হাতে আঘাত পাওয়ায় ঠিক সময়ে লীগের খেলায় যোগ দিতে পারলেন না। আক্রমণভাগ খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। গোল দেবার বহু সুযোগ পেয়েও গোল দেবার লোক পাওয়া যায় না। আক্রমণভাগে একমাত্র নির্ম্মল চ্যাটার্জির খেলাই উল্লেখ-যোগ্য। গোল করার বহু বল দিয়েও হতাশ হয়ে নিজেকে শেষ চেষ্টা করতে দেখা গেছে। ফলে অনেক সময় তাঁর খেলার বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। যদি একজন ভাল ইন্‌ম্যান থাকতো তাহলে তাঁর খেলাও খুলতো এবং গোল সংখ্যাও বৃদ্ধি পেত। নিমু বোস এবং বিজন বোস সবদিন সমান খেলতে পারেন না। হাফব্যাক লাইনে দীপেন সেনের খেলা এবার অনেক পড়ে গেছে; ফলে লেফট্ ব্যাক পান্না তাল সামলাতে না পেরে এক একদিন বেশ বেসামাল হচ্ছেন। উভয়ের মধ্যে একান্ত বোঝাপড়ার অভাব থাকার জন্য খেলা ঢিলে পড়ছে। ক্যাপটেন অনিল দে লীগের প্রথম দিকের কয়েকটা খেলায় প্রথম শ্রেণীর খেলা দেখিয়েছেন। সমস্ত দল যে তাঁর অধিনায়কত্বে খেলছে তার পরিচয় বহুবার খেলায় পাওয়া গেছে। তাছাড়া তাঁর জুড়ী শরৎ দাসের খেলার সঙ্গে খুব ভাল রকম বোঝাপড়া থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হয় না। কলকাতার মাঠে শরৎ দাসকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ব্যাক বলা যায়। এবং কলকাতা যদি বাংলা দেশের ফুটবল খেলার প্রধান কেন্দ্র হয় তাহলে তাঁকে বাঙ্গলা দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যাক বললে ভুল বলা হবে না। ছোটখাট মানুষটি, ব্যাকের পক্ষে কম অসুবিধার নয়; কিন্তু তাঁর প্রখর উপস্থিত বিচার বুদ্ধি এ অসুবিধাকে অতিক্রম করে তাঁর খেলাকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে। শরীরটী এমনই তৈরী যে তালগোল পাকিয়ে উলটে পালটে গিয়েও দেখা গেল শরৎ দাস ঠিক আছেন, বল এদিকে বিপদ গণ্ডীর বাইরে চলে গেছে। মোহনবাগানের এবার তিনজন গোলরক্ষক। রাম ভট্টাচার্য্য, ডি সেন ও চঞ্চল। রামের খেলা আগের থেকে পড়েছে। মোহনবাগান ৯টা খেলে একটাও গোল খায়নি। প্রথম গোল হ'ল ক্যালকাটার সঙ্গে খেলে। রামই ২টো গোল খায়। দ্বিতীয় গোলটি পেনালটি থেকে হয়। সট খুব শক্ত ছিল না, সোজা বল হাতে ধরেও পড়ে গোলে ঢুকে যায়। ডি সেন ও চঞ্চলের খেলার মধ্যে এ পর্য্যন্ত মারাত্মক ত্রুটি দেখা যায়নি। ফরওয়ার্ডে বুচি এসে যোগদান করেছেন। তাঁর হাত এখনও সম্পূর্ণ সারে নি। সেই কারণে খেলায়

আড়ষ্ট ভাব থাকলেও পূর্ব্বের তুলনায় দলের আক্রমণের খেলা কিছু উন্নত হয়েছে মনে হয়। বুচির বল আদান-প্রদানের পদ্ধতির মধ্যে নূতনত্ব আছে। আরও খুব পরিশ্রম করেই খেলছেন।

লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। ১১টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট হয়েছে। ভবানীপুরের সঙ্গে খেলায় গোলের বহু সুযোগ পেয়েও শেষে ১—০ গোলে প্রথম হেরে যায়। এরিয়ান্সের দিন বলতে গেলে সৌভাগ্য-ক্রমে খেলার শেষ মুহূর্ত্তে গোল পরিশোধ ক'রে খেলা ড্র ক'রে পরাজয়ের হাত থেকে বেঁচে যায়। ইষ্টবেঙ্গলের ফরওয়ার্ড লাইনে সোমানা, আপ্পারাও, পাগসলে, সুনীল ঘোষ ও সুশীল চ্যাটার্জি নামকরা খেলোয়াড় খেলছেন। গোল করবার বহু সুযোগ পেয়েও এই দলটিকে সেই পরিমাণ গোল দিতে দেখা যাচ্ছে না। হাফব্যাকে কাইজার ব্যাকে পরিতোষ ও রাখাল এবং গোলে কে দত্ত সকলেই নামকরা। গোলে কে দত্ত থাকায় দলের অন্য খেলোয়াড়রা অনেকখানি ভরসা পেয়ে খেলতে পারবেন।

ভবানীপুর ক্লাব ১০টা খেলে ১৮ পয়েন্ট করে দ্বিতীয় স্থানে আছে। ভবানীপুর ক্লাবে এবার অনেক নতুন খেলোয়াড় এসেছে। ইসমাইল, বাচ্চি খাঁ, জুম্মা তাজ-মহম্মদ এবং কে রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। লীগে এই দলটি এ পর্য্যন্ত ভালই খেলেছে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ৩-২ গোলে এবং ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে ১-০ গোলে জয়ী হয়ে তারা এই দল দুটীকে এবার লীগে প্রথম হারাবার কৃতিত্ব লাভ করেছে। লীগ তালিকায় এরিয়ান্সের খুব ভাল স্থান না হলেও মাঝে মাঝে তারা শক্ত দলের সঙ্গে ভাল খেলেছে। ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে ভাল খেলে মন্দ ভাগ্যের জন্যে তারা খেলা ড্র করেছে। তাদের বিরুদ্ধে গোলটি অফ্ সাইড থেকে হয়েছে বলে অনেকেরই মত।

গতবারের শীল্ড বিজয়ী বি এণ্ড এ রেলদলে অনেক নামকরা খেলোয়াড় সত্ত্বেও লীগে তারা এমন কিছু ভাল স্থানে নেই। এক একদিন ভাল খেলে আবার খেলায় ঢিলে দেয়। অথচ আক্রমণ ভাগে তাদের থেকে দ্রুতগামী খেলোয়াড় খুব কম দলেরই আছে। রক্ষণভাগও শক্তিশালী। গোলে পি ঘোষ, ব্যাকে মজুমদার, সেণ্টার হাফ মোহিনী ব্যানার্জি, নীলু মুখার্জি, ফরওয়ার্ডে আলাউদ্দিন, অমল মজুমদার, ও নন্দীর খেলা উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় দলের মধ্যে ক্যালকাটা গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার অনেক শক্তিশালী হয়েছে। জল পড়লে তাদের খেলা আরও ভাল হবে আশা করা যায়।

প্রথম বিভাগে কোন দল লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পাবে তা খেলা দেখে নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। কোন দলেরই খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলে কিছু নেই। মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এই তিনটি দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা খেলায় যে পরিমাণ গোল দেবার সুযোগ পায় তার কিছুটার সদ্ব্যবহার হ'লে দর্শকদের কাছে খেলা উপভোগ্য হ'ত এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডও ভাল হ'ত। এই তিনটি দলের জনপ্রিয়তা খেলার মাঠে বেশী বলেই এদের নাম উল্লেখ করলাম। অনেক সময় দুর্ব্বল দলের আক্রমণ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বল আদান প্রদান এবং খেলায় বোঝাপড়া উপভোগ্য হয়েছে। নামকরা এই তিনটি দল তাদের খেলায় Teritorial advantage পেয়েও দেখা গেছে হয় হেরেছে কিম্বা কোন রকমে মান রক্ষা করেছে। গোলের মুখে বল নিয়ে গিয়ে গোল দিতে না পারার কারণ উপযুক্ত অনুশীলনের অভাব। খেলার সারাক্ষণের মধ্যে কোথাও সত্যিকারের খেলা না পাওয়ার জন্যে দর্শকরাও বিরক্ত হয়ে কটু সমালোচনা করতে দ্বিধা বোধ করে না।

মহামেডান স্পোর্টিং ১১টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট ক'রে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে সমান পয়েন্ট করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

৭।৬।৪৫

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "মরা নদী"—৩৲
শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বালিগঞ্জের ট্রামে"—২॥০
প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত উপন্যাস "আহুতি"—২।০
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অভিনয় নয়"—২॥০
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "রবি-তর্পণ"—১॥০
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত রহস্যোপন্যাস "কালবৈশাখীর ঝড়"—১৲
প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত "জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ"—২৲
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কণ্ট্রোলের শাড়ী"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীরাধাচরণ বাগচী   অতীতের স্বপ্ন   ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

বলাকা

শিল্পী—শ্রীপান্না সেন

শ্রাবণ—১৩৫২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি, ডি-লিট্

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল, (১) ব্রহ্মতুল্য (২) দেবতুল্য (৩) যাহারা নিজেদের প্রাচীন জনশ্রুতি মানে, (৪) যাহারা নিজেদের প্রাচীন জনশ্রুতি মানে না এবং (৫) যাহারা নিকৃষ্ট জীবন যাপন করে। যাহাদের জন্ম পিতৃ ও মাতৃকুলে সাত পুরুষানুক্রমে উচ্চ ও বিশুদ্ধ, যাহারা ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করে, চারি বেদ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক পুস্তক সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে এবং অধ্যাপনা কার্য্যে রত থাকে, কালক্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া যাহারা নির্জনে ভগবদ্ চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করে তাহারাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ যৌবনে ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিত। কেবলমাত্র পুত্রার্থে যথা-সময়ে স্ত্রী-সহবাস করিত; অন্যথা কঠোর সাত্ত্বিক নিয়ম পালন করিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়া তাহাদের প্রাচীন জনশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিত। চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ সমাজের বিভিন্নস্তরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিত এবং পুত্রার্থে সঙ্গমে অসংযত ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ হইতে পঞ্চম শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের প্রভেদ এই যে, জীবিকা উপার্জনের নিমিত্ত তাহারা নানাবিধ বৃত্তি অবলম্বন করিত, যথা—কৃষিকার্য্য, ব্যবসা, গো-মহিষাদি প্রজনন, সৈনিকের কার্য্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের জীবনে একদিকে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, সম্যক জ্ঞানলাভ, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহ এবং অন্যদিকে বিপরীত গুণগুলি দেখা যায়।

বেদ এবং তাহার আনুসঙ্গিক বিজ্ঞান ও কলা অধ্যয়নে, রাজ্যের এবং প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য এই সকল বিষয়ের অধ্যাপনা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে পৌরোহিত্য করা ব্রাহ্মণগণের কেবলমাত্র পেশা ছিল। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ব্রাহ্মণেরা আশ্রমে [illegible]

সমাজে স্থান পাইত। পুরোহিত, সভাসদ বা মন্ত্রীরূপে ব্রাহ্মণেরা রাজসেবা করিত। যাজ্ঞিক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সহকারীরূপে কার্য্য করিত। তাহারা বৈদিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থান অধিকার করিত। সময়ে সময়ে রাজদূতের কার্য্যও করিত। সেনাপতি, সৈনিক, সারথী, হস্তী-শিক্ষক, আইনজ্ঞ এবং বিচারক, পুরোহিত, চিকিৎসক, ঔষধপ্রস্তুতকারক, জ্যোতিষিক, সৌধশিল্পী, লোকপ্রিয়গাথা-আবৃত্তিকারী এবং ঘটকের কার্য্য তাহারা করিত। ইহা ব্যতীত তাহারা নানাবিধ ব্যবসা করিত। দান ও ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করিতে হইত বলিয়া ব্রাহ্মণগণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না।

রাজদরবারে পুরোহিতের স্বতন্ত্র স্থান ছিল। সে আংশিক রাজকার্য্য করিত। অন্যান্য রাজকর্মচারীর অপেক্ষা তাহার আধিপত্য অধিক ছিল। রাজকুল-পুরোহিত বলিয়া সে রাজাকে লৌকিক ও পারত্রিক বিষয়ে পরামর্শ দিত। আচার্য্যও যজ্ঞ-পুরোহিতের কার্য্য করিত এবং রাজা ও রাজপরিবারের হিতের জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিত। অমঙ্গল দূর করিবার জন্য সে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সাহায্যে যজ্ঞ করিত। রাজার কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে সে কোন নিদর্শনের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করিত। রাজার শিক্ষক, ক্রীড়াসঙ্গী অথবা সহপাঠিগণের মধ্য হইতে রাজপুরোহিত নির্বাচিত হইত। ইহার কারণ এই যে রাজা সুখে দুঃখে তাহাকে প্রকৃত বন্ধুরূপে বিশ্বাস করিতে পারিত। রাজকোষ রক্ষা করা তাহার অন্যতম কার্য্য ছিল। কখন কখন তাহাকে বিচারকের কার্য্য করিতে হইত।

একই পরিবারের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে রাজ-পুরোহিতের কার্য্যে রত ছিল এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল না হইলেও পুরোহিতের পদ পুরুষানুক্রমিক ছিল না। যজ্ঞ এবং বিভিন্ন পর্ব ও উৎসব উপলক্ষে পুরোহিত যে দক্ষিণা পাইত তাহাই তাহার আয় ছিল।

প্রাচীন রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ সভাসদ ও মন্ত্রীর কার্য্য করিত। তাহারা ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। তাহাদের সততা ও যোগ্যতার উপর সুশৃঙ্খলভাবে রাজকার্য্য-পরিচালনা নির্ভর করিত। তাহারা কূটরাজনীতিজ্ঞ ও শাসননীতিজ্ঞ ছিল। মগধের একজন ক্ষমতাশালী রাজার দুইটী সুযোগ্য মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পাটলিগ্রাম সুরক্ষিত এবং পাটলিপুত্র নগর গঠিত হইয়াছিল। একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর কৌশলে একটী বলশালী প্রজাতন্ত্রের একতা নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ-সন্তান চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত শক্তিশালী মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

কাশীর রাজপুরোহিতের ব্রাহ্মণ-স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় আশ্চর্য্যজনক ধনুর্বিদ্যার কৌশল প্রদর্শন করিয়া পাঁচশত ধনুর্বিদ্‌কে সে পরাস্ত করে এবং ইহার ফলে তাহার মাসিক বেতন বৃদ্ধি পায়। ভরদ্বাজ গোত্রীয় একটী ব্রাহ্মণ কৃষক ছিল। তাহার জমি কর্ষণ করিতে পাঁচশত লাঙ্গলের প্রয়োজন হইত। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কৃষকের কার্য্য অবলম্বন করিয়া নিজেই জমিতে লাঙ্গল দিত এবং তাহার পুত্র রাজদরবারে সামান্য ভৃত্যের কার্য্য করিত। ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে লাঙ্গল পরিচালনা করিত বহু দৃষ্টান্ত ইহার পাওয়া যায়। পাঁচশত মালবাহী শকট বোঝাই করিয়া কোন একজন ধনী ব্রাহ্মণ ভারতের পূর্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যবসা করিত। সাধারণ ব্রাহ্মণ ব্যবসা ও ফেরিওয়ালার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিত। একজন ব্রাহ্মণ সূত্রধর অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মালবাহী শকট প্রস্তুত করে। একজন ব্রাহ্মণযুবক মৃগয়ালব্ধ পশু বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত।

নৃপতিগণের নিকট হইতে চিরস্থায়ীভাবে ভূমি ও স্থায়ীবৃত্তি লাভ করিয়া প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। উত্তর ভারতের চতুর্দ্দিকে বন্যভূমি, শস্যভূমি ও তৃণক্ষেত্রযুক্ত বহু ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। ধনী ব্রাহ্মণ-গণ এই সকল ভূমির রাজস্ব উপভোগ করিত। বিচার কার্য্যে ও বেসামরিক কার্য্যে তাহাদের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল।

ব্রাহ্মণগণ উৎপীড়ন ও মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত। যে সকল ভূমি তাহারা স্থায়ী বৃত্তি হিসাবে প্রাপ্ত হইত সেগুলির জন্য তাহাদের কোন কর দিতে হইত না। ব্রাহ্মণগণের এই সুবিধা সম্বন্ধে বৌদ্ধ সাহিত্যে কোন উল্লেখ নাই। অপরাধী ব্রাহ্মণ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হইত। পার্থিব ও অপার্থিব কর্তব্য ব্রাহ্মণের পালনীয়, এরূপ উল্লেখ বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বুদ্ধের সময়ে উদীচ্য ব্রাহ্মণগণ কুরু-পঞ্চালদেশীয় বা কুরু-পঞ্চাল-বংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইহারা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণগণের অবস্থার উন্নতি হয় এবং আরণ্যক যুগে তাহাদের মত সসম্মানে গৃহীত হইত।

মাতৃদায়

শ্রীকানাই বসু

এক মাথা রুক্ষ বড়ো বড়ো চুল, গলায় এক খণ্ড মলিন উত্তরীয়--তাহার দুই প্রান্ত এক করিয়া মধ্যে একটা চাবি বাঁধা, পরণের ধুতিতে পাড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বেশভূষা বাঙ্গালী সমাজে অতি পরিচিত। তাই ছোকরা যখন টেবিলের ধারে আসিয়া বলিল, আমার মাতৃদায় বাবু, তখন সে খবর কাহারও কাছে নূতন শুনাইল না,কেহ বিস্মিতও হইল না। করুণ সুরে ছেলেটি বলিল, ঘাট কামাবার পয়সা নেই বাবু, যদি দয়া করে কিছু সাহায্য করেন তবে দায় উদ্ধার হয়। কেউ নেই বাবু আমার, দুটা ছোট ছোট ভাই বোন, বাপ নেই—

বলিতেছিল বড়বাবুর কাছে। বড়বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—এখানে কিছু হবে না, যাও, যাও।

ছেলেটা নিরুৎসাহ হইল না। হাত দুইটা জোড় করিয়া কহিল, বাবু, গরীবের মাতৃদায়, আপনারা দয়া না করলে কী করে উদ্ধার হব বাবু। আপনারাই গরীবের মা বাপ। কিছু দয়া করুন বাবু।

বড়বাবু পঞ্চাননবাবু রাশভারি লোক। কথা কহেন অল্প এবং তাহাও ধীরে ও অনুচ্চ কণ্ঠে, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার কথা শ্রুতও হয়, পালিতও হয়। ধীরে ধীরে বলিলেন—তা জানি, কিন্তু এটা আপিস, এখানে ওসব চলবে না, যাও।

ছেলেটা হাতজোড় রাখিয়াই অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিজের মনেই বলিল--কী করে আমি কী করব। কেউ কিছু দেবেন না, হা ভগবান! ধীরে ধীরে সে বড়বাবুর টেবিল হইতে সরিয়া আসিল। বড়বাবুর পাশের টেবিল শৈলেন টাইপিষ্টের। তাহার জমকালো গোঁফ জোড়ার পানে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈলেন দেখলে না, তাহার মেশিন বাজিয়া চলিল—খট্ খট্ খটা খট্।

মিনিট দুয়েক কাটিয়া গেল। শৈলেন মেশিন হইতে কাগজ বাহির করিয়া নূতন কাগজ পরাইল, তাহাতে কার্ব্বন পেপার চড়াইল, তারপর ছাপিতে শুরু করিয়া হঠাৎ থামিয়া ছেলেটির দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। আশায় ও সাহসে ভর করিয়া ছেলেটি বলিল—বাবু আমার মাতৃ—

শৈলেন ইতিমধ্যে তাহার গোঁফের প্রান্তে পাক দিতেছে। বড় গোঁফের চাষ করিতেছে সে বেশী দিন না। উহার প্রতি তাহার যত্নের অন্ত নাই। সে পাক দেওয়া গুম্ফপ্রান্ত টানিয়া চোখের কোণ দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—মাতৃদায়, শুনেছি।

—আজ্ঞে আপনারা—

—দয়া না করলে কী করে উদ্ধার হব, তাও শুনেছি। কেউ নেই বাবু, তাও শুনেছি।

বলিয়া শৈলেন গভীর মনোযোগ সহকারে দুইটি গুম্ফাগ্র টানিয়া নিরীক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া মেসিনে হাত লাগাইল ও বলিল—ওসব চালাকি এখানে চলবে না, পথ দেখ।

ছেলেটি কিছুক্ষণ পুনরায় খট্ খটাখট্ শুনিয়া সরিয়া গেল। আর কথা কহিবার সাহস তাহার আসিল না। একে একে সকলের টেবিলেই নিরাশ হইয়া সে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এবার বাহির হওয়াটাই বাকী। কিন্তু শুধু হাতে বাহির হইতে তাহার মন সরিল না। সে আবার শৈলেনের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—বাবু!

শৈলেন মুখ না তুলিয়া বলিল—ফের তুমি বিরক্ত করছ?

বড়বাবু কহিলেন--আপিসের মধ্যে ভিক্ষে করতে আসা, তোদের আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। যা পালা।

কিন্তু সে গেল না। এক দৃষ্টিতে শূন্য পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

—তবু দাঁড়িয়ে আছে? আরে যা—, বলিতে বলিতে চোখ তুলিয়া সেই ম্লান মুখখানা দেখিয়া শৈলেনের মুখের তাড়না মুখেই বাধিয়া গেল। বলিল—এই, শোন।

ঈষৎ আগাইয়া আসিয়া ছেলেটি বলিল—আজ্ঞে?

—সত্যি সত্যি মা মরেছে তোর?

—কী বলছেন?

—বলছি, সত্যিই মা মরেছে না বুজরুকি?

চাদরে চোখ মুছিয়া সে উত্তর দিল—আজ্ঞে, আপনার কাছে বুজরুকি কী করব বাবু। বিশ্বাস না হয় তো চলুন আমার সঙ্গে। কেউ নেই বাবু দুটি ছোট ছোট ভাই বোন—

—বাড়ী কোথা তোর?

—আজ্ঞে বাড়ী? বাড়ী আমাদের আমতার উদিকে। ইষ্টিশন থেকে দু কোশ হবে।

—নাম কী? বাপ আছে?

—আজ্ঞে নাম? আমার নাম সাধন।

—বাপের নাম?

পঞ্চাননবাবু বলিলেন—আঃ, কী বাজে বকছ শৈলেন। বাপের নাম। ঠাকুরদার নাম—সাত পুরুষের কুটুম্বিতের খবর—হুঃ, তোমারও যেমন কাজ নেই। যত জোচ্চোর জুটেছে।

শৈলেন কিছু বলিবার পূর্ব্বে সাধনই জবাব দিল। চাদরের এক কোণ হাতে জড়াইতে জড়াইতে একবার বড়বাবুর একবার শৈলেনের প্রতি চাহিয়া বলিল—জুচ্চুরি নয় বাবু। আপনি দয়া করে যদি পায়ের ধুলো দেন তো দেখবেন আমাদের অবস্থা। বাবা কোথায় চলে গেছে অনেক দিন। মা বাবুদের বাড়ী কাজ করে সংসার চালাতো। আট দিন আগে বাসন ধুতে গিয়ে পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়েছিলো—কী করে চলবে বাবু যে বাজার পড়েছে—

গোঁফ পাকাইতে পাকাইতে শৈলেন ধমক দিল—বাজারের খবর আমরা খুব জানি। তোর নিজের খবর বল। বাপের নাম কী?

—আজ্ঞে বাপের নাম? বাপের নাম হরিদাস। দিন কিছু দয়া করে বাবু।

—হুঁ, তুই কাজ করিস না কেন?

—আজ্ঞে কাজ? কাজ করতুম বাবু, কারখানায়। হঠাৎ জবাব দিয়েছে। অনেক দূর যেতে হবে। ছোট বোনের অসুখ—

শৈলেন মণিব্যাগ খুলিয়া একটা আনি বাহির করিয়া বলিল—দেখ্‌, ঠকাচ্ছিস না তো? মা তোর মরেছে সত্যিই তো। যদি কোনদিন মিথ্যে কথা বলে টের পাই তবে আর আস্ত রাখব না। মনে থাকে।

—আজ্ঞে না বাবু, মিথ্যে কথা আমি বলছি না বাবু। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে যা।

আনিটি লইয়া যুক্তকরে শৈলেনকে নমস্কার করিয়া সাধন প্রস্থান করিল।

মিনিট তিনচার পরে বাহিরের বারান্দায় উচ্চ কণ্ঠের হুঙ্কার শুনিয়া বড়বাবু বলিলেন—কী হোলরে ওখানে? নিতাই বুঝি চীৎকার করছে? এখুনি সাহেব লাঞ্চ থেকে ফিরবে, ওটার কি একটা আক্কেল নেই। ডাক তো রে নিতাইকে।

নিতাইকে ডাকিতে হইল না। সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। একলা নয়, পিছনে মাতৃদায়গ্রস্ত সাধন। সাধনের গলার চাদর নিতাইয়ের বাম হাতে শক্ত করিয়া ধরা। টানিতে টানিতে সাধনকে লইয়া বড়বাবুর সামনে দাঁড় করাইয়া নিতাই তাহার চাদর ছাড়িয়া নিজের দুই হাতের আদ্দির পাঞ্জাবির আস্তিন গুটাইতে শুরু করিল।

পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিলেন, কীহে, হল কী?

সাধন প্রায় কান্নার সুরে কহিল—বাবু, আমি জোচ্চোর নই। চলুন দেখবেন আমাদের বাড়ীতে। পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে আমার মা—

প্রচণ্ড ধমক দিয়া নিতাই তাহার কথা চাপিয়া দিল—চোপরাও, ফের আমার মা? তুই মাসখানেক আগে কেন এসে বলেছিলি তোর বাপ মারা গেছে, শ্রাদ্ধ করবার পয়সা নেই, মা ছোটবেলায় মরে গেছে? বলিসনি?

—আজ্ঞে, গেল মাসে? না বাবু আমি আর কোনো দিন আসিনি আপনাদের আপিসে। সত্যি বলছি মা কালীর দিব্যি।

—আবার দিব্যি গালা? দেব তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে ইয়্যাক্ চড়ে। চালাকি? নিতাই চড় উদ্যত করিল।

সাধন বলিল—মারুন বাবু, আপনারা মা বাপ। কিন্তু সত্যি বলছি বাবু, আমি আর কখনো আসিনি।

—আর কখনো আসনি তুমি? আচ্ছা, তোর নাম কী?

—আজ্ঞে নাম? নাম আমার সাধন। বাড়ী আমতার কাছে বাবু।

পঞ্চাননবাবু কহিলেন—সে সব ঠিকুজি কুষ্ঠি ঘর সংসারের পরিচয় শৈলেন নিয়েছে। ওতে আর কী বুঝবে?

—ওইতেই বুঝে নিয়েছি সার। প্রথম মুখ দেখেই সন্দেহ হয়েছিল চেনা চেনা। এখন কথা শুনে আর সন্দেহ নেই। ঠিক এই বেটাই। এই যে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই, আজ্ঞে আমার নাম? আজ্ঞে বাড়ী?' এই অভ্যেসটি সেবারও আমার কানে লেগেছিল। বেটা, তুমি আমার চেয়ে চালাক, নয়?

—আজ্ঞে না বাবু, আপনার চেয়ে চালাক নই।

—চোপ্।

বাবুরা কেহ উঠিয়া আসিয়াছেন, কেহ নিজ আসন হইতেই মন্তব্য ছুঁড়িতেছেন। শৈলেন এতক্ষণ নীরবে গোঁফ পাকাইতেছিল। বলিল—ঠিক মনে আছে তো হে নিতাই? এরকম কত ছেলে ভিক্ষে করছে আজকাল। তা ছাড়া বাপ-মরা মা-মরাও কিছু দুর্ল্লভ নয়।

—না না, এই ছোঁড়াটাই এসেছিল। আমার বেশ মনে আছে। আমি চার আনা পয়সা দিয়েছিলুম, আরও কার কার ঠেঁয়ে চেয়ে কিছু তুলে দিলুম। এসব ওদের tactics, আমি জানি। বল বেটা, স্বীকার কর। স্বীকার করলে কিচ্ছু বলব না, নইলে পুলিশে দেব।

সন্দেহ ও বিশ্বাস দুই সংক্রামক মনোবৃত্তি। নিতাইয়ের সন্দেহের সংস্পর্শে আরও কয়েকজনের মনে সন্দেহ উপজাত হইল। মধু বেয়ারা বলিল—ঠিক ঠিক বাবু, এই ছোঁড়াকে আমিও আগে দেকিচি। হ্যাঁ, এই তো বটে, এই রকম কাচা গলায়।

পরিতোষবাবুরও স্মরণশক্তি উদ্বুদ্ধ হইল। বলিলেন—আমার কাছ থেকেও একবার আনা দুয়েক পয়সা নিয়ে গেছল, এই ছোঁড়াই তো। শয়তান ছেলে। মুখখানা দেখছেন না।

পরিতোষবাবুর কাছ থেকে দুই আনা পয়সা আদায় করিয়াছে,

এত বড় ক্ষমতা সাধনের চৌদ্দপুরুষের আছে কিনা সন্দেহ। দানের কথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু এই ছেলেটা যে শয়তান এবং ইহার মুখখানা দেখিলেই যে তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়, এ কথায় কেহ অবিশ্বাস করিল না। পাথুরে কয়লার আগুন যেমন পরস্পরের সহযোগিতায় জ্বলিবার সুবিধা পায়, বাবুদের সন্দেহও তেমনি পরস্পরের সন্দেহের আনুকুল্যে দৃঢ়তর হইল।

প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত রায় হইল, এই ছেলেটি অনেকদিন হইতে এইরূপ মাতৃদায় পিতৃদায় বলিয়া ঠকাইয়া পয়সা উপার্জন করিতেছে, ঠকাইতে কাহাকেও বাকী রাখে নাই। সকলের মুখপাত্রস্বরূপ নিতাই দ্বিগুণ উৎসাহে তাড়না করিল—কীহে বাপু, আর কতকাল মাতৃদায় পিতৃদায় চলবে? জবাব দে বেটা।

সাধন কহিল—আজ্ঞে—

জবাব চাহিলেও তাহাতে নিতাইয়ের প্রয়োজন নাই। সে কহিল—চোপরাও, ফের কথা? ঘুসিয়ে তোমার দাঁতের পাটি উড়িয়ে দেব, তুমি চেনো না আমায়। এখনো সত্যিকথা বলবি তো বল, নইলে নির্ঘাৎ মার খেয়ে মরবি। তারপর পুলিশে দিয়ে তোমার পরকালটি খেয়ে দেব।

গুম্ফচর্য্যা স্থগিত রাখিয়া শৈলেন বলিল—ওরে এই ছোঁড়া, সাধন না কী তোর নাম, সত্যি কথা বল না বাবা, কেন মার খেয়ে প্রাণটা যাবে, তারপর দেবে ঠেলে হাজতে।

সাধন কাঁদিতেছিল, কাঁদিতেই রহিল। কিন্তু কিছুতেই বলিল না যে মা তাহার মরে নাই। কোনো কথাই আর সে বলিল না। শুধু হাতের পিঠ দিয়া একটা চোখ অবিরাম রগড়াইতে লাগিল।

—ক্ষেপেছ তুমি! লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে কখনো। ওর অদেষ্টে আছে হাজতবাস। চল্ বেটা। বলিতে বলিতে সাধনকে টানিয়া লইয়া নিতাই বাহির হইল। বিনা পয়সার মজা দেখিবার লোভে পিছনে কয়েকজন চলিল।

মিনিট দশ পনের পরে নিতাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—Hopeless! তাহার অনুচরেরা সাহেবের ভয়ে ফটকের বাহিরে চোরানুগমন করিতে পারে নাই। নিতাই ঘরে পদার্পণ করিবামাত্র দুইদিক হইতে যুগপৎ প্রশ্ন উঠিল—কী করলে হে? কোন থানায় দিয়ে এলে?

জবাব না দিয়া নিতাই নিজের দুই করতল দেখিয়া বলিল—আসছি। ফিরিল ভিজা হাত রুমালে মুছিতে মুছিতে। একজন বলিল—কীরে বাবা, খুন করে এল নাকি?

—করাই উচিত ছিল। বলিয়া নিজের চেয়ারে বসিয়া নিতাই বলিল—হাতটা ধুয়ে ফেল্লুম। বেটাদের কাপড় নয়তো এক একটা রোগের ডিপো। যত রাজ্যের বীজাণু বিজ্ বিজ্ করছে।

শৈলেন বলিল—ধুয়েছ বেশ করেছ। কিন্তু হাত ধুলেই কি নিস্তার পাবে? The multitudinous seas incarnadine. যাক, তোমার ফল কী হোলো বল সাধনসমরের।

উত্তরে নিতাই যাহা বলিল সংক্ষেপে তাহা এই: বাহিরে গিয়া তাহার চোর ধরার সমস্যা চোরের ধরা পড়ার সমস্যা হইতে প্রবল হয়। সত্যই সাধনকে লইয়া থানায় যাইবে, এমন নির্বোধ সে নয়। বাঘে ছুঁইলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁইলে আঠারশো। সে মতলব নিতাইয়ের ছিল না। কিছু ধমক ধামকে ও পুলিশের ভয়ে ছেলেটা অপরাধ স্বীকার করিবে, এই আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সে আশা সাধন পূর্ণ করে নাই। অবশেষে নিতাই তাহাকে গোটা-কতক চড় চাপড় ও প্রচণ্ড ধমক দিয়া, ভবিষ্যতে পুলিশের ভয় দেখাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

অতঃপর অল্পক্ষণ সাধনতত্ত্ব আলোচিত হইল এবং ক্রমে এ তত্ত্বের অবসান ঘটিয়া আলাপের স্রোত মোড় ফিরিয়া ছোট সাহেব, বোনাস, কাপড়ের দর, সানফ্রান্সিস্কো, মেয়ের বিবাহ, রুজভেল্ট ইত্যাদির অভ্যস্ত খাতে বহিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পরে শৈলেন মেশিন ছাড়িয়া গোঁফে হাত লাগাইয়া বলিল—আমি ভাবছি, কী ভাবছি জান?

কেহই জানিত না তাহা বোঝা গেল। শৈলেন বলিল—আমি ভাবছি কেন, ও'র মা কি মরতে পারে না?

তখন কথা হইতেছিল চিয়াংকাইসেকের। তাহার মায়ের মৃত্যুর কথা উঠিল কেন, কেহ বুঝিল না।

—ধর যদি সত্যি ও'র মা মরে থাকে, নিতাইয়েরই যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে? তাহলে ঐটুকু ছেলে, মাতৃদায়ে ভিক্ষে চেয়েছে এই অপরাধে তা'র চোরের শাস্তি হোলো তো? অথচ সে প্রমাণ দিতে চাচ্ছে, সঙ্গে যেতে বলছে, আর কী কত্তে পারে সে?

শুনিয়া নিতাই দুই একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, —না, না আমার বেশ মনে পড়ছে এই ছোঁড়াই। মুখ চোখ কথা কইবার ধরণ সব—

শৈলেন বলিল—খুবই সম্ভব তোমার ভুল হয় নি। কিন্তু সত্যি একবার মা তা'র মরবে তো। এবার সেই সত্যি মরাটা হতেও তো পারে।

—সে তর্কের খাতিরে সবই হতে পারে। বলিয়া নিতাই গম্ভীর হইয়া কাজে মন দিল। মন লাগিল না। বেহারাকে সিগারেট ও পান আনিতে দিয়া সে নিমীলিত চোখে চেয়ারের পিঠে ঘাড় ঠেকাইয়া উর্দ্ধমুখে বসিয়া রহিল।

মনস্থির করিবার জন্যই সিগারেট আনিতে দিয়াছিল। কিন্তু

দৈবপ্রতিকূল। মধু বেয়ারা পান সিগারেট টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—বসে বসে কাঁদছে বাবু।

অন্যমনস্ক নিতাই জিজ্ঞাসা করিল—কোন বাবু?

মধু বলিল—বাবু নয় সেই ছোঁড়াটা। যাকে টেনে নিয়ে গেলেন।

—কোথায়? নিতাই সোজা হইয়া বসিল।

—ঐ ও মোড়ের পানওলার দোকানের পাশে বসে।

—কাঁদুকগে। তুই তোর কাজে যা। নিতাই ফাইল খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে ইন্‌ভয়েস পড়িতে লাগিল। একঘণ্টা আগে ঐ সামান্য মার খাইয়াছে, কান্না আসিবারই কথা নয়। আর যদি বা আসে এতক্ষণেও তার শেষ হয় না, শয়তানির প্রমাণ ইহার চেয়ে আর কী হইতে পারে।

ঘণ্টা কয়েক পরের কথা।

তখন বৈশাখের শেষ। সারাদিনের নিদারুণ গরমের পর সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিত ঝড় উঠিল। ক্ষণপরে সব তাপ ও জ্বালা জুড়াইয়া বহুপ্রত্যাশিত বৃষ্টি নামিল। ঘরে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিবার শব্দের সহিত পথের ত্রস্ত পথিকের দ্রুত ধাবনের শব্দ মিশিল এবং এই সকল শব্দ ছাপাইয়া শিশুকণ্ঠে আবাহন সঙ্গীত উঠিল—আয় বিষ্টি ঝেঁপে—

এই ঝড় জলের মধ্যে, কলিকাতায় এক গৃহস্থ বাড়ীতে গৃহস্থ ও তাহার গৃহিণীর মধ্যে প্রবল বচসা হইল। বচসার সকল কথা গোড়া হইতে লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই, কেবল শেষের কথাগুলি বলিলেই চলিবে।

গৃহিণী বলিলেন—এমন গোঁয়ার গোবিন্দ লোকের হাতেও পড়েছিলুম গা। পরের ছেলেকে মেরে ধরে, একী বীরত্ব। যত রাজ্যের লোকের শাপমন্যি কুড়িয়ে ঘরে আনা। তুমি কি মানুষ, না চামার? আহা মা মরা গরীব—

গৃহস্থ জবাব দিলেন—মা-মরা না হাতী! তুমি থামো। তোমাদের কাছে কোনো গল্প করাই ঝকমারি। যা জানো না তাতে কথা কইতে এস না। অমন ঢের মা মরা দেখেছি। রোজ ওদের একটা করে মা মরছে রোজ একটা করে বাপ মরছে।

সিগারেট ধরাইয়া গৃহস্থ গুম্ হইয়া বসিল। তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—পথের ধারে অপরিচিত একটি ছেলে বসিয়া কাঁদিতেছে। ছেঁড়া ময়লা চাদরে চোখ মুছিতেছে। পথ দিয়া লোকের পর লোকের আনাগোনারও বিরাম নাই, ছেলেটার কান্নারও ছেদ নাই। কেহ ফিরিয়াও দেখিতেছে না।

কঠিন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া গৃহস্থ বলিল,—ও সব বুজরুকি আমি একদিনে ঢিট্ করে দিতে পারি। কান্না! আর একদিন পড়ুক আমার হাতে, কান্না কাকে বলে দেখিয়ে দি।

সেই সময়ে কলিকাতার বাহিরে এক অখ্যাত গ্রামে এক চালা-ভাঙ্গা জীর্ণ মাটির ঘরে একটি ছেলে ভাত খাইতে বসিয়াছে। তাহার বাম পাশে একটি বছর চারেকের মেয়ে শুইয়া একটানা কান্নার সুরে গান গাহিয়া চলিয়াছে, গানের একটি মাত্র কলি—আমি ভাঁত খাঁবো ও ও। দক্ষিণে আর একটি শিশু, সাত আট বছরের বালক—বসিয়া বর্ণপরিচয়ের কয়েকখানা ছেঁড়া পাতা হাতে লইয়া দাদার মুখের পানে চাহিয়া আছে। দাদা সারাদিনের কাহিনী সত্য মিথ্যা মিশাইয়া, দুঃখের অংশ বাদ দিয়া, রঙ চড়াইয়া বলিয়া যাইতেছে, পথের বর্ণনা করিতেছে, পাহারাওলার হুঙ্কার, ফেরিওলার ডাক নকল করিয়া দেখাইতেছে। বর্ণপরিচয়ের মাধুর্য্য অপেক্ষা এই সব কথা অনেক মধুর লাগিতেছে।

বাহিরে বৃষ্টি বাড়িয়া উঠিল। ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে এখানে ওখানে জলধারাও বাড়িল। লণ্ঠনের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতে লাগিল। কখন এক সময়ে রুগ্ন ছোট বোনটি একঘেয়ে কান্না ভুলিয়া দাদার গল্প শুনিতে শুনিতে হাসিতে শুরু করিয়াছে। এই দুইজন শিশু শ্রোতা ব্যতীত আরও একজন গল্প শুনিতেছিল। মলিন ক্ষীণ আলোতে, মলিন জীর্ণ বিছানার সহিত তাহার মলিন শীর্ণ দেহ এমন মিশাইয়া আছে, যে আছে কি না তাহা বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তবে দৃষ্টির গোচরে আসে।

হঠাৎ আহার ও গল্প থামাইয়া ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—পায়ের ব্যথাটা তোমার কেমন আছে মা এবেলা?

মা বলিল,—ভালই আছে, তুই খা।

—তুমি ভাবছ তোমার সেধোটা কী পেটুক। খেয়ে দেয়ে পেটটি ঠাণ্ডা করে তবে মায়ের খবর জিজ্ঞেস করবার সময় হল ছেলের। ধন্যি ছেলে যাহোক।

মা সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—আহা, কী খেলি বাবা। ভাত কম হল তোর।

সাধন জিজ্ঞাসা করিল—তুমি? তুমি কী খেলে মা আজ? ভাত কম হবে বলে খাওনি বুঝি?

মায়ের আগেই খোকা জবাব দিল—মা আজ ভাত খায়নি গো।

সাধনের মা কহিল—তুই থাম।

তুমি খেয়েছ ভাত?

—ভাত খাব কী করে? গায়ে যে জ্বরের মতন হয়েছে রে আজ। ভাত খেলে কি রক্ষে থাকতো।

সাধন বিশ্বাস করিল না। বলিল,—হ্যাঁ, জ্বরের মতন হয়েছে, ও সব চালাকি আমি জানি না, না? যেদিনই ঘরে চাল থাকে না সেইদিনই তোমার জ্বর হয়। আচ্ছা বেশ, আমারও জ্বর হয়েছে, আর ভাত খাব না; এই রইল—

অন্নলুব্ধা ছোট বোন বলিল—আমি খাব,ঐ ভাতগুনো আমার।

সাধনের মা বলিল—সত্যি রে, দেখ গায়ে হাত দিয়ে দেখ,—গা গরম কি না।

সাধন বাম হাত দিয়া মায়ের কপাল বুক স্পর্শ করিয়া দেখিয়া বলিল—কেন? জ্বর হল কেন? কেবল তোমার জ্বর কেন হবে?

রাত্রি অধিক হইল। সাধনের মা ছোট মেয়েটাকে ভুলাইয়া বার্লির জল খাওয়াইয়া নিজের শয্যায় ঘুম পাড়াইতে লাগিল। ছোট খোকা বর্ণপরিচয়ের পাতা মুঠায় ধরিয়া,দাদার বিছানার এক পাশে ঘুমাইতেছে। তাহার ভাব মায়ের চেয়ে দাদার সঙ্গেই বেশী।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। বাহিরে সঙ্কীর্ণ দাওয়ার উপর বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন সাধন বহুক্ষণ পরে হাতের বিঁড়িতে টান দিয়া ধোঁয়া না পাইয়া সেটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। আরও কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া সে যখন ঘরে আসিল তখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তেল অভাবে লণ্ঠনের শিখা প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে।

সেই প্রায় অন্ধকার ঘরে অতি সন্তর্পণে সাধন মায়ের কপালে হাত রাখিল। কপাল যেন পুড়িয়া যাইতেছে। সেই স্পর্শে মা চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে? সাধু? কী হয়েছে?

সাধন জবাব দিল না। মা তাহার মনের কথা বুঝিয়া বলিল—কিছু হয়নি আমার, কালই জ্বর ছেড়ে যাবে। তুই ঘুমো সাধু। তোকে আবার সকালেই বেরোতে হবে কারখানায়। আর রাত করিসনি বাবা, শুয়ে পড়।

সাধন বলিতে পারিল না যে তাহার কারখানার চাকরী আর নাই। নীরবে আসিয়া সে শয্যা লইল।

এক সপ্তাহ পরের কথা। এক অপরাহ্নে নিতাই লালদিঘীর ধারে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পিছন হইতে একটি ভীত মৃদু ডাক কানে আসিল—বাবু, কিছু সাহায্য করবেন।

নিতাই ফিরিয়া দাঁড়াইল। ছিন্ন মলিন কাপড়পরা, খালি গা, খালি পা, বছর চৌদ্দ পনেরর একটি ছেলে, মাথায় বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল, বলিতেছে—দয়া করে যদি—

কিন্তু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভিক্ষুকের প্রার্থনা বন্ধ হইয়া গেল। সে বলিল—বাবু, আপনি!

নিতাই বলিল—তোর নাম সাধন, না?

কয়েক মুহূর্ত্ত সাধন ইতস্ততঃ করিল। সে পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছে বুঝিয়া নিতাই তাহার হাতখানি ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। কিন্তু ধরিতে পারিল না। তৎপূর্ব্বেই সাধন দুইটি হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবু, আমার মা—

উদ্গত ক্রন্দনের আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কণ্ঠের বাষ্প দমন করিবার চেষ্টায় সে চুপ করিল, কিন্তু চোখ জলে ভরিয়া গেল। নিতাই পুনরায় হাত বাড়াইল এবং তাহার রুক্ষ চুলের—মুঠি ধরিল না—চুলের উপর হাত বুলাইয়া মিষ্ট স্বরে বলিল—জানি জানি, বলতে হবে না আর। কী করবি বল বাবা, মা কি কারও চিরকাল থাকে। কাঁদিসনে—

এই অপ্রত্যাশিত অচিন্তনীয় সহানুভূতিতে সাধন বিস্মিত হইল, কিন্তু কান্না তাহার বাড়িল। নিতাই বলিল—এমনি হয় রে বাবা, এমনি হয়। আমার যখন মা মারা যায় আমি তোর চেয়ে ছোট। থাক সে কথা। বলিতে বলিতে নিতাই পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিল।—তোকে কদিনই খুঁজছি! কিছু মনে করিসনে বাবা, সেদিনের—

তাহাকে কথা শেষ করিবার অবসর দিল না সাধন, হঠাৎ নীচু হইয়া নিতাইয়ের পা ছুঁইয়া বলিল—বাবু, আপনি বেরাম্ভণ, আমাকে মাপ করুন বাবু। বলুন আমার মা ভালো হয়ে উঠবে মায়ের অসুখ সেরে যাবে বলুন বাবু—

এবার বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইবার পালা নিতাইয়ের। সাধন বলিয়া চলিল—আপনি সেদিন শাপ দিলেন, তাই সেইদিন থেকেই মা'র অসুখ করল। রোজই অসুখ বাড়ছে। আজ বাড়ীউলি পিসি বল্লে, তোর মা আর—

কান্নায় সাধনের কথা আবার বন্ধ হইয়া গেল। নিতাইয়ের মনে পড়িল সেদিন সাধনকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে সে বলিয়াছিল, আমি বামুন, এই দেখ পৈতে, মিথ্যে কথা স্বীকার কর। নইলে তোর মা যদি বেঁচে থাকে সত্যিই মরে যাবে, দেখিস।

মণিব্যাগ বন্ধ করিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়া নিতাই বলিল—মা তোর মারা যায়নি। মিছে কথাই বলেছিলি তাহলে? হুঁ।

রোরুদ্যমান সাধন বলিল—আর কখনো বলব না বাবু, আপনার শাপ ফিরিয়ে নিন, পায়ে পড়ি আপনার। বলুন আমার মা ভালো হয়ে যাবে। আমাদের আর কেউ—

সেই সময় ট্রাম আসিয়া পড়িল। ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টি সাধনের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বিনা বাক্যে নিতাই ট্রামে উঠিয়া বসিল।

অপ্রার্থিত সহানুভূতি, প্রার্থিত আশীর্ব্বাদ ও তাহার সহিত প্রত্যাশিত অর্থসাহায্য, তিনই সাধনের সত্যভাষণের উত্তাপে উবিয়া গেল। বিমূঢ় সাধন অশ্রুবাষ্পের মধ্য দিয়া চলন্ত ট্রাম গাড়ীর পিছনে চাহিয়া রহিল। গাড়ীর ভিতরে নিতাই বলিল—শয়তান, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর কোথাকার! •

—

অর্থই অনর্থের মূল

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

স্বর্ণমান (ক)

বাল্যকালের একটা কথা মনে পড়ে। বাড়ীর আত্মীয়বর্গের মধ্যে যখন কথোপকথন হতো, তখন প্রায়ই তাঁরা বলতেন যে গবর্ণমেণ্টের নাকি অর্থের বড় টানাটানি, তাই গবর্ণমেণ্ট নূতন লোকও সহজে চাকরিতে বহাল করতে চান না ; উপরন্তু যারা সরকারের স্থায়ী কর্ম্মচারী, তাদের বেতনও যাতে কমান যায় সেই চেষ্টাই চলছে। এমন কি অর্থের সঙ্কুলান না করতে পেরে সরকার মাঝে মাঝে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। অর্থাভাবে দেশের কলকারখানা-গুলি বন্ধ হবার যোগাড় হচ্ছে, কাজেই বেকার সমস্যাও নাকি দিনের পর দিন হুহু করে বেড়েই চলেছে।

শুনে, ব্যাপারটিকে অনেকটা রূপকথার মত আজগুবি মনে হতো এবং অভিভাবকদের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে কখন কখন সন্দেহও যে না হতো—তাও নয়। সুলভ কাগজের উপর যত টাকার ছাপ মারা যায়, সেটা যখন তত টাকার নোটেই পরিণত হয় এবং সেই ছাপ মারার যন্ত্রটি যখন অহরহ গবর্ণমেণ্টের কাছেই থাকে, তখন তার আবার যে টাকার অভাব কি করে হতে পারে, এ তত্ত্বটি অভিভাবকদের উপর অগাধ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না। বালকের এই চিরস্বাভাবিক প্রশ্নের জবাবই হলো আমাদের আজকের এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

দেশের অর্থ বাড়লেই যে দেশের দারিদ্র্য ঘোচে না, এ আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে দেখেছি। দেশের টাকা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যাদির মূল্যই সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, দেশের সম্পদ তাতে একটুও বাড়ে না। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পেলে জনসাধারণের মতো সরকারের খরচও বৃদ্ধি পায়, কাজেই অতিরিক্ত মুদ্রা বা নোট বার করে তাঁর যে লাভ হলো, তাতে তাঁর অবস্থার কোন উন্নতিই হলো না ; লাভ ও খরচ দুইই বৃদ্ধি পাওয়ায় গবর্ণমেণ্টের অবস্থা পূর্ব্ববৎই রয়ে গেল। তা ছাড়া, দাম একবার বাড়তে আরম্ভ করলে সে ক্রমাগত বাড়তেই থাকে—কারণ আগত দিনের মূল্যবৃদ্ধির আশায় দ্রব্য বিক্রেতাগণ পূর্ব্বদিনই পরদিনের মূল্য (To-morrow's price) চাহিয়া বসে। সরকারী বাজেটে আরো ঘাটতি পড়ে, সরকার অর্থবৃদ্ধি করতে আরও তৎপর হয়। কাজেই দেশের দারিদ্র্য ঘোচাতে হলে টাকা বাড়ালে কিছুই হবে না, বাড়াতে হবে দেশের সম্পদকে। অর্থ ও ঐশ্বর্য্য এই দুইটি জিনিষের পার্থক্য আমাদের ভাল ভাবে বুঝতে হবে। অর্থ সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য নয়, কিন্তু অর্থ ঐশ্বর্য্যের প্রতিভূ (representative)। আমার যত অর্থ আছে, আমি দেশের ততখানি সম্পদের অধিকারী। আমার টাকা বাড়লো অর্থে বোঝায়, দেশের আরো বেশী সম্পদের উপর আমার অধিকার জন্মলো। রামের চেয়ে আমার অর্থ বেশী মানে—রামের চেয়ে বেশী সম্পদ উপভোগ করবার অধিকার আছে। তবে এর মধ্যে আর একটা কথা আছে। যদি আমার টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে দেশের দ্রব্যাদির মূল্যও বেড়ে থাকে, তবে আমার বেশী টাকা সত্ত্বেও আমি পূর্ব্ববৎ সম্পদের অধিকারীই রয়ে যাব। অর্থাৎ আমার অর্থ বাড়লো বটে, কিন্তু তবুও আমি বড়লোক হলাম না। অর্থশাস্ত্রে এই সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য (wealth) বলতে অনেক কিছুই বোঝায়, এমন কি দেশের জনসাধারণের কর্ম্মদক্ষতা ও মানসিক বিকাশও দেশের সম্পদের পর্য্যায়ভুক্ত। তবে সম্পদ বৃদ্ধির মূল ভিত্তিই হলো দেশের কৃষি, খনিজ ও শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার লাভ করা।

দেশে টাকা চলে শুধু বিশ্বাসের উপর। প্রত্যেকেই জানে যে তার টাকা নিতে কেউ অসম্মতি প্রকাশ করে না, যখন খুসী টাকা দিয়ে লোকের কাছ থেকে জিনিষপত্র কেনা বা তাদের ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে। টাকা থাকলেই অন্তত দৈহিক সুখ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না, টাকার উপরে এ বিশ্বাস আমাদের আছে—তাই "ফেলো কড়ি, মাখো তেল," প্রবাদ বাক্যটি একদিক থেকে খুবই সত্য। টাকার উপরে বিশ্বাস থাকার অর্থই হলো, যে বা যার আদেশে এই টাকা মুদ্রিত হয়ে বের হয় তার উপরে বিশ্বাস থাকা। টাকার এই সৃষ্টি কর্ত্তা দেশের খোদ গভর্ণমেণ্টও হতে পারে, অথবা তার সংস্পর্শিত এবং অনুমোদিত কোন বিশ্বাসী ব্যাঙ্কও হতে পারে। টাকার উপরে বিশ্বাস আমাদের এনে দিতে হয় না, জন্ম অবধি দেখে দেখে বিশ্বাস আমাদের আপনিই এসে পড়ে। সরকারের আরো দশটা নিয়ম-কানুন যেমন আমরা নির্ব্বিবাদে ও নিঃসন্দেহে মেনে নিয়ে থাকি, টাকার অসীম ক্ষমতাকেও আমরা তেমনিই চোখ বুঁজে স্বীকার করে নি—একবার প্রশ্নও করি না যে এর মূলে শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু আছে কিনা। দেশের গবর্ণমেণ্টের উপর যতদিন বিশ্বাস থাকে, টাকার উপর আস্থাও ততদিন অটল, কিন্তু যেদিন সরকারের স্থায়িত্ব বা তার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে তার উপর বিশ্বাস হারাতে থাকি, টাকার উপর আস্থাও সেদিন থেকে আমাদের কমতে থাকে, সেদিন আমরা বুঝতে পারি টাকাটা স্রেফ একটা ধোঁকাবাজি, শুধু মাত্র একটা অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এতদিন তাকে দেবতার সমতুল্য উচ্চ আসন দিয়ে এসেছি। তাই সেদিন মেকী ছেড়ে খাঁটির দিকে নজর পড়ে বেশী, আমরা টাকার দ্বারা যে সম্পদের অধিকারী, সেই সম্পদ আহরণ করতে সেদিন ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সেদিন টাকার উপস্থিতি আমাদের শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি আনে, তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তাকে হাত ছাড়া করতে আমরা ব্যস্ত ; তার

পরিবর্ত্তে যত কিছু দ্রব্য সামগ্রী ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ করে রাখা যায়, সেদিকেই মানুষের নজর পড়ে বেশী। দুর্দ্দিনের ভিতর দিয়েই টাকার আসল রূপটি ধরা পড়ে।

সোনার উপর মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ, মানুষ সোনাকে ভালবেসে থাকে। কিন্তু এ ভালবাসা তার অন্ধ বিশ্বাস নয়, সোনার নিজস্বও কতকগুলি গুণ আছে। এই ধাতুটি খুবই শক্ত, সহজে এর ক্ষয় নেই; দেখতে শুনতেও এ মন্দ নয়, কাজেই লোকে অলঙ্কার তৈরী করে এর দ্বারা অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে থাকে। অন্যান্য অনেক দ্রব্য প্রস্তুতের সময়েও স্বর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সর্ব্বোপরি এ ধাতুটি যেখানে সেখানে বহুল পরিমাণে না পাওয়ায় এ একটি দুর্লভ সামগ্রী বলে গণ্য, কাজেই এর মূল্যও অধিক। সামান্য পরিমাণ স্বর্ণের মধ্যে বহুল পরিমাণ মূল্য সঞ্চিত থাকায় (**Store of value**)' সম্পত্তি হিসাবে একে বহন করে বেড়ান নিরাপদ ও সহজসাধ্য। এই সব কারণে সোনার উপর মানুষের একটা স্বাভাবিক আস্থাও আছে, তাই সোনার টাকার উপরে মানুষের বিশ্বাস সুদৃঢ়। কারণ সে জানে যে রাজনৈতিক গোলযোগ বা অন্য কোন কারণে যদি এ জিনিষটি হঠাৎ কোনদিন টাকা বলে আর না চলে, অর্থাৎ লোকে যদি তাদের দ্রব্যের মূল্য হিসাবে এই ছাপমারা স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়, তবুও ধাতু হিসাবে চিরদিনই এই স্বর্ণের একটা সর্ব্বস্থানে মূল্য পাওয়া যাবে। তাই স্বর্ণমুদ্রাকে সে নিরাপদ বলে স্বীকার করে। রৌপ্যের মধ্যেও কিছু কিছু এই সব গুণাবলী থাকায় রূপাও মুদ্রা হিসাবে বহুকাল হতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এককালে ইউরোপের অন্তর্গত অনেক দেশে সোনা ও রূপা দুইই একসঙ্গে সম অধিকারে মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথাকে দ্বিধাতুমান (Bimetalism) বলে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট একটা অনুপাত ঠিক করে দিতেন এবং সেই হিসাবে আদান প্রদান চলতো। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যেত যে বাজারে ঐ দুই ধাতু মূল্যের তারতম্য হেতু গবর্ণমেণ্টের স্থিরীকৃত অনুপাতের সঙ্গে বাজার দরের অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে, কাজেই বাজারে যে ধাতুটির মূল্য বেশী সেটি লোকে নিজের কাছে জমা করতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে ক্রমে সেই ধাতুটি বাজার থেকে একেবারে উধাও হয়ে যায়। যেমন মনে করা যাক্, সরকার ১২টি রৌপ্য মুদ্রা একটি স্বর্ণমুদ্রার সমান—এই ঠিক করে দিলেন। কিছুদিন পরে রূপার মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারে ১৩টি রৌপ্য মুদ্রাই হয়তো একটি স্বর্ণমুদ্রার সমান হয়ে গেল, অথচ কানুন হিসাবে একটী স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা তখনও ১৫টি রৌপ্যমুদ্রার কাজ চালান যায়। কাজে কাজেই লোকে সস্তার টাকা স্বর্ণমুদ্রার দ্বারাই সমস্ত ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ পরিশোধ করতে থাকবে এবং রৌপ্য মুদ্রাকে গলিয়ে ধাতুতে পরিণত করে, হয় তাকে দেশের মধ্যেই বেশী দামে বিক্রী করবে, নয়ত বিদেশে চালান দেবে। এইভাবে সস্তার বা খারাপ টাকা দামী বা ভাল টাকাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয়—**Bad money tends to drive good money out of circulation**—এই সত্যটি রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে (১৫৫৮—১৬০৩) অর্থনীতিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ বণিক গ্রেসাম সাহেব বহুদিন পূর্ব্বেই আবিষ্কার করেছিলেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের সতত পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য এই দ্বিধাতুমান প্রথা বড়ই উৎপাত আরম্ভ করে এবং এই জন্য গতযুদ্ধের সময় ও পরে বহু দেশে এই প্রথাকে ত্যাগ করে ক্রমে একবিধ ধাতুমান (**Mononutalism**) গ্রহণ করে। তাতে করে রূপা বা সোনা যে কোন একটি ধাতুই প্রধান মুদ্রা হিসাবে দেশে অবাধ শক্তিতে প্রচলিত থাকে।

ভারতবর্ষেও বহুদিন অবধি স্বর্ণ ও রৌপ্য দুইই মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। হিন্দু রাজারা সাধারণতঃ স্বর্ণ মুদ্রাই বেশী পছন্দ করতেন, মুসলমান বাদশারা সেই যায়গায় রূপাকেই পছন্দ করতেন বেশী। এদেশের এক এক রাজা এক এক রকমের মুদ্রা প্রচলন করতেন, তাদের মধ্যে না থাকতো কোন সামঞ্জস্য, না থাকতো তাদের আদান প্রদানের কোন স্থির ও নির্দ্দিষ্ট অনুপাত। এতে করে এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বড়ই অসুবিধা হতো। মুদ্রা ব্যবস্থার এই জটিলতার সুযোগ নিয়ে যারা বিভিন্ন প্রদেশের মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতো, তারাই শুধু প্রচুর পরিমাণে লাভবান হতো। ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে ভারতে প্রায় ৯৯৪ রকমের রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। ১৮৩৫ সালে মুদ্রার এই জটিলতা দূর করে সমগ্র বৃটিশভারতে একই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত করবার উদ্দেশ্যে একটি আইন পাশ হয়। সেদিন থেকে এ দেশে রৌপ্যমান প্রথা স্থাপিত হয় এবং সোনার মোহরের পরিবর্ত্তে রূপার টাকাই প্রাধান্য লাভ করে। ভারতের সঙ্গে আরো একটি দেশের মুদ্রানীতি হিসাবে খুবই সাদৃশ দেখা যায়, সে হলো চীন। চীনে আজও বহুবিধ মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত আছে এবং একটি মুদ্রার সঙ্গে অন্য একটি মুদ্রার বিনিময় কার্য্যে লিপ্ত ব্যবসায়ীরা এর দ্বারা প্রচুর পরিমাণে লাভবান হয়ে থাকে।

পূর্ব্বেই বলেছি স্বর্ণের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই নিজের দেশে প্রচলিত যে কোন মুদ্রার সঙ্গে যদি স্বর্ণের কিছু একটা সম্বন্ধ বজায় থাকে তবে সে নিজের অর্থকে নিরাপদ মনে করে। দেশের প্রচলিত টাকা যে কোন ধাতুর বা এমন কি কাগজেরই হোক্ না কেন যদি সরকার বা যে ব্যাঙ্ক সেই টাকা প্রচলন করে সেই ব্যাঙ্কের তহবিলে সমপরিমাণ সোনা জমা থাকে, তাহলেও মানুষের সেই টাকায় বিশ্বাস আসে; কারণ সে জানে যে বর্ত্তমানে তার হাতের টাকা যদি কাগজেরও হয়, তবুও ব্যাঙ্কে বা সরকারের নিকট চাইলেই তার পরিবর্ত্তে সমপরিমাণ সোনা বা স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যাবে। আবার ঐ পরিমাণ সোনা নিয়ে গেলে তার পরিবর্ত্তে যখন খুশী নোট অথবা কাগজী মুদ্রাও সরকার দিতে দ্বিরুক্তি করবেন না। কাজেই দেশের প্রচলিত মুদ্রা যে প্রকারেরই হোক না কেন, তা স্বর্ণমুদ্রারই সমান। যে দেশে এই ধরণের মুদ্রা বর্ত্তমান, সেই দেশে বলা হয় স্বর্ণমাপ বা **Gold Standard** প্রচলিত আছে। স্বর্ণমাপের আর একটা সর্ত্ত যে জনসাধারণের স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা আমদানি বা রপ্তানির উপর অবাধ অধিকার থাকবে।

স্বর্ণমান বা Gold Standardএর অশেষ গুণ। প্রথমত, সরকার ইচ্ছামত দেশের অর্থ বৃদ্ধি করতে বা নোট ছাপাতে পারেন না। কারণ প্রত্যেকটি টাকার পশ্চাতে গবর্ণমেন্টের তহবিলে সমপরিমাণ সোনা জমা থাকা প্রয়োজন। এ সোনাটা গবর্ণমেণ্ট যতক্ষণ না জোগাড় করতে পারে ততক্ষণ সে নোট ছাপতেও পারবে না। যে কোন মুহূর্ত্তে নোটের পরিবর্ত্তে স্বর্ণমানের সর্ত্ত হিসাবে সরকার সোনা দিতে বাধ্য। কাজে কাজেই স্বর্ণমান সরকারের প্রয়োজন ও খুশীমত অর্থসৃষ্টির পথে বাধা দান করে দেশের পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির পথ (ইনফ্লেশন) বন্ধ করে। ঠিক সেই ভাবেই অর্থ সঙ্কোচন করাও (deflation of currency) সরকারের হাতে থাকে না, কারণ সোনা জমা দিলেই সরকার জনসাধারণকে সমমূল্যের নোট দিতে বাধ্য।

এত গেল দেশের ভিতরকার ব্যাপার। নিজ দেশের লোককে কাগজের নোট দিয়ে সন্তুষ্ট রাখলেও বিদেশীদের প্রাপ্য মিটাবার সময় সরকারের সোনা প্রদান করতে হয়, কারণ এক দেশে অন্যদেশের টাকা অচল। সেইজন্য সরকারের তহবিলে পর্য্যাপ্ত সোনা জমা থাকা প্রয়োজন। দেশের বাণিজ্যের গতি যদি প্রতিকূল হয়—অর্থাৎ রপ্তানির থেকে আমদানি যদি বেশী হয়, (Unfavourable balance of trade) তবে সেই পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশীদের দিয়ে দিতে হবে। যেহেতু সেই পরিমাণ স্বর্ণের বদলে সমমূল্যের নোট ছাপান হয়ে রয়েছে, কাজেই সেই পরিমাণ টাকাও বাজার থেকে সরকারকে সরিয়ে নিতে হবে। এইভাবে দেশের মুদ্রা হ্রাস পাওয়ায় দ্রব্যের মূল্য যায় কমে, বিদেশীরা এ দেশে মাল বেচে আর লাভ করতে পারেনা, উপরন্তু এদেশে দ্রব্যের মূল্য কম হওয়ায় অন্যান্য দেশের হাটে এদেশের মালের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে আমদানি যায় কমে, রপ্তানি যায় বেড়ে, প্রতিকূল বাণিজ্যের গতি মোড় ঘুরে আবার অনুকূলের দিকে যায়।

দেশে বাণিজ্যের গতি যদি অনুকূল (favourable balance of trade) হয়, বিদেশ থেকে সেই পরিমাণ স্বর্ণ এসে উপস্থিত হয়, সেই স্বর্ণের পরিবর্ত্তে দেশে মুদ্রা বাড়ান হয়, তাতে দেশের মূল্যমানের (general price level)এর উন্নতি হয়, অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি পায়, দেশে দ্রব্যের আমদানি (import) বাড়াতে থাকে, রপ্তানি (export) কমে যায়, অনুকূল বাণিজ্যের গতি আবার আপনা আপনিই সংশোধিত হয়ে বহির্বাণিজ্যের সমতা ফিরে আসে।

প্রশ্ন হবে, দেশের মোট রপ্তানির থেকে যদি আমদানি বেশী হয়, তবে এই অতিরিক্ত আমদানির জন্য যে সোনা বিদেশীদের দিতে হবে তাতো যারা বহির্বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত তারাই দেবে; সরকারের তহবিলের স্বর্ণেই বা কি করে ঘাটতি পড়বে এবং তার জন্য মুদ্রা সঙ্কোচনই বা কেন হবে? কথাটা সোজাসুজিভাবে ঠিকই, কিন্তু তলিয়ে দেখলে অন্যরকম। ব্যবসায়ীরা যে স্বর্ণ তাদের বিদেশী মহাজনদের দ্রব্যের মূল্য বাবদ দেবে, সে স্বর্ণ তারা কোথায় পাবে? দেশে স্বর্ণমান বর্ত্তমান থাকায় ব্যবসায়ীরা জানে যে সরকারী খাজাঞ্চীখানায় নোট নিয়ে গেলেই তার পরিবর্ত্তে সমপরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যাবে, সুতরাং তারা তাই করবে এবং এই স্বর্ণ পরে বিদেশে নিজেদের দেনা পরিশোধের জন্য চালান দেবে। কাজেই প্রকারান্তরে সেই সরকারী তহবিলেই টান পড়লো এবং স্বর্ণমানের নিয়ম হিসাবে তাতে করে মুদ্রাসঙ্কোচনও হবে। ঠিক এই ভাবেই দেশের রপ্তানি যখন আমদানির থেকে বেশী হয়, বিদেশীরা যে স্বর্ণ এই দেশের ব্যবসায়ীদের নিকট তাদের দ্রব্যের মূল্যবাবদ পাঠায়, সেই স্বর্ণ দেশীয় ব্যবসায়ীরা সরকারের নিকট জমা দিয়ে সমমূল্যের নোট ছাপিয়ে নিয়ে আসে, কাজেই এইভাবে অনুকূল বাণিজ্যের গতির জন্য দেশে মুদ্রা সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও কাজে কাজেই মূল্যমানের (general price level)এর উন্নতি হয়।

সুতরাং দেখা গেল স্বর্ণমানের নিয়ম মেনে চললে, দেশের সিক্কা বা মুদ্রানীতি চালনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন বুদ্ধি বা বিবেচনা খরচ করতে হয় না, দেশের অর্থের সঙ্কোচন বা প্রসারণ এবং বহির্বাণিজ্যের সমতা রক্ষা (Equilibrium) আপনা আপনিই হতে থাকে ও বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের পথ সরল হয়। স্বর্ণমানে প্রত্যেক দেশের মুদ্রা একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের স্বর্ণ দ্বারা গঠিত হওয়ায় বা নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণের সঙ্গে আদান প্রদানের সর্ত্তে আবদ্ধ থাকায়, এক দেশের মুদ্রার সঙ্গে আর একদেশের মুদ্রার বিনিময় হার সহজেই ঠিক হয়ে গিয়ে স্থির থাকে। যদি বিলাতের এক সভারিনে ১২৩·২৭ গ্রেণ সোনা থাকে এবং আমেরিকার এক ডলারে ২৫ গ্রেণ সোনা থাকে, তবে অনায়াসেই বলা যায় এক পাউণ্ড ৪·৮৬ ডলারের সমান হবে। এইভাবে দেশ বিদেশের বিনিময় হার অনায়াসেই স্থির হওয়ায় স্বর্ণমানের অধীনে বাণিজ্যে জুয়া খেলা অনেক পরিমাণে কমে যায়।

দোকানদারের দেশ

স্বর্ণমানের এই সব গুণাবালীর জন্য স্বর্ণমানকে লোকে একটু সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যখন আর্থিক, রাজনৈতিক, মানসিক ইত্যাদি সর্ব্ববিধ উন্নতির জোয়ার এসে উপস্থিত হয়েছিল, সেই সময়কার ইতিহাসের সঙ্গে ওদেশের স্বর্ণমানও বিজড়িত। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড স্বর্ণমান গ্রহণ করে; তারপর থেকে পুরো শতাব্দিটা ধরে যেন একটা জাগরণ ও উল্লাসের সাড়া পড়ে গেল। বিজ্ঞানের উন্নতি ও ইনডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউসনের দৌলতে দেশে হাজার হাজার মাল সস্তায় তৈরী হতে লাগলো, মিল ও কলকারখানায় দেশটা ছেয়ে গেল। কোন দেশ জয় করে, কোন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের চুক্তি করে, ইংলণ্ড সেই সব মাল বিশ্বের হাটে ছড়িয়ে ফেললো। বাইরের টাকা ও সোনা এসে দেশটা ভরে গেল। স্বর্ণমান বজায় থাকায় দেশ বিদেশের সিক্কার সঙ্গে নিজ মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখা সম্ভব হয়ে পড়ে এবং তাইতে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা ও লেন-দেন আরো সরল ও ঘনিষ্ট হয়। এদিকে শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ায় নূতন নূতন সোনার খণির আবিষ্কারের ফলে স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দেশের মুদ্রারও সম্প্রসারণ হয় এবং শতাব্দির শেষ দিন পর্য্যন্ত দেশের মূল্যমান

প্রায় একটানা ঊর্দ্ধ গতিতে চলে থাকে। শতাব্দির শেষ কয় বৎসরে দক্ষিণ আফ্রিকার খনিগুলির স্বর্ণ উৎপাদক ক্ষমতা যেন আরো বেড়ে গেল এবং সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য চেক্‌ টাকার প্রচলন খুব বেড়ে গিয়ে দেশের মুদ্রা আরো বিস্তার লাভ করে। ধীর অথচ একটানা মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেশের ব্যবসায়ী মহলে একটা আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়, বিশ্বের হাটের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিগূঢ় হয়ে পড়ায় লণ্ডন সহর পৃথিবীর বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়ে পড়ে, বন্যার স্রোতের মত ব্যবসা ও বাণিজ্যের গতি ইংলণ্ডের দুই কূল ভাসিয়ে নিয়ে চলতে থাকে। উৎপাদনের নানারূপ যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডে সেদিন মাল সস্তায় তৈরী হতে লাগলো, কাজেই বিদেশীদের পণ্য তার দেশে বিকোবার কোন আশা না থাকায় সেদিন সে আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ বিধিনিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে অবাধ বাণিজ্য-নীতির (Free trade) ধোঁয়া তুলে উন্নতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। ইংলণ্ড সেদিন "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী", এই মন্ত্রের সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলো এবং সেদিন থেকে প্রকৃতই সে একটি দোকানদারের দেশে (A nation of shop keeper) পরিণত হলো। এই সব কারণের জন্যই উনবিংশ শতাব্দির শেষ অর্দ্ধেককে ইংলণ্ডে স্বর্ণযুগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইংলণ্ডের এই স্বর্ণযুগের সময় সে দেশে স্বর্ণমান অটুট অবস্থায় বজায় থাকায় স্বর্ণমানের স্বপক্ষীয়রা এর মানকেই উন্নতির সোপান বলে আজও গণ্য করে থাকে।

বিংশ শতাব্দীতে পা দিয়ে যদিও উন্নতির একটানা ঊর্দ্ধ রেখাটি একটু সরল হয়ে আসলো কিন্তু তা এখনও নিম্নগামী হয় নি। কিন্তু গত মহাসমরের প্রারম্ভ থেকেই আর্থিক জগতে যেন রাহুর দৃষ্টি পড়েছে। যুদ্ধে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কাজেই স্বর্ণমানে আবদ্ধ থাকা আর পোষায় না। প্রায় দেশই স্বর্ণমান ত্যাগ করলো, রাশিরাশি কাগজের মেকী অর্থ সৃষ্টি হলো, দ্রব্যমূল্য হু হু করে বেড়ে গেল, কিন্তু আর্থিক জগতের ভাগ্যচক্র আর ঠিক পথে চালিত হলো না। স্বর্ণমান নিয়ে যেন একটা মল্লযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। একবার স্বর্ণমানে ফিরে যাওয়া হয়, তাকে অটুট রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন মনোবৃত্তির পঙ্কিলতায় খাবি খেয়ে আবার ত্যাগ করতে হয়। এই সব দেখে শুনে একালে বিশেষজ্ঞ স্বর্ণমানকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দেবার মতো মতও প্রকাশ করে থাকেন। স্বর্ণমানকে নিয়ে এত টানা-হিঁচড়া করতে করতে এর কিছু অসুবিধা ও দোষের কথাও এদানিং বেরিয়ে পড়েছে। (আগামী বারে সমাপ্য)

ফুড্‌ কমিটির চেয়ারম্যান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ফুড কমিটির চেয়ারম্যানের
পদ তো বেজায় দামী,
পদোন্নতিটা সংখ্যায় কিনা ?
গণিয়া দেখিনি আমি।
নাই কেরোসিন, নাহিক লবণ,
চিনি খাওয়া চেয়ে—হওয়া ভাল মন
চেয়ারে বসিয়া দেখ্‌ছি স্বপন
বিফলে দিবস যামি।
লোকে নুনহীন ব্যঞ্জন খেয়ে
দেয় মোরে গালাগালি,
গুড় দিয়ে খেয়ে চায়ের পাঁচন
দেখে দেয় করতালি।
এত সুখ্যাতি কোথা ছিল মোর,
ভাবি আনন্দে হয়ে থাকি ভোর,
শুষ্ক শূন্য ভাণ্ডার লয়ে
কাহার আদেশ পালি ?
গৃহে গৃহে দিন দেউটী নিভিছে—
আর যে জ্বলে না বাতি।
বর্ষা বাদল দুর্য্যোগে ভয়ে
কাটিছে আঁধার রাতি।
রিক্ত তিক্ত শুধু নাম সার
উপকার চেয়ে বেশী অপকার,
কোনো কর্ম্মেই লাগিল না হায়
সুবৃহৎ শ্বেত হাতী।
কোথা শর্করা আঁধার বাজারে
গোপনে করিছে পথ,
কেরোসিন টিন গজের ভুক্ত
হয় কপিত্থ বৎ।
কোথায় কাপড় কম্বল চট,
পাখা মেলি ধায় উড়ি ঝট্‌পট্‌,
সাধ্য নাহিকো চিনিতে পারি। যে
কাহারা অসৎ সৎ।
'বস্ত্র বস্ত্র' সঙ্গেই শুনি
কিন্তু দৃশ্য নন,
ডাকি প্রাণপণে কোথা দ্রৌপদীর
হে লজ্জা নিবারণ।
পল্লীবাসিনী আমি চাষবাস,
ক্ষোভে ফিরে চায় ফেলি নিশ্বাস,
হে মধুসূদন—একি অভিশাপ
—একি এ বিড়ম্বন।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

ডাক্তার Military master-tailorদের (দরজিদের) সন্ধান দিলেন ; পথে একজন দ্রুত এসে সেলাম করলে, বললে—"আপনাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলুম,—বড়া ভাইয়া পেটের দরদে বেচ্যায়েন হয়ে পড়েছে—বলছে বাঁচবনা। হুজুর মাই বাপ—"

"ঘাবড়াও মত্।" পকেটেই ২।৪টে খুচরো ওষুধ থাকে। ডাক্তার। মুটোখানেক Sodi-B.carb—"গুরু নানক সাহাব কি জয়" বলে খাইয়ে দিলেন। মিনিট ৫।৭ পরে volly fireএর শব্দে মেঘ গর্জ্জনের মত কয়েকটা ঢেঁকুর উঠে যেতেই ভাইয়া উঠে বসল। ডাক্তারের জয় জয়কার পড়ে গেল।

সব "গ্রন্থসাহাব কি" কৃপা, হাম্ হরবখৎ হাজির হায় শিখজি, কুছ্ চিন্তা নেহি। আচ্ছা আব হাম্ চলা, বড়া জরুরি কাম থা, ফির দেখা যায়গা।

"ইয়ে নেহি হো সক্তা, কহিয়ে হুজুর হাম হাজির হায়। তারা দুঃখিত হয় দেখে ডাক্তার উদ্দেশ্যটা খুলে বললেন। "ইয়ে কোন্ বড়া কান ডাক্তার সাহাব। সামকো হাজির হো যায়গা।"

ঠাণ্ডামে বড় কষ্ট পাতা, তাই তকলিফ্ দিয়া ভাই। আর দেখো হামারা দাওয়াই বড়া তেজ হায়, সব-কুছ খা সেক্তে। রাতকো থোড়া সরাব পিলেনা। আচ্ছা ভাই হাম্ চলা।

ডাক্তার বেরিয়ে পড়লেন।

"একবার ষ্টেসনটা ঘুরেই যাই—কি জানি কে কখন লড়ায়ে ছটরা—অর্থাৎ কড়াইশুঁটি বাগাতে আসবেন।—

ওরে বাবা একি! না চাহিতে জল—শুভানুধ্যায়ী যে! যেখানে বাঘের ভয়—

চোখোচোখি হওয়ায়—"এই যে বিনোদ, তোমাকেই খুঁজছিলুম—"

"আমাকে পাবেন কোথা Sir? এক মিনিটও ছুটি নেই—কলেরা কুটীরেই ঘর বাড়ী। অনেকটা কায়দায় এনে ফেলেছি—"

"বেশ বেশ, এই তো চাই ; তা না তো আর তোমাকে—জলটা গরম করে খাচ্চো তো?"

"আজ্ঞে সকাল বেলা আর মিছে কথাটা—আপনি তো সব বুঝছেন—"

কর্ত্তা সহাস্যে—"সকাল বেলা কি হে! মাথার ঠিক নেই যে দেখছি!"

"তা ঠিক বলেছেন Sir, Patientই impatient করেছে, তারাই মাথায় inceissaent ঘুরছে।"

"তা হোক, কিন্তু গরম জলটা অবহেলা কোরোনা। দু'বেলাই—বুঝলে···বিবাহ করেছ, responsibility আছে তা জানো। শুধু পিসিকে আনলেই তো তা যোচে না! সেখানে আমরা তো রয়েইছি—"

"আজ্ঞে চাকরির চেয়ে ওটাকে বড় responsibility বলে যে মনেই হয় না। পিসির 'তীর্থ তীর্থ' বাই আছে তাই। ঐ যে ভাগলপুরের কাছে সুমের তীর্থের পাহাড় আছে কিনা—কার কাছে শুনেছেন সেই জন্যেই। আমারো কর্ত্তব্য সারা হবে—"

কর্ত্তা সহাস্যে—"সুমেরু নয়, মন্দার—"

"ওঃ তাই হবে, কে অত খোঁজ রাখে মশাই। এখন পাঠাতে পারলে বাঁচি। পিসির আর কি দরকার ছিল—আপনি রয়েছেন। চলুন না, বাসাটা দেখে আসবেন, দেখে রাখা ভালো—"

"তা মন্দ কথা নয়, আমার trainএর এখনো তিন কোয়াটার দেরী—"

উভয়ে বাসার দিকে চললেন।

বিনোদ। "মাপ করবেন, জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। রুগীগুলো দেখে এলুম তাদের কথাই মাথায় ঘুরছে। আপনার সে পায়ের ব্যথাটা কেমন—line ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হবে কিনা।"

সাহেব। "এখন যা আছে তাতে কাজ চলে। আর না চললেই বা ছাড়ে কে? বসে থাকবার জন্যে তো আমাদের কেউ পোষে না। জানতো মেম সাহেবরা হাঁচলেও ছুটতে হয়। এই তোমাদের Regimental O/Cকে বড় সাহেবকে দেখা দিয়ে এলুম। আমরা দেখা দিলেই ওঁদেরও একটা কিছু দেখা দেয়। নেড়ে চেড়ে দেখে Brandy আর Egg flip বাড়িয়ে দিয়ে এলুম—বললুম এটা India Sir, বড় doubtful and faithless climate—তাই expert hand পাঠিয়েছি—সন্দেহ হলেই তোমাকে ডাকতে বলেছি।"

বিনোদ। "very kind of you—ও দয়াটি আপনাতেই দেখতে পাই, সকলকেই এগিয়ে দেন—backgroundএ রাখেন না। অনেকেই subordinateদের চেপে রাখেন—"

সাহেব। "Chance সকলকেই দেওয়া উচিত। আর কতটা হে?"

"এই যে, এসে গেছি।"

"ওটা তো—"

"আজ্ঞে ওই"

"ওতে কি করে—"

"কতক্ষণই বা থাকি, রুগীর ঘরেই সময় কাটে—"

"তা কাটুক, সে ভালো। কিন্তু ঘর তো দেখছি একটি, আর একটু বারাণ্ডা—সাড়ে চার হাত হবে—"

মাণিক বারাণ্ডায় রাঁধছিল, খুন্তি হাতে এসে ঝুঁকে নমস্কার করলে—

"সোজা হয়ে ঢোকা যায় না যে, থাক আমি আর ঘরে ঢুকব না (রুমাল নাকে দিলেন)—এর মধ্যে থাকো কি করে?"

"সে তো বলেছি Sir, এখানে রান্না খাওয়া মাত্র। ভাগ্যে মাণিককে

দিয়েছেন, না হলে—এত রুগী অন্তে সামলাতে পারত না। একটু লম্বা কিনা, ভেতরে পা মেলবার স্থান নেই, আড়কাটায় দড়ি টাঙিয়ে মাণিক পা রাখবার sling ঝোলনা বানিয়েছে। অমন দশকর্ম্মান্বিত কাজের লোক না পেলে সামলাতে পারতুম না।"

সাহেব হো হো করে হেসে বললেন—"না না, বাসা বদলে ফ্যালো—বাসা বদলে ফ্যালো—"

"মাপ করবেন—ছাপ্পান্ন plus allowance যা পাই এ দুর্দ্দিনে তাতে পক্কান্ন জোটানোই দায়। আপনি ও বিষয় ভাববেন না আমাদের কষ্ট বলে কিছু নেই, বেশ চলে যাবে—অবশ্য মাণিক থাকলে। যা সব নিত্য দেখছি, আমরা তাদের তুলনায় বাদশা। কারো কুঁড়েতে একমুঠো দানা নেই—"

সাহেব। "থাক্। ওটা এক্ষেত্রে সুসংবাদ হে। দানা থাকলে একটি রুগীকেও বাঁচাতে পারতে না। দেশে সাবুর সাক্ষাৎ তো নেই—ঐ দানা খেতো আর মরতো। কেবল জল দেবে, আর ভগবান জোটান তো কমলালেবু।"

বিনোদ। (স্বগত) লঙ্কার আম্রকানন যাঁদের দখলে পড়েছিল, তাঁদের কুলুলে মিলবে। (প্রকাশ্যে)—"যে আজ্ঞে। এখন বাঁশের ও nasty লাঠি গাছটি দয়া করে ফেলুন দিকি, বড় বেমানান—দৃষ্টি-কটু লাগছে—"

সাহেব। "আরে ওরি সাহায্যে চলতে পারছি—"

বিনোদ। (ঘরের কোণ থেকে বার করে এনে) না Sir, এইটি নিন, ও ফেলে দিন—

সাহেব। (ঘুরিয়ে ফিরিয়ে) বাঃ এ যে grape stick, কোথায় পেলে? না, এ তোমার সখের জিনিস—তুমি রাখ।

বিনোদ। ও একজন present করেছিল—উপহার দিয়েছিল। ও নিয়ে আমি কি করব Sir, পড়েই থাকে, বড় জোর কুকুর তাড়ানো হয়। আপনার হাতে ত proper place পাবে—যোগ্য স্থানে থাকবে।

সাহেব। তবে দাও, তোমার ইচ্ছা হয়েছে (হাত-ঘড়িটা দেখে) ইস্ আর সময় নেই বিনোদ—চললুম। (মাণিকের প্রতি) খুব ভাল করে কাজ কোরো, সুনাম নিয়ে ফেরা চাই। আচ্ছা আজ আর নয়।

সাহেব বেরিয়ে পড়লেন। বিনোদ লাইন পার করে সেলাম করে বললে—"মাণিক আছে বলেই পেরে উঠছি Sir—"

সাহেব। আমি জানি বলেই ওকে দিয়েছি। আচ্ছা যাও। গরম জলের কথাটা—

বিনোদ। আজ্ঞে মনে আছে। (স্বগত) মনেই থাকবে। কিন্তু লোকটা তো মন্দ নয়—ও অলুক্ষুণে দুর্ভাবনাটা কোথা থেকে এসে আমাকে—দূর করো, এখনো কি গেছে!

* * * * *

বাসায় ফিরে বিনোদ বললে—"এদিকে কতদূর হে?"

মাণিক। আজ্ঞে সব ready, কিন্তু আপনি যে আমার length-এর কথা কয়ে সব strength শুকিয়ে দিয়েছেন। বেঁটে রাধু এসে না বাড়া ভাত খায়।

বিনোদ। কথাটা বলেই বুঝেছিলুম—সেরে নিয়েছি—ভেব না। পাকা করে নিয়েছি।

মাণিক। বাঁচালেন Sir, বসে পড়ুন।

বিনোদ। (খেতে বসে) বাঃ তুমি যে রন্ধনেও অরুন্ধতি দেখছি, কি ঝোলই বানিয়েছ, যেন যশোরে শ্বশুরবাড়ী এসেছি। আঃ ভাত পেটে প'ড়ে বাঁচলুম। কিন্তু বেশী খাওয়া হয়ে যায়, চালের মণ যে তেইশ টাকায় তাকাচ্ছে—

মাণিক। খাবার সময় ওসব ভাববেন না—হরি আছেন—

বিনোদ। তা ঠিক্, যখন ধর্ম্মকে ধরে আছি, বিশেষ 'হরিকে'—ওঁর চেয়ে দয়া আর কোন্ দেবতার বেশী! তিনি দেখবেন বই কি।

মাণিক। থাক্ মশাই—

বিনোদ। হ্যাঁ, ধর্ম্মের কথা এখন কেন, বিপদের সময়েই ভাল, সে তো সঙ্গে সঙ্গেই আছে। এখন যে শুতে হবে মাণিক, এ load নিয়ে নড়তে পারব না—

মাণিক। দরকার কি, খাটিয়া পাতাই আছে—একধারে ছাল আছে, এক ধারে খোঁটা পুতে দিয়েছি, পাশ ফিরতে ভয় নেই, পড়বেন না।

বিনোদ। এত সুখ সইলে হয় যে!

মাণিক। কোনো চিন্তা নেই মশাই। এ বাসা ছাড়া হবে না, বড় লক্ষণযুক্ত, কিন্তু রুগীদের যে একবারও—

বিনোদ। হ্যাঁ ধর্ম্মের দিকে চাইতে হবে বই কি—তাই ভালো করে চোখ বুঁজে নিচ্ছি—শরীরম আদ্যম্ কিনা; শরীর রক্ষাও ধর্ম্ম—

বিনোদ হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লেন।

মাণিক। মাথা ঠিক না রাখলে শরীরকে চালাবে কে মশাই। এখন একটা...

বিনোদ। মনে আছে মাণিক—you mean Gold Flake—কইয়ের ঝাঁক যে পেটে ঢুকেছে, ধোঁয়া ঢোকবার ফাঁক আছে কি? এ-পাশ ওপাশ করে সব চৌরোস করে নিচ্ছি হে—

মাণিক। তাই তো বলি আপনার কি ভুল হয়!

বিনোদ। হয় হে হয়। সেকালের ভোজভীমেরা আঁচিয়েই নাকে কাটি দিয়ে দুটো হাঁচতেন, তার ধাক্কায় যে যার স্থানে গুঁড়ি মেরে বসে যেত, তার পর একটা কাঁটালও প্রবেশ পথ পেতো। কি সব মুষ্টিযোগই ছিল। সময়ে ভুলে যাই—

মাণিক। সেকালের ব্যবস্থা একালে না চালানই ভাল, ওকে ভুল বলে না মশাই, এখন গড়িয়ে চৌরোস করুন। বেলা আড়াইটে বাজে। রাত্রে তখন কালকে—

বিনোদ। আর লোভ বাড়িও না। সাহেব বলছিলেন—যে করেছ, responsibility আছে।

মাণিক। সাহেব আবার কে—পল্টনের কর্ত্তা?—O/C?

বিনোদ। কি পাগল, আরে না হে, জান না,—সাবধান। Depart-

mentএর ডগায় বসলেই—তিনি হন সাহেব—তা তিনি যে রঙেরই হোন, আর যতই কালো হোন। কিষণজি আজ বৃন্দাবনে থাকলে বড় সাহেব হতেন। সোলার hat হাল্‌কা হ'লে কি হয়, Crownএর চেয়ে ভারী —brown সাহেবের মাথায় থাকলেও মেজাজে মেরে রাখে। খবরদার 'বাবু' বলে ফেল না।

মাণিক। আজ্ঞে আর কি ভুলি! আচ্ছা শুয়ে পড়ুন। আমার কাজ আছে—

*   *   *   *   *

কাজ সারতে সারতে মাণিক ভাবছে—পিসি এলেন, কই মাছ এলেন, কিন্তু কলেরার কথা যে কন না—ওদিকে পটাপট মরছে। চাকরি গেল দেখছি! এমন ভাললোক পেয়েও—(চমকে) কেরে বাবা—পেল্লায় লম্বা ছায়া যে—পাগড়িসুদ্ধ, সাত ফুট লম্বা জোয়ান—

"ডাক্তার সাহেব হায়?"

"আবি বোলা দেতা হায়" বলেই ঘরে ঢুকে—"এই যে উঠেছেন, আপনাকে কে খুঁজছে দেখুন—এক আকাশ-ফোঁড়া মূর্ত্তি, আমার ওপর এক হাত—

বিনোদ। রুগী নয় তো?

মাণিক। রোগের সাধ্য নেই তার ত্রিসিমানায় ঘেঁসে, well dressed কিন্তু—

বিনোদ। পুলিশ টুলিশ নয় তো হে, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাস্ত্র নয় তো? (চিন্তিত ভাবে) যেতে তো হবেই—(হ্যাট্‌টা মাথায় দিয়ে) জয় মা মঙ্গলচণ্ডী, চলো—

বাইরে পা দিয়েই এক মুখ হাসি! "এই যে মাষ্টার ভাইয়া! ইসকোইতো military punctuality বলে,—মরদ কি বাত্‌।

দর্জ্জি। হুজুর ইসমে রহ্‌তে হেঁ! দৌলত্‌খানা ইয়েই হায়? —তোবা—

বিনোদ। (সহাস্যে) আরে নেহি ভাইয়া, ইঁহা খানা-পিনা করনে আতে—

দর্জ্জি। দেখকে হাম তো তাজ্জব হো গিয়া থা। ইঠো 'কিচেন' হায়, শুকুর (Thank God) লিজিয়ে আপকা হুকুম তামিল হো গিয়া।

(half pantএর পুঁটলি বার করে দিলে)

বিনোদ। হাড় ভাঙা ঠাণ্ডা ভাই, বড়া আপ্যায়িত কিয়া। বড়া ভেইয়া ক্যায়সা হায়?

দর্জ্জি। আপ্‌কা দোয়াসে বাঁচগিয়া হুজুর—

ডাক্তার একটু আড়ালে গিয়ে তার হাতে চারটি টাকা দিলেন।

বিনোদ। বড়া মেহেরবাণী কিয়া। হামকো আবি ছুটনে হোগা, চতুর্দ্দিকে ডামাডোল—

দর্জ্জি। আচ্ছা—ডাক্তার সাব—সেলাম—

বিনোদ। সেলাম ভাই—

(দর্জ্জি চলে গেল)

"এই নাও মাণিক—তোমার গড্‌রেজের লোহার সিন্দুক—এখন প্রবেশ পথ বানাও, অভিমন্যু যেন বেরিয়ে আসতে পারেন, অগস্ত্য গমন না হয়।

মাণিক। আজ্ঞে তাতো বুঝেছি। আপনি টাকা টাকা বলছেন কেন—সবি তো খুচরো কাগজ, ওরা যে একস্থানে জড় হয়ে তাল পাকাবে, তখন প্যাণ্ট যে তেজপাতার থলে হ'য়ে দাঁড়াবে—

বিনোদ। ভেবনা ভেবনা। খাঁদি, পুঁটি মন্ত্রঃপুত হয়ে ঘরে এলেই অপ্সরী। ছাপ থাকলেই মাপ। কেষ্টচন্দ্রের সনন্দ কি আর কেষ্ট থাকতেন, তিনি মথুরায় মতিচুর মারতেন। কাগজেই কাজ চলে—

মাণিক। বাঁচলুম মশাই, ঐ পাঁচহাত লোকটা যেন পীলের ওষুধের মত এসেছিল, আমার পীলেটা শুকিয়ে দিয়ে গেছে। Spyটাই (গুপ্তচর) নয়তো,—বুঝে ফেলেনি তো? দৌলতখানা বললে কেন?

বিনোদ। ওরা বুসের কুঁড়েকেও দৌলতখানা বলে, নবাবী ভাষা কিনা। এখনো ওটা ছাড়তে পারেনি···

মাণিক। তা না ছাড়ুক, আমাদের ছাড়লে যে বাঁচি···

বিনোদ। আরো না না—ভয় নেই—ওরা সেপায়ের জাত—ছোটয় হাত দেয়না—মাথা নেয়, রাজ্য নেয়, তাও নিজের জন্যে নয়—খাঁটি পরার্থপর। যাক্‌ তুমি প্যাণ্টে সুড়ঙ্গ বানিয়ে ফেল,—ওদের আর ফেলবো কোথা?—দেশে বিদেশে আমাদের সর্ব্বত্র শুভানুধ্যায়ী যে—

মাণিক। আজ্ঞে হ্যাঁ,—ওকাজ এখুনি করে ফেলছি। আপনার কোনো কাজ থাকে তো—

বিনোদ। ওঃ—ভারি মনে করে' দিয়েছ thank you—আছে বইকি। কাজের লোকদের কি মরবার ফুরসৎ আছে—একবার 2nd classটা হয়ে আসি—

মাণিক। কেন বলুন দিকি?

বিনোদ। কৈফিয়ৎ দেবার সময় নেই। এ মরা পেটে—ভয়া খোরাক সইবেনা হে—চললুম—

বিনোদ চলে গেল। মাণিক ভাবতে লাগল—আবার একটা কিছু না মাথায় করে আসেন। 'কই' problem যুধিষ্ঠিরকে পাইয়েছে, এবার না একটা অনাসৃষ্টি আমদানী করে ফেরেন! সকালে কিন্তু রুগী দেখতে না গেলে এ চাকরী ফেলে পালাতে হবে—হাহাকার পড়ে গেছে। ষ্টেসনে দেখলুম দু'তিন জন লোক ডাক্তারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাসার খোঁজ নিচ্ছে, এখন ওঁকে বললে সারারাত আর ঘুমুবেন না। ও খাটিয়ায় ছট্‌ফট্‌ করার জায়গাও নেই। যেমন ভীতু, তেমনি নার্ভাস্‌, একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন।

মাণিক কাঁচি আর সূচ-সুতো নিয়ে সুন্দরের যাতায়াতের সুড়ঙ্গ বানাতে বসল।

*   *   *   *   *

তিনটি ভাল ম্যাজিক

যাদুকর পি-সি-সরকার

এবারে আমি তিনটি অতিশয় সহজ অথচ চমকপ্রদ ম্যাজিকের কৌশল প্রকাশ করিব। প্রথম খেলাটির নাম "অপরের লিখিত বিষয় পাঠ করা" বা **Billet Reading Teste.** বিলাতে ও আমেরিকায় এই জাতীয় খেলা আজকাল খুবই প্রচলিত কারণ ইহা **Mental Magic**এর অন্তর্গত, আমেরিকায় "Dr. Q" নামক জনৈক বিশিষ্ট যাদুকর এই ধরণের খেলা আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীময় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। সে দেশে মানসিক খেলা (**Mental Magic**) সম্বন্ধে নিয়মিত গবেষণার জন্য **"Jinx"**

আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর জ্যাক গুইন (**Jack Gwynne**)

নামক একটি পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। পরবর্ত্তী খেলা দুইটি যান্ত্রিক কৌশলের খেলা বা **Apparatus Magic.** আমাদের দেশের যাদুবিদ্যাসমূহ প্রায়ই হস্তকৌশলজাত, ইহাতে যান্ত্রিক কৌশল বা ঔষধপত্রের কারসাজী খুব কমই থাকে। কিন্তু জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশীয় যাদুবিদ্যাতে হস্তকৌশল অপেক্ষা যান্ত্রিক কৌশলই বেশী থাকে। কোন দেশ বা জাতির পূর্ণতা নির্ভর করে তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উন্নতির উপরে। কাজেই এদেশের ম্যাজিককে পূর্ণতা দিতে হইলে, এদেশীয় হস্তকৌশলজাত খেলার সহিত পাশ্চাত্যের অতি আধুনিক যন্ত্রকৌশল সম্বলিত খেলার যোগ করিতেই হইবে। এটা যে বিজ্ঞানের যুগ, বিদ্যুৎ-রেডিও-টেলিফোন টেলিগ্রাম প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়া ইহা ম্যাজিকের উপরের ম্যাজিক **"Super Magic"** দেখাইয়া চলিয়াছে। আধুনিক যাদুকরকে ওদেশীয় এবং এদেশীয় উভয় প্রকার যাদুবিদ্যার মিশ্রণ করিয়া লইতে হইবে। সেজন্যই ভারতীয় যাদুকরগণ আমেরিকা ও ইউরোপীয় যন্ত্রসম্বলিত খেলা শিক্ষা করিবেন এবং সে দেশীয়গণ এ দেশীয় খেলা শিক্ষা করিবেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে টাকা থাকিলেই (অর্থাৎ টাকা ব্যয় করিয়া যন্ত্র তৈয়ার করিলেই) সেদেশের

যাদুকর গুইন একটি চীনদেশীয় খেলা দেখাইতেছেন

বড় বড় খেলাগুলিও আমরা করিতে পারি, কিন্তু আমাদের খেলা যে তাঁহাদের ধাতে একেবারে সহিবে না। ইহার পশ্চাতে প্রয়োজন হইবে দীর্ঘকালের সাধনা, বৎসরের পর বৎসর নিয়মিত চেষ্টা ও অভ্যাস। সেদিন আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর 'জ্যাক গুইন' **Jack Gwynne** সাহেব চীনযাত্রার পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ রণ-ক্ষেত্রে মার্কিণ সৈন্যদিগকে আনন্দ পরিবেশন করার উদ্দেশ্যেই এদেশে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসার পর তিনি এদেশীয় খেলার ধরণ দেখিয়া অবাক হইয়া যান। এই ধরণের যাদুবিদ্যায় তিনি বা তাঁহারা মোটেই অভ্যস্ত নহেন। আমার কতকগুলি খেলায় তিনি এতো

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন যে মুক্তকণ্ঠে তিনি আমেরিকার পত্রিকাসমূহে উহার বিস্তৃত বিবরণ ও প্রশংসা করিয়াছেন। সে গৌরব আমার নিজের প্রাপ্য নহে। উহা ভারতীয় যাদুবিদ্যার গৌরব—কারণ তাঁহারা পাশ্চাত্যের যাদুবিদ্যাই জানেন—প্রাচ্যের মনস্তত্ব সম্বলিত খেলাসমূহের তাঁহারা কিছুই জানেন না এবং সেইজন্য পথের সামান্য বেদিয়ারাও তাঁহাদিগের নিকট এক একটি বিরাট বিস্ময়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মার্কিণ যাদুকর 'জ্যাক গুইন' (Jack Gwynne) ভারতীয় যাদুবিদ্যা দেখিয়া যে মুগ্ধ হইয়াছেন ইহা আমাদেরই গৌরবের কথা। যাহা হউক এক্ষণে আমার খেলা তিনটির কৌশল প্রকাশ করিতেছি।

অপরের লিখিত বিষয় পাঠকরা (Billet Reading Tests)

অপরের-লিখিত বিষয় পাঠ করার খেলাটি খুবই চমকপ্রদ এবং ঠিকমত করিতে পারিলে এই এক খেলাতেই যাদুকরের যথেষ্ট নাম হইবে। মনে করুন যাদুকর অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড কাগজ দর্শকদের মধ্যে বিলি করিয়া দিলেন এবং দর্শকদিগকে উহার মধ্যে নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন ফুলের নাম, ফলের নাম, লোকের নাম যাহা খুশী লিখিতে বলা হইল, তাঁহারা ইচ্ছামত লিখিয়া ছোট করিয়া ভাঁজ করিয়া যাদুকরের হাতে ফেরৎ দিলেন। যাদুকর সর্ব্বসমক্ষে একটি কাঁচের গ্লাস তুলিয়া লইয়া উহা বামহাতের তালুতে বসাইলেন এবং ডান হাতের মুঠায় সমস্ত লিখিত কাগজগুলি সর্ব্বসমক্ষে গ্লাসের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। পরে গ্লাসের মুখ একটি সাধারণ রুমাল দ্বার ঢাকিয়া সেটিকে রবারের ব্যাণ্ড অথবা সুতা দ্বারা বাঁধিয়া গ্লাসটিকে সর্ব্বসমক্ষে একটি টেবিলের উপর বসাইয়া দিলেন। এইবার তিনি কয়েক মিনিটের জন্য পর্দার অন্তরালে যাইয়া বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া চক্ষুমুখ ধুইয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন—একজন লিখিয়াছেন "হল্যাণ্ড", অপরজনে "গোলাপ ফুল", অপরজনে "রডড্রেনডন গুচ্ছ" ইত্যাদি। দর্শকগণ নিজেদের লিখিত বিষয় পঠিত হইতেছে দেখিয়া অবাক হইলেন। এইবার যাদুকর গ্লাসটি পুনরায় বাম হাতের তালুতে বসাইয়া উপরকার রুমাল খুলিয়া দিলেন এবং ভিতরকার কাগজের টুকরাগুলি দর্শকদের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। এইবার খেলার গোপন কৌশল বলা যাইতেছে। যে সাধারণ কাঁচের গ্লাসে ঐ কাগজের খণ্ডগুলি রাখা হইল উহা মোটেই সাধারণ নহে। উহার তলা নাই, কাজেই বাম হাতের তালুতে বসাইয়া মধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে উহা বাম হাতের তালুতেই যায় এবং হাতের তালুতে জিনিষ রাখিয়া গ্লাস তাহার উপরে বসাইলে এবং উপুড় করিলে গ্লাসের মধ্য হইতে জিনিষ বাহির হয়। বাকী অংশ নিরতিশয় সহজ। দর্শকদিগের লিখিত বিষয় গ্লাসে বন্ধ করিয়া যাদুকর যখন পর্দার অন্তরালে পোষাক পরিবর্ত্তনের জন্য গেলেন সেই ফাঁকে তিনি সেখানে কাগজগুলি খুলিয়া বিষয়গুলি পাঠ করিয়া মুখস্থ করিয়া পুনরায় ভাঁজ করিয়া লইয়া আসিলেন। এক্ষণে পাঠ করা হইলে বাম হাতের তালুস্থিত কাগজগুলির উপর গ্লাস বসাইয়া গ্লাসের মুখ খুলিলেই সমস্ত হইল। গ্লাসের তলা কাটিয়া সেখানে revolving এবং সেলুলয়েডের তলা লাগাইয়া লইয়া (যাহার নীচের পিঠে কয়েক খণ্ড কাগজ আঠার দ্বারা লাগান থাকিবে) এই খেলা আরও উন্নত করা চলে। তবে যন্ত্রটি তৈয়ার করা কঠিন হইয়া পড়ে প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে এইটুকুমাত্র অসুবিধা।

ভিক্টরী ফ্লাগের খেলা (A Patriotic Move)

আমি এই খেলাটি যুদ্ধকালে মিলিটারীর লোকদিগকে এবং রাজপুরুষদিগকে—বিশেষ করিয়া বড়লাট, ছোটলাট, যুদ্ধের সেনাপতি প্রভৃতিকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে আবিষ্কার করি। বলাবাহুল্য আমার এই খেলা যেখানেই দেখাইয়াছি উহা বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। একটি ২০ ইঞ্চি লম্বা ও ১৬ ইঞ্চি প্রস্থ কাল রংএর ভেলভেট কাপড়ের টুকরা দেখান হইল—উহাকে চিত্রের ন্যায় মধ্যস্থলে ভাঁজ করিয়া ধরিয়া মধ্যস্থলে কয়েকখণ্ড সরু সিল্কের (হলুদ) ফিতা রাখা হইল—চিত্রে উহাও দেখান হইয়াছে। এইবার এটিকে ঝাড়িয়া ফেলিতেই দেখা যাইবে যে সেই ফিতা দ্বারা······—এবং 'V' for victory লেখা হইয়া গিয়াছে (চিত্র দেখুন)। দর্শকগণ এতদ্দর্শনে খুবই অবাক হইয়া যাইবেন। খেলাটি অনেকাংশে আমার তাসের রং পরিবর্ত্তন খেলাটির ন্যায়। আমার 'ছেলেদের ম্যাজিক' পুস্তকে দেখান হইয়াছে কি ভাবে একটি তাসের 'ফ্লাপ' উপর হইতে নীচে উঠা নামা করাইলেই তাসের রং পরিবর্ত্তন হয়। এ ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে মধ্যকার ফ্লাপ ছাড়িয়া দিলেই 'V' for victory লেখা বাহির হয়। চিত্রের প্রথমে (······) চিহ্ণ দ্বারা মধ্যস্থলের বিভাগ দেখান হইয়াছে এবং ফ্লাপটি পড়িয়া রহিয়াছে। ফ্লাপটি
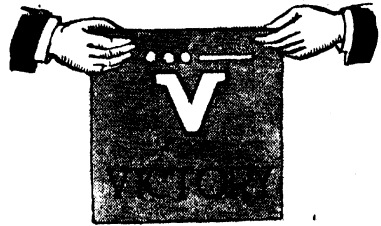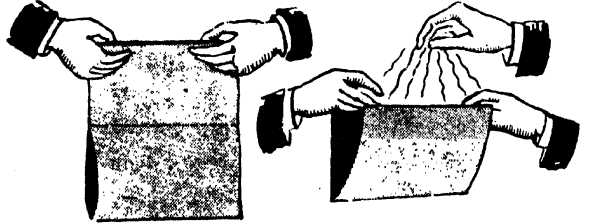
ভিক্টরী ফ্লাগের খেলা

উঠান থাকিলে একরূপ দেখাইবে এবং নামান থাকিলে অন্যরূপ দেখাইবে। পূর্ব্ব হইতেই একদিকে 'V' for victory লেখা থাকিবে এবং ফ্লাপদ্বারা উহা ঢাকা থাকিবে। যে সব ফিতাগুলি দেওয়া হয় উহা ফ্লাপের পিছনের ব্যাগে লুকান থাকে। এইবার জোরে ঝাঁকানি দিলেই 'V' for victory লেখা বাহির হইবে। যাহারা এই লেখার পরিবর্ত্তে অন্য লেখা বাহির করিতে চাহেন, তাঁহারা Good Night লেখা বাহির করিতে পারেন। এই ভাবে Good Night লেখা বাহির করিয়া খেলা শেষ করাটা খুবই 'আর্টিষ্টিক' হয় এবং বিলাতের বড় বড় যাদুকর নিজেরা এইরূপই করেন এবং এইরূপ করিতে নির্দ্দেশ দেন। এক্ষেত্রে সুবিধা এই যে চিরচলিত প্রথামত আর মুখে বলিতে হয় না "সমবেত দর্শকমণ্ডলী, এই খেলাই আজ আমার শেষ খেলা, ইত্যাদি"। ঝাঁকানি দিয়া Good Night লেখা বাহির করিয়া দিলেই হইল। বর্ত্তমানে আমি Good Night Target একটি খেলার আবিষ্কার করিয়াছি—এটি দ্বারা প্রোগ্রাম শেষ করা যায়।

"Good Night Target" গুড নাইট্ টারগেট

এইটি আমার সর্ব্বশেষ খেলা। রঙ্গমঞ্চের মধ্যে একটি Target বা চাঁদমারী ফিতা দ্বারা ঝুলান রহিয়াছে। যাদুকর সমস্ত খেলার শেষে রঙ্গমঞ্চে আসিলেন এবং দর্শকদিগকে তাঁহার মন্ত্রপূত চাঁদমারীর দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন। দর্শকগণ সেইদিকে তাকাইয়া আছেন, তখন দুম্ করিয়া যাদুকরের পিস্তলের আওয়াজ হইল। কি আশ্চর্য্য, যেস্থলে চাঁদমারী ছিল সেখানে রাজা ও রাণীর ছবি রহিয়াছে—উপরে রহিয়াছে রাজমুকুট (crown), দুইদিকে বড় বড় দুইটি ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক' এবং দুইটা ছোট ফ্লাগের মালা দ্বারা উহা ঝুলান—শুধু তাহাই নহে, দুইটা ছোট বোর্ডের উপর লেখা রহিয়াছে Good Night সঙ্গে সঙ্গে "God save the king" এই Back ground Music বাজিয়া উঠিল এবং খেলা শেষ। যাঁহারা ইচ্ছা করেন মধ্যস্থলে মহাত্মা গান্ধীর ছবি, উপরে চরকা এবং দুইদিকে স্বরাজ পতাকা দ্বারা খেলাটি করিতে পারেন—এক্ষেত্রে back ground music 'বন্দে মাতরম্' দিতে হয় তবে খেলা সুন্দর হয়। আমি এইভাবে অনেকবার করিয়াছি এবং সকলেই এই খেলা পছন্দ করিয়াছেন। এই খেলায় সুবিধা এই যে চিরাচরিত প্রথায় আসিয়া বলিতে হয় না—"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! এবারে আমার খেলা শেষ হইল, ইত্যাদি।" একটিবারমাত্র বন্দুকের আওয়াজ করিলেই Good Night লেখা বাহির হইল এবং যাদুকর মাথা একটু নীচু করিয়া দর্শকদিগকে অভিবাদন করিলেন ও বিদায় লইলেন, সকলেই বুঝিলেন খেলা শেষ। এই খেলাটির মূল কৌশল ঐ যন্ত্রটি প্রস্তুত করার মধ্যে—লিখিয়া উহা বুঝান কষ্টকর—চিত্রে ইহা খুব ভাল করিয়া দেখান হইয়াছে। 'ক্রাউন'টি স্প্রিংএর সাহায্যে ফিট করা থাকে এবং টারগেটের পিছনে ভাঁজ (fold) করা থাকে। সুতা টানিয়া দিলে উহা লাফ দিয়া সোজা দাঁড়াইয়া উঠে। ফ্লাগের রড দুইটি দুইবার ভাঁজ হইয়া টারগেটের পিছনে লুকান থাকে—ঐগুলিও স্প্রিং-এর কব্জা দ্বারা আটকান কাজেই একটু আল্গা দিলেই লাফ দিয়া দুইদিকে দুইটি খুলিয়া যায়। ছোট ছোট ফ্লাগের মালা দুইটির একপ্রান্ত ঐ ফ্লাগরডের সহিত ও অপর প্রান্ত টারগেটের উপর দিকে আটকান থাকে এবং উহা গুটাইয়া (ভাঁজ করিয়া) রাখিতে হয়। সম্মুখের টারগেটটি তিন পিস (3 Ply) কাঠের তৈয়ারী, মধ্যস্থলে দুই খণ্ড হইয়া দুইদিকে চলিয়া যায় এবং প্রত্যেক খণ্ড মধ্যস্থলে ভাঁজ হইয়া পড়ে—উহাতে লেখা থাকে একটিতে Good এবং অপরটিতে Night, এই খেলার মজা এই যে একটিমাত্র ১৬ ইঞ্চি স্কোয়ার টারগেট হইতে ৮০ ইঞ্চি লম্বা ও ২৪ ইঞ্চি চওড়া জিনিষ বাহির হইয়া ষ্টেজ ভরিয়া
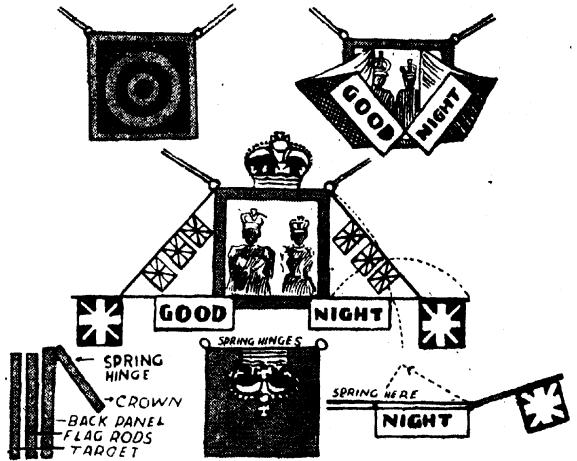
গুড-নাইট টারগেট খেলা ও তাহার নির্ম্মাণ কৌশল

যায় কাজেই সকলে এখেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। চিত্রে প্রথমে ঐ টারগেট দেখান হইয়াছে—তৎপর দেখান হইয়াছে কি ভাবে টারগেট দুই ভাঁজ হইয়া Good এবং Night কথা দুইটি বাহির হয়। তারপর দেখান হইয়াছে Good Night Target খুলিয়া গেলে উহা কিরূপ দেখাইয়া থাকে। উহার পরেই এই টারগেটের যথাক্রমে পার্শ্বের দৃশ্য (Side View) এবং পশ্চাতের দৃশ্য (Back View) দেখান হইয়াছে। সর্ব্বশেষে Flag Rodগুলি কি ভাবে ভাঁজ করা থাকে তাহাই দেখান হইয়াছে। খেলাটি অতিশয় সহজ, সুন্দর এবং এইটি প্রত্যেক ব্যবসায়ী যাদুকর দেখাইতে পারেন। আমি নিজে এই খেলাটি অদ্যাবধি দেখাইয়া থাকি। চিত্র ভাল করিয়া দেখিলে এই যন্ত্র প্রস্তুতের কৌশল সহজে বোধগম্য হইবে। ইহার সমস্ত অংশই কাঠের তৈয়ারী হইলেও আমি পিতল দিয়া ইহা তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছি। পিতলের উপর নিকেল করা 'গুড নাইট টারগেট' যন্ত্র সম্বলিত ম্যাজিক জগতে খুবই আদরের খেলা। এই ধরণের খেলাকেই আমরা "delightfully beautiful" আখ্যা দিয়া থাকি।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫

খুব ভোরে ওঠাই মণিমোহনের অভ্যাস। আজও যখন তার ঘুম ভাঙিল, ঘড়িতে পাঁচটা বাজে নাই তখনও। কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অনুজ্জ্বল আলো ঘরে ঢুকিয়া অন্ধকারটাকে যেন সবুজ আর স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। পাশে রাণী ঘুমাইয়া আছে, ঝিণ্টু দু হাত দিয়া একান্ত করিয়া আঁকড়াইয়া আছে মা-কে। রাণীর বিস্রস্ত চুল হইতে একটি স্তবক আসিয়া ঝিণ্টুর নিদ্রিত মুখের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—মায়ের উপর স্পর্শ সুগভীর ভালোবাসার মতো।

এই তো জীবন। পরিপূর্ণ—সমস্যাহীন, সংঘাতহীন। বংশচক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে, মানুষের বিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে—বিস্তার ঘটিয়া চলিয়াছে জৈব প্রবাহে। প্রাণ হইতে প্রাণে, রূপ হইতে রূপে। কী প্রয়োজন বিপ্লব ঘটাইয়া, উল্কার আলোকে জীবনে আহ্বান করিয়া? যা কখনো সত্য হইয়া উঠিবে না—একটা প্রখর আলোর বিচ্ছুরিত রশ্মিধারায় জ্বালাইয়া দিয়া যাইবে শুধু?

স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিল মণিমোহন। ভোরের আলোয় তন্দ্রাচ্ছন্ন পৃথিবী। চর ইসমাইলের নোনা মাটিতে প্রাণের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই তো পরিণতি। অসীম উন্মুক্ততার যাযাবর বৃত্তি হইতে নীড়ের সংকীর্ণ সীমানাতে—সংঘাত হইতে সন্ধিতে।

রাণী ঘুমাইতেছে—ঝিণ্টু ঘুমাইতেছে। পায়ের কাছ হইতে র‍্যাগটা তুলিয়া আনিয়া দুজনকেই সযত্নে ঢাকিয়া দিল মণিমোহন। এ পাশের জানালা দিয়া ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। এই ঠাণ্ডাটা ভালো নয়, রাণীর জ্বর আবার বাড়িতে পারে। টেবিলের উপরে ম্লানাভ লাল লেখা বিকীর্ণ করিয়া একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে, পোড়া কেরোসিনের লঘু বিস্বাদ গন্ধ ঘরময় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মণিমোহন লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিল।

পায়ের মধ্যে চটিটা টানিয়া আনিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল সে। আবছায়া আলোয় গ্রাম এবং অরণ্য যেন অবসিত স্বপ্নের রেশ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। সামনের বাবলা গাছটায় দু তিনটা কাক একসঙ্গে পাখা ঝাড়া দিয়া কা কা করিয়া প্রভাতী ঘোষণা করিল, বৈতালিক মুরগীর উদাত্ত আহ্বান ভাসিয়া আসিল গ্রামের দিক হইতে। ওপাশে নদীর উপরে খানিকটা হালকা কুয়াশা জমিয়া আছে, ভালো করিয়া নজর চলে না, শুধু কতগুলি নৌকার দীর্ঘ মাস্তুলকে অনুমান করিয়া লওয়া চলে মাত্র।

বারান্দায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে। ভারী ভালো লাগিতেছে—এই অপূর্ব ব্রাহ্ম মুহূর্তে মনের উপর হইতে সমস্ত দ্বন্দ্ব—সমস্ত সংশয়ের জালটা যেন সরিয়া গিয়াছে। ঝির ঝির করিয়া হাওয়া আসিয়া যেন উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে রাত্রির সমস্ত জড়তা—সমস্ত ক্লান্তি।

একটা দাঁতন করিতে করিতে পিয়ারী দেখা দিল। মণিমোহন বলিল, কোটটা বার করে দে তো, দু পা হেঁটে আসা যাক।

নদীর ধার দিয়া মেটে পথটায় সে চলিতে লাগিল। একটু একটু করিয়া প্রসন্ন উজ্জ্বল দিন দিগন্তে ফুটিয়া উঠিতেছে। আকাশের নীলিমা এখনো স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই—ধূসরতার একটা আচ্ছাদন পূর্বাচলকে সমাবৃত করিয়া আছে। তাহারি মধ্য দিয়া উজ্জ্বল রক্ত বিন্দুর মতো সূর্য দেখা দিল—সেদিকে তাকাইয়া মণিমোহনের মনে হইল যেন ভস্মভূষণা গৌরীর সীমন্তে সিন্দূরের একটা বিন্দু জ্বলিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন একনিষ্ঠ হইয়া তপস্যা করিতেছে—যেন স্থিরব্রতা পার্বতীর মতো বরাভয় কামনা করিতেছে জীবনের জন্য, কল্যাণের জন্য, সন্তানের জন্য।

পায়ের নীচে ঘাসের উপর শিশির বিন্দু চিক চিক করিতেছে। নদীর গেরিমাটি রাঙা জল লাল হইয়া উঠিল। এক একটি করিয়া নৌকা ভাসিয়া পড়িল—পূবের কোনো চরে কাজ করিতে চলিল হয়তো।

—সেলাম হুজুর।

সামনে একটি মুসলমান যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতে একটি কালো ভাঁড়ের মধ্যে খানিকটা দুধ। বলিষ্ঠ বুক, বলিষ্ঠ পেশী। হাতটা আর একবার কপালে তুলিয়া বলিল, হুজুর, সেলাম।

মণিমোহন দাঁড়াইয়া পড়িল।

—কী চাই তোমার?

—একটা কথা বলব হুজুর।

—বলো।

রূপার সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া মণিমোহন সিগারেট ধরাইল, তারপর লোকটির মুখের দিকে তাকাইল। ঠিক মুখের দিকে নয়—মুখের পাশ দিয়া তির্যক ভঙ্গিতে আকাশের একপ্রান্তে এক খণ্ড শাদা মেঘের দিকে। অধস্তনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার ইহাই আভিজাত্য সম্মত প্রথা—বহুদিনের অভ্যাসে এই আর্টটা মণিমোহন আয়ত্ত করিয়াছে। নীচের দিকে চাহিলে দীনতা, পাশের

দিকে তাকাইলে অন্যমনস্কতা, ঠিক মুখোমুখি তাকাইলে একটা অবাঞ্ছিত সাম্যবোধ। অতএব ঠিক কানের পাশ দিয়া এমনভাবে উপরের দিকে চোখ তুলিয়া রাখিবে যে তোমার মুখের পানে চাহিলেই মনে হইবে তুমি নিতান্তই এই পৃথিবীর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নও—তোমার সহিত ঊর্ধ্বের কোনো একটা স্বর্গলোকের নিবিড় আত্মীয়তা আছে। একজন সিনিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এই সমস্ত মূল্যবান মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক উপদেশ দিয়া মণিমোহনকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করিল—নিজের মনের সংকোচ ও সংশয়টাকে জয় করিবার চেষ্টা করিল বার কয়েক। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলিল, আপনি হাকিম, আপনাদের হাতেই সব। জুলুমবাজি বন্ধ করবার একটা ব্যবস্থা করুন হুজুর।

জুলুমবাজি? কিসের জুলুমবাজি?

—মহাজনের, আড়তদারের।

কথাটা তীরের মতো তীক্ষ্ণ হইয়া মণিমোহনের কানে আসিয়া আঘাত করিল। এই সুরটা ভালো নয়—সাধারণ একজন মুসলমান চাষা প্রজার মুখ হইতে কথাগুলি যেমন অবাঞ্ছিত, তেমনি অস্বস্তিকর। জমি লইয়া ঝামেলী নয়, নারীঘটিত ব্যাপারও কিছু নয়, নজরটা সোজা গিয়া পড়িয়াছে মহাজন আর আড়তদারদের উপরে। অবচেতন চিন্তাকে চকিত করিয়া দিয়া মনে হইল, লোকটা যাহা বলিতেছে, এইখানেই তাহার শেষ নয়—ইহার মূল দূর-দূরান্তব্যাপী—ইহার জটিল শিকড়ের জাল আরো অনেকখানি গভীরে গিয়াই ঠেকিয়াছে। সহরের পথে ঘাটে বজ্রকণ্ঠে 'শ্লোগান' শুনিলে ভয় করে না—পতাকাবাহী জনতার চলন্ত মিছিলটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ভালোই লাগে একরকম। কিন্তু চর ইস্‌মাইলের এই প্রত্যন্তে এমনি একটুা সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যেই যেন আসন্ন বৈশাখী ঝড়ের সংকেত লুকাইয়া থাকে।

ঊর্ধ্বচারী দৃষ্টিটা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল—সোজা আসিয়া পড়িল লোকটির মুখের উপরে। যেন তাহার ভিতরের সবটাই মণিমোহন দেখিয়া ফেলিতে চায়। খানিকটা সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশব্দে নদীর হুহু বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে জমির। কলুপাড়ায় আমার বাড়ী—হাট বাজার করতে প্রায়ই এখানে আসতে হয় আমাকে। কাসেম খাঁর ব্যাটা বললেই লোকে চিনবে আমাকে।

—হুঁ। তা আড়তদার মহাজনের ওপরে এত চটেছ কেন?

—তা ছাড়া আর কার ওপরে চটব হুজুর? আপনি তো হাকিম—প্রজার মা বাপ, নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছেন। যুদ্ধের জন্যে আকাল দেখা দিয়েছে চারভিতে। কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না—আধপেটা খেয়ে কোনোমতে দিন কাটাচ্ছে মানুষ। ওদিকে অসুখ বিসুখ—সরকারী দাওয়াই-খানাতে এক ফোঁটা ওষুধ নেই যে—

যেমন অস্বস্তি, তেমনি বিরক্তি বোধ করেন মণিমোহন। যেন বক্তৃতায় পাইয়াছে লোকটাকে। কখন যে সংকোচ আর ছায়ার আবরণটা তাহার সরিয়া গেছে—একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা পড়িয়াছে চোখে মুখে—কঠিন হইয়া উঠিয়াছে খাড়া চোয়ালে, কুঞ্চ ভ্রূ রেখাতে। প্রসারিত বুক আর সুগঠিত মাংসপেশীতে যেন শক্তির তরঙ্গ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। চকিতে একটা তীব্র সন্দেহে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। লোকটা পলিটিক্স করিয়া বেড়ায় না তো? গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গড়িয়া যাহারা—

হাতের সিগারেটটাকে জুতার নীচে মাড়াইয়া সে অসহিষ্ণুভাবে বলিল—আমার সময় নেই, সংক্ষেপে বলো।

—আজ্ঞে, সংক্ষেপেই বলব। আপনি হাকিম—কত কাজ, কত ভাবনা আপনার—সে কি আর জানিনা। যেন বিনয়ে গলিয়া গেল জমির।

কিন্তু এই বিনয়টাও তেমন প্রীতিকর লাগিলনা! ইহার মধ্যে কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাস আছে—একটা বিদ্রূপের খোঁচা আছে। হঠাৎ মনে হইল সরকারী বাবু কিংবা হাকিমদের সে সব দিন যেন আর নাই। মাটির তলায় কোথায় বাসুকীর ফণা আর ভার বহিতে পারিতেছে না—বহুদিনের আদায় করিয়া লওয়া সম্মান আর আভিজাত্যের সিংহাসনটা যেন কিসের স্পর্শে টলমল করিয়া নড়িতেছে।

—বলো, বলো, কী বলছিলে বলো।

—আজ্ঞে চাল তো ক্রমেই আক্রা হয়ে উঠছে। বেশি দর পেয়ে যারা ধান বেচে দিয়েছিল, তাদের ঘরের খোরাক ফুরিয়ে গেছে। আধিয়ার আর জন মজুরদের তো কথাই নেই। চাল কিনতে পারছে না কেউ। সব গিয়ে জমেছে আড়তদার আর মহাজনের গোলায়। ধান কিনতে গেলে পনেরো ষোলো টাকা দর হাঁকে তারা। অথচ হুজুর—বোঝেন তো—

—বুঝি।—মণিমোহনের গলার স্বরে এবারে আর স্বচ্ছন্দ ঔদার্য প্রকাশ পাইল না: তা আমাকে কী করতে হবে?

জমির কিন্তু দমিল না: আপনিই তো সব করবেন হুজুর। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সকলকে চাল ছাড়তে বলে দিন, নইলে মানুষ না খেয়ে মরে যাবে।

লোকটা যেন হুকুম করিতেছে!

চড়া গলায় মণিমোহন বলিল: চাল ছাড়তে বলব? আমার

কথা কেন শুনতে যাবে ওরা? মহাজনের ধান—সে যদি বিক্রী করতে না চায়, তা হলে কার কী বলবার আছে?

জমির আবার হাসিল: আপনার কথা শুনবে না? এও কি একটা কথা হল হুজুর? আপনি যা বলবেন, তাই হবে। আপনাকে মানবে না—কার ঘাড়ে এমন কটা মাথা গজিয়েছে?

শেষ কথাগুলির মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা আছে তবু মণিমোহন খুশি হইয়া উঠিতে পারিল না। বলিল, আমি তো বললাম, তবু ওরা যদি চাল ছেড়ে না দেয়?

জমিরের চোখ ঝক ঝক করিয়া উঠিল: তা হলে বাকীটা আমাদের ওপরেই ছেড়ে দেবেন। আমরাই দেখব কিছু করতে পারি কি না! বড়লোক হলেই গরীবকে মারবার এক্তিয়ার কারো জন্মায় না হুজুর।

কিন্তু মণিমোহনের প্রসঙ্গটা আর ভালো লাগিতেছে না। প্রসন্ন সকাল—নদীর জলে প্রথম সূর্যের আলো পড়িয়াছে। ভিজা বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে মাটির মিষ্টি গন্ধ। সমস্ত পৃথিবীটার যেন সুর কাটিয়া গেছে—আকাশ বাতাস ঘিরিয়া একটা আসন্ন দুর্যোগের কালো ইঙ্গিত যেন ছায়া ফেলিয়াছে লোকটার সর্বাঙ্গে। অধীরভাবে মণিমোহন বলিল, আচ্ছা, পরে আবার দেখা কোরো। এখন সময় নেই আমার।

—সেলাম হুজুর।

জমির আর দাঁড়াইল না। দুধের ভাঁড়টা মাটী হইতে তুলিয়া লইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানে এডিংটনের দান

অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে

স্যার আর্থার এডিংটনের মৃত্যু বিজ্ঞান জগতের অপরিসীম ক্ষতি; জ্যোতির্বিদ্ ও প্রাকৃতিক দর্শনবিদ্‌রূপে এই মনীষী বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতিভাসূর্য্য মধ্যাহ্ন আকাশে বিদ্যমান থাকিতেই ৬২ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। জন্ম মৃত্যু মনুষ্যজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু এক একজন মানুষ এই পৃথিবীতে আসেন যাঁহাদের মৃত্যুতে বিশ্বমানব ক্ষতি ও অভাববেদনা বোধ করে। এডিংটন ছিলেন এই শ্রেণীর মানুষ। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁহার দান বিপ্লবাত্মক ও সুগভীর সম্ভাবনাপূর্ণ। তাই তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় এবং আজ পৃথিবীর সর্বত্র জ্ঞানপিপাসু মাত্রেই তাঁহার অভাব বেদনা বোধ করিতেছে।

এডিংটন ছাত্রজীবনে একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকীয় বীক্ষণাগারের (Royal ovservatory) প্রধান সহায়ক নিযুক্ত হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষে প্লুমিয়ান প্রফেসার (Plumian Professor) পদ পান এবং পরবর্ত্তী বৎসর ক্যাম্বিজ বীক্ষণাগারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। এই বৎসরই তিনি রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী।

নাক্ষত্র-জ্যোতিষ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অতি অল্প দিনের। এডিংটনের রচিত Stellar Motions and the structure of the Universe পুস্তকে (১৯১৪ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথম নাক্ষত্র-জ্যোতিষ সম্বন্ধে সমগ্রভাবে তথ্যাদি প্রকাশিত হয়।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের গুরুত্ব অত্যল্প সময়ের মধ্যেই এডিংটন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯১৪—১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় মহাসমরের জন্য অপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে তথ্যাদি ইংলণ্ডে অনেকটা অজ্ঞাত ছিল। ওলন্দাজ জ্যোতিষী ডিসিটারের (desitter) নিকট হইতে তিনি আইনষ্টাইনের প্রবন্ধসমূহের এক প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন। আপেক্ষিকতা' বাদ সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় প্রথম প্রবন্ধ তাঁহারই রচিত। এই প্রবন্ধ ফিজিক্যাল সোসাইটিতে পঠিত হওয়ার পর আপেক্ষিকতাবাদ ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণের জন্য যুগপৎ দুইটি অভিযান হইয়াছিল; একটির অধিনায়ক ছিলেন এডিংটন। আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে আলো সূর্য্য বা কোন নক্ষত্রের নিকট দিয় যাইবার সময় বাঁকিয়া যায়। সূর্য্যের আকর্ষণে বাঁকার মাত্রাও অঙ্ক কষিয়া বাহির করা হইয়াছিল, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আপেক্ষিকতাবাদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হয় এবং ইহার ফলে আপেক্ষিতাবাদ বৈজ্ঞানিকমহলে পরিগৃহীত হয়। এডিংটনের রচিত Space, Time and Gravitation গ্রন্থ (১৯২০ খৃঃ) সাধারণভাবে আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। এই সময়ে অবৈজ্ঞানিক পাঠকের জন্য আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে বহুগ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন গ্রন্থকারই এডিংটনের ন্যায় বিষয়টি এমন সুষ্ঠুরূপে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। ইহার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত The Mathematical Theory of Relativity গ্রন্থ তাঁহার গবেষণা লইয়া প্রকাশিত হয়।

এডিংটনের Internal constitution of the stars গ্রন্থ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাপূর্ণ গবেষণা লইয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বহুদূরস্থিত নক্ষত্রের অন্তর রাজ্যের সংবাদ দিয়াছেন তিনি, গণিতের সাহায্যে, 'গাণিতিক ছেঁদা করিবার যন্ত্র' (Mathematical boring machine) বলিয়া তাঁহার এই গণিতের কার্য্যকে সম্মান দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার এই সমস্ত গবেষণা গণিতের অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেয়। বলা হইয়াছে তিনি যদি এমন কোন গ্রহে জন্মগ্রহণ

করিতেন—যেখান হইতে এ গ্রহের বায়ুমণ্ডলের অস্বচ্ছলতা হেতু নক্ষত্রদের দেখা যাইত না, তবুও তিনি গণিতের সাহায্যে বলিয়া দিতে পারিতেন যে মহাশূন্যে স্বতঃ জ্যোতিষ্মান জড়পিণ্ড থাকিলে তাহার আভ্যন্তরিক গঠন কিরূপ হইবে, তাঁহার প্রসিদ্ধ mass-luminocity law নক্ষত্রদের ঔজ্জ্বল্য ও ভারের (weight) মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা বলিয়া দেয়। নক্ষত্রদের উজ্জ্বলতা জানিবার উপায় জ্যোতিষীদের জানা আছে এবং এই উজ্জ্বলতা জানিয়া এডিংটনের mass-luminocity lawএর সাহায্যে অঙ্ক কষিয়া তাহার বস্তুমান বা ভার জানা যায়। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে আয়তনে নক্ষত্রদের মধ্যে মহাপার্থক্য থাকিলেও তাহাদের বস্তুমান বা ভারের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। নক্ষত্রের আয়তন পৃথিবীর সমান, এমন কি পৃথিবী অপেক্ষা কমও হইতে পারে।১ সূর্য্যের লক্ষাংশ কি তাহারও কম আয়তনের এবং অপর পক্ষে সূর্য্যের কোটি গুণ কি তাহারও বেশি আয়তনের সব নক্ষত্র আছে। কিন্তু বস্তুমান সাধারণতঃ সূর্য্যের এক তৃতীয়াংশ হইতে দশ গুণের মধ্যেই। এই বস্তুমানের নিম্ন ও উচ্চ সীমা যথাক্রমে সূর্য্যের দশমাংশ ও শতগুণ। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে অবৈজ্ঞানিক পাঠকদের উপযোগী এডিংটনের **Stars and Atoms** গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, পর বৎসর তাঁহার **Nature of the physical world** গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে চিন্তা রাজ্যে তিনি বহু উচ্চে বিচরণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষা সহায়ে যে সমস্ত সত্যে উপনীত হইতেছে তৎসমুদয়ই এক বিরাট উপলব্ধিগম্য জ্ঞানের অন্তর্ভূ'ত।

বিশ্বের বিশালতা সম্বন্ধে যে তথ্য আজ জ্যোতিষীদের বোধগম্য হইয়াছে এডিংটন তাহাক রূপ দিয়াছেন তাঁহার প্রসিদ্ধ সূত্রে—

দশ সহস্র কোটি নক্ষত্র = ১ নাক্ষত্র জগৎ।

দশ সহস্র কোটি নাক্ষত্র জগৎ = ১ বিশ্ব।

সাধারণ পাঠকের জানা আছে যে এক একটি নক্ষত্র ছোট বড় এক একটি সূর্য্য। দুইটি নক্ষত্রের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব প্রায় ৪ আলোক-বৎসর অর্থাৎ আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া কোন নক্ষত্র হইতে তাহার নিকটতম নক্ষত্রে পৌছিতে অন্ততঃ ৪ বৎসর২ সময় অতিবাহিত হয়। এক একটি নক্ষত্র-জগতে এরকমভাবে প্রায় দশ সহস্র কোটি নক্ষত্রের সমাবেশ, এই রকম একটি নক্ষত্র-জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলো পৌছিতে ৫০ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগে, এক একটি নক্ষত্র জগতের চারিদিকে বহু দূর পর্য্যন্ত বিরাট শূন্য এবং একটা নক্ষত্র জগৎ যে স্থান জুড়িয়া আছে তাহার অন্ততঃ ৮ গুণ দূরে আর একটা নক্ষত্র জগৎ মিলে, এই রকমভাবে অন্ততঃ দশ সহস্র কোটি নক্ষত্র-জগৎ আমাদের এই বিশ্বে বর্ত্তমান, সমগ্র বিশ্বে কতটা পদার্থ আছে অর্থাৎ বিশ্বের ইলেক্‌ট্রণ ও প্রোটন সংখ্যাও তিনি অঙ্ক কষিয়া নির্ণয় করিয়াছেন—অবশ্য ইহা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ, নক্ষত্র জগৎগুলির মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে ইহা জ্যোতিষীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এজন্য বলা হইয়াছে বিশ্ব প্রসারণশীল। এডিংটনের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক **Expanding universe** (১৯৩৩ খৃঃ) এই প্রসারণশীল বিশ্ব সম্বন্ধে গবেষণায় পূর্ণ অথচ সাধারণের অধিগম্য গ্রন্থ। বিশ্ব স্ফীত হইতেছে বলিয়াই নক্ষত্র-জগৎ-গুলির পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। ছবি বা চিহ্ন আঁকা রহিয়াছে এমন একটি খেলনার বেলুনকে ফুলাইলে ছবি বা চিহ্নগুলির মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া যায়। এখানে বেলুনের পৃষ্ঠদেশ স্ফীত হইতেছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট তিন আয়তনে। নক্ষত্র জগৎগুলি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ বিশিষ্ট তিন আয়তনেই বিদ্যমান, অতএব এই তিন আয়তন স্ফীত হইতেছে দেশকাল বিশিষ্ট চার আয়তনে। চার আয়তন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও গণিত শাস্ত্র ইহার সত্যতা প্রমাণ করে।

কিন্তু এই যে নক্ষত্র জগৎ সমন্বিত বিশ্ব ইহা কি সসীম না অসীম—সান্ত না অনন্ত, আর নক্ষত্র জগৎগুলির পরস্পর দূরত্ব যে বাড়িয়া চলিয়াছে ইহারই বা পরিণতি কোথায়? ভূপৃষ্ঠের উপর কেহ যদি একদিকে চলিতে থাকে তাহার চলার পথ কোন সীমায় গিয়া আটকাইয়া পড়ে না সত্য, কিন্তু এ যাত্রা তাহাকে অনন্তে লইয়া যায় না—একদিন সে আবার যাত্রা স্থানেই ফিরিয়া আসে। আমরা বলিতে পারি ভূপৃষ্ঠ অসীম,—কিন্তু তাই বলিয়া অনন্ত নয়। ইহা তিন আয়তন বিশিষ্ট পৃথিবীকে ঘিরিয়া আছে এবং ইহার পরিমাণ বা ক্ষেত্রফল সান্ত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যে পৃথিবী পৃষ্ঠকে সমতল মনে করিতেন, যিনি পৃথিবীর গোলত্ব ধারণা করিতে অক্ষম ছিলেন—তাঁহার কাছে ইহা খুবই আশ্চর্য্য ঠেকিত সন্দেহ নাই। আপেক্ষিকতাবাদ মতে এই বিশ্বও অসীম কিন্তু অনন্ত নহে। সুতরাং নক্ষত্র জগৎগুলি যে দেশের (space) অভ্যন্তরে আছে তাহার পরিমাণ বা ঘনমানের একটা অন্ত আছে। ইহা চার আয়তন বিশিষ্ট, আমাদের দেশ-কালকে ঘেরিয়া আছে এবং স্ফীত হইতেছে অর্থাৎ ইহার ঘনমান (volume) বাড়িয়া চলিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও ক্ষতি নাই! বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ যদি ইহাই হয়, তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলিয়া ইহাকে অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ চিরকালই ঠকিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর গোলত্ব, পৃথিবীর সূর্য্য পরিক্রমণ এবং আপন মেরুদণ্ডের উপর পূর্ব্বাভিমুখী আবর্ত্তন—এগুলি একদিন মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল না এমন কি বুদ্ধিগ্রাহ্যও ছিল না, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের ঘুরপাক খাওয়াকেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সত্য মনে করিতেন—আজ আমরা জানি এত বড় অসত্য আর নাই। তেমনই আজ যে সত্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে কঠিন আমাদের পরবর্ত্তীরা যখন অধিকতর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে তখন তাহাদের পক্ষে উহা হয়ত সহজ হইবে। এডিংটনের সন্ধানী দৃষ্টি নব্য-বিজ্ঞানকে প্রশ্ন করিতেছে—বিশ্ব যে স্ফীত হইতেছে, এই স্ফীতি একটা সীমায় পৌছানর পর ইহা কি আবার সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিবে, অথবা কালের কোলে ফাটিয়া পড়িবে খেলানার বেলুনেরই মত? এ প্রশ্নের উত্তর মানুষ কোনদিন পাইবে কিনা বলা যায় না, শেষ প্রশ্ন—বিশ্ব-রচয়িতা যিনি তিনি এরকম কোটি কোটি বিশ্বের জনক কিনা তাহাই বা কে বলিয়া দিবে?

১ সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তের লক্ষ গুণ।

২ এক বৎসরে আলোক ছয় লক্ষ কোটি (৬×১০^{১২}) মাইল পথ ভ্রমণ করে।

নীচে-তলা

শ্রীসুবোধ বসু

বেলা দশটায় কর্ত্তা-মশায়ের দুধ খাইবার সময়। তার আর দশ মিনিটও বাকি নাই।

পঙ্খের কাজ-করা মেঝের তৃতীয়াংশ জোড়া নিচু তক্তপোষের উপর ধবধবে চাদর পাতা। কিংখাবে মোড়া এবং কিংখাব ছাড়া গোটাকয়েক তাকিয়া তার উপর ছড়ানো। পান-দান, আতর-পাশ, পিক-দান এসব ফরাসের উপরেই কর্ত্তা-মশায়ের কাছাকাছি রহিয়াছে যাতে প্রয়োজনের সময় পাইতে বেগ না হয়। জবরজঙ্গ আলবোলাটার বিচিত্র নল একটা অজানা সাপের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে। মিবিয়া-যাওয়া অম্বরি তামাকের একটা অনতিস্পষ্ট গন্ধে ঘরটা ভরা।

কর্ত্তা-মশায় সুমুখের দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। আর সামান্য পরেই ভিতর হইতে রঙিন পাখিটা বাহির হইয়া আসিয়া দশটি ঠোকর মারিয়া যাইবে। তখনও যদি দুধ না আসিয়া পৌঁছায় তবে যমরাজের রথই আসিয়া পৌঁছাইবে। অথচ রামু-বেয়ারা এত বড় একটা জীবন-মরণের ব্যাপারের প্রতি সামান্যমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বেশ নিশ্চিন্তে গা-ঢাকা দিয়া আছে! এটা শুধু বেয়াদপি নয়, রীতিমত শত্রুতা! অথচ ছেলেরা সুপারিশ করিয়াই এই তরল-মতি ছোক্‌রাটাকে তার খাস্‌-বেয়ারার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল।

তাকিয়াটায় ভর দিয়া কিছু সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধ সাতঙ্কে কয়বার হাঁক ছাড়িলেন। কোনও সাড়া মিলিল না। কেন? কেন একপ্রান্তে তাহার বৈঠকখানা হইবে? ছেলেরা বলে, পুব আর দক্ষিণ খোলা এটাই নাকি দোতলার সেরা ঘর। বহিয়া গেল সেরা ঘরে, অথচ কণ্ঠ ফাটাইয়া চিৎকার করিলেও যে একটা বেয়াদপ চাকরের কানে ডাক পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় না, তার কি? কর্ত্তা শিবপ্রকাশ চৌধুরী রাগে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিলেন।

কালই তিনি ওদিককার ছেলেদের অফিসঘরগুলির একটিতে তার বৈঠকখানা পরিবর্ত্তন করিবেন। সিঁড়িতে লোক ওঠা-নামার শব্দে তার কোনই অসুবিধা হইবে না। পাঁচ পুরুষে জমিদার তিনি, তাঁর বৈঠকখানায় চিরদিনই লোক গিস্‌গিস্‌ করিয়াছে। বার্দ্ধক্যের ওজুহাতে এবং শহুরে কেতার খাতিরে ছেলেরা তাকে নির্জ্জনতার মধ্যে নির্ব্বাসন দিবে, এ তিনি সহিবেন না! 'এখনও আমি বাড়ির কর্ত্তা,' তিনি ছেলেমানুষের মতো মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ কি! দশটা বাজিতে যে আর মাত্র পাঁচটা মিনিট! স্বয়ং যে এত বড়ো জমিদার, ছেলেরা যার এতগুলি মিলের মালিক, তাকে কিনা শেষে দুধের অভাবেই শেষ হইতে হইবে!

বৃদ্ধ শিবপ্রকাশ গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যেন জলে পড়িয়াছেন, ডুবিয়া মরিতে আর এক মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব।

রামু-বেয়ারা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, 'কর্ত্তা, আমাকে ডাকছিলেন?'

'ডাকছিলাম মানে হারামজাদা,' রাগে শিবপ্রকাশের কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিল, 'বাড়ি ফাটিয়ে ফেলছিলাম, হৃৎপিণ্ড বন্ধ করবার জোগাড় করেছিলাম। গোলামের বাচ্চা, ছিলি কোথায়? মারতে চাস্‌? মারতে চাস্‌ আমাকে?' উত্তেজনার ঘোরে তিনি একই ভাষার অনুবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

'হুজুর, এখনও তো সময় হয় নি। দুধ গরম বসেছে।'

'চুপ রও হারামজাদা। সময় হয় নি! আমার চেয়ে বেশি জানিস তুই?' অবসন্ন হইয়া বৃদ্ধ কিংখাবের তাকিয়াতে এলাইয়া পড়িলেন। 'বেশ, সময় হয় নি, হয় নি। কিন্তু থাকিস কোথায়? ডাকলে সাড়া পাব না কেন, বেয়াদপ? ছিলি কোথায়?'

রামু অপরাধীর কণ্ঠে কহিল, 'খুকুদিদির ইস্কুলে পড়ছিলাম, হুজুর।'

বৃদ্ধ তাকিয়ায় ভর দিয়া আবার উঠিয়া বসিলেন। গণ্ডের শ্মশ্রু-বিমুক্ত স্থানগুলি সহসা প্রসন্ন হাস্যের আভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চোখের দৃষ্টি প্রসন্ন ও তরল হইল। প্রায় মোলায়েম কণ্ঠে কহিলেন, 'ওঃ, তুই-ও বুঝি আমার দিদিমণির ইস্কুলের ছাত্র! বেশ, বেশ! খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বি। কি বই পড়িস তুই?'

রামু মুখ নিচু করিয়া কহিল, 'বর্ণ-পরিচয়, ফার্ষ্ট-রিডার আর প্রথম পাটিগণিত।'

'ওঃ, সে বুঝি এগুলি শেষ করেচে! চমৎকার, চমৎকার মাষ্টার পেয়েছিস রামু। এমন মাষ্টার পেতে হলে সাত জন্মের পুণ্যি করতে হয়।' বলিয়া ক্ষণকাল পূর্ব্বের ক্রুদ্ধ, তিরস্কার-পরায়ণ বৃদ্ধ হো হো করিয়া অজস্র হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। 'মাষ্টার! ক্ষুদে মাষ্টার! হাতে বেত থাকে? থাকে না। বেশ, বেশ। এই নে, এক টাকা বক্‌শিষ, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়বি। একটু ফাঁকি দিয়েচিস কি মাষ্টারের হয়ে…ওরে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর, দেখচিস কি হাঁ করে তাকিয়ে? দশটা বাজতে যে আর দুমিনিটও নেই। ব্যাটা খুনে'-র বাচ্চা, তুই কি আমাকে জলজ্যান্ত খুন করতে চাস্‌?'

রাম বাক্যব্যয় না করিয়া কর্ত্তা-মশায়ের দশটার দুধ আনিতে ছুটিল।

'দাদু?'

'কি দিদিমণি? এই অসময়ে বৈঠকখানা ঘরে মহারাণীর উদয় কেন? অধীনকে এত্তালা পাঠালেই তো সে নিজে তোমার তেতলার খাস্‌-দরবারে হাজির হ'তো!'

'যাও, তুমি কেবল কাজলামো করো, দাদু। আমার একটা কাজের কথা আছে। চুপটি করে' শুনবে, আর যা করতে বলব করবে, কেমন?'

'তবে আর শোনার প্রয়োজনটা কি দিদিমণি? কি হুকুম, আজ্ঞা কর। বান্দা তামিল করবার জন্য হুজুরে হাজির আছে।'

কর্তা শিবপ্রকাশের নাতিনী খুকু এগারো বারো বছরের মেয়ে। কিন্তু কথায় ও কর্তৃত্বে সে অতুলনীয়া। তার নিজস্ব একটা জমিদারি আছে। সেটা বাড়ির চাকর, বেয়ারা, ঝি, দারোয়ান, সহিসদের লইয়া। এ জমিদারি হইতে খাজনা আদায় হয় না, নানা ভাবে খাজনা দিতে হয়। তবে অনুগত একদল প্রজা রাণী-মা বলিতে অজ্ঞান হইয়া ওঠে। বাড়ির নিচতলার বাসিন্দাদের উপর খুকুর রাজত্ব।

'দেখো, দাদু…'

'চশমাটা আবার কোথায় রাখলাম?'

'ধ্যেৎ, তোমাকে কিছুই দেখতে হবে না। শুনতে বলছি।'

'তবে তাই বলো,' দুষ্টু হাসিয়া বৃদ্ধ কহিলেন।

'বাবার টাকা বাড়চে, কাকাদের টাকা বাড়চে,' খুকু কহিল, 'তুমি তো রাজা-ই। তবে চাকর-বাকরদের মাইনে বাড়বে না কেন?'

বৃদ্ধ শিবপ্রকাশ চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। সবিস্ময়ে কহিলেন, 'এসব কথা কে তোকে শিখিয়ে দিলে, দিদিমণি?'

'কে আবার শিখিয়ে দেবে,' খুকু অবজ্ঞার সঙ্গে কহিল, 'আমি বুঝি সেই ছোট্টটিই আছি। আমি বুঝি কিছু বুঝতে পারি নে। তুমি একটা কাজ করে' দাও, দাদুমণি। আফিসের চাকরিতে যেমন বছর-বছর মাইনে বাড়ে, ওদেরও তুমি তেমনি করে' দাও। ওরা তো চাকরিই করে আমাদের বাড়িতে। চাকরি করে বলেই তো চাকর।'

দাদু হাসিয়া কহিলেন, 'মহারাণীর যখন এই অভিপ্রায়, তখন তো তোর বাবা-কাকাদের জানিয়ে দিতেই হবে। তারাই তো চাকর রাখে।'

'তবেই হয়েচে!' খুকি প্রবীণার ভঙ্গিতে কহিল, 'ওসব বাবুদের বল্‌লে, তাদের মাইনে বাড়াতে বয়ে গেছে। দূর করে' দেবে সব্বাইকে। ভাববে, ওরা বুঝি আমাকে শিখিয়ে দিয়েচে, যেমনটা তুমি প্রথম ভেবেছিলে। শিখিয়ে দিতে হবে কেন? আমি ওদের পড়াই না? ওদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প আমি শুনি না? ছোটলোক বলে তো আমি নাক-সিঁটকে বেড়াই নে, ওদের সব কথাই জানি।—আর কাউকে বলা-টলা নয়, যা করবার তোমাকেই করতে হবে।'

'আর একটা কথা আছে।' খুকি এইবার একটু দ্বিধা করিয়া কহিল।

'আবার কি হুকুম? এবার থেকে চাকরদের 'বাবু' বলেও ডাকতে হবে কি?'

'বাবু বলবে কেন', খুকি ফ্রকের প্রান্তটা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, 'কিন্তু যখন-তখন গালাগালি করতে পারবে না। পান থেকে চুণ খসলো, অমনি গালি! এই করা পছন্দ হলো না, অমনি বকুনি, এই সাজান মন-মতন হলো না, অমনি চোখ-রাঙানি!'

'ওরে বাবা! এ যে চাকরদের সেলাম করে' চলতে হবে দেখচি। এতটা পারব কি, দিদিমণি?'

'পারতেই হবে।' খুকি মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে কহিল। 'গালাগালি দিলে ওদের বুঝি আর কষ্ট হয় না? একটু কড়া কথা বল্‌লেই তো আমার কান্না পায়। চাকর-বাকরেরা লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ নিশ্চয়ই অনেক কাঁদে, আমরা দেখতে পাইনে!'

সত্যকিঙ্কর কর্তা-মশায়ের বড় ছেলে। অসময়ে আজ তিনি অন্দরে আসিলেন। কাজকর্ম্মে সারা সকালটা ঠাসা থাকে; লোকজন আসে, সলা-পরামর্শ হয়, নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির ভাবিতে হয়; নতুন কোম্পানী গঠন, নতুন শেয়ার ছাড়ার পরিকল্পনা বাড়ির অফিস-ঘরেই জন্মলাভ করে। বাহিরের ঘর হইতে আহার করিয়া, পোষাক করিয়া তিনি এবং তাঁর ভাইয়েরা অফিসে যান। অন্দরমহলের সঙ্গে রাতের পূর্ব্বে সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে।

অফিসে আজ ডিরেক্টারদের মিটিং, ব্যাঙ্কের সঙ্গে আরও কয়েক লাখ টাকার ওভার-ড্রাফ্‌টের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কাজের আজ অন্ত নাই। তা সত্ত্বেও অফিসে যাইবার পূর্ব্বে একবার অন্দরে যাইয়া স্ত্রীকে খবরটা জানাইয়া দেওয়া দরকার।

সমুখে মোক্ষদা ঝি-কে দেখিয়া কহিলেন, 'বড়বৌদিকে ডাক দেখি।'

বড়বৌ মৃণালিনী শাশুড়ির মৃত্যুর পর হইতেই বাড়ির গৃহিণী। দিনের অন্তহীন কর্ত্তব্যের মধ্যখানে স্বামীর অসময়োচিত আহ্বানে বিস্মিত হইয়া তিনি শয়ন-কক্ষে আসিলেন। কহিলেন, 'কি ব্যাপার?'

ভাবলেশহীন মুখে, পোষ্টপিয়নের ঔদাসীন্যের সঙ্গে একটা চিঠি আগাইয়া দিয়া সত্যকিঙ্কর কহিলেন, 'সঞ্জীবের চিঠি। জামাই-ষষ্ঠীতে আসতে পারবে না। ছুটি পেলে না।'

'কেন?' হতাশ হইয়া মৃণালিনী কহিলেন।

'কেন আবার কি। নকরির তো এই হাল্। যত ব্যাটা ছোটলোক সেখানে কর্ত্তা হয়ে কর্ত্তৃত্ব ফলায়।' এবং ভেংচাইয়া কহিলেন, 'সাহেব বলছেন, এখন কাজের খুব ভিড়। জামাই-ষষ্ঠীটা এমন কোনও জরুরি দরকার নয়। এখন যাওয়া চলবে না।—দরকার নয়! ব্যাটা হারামজাদা, তুই কি বুঝবি কোন্‌টা আমাদের জরুরি দরকার, আর কোন্‌টা জরুরি দরকার নয়। সব প্ল্যান্ ভেস্তে দিলে! ভেবেছিলাম, সঞ্জীবকে দিয়ে ধরিয়ে রাজা কমলেশ্বর রায়চৌধুরিকে নতুন কোম্পানীটার মধ্যে টেনে আনব, সম্পর্কে বুড়ো শুধু আমাদের সঞ্জীবের দাদামশাই হয় না, ওকে একটু বিশেষ স্নেহও করেন। তা দিলে সে গুড়ে বালি। বুড়োঘুঘু যা করুক, ওকে বাগানো আমার একলার কম্ম নয়।—একটা মূর্খ সাহেবের জন্য আমার লাখ লাখ টাকার স্কীমটা মারা পড়বার জোগাড়! —ওদের ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি স্মিথ্ সাহেব কলকাতায় আসুক না, একবার আমি দেখে নেব। তার মেয়েকে কম টাকার গয়না প্রেজেন্ট করেছি!'

উত্তেজনার ঘাম তিনি রুমাল দিয়া মুছিতেছিলেন, সহসা রুমালটা নিচে পড়িয়া গেল।

'ঈস্, এ কি !' মেঝে হইতে রুমাল উঠাইয়া সত্যকিঙ্কর সবিস্ময়ে কহিলেন, 'ধুলো নাকি ! মেঝেতে এত ধুলো এলো কি করে? মার্বেলের মেঝেতে ধুলো থাকবে কেন? প্রতি ঘণ্টায় মোছা হচ্ছে, তবু ধুলো?...'

'আমি রুমালটা পাল্‌টে দিচ্চি।' মৃণালিনী দেরাজের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন। 'আজ এসব এখনও কিছু পোঁছা হয় নি। শম্ভুর জ্বর হয়েচে। অন্য কাউকে আমার শোওয়ার ঘরে ঢুকতে দিতে...'

'শম্ভু? জ্বর করে' বসেচে! বটে?' সহসা সত্যকিঙ্কর জ্বলিয়া উঠিলেন। 'কোথায় সেই হারামজাদা। চাবকে ওকে আমি লাল করব। ছুটি দিইনি বলে মেজাজ দেখানো হচ্চে! জ্বর!'

গতকাল শম্ভু চাকর আসিয়া বলে, দেশ হইতে ছোটমেয়ের অসুখের খবর আসিয়াছে। কয়দিনের ছুটি দিতে হইবে। সত্যকিঙ্কর তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়াছিলেন। আর অমনি চট্ করিয়া জ্বর করিয়া বসা হইল! নেমকহারাম ব্যাটাদের চাবকাইলেও রাগ যায় না। চাওয়া মাত্রই ছুটি দিতে হইবে? চাকরের ছুটি, পেয়াদার শ্বশুরবাড়ি!

সত্যকিঙ্কর দারোয়ানকে হাঁক দিলেন, 'পাঁড়ে, পাঁড়ে...'

'না, না, দারোয়ানকে কেন', মৃণালিনী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, 'সত্যই হয়তো জ্বর। মোক্ষদা দেখে এসেচে। শরীরের ওপর তো কারুর হাত নেই।...'

'চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা! মোক্ষদা দেখে এসেছে!' সত্যকিঙ্কর রাগে ফুঁসিয়া উঠিতে লাগিলেন (কেন সঞ্জীব ছুটি পাইবে না, শুনি?)। 'একটা লোক হাজির না থাকলে এমন কিছু এসে যায় না। কিন্তু বেয়াদপি আর মেজাজ কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। চাকর থাকবে চাকরের মতো। আমি দেখচি...'

পাকশালার ওদিকটায় অন্ধকার ভাপ্‌সা একটা ঘরে ভাঙা একটা তক্তপোষের সমুখে আধ-ছেঁড়া শলা-ওঠা একটা মোড়ার উপর বসিয়া খুকি পাখার হাওয়া করিতেছে। ছেঁড়া মাদুরটায় বাড়ির পুরাণো চাকর শম্ভু চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। তার কপালে জল-পটি।

'একটু ভালো লাগচে, শম্ভু?'

'হ্যাঁ, দিদিরাণী। তুমি এবার যাও। বাবুরা দেখলে রাগ করবেন।'

'তুমি চুপটি করে' শুয়ে থাক।' খুকি কহিল, 'আমার যা ইচ্ছে আমি করব। বকুক না দেখি একবার! তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না, শম্ভু। দেখো তোমাকে আমি ছুটি পাইয়ে দেই কিনা। তাড়াতাড়ি জ্বর ভালো করে' ফেল, তারপর কায়দা করে'...তোমার মেয়ে কত বড়? কি বই পড়ে? পড়ে না? এ রাম! মুখ্যু হয়ে থাকবে? এবার যখন তুমি বাড়ি থেকে ফিরবে, তাকে সঙ্গে করে' নিয়ে এসো। আমার ইস্কুলে তাকে ভর্ত্তি করে' নেব...ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক...'

'এই শম্ভো, শম্ভো', দরজার কাছ হইতে দারোয়ান পাঁড়েজীর বাজখাই কণ্ঠ শুনা গেল। 'বাবুজী এসেচেন, উঠে আয়।' সঙ্গে সঙ্গে সত্যকিঙ্কর নিজেই একেবারে দরজার সমুখে আবির্ভূত হইলেন। মাথার অসহ্য যন্ত্রণা ভুলিয়া, জ্বরের অবসাদ ভুলিয়া শম্ভু চাকর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্যকিঙ্কর তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না; স্তম্ভিত হইয়া কন্যার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বেশ নির্লিপ্তভাবে সে মোড়ার উপর বসিয়া রহিয়াছে।

কণ্ঠস্বরের উপর দখল ফিরিয়া পাইয়া সত্যকিঙ্কর জলদ-কণ্ঠে কহিলেন, 'এখানে কি হচ্চে?'

'শম্ভুকে হাওয়া করচি', খুকি নির্লিপ্তস্বরেই জবাব দিল। 'বেচারীর অসুখ করেছে কিনা।'

'হাওয়া করছ!' ভেংচাইয়া সত্যকিঙ্কর কহিলেন। 'কে তোমাকে হাওয়া করতে বলেছে, কে হাওয়া করতে বলেছে তোকে?'

'কেউ বলেনি, আমি নিজেই করছি।' খুকি মোড়া হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল। 'আর সকলের কাজ আছে তো, কে আর বেচারীকে হাওয়া করবে!'

শম্ভু ভয়-পাংশু মুখে তোৎলাইয়া কহিল, 'তুমি যাও, দিদিরাণী। কতবার মানা করচি, শুনচ না...তুমি যাও দিদিমণি...'

'যাও দিদিমণি!' সত্যকিঙ্কর দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, 'এতক্ষণে ব্যাটার হুঁস্ হলো, যাও দিদিমণি—পালা এখান থেকে লক্ষ্মীছাড়ী। চাকরদের রাণীমা হচ্চেন! চাবকিয়ে লাল করব, দিনে দিনে বাঁদর হয়ে উঠচ! আহ্লাদে, আব্দারে, পাজি মেয়ে। আর কখনও তোমাকে চাকর-বাকরদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখেচি, তো তোরই একদিন আর আমারই একদিন। যাও, এই মুহূর্ত্তে চলে যাও......'

খুকি মাথাটা উঁচু করিয়া, ঠোঁটটা বাঁকাইয়া, চিবুকটা শক্ত করিয়া, কাঁধটা একবার কানের সঙ্গে ছোঁয়াইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

'আচ্ছা, দাদু, চাকরদের রবিবার হয় না কেন?' দাদুর শিয়রে বসিয়া পাকাচুলের মধ্যে আঙুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে খুকি প্রশ্ন করিল।

শিবপ্রকাশ আলবোলা টানিতেছিল, মুখ হইতে নলটি সরাইয়া কহিলেন, 'কি বলছিস্, দিদিমণি? সারাক্ষণ এত কথা তুই কোথায় পাস্?'

'বলছি, রবিবারে যেমন বাবুদের অফিস ছুটি থাকে,' খুকি প্রতিটি অক্ষর টানিয়া টানিয়া আলাদাভাবে উচ্চারণ করিয়া কহিল, 'চাকরদেরও তেমন থাকে না কেন?'

'চাকরদের রবিবার! হাসালি, দিদি, হাসালি।' বলিয়া বৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠে প্রচুর হাসিতে লাগিলেন। 'চাকরদের রবিবার থাকবে তো কাজ করবে কে?'

'আমাদের তো অনেক চাকর আছে,' খুকি বোদ্ধার মতো কহিল, 'পালা করে ছুটি দিলেই হয়।'

'আর যাদের', বৃদ্ধ জব্দ করিবার জন্য কহিলেন, 'একটা মাত্র চাকর ?'

'তারা নিজেরাই একদিন কাজ চালিয়ে নেবে। সবাই ছুটি পাবে, আর ওরাই বুঝি পাবে না ?'

'ছোটলোকদের ভারি তো ছুটির দরকার !'

'ওরা ছোটলোক কেন, দাদু ?' খুকি প্রশ্ন করিল।

'ওরা যে ছোট কাজ করে।' দাদু কহিলেন।

'কেন ওরা বড়ো কাজ করে না ?'

'ওদের কি বুদ্ধি আছে, না টাকা-পয়সা আছে ?'

'বুদ্ধি নেই কেন ?'

'লেখাপড়া শিখলে তবে তো বুদ্ধি হবে।'

'তবে লেখা পড়া শেখে না কেন ?'

'পয়সা পাবে কোথায় ?'

'কেন পয়সা নেই ?'

'বাপ-ঠাকুর্দ্দা রেখে যায় নি।'

'কেন রেখে যায় নি ?'

'তাদের ছিল না।'

'কেন ছিল না ?'

'তাদেরও বুদ্ধি ছিল না। বাঁচাবার মতো পয়সা কামাতে পারে নি।'

'কেন তাদেরও বুদ্ধি ছিল না ?'

'লেখা পড়া শেখেনি, সুযোগ পায়নি…'

'কেন লেখাপড়া শেখেনি, সুযোগ পায়নি ?'

'পয়সা ছিল না, বড়লোক আত্মীয়-স্বজন ছিল না…?'

'দূর ছাই, দাদু,' এবার খুকি রাগিয়া কহিল, 'পয়সা প্রথমে কি করে' আসে তাই তো জিজ্ঞেস করছি। ওদের পয়সা নেই, আমাদের এলো কি করে ?'

'ওরে কৌসলী', দাদু বিব্রত হইয়া আলবোলার নল ফেলিয়া কহিলেন, 'এত জেরার যে আমি জবাব দিতে পারি নে। এর জবাব জানেন ভগবান, তিনি যাকে দেন, সে-ই পায়…'

'তবে যে বল,' খুকি না দমিয়া কহিল, 'ভগবানের কাছে সব্বাই সমান ? তবে আর তিনি একজনকে টাকা দেবেন আর একজনকে দেবেন না কেন ? যত বাজে কথা ! তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বলছ না ; জান, কিন্তু বলছ না।'

'জিজ্ঞেস করিস তোর বাবাকে, যে বড় বড় কলকারখানা ফেঁদেছে ; মজুর খাটিয়ে লাখ লাখ টাকা আয় করচে।'

'নিশ্চয়ই তোমরা বড়লোক হবার কোনও ফন্দি জানো', খুকি দুষ্টু চোখ মেলিয়া কহিল। 'আমি যদি টের পেতাম, সব্বাইকে বলে দিতাম। সব্বাই হয়ে যেত সমান বড়লোক…'

'তুই আমার মাথা ঘুরিয়ে দিবি।' দাদু সাতঙ্কে কহিলেন, 'কি অসম্ভব কথা বলিস্ তুই ? পঁচাত্তর বছর বয়স হয়েছে, এমন অদ্ভুত কথা তো শুনিনি। সবাই হবে সমান বড়লোক !…যা তো, দিদিমণি, একবার ওদিক থেকে ঘুরে আয়। আর বেশিক্ষণ এসব কথা বলবি তো আমার মাথায় জট পাকিয়ে যাবে।…'

খুকি দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাসিয়া কহিল, 'বেশ যাব। এক্ষুণি যাব। কিন্তু একটা কাজ তোমাকে করে' দিতে হবে, দাদুমণি…'

শিবপ্রকাশ আতঙ্ক ও কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে কহিলেন, 'আবার কি ? এবার থেকে একবেলা করে' নিয়মিতভাবে ঝিদের বদলে আমাকে বাসন মাজতে বস্‌তে হবে কি ?'

খুকি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল, 'দূর, কি যে বল ! সবটাতেই তোমার ঠাট্টা। মোটেই ওসব নয়। শম্ভুর মেয়েটার খুব অসুখ কিনা। ওকে বাড়ি যাবার জন্য ছুটি দিতে হবে। আজই দিতে হবে। কেমন ? লক্ষ্মীটি তো দাদু…'

শিবপ্রকাশ দাড়িতে হাত বুলাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, 'তথাস্তু। এর চেয়েও বেশি কিছু চেয়ে বসোনি, এই আমার বাপের ভাগ্যি।…শম্ভুর ছুটি মঞ্জুর।'

এক সেকেণ্ড চোখ বুজিয়া খুকি অবস্থা ভাবিয়া লইল। বাবাই হও, আর কাকাই হও, শম্ভুর ছুটি একশোবার মঞ্জুর। ইহার উপর কথা বলিতে পারে, এ-বাড়িতে এমন সাধ্যি কারও নাই।

দুষ্টু হাসিতে সহসা খুকির সারাটা মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর সে বিলম্ব করিল না। নাচিতে নাচিতে সে ছুটিল নীচেতলায়।

বিজ্ঞাপনে আর্ট

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

বাগদাদের প্রসিদ্ধ সুলতান হারুণ-অল-রসিদ একদিন রজনী শেষে তিনজন প্রিয় অনুচরের সহিত প্রজাবৃন্দের অবস্থা অবগত হইবার জন্য নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। রাজধানীর অপর প্রান্তে দরিদ্র পল্লীতে জানালাদরজাবিহীন গৃহে আলো-গান ও জনসমাবেশ দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিকটে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে লোকজন একটা দোল্‌না দিয়া উঠানামা করিতেছে। তিনিও সঙ্গীদের সহিত কৌতুক দেখিবার জন্য দোল্‌নায় চড়িয়া উপরে উঠিলেন। ঘটনাচক্রে সেইদিন রাজ্যের যত ভিখারী সেখানে সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল শেষরাত্রে বাগদাদের সুরম্য প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রসিদকে হত্যা করিবে এবং বাগদাদ সহর ধ্বংস করিবে। তবুও সাহসী ও প্রজানুরক্ত রাজা আত্ম-পরিচয় দিলেন ; তখন সমবেত জনতা তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীত্রয়কে লৌহ-গারদে বন্দী করিল। দার্শনিক রাজা বন্ধন ও মুক্তি—সময়ের এই ব্যবধান-টুকুর সদ্ব্যবহার করিবার জন্য সঙ্গীদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই তিনি উজীর জাফরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভাবছেন ?

জাফর বলিলেন, "মানুষের কাজ ও কাজের উদ্দেশ্য, ইহার মধ্যে কত অসঙ্গতি তাহাই চিন্তা করিতেছি।" কোতোয়াল মসরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কি করিবেন?"

মসরু উত্তর দিলেন, "ততক্ষণ পাঁজরার উপরে তরোয়ালেরধার তুলিব।" তদনন্তর কবি হাসানকে প্রশ্ন করিলে হাসান জবাব দিলেন, "আমি ততক্ষণ এই কার্পেটখানা অমার্জ্জনীয় কুৎসিৎ নক্সা তৈরীর কারণ বাহির করিব।" রাজা সানন্দে বলিলেন, "হাসান, আমিও তোমার সহিত যোগদান করিব; তোমার রুচির আমি প্রশংসা করি।"

উল্লিখিত ঘটনায় প্রাণসংশয় বিপদের মধ্যেও বাদশাহ রসিদের যেরূপ কবিজনোচিত রুচি, উদার্য্য ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা দ্বারা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব হইলেও প্রত্যেক দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিকের জীবন-সন্ধিক্ষণে করণীয় কি তাহা সুস্থির হইয়া উঠা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয়-জীবনের অরুণোদয়ের সম্ভাবনা! দিগ্বলয় রঞ্জিত হইবার ক্ষণকাল পূর্ব্বে অন্ধকার যেমন আরও নিবিড় হইয়া উঠে, আমাদের সামনে জীবনের প্রত্যেক স্তরেও সেইরূপ অন্ধকারে ভরিয়া উঠিতেছে। এই বাস্তবের সম্মুখীন হইতে হইলে হারুণের মতন ঔদার্য্য, রুচি ও সাহস আমাদের আদর্শ হওয়া প্রয়োজন।

অর্থলোলুপ স্বার্থবাহের দল জীবনের নানাক্ষেত্র নানাভাবে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র "বিজ্ঞাপনী" প্রণালীর মধ্যে নিবদ্ধ রাখিব। আধুনিক বিজ্ঞাপনী চারু-শিল্পের আবরণে কিরূপ মিথ্যা ও কুরুচি প্রচার করিতেছে তাহার সম্যক জ্ঞান অনেকেরই নাই। ভাষা ও কথার চটকদারে ইহা যখন আমাদের সামনে উপস্থিত হয় তখন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার অক্ষমতা অনেকেরই। রোজ একই কথা চোখের সামনে উপস্থিত হইলে মিথ্যাও সত্য হইয়া দাঁড়ায়। মানব-সভ্যতার প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পই এই অভিনব প্রণালীর বিজ্ঞাপনে ভারগ্রস্ত ও আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে, —যেখানে রাজনৈতিক অধিকার অপরের হাতে, সেখানে ইহার পরিবেশন অজ্ঞ ও শিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়েরই ভয়ানক ক্ষতি করিতেছে; বিশেষতঃ, যেখানে শিল্প ও সুকুমার শিল্পের অতি শৈশবাবস্থা, যেখানে বৈদেশিক সুদৃঢ় ব্যবসা নানারকম মোহন উপায়ে, কথায়, ছন্দে, রেডিও, সিনেমায়, আকাশে তাহাদের দাবী-সমূহ অহরহ আমাদের চোখের সম্মুখে, কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে; যেখানে আজও জাতির অধিকাংশের মধ্যে পরাজয়ের মনোভাব বর্ত্তমান, সেখানে জনসাধারণের মনকে প্রতারিত করা খুব দুঃসাধ্য নহে। এই অবস্থায় বিদেশে কি হইতেছে তাহা যদি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যায় তবে সমূহ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

আমরা জানি মার্কিন দেশ বিলাসের নন্দনকানন। সিনেমার হলিউড যে সমস্ত মার্কিন মুলুক নয় এই খবর অনেকেই হয়তো জানেন না। নানা বিষয়ের জ্ঞানচর্চ্চায় মার্কিন শুধু সমৃদ্ধ নয়, অনেক অনেক বিষয়ে মার্কিন মুলুক সভ্যতার কেন্দ্রীভূত দেশ বলিলেও অন্যায় হইবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেও চলিয়াছে। রূপচর্চ্চা ও প্রসাধন-শিল্পেও মার্কিনই আজকাল সমৃদ্ধতম। এই উন্নতির মূল কারণ জাতি হিসাবে ইহারা খুব সংঘবদ্ধ; ভেজাল তাহাদের দেশে চলিতে পারে না। সেখানে ব্যবসায়ীদের মতন ব্যবহারকারীরাও খুব সংঘবদ্ধ। ব্যবসায়ীদের লিখিত দাবী সঠিক কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে একটী সমিতি আছে; এই সমিতির নাম **Federal Trade Commission.** সংক্ষেপে ইহাকে **F. T. C.** বলা হয়। এই **F. T. C.**-এর দাপটে কত বিক্রমশালী ব্যবসায়ীকে তাহাদের দাবীর পাততাড়ি গুটাইতে হইয়াছে তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিব। আমাদের মত অনগ্রসর দেশে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের সম্যক গুণাগুণ অবগত হইবার লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম। বিজ্ঞাপনের চটকে কত রকমে যে লোকে প্রতারিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেখাদেখি আমাদের দেশের শিশু-শিল্পপতিগণও বৈদেশিক চাতুর্য্য গ্রহণ করিতেছেন। যাহাতে এই পাপের পরিণতি বৈদেশিক ক্রোড়পতিদের ন্যায় না হয় তাহার জন্য এখন হইতেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনে প্রথমে ছিল কেবলমাত্র ভাষার লালিত্যের বাহাদুরী। আইনের ফাঁক খুঁজিয়া লালিত্যময় ভাষার ঝঙ্কারে লোকে নিজের জিনিষের গুণাগুণ প্রচার করিতেন। এই পদ্ধতি কতকটা আমাদের দেশের পুরাতন ভাটদের ন্যায়। এই রকমে দেশে একরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও বৈদেশিক বিজ্ঞাপনীর কৃপায় আমরা নিত্য নূতন আপাতঃ সুন্দর কথা শিখিতেছি; তফাৎ এই—পূর্ব্বে ছিল ঝঙ্কারময় সঙ্গীত-মূলক কাব্য, বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সাহায্যে যে সকল শব্দের কিম্বা কথার সৃষ্টি হইতেছে অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাহাদের অর্থ খুঁজে পাইতেছে না। "Body odour", "Night starvation", "Cosmetic skin", "Five O' Clock chin" প্রভৃতি শব্দময় কথা এই বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য হইতে পাইয়াছি। ভাষা ও সাহিত্যে প্রচার মানুষের মনের উপরে স্থায়িত্ব লাভ করিতে তবুও ক্ষণকাল বিলম্ব হইত কিন্তু বর্ত্তমান যুগে, Radio, **Aerial demonstration**, Film ও Neon a lve tisement মানুষের সকল রকম ইন্দ্রিয়কে একই সঙ্গে আক্রমণে স্থায়িত্ব-লাভে বিলম্ব হয় না। ইহার উপরেও গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে **Sex appeal** (যৌন আবেদন) আছে। যে নারীকে আমাদের দেশে জগজ্জননীর প্রতিচ্ছায়া মনে করা হয়, সেই নারীকেই পসারী করিয়া বিজ্ঞাপনী পণ্য করা হইয়াছে। রুচিবিকার এমন হইয়া পড়িয়াছে যে নগ্ন নারীদেহের বিজ্ঞাপনে শুচিতার মুণ্ডপাত হইয়াছে। সুকুমারমতি বালক হইতে সুস্থ সুগঠিত মানুষের মনেও ইহা চিত্তবিভ্রম জাগায় কিনা বিচার্য্য বিষয়। অনেকেই বলিতে পারেন ইহাতে কি আসে যায়; বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য আলোচনা; কোনও নগ্ন ছবি দেখিয়া যদি সেই আলোচনা সুরু হয় তবেই বিজ্ঞাপনের কাজ শেষ হইল। ছবি ইহার উদ্দেশ্য নহে। একই উদ্দেশ্যে "Night clu " ইত্যাদি জাঁকাল নামে গণিকালয়ের বিজ্ঞাপনও সমর্থিত হয়; অর্থোপার্জ্জন—এই মহৎ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। কিন্তু যাহা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, জাতিগতভাবে তাহাই সর্ব্বনাশ আনে। এই জন্যই এই সকল ব্যবসাকে **Anti-social** বা অসামাজিক ব্যবসা

বলিব। অনেক পেটেণ্ট ঔষধ আছে যাহা ক্ষণিক ব্যবহারে উপকার হয়তো সম্ভব কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারে অশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

এই সম্বন্ধে Rose's Lime Juice, the Ovaltine busk baly, এবং Stork Margerine-এর বিজ্ঞাপন হইতে কয়েকটী কথা নিয়ে উদাহরণ দিতেছে। এইগুলিতে Romance, Fear এবং Ambitionএর চমৎকার চিত্র পাইবেন।

Romance—

Two days after she washed her ears, Tom came to propose.

Fear—

Failure to eat breakfast lost Jim his job.

Ambition—

Mid morning gargle made Fred Governing Director.

উপরোক্ত উদাহরণগুলি Cartoon ছবি ও লালিত্যময় ভাষায় এমন সুন্দর করিয়া লিখিত যে পাঠকের মনে দাগ না পড়িয়া যায় না। চাতুর্য্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন শিক্ষিত লোকের মনেও কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহার উদাহরণ আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি। প্রত্যেক ফিল্মেই নাট্যশিল্পের ও কথাচিত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও সত্যিই যে তাহা নহে, ইহা জানা সত্ত্বেও কলিকাতা নগরীতেই কত বাজে ফিল্মও সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিতেছে দেখা যায় এবং বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকও কত সপ্তাহ চলিতেছে খবর নিয়াই নাট্যালয়ে যান এবং প্রতারিত হন।

রাজনৈতিক অধিকার সুনিয়ন্ত্রিত না থাকিলে বিদেশী শিল্প বিজ্ঞাপনের সাহায্যে কি ক্ষতি করে তাহা নিম্নের ঘটনা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। এই ঘটনা Soap Trade and Perfumery পত্রিকা 1931, March ও July মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের শেষে জার্ম্মানীর পরাভব হইলে সম্মিলিত মিত্রশক্তি যখন জার্ম্মান সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিণত করিল তখন তাহার আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হইল, যে বিরাট শিল্প মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীর অপর জাতিসমূহের বিভীষিকার কারণ হইয়াছিল তাহা শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এমন নহে, জার্ম্মান জাতির নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও বৈদেশিক শিল্পপতিগণের কুক্ষীগত হইল। আমাদের দেশে যেমন চমকপ্রদ নামমাহাত্ম্য সংযুক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ঠিক তেমনি জার্ম্মানীতে অখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের স্বাক্ষরযুক্ত প্রচার-পত্রে জার্ম্মান-শিল্পকে ঘৃণা করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে পারস্পরিক প্রচার কার্য্য হইত। অখ্যাত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে শাঁসাল প্রচার বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা করিতেন; ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা জার্ম্মান শিল্পের অপকর্ষতা সম্বন্ধে মন্তব্য দিতেন। নিম্নে কয়েকটী মন্তব্য লিখিত হইল। এই মন্তব্যগুলি এমন করিয়াই লিখিত হইত যাহাতে সাধারণে মনে করেন যে ইহা বিশেষজ্ঞদের স্বাধীন পরীক্ষার রায় ব্যতীত কিছুই নহে। নিম্নের উদাহরণে "ordinary" কথাটা লক্ষ্য করিবেন।

"Ordinary"—that is to say rival, toilet soaps are injurious to the skin, containing as they do too much alkali. "Ordinary" soaps are not compounded of the pure cosmetic oils of the oil of Palm and Olive and in consequence, inferior to Palmolive. 'Ordinary" soaps are dangerous to complexion. নিম্নে উক্ত কোম্পানীর বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় প্রচার দেখুন। Read what Leo Carsten of Berlin what Madam de Nerville, what Vincent of Paris have to say about Palmolive soaps. The same views are also held by two hundred other beauty specialists in Europe, who all recommend Palmolive for the daily care of the complexion.

জার্ম্মান জাতির দুঃখের অমানিশা শীঘ্রই শেষ হইল। শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়কের প্রভাবে জার্ম্মান সঙ্ঘবদ্ধ হইল; ত্যাগের নিকষ প্রস্তরে জাতির আত্মসম্মান-জ্ঞানও ফিরিয়া আসিল। The verband Deutscher Feinseifen und Perfumerie Fabriken E. V. জাতীয় অপমানের প্রতিবিধানের জন্য বিচারালয়ের দ্বারস্থ হইল। বিচারে Palmolive কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ ও ভবিষ্যতে এইরূপ আচরণ যাহাতে পুনরায় না করে তাহার জন্য নগদ টাকার জামিন দেওয়ার আদেশ হইল। এইভাবে ক্ষুব্ধ জাতীয় সম্মান জয়যুক্ত হইল। আমাদের দেশেও এই রকম বৈদেশিক বিজ্ঞাপন ভাবে ও চিত্রে অহরহ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের জাতীয়আত্মসম্মানজ্ঞান এত সুপ্ত যে প্রতিবাদ হওয়া দূরে থাকুক, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমর্থকের অভাব নাই; স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করেন না বলিয়া গর্ব্ব করিতে আমাদের মত দেশেই লোকের অভাব হয় না! মেকলে সাহেবের কল্পনা কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে তাহা দেখিতে মেকলে সাহেবের ভৌতিক আবির্ভাব যদি আজ সম্ভবপর হয় তবে তিনিও বিস্ময়ান্বিত হইবেন। তাই বৈদেশিক দ্রব্য বিশেষতঃ প্রসাধন দ্রব্য আজও সমারোহের সহিত বিক্রয় হয়। টাক মাথায় চুল গজাইবার, পাকা চুল কাল করিবার তৈল, বীজাণু হইতে আত্মরক্ষা করিবার সাবান, হলিউডের তারকাদের মতন মসৃণ ও সুন্দরী হইবার জন্য প্রসাধন, মুখমণ্ডল চির-যুবতীর ন্যায় কমনীয় রাখিবার জন্য ক্রীম, দন্ত শুভ্র, দন্তরোগ নিবারণ ও মুখমণ্ডল সুগন্ধ রাখিবার জন্য Toothpaste, আমাদের মনের অসীম দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়া বিপুল ব্যবসা চালাইতেছে। আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে এমন কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু F. T. C.-এর কল্যাণে আজ দিবালোকের মতন এই অসত্য প্রচারের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়াছে। লম্বা ফিরিস্তিতে পাঠকের ধৈর্য্য হানি হইবার আশঙ্কা আছে মনে করিয়া নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। মার্কিণ দেশের এই Federal Trade Commission সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে তাহাদের বিজ্ঞাপনী দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করিবার জন্য নোটীশ দেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবীর সপক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থিত করিতে হইবে, যুক্তি প্রমাণিত করিতে না পারিলে তথাকথিত দাবী প্রত্যাহার করিতে হইবে। নিম্নলিখিত কোম্পানীর দাবী প্রমাণিত না হওয়ায় F. T. C. সংশ্লিষ্ট

কোম্পানীকে ভবিষ্যৎ ইস্তাহারে ঐ সমস্ত দাবী প্রচার করিতে পারিবেননা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সুবিখ্যাত Kolynos Company কে তাহাদের নিম্নলিখিত দাবীসমূহ প্রমাণ করিবার জন্য ২০ দিন সময় দিয়াছিলেন কিন্তু কোম্পানী তাহাদের দাবী প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

The claims that "Kolynos" toothpaste erases or removes stain and tarter that it will whiten teeth several shades in a few days and that it cleans teeth down to the whilte enamel without injury ; other claims to the effect that "Kolynos" almost instantly kills millions of germs which cause most ailments of teeth and gums, that it keeps the teeth and mouth thourogbly clean and healthy on account of its germicidal and antiseptic properties and that it will remove or conquer bacterial mouth (Soap—April 1937) ; published in U. S. A. বিখ্যাত Lever Bros কোম্পানীর Lux toilet, Lux flakes ও Life Buoy Soapএর বিক্রয় আমাদের দেশে দিন দিন কিরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা অনেকেই জানেন। এই কোম্পানী নিম্নলিখিত দাবী তাঁহাদের প্রচার-পত্রে সর্ব্বদাই করিতেছেন কিন্তু মার্কিণ মুল্লুকে F. T. C.-এর কল্যাণে তাহা প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে।

Lever Bros আর B O. theme ব্যবহার করিতে পারিবেন না। Lux Toilet সাবান "Keeps skin flawless" because it is compounded specially to guard against "cosmetic skin" was barred as an advertising story. The Lux flakes claim to "make cloth newer" was also condemned,- "It's the soap nine out of ten screen-stars use to keep skin flawless" and "the active lather" of this fine soap "sinks deep into pores" were also other slogans.

F. T. C.এর সহিত Lever Brosএর যে agreement হইয়াছে তাহার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

The respondent hereby admits : that the number of diseases which can be spread solely by the hands has not been definitely established, that no soap can be depended upon to improve the skin of a user to 100% or any other stated percentage, that dull or blotachy skin is frequently due to internal conditions as well as external conditions, that while the product Lux flakes contains a minimum of free alkali and will not itself fade or shrink fabrics no soap will improve the original strength, colour or quality of fabrics. "That no soap can be relied upon to keep the skin flawless ; that Lux Toilet Soap is not compounded especially to guard against cosmetic skin, that no soap can be relied upon to keep the skin clear, except in connection with conditions due to or aggravated by dirt, cosmetic residue, epithelial debris or foreign matter.

That according to clinical test and scientific opinion bacteria are present on the skin under normal conditions, and that perspiration has no offensinve odour when it exudes from the sweat glands and ducts, but acquires an offensive odour as the bacteria cause decomposition of the perspiration intermigled with oil, disquamation by the skin and foreign substances ; that while such decomposed material and most of the bacteria can be removed by the use of a good soap which also contains a sufficient amount of special ingredient which is included in Life Buoy soap, thereby removing temporarily all perspiration odours, no soap will completely remove all such bacteria and the remaining baceria as they multiply will act upon newly excreted perspiration and produce some odour within from twenty four to forty eight hours and that no permanent elimination of perspiration or body odour can be effected by the single application of Life Buoy or any other soap.

আমার আশঙ্কা হইতেছে পাঠকদের ধৈর্য্য ধারণ ক্রমশঃই কঠিন হইতেছে, কাজেই অধিকতর বিস্তৃত উদাহরণ প্রদর্শনে নিবৃত্ত হইলাম। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে Pond's skin vitamin, Coty's "air spun" Talcum Powder, Albone's "Hospital proved" Cream—কেহই F. T. C.-র দৌরাত্ম্যে রেহাই পান নাই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 'নারী দেহ'-প্রচার পত্রিকায় বড় মূলধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈদেশিক পত্রিকায় যৌন-আবেদনের ঢেউ ক্রমে আমাদের দেশেও পৌঁছিতেছে। কোনও বিশিষ্ট বৈদেশিক-বিজ্ঞাপনীতে লিখিত হইয়াছে—Woman wants man,'Make up' helps her to catch them, many men, almost invariably married ones, pretend they do not approve of cosmetics. Just watch them when when a woman passes by." ঠিক এই রকম না হইলেও "যৌন আবেদন" নানাভাবে বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়া আমাদের দেশেও প্রচারিত হইতেছে। আমি পাঠকদের নিকট নিবেদন করি, এই সকল বিজ্ঞাপন যে-সকল গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে লিখিত হইতেছে তাঁহারাই সমবেতভাবে জাতিগঠন কি করিতেছেন না? জাতীয় জাগরণের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে, পাশ্চাত্যের এই বিষ যেন আমাদের সমাজ-দেহে প্রবেশ না করে। নরনারীর বিশুদ্ধ মিলন জাতীয় সম্পদ। এই মিলন ততক্ষণই জাতিকে শক্তিসম্পন্ন করিবে, যতক্ষণ ইহার পবিত্রতা রক্ষিত হইবে, যতক্ষণ ইহা ইন্দ্রিয় লালসার স্ফুলিঙ্গে আহুতি অর্পণ না করিবে।

এই প্রবন্ধের জন্য S. P. C. Nov. 1938 and January, 1939—An article by "Look-out" manএর নিকটে লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

শনিবার বৈকালে হিসাব করিয়া অমল দেখিল, পাঁচ আনার পয়সা আছে। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে যাওয়া ও ফার্ষ্ট ক্লাসে ফিরিয়া আসা যায়, কিন্তু মাসের শেষের কয়েক দিন বিড়ির কি উপায় করিবে তাহা বুঝিয়া পাইল না। ধার করাটা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ কিন্তু আজকার প্রলোভন তাহার অদম্য হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়াই সে কাপড় জামা পরিয়া ফেলিল। বাড়ী খুজিয়া বাহির করিতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। অমল যখন সভাস্থলে উপস্থিত হইল তখন একজন মহিলা উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিতেছেন। মহিলাটির মুখখানা পরিচিত, পোষ্ট-গ্রাজুয়েটেরই ছাত্রী। সভাকক্ষের বাহিরে বারান্দায় অপর্ণার সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। অপর্ণা অমলের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ এমনি দেরী ক'রতে আছে? সকলে অপেক্ষা ক'রছে, একটু সকালে বেরুতে পারেন নি।

অমল হাসিয়া বলিল—ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হয়নি ত? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই—শেষোক্ত অজুহাতটি একেবারেই মিথ্যা।

উদ্বোধন সঙ্গীত থামিয়া গেল। অপর্ণা অমলকে লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া সভাস্থ সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ইনিই আমাদের নতুন সভ্য, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সহপাঠী, গেজেটে আমার ওপরে যে নামটি ছিল সেটা ওর। ইনি সংহতির 'প্রেম' কবিতার কবি, আর—

অমলের দিকে ফিরিয়া বলিল—এঁদের সকলকে পরিচয় করিয়ে দি—ইনি ইলা সেন, ইনি ডলি মিত্র অমল চাহিয়া রহিলমাত্র এবং ধারাবাহিক ভাবে নমস্কার করিয়া যাইতে লাগিল। অপর্ণা কতকগুলি একালের কতকগুলি সেকালের নাম মুখস্থ নামতার মত বলিয়া গেল। পরিশেষে সকলকে বিস্মিত করিয়া হটাৎ বলিল—নতুন সভ্যকে প্রথমদিনে কিছু ব'লতে হয়, এই আমাদের ক্লাবের আইন। অতএব অমলবাবু যা হয় বলুন—

অমল মাথা চুলকাইয়া, ক্ষণিক বিভ্রান্তের মত সমবেত পুরুষ ও মহিলাগণের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আগে জানলে আমি কথনই এ ক্লাবের সভ্য হ'তে রাজি হতাম না—

সকলে বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

—যারা নিরপরাধ ভদ্রলোককে ডেকে এনে, সভাস্থলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ ক'রবার মত হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকতে পারেন তারা জগতে অমানুষিক নিষ্ঠুর ও গর্হিত কাজও ক'রতে পারেন এই আমার বিশ্বাস। বর্ত্তমানে অবাধ্য পা' দুটো যে রকম ভাবে বিকম্পিত হ'চ্ছে তা'তে অদূর ভবিষ্যতে হৃৎপিণ্ডে এ কম্পন সংক্রামিত হ'তে পারে বলে আমি শঙ্কিত হচ্ছি এবং এর বেশী কিছু ব'লতে হ'লে হত্যাকাণ্ডের সম্ভাবনা এত বেড়ে যাবে যে শেষে সেটা অনিবার্য্যই হ'য়ে উঠবে—

কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া এবং কোনও রূপ ভদ্রতার অপেক্ষা না করিয়া অমল ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সভাগৃহে বসিবার বন্দোবস্ত ভারতীয় রীতি অনুসারে—পুরু একটা গালিচা পাতা, তাহার 'পর ইতস্ততঃ বালিশ বিক্ষিপ্ত, মাঝখানে পান ও সিগারেটের প্লেট রহিয়াছে—

অমল যেখানে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার পাশেই যে মেয়েটি বসিয়া ছিল সে হাসিতে হাসিতে প্রায় অমলের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। সভাস্থ সকলেই তখন হাসিতে হাসিতে প্রায় বিবশ। অকস্মাৎ এই মহিলাটি, অর্থাৎ ডলি মিত্র অমলকে বলিল—পান খান ত? এই নিন্—পানের পাত্র সে আগাইয়া দিল—

অমল পুনরায় বলিল—এ শুষ্ককণ্ঠ কি পানের রসে ভিজবে, এখন প্রয়োজন ষ্টিমুলেণ্ট—

সভায় অকারণেই পুনরায় হাসির রোল পড়িয়া গেল।

সেক্রেটারী অপর্ণা তাহার খাতা দেখিয়া পড়িয়া গেল—আজকার কার্য্যসূচী, ডলি মিত্রের কবিতা, প্রশান্ত মজুমদারের 'কাব্যে ইয়েটস্', অমলা বসুর "টমাস হার্ডি কল্পিত গ্রাম" ইত্যাদি। খাতা নামাইয়া বলিল—এখন

সভাপতি নির্ব্বাচন ক'রে সভার কাজ আরম্ভ হ'তে পারে—

ডলি মিত্র প্রস্তাব করিল অমলেরই নাম, কয়েকজন সমস্বরে সমর্থন করিলেন। অপর্ণা স্মিতহাস্তে সগর্ব্বে অমলকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—আসুন, সভার কাজ পরিচালনা করুন।

অমল আগাইয়া বসিয়া বলিল—নার্ভষ্ট্রেণে যদি আমি মারা যাই তা'হলে আমি কিন্তু দায়ী হ'ব না।

সভায় পুনরায় একটা হাসির রোল উঠিল। হাসি থামিয়া আসিলে অমল বলিল—কবিতা আবৃত্তি ডলি মিত্র।

ডলি মিত্র স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া গেলেন। সভা চলিতে লাগিল—

অমলের পাশেই অপর্ণা বসিয়া ছিল। অমল হঠাৎ চাহিয়া দেখে অপর্ণা তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। চোখোচোখি হইতেই একটু হাসিয়া সে মাথা নীচু করিল। অমল বুঝিল না কেন, কিন্তু অপর্ণার এই চাহনি ও হাসির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন একটা সগর্ব্ব সহানুভূতি ও কৃতকার্য্যতার আত্মতৃপ্তি ছিল তাহা সে বুঝিয়াছিল—সকলে একবাক্যে তাহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করায় অপর্ণার আনন্দ হইয়া থাকিবে, যেহেতু সে তাহারই বন্ধু। অমল নিম্নকণ্ঠে ডাকিল কিন্তু অপর্ণা শুনিল না—অপর্ণার শুভ্র আঙুল কয়টি ক্লাবের খাতার উপর বিক্ষিপ্ত কয়েকটি চাঁপার কলির মত পড়িয়া আছে। অমলের ইচ্ছা করিতেছিল ওই কয়েকটিকে সে নিজের হাতের মধ্যে সঙ্গোপনে টানিয়া লয়। কি যেন ভাবিয়া অকস্মাৎ সে তাহারই একটিকে আকর্ষণ করিয়া বলিল— খাতাখানা আপনি নিলে আমি সভার কার্য্য পরিচালনা করি কেমন ক'রে—জানেন আমি সভাপতি!

অপর্ণা হাসিয়া খাতাখানি তাহার সামনে খুলিয়া ধরিল—আঙুলটিকে মৃদু আকর্ষণে মুক্ত করিয়া লইল।

সভান্তে জলযোগ ও জলযোগান্তে সকলে প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অপর্ণা তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্ত সদর দরজা পর্য্যন্ত যাইতেছিল, অমলও দলের পিছনে পিছনে চলিতেছিল। একে একে সকলে প্রস্থান করিতেছিলেন; পরিশেষে অমল বলিল—আসি তা হ'লে মিস্ রায়।

অপর্ণা বলিলে—না, আসুন, আপনাকে এখন যেতে হবে না।

অমল বলিল—কেন? আরও কিছু খাওয়াবেন না কি?

—আপনি ত আচ্ছা পেটুক, আসুন—

অমল পুনরায় আসিয়া অপর্ণার পড়িবার ঘরে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। অপর্ণার বোন ভাই পিতা মাতা সকলের সঙ্গেই পরিচয় হইল। অপর্ণার মা বলিলেন—মাঝে মাঝে এস বাবা, শুনি তোমরা দু'জনে একসঙ্গে পড়াশুনো কর।

অপর্ণার পিতা ইঞ্জিনিয়ার তিনি পরিহাস করিলেন—অমল বাবা, শুন্‌লাম তুমি কবি, মানুষ কবিতা লেখে কেমন ক'রে ব'লতে পারো? গরমিল শব্দ ছাড়া ত আমি খুঁজে পাই নে—

অমল বলিল—কবি আমি কোন দিনই নয়, মিস্ রায় অত্যন্ত বাড়িয়ে বলেন—

তিনি পুনরায় পরিহাস কহিলেন—কমিয়ে বলার চেয়ে বাড়িয়ে বলাই ত ভাল, তোমার লাভ। হ্যাঁ আজকাল শুন্‌ছি এক রকম কবিতা উঠেছে হাল ফ্যাসানের তাকে গাব্য বলে—অর্থাৎ গদ্য কবিতা, তা কিছু কিছু দেখাতে পারো, একবার চেষ্টা ক'রে দেখতাম—

অমল জবাব দিল না। অপর্ণার পিতা খুব জব্দ করিয়াছেন এমনি ভাবে হো হো করিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিলেন। আরও কিছু আলাপ আলোচনার পর অপর্ণা ব্যতীত সকলেই প্রস্থান করিলেন। অপর্ণা মুখ টিপিয়া বলিল,—আপনাকে congratulate করি, আপনার বক্তৃতা চমৎকার হ'য়েছে।

অমল প্রশ্ন করিল—পরিহাস!

—মোটেই নয়, আপনার বক্তৃতা কতখানি উপভোগ্য হ'য়েছে তা' ত বুঝলেনই, প্রথম দিনেই সভাপতি—

—কিন্তু, অমনি ক'রে মানুষকে বেকুব ক'রবার এত লোভ কেন আপনার?

—সে কি!

—অমনি ক'রে হটাৎ বক্তৃতা দিতে বলা যে কত বড় নিষ্ঠুর কাজ—

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ও তাই! যা হোক্, মায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে কবে আস্‌ছেন?

—যেদিন ব'লবেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রবো, যদি সত্যি উত্তর দেন তবে জিজ্ঞাসা করি—

—আমি মিথ্যাবাদী এ অপবাদ আপনি প্রথম দিলেন—

—মিথ্যা ভাষণ ও সত্য গোপন করা ত এক নয়। যা জিজ্ঞাসা ক'রব তার উত্তর মানুষ সাধারণতঃ সরল ভাবে দেয় না—

—কিন্তু আমি বল্‌ছি, সারল্যের অভাব আমার মধ্যে নেই—

অমল একটু থামিয়া অপর্ণাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল—এত ছেলে থাক্‌তে আপনি আমার সঙ্গেই বা আলাপ ক'রলেন কেন এবং আমাকেই বা ক্লাবের সভ্য হওয়ার সম্মান দিলেন কেন?

—এই কথা! এর আবার একটা গোপন কি আছে? আপনিই বা এত মেয়ে থাক্‌তে আমার শাড়ীপরা নিয়ে অভিযোগ করেন কেন?

—সেটা আলাপের পূর্ব্বে নয় পরে—খানিকটা পরিচয় তথা ঘনিষ্ঠতার পরে।

অপর্ণা একটু চিন্তা করিয়া বলিল—আপনি যেমন ক'রে জান্‌লেন আমার নাম ডেজি, তেমনি ক'রে আমিও জানলাম আপনার নাম অমল। চেহারাটা দেখে ভাবলুম, অত্যন্ত গোবেচারা, ভাবলুম নেহাত গোবেচারী লোক নিয়ে তামাসা করা উপভোগ্য হবে—তাই আলাপ ক'রলাম কিন্তু শেষে দেখি একেবারে কালসর্প, মুখে ক্ষুরধার—

—কালসর্প?

—হ্যাঁ শুনুন, আর একটা কথা ভেবেছিলাম সেটা হ'চ্ছে এই যে আপনার কোন বিষয়েই কোন আগ্রহ নেই দেখে সমবেদনা বোধ ক'রেছিলাম—আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রবার কোন কৌতূহল আপনার নেই কেন, এইটে জানবার কৌতূহলও হ'য়েছিল—

—এখন কৌতূহল নিবৃত্ত হ'য়েছে আশা করি।

—না, আপনি বল্‌লে নিবৃত্ত হ'তে পারে।

—যদি সত্যি কথা ব'লতে হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে ভয়। ভয়টা ঠিক বাঘের ভয়ের মত নয়, অন্য জাতীয়। আমার যা ধারণা তাতে অনেক আধুনিক মেয়েই মনে করেন যে তাদের প্রেমে পড়বার জন্য সকল লোকই ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে রয়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে গেলে তারা যা ভাববে তা আপনিও বুঝ্‌তে পারেন, কাজেই সেধে গিয়ে এ অসম্মানকে ডেকে আনি কেন?

—আমাকেও কি ওই জাতীয় ভাবেন?

—কোন কারণ নেই, পরন্তু এও ভাবিনা যে যেহেতু আপনি আমার সঙ্গে আগে আলাপ ক'রেছেন সেই হেতুই আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন।

অপর্ণা হাসিয়া একটু ব্রীড়া ভঙ্গি সহকারে বলিল—তাও হতে পারে ত?

—কোন কারণ নেই, আপনারা I. C. S. স্বামীর স্বপ্ন দেখেন, মনে মনে আমাদের মত নিরীহ পথচারীকে মোটর চাপা দেন, আপনাদের এ দৈন্য কল্পনাতীত।

—কেন? আপনারাও ত I. C. S. হ'তে পারেন, তা ছাড়া ঘনিষ্ঠতায় স্বপ্নটা ত ক'মে আস্‌তে পারে—

—পারে একথা অস্বীকার করি না, তবে সাধারণতঃ স্বপ্নটা কমে না। বিশেষতঃ আমার মত একটি বর্ব্বরের প্রেমে আপনি পড়তে পারেন, আপনার মাঝে এ দৈন্য আমি কল্পনা ক'রতে বাধা পাই।

অপর্ণা বলিল—আপনার বিনয় কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনায় পর্য্যবসিত হ'তে চলেছে।

—কেন আপনার কি সে রকম মনে হয়?

অপর্ণা অশোভন ভাবে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—রোগের লক্ষণ সে রকম প্রকাশ পায় নি—যাক্ আর একটু চা খাবেন কি?

—এতখানি অভদ্রতা আশা করিনি, কিছু খাওয়াবেন বলেই ত ফিরিয়ে নিয়ে এলেন; এখন এ জিজ্ঞাসা করাটা সম্মানিত অতিথির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন।

—বাবা, এতখানি সম্মান-জ্ঞান আপনার আছে? একটু বিনয় কি ভাল দেখাতো না—চা ও চুরুট দু'টোকে কমাতে হবে।

—আপনার অনুরোধ।

—হ্যাঁ, আমার অনুরোধ।

—আপনার অনুরোধের এত মূল্য আপনি কেন দেন?

অপর্ণা পর্দ্দার আড়ালে যাইয়া সম্ভবতঃ চায়ের আদেশ

দিয়া ফিরিয়া আসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আপনি ত ভারি প্রতিহিংসা-পরায়ণ—ওই কথাটা আমি বলেছিলাম বলে তা ফিরিয়ে না দিয়ে আর পারলেন না। তবে আর আপনার প্রেমে পড়া হ'ল না—

—আহা-হা, কেন?

—এই রকম প্রতিশোধ যদি নিতে থাকেন তবে ভয় ক'রবে না?

অমল হাসিয়া বলিল—এত ভয় যায় সে আর প্রেমে পড়বে কেমন ক'রে? কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে চুপ করিল।

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল। অহেতুক ভাবে চোখ দু'টিকে বিস্ফারিত করিয়া, দক্ষ অভিনেত্রীর মত ন্যাকামীর সুরে বলিল—আপনি অভিনেতাও তা হলে—

চা আসিল। অপর্ণার ছোটবোন চা দিয়া গেল। চা'র বাটিতে একটা চুমুক দিয়া অমল বলিল—চা তুমি তৈরী করেছ? করুণা?

—হ্যাঁ।

—বেশ চা হ'য়েছে। ভবিষ্যতেই তুমিই চা দিও, তোমার দিদি যা চা তৈরী করেন!

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল—আমার তৈরী চা আবার কবে খেলেন?

অমল সংক্ষেপে বলিল—খেয়েছি। হ্যাঁ করুণা তোমার দিদি আমার নিন্দে করেন না?

করুণা জবাব দিল—হ্যাঁ।

—কি বলেন?

—আপনি নাকি মানুষকে বড় কটু কথা বলেন।

অপর্ণা বলিল—কবে বলেছি?

—ওই সেদিন তুমি বল্‌লে, উনি বড্ডো উচিত কথা বলেন।

—কটুকথা মানে উচিত কথা?

অমল বলিল—হ্যাঁ, অভিধানে পাবেন না, তবে মনের অভিধানে ওটার ওই মানে হয়।

অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি যখন আমার নিন্দে করেন তখন আর কি? চলেই যাই—

অপর্ণা বলিল—রাগ ক'রে—

—হ্যাঁ। আসি নমস্কার। করুণা, নমস্কার।

করুণা ফিরিয়া নমস্কার করিল, অমল হাসিতে হাসিতে সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া আসিল।

অমলের দারিদ্র্য-অভিশপ্ত জীবনযুদ্ধেরত সুদীর্ঘ বাইশটি বৎসরের মধ্যে এমনি মহার্ঘ স্মরণীয় দিন একটিও যায় নাই। যাহা জানিবার জন্য, দেখিবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ ছিল আজ তাহাই সে পাইয়াছে—এমনি করিয়া তাহার জীবনে যে কল্পনাময়ী, স্বপ্নাচ্ছন্ন নারী মূর্ত্তি ধরিয়া সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়াইবে—এমনি করিয়া মাদকতা দিয়া মোহ দিয়া তাহার জীবনকে রোমাঞ্চিত করিয়া দিবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। ট্রামে উঠিবার পর হইতে নিদ্রিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটা অপ্রাপ্ত, অনির্দ্দিষ্ট অস্বচ্ছ সুখাশার পদ্মগন্ধে তাহার অন্তর সুবাসিত হইয়া রহিল। মনে মনে নানাভাবে অপর্ণাকে সাজাইয়া সে দেখিল—মনে হয়, জীবনের মাঝে এই নারীর পরিচয় অতি আকস্মিক কিন্তু সে যেন মনের অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। উন্মুখ যৌবনের প্রথম দিনে সে যে মানসীমূর্ত্তিকে কল্পনা দিয়া, বাসনা দিয়া, মনের সংগোপনে স্থাপিত করিয়াছিল সে যেন আজ মর্ত্তে আসিয়া ধরা দিয়াছে—কিন্তু সে জানে না তাহার অজ্ঞাতে, মনের অগোচরে সে অপর্ণার কত ত্রুটি, কত অক্ষমতাকে এই পরিচয়ের ঘনিষ্ঠার মাঝে ক্ষমা করিয়া লইয়াছে। নিজের মনকে সে যুক্তি দ্বারা, সহানুভূতি দ্বারা, বাসনার দ্বারা প্রতারিত করিয়াছে, তাহা না হইলে অপর্ণাকে সে এমনি করিয়া আপনার করিয়া ফেলিতে পারিত না, তাহা না হইলে জগতের কোন বাস্তব প্রাণীকেই ভালবাসা সম্ভব হইত না।

এতদিন সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া রবিবারের অপেক্ষা করাই তার স্বভাব ছিল, কিন্তু অমল আজ সবিস্ময়ে দেখিল যে সে সোমবারের প্রতীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে মনে সে ভাবিল ক্ষতি কি। এমনি করিয়া যদি স্বপ্নাবেশে জীবনের গুরুভার দিনগুলি চলিয়া যায় তবে সেই ত পরম লাভ।

সোমবারে কলেজে যাইবার সময় সে মণিব্যাগটিকে খুলিয়া দেখিল তাহা একেবারেই শূন্যোদর। সেটাকে

বিছানার নীচে গুঁজিয়া রাখিয়া হিসাব করিল, মাস শেষ হইতে তিন দিন বাকি, কলেজে চা না খাইয়াই কাটাইয়া দেওয়া যাইবে, আর বিড়ির বন্দোবস্ত যেমন করিয়াই হোক হইয়া যাইবে—দোকানটা ত পরিচিত, অবশ্যই বাকী দিবে—

কলেজের সদর দরজায় সামনাসামনি রাস্তা পার হইবার সময়ে সে দেখিল—অপর্ণা ট্রাম হইতে নামিতেছে—চিনিতে বিলম্ব হইল না, সেই নীল শাড়ীখানিই সে পরিয়া আসিয়াছে। অমল গেটের নিকটে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, অপর্ণা নিকটবর্ত্তী হইতেই বলিল—ধন্যবাদ।

অপর্ণা না থামিয়া চলিতে চলিতে বলিল—কারণ?

—আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন—মানে মূল্য দিয়েছেন দেখে।

—ও—শাড়ীর কথা। খুব ভাল দেখাচ্ছে—না?

—দেখাচ্ছে কিনা জানিনা, আমি দেখছি।

—চোখ খারাপ হয়নি ত!

—ভগবানের কৃপায় এমনি খারাপই চিরদিন থাক্।

অপর্ণা লিফ্‌টে উঠিয়া চলিয়া গেল। অমল মৃদু-পাদক্ষেপে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া চলিল।

ক্রমশঃ

ছেলেটা

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মায়ায় ভরা স্তব্ধ রাত্রি, অসংখ্য তারার প্রদীপ জ্বালা অনন্ত আকাশের নীল অংগনতলে। চাঁদ নেই কিন্তু আলো আছে, ঝাপ্‌সা আলো। দূরের গ্রামগুলির ঘুমন্ত চোখে যেন অনন্ত নিদ্রা, জেগে থেকে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে।

ও কিসের আলো? যেন চোখ ঝল্‌সে দিয়ে গেল! তারা ছুটেছে। আকাশের বুকে সাজানো দীপান্বিতার সমারোহ থেকে নিভে গেল একটা তারার প্রদীপ। বন্ধ্যা রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে কানে এলো 'বল হরি, হরি বল।'

তাই তো, এ কি স্বপ্ন…না, এই তো আমি জেগে আছি, ঐ তো সামনের জামরুল গাছ থেকে রাত-জাগা পাখীর একটানা কান্নার শব্দ আস্‌ছে; আবার কর্ণভেদী রব 'বল হরি, হরি বল!'

না, সত্যিই তবে, সত্যিই তবে পৃথিবীর বুকে দোলানো মালা থেকে আজ একটা ফুল খসে গেল। নিভে গেল একটা উজ্জ্বল প্রদীপ। তবে কি উল্কাপাত এরই ইংগিত?

যে ছেলেটির অস্তিত্ব আজ নিমেষে ধরণীর ধূলিকণার সাথে মিশে গেল, একে আমি চিনতাম, জানতাম এবং ভালবাসতাম। বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের মত সে এসেছিল পৃথিবীর বুকে। অন্ধকার রাতের মেঘাড়ম্বরের মধ্যে ও ছিল বিদ্যুতের আলো…মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ করতো সব মানুষের মনকে।

এত তাড়াতাড়ি যে ওকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে কে জানতো? ওর পৃথিবী থেকে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত মনে হয়েছে, প্রভাতের সান্দ্র স্নিগ্ধ ছায়াখানি ওর মাঝে লুকোচুরি খেল্‌ছে…যে দেশ থেকে অভিশপ্ত দেবতার মত ও এসেছিল, সে দেশের মায়া যেন ভুলতে পারেনি? কে জানতো, ও জীবনের লীলা প্রভাতের মায়াময় আলোতেই শেষ হয়ে যাবে। পদ্ম যখন কুঁড়ি থেকে ফুটে বেরোয় তখন তার পূর্ণবিকাশ দেখবার জন্য পৃথিবী উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু সে যখন অকালে ঝ'রে যায় তখন ধরণীর চোখে নেমে আসে ব্যথার অশ্রুধারা।

তার নাম ছিল প্রণব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, শ্রেষ্ঠ ধ্বনি যেমন লুকিয়ে আছে এই নামটিতে—তেমনি আমাদের সব চেয়ে বেশী ভালবাসা, সব চেয়ে বড় আকর্ষণ লুকিয়ে ছিল এই ছেলেটির মধ্যে। তাই তার অন্তর্ধানে আমাদের মনের দুয়ারে আঘাত লেগেছে, বজ্রপাতের যেমন আঘাত লাগে পৃথিবীর বুকে।

তবু পৃথিবী টলে না। আঘাত আসে নব নব, বেদনা পায়, অজস্র, তবু পৃথিবী স্থির, স্তব্ধ অচঞ্চল…তাই পৃথিবী সর্বংসহা। অহরহ তার বুকে মৃত্তিকার শিশুদের আবির্ভাব। আবার তারই বুকে ভস্মমুষ্টি হয়ে তারা মিলিয়ে যায় অনন্ত শূন্যে। তবু ধরণীর বুকে কোন চঞ্চলতা নেই। সে ভাবে…এর চেয়ে আরোও একটা উন্নততর ধরণী আছে। যেখানে পরিত্যক্ত জীবনগুলি লাভ করবে মহদাশ্রয়। যেখানে যাবার সাধনা মানুষ এখানে এসে করে—তাই সে কাঁদে না, শুধু একবার চম্‌কে চেয়ে দেখে আবার চোখ বোজে। সেই চম্‌কে ওঠাটাই হয় তার সম্বল। আমাদের কাছে সেই চম্‌কে ওঠাটা ভেসে আসে স্মৃতি হয়ে…অনন্তকালের জন্যে সঞ্চিত হয় মনের মণিকোঠায়…এই বুঝি সত্য…এই বুঝি চিরন্তন।

আধুনিক ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্য

শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষ

"আমাদের সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য।" মানব-চিত্তের ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় তার সাহিত্যের ধারা হ'তে। কোন জাতীয় জীবনকে বিশ্লেষণ করতে হ'লে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করতে হয়, সাহিত্য-কলা তন্মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে।

এই সাহিত্য কলায় ইংলণ্ড, শুধু ইউরোপ কেন, সারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছে। বিশ্ব-সাহিত্যের বোধ-হয় সকল পুস্তকই ইংরাজীতে অনূদিত হ'য়েছে। অধুনা উপন্যাস সাহিত্যই ইংলণ্ডের প্রধান সাহিত্য। এই যুগের আরম্ভ হয়—ভিক্টোরিয়া-যুগের পরবর্ত্তীকাল থেকে। ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বেশ বুঝতে পারা যায়—এলিজাবেথের যুগে নাটকই ছিল সমস্ত জাতির আশা-ভরসা। তাই সে যুগে পাই Shakespeare, Merlawe, Benjonson প্রভৃতি খ্যাতনামা নাট্যকারকে। তারপর এলো কবিতার যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও কবিতা ছিল সাহিত্যের প্রধান অংগ। বর্ত্তমান যুগে নাট্যকার বা কবিদের রচনায় বর্ত্তমান মানব-জীবনের জটিলতা ভালো ক'রে ফুটে উঠ্‌তে পারে নি। তাই আজ সাহিত্যে প্রধান হ'য়ে উঠেছে—উপন্যাস।

ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় সাহিত্যের সব স্থানে রয়েছে একটা বিদ্রোহের সুর, তার মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকরা চাইছেন এক আমূল পরিবর্ত্তন, সমস্ত পুরাতনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে নূতনের প্রতিষ্ঠা।

ভিক্টোরিয়া যুগ ছিল ইংলণ্ডের সর্বাংগীণ উন্নতির যুগ। সুখে শান্তিতে বাস করার ফলে সাহিত্যিকদের মতবাদেও ছিল একটা সামঞ্জস্য ও প্রসন্নতা। কিন্তু এ যুগে—অশান্তির যুগে সাহিত্যিকদের প্রসন্নতার ভাব গেছে টুটে; তাই তাঁদের কণ্ঠে ফোটে বিদ্রোহের ধ্বনি। কারো কণ্ঠে সে বিদ্রোহ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে বাগ্মিতা পেয়ে—কারো বা মনে মনেই গুমরে মরছে। তাই ঐ যুগে "Victorian compromise" বা বিভিন্ন মতবাদের মিল আর লক্ষিত হয় না।

এ যুগের সাহিত্যিকরা প্রায় সকলেই আত্মসম্পূর্ণ। সহযোগী সাহিত্যিকদের দিকে নজর বড় একটা কারুর নেই। তাই কেউ আলোচনা করছেন সমাজতন্ত্র নিয়ে, কেউ সমাজ সংস্কার নিয়ে, আর কেউ যৌন-বিজ্ঞানকে দিচ্ছেন রূপ। এই যুগের মাত্র আরম্ভ হ'য়েছে; পরিণতি কোথায় কে জানে?

ইংলণ্ডের শিল্প বাণিজ্যের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধির সংগে সংগে গ্রাম ধ্বংস পেতে লাগলো। গ্রামের বুকে জুড়ে বসল বিরাট ফ্যাক্টরী আর নগর। বস্তিতে বস্তিতে কুলি-মজুররা অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিকার করতে না পেরে নিজেদের মধ্যে গুমরে মরতে লাগ্‌লো। আবার সাম্রাজ্য-বিস্তারের সংগে সংগে সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠ্‌লো। তাই একদল সাহিত্যিক সমাজ-তন্ত্রকে আশ্রয় করলেন, আর একদল মন দিলেন সাম্রাজ্য-বাদে। রুডিয়ার্ড কিপলিং কবিতা ও উপন্যাসে সাম্রাজ্যবাদের প্রচার করেছেন।

যখন সাম্রাজ্যবাদীদের চীৎকারে সহর হ'য়ে উঠেছে মুখরিত, তখন প্রতি বস্তি ভরে উঠ্‌ছে নির্য্যাতীত, নিষ্পেষিতদের আর্ত্তনাদে। এই উৎপীড়িতদের দল থেকে খুব কম লোকই এসেছেন যাঁরা তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার মধ্য-দিয়ে মর্মকথাকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। দরিদ্রের মুখপাত্র হিসাবে Richard whiting এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Galsworthy এর উপন্যাসে দারিদ্র্যের কথা বেশী স্থান না পেলেও তাঁর নাটকে দরিদ্র-জীবনের রূপ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে।

Lower Middle class এর মুখপাত্র H. G. Wells এর বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। বিজ্ঞানের প্রভাবে জগতের কি পরিবর্ত্তন ঘটবে, Wells দেখেছেন তারই স্বপ্ন। এঁর কল্পনা শক্তি এবং চিন্তাধারার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। তিনি শুধু কল্পনা-জগৎ নিয়েই মেতে থাকেন নি; তাই তাঁর সাহিত্যেও আমরা পাই দরিদ্র এবং সমাজের বিক্ষোভিত রূপ।

Arnold Bennette ছিলেন Lower Middle class-এর অন্যতম প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন Artist—বর্ত্তমান সামাজিক জীবনকে রূপদান করেছেন। তিনি লেখার ধরণ ও 'টেক্‌নিক্' নিয়ে Wells এর চেয়ে বেশী ভাবতেন।

Intelligentsia দলের প্রতিনিধি হিসাবে "Bernard Shaw" এর নাম সর্ব-প্রথমে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে চেয়ে ছিলেন পুরাতনের ধ্বংস আর নূতনের সৃষ্টি। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর মতবাদকে ফোটাতে না পেরে তিনি

নাটকের অশ্রয় নেন। তাঁর সব লেখার মধ্যেই আমরা "Pfopagandist show" কে দেখ্‌তে পাই।

Upper Middle classএর মনোভাব বেশ ফুটে উঠেছে John Galsworthyর লেখায়। তিনি বুঝেছিলেন সমাজে ধ্বংসের বীজ প্রবেশ করেছে—এখানে হৃদয়াবেগের স্থান নেই, সব জিনিষকেই টাকা পয়সার মাপকাটিতে বিচার করা হয়। নরনারীর যৌনবোধ সম্বন্ধে যে হীন ধারণা জেগে উঠেছিল তার মূলে তিনি করেছিলেন কুঠারাঘাত। মানবের অন্তর্জীবনের সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বকে তিনি বেশ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেছেন।

এরপর মহাযুদ্ধের পর থেকে সাহিত্যের নব-যুগ। মহাযুদ্ধের পূর্বে যে নৈরাশ্য ছিল সাহিত্যের অন্তরে, যুদ্ধের পরে তা' মূর্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সবেতেই ফুটে উঠ্‌লো একটা গভীর ঔদাসীন্য।

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" (Eat, drink and be merry, for to-morrow we shall die) ভাবটা বেশ ফুটে উঠ্‌লো। সংগে সংগে উচ্ছৃঙ্খলতাও গেল বেড়ে। এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে কেন্দ্র ক'রে লিখলেন Aldous Huxley, তিনি দেখ্‌লেন সমাজ মর্‌তে বসেছে। দেহ-সর্বস্ব লোক নিয়ে সমাজ বাঁচবে কেমন কোরে? Huxley ভবিষ্যত মানব-জীবনের কোন আশা ভরসাই দেখেন নি।

মহাযুদ্ধের পর এই অভিজ্ঞতাকে নিয়ে উপন্যাস রচিত হ'ল— যেমন "All quiet on the Western front" আর একদল মনস্তত্ব নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। মহিলা ঔপন্যাসিক Virginia Wolfe এঁর লেখায় রাশিয়ার ঔপন্যাসিকদের প্রভাব লক্ষিত হয়।

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল ঔপন্যাসিক নানা তত্ব আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে D. H. Lowrence-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরনারীর যৌন-বোধ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল মধুর এবং পবিত্র।

মহিলা ঔপন্যাসিক Mary Webbএর রচনায় পল্লীর একটা সুন্দর রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে; তাঁর আর একটা বিশেষত্ব— নারী হ'য়েও যৌন-তত্ব সম্বন্ধে নির্ভীক আলোচনা করবার সাহস।

আধুনিক ইংলণ্ডের উপন্যাস-সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে ইংলণ্ডের সাহিত্যের দৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে উদার—বদ্ধ গণ্ডীর সীমা ক্রমে বিলীন হচ্ছে। ইংলণ্ডের ভাবধারা ক্রমে ইউরোপের ভাবধারার সংগে 'বিশ্বসাহিত্যের সংগে মিলিত হ'তে চলেছে— এইটেই ইংলণ্ডের বর্তমান সাহিত্যের বিশেষত্ব।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া স্মরণে

কবিকঙ্কণ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মহা-বিশ্বজীবনের প্রথম স্পন্দন তুমি রসরাজ মহাভাব মাঝে
আবির্ভাব পুণ্য দিনে ভাগবত মহোৎসবে হেরি তব পাদপদ্ম রাজে।
বৈষ্ণবের আবাহনে তুমি এলে এ বঙ্গের সারস্বত সাধনা-দেউলে
সাথে করে এনেছিলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে নদীয়ার প্রাণ-গঙ্গাকূলে।
নিজে হাতে ধুয়ে দেছ নিখিলের পাপ-তাপ এ বঙ্গেরে দিলে ধন্য করি,
তোমার করুণাবলে এ বঙ্গ বৈকুণ্ঠ পেলো, তীর্থভূমে ছিলে রাসেশ্বরী।
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে দেখায়েছ লীলাচ্ছবি দূর করি গভীর আঁধার,
দীনের অর্চ্চনা লহ হে কালের আদ্যাশক্তি, অর্ঘ্য লহ অন্তর আমার।
আজি নব বর্ষ এলো—পড়ে মনে কত কথা, কত স্মৃতি স্নিগ্ধ মধুরিমা!
কিশোরীর বেশ ধরি জাহ্নবীর জনাকীর্ণ ঘাটে তুমি সৌন্দর্য্য-প্রতিমা
দিয়েছিলে যবে দেখা, স্তব্ধ হয়ে সেদিনের যাত্রাপথে শচীদেবী রয়,
দেখার অতীত করে প্রতি দিবসের মাঝে মাতৃচিত্ত করেছিলে জয়।
সংসারের খেলা ঘরে প্রবেশিয়া বধূবেশে দেখায়েছ চৈতন্য বিলাস,
নবদ্বীপ লীলা লয়ে ভাবরসে তোমারি মা নিত্যলীলা করেছ বিকাশ।

সংসার পাষাণ ভেদি অশ্রুর নির্ঝর দিয়া বহায়েছ প্রেমপ্রবাহিনী,
বুঝিতে পারেনি তাহা নদীয়ার জনারণ্য—বুঝেছিল শুধু মন্দাকিনী।
তোমার কঠোর ব্রত মানবের চিন্তাতীত, হেরিয়াছে নবদ্বীপবাসী
ভাবেনি সে ব্রত মাঝে পরম রহস্য রাজে যে রহস্য যুগে যুগে আসি
দেখাও বৈশাখী প্রান্তে বর্ষণ মুখর রাতে ফাল্গুনের গন্ধসমীরণে—
জীবন কল্লোল গীতে প্রাণের মৃদঙ্গাঘাতে বিরহের নিবিড় বেদনে।
কৃষ্ণকক্ষে আত্মভোলা জীবন কাব্যেরে তব রেখেছিলে মৌন অগোচরে,
বাহিরে বিরহ যাহা, ভিতরে সে মিলনের মাধুর্য্যেরে ব্যক্তাতীত করে।
বহু পুণ্যফলে মাগো তোমার পেয়েছি কৃপা তাই তব ভক্ত অনুরাগী,
যুগল মিলন লয়ে নিত্য নূতনের লীলা হেরি যেন,—এই ভিক্ষা মাগি।
নহ গৌর-অপেক্ষিতা, নহ গৌর-উপেক্ষিতা বিরহিনী নহ বিষ্ণুপ্রিয়া
নহ গোপী ঠাকুরাণী—চৈতন্যের চিত্তেশ্বরী বৃন্দাবন-মাধুর্য্যেরে নিয়া।
তাই তো তোমায় দেখি বৈরাগী বসন্ত যেথা করে তব সঙ্কীর্তন নাম,
ছন্দের অঞ্জলি দিয়া সেথায় রাখিনু মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া আমারি প্রণাম

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গত সংখ্যার পরের অংশ

জনার্দ্দনের প্রবেশ

জনার্দ্দন। হুজুর—

প্রতুল। (চমকে) কে? জনার্দ্দন! তুমি এখনও যাওনি?

জনার্দ্দন। যাচ্ছিলুম। এমন সময় একটী স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, নাম বললেন মল্লিকা বসু—

প্রতুল। তাঁকে পাঠিয়ে দাও। আর তুমি এবার বাড়ী যাও।

জনার্দ্দন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জনার্দ্দনের প্রস্থান

নিরঞ্জন। কে? (ছবির দিকে দেখিয়ে) ইনি?

প্রতুল। হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ এখানে—

নিরঞ্জন। টামে। বলেছি তো প্রেম ভয়ানক জিনিস।

প্রতুল। (অন্যমনস্ক ভাবে) হ্যাঁ।

নিরঞ্জন। আমি ততক্ষণ তোমার ল্যাবরেটরী দেখি।

প্রতুল। তার কোন প্রয়োজন নেই। আমার ইচ্ছা তুমি তার সঙ্গে আলাপ করে দেখ।

নিরঞ্জন। এই সব কথার পর—

প্রতুল। তাতে কি হয়েছে।

মল্লিকা বসুর প্রবেশ

মল্লিকা। আপনি খুব অবাক হয়ে গেছেন না?

প্রতুল। তা একটু হয়েছি বই কি। এস, তোমায় আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত, মল্লিকা বসু।

নিরঞ্জন। নমস্কার, মিস্ বসু।

মল্লিকা। নমস্কার। পরিচিত হয়ে খুবই সুখী হলুম, বিশেষ করে আপনি যখন মিষ্টার চৌধুরীর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

নিরঞ্জন। আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার পূর্ব্বেই ঘটেছে—

মল্লিকা। (বিস্ময়ের সুরে) কবে? কোথায়?

নিরঞ্জন। আজকে, এইখানেই। (ছবির দিকে দেখিয়ে) ঐ ছবির সাহায্যে।

মল্লিকা। (হেসে) ওঃ, তাই বলুন। (ছবির কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রতুলের প্রতি) শেষ হয়ে গেছে?

প্রতুল। না, একটু বাকী আছে।

মল্লিকা। চমৎকার হয়েছে। আমি কিন্তু এতটা—

নিরঞ্জন। আপনার প্রকৃত প্রতিকৃতিই প্রতুল এঁকেছে। আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি যে এত সুন্দরী মহিলা থাকতে পারেন—

মল্লিকা। ইজ ছাট এ কম্‌প্লিমেণ্ট?

নিরঞ্জন। ইয়েস, অ্যাণ্ড এ ট্রু ওয়ান টু।

মল্লিকা। (হেসে) থ্যাঙ্কস্। (প্রতুলের প্রতি) ছবিটা আঁকা শেষ হয়ে গেলে আমাকে দেবেন তো?

প্রতুল। নিশ্চয়ই।

মল্লিকা। আমাদের বসবার ঘরে টাঙিয়ে রাখব। সকলে দেখে হিংসেয় মরে যাবে। বাবা আপনার নৈনীতালের পাহাড়ের ছবির খুব প্রশংসা করছিলেন।

প্রতুল। লেকের ধারে, যেখানে আমরা বসতুম—

নিরঞ্জন। প্রতুল, তুমি কি আরও ছবি এঁকেছ?

প্রতুল। আর একটা মাত্র। নৈনীতালে।

মল্লিকা। বাবা বলেন এরকম রঙের কাজ ভারতবর্ষে আর কারো ইদানীং নেই। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে, মানে আমাদের জন্মাবার আগে, একটীমাত্র লোক, এই রঙ ব্যবহার করেছিলেন।

নিরঞ্জন। তার নাম জানেন?

মল্লিকা। না। ছবিতে তাঁর নাম ছিল না। বাবা বলেন, সে ছবি দেখে আর্টিষ্ট মহলে হৈ চৈ পড়ে যায়। তাতে শুধু তারিখ ছিল।

নিরঞ্জন। স্থান?

মল্লিকা। দিল্লী।

প্রতুল। দিল্লী?

মল্লিকা। হ্যাঁ। প্রথমে দিল্লীর আর্ট প্রদর্শনীতে সেটা এগ্‌জিবিট করা হয়, তারপর তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হওয়ায় সেটাকে কলকাতায় এনে আবার এগ্‌জিবিট করা হয়। বাবা ছবিটা কলকাতায় দেখেছিলেন।

নিরঞ্জন। আর্টিষ্টের খোঁজ করা হয় নি?

মল্লিকা। হয়েছিল, কিন্তু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

প্রতুল। ছবিটা এখন কোথায়?

মল্লিকা। জানি না। আচ্ছা প্রতুলবাবু, আপনি অথবা আপনার কোন আত্মীয় কখনও দিল্লীতে ছিলেন?

প্রতুল। না।

মল্লিকা। আপনি কার কাছে আঁকা শিখেছিলেন?

প্রতুল। কারো কাছে নয়।

মল্লিকা। ভারী আশ্চর্য্য তো। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বের একজন

অজ্ঞাত আর্টিষ্টের অঙ্কনপদ্ধতি, রঙের বিন্যাসের সঙ্গে আপনার অদ্ভুত মিল রয়েছে…

প্রতুল। এমন কিছু অসম্ভব নয়—

মল্লিকা। আপনি বাবার সঙ্গে একদিন দেখা করবেন তিনি মিলটা কোথায় বুঝিয়ে দেবেন। আজ কি আপনি খুব ব্যস্ত?

প্রতুল। ডাক্তার গুপ্তর সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কাজ ছিল। তা ছাড়া এখুনি ডাক্তার সুবোধ রায়ও আসবেন—

মল্লিকা। সেইজন্যই আমি আরও এলুম। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব।

নিরঞ্জন। ডাক্তার রায় কি খুব ভাল ডাক্তার?

মল্লিকা। হ্যাঁ। কলকাতায় তাঁর খুব নাম।

নিরঞ্জন। কিছু মনে করবেন না, আমি বম্বেতে থাকি, কলকাতার ডাক্তারদের তো চিনি না। তাই প্রশ্ন করলুম। প্রতুল, আমি এবার তোমার ল্যাবরেটরী দেখি—

প্রতুল। বেশ তো। কিন্তু বিশেষ কিছু নেই।

নিরঞ্জন। তা হোক। কিছু তো আছে। এক্সকিউজ মী মিস বসু—

ল্যাবরেটরীর দরজা খুলে নিরঞ্জনের প্রস্থান

মল্লিকা। লোকটী খুব ভদ্র—

প্রতুল। এবং ভারতবিখ্যাত সার্জ্জন। আজকাল আর প্র্যাকটিস করেন না।

মল্লিকা। আপনার ঘরটী বেশ মিষ্টার চৌধুরী, কিন্তু এত আলো কেন?

প্রতুল। আমি বেশী আলো ভালবাসি।

মল্লিকা। আপনার কি শরীর খারাপ?

প্রতুল। না। কেন? ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছি বলে?

মল্লিকা। আবার ডাক্তার গুপ্ত…

প্রতুল। আমি একটা রীসার্চ করছি। এঁদের মতামত এবং সাহায্য নেব।

মল্লিকা। আর কিছু নয় তো। আমায় লুকোবেন না—

প্রতুল। না, আর কিছু নয়।

মল্লিকা। তবে ঘরে এই সব কেন?

আল্‌ট্রা ভায়োলেট রে'র সরঞ্জাম দেখালো

প্রতুল। ওসব গবেষণার জন্য প্রয়োজন।

মল্লিকা। আপনি সন্ধ্যার পর বাড়ী থেকে বার হন না। ডায়েট সম্বন্ধে এত কড়াকড়ি—কেন? সত্যি বলুন, শরীর ভাল তো?

প্রতুল। হ্যাঁ মিলি, শরীর আমার ভালই আছে।

মল্লিকা। শুধু গবেষণার জন্য—

প্রতুল। হ্যাঁ। আমি কলকাতায় এসেছি এই কাজের জন্যই এবং শেষ হলে আবার চলে যাব।

মল্লিকা। কোথায়? নৈনীতালে?

প্রতুল। না। কোথায় তা আমি নিজেই জানি না।

মল্লিকা। অনেক দিনের জন্য।

প্রতুল। হ্যাঁ।

মল্লিকা। (একটু পরে) তবু?…কতদিন?…

প্রতুল। জানি না, হয়ত' আর ফিরব না।

মল্লিকা। খেয়াল?

প্রতুল। (ব্যথিত স্বরে) খেয়াল নয় মিলি, নিরুপায়।

মল্লিকা। (অন্য দিকে চেয়ে) হবে।

প্রতুল। মিলি, তুমি আমায় ভুল বুঝ না। তুমি তো জান আমি তোমায় কত—

মল্লিকা। তবে যাওয়ার কথা মিথ্যা।

প্রতুল। মিথ্যা হলে সব চেয়ে সুখী হতুম আমি, কিন্তু অন্য কোন পথ নেই? আমায় চলে যেতেই হবে।

মল্লিকা। একথা পরে আর একদিন আলোচনা করা যাবে।

প্রতুল। তুমি আমায় ক্ষমা কর মিলি, এ অপ্রিয় আলোচনা আর কোরো না।

মল্লিকা। বেশ। ওকি! আপনার চোখ দু'টো অমন জ্বলছে কেন?

তাড়াতাড়ি কতকগুলি আলো জ্বেলে

প্রতুল। তোমায় দেখছি। দেখে আশ মেটে না।

মল্লিকা। কিন্তু আপনার চাউনি, সে যে আমি সহ্য করতে পারছি না। যেন ঝলসে দিচ্ছে—

প্রতুল। (আরো অনেকগুলি আলো জ্বেলে) আমি ভাবছি—

মল্লিকা। কি ভাবছেন?

প্রতুল। পতঙ্গরা দু'দণ্ডের সুখের আশায় আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন জলাঞ্জলি দেয়—

মল্লিকা। (ভীতভাবে) হঠাৎ এ কথা কেন?

প্রতুল। আমারও এ দু'দিনের সুখ—

মল্লিকা। নিশ্চয়ই আপনার শরীর খারাপ। এ অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা—

প্রতুল। তোমায় দেখলে আমি একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ি।

মল্লিকা। আপনার একজন অভিভাবক দরকার।

রেজ্জার প্রবেশ

রেজ্জা। হুজুর—

প্রতুল। কি রেজ্জা?

রেজ্জা। একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান—(কার্ড দিল)

প্রতুল। (কার্ড দেখে) ডাক্তার সুবোধ রায়—(মল্লিকার দিকে চাইলেন)

মল্লিকা। আমার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করিয়ে রাখবেন না।

প্রতুল। রেজ্জা, তাঁকে আসতে বল।

রেজ্জা। আচ্ছা হুজুর।

রেজ্জার প্রস্থান

মল্লিকা। আমাকে এখানে দেখলে ডাক্তার রায় বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন না।

প্রতুল। কেন?

মল্লিকা। তিনি আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড, এবং···আমাকে একটু···

প্রতুল। তাই নাকি। আমি তা জানতুম না—

মল্লিকা। এমন কিছু ইম্পর্টেণ্ট কথা তো নয়। আমি তবে এখন যাই। আপনাদের কাজের কথাবার্ত্তার মধ্যে···

ডাক্তার সুবোধ রায়ের প্রবেশ

মল্লিকা। নমস্কার ডাক্তার রায়—

সুবোধ। মিলি! তুমি এখানে?

মল্লিকা। আমি এসেছিলুম আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে।

সুবোধ। ওঃ! কিন্তু তার কি বিশেষ প্রয়োজন ছিল!

মল্লিকা। (যেন একথা শুনতে পান নি এমন ভাবে) ইনি ডাক্তার সুবোধ রায়, কলকাতার বিখ্যাত সার্জ্জন আর ইনি মিষ্টার প্রতুল চৌধুরী।

প্রতুল। নমস্কার।

সুবোধ। নমস্কার। পরিচিত হয়ে সুখী হলুম।

মল্লিকা। যাক্‌, এইবার আমার কাজ শেষ হয়ে গেল—

সুবোধ। সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মল্লিকা। মিষ্টার চৌধুরী আপনার সাহায্যপ্রার্থী—

সুবোধ। আই উইল ডু মাই বেষ্ট।

প্রতুল। ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্তও এসেছেন। আমি তাঁকে ডেকে আনছি।

সুবোধ। যাঁর কথা আপনি চিঠিতে লিখেছিলেন?

প্রতুল। হ্যাঁ।

সুবোধ। আচ্ছা, ইনিই কি "গ্ল্যাণ্ডস্‌ অ্যাণ্ড দেয়ার ইম্পর্টেন্স ইন্‌ দি সিষ্টেম্‌" বইটা লিখেছেন?

প্রতুল। হ্যাঁ।

ল্যাবরেটরীর দরজা দিয়ে প্রতুলের প্রস্থান

মল্লিকা। ডাক্তার গুপ্ত কি খুব বিখ্যাত লোক?

সুবোধ। "গ্ল্যাণ্ড ট্রীটমেণ্টে" ভারতবর্ষে উনি একজন অথরিটি।

প্রতুল ও নিরঞ্জনের প্রবেশ

প্রতুল। (ল্যাবরেটারীর দরজায় চাবী দিতে দিতে) ডাক্তার রায়—

সুবোধ। ইয়েস প্লীজ।

প্রতুল। (এগিয়ে এসে) ইনি ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত, আমার বিশেষ বন্ধু, আর ডাক্তার গুপ্ত ইনি হলেন ডাক্তার সুবোধ রায়।

নিরঞ্জন। সো গ্ল্যাড টু মীট ইউ ইয়ং ম্যান।

সুবোধ। আমার সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটল স্যর। আপনার পুস্তক "গ্ল্যাণ্ডস্‌ অ্যাণ্ড দেয়ার ইম্পর্টেন্স ইন্‌ দি সিষ্টেম্‌" আমি পড়েছি এবং আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে শ্রদ্ধায় শির নত করেছি।

নিরঞ্জন। ধন্যবাদ। ডাক্তার রায়, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। হয়ত বেশী দিন বাঁচব না। আপনাদের মত বিচক্ষণ ইয়ং ডাক্তাররা যদি যতখানি আমি এগিয়েছি তার পর থেকে এই লাইনে কাজ করেন, তবে হয়ত' জগৎকে আমরা নতুন কিছু দিতে পারব।

সুবোধ। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন স্যর, কিন্তু আপনার লাইনটা খুব ডেলিকেট। জীবন-মরণ নিয়ে খেলা—

নিরঞ্জন। ইউ আর এ গুড্‌ সার্জ্জন। আর নতুন কিছু করতে গেলেই বিপদ আছে, কিন্তু ভয় পেলে চলবে কেন?

মল্লিকা। আপনারা কাজের কথা ক'ন। আমি এবার চলি। নমস্কার।

নিরঞ্জন। নমস্কার, মিস্‌ বসু।

সুবোধ। নমস্কার। কাল সকালে আপনাদের ওখানে যাব। মিস্‌ বসু এখন কেমন আছেন?

মল্লিকা। অনেকটা ভাল।

প্রতুল। এক্সকিউজ মী। আমি এঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসেছি।

প্রতুল ও মল্লিকার প্রস্থান

সুবোধ। ঘরটি দেখেই মনে হয় বৈজ্ঞানিকের গবেষণা মন্দির।

এদিকে ওদিকে দেখতে দেখতে মল্লিকার ছবির দিকে নজর পড়ল। কাছে এগিয়ে গিয়ে একমনে দেখতে লাগলেন

নিরঞ্জন। কি রকম দেখছেন?

সুবোধ। ওয়াণ্ডারফুল! আমি জানতুম না যে উনি একজন আর্টিষ্ট!

নিরঞ্জন। প্রতুল অদ্ভুত লোক।

সুবোধ। আমার সঙ্গে কি বিষয়ে পরামর্শ করতে চান জানেন?

নিরঞ্জন। সেই বলবে।

সুবোধ। যদি কিছু মনে না করেন, আপনিও কি কন্সাল্টেশনের জন্য এসেছেন স্যর?

নিরঞ্জন। না, কারণ আমি প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দিয়েছি। আমি ওর গবেষণায় ইণ্টারেস্‌টেড, তা ছাড়া আমি ওর বন্ধু।

সুবোধ। কিন্তু ওঁর বয়স বোধ করি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশী হবে না।

নিরঞ্জন। বয়সে কি ডাক্তার রায় বন্ধুত্ব আটকায়?

সুবোধ। (লজ্জিত ভাবে) না, না, আমি তা বলছি না।

প্রতুলের প্রবেশ

প্রতুল। মাফ করবেন, আপনাকে বসিয়ে রাখলুম—

সুবোধ। নট্‌ অ্যাট্‌ অল্‌। আপনার আঁকা ছবিটি দেখছিলুম। চমৎকার হয়েছে।

প্রতুল। ইউ থিঙ্ক্‌ সো?

সুবোধ। ইয়েস্‌। আচ্ছা, আপনি কি নৈনীতালে ছিলেন?

প্রতুল। হ্যাঁ। মাস পাঁচ-ছয়। কেন বলুন তো?

সুবোধ। এমনি জিজ্ঞেস করলুম।

প্রতুল। ডাক্তার রায়, বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

সকলে বসলেন

প্রতুল। হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক ডাক্তার রায়?

সুবোধ। নো থ্যাঙ্কস্।

প্রতুল। দেখুন ডাক্তার রায়, আপনার সার্জ্জারী আমার ওপর করতে হবে।

সুবোধ। আপনার ওপর! দেখে তো আপনাকে সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে।

প্রতুল। আমি ঠিক অসুস্থ নয়। তবুও আপনার সাহায্য দরকার। ইউ আর দি বেষ্ট ম্যান অ্যাভেলএবল—

সুবোধ। কমপ্লীমেণ্ট!

প্রতুল। সোজাসুজিই বলা ভাল। আমার আড্রেনাল গ্ল্যাণ্ড বদলে আর একজনের গ্ল্যাণ্ড গ্রাফ্‌ট করে দিতে হবে।

সুবোধ। (বিস্মিত হয়ে) হোয়াট! গ্ল্যাণ্ড বদলে—

প্রতুল। হ্যাঁ।

সুবোধ। আর একজনের গ্ল্যাণ্ড—

প্রতুল। এগজ্যাক্টলি।

সুবোধ। কেন?

প্রতুল। দরকার আছে বলে।

সুবোধ। আমি ডাক্তার, মিষ্টার চৌধুরী। কারণ না জেনে কাজ করতে পারব না। পেশেণ্টের ইচ্ছানুসারে সব কাজ করা সম্ভবপরও নয়, কর্ত্তব্যও নয়। তা ছাড়া আপনি যা বলছেন তা করা অসম্ভব?

প্রতুল। আমি জানি সম্ভব। ডাক্তার ভরনফ—

সুবোধ। বাঁদরের গ্ল্যাণ্ড দিয়ে কাজ করা চলে, কারণ ওয়ান ক্যান কিল ইট। কিন্তু আর একজন মানুষের গ্ল্যাণ্ড দিয়ে—

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, তাও সম্ভব।

সুবোধ। সম্ভব! কি বলছেন স্যর?

নিরঞ্জন। ঠিকই বলছি ডাক্তার রায়। আমার বইতে এই রকম একটা হিণ্ট দিয়েছি এবং নিজে হাতে করেও দেখেছি।

সুবোধ। করে দেখেছেন!

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। একবার নয় বহুবার।

সুবোধ। কিন্তু স্যর…

নিরঞ্জন। বলছি, শুনুন। আমি বইতে যখন একথা লিখি, তখন মেডিক্যাল ওয়ার্ল্ডে কেউ তা বিশ্বাস করতে চায় নি। অনেকে তীব্র প্রতিবাদও করেছিল। কিন্তু আমি শীঘ্রই জগতকে জানাব তা সম্ভব। ব্লড গ্রুপস্ আছে, জানেন?

সুবোধ। হ্যাঁ জানি। ডাক্তার ল্যাডষ্টেনার—

নিরঞ্জন। এগজ্যাক্টলি। এক ব্লডগ্রুপের দুই সাবজেক্টের মধ্যে গ্ল্যাণ্ড কেন প্রত্যেক অরগ্যান অদল বদল করা চলে, অ্যাণ্ড দে উইল গ্রো।

সুবোধ। বদলাতে গিয়ে তার শক্তি কমে যাবে—

নিরঞ্জন। স্কুইক্‌টনেস দরকার।

সুবোধ। রক্তের সাপ্লাই, হেমরেজ—

নিরঞ্জন। যে রকম ভাবে লাঙ্গস সীল করা হয়, সেই রকম ভাবে আর্টারী সীল করে রাখতে হবে, আর গ্রাফ্‌টিংএর পর কিছুক্ষণ আর্টিফিশিয়াল পাম্পিং প্রয়োজন হবে।

সুবোধ। পেশেণ্টরা বাঁচবে?

নিরঞ্জন। নিশ্চয়ই বাঁচবে। অপারেশানটা ডেলিকেট কিন্তু ইম্পসিবল নয়। আমি বহুবার করে দেখেছি।

সুবোধ। একেবারে নতুন—

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। এখনও এ জিনিষ কেউ জানে না, করে নি। আই ওয়াণ্ট টু টীচ ইউ। আপনি ভাল সার্জ্জন, চেষ্টা করলে পারবেন।

প্রতুল। এর জন্য আপনার যত টাকা ফী লাগে আমি দিতে প্রস্তুত।

সুবোধ। আপনি কেন এ কাজ করতে বলছেন?

নিরঞ্জন। কারণ উনি এই এক্সপেরিমেণ্টটা করতে চান এবং নিজের ওপর দিয়ে। যখন এতটা আপনাকে বললুম, তখন আর একটী কথাও আপনাকে বলা চলতে পারে। অবশ্য সবই কনফিডেনশিয়াল। কিন্তু আপনি ডাক্তার, বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না এ বিশ্বাস আমাদের আছে। এই নতুন গ্ল্যাণ্ড এক্সচেঞ্জের থিওরী ওঁরই আবিষ্কৃত। আমি ওঁকে এসিষ্ট করেছি মাত্র।

সুবোধ। ওঁর আবিষ্কৃত।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। উনি বহু দিন গবেষণা করে এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

সুবোধ। হী ইজ এ ষ্ট্রেঞ্জ ম্যান—

নিরঞ্জন। ইয়েস, বীকজ হী ইজ এ জিনীয়াস।

প্রতুল। আমার গ্ল্যাণ্ডসের জীবনীশক্তি কমে গেছে—

সুবোধ। ভেরী ইণ্টারেষ্টিং এক্সপেরিমেণ্ট!

প্রতুল। শরীরে থাকলে প্রভুত ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বদলে নিলে দে উইল ফাংশন নর্ম্যালি।

নিরঞ্জন। হী ইজ অ্যাবসোলিউটলি রাইট।

সুবোধ। আর একজন লোক,…সে কি এতে রাজী আছে?

প্রতুল। নিশ্চয়ই। তা না হলে কাজে এগোবো কি করে। তাকে দেখবেন?

সুবোধ। আই উড লাইক টু।

প্রতুল। বেশ।

কলিং বেল টিপলে

সুবোধ। স্যর, এ কিন্তু সত্য হলে চিকিৎসা জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে।

নিরঞ্জন। ডাক্তার রায়, এতে কিন্তু নেই। এ সত্য এবং সম্ভব।

আমি তো বলেছি যে এর পূর্ব্বে বহুবার আমি এ অপারেশান করেছি।

রেজার প্রবেশ

রেজা। স্তর ডাকছেন?

প্রতুল। হ্যাঁ। ডাক্তার রায়, হিয়ার ইজ দি আদার ম্যান।

স্তবোধ। (ডাক্তার গুপ্তকে) এর ব্লড টেষ্ট করেছেন?

নিরঞ্জন। এখনও করি নি। কাল করব।

স্তবোধ। কোথা দিয়ে গ্রাফ্‌টিং করবেন?

নিরঞ্জন। লাম্বার—

স্তবোধ। (রেজার পিঠে হাত দিয়ে) রেট্রোপেরিটোনিয়াল ইনসিশন—

নিরঞ্জন। ইয়েস। অ্যাণ্ড কুইকনেস ইজ এসেনসিয়াল!

স্তবোধ। বটেই তো। (প্রতুলের প্রতি) এর স্বাস্থ্য তো খুব ভাল নয়।

প্রতুল। দেখতে হবে।

নিরঞ্জন। স্বাস্থ্য তো ইম্পর্টেন্ট নয়, ব্লড টেষ্টই হ'ল আসল।

স্তবোধ। দু'জনের এক গ্রূপ হওয়া চাই।

নিরঞ্জন। এগজ্যাক্টলি।

স্তবোধ। দু'জনকে এক সঙ্গে ওপেন করতে হবে…

নিরঞ্জন। ওফ কোর্স, ইট ইজ ডেলিকেট!

স্তবোধ। ভেরী ডিফিকাণ্ট অপারেশন—

নিরঞ্জন। বাট ইণ্টারেষ্টিং।

স্তবোধ। তা বটে। (রেজার প্রতি) কি করা হবে তুমি জান?

রেজা। হ্যাঁ স্তর। অপারেশন। খুব লাগবে না তো?

স্তবোধ। না। ক্লোরোফর্ম করে করা হবে। তোমার কোন আপত্তি আছে?

রেজা। আজ্ঞে না। আমি তো তা লিখে দিয়েছি। পাঁচশ' টাকা পেলে—

স্তবোধ। তুমি একাজে সম্পূর্ণ রাজী?

রেজা। হ্যাঁ স্তর। অনেক দিন পাথর ভাঙতে হয়েছে—

প্রতুল। রেজা, তুমি এবার যেতে পার।

স্তবোধ। মানে, তুমি কি…

রেজা। পাঁচশ' টাকার পরিবর্ত্তে আমি অপারেশনে রাজী আছি। (প্রতুলের প্রতি) আমি এবার যাব স্তর?

প্রতুল। হ্যাঁ। যেতে পার। দরকার হলে ডাকব।

রেজার প্রস্থান

প্রতুল। ও রাজী আছে, দেখলেন তো।

স্তবোধ। কিন্তু ওলেষটা কি বোঝে?

প্রতুল। অত ফাইনার পয়েণ্টস্ ওর সঙ্গে ডিস্কাস করিনি। ও ডাক্তার নয়, সব জিনিষ বুঝতেও পারত না।

স্তবোধ। তা ঠিক। (একটু থেমে) পাথর ভাঙ্গার কথা কি বলছিল? লোকটা কি জেল ফেরত।

প্রতুল। হ্যাঁ। দু'একবার পুলিশের হাতে পড়েছিল—

নিরঞ্জন। কিন্তু তাতে ইণ্টার্নাল অরগ্যান্সের কোন ক্ষতি হয় না।

স্তবোধ। না, না, আমি তা মীন করিনি—

নিরঞ্জন। না করলেও, কথা বলার ভঙ্গীতে সন্দেহ প্রকাশ পাচ্ছে।

স্তবোধ। ব্যাপারটা একটু আনইউজুয়াল—

নিরঞ্জন। প্রথম হিউম্যান বডি নিয়ে কাটা ছেঁড়াও আনইউজুয়াল ছিল।

প্রতুল। আগেও আমি একাজ করিয়েছি।

স্তবোধ। তাই তো শুনছি। কোথায়?

প্রতুল। এলাহাবাদে।

স্তবোধ। কার সঙ্গে?

প্রতুল। তার কি কোন দরকার আছে?

স্তবোধ। সে বেঁচে আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখব।

প্রতুল। এ সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত গোপনীয়…

স্তবোধ। গোপনীয়? কেন?

প্রতুল। প্রত্যেক নতুন জিনিষ আবিষ্কার গোপনেই করা হয়। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

নিরঞ্জন। আপনি কিজন্য এত চিন্তিত হচ্ছেন?

স্তবোধ। দু'জন অজানা লোকের গ্ল্যাণ্ড অদল বদল—তার মধ্যে আবার একজন জেল ফেরত—

প্রতুল। আপনি রাজী নন?

স্তবোধ। সবই গোপনে করতে হবে। যদি কিছু ভুল হয়ে যায়, তখন আমার পোজিশন কি হবে?

নিরঞ্জন। আমি বলছি ভুল হতে পারে না।

স্তবোধ। আপনি আগেও করেছেন স্তর তাই আপনার সাহস আছে কিন্তু আমার এই প্রথম। ভয় হওয়া স্বাভাবিক। (প্রতুলের প্রতি), আমাকে দু'এক দিন ভাবতে সময় দিন।

প্রতুল। বেশ।

স্তবোধ। খুব তাড়া নেই তো?

প্রতুল। যত শীঘ্র সম্ভব হয় তত ভাল।

স্তবোধ। দুদিন ভাবতে সময় দিন। (হাতঘড়ি দেখে) আমাকে এবার উঠতে হবে। কেস আছে।

প্রতুল। অল রাইট।

নিরঞ্জন। আশা করি শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

স্তবোধ। হোপ সো। নমস্কার।

স্তবোধের প্রস্থান

নিরঞ্জন। তোমার মিস বন্দুর ছবি আঁকাটা ওঁর পছন্দ হয় নি।

প্রতুল। না। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি।

নিরঞ্জন। একটু গণ্ডগোল করবে—

প্রতুল। না রাজী হয় অন্য লোক দেখব।

নিরঞ্জন। রাজী হলেও হতে পারে। লোকটা ভাল সার্জ্জন, ওকে ছাড়া ঠিক হবে না। এইবারই হয়ত' আমি তোমাকে শেষ সাহায্য করতে পারব, পরে···কে জানে ?

প্রতুল। তুমি আর থাকবে না, এ আমি ভাবতেই পারি ন'। যেদিন থেকে একাজে নেমেছি প্রত্যেকবারই তুমি আমার পাশে ছিলে।

নিরঞ্জন। আর কোন ভাল সার্জ্জন জোগাড় হলেও চলে যাবে—

প্রতুল। তা হয়ত' যাবে, কিন্তু তুমি থাকবে না ভেবে আমার মনটা দমে যাচ্ছে। আমি আরও কতদিন থাকব—একলা, সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন অবস্থায়।

নিরঞ্জন। মিস্ বসু—

প্রতুল। না নিরঞ্জন, আমার জীবনে বন্ধুত্ব, প্রেম, সোসাইটী কিছুই থাকতে পারে না। প্রতিদিন আমার ভয়ে ভয়ে কাটে, কি জানি কখন কি হয়। সর্ব্বদা নতুন দেশে নতুন পরিচয়ে আমায় বাস করতে হয়—পাছে আমার কোন ট্রেস পিছনে পড়ে থাকে। তাহলেই আমার সীকরেট বেরিয়ে পড়বে।

নিরঞ্জন। কর্ম্মচারীটীরও তো কোন ট্রেস রাখলে চলবে না।

প্রতুল। না এবং সেইটাই আমার চলার পথে সবচেয়ে অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য।

নিরঞ্জন। প্রতুল, বহুদিন আগে তোমাকে একটা কথা বলেছিলুম, মনে পড়ে ?

প্রতুল। কি কথা ?

নিরঞ্জন। তুমি যা করছ' তা প্রকৃতির নিয়মবিরোধী এবং বোধ-করি ভগবানেরও নিয়ম বিরোধী।

প্রতুল। না, আমি তা স্বীকার করি না। তাহলে প্রত্যেক রোগীকে আরোগ্য করবার চেষ্টাও নিয়মবিরুদ্ধ বলতে হয়।

নিরঞ্জন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমি তোমার এই অপূর্ব্ব প্রচেষ্টার সুখ্যাতি করি, কিন্তু তোমার বন্ধু হিসেবে আমার মনে হয়—

প্রতুল। বুঝেছি, কিন্তু এখন টু লেট্।

নিরঞ্জন। তোমার মনে কখনও কোন সন্দেহ জাগে না ?

প্রতুল। ন'। তবে এইবার একটু···

নিরঞ্জন। প্রেম ? মল্লিকা ?

প্রতুল। (চমকে) প্রেম ? না, না, বন্ধু, ওকথা উচ্চারণ কোরো না। প্রেমে আমার অধিকার নেই। আমি মানুষ হয়েও মানুষ নই। (অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ নিরঞ্জনের সামনে থেমে) নিরঞ্জন, তুমি হয়ত' বললে বিশ্বাস করবে না, জীবনে আমার মনে এই প্রথম সন্দেহ, ভয় উঁকি দিয়েছে। তুমি চলে যাবে, মিলি চলে যাবে—একে একে সকলে চলে যাবে। আমি একা থেকে যাব—একা—একা—

নিরঞ্জন। প্রতুল, তুমি আজ ক্লান্ত। শুতে যাও।

প্রতুল। (লজ্জিতভাবে) মাফ করো নিরঞ্জন, আমি ভুল বকছিলুম।

নিরঞ্জন। তোমার সাহস হারালে চলবে না বন্ধু। যে জীবনমরণ যজ্ঞে তুমি ব্রতী, তা শেষ করে যেতে হবে।

প্রতুল। তা হবে। তারপর···ডাক্তার, তারপর কি ? শুধু অন্ধকার—

নিরঞ্জন। (চীৎকার করে) প্রতুল—

প্রতুল। ভয় পেও না নিরঞ্জন, আমি পাগল হয়ে যাইনি। সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আছি। সেই গাঢ় অন্ধকারে যদি তুমি আমায় দেখ, ভয় পাবে ?

নিরঞ্জন। না !

প্রতুল। আমার শরীর দিয়ে আগুন বেরোবে—তবু ভয় পাবে না ?

নিরঞ্জন। না। (আজ্ঞার সুরে) প্রতুল, তুমি শোবে চল।

প্রতুল। (ধীরভাবে) চল।

প্রতুলকে নিয়ে নিরঞ্জনের প্রস্থান

ক্রমশঃ

গান

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতসুধাকর

ভুলে যেও মোর গান॥
মনে রেখ শুধু অতীতের স্মৃতি
মনে রেখ অভিমান॥

আমার মাঝারে তোমার মাধুরী
বিকাশে শতেক বরণ-চাতুরী
স্বপনের মাঝে যায় গো ভাঙিয়া
মিলনের অভিযান॥

কি হবে গো প্রিয় কলহ মিলনে
আশীষ যেথায় নাই,
শুধু আঁখিজল লয়ে সম্বল—
যাই আজি চলে যাই॥
যদি মনে পড়ে ভালবাসা মম,
ভুলে যেও প্রিয় স্বপনের সম,
বিজয়ার মত সব কিছু আজি
হোক্ তবে অবসান॥

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর-ই-এস্‌

১৩

কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন হয়। অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ান এবং ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু স্যর উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। উমেশচন্দ্রের অনুরোধে পার্লিয়ামেন্টের নির্ভীক সদস্য ও ভারতবন্ধু চার্লস ব্র্যাডল এই অধিবেশনে যোগদান করায় এই অধিবেশনে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। ব্র্যাডল ফ্রি থিঙ্কার ছিলেন। তিনি নাস্তিক বলিয়া পার্লিয়ামেন্টের চিরপ্রচলিত শপথ গ্রহণে অস্বীকার করেন—সুতরাং কয়েকবার উপর্য্যুপরি নির্বাচিত হইয়াও পার্লিয়ামেন্টে বসিবার অধিকার পান নাই,

সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ

বহু মামলা মোকদ্দমা ও অর্থব্যয়ের পর তিনি পার্লিয়ামেন্টে আসন প্রাপ্ত হন। অধ্যাপক ফসেটের পর ভারতবর্ষের জন্য আর কেহ তাঁহার ন্যায় পার্লিয়ামেন্টে পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাই 'প্রচারে' লিখিয়াছিলেন—"আমাদের কি দুঃখ, আমরা কি চাই তাহা পার্লিয়ামেন্টে দাঁড়াইয়া কেহ বলা চাই, কেন না, পার্লিয়ামেন্ট ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পার্লিয়ামেন্টই প্রকৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা। ফসেট সাহেব দয়া করিয়া ভারতবর্ষের এই উপকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকৃতপক্ষে এ ভার আর কেহ গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে মিষ্টার ব্যানারজি ও দাদাভাই ব্র্যাডল সাহেবকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন।" ব্র্যাডলকে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। যে সমিতির প্রতি এই অভিনন্দন পত্র প্রণয়নের ভার প্রদত্ত হয় তাহাতে উমেশচন্দ্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্র্যাডল সাহেবও ভারত শাসন-সংস্কার সম্বন্ধীয় একটি নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া পার্লিয়ামেন্টে পেশ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনও করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার অনতিকাল মধ্যে তিনি পরলোকগমন করায় তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট লর্ড ক্রশ যে সংশোধিত বিল পেশ করেন তাহাই বিধিবদ্ধ হয়। এই অধিবেশনে হিউম ও অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে পুনর্নিযুক্ত হন এবং হিউমের অনুপস্থিতিকালে যুগ্ম সম্পাদক এবং উমেশচন্দ্র বাঙ্গালায় কংগ্রেসের আইন সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডে কংগ্রেসের এজেন্টরূপে কার্য্য করিবার জন্য স্যর উইলিয়ম

রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

ওয়েডারবার্ণ, মিঃ ডব্লিউ-এস-কেইন এম-পি, ডব্লিউ-এস-ব্রাইট-ম্যাক্‌ল্যারেন এম-পি, জে-ই-এলিস এম-পি, দাদাভাই নৌরোজী ও জর্জ্জ ইউলকে নিযুক্ত করা হয় এবং সম্পাদক ডব্লিউ ডিগবী সি-আই-ই কে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়। কংগ্রেস যে সকল সংস্কারের প্রার্থী তাহা ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য এবং তাহাদের সহযোগিতা লাভের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ইংলণ্ডে আন্দোলন করিবার ভার প্রদত্ত হয়:—

জর্জ্জ ইউল, এ-ও-হিউম, অ্যাডাম, আর্ডলি নর্টন, জে-ই-হাউয়ার্ড, ফিরোজশাহ মেটা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, মিঃ

শরফুদ্দীন, এন মুধোলকার, ডব্লিউ-সি বনার্জ্জী। ইংলণ্ডে কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ৫৫০০০৲ টাকা চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হয়।

'ইণ্ডিয়া।' পারিবারিক বিপদ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ

ইংলণ্ডে কংগ্রেসের একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে উমেশচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগিগণ 'ইণ্ডিয়া' পত্র প্রবর্ত্তিত করিতে সাহায্য করেন। এই বৎসর উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের অধিবেশনে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই বৎসরটী উমেশচন্দ্রের পক্ষে ভয়ানক দুর্ব্বৎসর। মোক্ষদা দেবী লিখিয়াছেন—"সে বৎসর (১৮৯০ খ্রীঃ) পূজার বন্ধের পরেই কলিকাতায় আমার দাদার খুব ব্যারাম হয়। আমার ভাজ শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী তাঁর ছেলেমেয়েদের লইয়া তখন বিলাতে। সেখানে ঐ সময়ে তাঁর বার বৎসরের ছেলে, কিটি (সরলকৃষ্ণ) হঠাৎ মারা পড়াতে আমার দাদার অসুখ আরও বৃদ্ধি

সরলকৃষ্ণ কীট্‌স্ বনার্জ্জী

পায়। তাঁর শুশ্রূষার জন্য আমাকে ভাগলপুর ছাড়িয়া প্রায় ছয় মাস কলিকাতায় থাকিতে হয়। * * * আমার দাদা ১৮৯১য়ের মার্চ্চ নাগাৎ সুস্থ হইয়া উঠিলে আমি ভাগলপুরে ফিরিয়া যাই।"

উমেশচন্দ্র তাঁহার তৃতীয় পুত্র সরলকৃষ্ণ কীট্‌সকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তিনি যখন বাতব্যাধিসংক্রান্ত জ্বরে শয্যাগত তখন এই আকস্মিক শোক সংবাদে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এই বৎসরে তাঁহার বিমাতা গোবিন্দমণিও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইঁহাকেও তিনি তাঁহার গর্ভধারিণীর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং ইঁহার পারলৌকিক কার্য্যের জন্য অন্যূন দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রোগের জন্য কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন কলিকাতাতে হইলেও তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই। সুরেন্দ্রনাথও এই সময়ে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে লিখিত আছে—"There was another fellow-sufferer whose absence was severely felt by Congress-workers. That was Mr. W. C. Bonnerjee, who too, was confined to a sick-bed, prostrated with rheumatic fever."

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন উমেশচন্দ্রের সতীর্থ স্যর ফিরোজশাহ মেটা এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু মনোমোহন ঘোষ। এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ ১২৯৭-৮ সালের 'ভারতীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের ব্রিটিশ এজেন্সীর সম্পাদক "শ্রীযুক্ত ডিগবী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মুধলকার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নর্টন ও শ্রীযুক্ত হিউম মহাসমিতির প্রতিনিধিস্বরূপে গত বৎসরে ইংলণ্ডে যেরূপ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব গুরুতর কার্য্যভার সম্পাদন করিয়াছিলেন" তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি মহাসমিতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথমে একজন মহিলা প্রতিনিধি—বাঙ্গালী মহিলা

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় "সংক্ষেপে সুমধুর ভাষায় সভাপতির গুণকীর্ত্তন ও মহাসমিতির গুরুতর কার্য্য একান্ত দক্ষতার সহিত পরিচালন জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ" দান করেন। সভাপতি মহাশয়ও সর্ব্বপ্রথম একজন মহিলা প্রতিনিধির নিকট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক জানকীনাথ ঘোষাল এবং সহকারী চারুচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কংগ্রেসকর্ম্মীকেও সুব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ দেন। এই অধিবেশন উপলক্ষে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক "মহাপূজা" রচিত ও ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমা

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আর একটি ঘটনা এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিব। উহা রাজনীতিঘটিত নহে। 'রেইজ ও রায়ত' সম্পাদক সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উমেশচন্দ্র আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার পত্রের নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তাঁহার রাজনীতিক মতামত উমেশচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করিত এবং উমেশচন্দ্র তাঁহাকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া হিউম সাহেবও একবার উমেশচন্দ্রকে লিখিত এক পত্রে গুরুজী বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাতে শম্ভুচন্দ্র বিশেষ অপমানিত বোধ করেন এবং উমেশচন্দ্রকে বলেন "তোমরা গুরুজী বল তাহাতে দোষ হয় না কিন্তু যখন একজন বিদেশী ঐ ভাবে সম্বোধন করে তখন মনে হয় সে বিদ্রূপ করিয়া ঐরূপ বলিতেছে।" হিউম একথা শুনিয়া শম্ভুচন্দ্রকে লিখেন তিনি যথার্থই শম্ভুচন্দ্রের ভক্ত এবং বিদ্রূপ করিয়া ঐ ভাবে লিখেন নাই। স্ক্রীন বিরচিত শম্ভুচন্দ্রের ইংরাজী জীবনচরিতে (An Indian Journalist by F. H. Skrine (I. C. S. হিউমের পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে। শম্ভুচন্দ্র একবার তাঁহার পত্রে কোনও ধনী ব্যক্তির মান- হানিকর মন্তব্য লিখিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হয়। এই মানহানির মোকদ্দমায় উমেশচন্দ্র তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং স্যর চার্লস পল

প্রভৃতিকে বুঝাইয়া এই প্রবীণ রাজনীতিক লেখক ও সম্পাদককে বিপন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিছু অর্থ দণ্ড (৫০০৲) দিতে হইয়াছিল কিন্তু শম্ভুচন্দ্র একখানি পত্রে লিখিয়াছেন বিপক্ষকে তিনি উমেশচন্দ্রের রক্ত,তার দ্বারা যে আঘাত দিয়াছিলেন তাহার তুলনায় উহা কিছুই নহে।

বন্ধু বিয়োগ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে চার্লস ব্রাডল রাজা স্যর তাঞ্জোর মাধব রাও, ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতির মৃত্যুতে উমেশচন্দ্র মর্মাহত হইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত তিনজন কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন এবং পরবর্ত্তী কংগ্রেসে তাঁহাদের উদ্দেশে সভাপতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই। তাঁহার দৌহিত্র সাহিত্যগুরু সুরেশ চন্দ্র সমাজপতির মুখে শুনিয়াছি যে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহাকে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস কেবল আবেদন নিবেদনের দ্বারা কোন
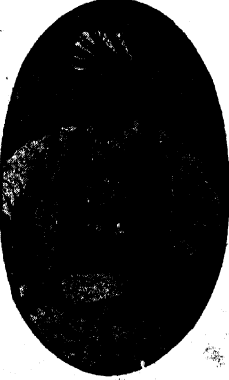
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রকৃত রাজনীতিক অধিকার লাভ সম্ভব নহে। বিদ্যাসাগরের প্রতি উমেশচন্দ্রের অসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং উমেশচন্দ্রের অসাধারণ মাতৃভক্তির জন্য

উমেশচন্দ্র ও সার ফিরোজশাহ মেটা (সম্মুখে উপবিষ্ট)
পশ্চাতে দণ্ডায়মান—নলিনবিহারী সরকার, মনোমোহন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র মল্লিক ও শেফালী বনার্জী

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও উমেশচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা বিনয়কৃষ্ণকে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করিতে উদ্বুদ্ধ করেন * এবং তাঁহার আশা ছিল ইঁহাদের দ্বারা দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত করিবেন! কিন্তু অল্প বয়সে নীলকৃষ্ণ ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁহার সে আশা নির্মূল হয়। তিনি নীলকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর বিনয়কৃষ্ণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

খিদিরপুর ভবন বেডফোর্ড পার্ক, ক্রয়ডন ১৭ই জুলাই ১৮৯১

প্রিয় বিনয়কৃষ্ণ,

গত মেলে তোমার দাদা মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি যে কিরূপ শোকান্বিত হইয়াছি—তাহা প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন একনিষ্ঠ স্বদেশহিতৈষী এবং তাঁহার বন্ধুগণ একজন প্রেমময়, সদাশয়, সহৃদয় এবং সুবিবেচক সঙ্গী ও সহকর্মী হারাইল। তাঁহার পারিবারিক জীবন কিরূপ ছিল তাহা তুমি বাহিরের লোক অপেক্ষা বেশী জান কিন্তু এক্ষেত্রেও আমি কিছু জানি বলিয়া দাবী করিতে পারি, এবং যদি আমি বলি যে তাঁহার মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা হইলেও তাঁহার শোকাবহ মৃত্যুতে লোকে যাহা অনুভব করিতেছে তাহার সহস্রাংশের

* দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৮৮৬) নীলকৃষ্ণ যোগদান করিয়াছিলেন এবং ষষ্ঠ অধিবেশনে (১৮৯০) তিনি একটী প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন।

একাংশও অভিব্যক্ত হয় না। * * * এ সময়ে আর অধিক কিছু বলিতে যাওয়া অনুচিত।

ভবদীয় প্রীতিভাজন বন্ধু
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। উহাতে আনন্দ চার্লু সভাপতিত্ব করেন। ইংলণ্ডে কংগ্রেসের একটা অধিবেশন হইবে এইরূপ একটী প্রস্তাব চলিতেছিল এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষে পরবর্ত্তী অধিবেশন স্থগিত রাখিবার জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র বলেন যতদিন না কংগ্রেসের দাবী স্বীকৃত হইতেছে ততদিন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া উচিত এবং তাঁহার প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

আনন্দ চার্লু
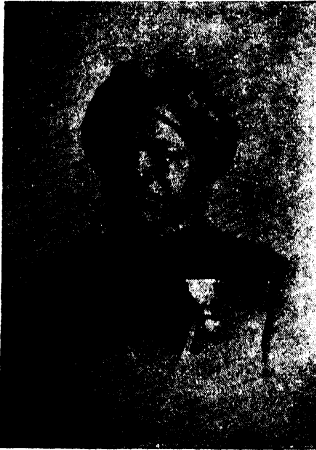
মাতৃ বিয়োগ

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র একটা ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন। এই বৎসর তাঁহার গর্ভধারিণী জননী সরস্বতী দেবী বারাণসীধামে স্বর্গারোহণ করেন। উমেশচন্দ্রের মাতৃভক্তি আদর্শস্থানীয় ছিল। বিলাত যাত্রায় পিতার মত ছিল না, কিন্তু তাঁহার মাতা আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও পরিণীতা হইয়াও যথেষ্ট উদার মতাবলম্বিনী ছিলেন এবং বিলাত গমনের পূর্ব্বে উমেশচন্দ্র কথোপকথনচ্ছলে তাঁহাকে চট্টগ্রামে একটি উচ্চ পদ পাইলে পুত্রকে তথায় যাইতে দিতে তাঁহার আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পুত্রের উন্নতির জন্য তাঁহাকে কালাপানি পার হইতে দিতে সম্মতি দিয়াছিলেন। এই সম্মতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উমেশচন্দ্র বিলাত যাইতে দ্বিধা করেন নাই, হয়ত মাতার আপত্তি থাকিলে তিনি তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতেন। ইংলণ্ডে দারুণ অর্থকষ্টের সময় উমেশচন্দ্র তাঁহার মাতুল দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্যের মধ্যবর্ত্তিতায় মধ্যে মধ্যে জননীর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেন এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। মাতার গভীর ধর্ম্মপ্রাণতা ও আচারনিষ্ঠা উমেশচন্দ্র শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহার সকল ইচ্ছা পূরণ করিতে তিনি সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি খিদিরপুরে ৫ বিঘা পরিমিত জমির উপর যে উদ্যান ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহার জননী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে সাহেবটোলায় ইংরাজের ন্যায় বাস করিলেও প্রতি সপ্তাহে বলরাম দে (এখন ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী) ষ্ট্রীটে তাহার পৈতৃক ভবনে জননীর চরণ বন্দনা করিতে আসিতেন। দেব সেবা, কথকতা, অতিথি সেবাদির জন্য, যখন তাঁহার যাহা প্রয়োজন হইত, তাহা তখনই তাঁহাকে দিয়া আসিতেন। শেষ জীবন তিনি ৺কাশীধামে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উমেশচন্দ্র তথায় (সোণারপুরায়) একটী বাটী ক্রয় করিয়া তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনি মাতার তুলাদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মাতার দেহের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্যাদি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী একবার দীক্ষা গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হন কিন্তু উমেশচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মকে এরূপ শ্রদ্ধা করিতেন ধর্ম্ম লইয়া ভণ্ডামী তাঁহার সহ্য হইত না। তিনি বিলাত প্রত্যাগতা একজন বন্ধুপত্নীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে একদিকে হিন্দুধর্ম্মের নিষিদ্ধ আচার সমূহ পালন করিবে অপরদিকে মালা জপিবে ইহা হইতে পারে না। হেমাঙ্গিনী দেবী বলেন যে "একটা ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া কিরূপে জীবনযাপন করিব, তাহা হইলে এস আমরা খৃষ্টান হই।" উমেশচন্দ্র বলেন যে "পতিত হইলেও হিন্দুধর্ম্ম কখনও পরিত্যাগ করিব না, ইচ্ছা হয় তুমি খৃষ্টান হইতে পার।" হেমাঙ্গিনী দেবী খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন কোন সন্তানও খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু উমেশচন্দ্র আজীবন আপনাকে হিন্দু-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

শুনা যায়, উমেশচন্দ্র তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ) প্রায় ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। মহারাজা, রাজা, হাইকোর্টের বিচারপতি ও ব্যবহারাজীব প্রভৃতি সমাজের উচ্চতম স্তরের ব্যক্তিরা এই শ্রাদ্ধ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, এবং সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি-আই-ই এই সভায় অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। এরূপ দানসাগর শ্রাদ্ধ অতি অল্পই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কাঙ্গালীদিগকে ‖৹ করিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছিল।

এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে শ্রাদ্ধাদিতে ব্যয় উমেশচন্দ্র অপব্যয় মনে করিতেন না। অধ্যাপকগণকে মুক্তহস্তে দান, নরনারায়ণের সেবা তিনি পবিত্র কর্ত্তব্য মনে করিতেন। এইজন্য যখনই কেহ তাঁহার নিকট পিতামাতার শ্রাদ্ধাদির জন্য সাহায্যপ্রার্থী হইতেন, তিনি তাহাকে প্রভূত অর্থ সাহায্য করিতেন। কন্যার বিবাহে ক্ষমতাতিরিক্ত যৌতুকাদির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না এবং কন্যাদায়গ্রস্তদিগের প্রতি সেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন না।

সেতু

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

সন্ধ্যা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ধীর মন্থর গতিতে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বাস্-ষ্ট্যাণ্ডে—বিষণ্ণ রোগপাণ্ডু মলিন মুখে। বেলা তখন ১০টা। ট্রামে বাসে ভয়ানক ভীড়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে একখানা দোতলা বাসে ভীড় ঠেলে উঠে বসবার যায়গা পেলো। শ্রান্তভাবে মেয়েদের সিটে বসে পড়লো অবসন্ন দেহে। সে এসেছিল তার প্রিয় বান্ধবী অমিয়ার কাছে তাঁকে ধরে হাসপাতালে একটী সিট্ সংগ্রহের চেষ্টায়। অমিয়া এম-বি পাশ করে হাসপাতালে শিক্ষানবীশ। তাঁর কাছে আশ্বাস পেয়ে বাড়ী ফিরছে।

সন্ধ্যা বাসে বসে ভাবছে তা'র অদৃষ্টের ঘটনালহরী : বাল্যে মাতৃহারা হ'লে পিতা সুহৃদকুমার মাতার ন্যায় কত স্নেহে আদরে তাকে মানুষ করেন। স্নেহান্ধ পিতার কথা স্মরণ হ'তে তা'র দুই গণ্ড বয়ে পড়তো বাষ্পধারা। সুহৃদকুমার পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের লেক্‌চারার ছিলেন—ইউনিভার্সিটী ক্লাশে কয়েক ঘণ্টা ক্লাশ করে ফিরতেন বাড়ী—এসে ভার নিতেন কন্যা প্রতিপালনের। এমনি করে সন্ধ্যার বাল্য কিশোর বয়স কেটে গেল ; বাবার অত্যধিক আদরে মায়ের স্নেহের অভাব সে অনুভব করে নি। রুগ্ন-শয্যায় দেখেছে পিতাকে তা'র শয্যাপ্রান্তে দিবারাত্র ; তাতে মায়ের কোমল হস্তের স্পর্শ সে পেয়েছে। সুহৃদকুমার উচ্চশিক্ষিত খ্যাতনামা প্রফেসর ; তিনি কন্যাকে গড়ে তুল্লেন বর্ত্তমান যুগের স্ত্রী-শিক্ষার দোষ-বর্জ্জিত আদর্শস্থানীয় করে। পিতা-পুত্রী আনন্দে সংসার করছিলেন। হঠাৎ বিধাতা বিমুখ হলেন। সুহৃদকুমার কঠিন 'টাইফয়েড' জ্বরে শয্যা নিলেন—তৃতীয় সপ্তাহে রোগ দুরারোগ্য হয়ে দাঁড়ালো, চতুর্থ সপ্তাহে সুহৃদকুমার সজ্ঞানে অমর ধামে প্রস্থান করলেন। শোকবিধুরা সন্ধ্যা শেষ মুহূর্ত্ত অবধি পিতার সেবাশুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করেছিল। মৃত্যুর পূর্বে প্রিয় ছাত্র অমিয়কুমারের হাতে তিনি সন্ধ্যাকে স'পে দিলেন। অমিয়কুমার 'অর্থনীতি' শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর এম-এ মেধাবী ছাত্র ; চরিত্রের সুষমায় সকলের প্রিয়। সুহৃদকুমার তাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন ; সন্ধ্যা অমিয়কুমারের গুণমুগ্ধা।

সুহৃদকুমারের আকস্মিক মৃত্যুতে সন্ধ্যা সর্বহারা হলো—তার পিতৃকুলে কেউ ছিল না। বাল্যে মাতৃহারা হওয়ায় মাতৃকুলের কোন খবরও জানত না সে। অমিয়কুমার সংসার অনভিজ্ঞ সরল যুবক, ধনী পিতার একমাত্র পুত্র ; আলালের ঘরের দুলাল। পিতার নিকট অকপটে সন্ধ্যার বর্ত্তমান অসহায় অবস্থার বিষয় লিখে জানালো। পত্রের উত্তরে পিতা শীতল ভট্টাচার্য জমিদারী চালে যে ব্যঙ্গ উক্তি করে কড়া চিঠি লিখলেন তাতে সরলমতি অমিয়কুমার পিতার প্রতি বিরক্ত হলো ; ফলে পিতাপুত্রে মনোমালিন্য ঘটলো। তার ইন্ধন যোগালো আত্মীয় রমানাথ চৌধুরী মোক্তার। জমিদার পিতা পুত্র অমিয়কুমারকে তিরস্কারপূর্ণ ভাষায় চিঠি লিখে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে শাসালেন। অমিয়কুমারের মাথায়ও খুন চাপলো। সামান্য ব্যাপারে পিতার এই অন্যায় বিধানে মর্ম্মাহত হয়ে অমিয়কুমার পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করলো। অমিয়কুমারের জননী হরসুন্দরী স্বামীর কার্য্যে প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্বামীর রূঢ় ব্যবহার ও অগ্নিমূর্তি দেখে অন্তরে তীব্র আঘাত পেয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন।

কয়েকদিন পরে মায়ের নামে অমিয়কুমারের এক পত্র এল। পত্রে লেখা ছিল :

মা, বাবার নির্মম পত্র আমাকে রীতিমত আঘাত দিয়েছে। আমি সন্ধ্যাকে বিবাহ করলুম। তোমাদের সম্পত্তি আমি চাই না। আমি যুদ্ধে চল্লুম, হয়তো আর ফিরবো না। আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ করো।

—হতভাগ্য অমু।

পুত্রের পত্র পাঠ করে শীতল ভটচার্য বজ্রাহতের ন্যায় বসে পড়লেন ; স্ত্রী হরসুন্দরী মূর্চ্ছিতা হ'লেন।

অমিয়কুমার সন্ধ্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলো। সন্ধ্যা শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী যুবতী ; অমিয়কুমারের এই সৎসাহস ও দৃঢ়তায় মুগ্ধা হলো। সেই সময়ে পৃথিবীব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম চলছিল। অমিয়কুমার বৈমানিক-রূপে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও রয়াল এয়ার ফোর্সে চাকুরী নিয়ে যাত্রা করলো এক অজ্ঞাত স্থানে—বিদায়কালে সন্ধ্যাকে অনেক সান্ত্বনার সঙ্গে ভবিষ্যতের অনেক রঙিণ আশার বাণী শুনিয়ে দিল। সন্ধ্যা অশ্রুসিক্ত নয়নে স্বামীকে বিদায় দিল।

টালীগঞ্জে সুহৃদ গুপ্তের বাড়ীর নীচের তলায় সন্ধ্যা আশ্রয় নিয়েছে। গুপ্তমশায় তা'র স্বামীর বিশিষ্ট বন্ধু। অমিয়কুমার যাবার সময়ে বন্ধুপত্নীর হাতেই সন্ধ্যার সম্পূর্ণ ভার দিয়ে যায়। গুপ্ত-গিন্নী ছোট বোনের মত সন্ধ্যাকে ভালবাসেন ও স্নেহ করেন। সন্ধ্যা তাঁহার স্নেহ ভালবাসার পীযূষধারায় নিজের সব কিছু দুঃখ কষ্ট ভুলে আছে। অমিয়কুমার মাসে মাসে সন্ধ্যার জন্য যে টাকা পাঠান, তাতে তার অর্থের অনটন হয় না। দেখতে দেখতে আট মাস কেটে গেল।—সন্ধ্যার সমস্ত অঙ্গে মাতৃত্বের ছাপ দেখা দিয়েছে। গুপ্ত-গিন্নীর তাড়নায় সন্ধ্যা গিয়েছিল, বান্ধবী অমিয়ার কাছে প্রসূতি-হাসপাতালে আশ্রয় পেতে। অমিয়ার সুপারিশে তা'র আশ্রয় মিলে গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রসূতি-আগারে গিয়ে সন্ধ্যা এক অনিন্দ্য-কান্তি সুন্দর বলিষ্ঠ-পুত্ররত্ন প্রসব করলো।—সাতদিন তা'কে হাসপাতালে আটক থাক্‌তে হলো।—এই সাত রাত্রে সে বাংলার শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে যে বীভৎস দৃশ্য দেখলো তা'তে তার এই প্রতিষ্ঠান তথা বর্ত্তমান শিক্ষার্থী যুবকযুবতী ডাক্তার ও সেবিকাদের প্রতি ঘৃণা জন্মে গেল। গভীর রজনীতে যখন রুগ্না যুবতীগণ রোগযন্ত্রণায়

আর্তনাদ করছে, সেই সময় যুবক ডাক্তার যুবতী নার্সের সঙ্গে প্রেমালাপে তন্ময়! আরো কত কি কুৎসিৎ দৃশ্য! আর, সন্ধ্যা ভাবে এই কি আমাদের দেশের শিক্ষিত শিক্ষিতা তরুণী!—এই কি সেবা ধর্ম্ম! এর কি কোন প্রতীকার নাই?

এক বৎসর পর। নবাগত শিশু তা'র মোহন মূর্তিতে মায়ের পুঞ্জীভূত দুঃখকষ্টকে ভুলিয়ে রেখেছে। তার কচিমুখে হাসি ফুটেছে—আধ আধ বুলী শিখেছে। এই সুস্থ সবল সুন্দর শিশুকে সবাই ভালবাসে, কোলে নেয়। সন্ধ্যা তার শিশুপুত্রের মুখে স্বামীর মুখের সাদৃশ্য দেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে স্বামীর বিরহ ব্যথা ভুলে যায়। অমিয়কুমার পুত্রের জন্ম সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হয়ে চিঠি লিখেছে—পুত্রের ফটো পাঠাতে লিখেছে; শিশুপুত্রের নাম সে-ই দিয়েছে "নরেন্দ্রকুমার"। পুত্র প্রসবের পর হ'তে সন্ধ্যার শরীর ভাল যাচ্ছে না। তার সুন্দর কমনীয় মুখমণ্ডলে কে যেন এক পোচ কালী লেপে দিয়েছে। ডাক্তার দেখান হলো—তিনি পরামর্শ দিলেন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কয়েক মাসের জন্য নব প্রসূতিকে পাঠাতে—আর যদি সম্ভব হয় সন্ধ্যার স্বামীকে একবার আসতে লিখতে। গুপ্ত মহাশয় শঙ্কিত হলেন; অমিয়কুমারকে পত্রে সব কথা লিখে একবার ছুটি নিয়ে আসতে লিখলেন। তারপর দুই মাস কেটে গেল অমিয়কুমারের কোন পত্র বা মণিঅর্ডার না পেয়ে সন্ধ্যার রুগ্না পাণ্ডুর মুখ আরো মলিন ও চিন্তাকুল হলো। গুপ্তমশায়ের সদা প্রফুল্ল মুখও মলিন হ'লো। তিনি অমিয়কুমারের উপরওয়ালার নিকট একখানি দরখাস্ত সন্ধ্যার নাম দিয়ে লিখলেন—প্রায় ৩ সপ্তাহ পরে একসঙ্গে তিনমাসের খরচ এল, কিন্তু তা'তে অমিয়কুমারের কোন খবর মিলিল না। গুপ্তমশায় অগত্যা মন্দের ভাল মনে করে সন্ধ্যাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাবার মন করলেন। পুরীর এক আশ্রমে তাঁর একটী বন্ধু ছিলেন; গুপ্ত মশায়ের অনুরোধে তিনিই সন্ধ্যার জন্য উপযুক্ত স্থানসংগ্রহ ও তাঁর দেখাশুনার ভার নিতে প্রতিশ্রুত হ'লেন—গুপ্তমশায়ের মলিনমুখে হাসির রেখা ফুটল। বৈশাখের এক শুভদিনে সন্ধ্যার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুপ্তমশাই তাঁর পুত্র শ্যামলকে দিয়ে সন্ধ্যাকে পুরীতে পাঠালেন—সঙ্গে বিশ্বাসী ঝি সৌদামিনী গেল।

পুরীতে স্বর্গদ্বারে সমুদ্রের তটে একখানি দোতলা ঘরে সন্ধ্যার বাসস্থান ঠিক করা হয়েছিল। বিশাল সমুদ্রের নীলজলরাশি ও পর্ব্বত প্রমাণ অবিশ্রান্ত ঊর্মিমালা দেখে সন্ধ্যা মুগ্ধা হলো—সমুদ্রের শীকরসংপৃক্ত শীতল বাতাস তার মন-প্রাণ পুলকিত করলো—হৃদয়ের সব ক্ষত যেন কার কোমল স্পর্শে শীতল হলো। সায়াহ্নে জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়ে আরতির মঙ্গল শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে তার হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হ'লো; সন্ধ্যা যুক্ত করে মঙ্গলময়ের চরণে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করলো।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। সন্ধ্যা হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেল। তবে মাঝে মাঝে তার মানসিক অশান্তি হয়—কিন্তু মন্দির ও সমুদ্রের তীর তা'র সেই অশান্তি দূর করে। সমুদ্রের হাওয়ার সঙ্গে তার উদাস মন উড়ে যায় কোন অজানা দেশে—তার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হ'য়ে যায় উড়ো জাহাজের নির্ঘর শব্দে; মনে করে এই জাহাজে হয়তো আছে তা'র হৃদয় দেবতা! অমনি মনের কোণে খচ করে ওঠে তার লুকানো ব্যথা! কত মাস পায়নি তার স্বামীর এক ছত্র হাতের লেখা। একদিন সন্ধ্যা সমুদ্রতীর থেকে ফিরে বাড়ী ঢুকতে দেখলো পাশের বাড়ীতে হৈ চৈ, পড়েছে; কত মাল পত্র গাড়ী থেকে নামছে। সর্ব্বশেষে নামানো হোল একটী রুগ্না বর্ষীয়সী নারীকে 'ষ্ট্রেচারে' করে।

পরদিন দুপুর বেলা সন্ধ্যার খোকাবাবু এক কাণ্ড করে বসলো। মা ও সৌদামিনী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই সুযোগে খোকাবাবু আপন মনে ঘরের মধ্যে খেলা করতে করতে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাশের বাড়ীর নবাগত বড়লোক ভাড়াটে ঘরের তক্তপোষের উপর শুয়ে আরাম করছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি সন্ধ্যার শিশুপুত্রের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি তড়িৎপৃষ্ঠের ন্যায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন—অপলক দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে তাকিয়ে রইলেন, পরে আপন মনে বললেন, "কি অদ্ভুত সাদৃশ্য!—ঠিক যেন আমাদের সেই বালক অমু। ওগো, ছুটে এসো, তোমার ছোট্ট অমু এসেছে?"—ভাবের আতিশয্যে বৃদ্ধের মুখ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে এলো। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যে রুগ্না শয্যাশায়িনী তা ভুলে গিয়েছিলেন! সে ভাব কেটে গেলে তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে জানালার পাশে দাঁড়ালেন—দুই হাত বাড়িয়ে সাশ্রুনয়নে কোমল কণ্ঠে ডাকলেন, "এসো"—খোকা তার নরম হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে আধ আধ কণ্ঠে উত্তর দিল, "দা-দু!" শিশুর এই সম্বোধন বৃদ্ধের হৃদয়ে নবীন ভাবের সৃষ্টি করল—তাঁর দুই নয়নে অশ্রুবারি ছুটল।—দুই হাতে চোখের জল মুছে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলেন খোকা জানালা থেকে নেমে গেছে। বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে পড়লেন; বহুদিনের হারানো স্মৃতি তাঁর মনপ্রাণ বিচলিত করে তুললো। কানের কাছে কে যেন তখনো সুধাবর্ষণ করছিলো "দাদু!"

বৃদ্ধ শীতল ভট্টাচার্য স্ত্রী হরসুন্দরীর নিকট পাশের বাড়ীর খোকার কথা সবিস্তারে বললেন। হরসুন্দরী শুনে অশ্রুজলে বিছানা সিক্ত করলেন; শিশুর ন্যায় বায়না ধরলেন, বললেন, "ওগো, একটি বারের জন্য সেই খোকামণিকে দেখাও আমায়।" কর্তার হুকুমে বৃদ্ধা ঝি মুক্তার মা পাশের বাড়ীতে সন্ধ্যার কাছে গিয়ে হাজির হ'লো। জমিদারের বাড়ীর ঝি সাজিয়ে গুজিয়ে অনেক রকম ভনিতা করে সন্ধ্যাকে জানিয়ে দিলো তার বাবু মস্তবড় জমিদার—কত লোক লস্কর দাস দাসী ধন দৌলত তার বাবুর, জমিদার গিন্নী শয্যাশায়িনী, ব্যারাম পীড়া তেমনি কিছু নয়, একমাত্র ছেলে রাগ করে লড়াইয়ে গেছে সেই মনোকষ্টে বিছানা নিয়েছেন। আহার নিদ্রা নেই। বড়লোকের খেয়াল বায়না ধরেছে সন্ধ্যার ছেলেটাকে একবার কোলে নিয়ে আদর করবে, তাই হয়ত, ছেলেকে একটা সোনাদানা খয়রাৎ করবে। সন্ধ্যা মুক্তার মায়ের কথায় ও হাবভাবে মোটেই সন্তুষ্ট হ'লো না, সে তার ছেলেকে বড়লোকের বাড়ীতে পাঠাতে অস্বীকৃত হ'লো। মুক্তার মা বিফলমনোরথ হ'য়ে গিন্নীর কাছে সন্ধ্যার নামে অনেক কথা লাগিয়ে শেষে বললে "ছুঁড়ীর বড় দেমাক, মাগো।" গিন্নী হরসুন্দরীর পুঞ্জীভূত শোকভার উথলে উঠলো, তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে প্রবল বেগে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হয়ে উপাধান সিক্ত হ'ল। বৃদ্ধা ঝি সৌদামিনী খোকাকে নিয়ে

সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসত। তার অনতিদূরে শীতলবাবুও গিয়ে বসে থাকতেন—একদৃষ্টে খোকার পানে তাকিয়ে এমনি করে বৃদ্ধ শীতল ভট্টাচার্য তাঁর বুভুক্ষু হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাতেন; যেদিন খোকাকে না দেখতে পেতেন তাঁর মন প্রাণ শোকাচ্ছন্ন হ'তো। একদিন সৌদামিনী ঝিকে শীতলবাবু অনেক মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করে খোকাকে হরসুন্দরীর নিকট নিয়ে গেল; হরসুন্দরী অবাক হ'য়ে খোকাকে দেখলেন, আদর করে চুমো খেলেন। স্বামীকে বললেন, এ যেন আমার অমুর নব-কলেবর! হরসুন্দরীর রোগে পাণ্ডুর মলিন মুখে সেদিন হাসির রেখা দেখে শীতলবাবুর হৃদয় শীতল হল। হরসুন্দরী ঝি সৌদামিনীর হাতে পাঁচটি টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন "তুমি মা, আমাকে একটিবার খোকামণিকে রোজ দেখাবে—আমি তোমায় খুসী করব।" সৌদামিনী এদের ব্যবহারে ও হাব ভাবে অবাক হল—সে সন্ধ্যাকে কিছু জানালো না, পাছে তার আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। নিত্য খোকার সন্দর্শনে ও সাহচর্যে হরসুন্দরীর জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল। চিকিৎসক এই আকস্মিক রোগমুক্তির কারণ খুঁজে পেলেন না, কিন্তু মুখে তাঁর চিকিৎসার প্রশস্তি করতে ভুললেন না।

সেদিন সন্ধ্যা স্বামীর চিঠি পেল—অমিয়কুমার বৈকালের গাড়ীতে পুরী পৌঁছিবেন। তা'র সমস্ত হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় পুলকের সঞ্চার হ'লো, মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো—খোকার কোমল গালে অসংখ্য স্নেহচুম্বন দিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তুললো। ঝি সৌদামিনী সন্ধ্যার আনন্দাতিশয্য দেখে বললে, "মায়ের মুখে যে আজ হাসি ধরে না—কি সুসংবাদ মা?" সন্ধ্যা লজ্জিতভাবে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকে অমিয়কুমারের আগমন বার্তা জানালো—সৌদামিনী হৃষ্টমনে প্রস্থান করলো। বৈকালে জমিদার-গিন্নী সশরীরে সন্ধ্যার ঘরে এসে উপস্থিত হ'লেন। সন্ধ্যা সসম্ভ্রমে তাঁ'কে অভ্যর্থনা করে বসালেন। গিন্নি স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে বললেন "মা, তোমাকে দেখে অবধি মনে কেমন একটা মায়া জন্মেছে, মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার অতি আপনার জন। আমি তোমার নিকট থেকে একটী প্রশ্নের জবাবের জন্ম ছটফট্ করছি।" বলেই তিনি সাশ্রুনয়নে সন্ধ্যার মুখের পানে তাকালেন। সন্ধ্যার সুন্দর মুখখানি অশ্রু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো; জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অভ্যাগতা মহিলাটিকে সে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো এমনি মুহূর্তে ঝি সৌদামিনী খবর দিলে, বাবু এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অমিয়কুমার সহাস্যমুখে ঘরের দরজায় উপস্থিত হলো। হরসুন্দরী মাথার কাপড় টেনে দরজার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে দেখলেন—সম্মুখে তাঁরই হারানো নিধি স্নেহের পুত্তলী! দুই নয়নে অশ্রুর প্লাবন নিয়ে ছুটে গিয়ে বুকে ধরলেন তিনি অমিয়কে—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলেন, "বাবা অমু, এমনি করেই কি বুড়ো মা'কে কষ্ট দিতে হয়।"—অমিয়কুমার দুই চোখে বাষ্প ধারা নিয়ে মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়ে বললো মা, তুমি এখানে! সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে হরসুন্দরীর পদতলে বসলো। গাড়ী থেকে নামবার সময় শীতলবাবু পুত্রকে চিনেছিলেন, তিনি রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছিলেন এ বাড়ীতে—আনন্দের আতিশয্যে রণুকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আমি যে ঠিক ধরেছিলুম দাদুমণি, আমার অনুমান মিথ্যা নয়?" স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে হরসুন্দরী বস্ত্রাদি সামলে নিলেন। অমিয় ও সন্ধ্যা ধীর মন্থর গতিতে শীতল ভট্টাচার্যের পদতলে নতজানু হলো; শীতল সস্নেহে দু'জনকে তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন, "এবার আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চল মা, আর ত তফাতে থাকা চলবে না, আমার দাদুমণি যে আগেই বেঁধেছে মিলনের সেতু।"

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

তৃতীয় প্রকরণ—ইন্দ্রিয়জয়

ষষ্ঠ অধ্যায়—অরিষড়্‌বর্গত্যাগ

মূল :—বিদ্যা-বিনয় হেতু ইন্দ্রিয়জয়—কাম ক্রোধ-লোভ-মদ হর্ষ-ত্যাগ-দ্বারা কর্ত্তব্য। কর্ণ ত্বক্ অক্ষি জিহ্বা ঘ্রাণ—(এই) ইন্দ্রিয়গুলির (যথাক্রমে) শব্দ স্পর্শ-রূপ রস গন্ধ—(এই বিষয়সমূহে) অবিপ্রতিপত্তি, অথবা শাস্ত্রার্থের অনুষ্ঠান(ই) ইন্দ্রিয়জয়। যেহেতু এই কৃৎস্ন শাস্ত্র(ই) ইন্দ্রিয়জয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়ের হেতু)।

সঙ্কেত :—ইন্দ্রিয়জয়—ইন্দ্রিয়—মূলতঃ দ্বিবিধ—(১) অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ ও (২) বহিরিন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ। বহিরিন্দ্রিয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১)জ্ঞানেন্দ্রিয়—সংখ্যায় পাঁচটি—কর্ণ-ত্বক্-চক্ষুঃ-জিহ্বা-নাসা, (২) কর্ম্মেন্দ্রিয়—সংখ্যায় পাঁচটি—বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি (কর্ণ-ত্বক্-চক্ষুঃ-জিহ্বা-নাসিকা) যথাক্রমে পঞ্চ বিষয় (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ) গ্রহণের দ্বারভূত। আর পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্-পাণি-পাদ পায়ু-উপস্থ) যথাক্রমে পঞ্চবিধ কর্ম্ম (শব্দোচ্চারণ-গ্রহণ-গমন-বিসর্জ্জন-আনন্দভোগ) করণের দ্বার। অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ (মন) একাই এই দশটি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক—একাই এই দশ বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে সমর্থ। ইহা ব্যতীত ইহার নিজ কর্ম্মও আছে উহা চতুর্ব্বিধ—(১)

সংশয়, (২) নিশ্চয়, (৩) স্মরণ ও (৪) অহঙ্ভাব বা গর্ব্ব অনুভব।* যখন ইহা সংশয়যুক্ত (সঙ্কল্প-বিকল্পে দোলায়মান) হয়, তখন ইহার নাম—'মন'। যখন ইহা নিশ্চয় করে, তখন ইহাকে বলা হয়—'বুদ্ধি'। যখন ইহা স্মরণ করে, তখন ইহার নাম দেওয়া হয়—'চিত্ত'। আর যেরূপে ইহা গর্ব্বানুভব বা অহম্ভাবানুভব করে,ইহার সেই রূপের নাম—'অহঙ্কার'। বহিরিন্দ্রিয়-জয় করিবার নিমিত্ত যে সাধনা অবলম্বনীয়, তাহার নাম—'দম' সাধন। অন্তরিন্দ্রিয়-জয় সাধনার নাম—'শম'-সাধন। বিদ্যাবৃদ্ধগণের সহিত সংযোগ ইন্দ্রিয়জয়ের হেতু—এই কারণে 'বৃদ্ধসংযোগ' প্রকরণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রকরণে ইন্দ্রিয়জয়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

অরিষড়্বর্গ—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য—এই ছয়টির নাম ষড়্রিপু বা অরিষড়্বর্গ। কিন্তু এস্থলে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই যে সাধারণতঃ প্রচলিত দুই রিপুর (মোহ ও মাৎসর্য্য) পরিবর্ত্তে কৌটিল্য দুইটি নূতন রিপুর নাম দিয়াছেন—'মান' ও 'হর্ষ'।

বিদ্যা-বিনয়-হেতু—শ্যাম শাস্ত্রীর অভিপ্রায় বিদ্যা ও বিনয়ের হেতু—'on which success in study and discipline depends'; কিন্তু গণপতি শাস্ত্রী অর্থ করিয়াছেন—বিদ্যাসংস্কার-কারণ ; বিদ্যা-জনিত বিনয় (অর্থাৎ সংস্কার)—তাহার হেতু—cause of culture (discipline) arising out of education বলা চলে ; অথবা cause of education and culture (discipline)। কাম—পরস্ত্রী-বিষয়ক অভিলাষ (গঃ শাঃ) ; lust (SH) ; কিন্তু 'কাম' বলিলে কেবল 'কামনা' (desire)—এরূপ অর্থও বুঝাইতে পারে। ক্রোধ—হিংসা-প্রবর্ত্তক চিত্তবিকার (গঃ শাঃ) ; anger (SH) ; কাম পূর্ণ না হইলে—কামনা বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধের উদ্রেক হয়। লোভ—পরদ্রব্য গ্রহণে ইচ্ছা (গঃ শাঃ) ; greed (SH) ; মান—মূর্খতাবশতঃ নিজের উপর অনুপমত্ব-বুদ্ধির আরোপ (গঃ শাঃ) ; অহম্ভাব ; vanity (SH) ; self-conceit। মদ—ধন-বিদ্যাদি-জনিত গর্ব্ব (গঃ শাঃ) ; haughtiness (SH) ; pride. হর্ষ—অভিলষিত বিষয়ের উপভোগ-জনিত প্রীতি (গঃ শাঃ) ; overjoy (SH)। এই ষড়্রিপু বর্জ্জন করিলে তবেই ইন্দ্রিয়-জয় সম্ভব। অবিপ্রতিপত্তি—স্বতঃ অবিরুদ্ধা প্রবৃত্তি (গঃ শাঃ) ; absence of discrepancy in the perception of (SH) ; proper or legitimate application in the (perception of)—বলাই সঙ্গত। তাৎপর্য্য—শব্দাদি বিষয়ে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের অবিরুদ্ধভাবে প্রবৃত্তির নামই—ইন্দ্রিয়-জয়, অর্থাৎ—শোত্রাদি ইন্দ্রিয় যদি অবিরুদ্ধ শব্দাদি বিষয় ভোগ করে—তাহারই নাম ইন্দ্রিয়-জয় ; আর বিরুদ্ধ বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে বলা চলে ইন্দ্রিয়লৌল্য। বিষয়ের বৈধ ভোগ ইন্দ্রিয়-জয় ; অবৈধ ভোগ—ইন্দ্রিয়-চাপল্য। শাস্ত্রার্থের অনুষ্ঠানই ইন্দ্রিয়-জয়—ইহার তাৎপর্য্য এই যে—এই সকল শব্দাদি বিষয় সেব্য—এইরূপ জ্ঞান শাস্ত্র হইতে অবগত হইলে তত্তৎ বিষয়ে প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়-জয় নামে খ্যাত হইয়া থাকে। শাস্ত্র-বিহিত বিষয়-সেবার নাম বৈধ-বিষয়-সেবা—উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিহিত বিষয়-সেবায় ইন্দ্রিয়-জয়ের পরিচয় পাওয়া যায়—ইহাতে বিষয়-চাপল্যের লেশমাত্রও থাকে না। কৃৎস্ন শাস্ত্রই ইন্দ্রিয়-জয়—শাস্ত্র যে সকল বিষয় অনুষ্ঠেয় বলিয়া প্রতিপাদন করেন, সেই সকল বিষয়ই ইন্দ্রিয়-জয়ের হেতু। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-জয়ের হেতুকেই ইন্দ্রিয়-জয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণে কার্য্যোপচার (গঃ শাঃ) ; the sole aim of all sciences is nothing but restraint of the organs of sense (SH) ; শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-জয়—একথা বলা অনুচিত। তবে শাস্ত্র ইন্দ্রিয়-জয়ের হেতু—একথা বলা সঙ্গত।

মূল :—তদ্বিরুদ্ধবৃত্তি অবশীকৃতেন্দ্রিয় রাজা চতুঃসমুদ্রব্যাপিনী পৃথ্বীর অধীশ্বর হইলেও সদ্যঃ বিনষ্ট হইয়া থাকেন।

সঙ্কেত :—তদ্বিরুদ্ধবৃত্তি—শাস্ত্র-বিরুদ্ধানুষ্ঠানকারী (গঃ শাঃ) ; whosoever is of a reverse character (SH) ; ; 'তৎ' বলিতে শাস্ত্রকেই বুঝাইতেছে। অবশ্যেন্দ্রিয় (মূল)—অবশ্য ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার এমন রাজা। চাতুরন্তঃ—চতুঃসমুদ্রা পৃথ্বীর অধীশ্বর রাজা—সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ; possessed of the whole earth bounded by four quarters (SH) ; lord of the land bounded by the four oceans—বলাই সঙ্গত। চতুরন্ত—চতুর্দিগন্ত—এরূপ অর্থ হয় না চতুঃসমুদ্রান্ত—এইরূপ অর্থই সঙ্গত ও সাধারণতঃ চতুঃসমুদ্রা ধরণীর অধীশ্বর—এইরূপ প্রয়োগই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

মূল :—যথা—দাণ্ডক্য-নামক ভোজবংশীয় রাজা ব্রাহ্মণ কন্যার উপর অভিমান করায় বন্ধু ও রাষ্ট্রসহ বিনষ্ট হইয়াছিলেন—আর বিদেহাধিপতি করালও ঐরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সঙ্কেত :—ভোজবংশীয় রাজা দাণ্ডক্য কামবশতঃ ব্রাহ্মণ-কন্যা অপহরণ করায় তৎপিতৃ-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার বন্ধু (অর্থাৎ আত্মীয়বর্গ) বিনষ্ট ও রাজ্য মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়াছিল। আর বিদেহাধিপ করাল ব্রাহ্মণীর প্রতি লোলুপ হওয়ায় ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন (গঃ শাঃ)' "No Purana mentions the particular historical incident in connection with some of the kings" (SH) ; "The majority of the twelve legends...two for each of the six destructive passions of a king may be found with some variations no doubt, in the great epics. Several of them may be traced in Buddhist works. Thus Karala and Dandakya recur in the Buddhacharita XI. 31 as Maithila and Dandaka, and the former as Karalajanaka as well (IV. 80). As for Dandakya, see also Kama-sutra, p. 24, l. 5"—Jolly. রামায়ণে (উত্তরকাণ্ড ৭৯-৮১ অঃ) দৃষ্ট হয়—ইক্ষ্বাকুর কনিষ্ঠ তনয় দণ্ড ভার্গবের কন্যা অজার উপর অত্যাচারে বিনষ্ট হয়।

মূল :—কোপবশতঃ জনমেজয় ব্রাহ্মণগণের উপর বিক্রম

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর তালজঙ্ঘ ভৃগুগণের উপর (অত্যাচার করিয়াছিলেন)।

সঙ্কেত :—জনমেজয়-নামক রাজা অশ্বমেধ-যাগকালে কোপবশতঃ ব্রাহ্মণগণের সহিত কলহ করিয়া তাঁহাদিগের শাপে বিনষ্ট হন। আর তালজঙ্ঘ ভৃগুবংশীয়গণের প্রতি অত্যাচারে ফলে বিনষ্ট হইয়াছিলেন (গঃ শাঃ)। "Janamejaya and Talajangha are mentioned in another poem of As'vaghosha, the Saundarananda" (VII. 39. 44)—Jolly.

মূল : লোভবশতঃ ঐল চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিকট অতিরিক্ত আহরণ করিয়া (বিনষ্ট হন), আর সৌবীর-(পতি) অজবিন্দু।

সঙ্কেত :—ঐল—ইলার পুত্র পুরূরবাঃ নামক চন্দ্রবংশীয় রাজা অত্যন্ত ধনাহরণ-দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্যের পীড়াদানে চাতুর্ব্বর্ণ্য-কোপে বিনষ্ট হন। লোভবশতঃ ঐল নিমিশারণ্যে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞশালায় প্রবেশপূর্ব্বক অপরিমিত ধনহরণে উদ্যোগী হইলে ব্রাহ্মণ-শাপে বিনষ্ট হইয়াছিলেন—এইরূপ ঐতিহ্যও কেহ কেহ বর্ণনা করেন (গঃ শাঃ)। অত্যাহারয়মাণঃ—অত্যন্ত আহরণ করিয়া ; in his attempt to make exactions (SH) ; making extortions from বলাই ভাল। চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ (মূল)—শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজি করিয়াছেন—Brahmans—ইহা অত্যন্ত শিশুসুলভ ভ্রম।

মূল :—মানবশতঃ রাবণ পরদার প্রদান না করিয়া ও দুর্য্যোধন রাজ্যের অংশ (প্রত্যর্পণ না করিয়া) (বিনষ্ট হইয়াছিলেন)।

সঙ্কেত :—পরদার—রামপত্নী সীতা। রাজ্যের অংশ—পাণ্ডবগণের ন্যায়তঃ প্রাপ্য অংশ। "These allusions sufficiently establish the historical nature of the Ramayana and of the Mahabharata" (SH)।

মূল :—মদবশে ডম্ভোদ্ভব ও হৈহয় অর্জ্জুন ভূতগণের অবমানকারী (হওয়ায়) (বিনষ্ট হইয়াছিলেন)।

সঙ্কেত :—ডম্ভোদ্ভব—মদবশে সকল প্রজার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলে নর-নারায়ণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন (গঃ শাঃ)। হৈহয়-বংশাধিপ কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন মদবশে পরশুরামের পিতা ঋষি জমদগ্নিকে অবমানিত করায় পরশুরাম-কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। (গঃ শাঃ)। ভূতাবমানী—ভূত—প্রাণী ; প্রাণিগণের অবমানকারী। মদাদ্ ভূতাবমানী—being so haughty as to despise all people (SH) ; slighter of people through pride (haughtiness) বলা উচিত। মহাভারতে 'দম্ভোদ্ভব' নাম দৃষ্ট হয়—নরনারায়ণের সহিত যুদ্ধে তিনি বিগতদর্প হন,—নিহত হন নাই (উদ্যোগপর্ব্ব ৯৬ অধ্যায়)।

মূল :—হর্ষবশতঃ বাতাপি অগস্ত্যকে বঞ্চনা করিয়া ও বৃষ্ণিসঙ্ঘ দ্বৈপায়নকে (বঞ্চনা করিতে যাইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল)।

সঙ্কেত :—বাতাপি—ইল্বল ও বাতাপি দুই অসুরভ্রাতা। বাতাপি মেষরূপ ধারণ করিত ও ইল্বল সেই মেষ-মাংস পাক করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইত। ভোজনের পর ইল্বল বাতাপির নাম ধরিয়া ডাকিলে বাতাপি ব্রাহ্মণের উদরভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিত ও ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হইতেন। একবার মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত এইরূপ চালাকি খেলিতে যাইলে অগস্ত্য মেষরূপী বাতাপির মাংস ভোজন-পূর্ব্বক জীর্ণ করিয়া ফেলেন (বনপর্ব্ব, ৯৯ অধ্যায়)। অত্যাসাদয়ন্—বঞ্চনা করিয়া (গঃ শাঃ); in his attempt to attack (SH)। বৃষ্ণিসঙ্ঘ—বৃষ্ণিবংশীয় বালকগণ কৃষ্ণ-জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে স্ত্রীরূপে সজ্জিত করিয়া পরিহাসচ্ছলে মুনিগণের নিকট প্রশ্ন করেন—'এই মেয়েটির কি সন্তান হইবে?' তাহাতে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন—'এ কুলনাশন মুষল প্রসব করিবে'। দ্বৈপায়ন—ব্যাসকে প্রবঞ্চিত করার কথা অর্থশাস্ত্রেই নূতন বলা হইয়াছে। মহাভারতে (মৌষলপর্ব্বে) প্রবঞ্চিত মুনিগণের নাম—বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ। শ্রীমদ্ভাগবতে নাম—বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসাঃ, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বসিষ্ঠ, নারদ ইত্যাদি। ব্যাসদেবের নাম কোথাও নাই।

মূল :—ইঁহারা ও অন্য বহু অজিতেন্দ্রিয় রাজা—শত্রু ষড়্‌বর্গাশ্রয়-পূর্ব্বক বন্ধু-রাষ্ট্রসহ বিনষ্ট হইয়াছিল।

সঙ্কেত :—শত্রুষড়্‌বর্গমাশ্রিতাঃ (মূল)—falling a prey to the aggregate of the six enemies (SH)। অন্য—বেন প্রভৃতি।

মূল :—শত্রু ষড়্‌বর্গ বিসর্জ্জন দিয়া জিতেন্দ্রিয় জামদগ্ন্যও নাভাগ অম্বরীষ চিরকাল মহী ভোগ করিয়াছিলেন।

সঙ্কেত :—জামদগ্ন্য—জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। তিনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করিয়া কার্ত্তবীর্য্যকৃত পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন। পরে একবিংশতিবার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া নির্জ্জিতা মহী কশ্যপকে দান করেন (মঃ ভাঃ, বনপর্ব্ব, ১১৬-১১৭ অধ্যায়)। নাভাগ অম্বরীষ—নভাগের পুত্র অম্বরীষ নামক রাজা। ইনি অতি সাধুপ্রকৃতি, ভক্ত, প্রজারঞ্জক ছিলেন। ইঁহার উপাখ্যানের সংখ্যা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষতঃ মহাভারতে ইঁহার সম্বন্ধে একাধিক আখ্যান আছে। মহাভারতে প্রসিদ্ধ ষোড়শ-রাজকীয় মধ্যে নাভাগ অম্বরীষ অন্যতম (দ্রোণপর্ব্ব, ৬২ অধ্যায় ; শান্তিপর্ব্ব, ২৯ অধ্যায় ও ৯৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

এই শ্লোকে জামদগ্ন্যকে জিতেন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আলোচনায় পাওয়া যায়—তিনি অত্যধিক ক্রোধী ছিলেন।

ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে ইন্দ্রিয়জয়-নামক তৃতীয় প্রকরণে অরিষড়্‌বর্গত্যাগ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥

হাই হিল্

শিশির সেন

তিন ইঞ্চি উঁচু হিলের জুতো পরতো অমলা।

ঠকাঠক ঠক্ আওয়াজ হতো মেজেতে, রাস্তায়, মাটিতে।

কলেজের ছেলেরা আদর করে কোড্ নাম দিয়েছিল 'হাই হিল্'।

কথাটা অমলা নিজে জানতো। জানতো আশেপাশের আরও মেয়েরা।

নোতুন নামকরণে অমলা নিজেকে অনেকটা গর্বিতই অনুভব করত। সমালোচনার পাত্রী হওয়া ত আর সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। সাধারণের থেকে একটু কিছু পার্থক্য না থাকলে আর কি করেই বা ঘটবে।

অমলা আধুনিকা। মন-মেজাজও সেই ধাচে গড়া। অনাগত যুগে কলেজী পাঠ সাঙ্গ হলে যে সংসার নীড় গড়ে উঠবে তার একটা মনগড়া ছবি সে যে না এঁকেছে, তা নয়। যেমন : তার স্বামীটি কি রকম হবে? রূপে রাজপুত্র, বিদ্যায় সরস্বতী, পদমর্যাদায় প্রবল প্রতাপান্বিত, গুণে যশস্বী ও কৃতী। কিন্তু কোন আধুনিকার স্বামী যদি সংস্কৃতসাহিত্যের আলংকারিক বিশেষণ নিয়ে ধরা দেন, তা হলে কি তাদের মন ওঠে! তারা চান দাস্যবৃত্তিতে সিঁড়ির কে কত উঁচু ধাপে উঠতে পেরেছেন। কারণ মানদণ্ডের যন্ত্রত আজ দাস্যবৃত্তিতে। সুতরাং বিজয়ের বরমাল্য যে তাঁদেরই একচেটে হবে, তা'তে আর আশ্চর্য কি আছে।

দেখতে দেখতে কলেজ জীবন একসময় পেরিয়ে গেল।

বাইরে থেকে দেখে ওর বুড়িয়ে যাওয়া যৌবনের প্রান্তসীমা যুবকের হৃদয়ে তুফান তুলতে পারে বলে আর মনেই হয় না। এতটা অধিক বয়স পর্যন্ত বিয়ে হলো না—কাজেই চারিত্রিক জনশ্রুতিও কিছু কিছু শোনা যায়। বিয়ের মন্ত্রে যা' হতে পারত মাধুর্যমণ্ডিত, আইবুড়ো হবার অভিশাপে ক্ষণিক চিত্ত-চাঞ্চল্যের ছিটে ফোঁটায়—রসিক নাগর তাতেই দেয় অফুরন্ত রসের যোগান।

এই ভ সংসার! কাকেই বা আর কি বলা যায়!

একবার নাকি এক মন্ত্রদেশীয় সিভিলিয়ান এস্-ডি-ও অমলার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন। এশিয়ার পোয়েট্ লরিয়েটের দেশের কালচার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঈর্ষা-মিশ্রিত গর্বের বস্তু। বাঙালী মেয়ের কোমল হিয়া—চিত্ত শতদল দেয় ভরিয়া—

তবে এটা শোনা কথা—শোনা কথার ভিত্তিই বা কতটুকু!

অমলার বাপ-মা কোনদিন ওর বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন কিনা, তা' আমাদের জানা নেই। যদি বলি কুমারী জীবনের জন্য অমলা পিতা-মাতাকে দায়ী করে, তা' হলেও হয়ত ঠিক বলা হবে না—কারণ ইদানীং পাড়ার বিশ বখাটে ছোকরা করালীকান্তের উপর অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব দেখাতে সুরু করেছে।

করালীকান্তের বিদ্যে হাই-স্কুলের ফোর্থ ক্লাশ পর্যন্ত। পিতৃমাতৃহীন করালী মাতুল কর্তৃক বহুবার গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। আবার একদিন স্নেহ-প্রবণতার আতিশয্য হেতু নিজে নিজেই গৃহে ফিরেও এসেছে।

করালীর বয়সমাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর। পুরুষ মানুষের তুলনায় কিছুই নয়।

বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। অকেজো করালী হলো কাজের মানুষ। মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। আমেরিকান লেপ্টেনাণ্ট সাহেব ডভিন্ জিপস্-এ করে ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায় দূরের উড়ো জাহাজ ঘাঁটি থেকে।

এত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পাড়ার বর্ষীয়ান পুরুষরা এ ধরণের অকস্মাৎ ভাগ্যবিবর্তনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখে। সান্ধ্য আলোচনায় মন্তব্য পাশ করে : করালী সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা চালায় কি করে?

তারপর বিস্ময় চরমে এসে পৌঁছাল, যখন করালী বিরাট ঝকঝকে প্লি-মাউথ্ গাড়ী ড্রাইভ করে বাড়ী ফিরলে একদিন।

মিলিটারী কনট্রাক্টার। হবেই ত হবেই। ভূতে কেন গুণের টাকা জোগান। আমরা শালারা না খেয়ে মরলুম। কবে যে পোড়ার যুদ্ধ থামবে, কে জানে!

যুদ্ধ আমাদের গুণের বৈষম্য দূর করে দিলে। মুড়ি মিছরীর সমান দর। যুদ্ধ না থামলে করালীর মার্কেট ভ্যালু জিরো মাইনাস্ সাম্থিং।

করালীর ভক্তসংখ্যা নিতান্ত সামান্য নয়। ভক্তের দলই প্রধানতঃ তাঁর কর্ম সহচর। ফেউয়ের মত সর্বদা তারা তাঁর পিছনে লেগেই আছে।

সন্ধ্যে ছ'টার পর করালীকে আর সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না। এ সময়টা আমরা তাঁকে দেখতে পাই অমলার দপ্তরখানায়, নতুবা ড্রাইভিং-এ উঁচু নীচু পিচ্ বাঁধানো ধূ ধূ করা গ্রাণ্ডট্রাংক রোডের সীমাহীন থম্‌থমে নির্জনতায়।

গাড়ীতে বসে অমলা গলাটা একটু কেসে করালীকান্তের সান্নিধ্যে নিবিড় হয়ে বললে : য়ুনিভার্সিটি ছাড়বার পর পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেছে। দিনগুলি কেটেছে আমার রিক্ততার হাহাকারে। ভবিষ্যতের যে ঔজ্জ্বল্য আমার দাম্ভিকতার মূলধন ছিল, তাই যেন কলেজ ছাড়বার পর নামপরিচয়হীন, অখ্যাত জনসমাজে তলিয়ে গেল। কোথায় আমি? কে আমি? কলেজে যোগাতুম চকমকানি বিদ্যুৎবহ্নি। হারিয়ে গেল আমার সে-শক্তি, সে-রূপশিখা, আঘাত হানবার সেই উন্মত্ত উল্লাস।

করালী সরল রেখার মত একটু নিরলম্ব জবাব দিলঃ তুমিই ত আমায় মানুষ করলে...

অমলা ওই ছোট্ট কথাটাকে ফেনিয়ে গুণ-গুণিয়ে এমনি একটা রূপ

দিলে : আমার সোনার কাঠির পরশ তোমায় সোনা করলে…বল, বল আরও একটু কবিত্ব করে বল—আমার শুনতে বেশ ভাল লাগবে—

করালী বললে : জান ত আমার ভাষা নেই…

অমলা হঠাৎ দীপ্ত কণ্ঠে বললে : একটু উচ্ছৃঙ্খল হতে পার করালী—একটু উচ্ছৃঙ্খল…

করালী বিস্ময়ের একটা আলগা গাম্ভীর্য চোখেমুখে টেনে বললে : নৈতিক স্খলনকে আমি বড্ড ভয় পাই, মালা।—সেখানে আমি ভীরু, কাপুরুষ…

অমলা বললে : এ-ধারে যে নানান্ লোকে নানান্ কথা বলছে, তুমি তাদের মুখ চাপা দেবে কি করে ?

ভয় আমি কাকেও করি না। বাংলা দেশে ভয় ত শুধু রজনীদাকে…তা' টাকা আছে আমার…টাকা যেমন নিতে জানি, দিতেও জানি…সব ঠিক হয়ে যাবে, কিচ্ছু ভয় পেয়ো না তুমি…

তোমার ওই এক গোঁ—টাকা দিয়ে কি সব পাওয়া যায় ?

সব পাওয়া যায়…

না, না—ঠিক হলো না—বিদ্যে, কালচার এগুলো ত পাওয়া যায় না।—তুমি কিন্তু একটু ভুল করলে…

ভুল আমি করিনি…টাকা না হলে তোমার বিদ্যে আর কালচার কিনবার কথা কি স্বপ্নেও কখন ভাবতে পারতুম…

এভাবে attack করলে আমাকে শেষকালে…

বিশ্বাস করো তোমাকে আঘাত দেবার জন্য করিনি…

তবে কিসের জন্য করলে ?

শুধু সত্যটুকু বললুম। টাকা হবার আগে পেটে বোমা মারলেও আমার মুখ থেকে 'ক' অক্ষর গো-মাংস বেরুত না…আর আমার কথা কে-ই বা শুনতে চাইতো…এখন যা' বলি তাই হয় বাণী…আমার কথা শুনবার জন্য কত লোকের কত আকুল আগ্রহ, ব্যাকুল প্রতীক্ষা…অবশ্য কথা বলবার শিক্ষা তুমিই আমাকে দিয়েছ…

তা'হলে একথাটা স্বীকার করো…

করি বলেই ত বললুম। সবই ত হলো, কিন্তু বড্ড একা একা লাগে। আমার যেন কেউ নেই। আমি বড় একা…আপনার জন বলতে কেউ নেই…

পুরুষ মানুষ বড় হলে বৌ ছাড়া আর কে-ই বা আপনার জন থাকে…

সত্যি সত্যি প্রাণের কথাটাই বলেছ বটে…কিন্তু সেখানেও আছে বোধহয় স্বার্থসম্বন্ধ…

রূপসীতে তৈরী হবে নোতুন বিমানঘাঁটী।

টেণ্ডারের সাড়া পাওয়া গেল দূরের দেশ-দেশান্তর থেকে। বহুলোকের ভিড়। সি-পি-ডাবলিউ-ডি'র হেড্ক্লার্ক মাণিকবাবুর স্ত্রীর অঙ্গে উঠলো নোতুন জড়োয়া গহনা। একটা হৈ হৈ ব্যাপার। শাড়ীর দোকানগুলো লজ্জায় শহর ছেড়ে পালিয়ে এসে স্থান করে নিলে মাণিকবাবুর অন্দর মহলে…

কাজ হবে আনুমানিক পাঁচ কোটি টাকার।

পিচ্ বাঁধানো রাস্তা, রাণ-ওয়ে, ছোট বড় মাঝারি বাড়ী ঘর, মাটি কাটা, লোডিং আনলোডিং—কত রকমারি কাজ তার কি কিছু ঠিক আছে। সাবসিস্টেন্স্ অফিস, রেড্ক্রস্, এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো, সার্ভিস্ ক্লাব, ম্যালেরিয়া-কণ্ট্রোল, ক্যানটিন্, বেকারি—পাশাপাশি তৈরী হবে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সংস্কৃতির এক ভারতীয় নব সংস্করণ।

করালীকান্তের দক্ষিণহস্ত ত্রিপুরাশংকর এসে খবর জানালো : উপঢৌকন পর্ব শেষ হয়েছে। রেসে জিত হয়ত আমাদেরই। তবে হেড্ক্লার্ক মাণিকবাবু টেণ্ডারের নিম্নতম হারটি কাকেও ফাঁস করেন নি এখন পর্যন্ত। সুতরাং মনিবের নিজে একবার গেলে কাজটা সম্ভবত সহজ হয়ে যাবে।

করালীকান্ত তোড় জোড় করে রওনা দিল। গায়ে একটি খদ্দরের পাঞ্জাবী——গলায় একটি চাদর—নগ্ন পদদ্বয় ও একটি লাঠি সম্বল করে।

রূপসীতে পৌঁছে করালীকান্ত কঠোর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়মকানুনগুলোর একটা জৌলুস বিজ্ঞাপন প্রচারে ব্রতী হলেন। কিন্তু কাজ আর অগ্রসর হয় না। মাণিকবাবুর কঠিন বিজাতীয় ক্রোধ করালীকান্তের উপর। কারণটা ঠিক বোঝা যায় না।

করালীকান্তও ঝানু ছেলে। গোয়েন্দা লাগিয়ে আসল খবরটি জেনে নিলে। ব্যাপারটা ছিল এইরূপ : কলেজী আমলে হাইহিল অর্থাৎ অমলা ছিল মাণিকবাবুর সহাধ্যায়িনী। একদিন কি একটা অযথা ভাবাবেগের জন্য অমলা অপমান করেছিল মাণিকবাবুকে। বর্তমানে সংসারধর্ম পালন করলেও মাণিকবাবু অমলার জীবন-ইতিহাস সম্বন্ধে উদাসীন নয়। সব খবরই তার নখদর্পণে।

করালী অমলাকে আনবার ব্যবস্থা করে লোক পাঠালে। কিন্তু অমলার মা বেঁকে বসলেন। আইবুড়ো মেয়েকে আমি শহরে বেড়াতে দেই বলে করালীর সঙ্গে বন বাদাড়েও পাঠাব ? ওকথা চলতে পারে সিঁথেয় সিঁদুর পরলে পরে—তার আগে নয়।

এবারে করালী নিজে এলো।

অমলার মা বললেন : না বাবা, বিয়ের জল গায়ে না পড়লে মেয়েকে আমি কোথাও যেতে দেবো না…

বিয়ে আমি করব না বলে ত অস্বীকার করিনি, তবে দুদিন সময় সাপেক্ষ—কণ্ট্রাক্ট, বিজনেস্ বড় ন্যাস্টি বিজনেস্—বিশেষ করে মিলিটারী কনট্রাক্ট—অন্য জিনিষে তর সয়, কিন্তু এসব জিনিষে তর সয় না—

তা' ত বুঝলুম, বিয়েটা করতে আর কতই বা সময় লাগবে, সেটা শেষ করে তুমি হিল্লী দিল্লী মক্কা যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাও আমার কোন আপত্তি নেই…

আপনি বুঝতে পারছেন না—কনট্রাক্টটা ফসকে গেলে আমার কত বড় ক্ষতি হবে জানেন ! শুধু অমলার একটা মুখের কথা বইত নয়…সে কথাটি বলেই সে চলে আসবে রূপসী থেকে…

সে হয় না বাবা, তুমি যদি মেয়ের মা হতে তবে বুঝতে পারতে আমার কথা…

আপনাদের বোধকরি আমার চাইতে নোতুন কোন ভালপাত্র হাতে আছে, সুতরাং···

এ—কি কথা বলছ তুমি···

তা' নইলে আপনারা ত সামান্য কথা নিয়ে পূর্বে আমার সঙ্গে এরকম করতেন না···

রকম আর কি করেছি বাছা, তুমি ঘরে এসে বসো করালী···

থাক্—বসবার আমার সময় নেই—তবে এটুকু শুনে রাখুন, ভারতবর্ষে আজ যত বড় উঁচু চাকুরেই থাক না কেন, তাঁদের চাইতে আমার আয় বেশি···

তুমি রাগ করলে করালী···

রাগ না করলেও খুসী যে হইনি সেকথা বলাই বাহুল্য—কথা কয়টি বলে জবাবের প্রতীক্ষা না করে করালী ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়ে উঠে বসে তার গাড়ীতে—

মুহূর্ত পরেই অমলা দোতলা থেকে নীচে নেমে মা'র সঙ্গে মুখোমুখি বচসা সুরু করে দেয়। নির্লজ্জতার সম্মার্জনী তুলে।

তারপর মনে মনে নিজেই একটা ব্যবস্থা ঠিক করে অনেকটা প্রকৃতস্থ হলো।

এদিকে করালীকান্ত মনের খেদে উত্তর দক্ষিণ কোলকাতা চষে ফেলে দিলে পরাজয়ের আবহাওয়া বুকে নিয়ে।

দিনের শেষে গোধূলির ঠিক পরে। অমলা করিডোরের রেলিং-এ তির্যক ভঙ্গীতে দুই কনুতে ভর করে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে। এলোমেলো চিন্তার স্রোত ওকে বিপর্যস্ত করে তোলে। করালীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। এই রাস্তা দিয়েই সে সন্ধ্যাবেলা যায় আসে।

মাণিক—কত বড় স্কাউণ্ড্রেল মাণিক···আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য করালীর উপর এই অবিচার···ক্ষমতা হাতে পেলে চুনোপুঁটিরই তেজ হয় সবচাইতে বেশি। কা'র সঙ্গে লড়াই করতে চলেছে, সে কি তা' জানে? কতবার কিনে কতবার বেচতে পারে তোকে আর তোর মনিবকে একসঙ্গে। "চাঁদনীর জুতো' সইতে পারবি তুই—তোর মত থার্ডক্লাশ এম-এ কত ঘোরে পথেঘাটে ফ্যা ফ্যা করে···

এই যে করালী—করালী। প্রাণের রসসুধা উপচে ঢেলে দিয়ে হাঁক দিলে অমলা।

করালী নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো অমলার কাছে।

বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমরা পুরুষমানুষ হীরের আংটি—রাগটা তোমাদেরই শোভা পায়—

কি রকম?

সকালে এতবড় একটা কেলেংকারি করে, বুকে দুঃখ নিয়ে সারাটা দিন ঘুরে বেড়ালে, আমাকে একটুও ভাগ দিলে না—

সব জিনিষের ভাগ কি সবাইকে সব সময় দেওয়া যায়—

বুঝেছি, অভিমান—ইংরেজীতে যার প্রতিশব্দ নেই। আমি যাব, যাব, যাব। আজ রাত বারোটার গাড়ীতেই তোমার সঙ্গে রূপসী যাব।

তবে তৈরী হয়ে নাও। ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলি যেন করালী কোন এক বিলেতী একজিবিশনের শো-রুমে তুলে ধরলে।

চা খাবে করালী, চা—বললে অমলা।

চা খাব, যা' দেবে তাই খাব। খুসীতে ফেনিয়ে-পড়া মন নিয়ে করালী অমলার ডান হাতটি তুলে নিয়ে হঠাৎ একটা চুমো খেলো।

হাসিতে গলে পড়ে অমলা বললে; চরিত্র নষ্ট করো না করালী···

ডিগ্রীওয়ালাদের চরিত্রের মাপকাঠি বড় উঁচু সুরে বাঁধা—বুঝলে হাইহিল। পদে পদে তারা হারিয়ে বসে, আমাদের সে বালাই নেই।

খুব হয়েছে আর দুষ্টুমিতে কাজ নেই—অমলা বললে চোখেমুখে একটা ক্ষিপ্রতা এনে।—ইলেট্রিক্ হিটার থেকে চায়ের জলটা নামিয়ে নিয়ে ঢাললে টি-পটে।

নাম-না-জানা এঁদো পাড়াগাঁ রূপসী ভাগ্যান্বেষীর ভিড়ে গেছে ভরে। রূপসীর বনে আর পাপিয়া গাইবে না গান, দোয়েল দেবে না শীষ, মন মাতাবে না বুনোফুলের বসন্ত ঋতু উৎসব। নদীর ধারে বনের ছায়ায় কৃষকপ্রিয়ার অশ্রুচোখ দেখবে না আর কেউ। বনের অবান্তর ঝেঁটিয়ে দিয়ে নিঃশব্দতার বুকে সদর্প সৈন্যদলের কোলাহল উঠেছে মেতে।

সবই হলো। কনট্রাকট্-ও মিলল। কিন্তু অনেক কান্না জমলো অমলার মনে।

সান্ত্বনা দিলে করালীকান্ত। যুক্তি দিয়ে দ্বন্দ্ব থামতে চায় না।

অমলা জিদ্ ধরলে সাইনাড্ খাবে। টাকা দিয়ে এ-ক্ষতিপূরণ হয় না। স্তিমিত দেহ আর অবসন্ন মন ধিক্কারের স্তূপে ডুবে গেল।

করালী সালংকারে দেশের কাগজগুলোতে প্রচার করলে ওদের বিয়ের সংবাদ খুবই জাঁকের সঙ্গে।

খবর শুনে পাড়ার উৎসাহী ছেলেরা কার্টুন পিকচার এঁকে ছাপালে। বখাটে ছোকরারা হাইহিল সম্বন্ধে কবিতা লিখে প্রীতি-উপহার তৈরী করলে। প্রাজ্ঞরা বললেন: ম্যাচটা একেবারেই ঠিক হলো না। শুধু মালা পরাচ্ছে এক কাঁড়ি টাকার গলায়। মাতব্বরেরা বললেন: ছেলে বটে করালীকান্ত—মাতুলের প্রতি কি অসীম শ্রদ্ধা—ঠিক যেন সেকেলে ছেলের মত—বিয়ে-ও করতে চলেছে একটা ড্যাব ডেবে জ্যান্ত সরস্বতীকে।

জনমত আর জনস্রোত দেখেশুনে অমলার দেহ ক্লান্তিতে হিম হয়ে আসে। চোখে ওর ঘুম নেই। শেষ রাত্রির পাণ্ডুর চাঁদের একফালি ওর বিছানায় এসে লুটোচ্ছে। তারায় ভরা আকাশ। একটা পৈশাচিক নিঃশব্দতা প্রেতরাজ্যের বাণী সদম্ভে ঘোষণা করে।

মাণিকের টুক্‌রো টুক্‌রো কথা মনে পড়ে: বুঝলে হাইহিল, আমার কলেজ জীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টাকে গুড়িয়ে দিয়ে চলে গেলে তুমি···শুধু শিখলে ব্যথা দিতে···তোমার রূপের শিখায় দগ্ধ হলো কত বিরহীচিত্ত···তাদের অভিশাপেই আজ তুমিও জীবনে সুখ পেলে না···

অমলা জবাব দিয়েছিল: নতি স্বীকার করে আবার এসুম ত তোমার দুয়ারে···

মাণিক এবারে তার শেষ বাণ নিক্ষেপ করলে: তুমি যে একদিন আমার কাছে আসবেই—সেকথা আমি জানতুম। মানি-ইনফ্লুয়েন্সে

রূপোর চাকতির মোহ আমার গেছে—রূপোতে আর এবার কুলোবে না হাই-হিল—রূপ চাই···

আর ভাবতে পারে না অমলা। শেষটা কি রকম গুলিয়ে যায়। একটা মোহাচ্ছন্ন আবেশ মুহূর্ত্তে প্রেতায়িত হয়ে অতীতের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিলে অমলার। তার দম্ভ করবার আর রইল না কিছু। উঁচু হিলের আভিজাত্য পণ্যস্ত্রীর দুয়োরে হোচোট্ খেলো। তার সঙ্গে আর সাধারণের তফাৎটা কোথায়?

শ্যেনপাখীর দৃষ্টি দিয়ে অমলা পৃথিবীর প্রভাতিক মাধুর্য একবার নিরীক্ষণ করলে। মুহূর্ত পরেই এ-পৃথিবীর কোন কিছুর সঙ্গেই আর ওর যোগাযোগ থাকবে না। প্রেম, ভালবাসা, পীরিতি—কত কি তৈরী করলো মানুষ—অচিরেই সব ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে—ভালবাসে সে, কিন্তু দেহ দিয়ে অর্থ-গৃধ্নুতার স্বর্গারোহণ! ধিক্—মৃত্যু দিয়ে করবে সে শুচিতার বহিঃপ্রকাশ···মাণিকের লোলুপতার ক্ষমা চললেও করালীর ক্ষমা নেই—যে নিজের ভাবী স্ত্রীকে অর্থের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে পারে।—যুদ্ধের ডাকে এমনি নীচু মনোবৃত্তি ঘর বেঁধেছে আমাদের অন্তরে। আমরা সব পারি, অর্থের বিনিময়ে আমরা সব পারি···

চিত্রধর্মের গোড়ার কথা

শ্রীইন্দু রক্ষিত

আদিম মানব যেদিন প্রাকৃতিক গুহা পরিত্যাগ করিয়া নিজেই গুহাগেহ নির্মাণ করিতে শিখিল, শিকার সংগ্রহ বা আত্মরক্ষার জন্য পাথর ঠুকিয়া আয়ুধও প্রস্তুত করিয়া লইল, সেদিন সে তার শিল্পীজীবনের প্রথম পর্য্যায়ে পদার্পণ করিল। কিন্তু তখনই সে তার রসজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিল না। মানবমনের অন্তঃপুরে, ক্ষুৎপিপাসাদি প্রয়োজনবোধের অন্তরালে আরও যে একটি অনুভূতির অবকাশ আছে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল আরও পরে, পুরা-প্রস্তরযুগ কাটাইয়া হিমালযুগে। এই অনুভূতির উন্মেষের ফলে সে শুধু আর হাতিয়ার বানাইয়াই ক্ষান্ত রহিল না, তাহার হাতলটিকেও সুশ্রী করিতে চেষ্টিত হইল; শীতাতপ বা বহিরাক্রমণের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আস্তানা গাড়িয়াই নিশ্চিন্ত বা তৃপ্ত রহিতে পারিল না, চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত সেই গুহাগেহ চিত্রিতও করিল। কিন্তু হঠাৎ এই রসচেতনা প্রকাশ হইয়া পড়িল কি করিয়া? মনের নিভৃতে নিহিত ছিল যে তরল রস তাহা এমন দানা বাঁধিতে সুরু করিল কি প্রকারে? বাহির হইতে কোনও অনুপ্রেরণার স্নিগ্ধ সংস্পর্শ লাভেই অবশ্য এমন ঘটিতে পারিয়াছিল; নতুবা আপনাআপনিই তাহা কিছু সম্ভব হইত না। প্রভাতের অরুণ তাহার সাতরঙ্গা আলোর পরশ বুলাইয়া দেয় বলিয়াই পাতায় পাতায় তারুণ্যের আমেজ সবুজ হইয়া উঠে, ফুলকুসুম রঙীণ হইয়া হাসিতে থাকে। তবে আদিম মানব এই অনুপ্রেরণা লাভ করিল কোথা হইতে? যে সুর তরঙ্গ ধ্বনিত হইয়া তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানিল, তাহাতে ঝনন রণন ঝঙ্কার তুলিয়া দিল তাহার উৎস কোথায়? উত্তরে বলিতে হয় প্রকৃতি। কোনও অজানিত অদৃশ্যলোক হইতে অনুপ্রেরণা আসিয়া পৌঁছে নাই, জীবনের জাগতিক পরিবেশ বা প্রকৃতি, অথবা বাস্তবই এই রসচেতনার জাগৃতি আনিয়া দিয়াছে এবং বাস্তব বা স্বভাব হইতে উদ্ভূত যে রসচেতনা শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রথম রূপায়িত হইয়াছিল তাহা মূলতঃ স্বভাবানুকৃতিই, নিছক খেয়ালপ্রসূত কল্পনাবিলাস নহে। চিত্রকলার এইখানেই সূত্রপাত এবং চিত্রধর্মের ইহাই গোড়ার কথা।

কগুল গুহাচিত্র—নবপ্রস্তর যুগ

প্রাচীন মিশরের—খিরীয় যুগ

কিন্তু চিত্রধর্ম মূলতঃ অনুপ্রেরণালব্ধ স্বভাবেরই অনুকৃতিপ্রকাশ—এই সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাতে আর একটি সন্দেহ ছায়ারূপ পরিগ্রহ করিয়া উঁকি মারিতে থাকে। প্রশ্ন জাগে, মনোরাজ্যের সহিত স্বভাবের যোগসূত্রস্থাপনে যে রসের বিকাশ তাহার প্রকাশে মনন প্রতিভার কি কোনও সহযোগিতা নাই! স্বভাব বা প্রকৃতি দেবী তাহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রস পরিবেশন করিল, সেই রসাস্বাদনে রসিক মানব প্রকৃতিকে ভালবাসিয়া ফেলিল, মজিল এবং অনুরাগভরে তাহারই আলেখ্য রচনার মন ঢালিয়া দিল। তবে মানব কি তাহার প্রিয়জনের প্রতিকৃতি রচনায় কেবল সাদা চোখের দৃষ্টির উপরই নির্ভর করিয়া রহিতে পারিল? তাহার মনশ্চক্ষু কি সেই বাস্তবরূপকে আরও একটু রঙীণ করিয়া গ্রহণ করিতে চাহিল না? অবশ্যই চাহিল, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল স্বাভাবিক মনে হইলেই এই বিশ্বাসটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়তো যাইবে না। তাহার জন্য আরও বিচারের প্রয়োজন হইবে। বাস্তবিক এই প্রশ্নের আজও মীমাংসা হইয়া উঠিল না যে—চিত্রকলা, যাহার সূত্রপাত মূলতঃ দৃশ্যমান বস্তু বা ঘটনার অনুকৃতি

আমেনোফিস্‌এর শিলাফলক—থিরীয় যুগ

রচনায়, তাহা কি কেবলমাত্র সেই অনুকারিতাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া চিত্রধর্মকে বাঁচাইয়া চলিতে সক্ষম হইবে? অথবা এই অনুকৃতির উপরও কল্পনার কারুকৃতির প্রয়োজন হইবে তাহার পূর্ণতা সম্পাদনে?

যে কোনও কারণেই হউক প্রাচ্যদেশীয় শিল্পকলা বাস্তবের যথার্থ প্রতিচ্ছবিরূপে প্রকাশিত নহে। হালে দেখা যায় পাশ্চাত্যশিল্পকলাও (এদেশে স্পষ্টও) বাস্তবানুকৃতির প্রতি তাহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা পরিহার করিয়া বাস্তবাতিরিক্ত কিছুর সন্ধানে বাহির হইয়াছে। ইহার ফলে দেশকালনির্বিশেষে যে চিত্রসৃষ্টির এক সার্বজনীন ধর্ম স্থির হইয়া গিয়াছে, এতটা মনে করিবার মত অবস্থায় এখনো না পৌঁছাইলেও, স্বভাবের যথার্থ অনুকৃতি রচনার আদর্শ ইহাতে কোথাও আর প্রধান হইয়া থাকিতে পায় না। কিন্তু এখনও এই বাস্তবিকতাবর্জননীতি সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এখনও নূতন করিয়া অনুকৃতির আদর্শই আদর্শ বলিয়া প্রচারিত হইতে দেখা যাইতেছে। বিশেষজ্ঞ মহল হইতে উচ্চারিত এমন কথা শোনা যাইতেছে—যাহা বলিতে চাহে যেন স্বভাবানুকৃতিই চিত্রধর্মের চরম লক্ষ্য এবং একমাত্র তাহাই চিত্রসৃষ্টির শাশ্বত ও সনাতনরীতি। তবে এই নূতনতর ঘোষণাও বক্তব্য বিষয়ে সুস্পষ্ট নহে। এই অবলোকনের ক্ষেত্রে এমন কোনও সত্যের সন্ধান মিলে না যাহা প্রকৃত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে। কারণ একদিকে 'ভাবপ্রবণ চিত্র' বলিয়া যাহা বাস্তবের হুবহু প্রতিকৃতি নহে এমন এক শ্রেণীকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং "চিত্রকলা বাস্তবানুকৃতিতেই পর্যবসিত নয়" তাহা "বাস্তবাতিরিক্ত কিছু ও বাস্তবের রূপান্তর" কথিত হইয়াছে, অপরদিকে "পটের উপর বাস্তব বস্তুর দৃষ্টিবিভ্রমকারী অনুকৃতিরচনা না করিয়াও চিত্রকলা সম্ভব" এই অভিমতটুকুও অগ্রাহ্য হইয়াছে। যুগপৎ এই পরস্পর-বিরোধী উক্তি কিঞ্চিৎ গোলযোগ সৃষ্টির সহায়ক। কারণ অতি বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেও ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারা কঠিন হইবে যে, যে চিত্রকলা বাস্তবাতিরিক্ত কিছু বা বাস্তবের রূপান্তর তাহা পটের উপর বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার গুণসম্পন্ন কি করিয়া হইতে পারে? যাহা হউক, চিত্রধর্মের এই নূতনতর

পদ্মাসন লিপিকার—প্রাচীন মিশর, প্রথম যুগ

বিচারপ্রচেষ্টা তথ্যবহুল এবং পাণ্ডিত্যের সুনিপুণ প্রকাশ সন্দেহ নাই। বহু উক্তির উল্লেখে ও যুক্তির অবতারণায় যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বাস্তববাদেরই সমর্থক হিসাবে বিচার দাবী করিবে। (কারণ "বাস্তবাতিরিক্ত বা বাস্তবের রূপান্তর" বিষয়ে কোনও উল্লেখ আলোচনা প্রকাশ পায় নাই)

এই নূতনতর অভিমতের প্রাথমিক এবং প্রধানতম যুক্তি এই যে বাস্তবানুকৃতির রীতিকে ঠেলিয়া কল্পনা বা ভাবাবেগকে আশ্রয় করিতে চাহিলে আরও দুইটি প্রস্তাব নাকি নির্বিচারে মানিয়া লওয়ার প্রয়োজন। প্রথমতঃ অলঙ্কারশিল্পই চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং দ্বিতীয়তঃ, আদিমকাল হইতে বিগত শতাব্দী পর্যন্ত সৃষ্ট, যাহা চিত্রকলা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহা মোটেই চিত্রকলা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব অপর সূক্ষ্ম তর্কালোচনায় নিয়োজিত না হইয়াও এই

দুইটি প্রস্তাবকে অবলম্বন করিয়া বিচারে অগ্রসর হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

'ফটোগ্রাফি যেমন আর্ট নয়' এবং সে প্রশ্ন অবান্তর, তেমনি অলঙ্কার শিল্পও চিত্রকলা নয়। কিন্তু কেবল ওইটুকু বলিয়াই উল্লিখিত প্রথম প্রস্তাবটিকে ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না, আরও কিছু বলিবার প্রয়োজন হইবে। সেখানে বলিতে হইবে চিত্রকে চিত্ররূপে পরিগণিত হইবার জন্য কয়েকটি বিশেষ গুণ বা লক্ষণ সম্পন্ন হইতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে এই-রূপ আটটি বা ছয়টি গুণ বা অঙ্গের নির্দেশ আছে অন্য দেশের শাস্ত্রেও আছে।১ অলঙ্কারশিল্পে এই "ষড়ঙ্গের" ভাব ও সাদৃশ্য লক্ষণের বিশেষ অভাব ঘটে এবং লাবণ্যসংযোগকল্পে যদি বাস্তবের রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজন হয় তবে তাহার মাত্রা অত্যধিক হইয়া পড়ে। যদি সব কয়টি লক্ষণই উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তবে সেই নক্সা বা অলঙ্কারশিল্পও যে চিত্রকলা হইয়া উঠিবে তাহা আর বিচিত্র কি? এই কয়টি কথার
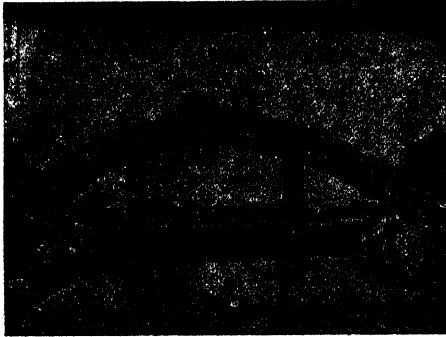
সেতু ও ফুজি পাহাড়—হকুসাই—অষ্টাদশ শতাব্দী

ভিতরই প্রথম প্রস্তাবটির সবটুকু উত্তর পাওয়া যাইতে পারিবে। অতঃপর অপ্রাসঙ্গিক হইবে কি না বলিতে পারি না, তবু এই সূত্রে আরও কয়েকটি প্রশ্ন পাল্টাইয়া করিবার বাসনা করি। অলঙ্কার শিল্পের একটি প্রয়োগ মনে করা যাউক। অভিনন্দন লিপি বা সেইরূপ কিছু—যাহার খানিকটা আয়তনকে বেষ্টন করিয়া লতাপাতার নক্সা আঁকা হইয়াছে। বলিতে হইবে ইহার উদ্দেশ্য সৌন্দর্যবর্ধন। লতাপাতা বাস্তবেরই বস্তুবিশেষ। আমরা বলিয়া থাকি সমগ্র বাস্তবজগৎ, বিশ্বচরাচর সৌন্দর্য-সুষমায় ভরপুর। অতএব প্রশ্ন আসিতে পারে স্বভাবের অবিকৃত অনুকরণই যদি সৌন্দর্যসৃষ্টি হয় তবে আসল লতাপাতা ছাড়িয়া এস্থলে লতাপাতার ঢং (motif) সৃষ্টি করিতে হইল কেন? ইহা কি মধ্যযুগীয় অপরিণত রসবোধের রীতি এবং বর্তমানে পরিত্যাজ্য? অধুনা যে শাড়ীর Scenery পাড় দেখা দিয়াছে সোনার চাঁদমালা পদ্মের ঢং ছাড়িয়া পাপড়ি তুলিয়া realistic হইতে চাহিতেছে, পূজার প্রতিমার পরিকল্পনায় থিয়েটারের ষ্টেজ নির্মিত হইয়া বাস্তবিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছাড়িতেছে, তাহা কি তবে ওই অপরিণত (?) রসবোধের যথার্থ পরিণতি? প্রশ্ন আসিয়াছে "মোগল ছবির ছবিটুকু বাদ দিয়া হাঁসিয়াটুকু লইয়া মাতামাতি করিবার বিপক্ষেই বা কি যুক্তি আছে?" পাল্টা প্রশ্ন করিতে হয়—মোগল বা পারসিক চিত্রাভ্যন্তরের লতাগুচ্ছ ও হাঁসিয়ার নক্সার মধ্যে প্রভেদ কতটুকু? যাহা হউক এ সকল হয়তো অবান্তর হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে ইহাই বলা চলে আদিমযুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর চিত্রকলা, যাহা বাস্তবের অনুকরণ মাত্র বলিয়া প্রস্তাবিত তাহা কেবল অনুকরণমাত্রই নহে; সুতরাং চিত্রকলা বিবেচিত হইবার বাধা নাই। তবে ইহার জন্যও একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

আদিম যুগের চিত্রকলার সুরু যে বাস্তবানুকৃতি এবং বাস্তবই যে রস-চেতনার জীয়নকাঠি একথা আগেই দেখা গিয়াছে। এমন কি আদিম মানব রেখার আঁচড়ে যে জ্যামিতিক ঢং (design) রচিয়াছে, পণ্ডিতেরা অনুমান করেন জলের ঢেউ, স্রোতের গতি প্রভৃতি বাস্তব জগতেরই অংশ হইতে তাহার প্রেরণা আহরিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা হয়তো সঙ্গত হইবে না যে চিত্ররসের অনুকরণগত সৃষ্টির মধ্যে কল্পনার স্থান ছিল না বা নাই, অথবা তাহা অপ্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ চিত্রকাব্য রচনায় ভাবের যথার্থ অভিব্যঞ্জনাকল্পে চিত্র-ভাষায় একটি আবেগ—লক্ষণের (emphasis) আবশ্যকতাবোধ আদিম অবস্থা হইতেই হইয়াছিল। অবশ্য আদিম মানবের অপটু হস্ত ও অপরিণত বুদ্ধিবৃত্তি পূর্ণসাদৃশ্য রচনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না বলিয়াও, সেই অপূর্ণতার কতক পূরণের জন্যও কল্পনার সাহায্য দরকার হইয়াছিল। কিন্তু কল্পনা যে ভাবলাবণ্যের খাতিরেও আদিম শিল্পীকে স্বাভাবিকতা ডিঙ্গাইয়া যাইতে প্ররোচিত করিয়াছে তাহারও নিদর্শন অপ্রচুর নহে। উদাহরণ পরে আসিতেছে। আরও এক কথা। দৃষ্টির গোচরীভূত বস্তু বা ঘটনামাত্রই নহে, তাহার মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি মাত্র আদিম মানবের মন-দুয়ারে রূপায়িত হইবার আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। যে বন্য হরিণকে জীবন পথের সাথী করিয়া সে সংসার পাতিয়াছিল, বা যে মৃগ শিশুর চকিত আবির্ভাব অন্তর্ধানের তড়িৎচঞ্চলগতি তাহার নিষাদ নয়নেও পুলক জাগাইয়াছিল তাহারই ছবি দিয়া সে বাসগৃহ চিত্রিত করিয়াছে। যে বন্য মহিষের অতর্কিত উপস্থিতি তাহার জীবন সংশয় ঘটাইয়াছিল এবং যাহার নিধন সাধিয়া সে শুধু আত্মরক্ষাই করে নাই অন্তরে অনন্ত তৃপ্তির স্বাদ পাইয়াছিল অথবা দুর্ধর্ষ শত্রুদলের সহিত যে সংগ্রাম হইতে সে বিজয়ীর গর্ব লইয়া ফিরিতে পারিয়াছিল সেই গৌরবদীপ্ত ঘটনাস্মৃতিই সে সঞ্জীবিত করিতে চাহিয়াছে রেখার আঁচড়ে। ঋতুতে ঋতুতে নব নব রূপে প্রকাশ পাইয়া তাহার কৌতূহলের উৎস খুলিয়া দিয়াছিল যে লতাপাতা ফুলফল, তাহাকেই তাহার দরদী চিত্ত চিত্রাকারে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে অর্থাৎ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত ও অনুভূত যে সকল বস্তু বা ঘটনার স্মৃতি তাহার চিত্রপটে বার বার

১ রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

ফুটিয়া উঠিয়াছিল, রসাবেশে মাত্র তাহাই সে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এই সকল সে লক্ষ্য মাত্রই আঁকিয়া ফেলে নাই। অতীব অনুভূতির তিমিরাচ্ছন্ন বিস্মৃতিরাশির মধ্যে দ্যুতিমান এই কয়টি স্মৃতিখণ্ডকে সে পরে কল্পনার সহযোগিতায়ই রূপদান করিয়াছে। বলা বাহুল্য আদিম অবস্থার অনুকৃতির অপ্রকৃতার মত এই ভাব লক্ষণের প্রকাশও ছিল স্থূল প্রকৃতির। যথা—নব প্রস্তর যুগের (Neolithic) সূচনা কালে চিত্রিত কগুল (cogul), আল্পেরা (Alpera-Almeria) প্রাচীর চিত্রে অথবা বুশম্যানদের (Bushmen) চিত্রের যুদ্ধ দৃশ্যে দেখা যায় স্বপক্ষীয় বা প্রধানদের প্রাধান্য সূচিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহাদের দেহাবয়ব অনৈসর্গিক কল্পনাবশে বৃহদাকার করিয়া আঁকিয়া। (১) এরূপভাবের স্থূল প্রয়োগ পরিকল্পনার উদাহরণ আরও পাওয়া যাইতে পারে। কালক্রমে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হস্তনৈপুণ্যের উন্নতির মত এই ভাবাবেগ লক্ষণের প্রয়োগ পরিকল্পনা উৎকর্ষতায় বিকশিত হইতে থাকে।

চৈনিক নিসর্গচিত্র—মিঙ্‌ যুগ

আদিম যুগের পর শিল্পের মিশর, ব্যবিলন বা আসিরীয় সভ্যতালব্ধ যে পরিণতি তাহাকেও নিছক বাস্তবধর্মী মনে করিবার কারণ নাই। পরিণত থীবিয় যুগোৎকীর্ণ প্রস্তর ফলকের ভাস্কর্য, পুঁথির পট বা ভিত্তি চিত্রকে উদাহরণ ধরিয়া বলা যাইবে যে সে যুগের শিল্প দৃষ্টি-বিভ্রমকারী বাস্তবের অনুকৃতি ত নহেই, এমন কি অক্ষমতাজনিত অপূর্ণতা মাত্রও নয়। এই অবাস্তবিকতার অনেকটাই স্বেচ্ছাকৃত। থিবীয় যুগের আমেনোফিস্ তৃতীয়ের উৎকীর্ণ ফলক এবং তাহারও পরের যুগের তুতেন্‌খামেনের কবরে প্রাপ্ত "রথবাহিত যুদ্ধ বন্দী"র খোদিত ফলক একদিকে এবং থিবীয় যুগের ফেরোদের (Pharaoh) প্রতিমূর্তি, এমন কি তাহারও আগের যুগের "পদ্মাসন লিপিকার" (seated scribe) মূর্তি অপরদিকে রাখিয়া যথাক্রমে অবাস্তবিকতা এবং বাস্তবিকতা লক্ষ্য করিতে পারিলেই ইহা পরিষ্কার হইবে। মিশর শিল্প যেখানে টেঁকে না, সেখানে আসিরীয় বা বাবিলনীয় শিল্প যে নিছক বাস্তবের অনুকারী ছিল তাহা বলাই চলে না। ভারতের কথা এখন না হয় বাদই রহিল। চতুর্থ শতাব্দীতে ফেইদিআস্ প্রমুখ শিল্পীদের ভাস্কর্যও সেই ধারায় পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর অনুবর্তন; বিশেষ করিয়া গ্রীক ও রোমক, এবং "Renaissance"(রেনেসাঁস্)এর পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় চিত্রকলাকে মাত্র যথার্থ স্বভাবানুকৃতির নিদর্শন বলা চলে। শিল্পেতিহাসের হিসাবে এই কয়টি বছর খুব দীর্ঘকাল বলা চলে না। যথার্থ সাদৃশ্য সংঘটিত হইলেই শিল্পের পর্যায় হইতে বাদ পড়িয়া যাইবে এমন যুক্তি "বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়াও চিত্রকলা সম্ভব" এই উক্তির মধ্যে খুঁজিয়া পাইবার কথা নয়। ইহাই বা বুঝিতে হইবে কি যে তৎকালীন বিশ্বসভ্যতা তথা শিল্পের পরিচিতি লইয়া ধরা পৃষ্ঠে একমাত্র য়ুরোপখণ্ডই বিরাজ করিতেছিল? নতুবা সমসাময়িক চৈনিক, ভারতীয়, কাম্বোডীয়, জাপ প্রভৃতি যে সকল শিল্পকে জগৎ সশ্রদ্ধ নতি জানাইতে দ্বিধা করে নাই তাহার কোনটি নিছক বাস্তবিকতার আদর্শে সৃষ্ট অথবা বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার গুণসম্পন্ন? বলা চলিবে কি যে এই সকল শিল্প বাস্তবিকতার আদর্শই মানিতে চাহিয়াছে—তবে সাফল্যলাভ করে নাই? এই মত গ্রাহ্য হইলে ইহাও মানিতে হয় ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় শিল্প যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীতে বা আজও, অনেক মাজাঘসাতেও চৈনিক বা জাপানী চিত্রকলা তাহার ধারপাশেও পৌঁছে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর ওস্তাদ মনসুর ও সপ্তদশ শতাব্দীর পল পটার (paul pottar) যদি একধর্মী হন তবে কাহাকে কোন স্তরে রাখা যৌক্তিক? আরও গোলের কথা যে—যে যুগে ইংলণ্ডে লর্ড লেটনের (Leighton) মত রক্তমাংসের উপাসক ও বাস্তব সৃষ্টির অন্যান্য ওস্তাদ শিল্পীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, প্রায় সেই যুগেই তথায় হকুসাইএর কাঠ খোদাইএর ছাপ (—যাহাকে অনৈসর্গিক নিসর্গ চিত্র বলিলে অদ্ভুত শোনাইলেও ভুল হইবে না—) তথাকার শিল্পী বা রসিক সমাজে আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব নিছক বাস্তবের দৃষ্টি-বিভ্রমকারী অনুকৃতির আদর্শকেই সার বুঝিয়া তৎকালীন য়ুরোপও যে বসিয়াছিল তাহাও নহে। (আগামী বারে সমাপ্য)

(১) স্পেনিশ শিল্পব্যাপক জোসেফ পিজোআন (Josup Pijoan) বুশমেন চিত্রপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"It is curious to note that the victorious Bushman are of exaggerated size, just as all primitive people represent persons as larger or smaller according to their relation, rank and importance"—History of Art, Vol 1.—Pijoan

বিজয়লক্ষ্মী

নরেন্দ্র দেব

নির্ভীক সতেজ কণ্ঠে সত্য আজ কে তোলে ধ্বনিয়া
স্বার্থান্ধ সিন্ধুর দূর পারে ?
নির্দ্দয় শোষণে মত্ত সাম্রাজ্য-সম্পদ-লুব্ধ হিয়া
লজ্জানত অপরাধ ভারে।
অহল্যা পাষাণ-শিলা অকস্মাৎ লভিয়া কি প্রাণ
কহে নিজ ইতিবৃত্ত কথা ?
লজ্জিত কি শুনি আজ দৃষ্টিহীন কৌরব প্রধান
গান্ধারীর মর্ম্মের বারতা ?
বিস্মিত জগৎ শুনি কুরুক্ষেত্র চলেছে ভারতে,
ভীষ্ম শুয়ে শরশয্যা'পরে।
নির্ব্বাসিতা সীতা সেথা মিথ্যা অপবাদ মুক্ত হ'তে
অভিযুক্ত করে লঙ্কেশ্বরে !
বৃত্রাসুর অত্যাচারে স্বর্গহারা দেবেন্দ্রাণী শচী
রুদ্রের শরণ যেন যাচে।
শম্ভু নিশম্ভুর দ্বন্দ্ব ঘটায়ে যে মরীচিকা রচি
গৃহযুদ্ধ অন্তরালে বাঁচে,
সুরাসুরে বাধে রণ মোহিনী মায়ায় যার ভুলি,
পরাস্ত করে যে বীরে ছলে,
অমৃত হরিয়া তারা বিষভাণ্ড দেয় করে তুলি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য যায় রসাতলে !
পৌর সভা মাঝে যেন অসহায়া লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী
দুঃশাসনে হানে অভিশাপ !
কৌটিল্য কৌশলে যারা অবজ্ঞাত ছিল নিরবধি
সহিয়া সত্যের অপলাপ—
আত্মপ্রকাশের লাগি ব্যাকুলতা তাহাদের চিতে,
যাজ্ঞসেনী ব্যগ্র তাই আজ।
জানি, তুমি মহাবীর্য্য সঞ্চারিয়া বীরের শোণিতে
যুগে যুগে এনেছো স্বরাজ,
স্বাধীনতা সাধকের মুক্তি-যজ্ঞে উত্তর-সাধিকা
ঈপ্সিতা বিজয়লক্ষ্মী তুমি !
ভাগবতী তেজে তব দীপ্ত হবে নির্ব্বাপিত শিখা
নব জন্ম পাবে জন্মভূমি।
প্রণমি ধরণী-ধন্যা আর্য্যকন্যা প্রয়াগ-নন্দিনী,
বন্দি তব অনন্য প্রতিভা,
শোনো ওই আশীর্ব্বাণী উচ্চারিছে জননী বন্দিনী
ম্লানমুখে মা'র দিব্য বিভা॥

"পঞ্চাশের মন্বন্তরে"র কারণ নির্ণয়

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

গত ১৩৫০ অগ্রহায়ণের "ভারতবর্ষে" বাঙ্গালার ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষ আলোচনা প্রসঙ্গে 'ছিয়াত্তরে মন্বন্তর'-এর সহিত তুলনায় লেখক বলেন—

"আবার যদি কমিশন বসে, আবার যদি হাণ্টারের মত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক "পঞ্চাশের মন্বন্তরের" ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, দেখা যাইবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অপেক্ষা বর্ত্তমানের দুর্ভিক্ষ গুরুত্ব হিসাবে মোটেই কম নয়; বরং প্রায় দুই শত বৎসরের সভ্যতার ধারা, লোক সেবার মান, যানবাহনের সুবিধা সবই উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আজ যে ভাবে লোক মরিতেছে, তাহাতে মনে হয়, বর্ত্তমানের দুর্ভিক্ষ মহামারী, পৌনে দুই শত বৎসরের আগের ঘটনা অপেক্ষা তুলনায় ভীষণতর।"

এ কথা আজ ১৯৪৪ সালে নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটীর সদ্যপ্রকাশিত বিবরণী হইতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে আরও বহু অদ্ভুত তথ্যের সন্ধান মিলিয়াছে। মানুষের অবিবেচনা, অদূরদর্শিতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অতি লোভ, স্বজাতিপোষণপ্রবৃত্তি প্রভৃতি দোষ, অন্নের অভাবকে দারুণ দুর্ভিক্ষে পরিণত করিয়াছে। ভারতের দুর্ভাগ্য অব্যবস্থিতচিত্ত কতগুলি কর্ম্মচারীর উপর এতগুলি লোকের মঙ্গলামঙ্গলের ভার নির্ভর করিতেছে। যে দেশের শাসিত ও শাসকের যোগাযোগ কেবলমাত্র একজন খরচ দিয়া অপরকে পুষ্ট রাখে, একজন মুখের অন্ন বিক্রয় করিয়া অপরের সফর, সদর, চাপরাশীর খরচ যোগায়, সেখানে বারে বারে দুর্ভিক্ষ মহামারী আবির্ভূত হওয়াই ত স্বাভাবিক।

দুর্ভিক্ষ তদন্তের রিপোর্টে প্রকাশ, এই অদ্ভুত দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের মত দুর্ভিক্ষবহুল স্থানেও পূর্ব্বে হয় নাই। যেখানে দুর্ভিক্ষ ছিল না, দুর্ভিক্ষ ঘটিবার কারণও ছিল না, সেখানে অনাহার-মহামারীতে দশ হইতে বিশ লক্ষ লোকের প্রাণান্ত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের অজন্মা হইতে ১৯৪২ সালের মোট ভাণ্ডার কম হইয়া যায়; তাহারউপর আংশিক অজন্মা—১৯৪৩ সালে পূর্ব্ব বৎসর হইতে জমা চাউল প্রয়োজন মত পাওয়া গেল না; সুতরাং দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। কিন্তু রিপোর্ট অতি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছে যে এই সামান্য পরিমাণ চাউলের ঘাটতি দুর্ভিক্ষকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে নাই। সময়মত চেষ্টা করিলে ইহা স্বচ্ছন্দে দূর করা যাইত। ইহা কম ক্ষোভের কথা নয় কিন্তু এই ক্ষোভ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও গতি নাই।

চাউলের ঘাটতি ছাড়া ইহার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের অপর কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দরিদ্র বাঙ্গালা; ক্রয়শক্তির অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় যত লোক অন্নাভাবে মরিয়াছে, শক্তির অভাবে ক্রয় করিতে না পারায় হয়ত তত লোকই মরিয়াছে। ধনীতে মরে নাই; সরকার যাহাদের চাউল সরবরাহের ভার লইয়াছিল—অর্থাৎ যুদ্ধসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মিবৃন্দ—তাহারা কেহ মরে নাই, খেতাঙ্গ এমন কি ফিরিঙ্গি কেহ মরে নাই, মরে নাই বাঙ্গালার বক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অবাঙ্গালী যাহারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছে তাহাদের একজনও।

এই মূল্যবৃদ্ধির কারণও রাজশক্তি—রাজকর্ম্মচারী। যখন বাহিরের আমদানী পড়িয়া গেল, তখনও রপ্তানী চলিয়াছে। ভারতের বাহিরে এবং বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে যাহারা ব্রহ্মের চাউলের উপর নির্ভর করিত তাহারা বাঙ্গালার চাউল টানিয়াছে। যাহাদের এই সময় সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল, তাহারা বেতন পাইয়াছে, সেলুন পাইয়াছে ও দিনের শেষে কর্ম্মহীন,অবসাদগ্রস্ত দেহখানি এলাইয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিয়াছে। বাহির হইতে অভাব পূরণের চেষ্টা হয় নাই। উপরন্তু সরকারী স্নেহপুষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি বাজার হইতে চাউল টানিয়া লইয়াছে। বিবরণীতে প্রকাশ যদি সময়মত গম আমদানী করা যাইত, এদিক-ওদিক ছাড়িয়া পঞ্চনদ সরকারকে অনুরোধ করা যাইত, তাহা হইলে এই দুর্দ্দশা ঘটিত না। চাউলের দর বৃদ্ধি না পাইলে এ অবস্থা দাঁড়াইত না। তদন্ত কমিটীর সভ্যগণ অতি জোরের সহিত বলিয়াছেন যে সময়মত উপায় অবলম্বন করা এবং রপ্তানী বন্ধ করিয়া লোকের মনে ভরসা দেওয়া সরকারের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

শত্রু কবে আসিবে সেই আশঙ্কায় চাউল অপসারণ এবং নৌকা ও সাইকেল নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার "সভ্যগণ" (তদন্ত কমিটীর সভ্যগণ বুঝিতে হইবে) বেশ সুনজরে দেখেন নাই। চাউল অপসারণ যে কেবল মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা নহে; শত্রুর আগমন আসন্ন বুঝিয়া লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে; যাহার যে চাউল ছিল শক্তিতে কুলাইলে এবং সরকারী কর্ম্মচারীর শ্যেনদৃষ্টি ও বিরাট কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিলে ছাড়ে নাই।

নৌকা নিয়ন্ত্রণ আরও অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। কমবেশ ৬৬ হাজার নৌকার মধ্যে মাত্র ২০ হাজার (তাহাও রেজিষ্ট্রশনের মধ্যে) লোকের হাতে ছিল। বাকী ৪৬ হাজার সরকারী আওতায় পড়িয়াছে; তাহার মধ্যে কতগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সরকারী আস্তানায় ("reception stations") ছিল, তাহারা বে-মেরামতে থাকায় যখন মাল চলাচলের জন্য একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন ব্যবহার করা যায় নাই। বাঙ্গালা সরকার বলিয়াছিলেন যে ঐ সকল নৌকা মেরামতে রাখা অসম্ভব ছিল। "সভ্যগণ" বলিয়াছেন, তাঁহারা ওকথা বিশ্বাস করেন না।

ছাউনী, বিমানপোত অবতরণক্ষেত্র প্রভৃতি কাজে বহু লোককে (সরকারী বিবরণীর মতে ৩০,০০০ পরিবার) ভিটাচ্যুত হইতে হয়। তাহাদের অনেককে খেসারত দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া সরকার মনকে

প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের অনেকেই যে অনাহারে মরিয়াছে, তাহা "সভ্যগণ" মনে করেন।

চাউল, নৌকা, লোক অপসারণ করিয়া দারুণ দুর্ব্বিপাক যাহারা ঘটাইল, তাহাদের কি ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন? পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া যাহারা হুকুম চালাইয়া মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ অপরের মৃত্যুর কারণ হয়, তাহারা কি কেবল পদের বেতন ও মর্য্যাদাভোগ করিবে? না, তাহাদের কাজের ত্রুটী ঘটিলে তাহার জন্যও দায়ী হইবে?

চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও অবাধ ক্রয় বিক্রয় বা গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে যে প্রহসনের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা একটী শিশু কিশোরের পক্ষেও লজ্জার বিষয়। আজ যে হুকুমে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে, কাল সে হুকুম রদ করা হইয়াছে। একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাপারী চাউল সংগ্রহ করিয়াছে; পরদিন একবার বন্ধ করা হইয়াছে, সরকারী সরাইয়া বেসরকারী ব্যাপারীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; বাঙ্গালার বাহির হইতে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। বেসরকারী ব্যাপারীর হাতে ভার ছাড়িয়া দেওয়ায় সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। প্রকাশ্য ভাবে লোকে বলিয়াছে, সরকারী ছাড় লইয়া ইহারা যে পরিমাণ চাউল ভিন্ন প্রদেশে ক্রয় করিয়াছে, বাঙ্গালা সরকারকে তাহা দেয় নেই এবং যে দরে কিনিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী দাম আদায় করিয়াছে। "সভ্যগণ" এ সন্দেহ পোষণ করেন বলিয়া ভারত সরকারের সাহায্যে একটী কোম্পানীর খাতাপত্র পরীক্ষা করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এ কার্য্যে বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। যখন এই সন্দেহ প্রকাশ্যে আলোচিত হইত, তখনই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ ছিল।

যে দিকেই আলোচনা করা যায়, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা সরকারের অযোগ্যতা এবং অপরিণামদর্শিতার কথা মনে পড়ে। যখন লোকে অনাহারে পথে পড়িয়া মরিতেছে, তখন তাহারা দেশের মধ্যে অভাব নাই বলিয়া প্রচার করিয়াছে। "সভ্যগণ" ইহাকে ভুল, অন্যায় এবং অযৌক্তিক কাজ বলিয়া রিপোর্টের তিন স্থানে স্বতন্ত্রভাবে কটূক্তি করিয়াছেন। তখন যাহারা লজ্জাহীন ভাবে লোকের জীবন সংশয় ঘটাইয়াছে, তাহাদের আজ এ কথায় কোনও লজ্জা, কোনও অনুশোচনা হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

যথাকালে খাদ্য বণ্টনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে। বাঙ্গালা সরকার বলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তিত করার মত পরিমিত পরিমাণ মজুত ছিল না এবং তাহাদের তাঁবে লোক শক্তি কম ছিল। সকল ব্যাপারেই "সভ্যগণ" বাঙ্গালা সরকারের কাজের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। যে পরিমাণ চাউল ছিল তাহাতে রেশনিং করা চলিত, পুরাতন দোকানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে চেষ্টা করা এবং রেশনিং কাজে নিয়োগের জন্য কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক হার বজায় রাখিবার চেষ্টা যে ঘৃণ্য ব্যাপার তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিলে বিপন্ন লোকে আরও সত্বর সাহায্য পাইত, দুর্ভিক্ষ কমিশনার নিযুক্ত হইলে প্রাদেশিক সরকারের খামখেয়ালীর হাত হইতে লোক বাঁচিয়া যাইত এবং বাহিরের লোকের সহানুভূতি আকর্ষণে সহায়তা করিত। ইহার কিছুই হয় নাই; যে যুক্তিতে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয় নাই, তাহা মোটেই বিচারসহ নহে।

ভারত সরকার বসিয়া "মজা" দেখিয়াছে। যানবাহনের অসুবিধা দূর করা, বাহির হইতে মাল আমদানী করা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তব্য লইয়া তর্কের ব্যাপারে নিজ মতামত জোরপূর্ব্বক চালু করা প্রভৃতি কাজে ইহাদের শিথিলতার অন্ত ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের "খাদ্য-বিভাগ" বলিয়া কার্য্যের ভার লইতে লোকের অভাব ঘটিয়াছিল। লাট বাহাদুর সফর করিতে ব্যস্ত, অথচ তিনি কয়েক মাস এই দপ্তর হাতে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। যুদ্ধের চাপে কলিকাতা, তথা বাঙ্গালা দেশে অজস্র লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের খাদ্য সরবরাহের ভার লইলেন না; উপরন্তু রেল, বন্দর, বড় বড় কারখানা, চা বাগান, কর্পোরেশন, এ-আর-পি, সিভিক গার্ড ইত্যাদি, ইত্যাদি সকল কারবারকে বাজার হইতে চাউল ক্রয় করিবার সুযোগ করিয়া দিতে, হয় নির্দ্দেশ আর না হয় প্রকারান্তরে উৎসাহ দিয়াছেন। বৃহত্তর কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহের ভার বহু পূর্ব্ব হইতে ইহাদের লওয়া উচিৎ ছিল বলিয়া "সভ্যগণ" মত দিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকের সাহায্য করিতে উপযুক্ত সময় অন্তর্হিত হইতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া দুঃখ হয়; তাহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয়, আর্থিক অপ্রতুলতার অজুহাতে যাহা করা সমীচীন ছিল তাহা হয় নাই; আর পরে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা মূর্ত্তিমান হৃদয়হীনতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া "রিপোর্টে" বহু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে; ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তাহার আলোচনা সম্ভব নয়। ফলে ১৫ হইতে ২০ লক্ষ লোক মরিয়াছে (বে-সরকারী মতে অন্ততঃ ইহার দ্বিগুণ); অন্ততঃ এক কোটী লোকের স্বাস্থ্য, বিত্ত, ভবিষ্যতের আশা গিয়াছে; দেহ জীর্ণ হইয়া, অকাল বার্দ্ধক্য আসিয়াছে, উত্তমর্ণের তাগিদে জর্জ্জরিত হইতেছে, চারিদিকে ঘনায়মান অন্ধকার দেখিয়া মৃত্যুর দিন গণিতেছে।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের দাবী

জার্ম্মানীর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং জাপানের যুদ্ধও শেষ হইতে চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া জার্ম্মানীর যুদ্ধ শেষ হওয়ায় এখন ইয়োরোপে ব্রিটিশ জাতি নিশ্চিন্ত অবকাশে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং জাপানী যুদ্ধের সম্পর্কে তাহাদের দিক হইতে যত উদ্বেগই দেখা যাক, তাহা মূলতঃ ব্রিটেনের প্রাত্যহিক জীবনকে বিশেষ ব্যাহত করিতেছে না। ব্রিটেনের দিক হইতে যখন এইরূপ শান্তির সুযোগ আসিয়াছে ও ভারতের সীমান্ত হইতে যুদ্ধের ঢেউ যখন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, তখন এই দুই দেশের পুনর্গঠন কার্য্য একই সঙ্গে আরম্ভ হওয়া উচিত এবং সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে দেনাপাওনার বোঝাপড়ায় আর অনর্থক বিলম্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বলা বাহুল্য, যুদ্ধজয়ী ব্রিটেন তাহার মানসিক উদ্বেগহীন ও উৎফুল্ল জনসাধারণের স্বাভাবিক সহযোগিতা, পরাজিত শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ তহবিল মূলধন করিয়া পুনর্গঠনের যেরূপ সুযোগ পাইবে, ভারতের পক্ষে সেরূপ সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রিটেনে অবিরাম যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অনাহারে একজন ব্রিটিশ প্রজাকে মরিতে হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। নানাভাবে মাথা খেলাইয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ডে পণ্যাদির জোগান ও মুদ্রানীতির ভারসাম্য এমন চমৎকারভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই এবং ইহার কুফলসমূহের কোন আঘাত ব্রিটিশ জাতির দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহ-রীতিকে সমস্যাপূর্ণ করিয়া তুলে নাই। ভারতবর্ষের উপর কিন্তু এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ আঘাত না হইলেও যুদ্ধের পরোক্ষ চাপে ভারতের আর্থিক বনিয়াদ ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাবতঃ পরনির্ভরশীল এই দেশ যুদ্ধের আমলে মোটামুটি বাঁচিবার মত পণ্যাদির অভাবেও মারাত্মক দুঃখস্বীকার করিয়াছে এবং সরকারী দায়িত্বহীনতার অভিশাপে রাশি রাশি কাঁপাই টাকা শ্রেণীবিশেষের হাতে যাইয়া পড়ায় বাজারের স্বল্প পরিমাণ পণ্যাদি এত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে জনসাধারণ বাধ্য হইয়া এই সকল পণ্য ছাড়াই বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং যে ক্ষেত্রে অন্য কোন উপায় স্থির করিতে পারে নাই, সে ক্ষেত্রে বরণ করিয়াছে অপমৃত্যু। এইভাবে এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে ও নানাপ্রকার ব্যাধিতে কালগ্রাসে পতিত হইয়া সারা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলাকে করিয়াছে চরম বিপন্ন। এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, সরকার উৎসাহ করিয়া যদি অগ্রসর হন এবং নিজদায়িত্বে যদি ভারতবর্ষকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন, তবেই এখনও যাহারা এদেশে মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া বাঁচিবার স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহারা হয় ত আবার জীবন ফিরিয়া পাইতে পারে।

কিন্তু ভারতসরকার এদেশবাসীর বাঁচামরার সমস্যায় কতটা মাথা ঘামান, তাহা প্রকৃতই একটা জটিল প্রশ্ন। যে ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সহিত ভারতের ভালমন্দের সমস্যা একই সঙ্গে জড়ানো থাকে, সে সময় নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে স্বভাবতঃ ভারতসরকারের দৃষ্টি চলিয়া যায় সাত হাজার মাইল দূরে এবং ভারতবর্ষের শাসন করিবার মালিককে পালন করিবার সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়া অসহায় এদেশের সামান্য দুর্দ্দশা সময়োচিত প্রতিকারের অভাবে মারাত্মক হইয়া উঠে। ভারতের যুদ্ধকালীন এই যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, ভারতসরকার উপযুক্ত সহানুভূতি ও দূরদর্শিতা দেখাইলে এদেশের অবস্থা এতটা শোচনীয় অবশ্যই হইতে পারিত না। ভারতের সামান্য পণ্য হইতে ব্রিটেনের সুখসুবিধার জন্য একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, ভারত-সরকার আমেরিকাকে পণ্য জোগাইয়া আমেরিকার ডলার পাওনা এম্পায়ার-ডলার-পুলের মারফৎ ব্রিটিশ ষ্টার্লিংয়ে রূপান্তরিত হইতে দিয়াছেন এবং ব্রিটিশ সরকার ভারতের হিসাবের সেই ডলার দ্বারা আমেরিকা হইতে পণ্যাদি লইয়া গিয়া স্বদেশে রক্ষা করিয়াছেন পণ্যাদির চাহিদা ও জোগানে ভারসাম্য। ভারতসরকার ব্রিটেনকে এই যুদ্ধের সময় বহু কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় করিয়াছে এবং স্বাভাবিক মূল্য হিসাবে একটুকরো স্বর্ণ না পাইয়া—পাইয়াছেন ষ্টার্লিং সিকিউরিটি অথচ ভারতে সেই পণ্যের জোগানদারদের পাওনা স্বর্ণের জামিনবিহীন নোট ছাপাইয়া ভারতসরকার করিয়াছেন পরিশোধ। প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটি ব্রিটিশ ট্রেজারী বিলে লগ্নী করিয়া ভারতসরকার ঊর্দ্ধপক্ষে পাইতেছেন বার্ষিক শতকরা ১ টাকা হারে সুদ, অথচ যুদ্ধের খরচ মিটাইবার জন্য ভারতের সরকারী ঋণপত্রের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে এখন প্রায় ২ হাজার কোটি টাকায় পেঁছাইয়াছে এবং তজ্জন্য ভারতসরকারকে দিতে হইয়াছে গড়ে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হারে সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি। এই যুদ্ধের সময় ভারতে শিল্পাদি প্রতিষ্ঠার বহু সুবিধা ছিল, অভাবের দিনে দেশীয় জিনিষ ব্যবহার করিতে করিতে আমরা কতকটা অভ্যস্ত হইয়া যাইতাম, কিন্তু ভারতসরকার নানারূপ বিধি-নিষেধের প্রবর্তন করিয়া আমাদের শিল্পপ্রসারের ইচ্ছা অনেকাংশে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এক কথায় যুদ্ধের সময় সহানুভূতির অভাব দেখাইয়া ভারতবর্ষকে ভারতসরকার শুধু যে নিঃস্ব ও রিক্ত করিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাদের শুভেচ্ছার অভাবে দেশবাসীর মন বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের সম্বন্ধে একান্তভাবে বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

সাম্প্রতিক আশানুযায়ী ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে ভারতসরকারকে সর্ব্বপ্রথম এদেশের আর্থিক বনিয়াদ পুনর্গঠনের দিকে নজর দিতে হইবে। ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং ঋণ যে ব্রিটেন স্বেচ্ছায় অবিলম্বে শোধ করিবে, এখনও ব্রিটিশ সরকার বা ব্রিটিশ জনসাধারণের দিক হইতে সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। গত ব্রেটন উডস্ কনফারেন্সে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি লর্ড কেনেস যথাসম্ভব ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পরেই বৃটেনের পক্ষে দেনা শোধের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, কারণ আত্মরক্ষা করিতে হইলে তাহাকে সর্ব্বপ্রথম বহির্বাণিজ্য পুনর্গঠনে মনোযোগ দিতে হইবে। তারপর বিগত প্যাসিফিক রিলেসনস্ কনফারেন্সেও জনৈক পদস্থ ব্রিটিশ সরকারী কর্ম্মচারী পরিষ্কারভাবে বলেন যে, ভারতবাসী যদি বর্ত্তমানে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইবার আশায় শিল্পপ্রসারের পরিকল্পনাসমূহ রচনা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে হতাশ হইতে হইবে। এই সকল বিবৃতি হইতে অন্ততঃ এটুকু বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ব্রিটেন নিতান্ত নিরুপায় না হইলে ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধে মোটেই আগ্রহশীল হইবে না। শুধু ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইতে বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনাই আমাদের একান্ত দুর্ভাবনার কারণ নয়; সম্প্রতি ব্রিটেনের দিক হইতে এই ঋণের পরিমাণ কমাইবার জন্য অপচেষ্টাও দেখা যাইতেছে। কতকগুলি ব্রিটিশ সংবাদপত্র অভিযোগ করিয়াছে যে, ব্রিটেনকে পণ্যাদি জোগাইতে ভারতবর্ষ সেই পণ্যসমূহের জন্য যে মূল্য ধরিয়াছে তাহা ন্যায্য মূল্য নয় এবং এই বাড়তি দাম বাদ দিলে প্রকৃত পাওনার পরিমাণ অনেক কম হইবে। অবশ্য ভারতের সৌভাগ্য-ক্রমে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটি সংবাদপত্রের উপরিউক্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতসরকার ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের ক্রয়মূল্যের চেয়ে কমদামেই ব্রিটিশ সরকারকে পণ্য সরবরাহ করিয়াছে। ভারতে কাপড়ের মূল্য যখন শতকরা ৪ শত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তখনও ব্রিটিশ-সরকারের নিকট হইতে শতকরা ১শত ভাগের বেশী মূল্যবৃদ্ধি দাবী করা হয় নাই এবং ভারতে লৌহ ও ইস্পাত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইলেও ব্রিটিশ সরকার শতকরা মাত্র ২৭ ভাগ বাড়তি মূল্যে ভারত হইতে ইস্পাতাদি কিনিতে পারিয়াছেন। অবশ্য এইভাবে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইলেও ঋণের পরিমাণ কমাইবার অপচেষ্টা যখন একবার দেখা দিয়াছে তখন ভবিষ্যতে যে এই চেষ্টা পুনরায় নূতন কোনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে না এমন কথাও বলা চলে না। গত যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধ তহবিলে সাহায্যের নামে ভারতসরকার দরিদ্র ভারতের ১৯০ কোটি দান করিয়াছিলেন, এবারও যে অনুরূপ কোন সদ্‌বুদ্ধি ভারতসরকারের দেখা দিবে না, এখন হইতে সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া ভারতের নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশের মুদ্রামান ব্রিটিশ মুদ্রামানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহে টাকা ও ষ্টার্লিংয়ের বিনিময় হারে যদি কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহা হইলেও ভারতের পাওনার পরিমাণ এক কলমের খোঁচায় অনেকখানি কমিয়া যাইতে পারে।

এই সকল কারণে ভারতের ন্যায্য প্রাপ্য টাকাগুলি (যাহা সঞ্চিত হইবার জন্য ভারতের আর্থিক বিশৃঙ্খলা চরমে উঠিয়াছে) যাহাতে যথাসম্ভব ফিরিয়া পাওয়া যায় তজ্জন্য এ দেশের সরকারী অর্থবিভাগের অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা উচিত। ভারতবর্ষ যে অতি দরিদ্র দেশ এবং অকেজোভাবে আটকাইয়া রাখিবার মত যথেষ্ট অর্থ তাহার নাই ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী দেশ, যাহারা পৃথিবীর মোট স্বর্ণের শতকরা ৭৫ ভাগের মালিক, তাহারা পর্য্যন্ত ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন দেশকে যে টাকা ধার দিয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী আর্থিক উন্নয়ন কমিশনের মুখপাত্র মিঃ বেয়াউলে রুমল মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের যে যুদ্ধ সংক্রান্ত পাওনা জমিয়াছে তাহা অবিলম্বে পরিশোধিত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঋণ ও ইজারা সংক্রান্ত পাওনার মীমাংসাও শীঘ্র করিয়া ফেলিতে হইবে কারণ এই সকল ঋণ অনিশ্চয়তার উৎস এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সুপরিচালনার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমেরিকার মত সম্ভ্রান্ত এবং ধনী দেশও যখন পাওনা টাকা যুদ্ধ শেষ হইবার আগেই ফিরিয়া পাইবার জন্য আগ্রহ দেখাইতেছে, সেক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার একমাত্র অস্থিস্বরূপ লণ্ডনে সঞ্চিত ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের দাবী এখনই ভারতসরকারের করা উচিত এবং ঔদাসীন্যবশতঃ তাঁহারা যদি এই দাবী না জানান তাহা হইলে তাঁহারা যে এই অসহায় দেশের দুর্ভাগ্য আরও বাড়াইয়া দিবেন তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভারতের বাণিজ্য-জাহাজ সমস্যা

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে ঠিকাদারীর কাজ্‌করিয়া ভারতবর্ষ কিছু টাকা করিয়াছে সত্য, কিন্তু শিল্পাদি প্রসারের সুযোগ সুবিধা হয় নাই বলিয়া সেই টাকা মুষ্টিমেয় জনকয়েকের হাতে আটক পড়িয়া দেশে সুতীব্র মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিয়াছে। তবে যুদ্ধকালীন বাড়তি টাকায় ভারতে যে শিল্পপ্রসার সম্ভব হয় নাই তাহার জন্য অবশ্য ভারতবাসী ততটা দায়ী নয় যতটা দায়ী ভারতসরকারের অদূরদৃষ্টি আর ঔদাসীন্য। বরং বলিতে গেলে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় এখন প্রায় ৯ শত কোটি বাড়তি টাকা হাতে আসায় ভারতের অর্থশালী সমাজ সেই টাকা কাজ কারবারে খাটাইতে চান এবং প্রকৃতপক্ষে নানারূপ সরকারী বিধিনিষেধের চাপে শিল্পাদিতে যথেচ্ছ টাকা খাটাইবার সুবিধা পান না বলিয়াই তাহারা টাকাগুলি ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হন। এখনও ভারতে শিল্পোৎসাহ এত অধিক মাত্রায় বজায় আছে যে, সুবিধা পাইলেই ভারতবাসী ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া শিল্পাদিতে লগ্নী করিতে দ্বিধা করিবে না এবং যুদ্ধের কাঁপা টাকার দৌলতে এ দেশের সমৃদ্ধ ব্যাঙ্কগুলিও এই শিল্পপ্রগতিতে লক্ষণীয় সাহায্য করিতে পারিবে।

বর্ত্তমানে বড়লাট ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে মনে হয় যে ভারতের আর্থিক বনিয়াদ দুর্ব্বল করিয়া রাখিবার জন্য এতকাল ভারতসরকার যে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, অতঃপর তাঁহাদের সেই চেষ্টা কতকটা প্রতিরুদ্ধ হইবে। বলা বাহুল্য, এই আশা সত্য হইলে যুদ্ধোত্তরকালে এখনকার তুলনায় অনেক বেশী অসুবিধার মধ্যেও ভারতে উল্লেখযোগ্য শিল্পপ্রসার হইবে।

ভারতসরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তনের লক্ষণ যদি স্থায়ী হয় তাহা হইলে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা বা ডলার পাওনার সাহায্যেও এই শিল্পপ্রসারের পথ অনেকটা বাধাহীন করিয়া তোলা যাইতে পারে। যুদ্ধের পরে ভারতে শিল্পাদি প্রসারিত হইলে ভারতীয় পণ্যাদি রপ্তানী করিতে ও ভারতে পণ্যাদি আমদানী করিতে ভারতের একটা নিজস্ব জাহাজ শিল্প গড়িয়া উঠার প্রয়োজন, না হইলে পণ্যাদি বহনের ভাড়া বাবদ বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর লাভের কড়ি যোগাইতে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পাদির পক্ষে পৃথিবীর খোলা বাজারে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশের সহিত প্রতিযোগিতা চালানো সম্ভব হইবে না। এই জাহাজ শিল্পের সংগঠন এত গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতে শিল্পপ্রসারের যে কোন পরিকল্পনার অঙ্গাঙ্গীভাবে ভারতের নিজস্ব জাহাজ-শিল্প সংগঠনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা উচিত।

অবশ্য ভোগ্য পণ্য নির্ম্মাণের শিল্পসমূহ যত সহজে এবং শীঘ্র গড়িয়া উঠিবে, জাহাজী শিল্প হয়ত তত সহজে গড়িয়া তোলা চলিবে না। তবে দেরীতে হইলেও এই প্রয়োজনীয় শিল্পটির গঠনে অবহেলা দেখানো ভারতের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইবে। যতদিন নিজস্ব জাহাজ তৈয়ারীর পূর্ণাঙ্গ কারখানাগুলি গড়িয়া না উঠে, ততদিনের জন্য পৃথিবীতে বাণিজ্য চালাইবার উপযুক্ত জাহাজ সংগ্রহ করাই সমীচীন এবং এইভাবে সংগৃহীত জাহাজের সহিত নিজ কারখানায় নির্ম্মিত জাহাজগুলি যুক্ত হইয়া কালে ভারতকে জাহাজ শিল্পের দিক হইতেও জগতে সম্মানজনক আসন প্রদানে সমর্থ হইবে।

ভারতে শিল্পপ্রসারের প্রথম অবস্থায় বিদেশ হইতে শিল্পপণ্য উৎপাদন-উপযোগী যন্ত্রপাতি আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে বাণিজ্য জাহাজ ক্রয়ের চেষ্টাও দেখিতে হইবে। দেশবাসীর আগ্রহ অনুধাবন করিয়া ভারতসরকার যদি ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং হইতে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষভাবে বিলাতী যন্ত্রের জন্য ষ্টার্লিং বা মার্কিনী যন্ত্রের জন্য ডলার ব্যবহারের অধিকার লাভ করেন, তাহা হইলে সেই অর্থের একাংশ হইতেও পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকখানি বাণিজ্য জাহাজ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

সম্প্রতি রয়টারের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট নাকি যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই প্রায় ১৭৩ কোটি ডলার মূল্যের (প্রতি শত ডলার ৩৩২৸৹ আনা) কতকগুলি জাহাজ (এইগুলির মোট ভার বহনের ক্ষমতা ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টন) ন্যায়সঙ্গত ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিকট বিক্রয় করিবার একটি পরিকল্পনা করিতেছেনএবং যুক্তরাষ্ট্রের "হাউস অফ রিপ্রেসেণ্টেটিভসের" বাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কিত কমিটি উক্ত জাহাজ বিক্রয় সম্বন্ধে একটি বিল আলোচনা করিতেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমেরিকা যদি এইভাবে বিক্রয়ের জন্য বাণিজ্য জাহাজ বাজারে উপস্থিত করে তাহা হইলে ভারতের দাবী সর্ব্বাগ্রে স্বীকৃত হইবে, কারণ নিজস্ব জাহাজের অভাবে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল বহির্বাণিজ্যের দিক হইতে যে ভাবে আঘাত পাইয়াছে তাহার তুলনা হয় না। ষ্টার্লিং পাওনার একাংশ ডলারে রূপান্তরিত করিয়া ভারতসরকার যদি এই মার্কিনী জাহাজ ভারতের নামে কিনিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পপতিগণের অনেকেই নিজস্বার্থে এই বাণিজ্য জাহাজের সম্পূর্ণ মূল্য প্রদানে প্রস্তুত থাকিবেন। অবশ্য এ পর্য্যন্ত ভারতসরকারের এ সব ব্যাপারে যেরূপ ঔদাসীন্য দেখা গিয়াছে তাহাতে মনে করা কঠিন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এ ভাবে জাহাজ কিনিয়া ভারতীয় জাহাজশিল্প সংগঠনের প্রাথমিক সুযোগ ভারতসরকার করিয়া দিবেন। তবে সম্প্রতি নানা কারণে তাঁহাদের মধ্যে যেটুকু ঔদার্য্য প্রত্যক্ষ হইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতবাসীর নিজের হাতে গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার ভার ফিরিয়া আসিবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহাতেই আশা হয় যে, হয়ত যুক্তরাষ্ট্রের এই বিক্রীতব্য জাহাজের একাংশ ক্রয় করিতে সক্ষম হইয়া ভারতবর্ষ যুদ্ধোত্তর শিল্পপ্রগতির সহিত বাণিজ্য-প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের বাজারে কতকটা সুবিধা পাইবে।

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী

যুদ্ধের আগে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের ব্যবহারের শতকরা প্রায় ২½ ভাগ চাউল ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী হইত এবং এই চাউলের মূল্য অত্যন্ত সুলভ ছিল বলিয়া ভারতের বাজারে সাধারণ চাউলের দর মন প্রতি ৪।৫ টাকার বেশী হইতে পারিত না। ১৯৪২ সাল হইতে ব্রহ্মদেশ জাপকবলে ছিল এবং ব্রহ্মদেশীয় চাউলের অভাবে ও ভারতের উপর অতিথি অভ্যাগতের চাপ পড়ায় ভারতবর্ষে অন্নাভাব মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে এবং চাউলের মূল্যও হইয়াছে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় চতুর্গুণ। সম্প্রতি উত্তরব্রহ্ম ও আরাকান হইতে জাপসৈন্য বিতাড়িত হইবার ফলে ব্রহ্মদেশের উদ্বৃত্ত চাউল পুনরায় ভারতবর্ষে আমদানী হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। প্রকাশ, ব্রহ্মে নাকি প্রচুর ধান সঞ্চিত আছে, অথচ সেখানে চাউল করিবার যন্ত্রাদি এবং চাউল পাঠাইবার থলিয়া প্রভৃতির অত্যন্ত অভাব থাকায় সেই চাউল স্থানান্তরিত করা চলিতেছে না। তবে আশা করা হইতেছে যে, শীঘ্রই ভারত হইতে ঐ সকল দ্রব্য ব্রহ্মে পাঠান হইবে এবং ব্রহ্ম হইতে অল্পদিনের মধ্যেই ভারতে চাউল রপ্তানী সুরু হইবে। সম্প্রতি নিখিল ভারত বেতার কেন্দ্রের রেঙ্গুনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইতে ভারতে শীঘ্রই আনুমানিক ৫ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হইবার সম্ভাবনা আছে।

জাপানী দখলের সময় ব্রহ্মের ধানচাষ কতকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কাজেই স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় এই চার বৎসর ঐ দেশে কম শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই উৎপাদন হ্রাসের দরুণ উদ্বৃত্ত ধান্যের পরিমাণও কম হওয়া স্বাভাবিক এবং রপ্তানীও উপস্থিত কিছু কম হইবেই ? এইভাবে এমনিই ভারতে কম চাউল আসিবার সম্ভাবনা, তাহার উপর

সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেস জানাইয়াছেন যে ব্রহ্ম হইতে ভারত ছাড়া মধ্য ইউরোপের অন্নভোজী জাতিসমূহের জন্যও প্রচুর পরিমাণ চাউল রপ্তানী হইবে। এই সূত্রে আরও সংবাদ আসিয়াছে যে ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সাউথ-ইষ্ট-এশিয়া-কমাণ্ড নাকি ব্রহ্মের দুই বৎসরের উদ্বৃত্ত চাউল কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহাড়া ব্রহ্ম গভর্ণরের সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় এমন আভাষও পাওয়া গিয়াছে যে ব্রিটিশ মিনিষ্ট্রি-অফ-ফুড বা ব্রিটিশ সরকারের খাদ্যবিভাগ অতঃপর ব্রহ্মের উদ্বৃত্ত চাউলের রপ্তানীনীতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন। বলা বাহুল্য এই সকল সংবাদ পড়িলেই মনে হয় যে, ব্রহ্মের চাউল আমদানী দ্বারা ভারতের অন্নসঙ্কট সমাধানের যে আশা আমরা করিতেছি তাহা ফলপ্রসূ হইবার পথে অনেক বিঘ্ন দেখা দিবে। ব্রিটিশ সরকারের খাদ্যবিভাগ অথবা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে উদ্বৃত্ত চাউল পড়িলে তাহারা ভারতের দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের কথা মধ্য-ইউরোপের প্রয়োজনের চেয়ে যে অবশ্যই বড় করিয়া দেখিবেন, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মের উদ্বৃত্ত চাউলের কারবার প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের হাতে ছিল এবং সেইজন্য এই চাউল হইতে দরিদ্র ভারতবাসী গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ পাইত। বর্ত্তমানে সমস্ত কিছু ওলট পালট হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাত হইতে ব্রহ্মের চাউলের কারবার চলিয়া যাইবার এই যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, ইহাও অবশ্যই ভারতের স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক হইবে। অবশ্য ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা পরের কথা, উপস্থিত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভারত ব্রহ্মের চাউল আমদানীর উপর কতটা নির্ভর করিয়া আছে, তাহা লইয়া বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা আশা করি সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ, ব্রিটিশ সরকারের খাদ্যবিভাগ বা যে কেহই ব্রহ্মের চাউল হস্তগত করুন, ভারতসরকার তাঁহাদিগকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা ও চরম অভাবের কথা জানাইয়া এই দেশে অধিক পরিমাণ চাউল রপ্তানী করিতে সম্মত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ১।৭।৪৫

স্বপ্ন

ডাঃ শ্রীদুর্গারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক আলোচনা বা এই নির্দ্দিষ্ট স্বপ্নের বিষয় কোনও মন্তব্য না করিয়া উহা যথাযথ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম।

বর্ষাকাল। সন্ধ্যা আগত প্রায়। তখনও বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছে। অজানা গ্রামের কর্দ্দমাক্ত ক্ষুদ্র পথ দিয়া লক্ষ্যশূন্যভাবেই চলিয়াছি। স্বীয় পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন ব্যতীত আর কোনও আবরণ নাই। নগ্ন পদ। আজ আমি গৃহহীন, আশ্রয়বিহীন ও সর্ব্ব-পরিত্যক্ত, তাই চলিয়াছি। আজ আমার পথ ছাড়া আর গতি কি? কিন্তু বক্ষে আমার একটী জীর্ণ কায়া, অপরিচিতা, ক্ষুদ্র শিশুকন্যা, সে কে? আজ আর আমার বংশগত মর্য্যাদা, জাতিগত মান, বিদ্যাগত অভিমান এবং অর্থগত দম্ভ নাই। এ অবস্থা তাঁহারই দান, এরূপ একটী প্রশান্ত মনোভাবই যেন আমার সম্পূর্ণ সম্বল হইয়াছে। চারিধারে ধান্য ক্ষেত্র। উহার মধ্যের পথ দিয়া কেবলই চলিয়াছি। কিয়ৎকাল পরে সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর দেখিয়া, বালিকাটীকে বৃষ্টির কবল হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। ঐ কুটীরে পৌঁছাইবার জন্য রাস্তা ত্যাগ করিয়া একটা পুষ্করিণীর পাড় হইয়া ঘাটের দিকে কিঞ্চিৎ নামিয়া কুটীরের পথ ধরিয়া চলিয়া ক্রমে কুটীরের আচ্ছাদিত দাওয়ায় উঠিবামাত্র আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল—"নারায়ণ"। মুহূর্ত্তে গৃহ মধ্য হইতে কর্কশকণ্ঠে প্রতিউত্তর আসিল "দাওয়ায় কে? বেরিয়ে যা, এখনই গিয়ে লাঠি পেটা করব"। অভিমান এখনও বর্ত্তমান। মনে হইল উদরের যাতনা নিবারণ করা তো দূরের কথা, এমন কি, কিয়ৎকালের জন্য আশ্রয়ও ভগবানের সহ্য হইল না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে নিজ ভ্রম বুঝিলাম। তিনি যাকে আশ্রয়হীন করেন তাহার আশ্রয় তো নাই। নিশ্চিন্তভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পুষ্করিণীর পাড়ে উঠিবার সময় পদস্খলন হইল। নিমেষে কর্ম্ম অভিজ্ঞতাপ্রসূত [illegible] বালিকার অপঘাত মৃত্যুর বীভৎস দৃশ্য মানস নেত্রে উদিত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য, পড়িয়া গেলাম না। কে আমার পৃষ্ঠে হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিল। পূর্ব্বক্ষণে কর্কশকণ্ঠে যে বিতাড়িত করিয়াছিল, এ কি সেই ব্যক্তি? ইতস্তত চিন্তা করিয়া পশ্চাদভাগে তাকাইয়া দেখি, স্থানটী জনশূন্য। এ কাহার করস্পর্শ? বুঝিলাম। সর্ব্বস্ববিহীন অবস্থায়ও যে চিন্তা-দ্বন্দ্বের গুরুভার ছিল, তাহা নিমেষে অপসারিত হইল। অনুভূতি বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিল, কৃতজ্ঞতা আনিল গদগদ ভক্তি উচ্ছ্বাসে অশ্রুনীর, উদয় হইল চৈতন্য। অশ্রুবিগলিত নয়নে আবার পথে চলিলাম।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তাহার প্রতীচ্য মিত্রশক্তির একটা বিরোধ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সান্ ফ্রান্সিসকোর ভিটো সম্পর্কে কিছুতেই মীমাংসা হইতেছিল না; আড্রিয়াতিকের তীরে ত্রিয়েস্তের ব্যাপার লইয়া একটা খণ্ড যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল; পোল্যাণ্ড সম্পর্কে নূতন সমস্যা দেখা দেওয়ায় একটা বড় রকমের কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সোভিয়েট রুশিয়া আপোষের মনোভাব লইয়া তিনটি ক্ষেত্রেই মীমাংসা করিয়াছে। কোন বিষয়ে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির আসর হইতে সে সরিয়া আসিতে চায় না। তাহার প্রতীচ্য মিত্রশক্তিগুলির শাসনক্ষমতা যাহাদের হাতে, তাহারা অনেকেই যে প্রগতিপন্থী নয়, তাহা সোভিয়েট রুশিয়া জানে। তবু, তাহাদের সহিত এখন যথাসম্ভব সহযোগিতা করিয়া যুদ্ধোত্তর জগতে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রভাব কমাইতে সচেষ্ট হওয়াই তাহার নীতি। অনমনীয় মনোভাব লইয়া আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির আসর ছাড়িয়া গেলে প্রতিক্রিয়াপন্থীদেরই জয় হইবে।

সান্‌ফ্রান্সিসকো সম্মেলন

নয় সপ্তাহ অধিবেশন চলিবার পর সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের অবসান হইয়াছে। সম্মেলনে ৫০টি জাতির প্রতিনিধি জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহারা একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য কতকগুলি বিধান রচনা করিয়াছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বে শান্তি রক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, এবার প্রয়োজন হইলে, সামরিক শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে; প্রধান পাঁচটি শক্তির হাতে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; প্রথম মহাযুদ্ধের পর এক একটি প্রধান শক্তিকে কতকগুলি অঞ্চলে ম্যাণ্ডেটারী প্রভুত্বের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, এবার তাহার পরিবর্ত্তে ঐ ধরণের অঞ্চলে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে একটি ট্রাষ্টিসিপ্ কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।

সান্ ফ্রান্সিসকোয় রচিত সনদ ত্রুটিশূন্য হয় নাই; বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহাকে নিশ্চয়ই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা বলা চলে না।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ। শ্রমশিল্পে উন্নত দেশগুলির ধনিকরা পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলের অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিতে চায়; এই প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করে, তাহা হইতেই আন্তর্জ্জাতিকক্ষেত্রে হানাহানি ঘটে। কোন একটি দেশ বা কোন বিশিষ্ট মতবাদ যুদ্ধের হেতু হইতে পারে না। যুদ্ধের প্রকৃত কারণ—এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কাজেই কতকগুলি দেশের উপর যতদিন অন্যের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, এই সব দেশের অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা যতদিন উন্নত দেশগুলির ধনিক শ্রেণীকে প্রলুব্ধ করিবে, তত দিন বিশ্বে স্থায়ী শান্তি আসিবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে জাতি-সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল, আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনীর অভাবে উহা অন্তঃসারশূন্য হয়। সেই সঙ্ঘের ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ—উহার প্রধান পাণ্ডারা বিনা যুদ্ধে নিজ নিজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘকে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ইতালীর আবিসিনিয়া অভিযান প্রভৃতির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের অক্ষমতা সামরিক শক্তির অভাব নয়—এই অক্ষমতার মূলে ছিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবুদ্ধি। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের সক্রিয় বিরোধিতা করিতে হইলে চীনে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলে পাশ্চাত্য শক্তির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে মধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রের আত্মকর্ত্তৃত্বের দাবী অপ্রতিরোধ্য হইতে পারিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পুরাতন জাতি-সঙ্ঘে অত্যাচারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগের যে নির্দ্দেশ ছিল, তৎকালে জাপান ও ইতালীর বিরুদ্ধে সে ব্যবস্থাও প্রযুক্ত হয় নাই।

নূতন বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হয় নাই। অথচ, আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে স্বভাবতঃই আশঙ্কা হয়—পুরাতন জাতি-সঙ্ঘের কেবল কূটনৈতিক গুরুত্বকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহারের সুবিধা ছিল; এবার হয়ত নূতন বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানের সামরিক শক্তিও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবে।

কিন্তু আশার কথা এই যে, এবার বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি প্রধান পাণ্ডা সাম্রাজ্যবাদী নয়। সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই জানেন—মঃ মলোটভ্ সান্ ফ্রান্সিস্কোতে দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, পরাধীন রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা লাভ না করিলে জগতে স্থায়ী শান্তি আসিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ভণ্ডামীর মুখোস এইভাবে খুলিবার মত শক্তিও এবার বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানে রহিয়াছে। মঃ মলোটভ্ মূল অধিকারের ঘোষণায় প্রত্যেক মানুষের কাজ করিবার অধিকার ও শিক্ষা পাইবার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করাইতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান শক্তি সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ-বিরোধী এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনে যথেষ্ট প্রগতি শক্তি না থাকায় সোভিয়েট রুশিয়ার এই সব প্রগতিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কিন্তু বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের এই প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। প্রধান পাঁচটি শক্তির মধ্যে বৃটেন ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রূপ সত্বর পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা অবশ্য অল্প। বৃটেনে আসন্ন নির্ব্বাচনে সেখানকার রাজনীতিক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্ত্তন ঘটিবার আশা নাই। কিন্তু ফ্রান্সের রাজনীতির স্রোত ক্রমেই আরও প্রগতিমুখী হইবে। চীন শ্রমশিল্পে অনুন্নত দেশ; তাহার স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। অদূর ভবিষ্যতে চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক একতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। কাজেই ভবিষ্যতে সে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আঁচল ধরিয়া আর চলিবে না। এই ভাবে শীঘ্রই ফ্রান্স ও চীন সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতির ঐকান্তিক সমর্থক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহার পর, বর্ত্তমানে সিকিউরিটী এসেম্বলীতে আমেরিকার অনুরক্ত কতকগুলি দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র এবং বৃটেনের অনুরক্ত কতকগুলি মধ্য-প্রাচ্যের রাষ্ট্র যোগ দেওয়ায় এই দুইটি শক্তির বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই সুবিধা চিরদিন থাকিবে না—অদূর ভবিষ্যতে এসেম্বলীতেও প্রগতিশীল শক্তির সংখ্যা বাড়িবে।

এবার বড় বড় শক্তিকে বেশী ক্ষমতা দেওয়ায় অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের ভণ্ডামী ব্যর্থ করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট উপায় থাকিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে জগতে অশান্তি সৃষ্টি করে বড় বড় শক্তি; ছোট ছোট শক্তির বিরোধের মূলেও থাকে ইহারা। ইহারাই ইচ্ছা করিলে জগতে শান্তি রক্ষা করিতে পারে। ছোট শক্তিগুলি এক একটা বড় শক্তির আঁচল ধরিয়া চলে; আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহারা যদি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে বড় বড় শক্তির সমান অধিকার পায়, তাহা হইলে বড় শক্তিগুলি নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহাদিগকে শিখণ্ডীরূপে ব্যবহার করিবার সুবিধা হয়। বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের সনদে বড় শক্তিগুলির হাতে ভিটোর ক্ষমতা দেওয়ায় বাস্তব অবস্থাকেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ছোট ছোট শক্তির ভোট লইয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির খেলা করিবার সুযোগ বন্ধ করা হইয়াছে।

সান্-ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ইহা অপেক্ষা উত্তম ফল বর্ত্তমান অবস্থায় আশা করা যায় না। সম্মেলনে সমবেত বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিজ নিজ রাজনৈতিক অবস্থা সম্মেলনের সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। সান্ ফ্রান্সিসকোয় যে সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশেই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হাতে। কাজেই, এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে প্রগতিমূলক হইতে পারে না। তবে, ষ্টালিন-টিটো-বেনেসের দেশের প্রতিনিধি যে সান্-ফ্রান্সিসকোয় ছিলেন, তাহার পরিচয় সম্মেলনের সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়। ইডেন্-স্মাট্‌স্-ষ্টেটিনিয়াসের দেশের প্রভাবও উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

পোলিস্ সমস্যার সমাধান

এবার পোলিস্ সমস্যার সত্যই মীমাংসা হইয়াছে; কয়েকজন নূতন সদস্য লইয়া অস্থায়ী পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের (লুব্‌লিন্) বিস্তার সাধিত হইয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকা সত্বর এই গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইবে। তাহাদের আপত্তির কারণ এখন দূর হইয়াছে। বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধি নূতন গভর্ণমেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচনে মধ্যস্থতা করিয়াছেন।

ষোল জন পোলিস্ প্রতিনিধিকে সোভিয়েট সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করিয়াছেন শুনিয়া মিঃ ইডেন ও ষ্টেটিনিয়াস্ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কথা প্রকাশ পাইবার পর তাঁহারা মঃ মলোটভের সহিত পোল্যাণ্ড সম্পর্কে আর আলোচনা করিতে সম্মত হন নাই। সোভিয়েট রুশিয়া প্রকাশ্যে বিচারের ব্যবস্থা করিয়া এই পোলিস্ ধুরন্ধরদের স্বরূপ বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছে। লণ্ডনের আশ্রিত পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত পরিচয়ও এই বিচারে প্রকাশ পাইয়াছে; তাহাদের "হিরো" জেনারল বর জীবটিকেও বিশ্ববাসী চিনিয়াছে। ওয়ার্স'য় বিদ্রোহের সময় লালফৌজ কেন বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় নাই, তাহার উত্তরও এই বিচারে মিলিয়াছে।

লণ্ডনের পিঁজরাপোলে অবস্থিত পোল্যাণ্ডের জমিদার-গভর্ণমেণ্টের এবার সত্যই সমাধি হইয়াছে। তাহারা এখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে তাহাদের মিথ্যা অধিকার সম্বন্ধে জগতের কাছে কাঁদুনী গাহিবার সিদ্ধান্ত করিতেছে। তাহারা এখনও বুঝিতেছে না (অবশ্য বোঝা স্বাভাবিকও নয়) যে, বিভিন্ন দেশে তাহাদের স্বগোত্র শ্রেণীর আসন টলিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর হতভাগ্য জীব এখনও লণ্ডনের পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের জন্য মায়াকান্না কাঁদিতেছে। এই কান্নার প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে লণ্ডন পোলদের সত্যকার রূপ জানিবার জন্য তাহাদের একটু পরিশ্রম করা উচিত। এই জীবগুলি ওকুলিকি ও তাহার সহকর্ম্মীদের বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় সোভিয়েট রুশিয়ার বিচার-পদ্ধতির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছে। তাহাদের জানা উচিত—বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক ও প্রতিনিধিদের সমক্ষে এই বিচার হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া হইতে সংবাদ প্রেরণের অসুবিধা থাকিতে পারে। কিন্তু এই সব সাংবাদিক ও প্রতিনিধিকে সোভিয়েট রুশিয়া বন্দী করিয়া রাখে নাই। তাহারা রুশিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসিয়া ত "প্রকৃত তথ্য" ফাঁস করিয়া দিতে পারে! সোভিয়েট রাশিয়ায় দেশদ্রোহের বিচার সম্বন্ধে তৎকালে যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জন্ গান্থার এই যুক্তি দেখাইয়াছেন।

ত্রিয়েস্ত প্রসঙ্গ

গত মাসে ত্রিয়েস্ত প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ত্রিয়েস্ত সমস্যার আপাততঃ মীমাংসা হয় নাই। মার্শাল টিটো ত্রিয়েস্ত অঞ্চলে সৈন্য রাখিবার জন্য জিদ্ করেন নাই। তবে, ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে যুগোস্লেভিয়ার

দাবী তিনি ত্যাগ করেন নাই। শান্তি বৈঠকে এই অঞ্চল সম্পর্কে যুগোস্লোভিয়ার পক্ষ হইতে দৃঢ়তার সহিত দাবী উত্থাপিত হইবে।

বৃটেনে আসন্ন নির্ব্বাচন

মিঃ চার্চ্চিল চাহিয়াছিলেন—জাপান পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন স্থগিত থাকুক। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের ব্যাপারে তিনি কতকটা গুছাইয়া লইতে পারিবেন। শ্রমিক দল নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিতে সম্মত না হওয়ায় তিনি কোয়ালিসন গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া অবিলম্বে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার আশা—ইউরোপীয় যুদ্ধের বিজয়ে তাঁহার যে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে, তাহার সুযোগে রক্ষণশীল দল অনায়াসে নির্ব্বাচন বৈতরণী পার হইবে।

শ্রমিক দলের নির্ব্বাচনী ধ্বনি—মূলশিল্প, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিব, একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তন করিব, সর্ব্বতোভাবে জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব। রক্ষণশীল দলের পাণ্টাধ্বনি—আমরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিব; সোস্যালিষ্ট দল বৃটিশ জাতির এই অধিকার হরণ করিতে যাইতেছে।

যুদ্ধের সময় বৃটেনের শ্রমিক দলের শক্তি বাড়িয়াছে। সাধারণ নির্ব্বাচনে এই শক্তির পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। কিন্তু শাসনক্ষমতা লাভ করিবার উপযোগী সাফল্য তাহাদের হইবে কিনা, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ—রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই, বিরুদ্ধ পক্ষে এই বিভেদের সুযোগ রক্ষণশীলরা বিশেষভাবে গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া, বৃটিশ জনসাধারণ এখনও যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে না। কাজেই, এই সময় শাসন-ব্যবস্থায় একটা বড় পরিবর্ত্তন তাহারা হয় ত চাহিবে না। মিঃ চার্চ্চিলের ব্যক্তিগত প্রভাবও রক্ষণশীলদের বিশেষ উপকারে আসিবে। শ্রমিক দল যে নির্ব্বাচনী কর্ম্মসূচী উপস্থাপিত করিয়াছে, বৃটিশ জনসাধারণের দৃষ্টিতে উহা পরীক্ষামূলক। বৃটিশ জাতির প্রকৃতি রক্ষণশীল; পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থার প্রতি তাহারা সহজে আকৃষ্ট হয় না। কাজেই, পুরাতন ব্যবস্থা যে যুদ্ধোত্তরকালীন সমস্যাগুলি সমাধান করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম—ইহা কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ জাতি শ্রমিক দলের প্রগতিমূলক কার্য্যসূচী সমর্থন করিবে কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। মনে হয়, বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের হাতে ক্ষমতা আসিবার পর তাহারা যখন জনসাধারণের বিভিন্ন দাবী পূরণ করিতে অসমর্থ হইবে, তখনই বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রকৃত সুযোগ আসিবে। এই নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল যদি জয়ী হয়, তাহা হইলেও শীঘ্র বৃটেনে আবার নির্ব্বাচন হওয়া সম্ভব; পাঁচ বৎসর রক্ষণশীল দল হয়ত টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

সারিয়া ও লেবনেন

সারিয়া ও লেবনেনের সমস্যা এখনও মেটে নাই। সোভিয়েট রুশিয়া, চীন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত বৈঠকে সমগ্র মধ্য-প্রাচ্যের প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বৃটেন ও আমেরিকা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যে মাতব্বরি করিবার অধিকারকে তাহারা অন্যের সহিত ভাগাভাগি করিতে চায় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এখন সোভিয়েটের প্রভাব বিস্তৃতি নিবারণের জন্য মধ্য-প্রাচ্যকে প্রাচীররূপে ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বাণ্টিক রাজ্যগুলি ও বল্কান অঞ্চল যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, যুদ্ধোত্তরকালে মধ্য-প্রাচ্যকে সেই উদ্দেশ্যে তাহারা ব্যবহার করিতে চায়। কাজেই, এই অঞ্চলের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সোভিয়েট রাশিয়াকে ডাকিতে তাহারা সম্মত হইতে পারে না। ফ্রান্স একাকী এখন লেভান্ত রাজ্যের সহিত একটা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছে।

সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ

ওকিনাওয়ার প্রচণ্ড সংগ্রাম শেষ হইয়াছে, ছয় মাস যুদ্ধের পর ফিলিপাইনসের লুজন দ্বীপে মার্কিণ সেনা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বোর্ণিও দ্বীপে অষ্ট্রেলিয়ান্ সেনাবাহিনী অবতরণ করিয়াছে। ইহাই সুদূর প্রাচ্যের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খাস জাপানে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ সমান ভাবেই চলিতেছে।

জাপানীরা যেরূপ দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করিতেছে, তাহাতে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবার সম্ভাবনা খুব অল্পই। সুদূর-প্রাচ্যের যুদ্ধে শেষ পর্য্যায়ে উভচর অভিযান চলিবে খাস জাপানে, খাস চীনে এবং মালয়ে। এই তিনটি অভিযান অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। এই সব অভিযান আরম্ভ হইবার পর বলা চলিবে যে, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে।

১।৭।৪৫

লাল-কাকাতুয়া *

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনাম হইতে প্রেরিত এ উপহার
লাল-কাকাতুয়া,—রং দেখিবার মত;
পীচ্-কোড়কের মত লাল রং তার,
মানুষের ভাষা ব'লে যায় অবিরত।

তার সাথে তারা করে একই ব্যবহার
যেমন করিল বিজ্ঞ বাগ্মী জনে;
শক্ত খাঁচায় বন্ধ করিয়া দ্বার—
বন্দী করিয়া রেখে দিল সযতনে।

* চীনা-কবি পো চু-ইর কবিতার অনুবাদ।
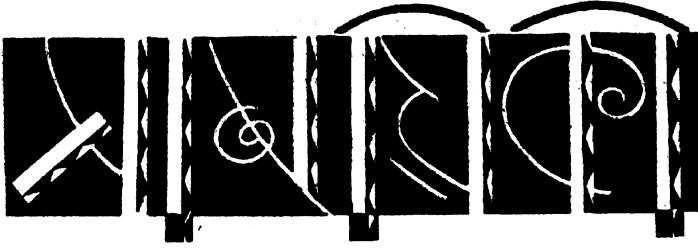
সিমলায় নেতৃ-সম্মিলন—

গত ২৫শে জুন হইতে সিমলায় লাটপ্রাসাদে নেতৃ-সম্মিলন আরম্ভ হয়। প্রথমেই বড়লাট এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আলোচ্য বিষয় সকলকে বুঝইয়া দেন। মহাত্মা গান্ধী সম্মিলনে যোগদান করেন নাই—রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ ও বাকী ২০জন নিমন্ত্রিত নেতা উপস্থিত ছিলেন। ২৫, ২৬ ও ২৭শে জুন তিন দিন ধরিয়া সকল নেতা নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। ২৭শে তারিখে কংগ্রেসের সহিত রফা করিবার জন্য মিঃ জিন্না একদিন সময় চান। সেজন্য ২৮শে সম্মিলনের সভা বন্ধ রাখা হয়। ২৯শে সম্মিলন বসিলে ঘোষণা করা হয় যে কংগ্রেস ও মুসলেম লীগ বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদের সদস্য মনোনয়ন ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই। ২দিন ধরিয়া পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া বিফল হইয়াছেন। মিঃ জিন্না ভারতবাসী সকল মুসলমানের নিজেকে একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া মনে করেন। কংগ্রেস তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কাজেই শুক্রবার (২৯শে) সম্মিলনে বড়লাট ঘোষণা করেন, তিনি সকল দলের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রস্তাবিত নামের তালিকা গ্রহণ করিবেন। ৬ই জুলাই সেই তালিকা বড়লাটের নিকট নেতারা পেশ করিবেন। বড়লাট ঐ তালিকা হইতে বাছিয়া নিজ পছন্দ মত শাসন পরিষদ গঠিত করিবেন ও ১৪ই জুলাই পুনরায় সম্মিলনে মিলিত হইয়া নূতন পরিষদের সদস্যগণের নাম ঘোষণা করিবেন।

হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে সম্মিলনে কোন প্রতিনিধি আহুত না হওয়ায় সম্মিলনে সে কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। 'কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, কংগ্রেসকে শুধু হিন্দুদের প্রতিনিধি মনে করা খুবই অন্যায় হইয়াছে। কংগ্রেস ভারতের সকল জনগণের প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান, কাজেই সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। ক্রমে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সে কথা বুঝিতে পারিতেছেন। মিঃ জিন্না যে অন্যায় জিদ করিতেছেন, সে কথাও নাকি বড়লাট মিঃ জিন্নাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

২৯শে তারিখে সম্মিলন স্থগিত হইলে তখনই রাষ্ট্রপতি, পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে সিমলায় আহ্বান করেন। জহরলাল ১লা জুলাই সিমলায় পৌছিয়াছেন। ২রা তারিখে বড়লাটের সহিত জহরলালের ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ধরিয়া এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। ৩রা জুলাই হইতে সিমলায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা চলিতেছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া একটি নামের তালিকা বড়লাটকে দেওয়া হইবে। তাহাতে কংগ্রেসের লোক ছাড়াও বহু যোগ্য ব্যক্তির নাম থাকিবে। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, নূতন শাসন পরিষদে যাহাতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই শুধু গ্রহণ করা হয়, সেজন্য সকল দলেরই চেষ্টা করা উচিত। সেজন্য কংগ্রেস নিজেদের দল ছাড়াও যাঁহাদের ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহাদের সকলের নাম বড়লাটকে জানাইয়া দিবেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ১৫ জনের নাম দাখিল করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে—(১) মৌলানা আজাদ (২) মিঃ আসফ আলি (৩) পণ্ডিত নেহেরু (৪) সর্দ্দার পেটেল (৫) রাজেন্দ্রপ্রসাদ (৬) মিঃ জিন্না (৭) লিয়াকৎ আলি খাঁ (৮) নবাব ইসমাইল খাঁ (৯) মুনিস্বামী পিলাই (১০) রাধানাথ দাস (১১) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১২) গগনবিহারীলাল মেটা (১৩) রাজ-কুমারী অমৃত কাউর (১৪) তারা সিং (১৫) সার আর-দেশীর দালাল। বাঙ্গালা দেশের প্রতিনিধিত্বের কথা আলোচনার জন্য বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত কিরণ-শঙ্কর রায় মহাশয়কে সিমলায় আহ্বান করা হইয়াছে ও তিনি তথায় গিয়াছেন। সম্মিলনে বাঙ্গালার ডক্টর

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার নাজিমুদ্দীন, রাষ্ট্রপতি আজাদ আছেন। মৌলানা আজাদের সঙ্গে তাঁহার সেক্রেটারী অধ্যাপক হুমাউন কবীর সিমলায় বাস করিতেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য হিসাবে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সিমলায় গিয়াছেন। বাঙ্গালার দাবী যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, সেজন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছেন। মিঃ জিন্না ৯ই জুলাই বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে বড়লাট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহাকে সমগ্র ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার না করায় তিনি মুসলেম লীগের পক্ষ হইতে কোন নামের তালিকা পেশ করিবেন না।

বোধহয় ৬ই জুলাই সকল দলের নিকট হইতে নামের তালিকা পাইয়া বড়লাট সে বিষয়ে সকল নেতার সহিত পৃথকভাবে আলোচনা করিবেন ও আলোচনার শেষে সকলকে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করিয়া নিজে একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া ১৪ই জুলাই নেতৃ সম্মিলনে তাহা প্রকাশ করিবেন। তাহার পূর্ব্বে নূতন শাসন পরিষদের সদস্যদের নাম জানা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

আপোষ চেষ্টা—

১৪ই জুন সন্ধ্যায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাঁহার বিবৃতি প্রকাশ করেন। ঐ বিবৃতিতে বলা হয়, ভারতীয় নেতাদের সহিত আপোষ করিবার জন্য তিনি বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন—তখনই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ধৃত সদস্যগণকে মুক্তি দেওয়া হয় ও ভারতীয় নেতাদের লইয়া ২৫শে জুন সিমলায় এক বৈঠক স্থির হয়। ঐ বৈঠকে বড়লাট সভাপতিত্ব করিবেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনভার বৈঠকে সম্মিলিত নেতাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যগণের উপর অর্পণ করা হইবে। শুধু বড়লাট পরামর্শদাতা হিসাবে ও জঙ্গীলাট সমরসচিব হিসাবে ঐ পরিষদের সদস্য থাকিবেন। নূতন শাসন পরিষদকে নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে হইবে। (১) যতদিন না জাপান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়, ততদিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা (২) বৃটীশ ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালন—যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্য সম্পাদন—নূতন স্থায়ী শাসনতন্ত্র গঠন (৩) কি ভাবে নূতন স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে তাহা স্থিরীকরণ। যতদিন না স্থায়ী ব্যবস্থা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই অস্থায়ী ব্যবস্থা চলিবে। কেন্দ্রে নূতন শাসন পরিষদ গঠিত হইলে প্রদেশসমূহেও নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে বা পুরাতন (ভাঙ্গিয়া দেওয়া) মন্ত্রিসভাগুলিকে কাজ করিতে দেওয়া হইবে। নূতন কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক শাসনপরিষদ পরে অন্যান্য কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তিদান করিতে পারিবেন। কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থাও নূতন মন্ত্রীদের করিতে হইবে।

সিমলায় নেতৃ-সম্মিলনে বড়লাট নিম্নলিখিত ২১ জনকে প্রথমে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—(১) মহাত্মা গান্ধী (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস) (২) মিঃ এম-এ জিন্না (নিখিল ভারত মুসলেম লীগ) (৩) শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই (কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসীদলের নেতা) (৪) নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ (কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলেম লীগ দলের ডেপুটী নেতা) (৫) ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কেন্দ্রীয় পরিষদে জাতীয় দলের নেতা) (৬) সার হেনরী রিচার্ডসন (কেন্দ্রীয় পরিষদে ইউরোপীয় দলের নেতা) (৭) শ্রীযুক্ত জি-এস মতিলাল (রাষ্ট্রীয় পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা) (৮) মিঃ হোসেন ইমাম (রাষ্ট্রীয় পরিষদে মুসলীম লীগ দলের নেতা)। এই ৮জন ছাড়া ১১টি প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী (যাঁহারা ছিলেন ও আছেন)—(৯ শ্রীযুক্ত বি-জি খের (বোম্বাই) (১০) শ্রীযুক্ত রাজাগোপালচারী (মাদ্রাজ) (১১) শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পন্থ (যুক্তপ্রদেশ) (১২) পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লা (মধ্যপ্রদেশ) (১৩) শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (বিহার) (১৪) পার্লাকামেদীর মহারাজা (উড়িষ্যা) (১৫) খাজা সার নাজিমুদ্দীন (বাঙ্গালা) (১৬) সার সাদুল্লা (আসাম) (১৭) সার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা (সিন্ধু) (১৮) মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ (পাঞ্জাব) (১৯) ডাক্তার খান সাসাহেব (সীমান্ত প্রদেশ)। অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—(২০) মাষ্টার তারা সিং (শিখ) ও (২১) রাও বাহাদুর শিবরাজ (তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়)। ইহার পর মহাত্মা গান্ধী নিজেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলিয়া অস্বীকার করায় তাঁহার নির্দ্দেশে বড়লাট কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদকে সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

১৫ই জুন মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে জানান যে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি নহেন—কাজেই কংগ্রেস সভাপতিকে নিমন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ঐ সঙ্গে মহাত্মাজী বড়লাটের একটি ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন। বড়লাট সকল প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করেন বটে, কিন্তু বর্ণহিন্দুর প্রতিনিধিরা বাদ পড়িয়া যায়। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হওয়া কংগ্রেসের কর্ত্তব্য নহে। সম্মিলনে হিন্দুদের কোন প্রতিনিধি আহুত না হওয়ায় দেশের সর্ব্বত্র বড়লাটের এই পক্ষপাতিত্বের তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তারযোগে বড়লাটের যে আলোচনা হয়, তাহার ফলে বড়লাট একদিকে যেমন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদকে নেতৃ-সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিতে সম্মত হন, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার বিবৃতিতে 'বর্ণহিন্দু' কথাটির উল্লেখ থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তিনি শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে 'বর্ণহিন্দু' সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি না বলিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লয়েন। মিঃ জিন্না সম্মিলনের তারিখ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলে বড়লাট তাহাতে সম্মত হন নাই।

২৩শে জুন মৌলানা আজাদ ও শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই সিমলায় উপস্থিত হন। ২৪শে জুন সিমলায় মহাত্মা গান্ধী বড়লাট প্রাসাদে বড়লাটের সহিত আলোচনা করেন ও বড়লাট পত্নীর সহিত কথা বলেন। ঐদিন মৌলানা আজাদ দেড় ঘণ্টাকাল বড়লাটের সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার সময় পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ও অধ্যাপক হুমাউন কবীর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মিঃ জিন্নাও ঐদিন বড়লাটের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড়লাটের আলোচনার ফলে স্থির হয় যে গান্ধীজি সিমলায় নেতৃ-সম্মিলনে যোগদান করিবেন না—তবে যতদিন না সম্মিলন শেষ হয় ততদিন সিমলায় উপস্থিত থাকিবেন এবং যাহার যখন প্রয়োজন হইবে, তখন তাঁহাকে পরামর্শ দিবেন।

বড়লাটের আন্তরিকতা—

স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার দেশবাসী চিরদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর প্রস্তাব মত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই পরিষদের মুসলেম-লীগ দলের ডেপুটী নেতা নবাব লিয়াকৎ আলি খাঁর সহিত একযোগে আপোষের যে প্রস্তাব করেন, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার আপোষ প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়াছেন। দেশাই-লিয়াকৎ প্রস্তাবই লর্ড ওয়াভেলের বর্ত্তমান প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত দেশাই গত ১২ই জুন পাঁচগণিতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ প্রস্তাবটি গান্ধীজিকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। গান্ধীজি উহার যৌক্তিকতা সমর্থন করায় এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত দেশাই-এর উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তাহার পর গত ২১শে জুন বোম্বায়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই তাঁহার প্রস্তাব সকলকে বুঝাইয়া দিয়া লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। বড়লাট তাঁহার প্রস্তাবের মধ্যে যে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ভুলাভাই সে বিষয়ে সকল কংগ্রেস নেতাকে নিঃসন্দেহ করায় সকলে সিমলা বৈঠকে যাইতে সম্মত হন। হিন্দু মহাসভাদল বড়লাট কর্ত্তৃক বৈঠকে নিমন্ত্রিত না হওয়ার জন্য বড়লাট মহাত্মা গান্ধীর নিকট ত্রুটি স্বীকার করায় এ বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যায়। বড়লাট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে মাহাত্মা গান্ধীকে সিমলায় লইয়া যাইবার জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার আন্তরিকতা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

নূতন অধ্যাপক নিয়োগ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি দুইজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিককে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। (১) ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইনি বহু বৎসর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাকে ১৩শত মাসিক বেতনে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। (২) ডক্টর নীলরতন ধর—ইনি বহুদিন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের সরকারী শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালকের কাজও করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মাসিক হাজার টাকা বেতনে কৃষিবিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করা

হইয়াছে। উভয়েই তাঁহাদের বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারিবেন।

তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ—

নেতৃ-সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই হইতে সিমলা পর্য্যন্ত রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মৌলানা আজাদ, শ্রীযুক্ত পন্থ প্রভৃতি উড়োজাহাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বোম্বাই হইতে সিমলা গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী প্রমুখ কয়েকজন মহাত্মা গান্ধীর সহিত একই ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অসুস্থ শরীর লইয়া মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে এই দারুণ গ্রীষ্মে রাজপুতানার মরুভূমির মধ্য দিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই বুঝা যায়। পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে তাঁহার দর্শন-প্রার্থীর দল এত অধিক গোলমাল করিয়াছে যে তাঁহার পক্ষে দুই দিনে একটুও নিদ্রা যাওয়া সম্ভব হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, দেশের জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার জন্য তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে গমন করিয়া থাকেন। এবার তাঁহার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে ডক্টর সুশীলা নায়ার, সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ও পুত্র শ্রীযুক্ত মণিলাল গান্ধী ছিলেন। সিমলায় অবস্থানকালেও তাঁহাকে প্রত্যহ বহু দর্শনার্থীর নিকট দর্শন দিতে হইতেছে। সম্মিলনের সকল সংবাদ রাখিয়াও তিনি সারাদিন নিয়মিত কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। এই বয়সে তাঁহার কর্ম্মশক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া থাকেন।

পণ্ডিত জহরলাল সম্বর্দ্ধনা—

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি একদিন পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় জনপ্রিয়তার দিক দিয়া পণ্ডিতজী গান্ধীজি অপেক্ষা অধিক সাফল্যলাভ করিয়াছেন। যাঁহারা বোম্বায়ে, এলাহাবাদে ও সিমলায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ছাড়া অপরে পণ্ডিতজীর জনপ্রিয়তার পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। পণ্ডিতজী যখন বোম্বায়ে পৌছেন (কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ২১শে জুনের সভায় যোগদানের জন্য) তখন তথায় খুব বৃষ্টি হইতেছিল; তাহা সত্ত্বেও সমস্ত পথ ও ষ্টেশনে এত লোকারণ্য হইয়াছিল যে পণ্ডিতজীকে মোটর গাড়ীর ছাদে চড়িয়া পথে যাইতে হইয়াছে। এলাহাবাদে ফিরিয়াও তিনি বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। গত ১লা জুলাই সিমলায় পৌছিলে তাঁহাকে যেভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে, তাহা সিমলার লোক কখনও কল্পনাও করে নাই। কাল্কা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত সমস্ত পথ জনাকীর্ণ ছিল এবং সিমলা সহরের পথে এত জনতা ছিল যে পণ্ডিতজীকে গাড়ী ছাড়িয়া জনতার মধ্য দিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। প্রকাশ, তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়া পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইবেন। ঐ বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম কর্ম্মনিষ্ঠা, অনমনীয় দেশপ্রীতি, তাঁহাকে সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই জয়যুক্ত করিবে বলিয়া তাঁহার দেশবাসী সকলের বিশ্বাস আছে।

যুবমঙ্গল পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন—

গত ৩রা জুন অপরাহ্নে বুড়ুল যুব-মঙ্গল পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। গীতিকবি শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় প্রধান অতিথি হন। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার করাল প্রভৃতি অনেকেই বক্তৃতা দেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে পাঠাগারের উদ্দেশ্য, গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও গ্রামবাসীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। সভায় বহু জনসমাগম হয়।

গান্ধীজির আশীর্ব্বাদ—

মিঃ রজনী পামী দত্ত নামক একজন ভারতবাসী বিলাতে পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে ভারতসচিব মিঃ এল-এস্-আমেরীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নির্ব্বাচনে সাফল্য কামনা করিয়া তাঁহাকে এক তার করিয়াছেন। মিঃ ফ্রেনার ব্রকওয়ে নামক

একজন শ্বেতাঙ্গ ভারতবন্ধু বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের নির্ব্বাচন কেন্দ্রে তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে যাইবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীর আদেশ প্রার্থনা করেন। উত্তরে মহাত্মাজী জানাইয়াছেন—"বিলাতে যে দল ভারতের ও অন্যান্য পরাধীন দেশের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিতেছে বা করিবে, আমি শুধু তাহাদেরই জয় লাভ কামনা করিব। ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত জার্ম্মানীর বা জাপানের নিকট জয়লাভ নিরর্থক হইবে।"

সেল-ট্যাক্স বৃদ্ধি—

বাঙ্গালা সরকারের বর্ত্তমান বর্ষে আয় অপেক্ষা ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ২৫শে জুন হইতে বিক্রয়-করের হার টাকা প্রতি দুই পয়সার স্থলে ৩ পয়সা করা হইয়াছে। এই করবৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহার ধারণা করিবার শক্তি বোধহয় বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের নাই। বাঙ্গালা দেশে গত ৯৩ ধারার শাসন অর্থাৎ গভর্ণরের স্বৈরশাসন চলিতেছে। লোক আশা করিয়াছিল মিঃ কেসি জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে অবহিত হইবেন। চাউলের দর কমিবার ব্যবস্থা করিবেন ও খাদ্য-দ্রব্যের যাহাতে মূল্য হ্রাস হয়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন। তাহার পরিবর্তে দরিদ্র ক্রেতার উপর নূতন বিক্রয়-কর বসাইয়া লোককে বিব্রত করা হইল। খুচরা পয়সা পাওয়া যায় না—৩ পয়সা বিক্রয়-কর আদান প্রদানের অসুবিধাও কম হইবে না। কিন্তু দুঃখীর ব্যথা শুনিবে কে ?

রাজবন্দীদের মুক্তি—

সিমলায় নেতৃসম্মিলনের প্রথম দিকে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জানাইয়াছেন যে, সকল কংগ্রেস কর্ম্মীকে অবিলম্বে মুক্তিপ্রদান করা না হইলে দেশের আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইবে না এবং দেশে সন্তোষজনক আপোষ প্রবর্ত্তন সম্ভব হইবে না ; কলিকাতার খ্যাতনামা নেতা ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এই সময়ে সকল রাজনীতিক বন্দীর সুবিধার জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে তার করিয়াছেন ও কলিকাতায় আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন। তিনি জানাইয়াছেন—১৯৩৭ সালের পূর্ব্বে ধৃত ৭২জন রাজনীতিক বন্দী ১২ হইতে ২০ বৎসর জেলে আছেন। মহাত্মা গান্ধী গত ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে তাহাদের মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে সময়ের জন্য দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেই দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইলেও ভারতরক্ষা আইনে তাঁহাদের আটক রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলকে এখন মুক্তিদানের সময় আসিয়াছে।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—

রুশিয়ায় স্থানীয় বিজ্ঞান পরিষদের ২২০ বৎসর বয়স উপলক্ষে যে উৎসব হইতেছে, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা গত ১৪ই জুন মস্কো সহরে গিয়া ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মস্কো যাওয়ার কথা ছিল, তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য যাইতে পারেন নাই। ডক্টর সাহা জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মস্কোতে থাকিয়া পরে লেলিনগ্রাডে যাইবেন ও জুলাই মাসের শেষভাগে ভারতে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি তথায় ভারতের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন—ইহাই তাঁহার দেশবাসী সকলের বিশ্বাস।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি—

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী ও শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য্য পি-আর-এস বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণগোপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও তারাপদ কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক। উভয়েই কৃতী ছাত্র—তাঁহাদের জীবন সাফল্য মণ্ডিত হউক।

সাহিত্যিকের সম্মান—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, উত্তরবঙ্গের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুত কুলদাচরণ সরকার রায়পুর সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক সাহিত্য-ভারতী ও কবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তিকেই এই সম্মান প্রদান করা হইয়াছে—তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার এই পুরস্কারে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

বর্ত্তমান দুর্নীতি ও জহরলাল—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বোম্বাই হইতে এলাহাবাদ ফিরিবার পথে জব্বলপুর ষ্টেশনে সমবেত যুবকগণকে বলেন

—ঘুস প্রথা, হীন মনোবৃত্তি, অন্যায়ভাবে লাভ করা, অহেতুক মজুত করা, চোরা বাজার প্রভৃতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নির্দ্দয়ভাবে অভিযান চালাইবার জন্য দেশবাসী সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। আমরা দেশের জাতীয়তাবাদী যুবকবৃন্দের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিতেছি। তাঁহারা জহরলালকে শ্রদ্ধা করেন—কাজেই জহরলালের নির্দ্দেশ মত সকলের একযোগে দেশকে এই পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যতদিন না দেশে জাতীয় নূতন আন্দোলন আরম্ভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে প্রবল আন্দোলন হইলে দেশবাসী তদ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিতে পারিবে।

উপাধি বর্ষণ—

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে গত ১৪ই জুন বড়লাট ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপাধিদান করিয়াছেন। ইহা বার্ষিক

রাজা শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
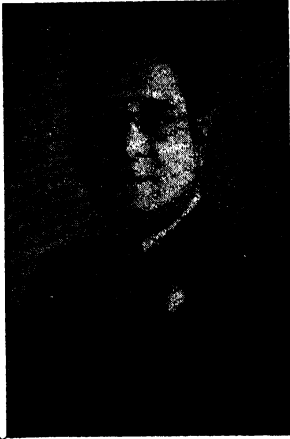
ব্যবস্থা। যাঁহারা এই উপাধি লাভ করেন, তাঁহারা নিজেদের সম্মানিত মনে করেন। তবে যাঁহারা দেশের সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁহাদের উপর এই উপাধি বর্ষিত হইলে উপাধিরও গৌরব বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি যাঁহারা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৩ জন পণ্ডিত ও লেখক আছেন। তাঁহাদের এই সম্মান লাভে শিক্ষিত সমাজ আনন্দ লাভ করিয়াছেন—(১) প্রথমেই লালগোলার (মুর্শিদাবাদের) জমীদার ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের 'রাজা' উপাধি লাভের কথা বলা যায়। তাঁহার বংশ দান-শীলতার জন্য সমগ্র বঙ্গে সুপরিচিত। তাঁহার পিতামহ
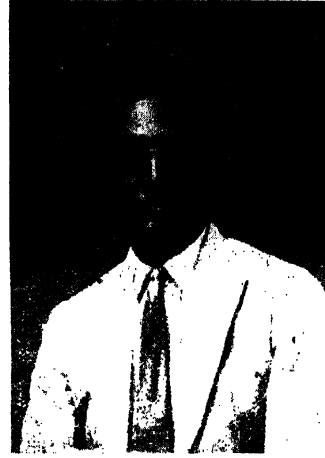
মহামহোপাধ্যায় ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য

মহারাজা সার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও মহাশয়ের বয়স বর্ত্তমানে ১০৬ বৎসর এবং তাঁহার জীবনব্যাপী দানের পরিমাণ করা যায় না। তাঁহার পৌত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণও বহু সৎকার্য্যে বহু টাকা দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার লেখক ও সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি কম নহে। (২) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রসন্নকুমার আচার্য্য মহাশয় 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি এম-এ, পি-এচ্-ডি, ডি-লিট্; বহুদিন যাবৎ তিনি অধ্যাপনা দ্বারা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী হিসাবে তাঁহার এই সম্মানলাভে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরববোধ করিবেন। (৩) মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার ডক্টর বিমান বিহারী দে মহাশয় 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনিও খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ও বৈজ্ঞানিক এবং বাঙ্গালাভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের এই রাজ-সম্মান লাভে তাঁহাদের সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন—

দৈনিক 'ভারত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন গত ২৫শে জুন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ২৬শে নভেম্বর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় 'ভারত' প্রচারও বন্ধ করা হইয়াছিল।

শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়
(ইনি হাওড়া মিউনিসিপালিটীর নূতন চেয়ারম্যান—নির্বাচন সংবাদ গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।)

কবি ৺কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়
(ইহার পরলোকগমন সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।)

হিন্দু মহাসভার সিদ্ধান্ত—

গত ২৩শে জুন পুনায় ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হয়। সভায় বীর সাভারকর, ডাক্তার মুঞ্জে, মিঃ বোপৎকার, আশুতোষ লাহিড়ী, মনোরঞ্জন চৌধুরী, ডি-জি-দেশপাণ্ডে, জে-এস-করণ্ডিকার, মেজর পি-বর্দ্ধন, কে-শিবানন্দ, মোহান্ত দিগ্বিজয় নাথ, শ্রীমতী জানকীবাঈ যোশী, রামপ্রসাদ, রঙ্গনাথম, কৃষ্ণ পাণ্ডে ও ধানদেরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত এন-সি-কেলকারকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ২৪শে তারিখে কমিটীতে ওয়াভেল ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়—হিন্দুরা ভারতের শতকরা ৭৫জন অধিবাসী। ওয়াভেল ব্যবস্থায় তাহাদের মধ্যে বিভেদের চেষ্টা করিয়া ভারতের জাতীয়তা নষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। যাহাতে ভারতে বৃটীশ স্বার্থ কায়েম থাকে, সেজন্য লর্ড ওয়াভেল এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার সিদ্ধান্ত জানাইয়া বড়লাটকে এক তার করিয়াছেন।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই লেখিকাকে সম্প্রতি 'জগত্তারিণী পদক' দেওয়া হইয়াছে।)

বিলাতে ভারতীয় শিল্পপতিবৃন্দ—

৭জন ভারতীয় শিল্পপতি ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করিবার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার

কারখানাসমূহ দেখিতে গিয়াছেন। ঐ দলে আছেন—(১) শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিরলা (২) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার (৩) মিঃ লায়েক আলি (৪) সার সুলতান চিনয় (৫) এ-ডি-শ্রফ (৬) আজাইব সিং ও (৭) জে-আর-ডি-টাটা। নলিনীবাবু দেশে ফিরিয়া বাঙ্গালায় নূতন ১০ হইতে ২০টি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়াছেন ও সেজন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিরলা এদেশে মোটর গাড়ী ও সাইকেল প্রস্তুত করিবার জন্য যন্ত্রপাতি আমদানী করিবেন। প্রয়োজন হইলে মিঃ টাটা ঐ প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র হিসাবে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিলাতের কারখানাসমূহ দেখিবার পর আমেরিকায় গিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী—

দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ প্রবাসী ভারতবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য তথায় যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কমিশনে ২ জন ভারতবাসীও ছিলেন। কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারত হইতে একজন ভারতীয় নেতাকে তথায় লইয়া গিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা তাঁহাদের দেখান হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা নূতন নহে—৪০ বৎসর হইতে গান্ধীজি তথায় এ বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছিলেন—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই।

অধ্যাপক ৺কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত
(ইহার পরলোকগমন সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।)

চাউলের দর—

ত্রিপুরা চাঁদপুর হইতে খবর আসিয়াছে যে তথায় চাউল ১৮ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। অথচ বগুড়া, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় ৮ টাকা মণ দরে প্রচুর চাল পাওয়া যায়। যেখানে চাউল রেশন করা হইয়াছে সেখানে চাউলের মণ ১৬ টাকা ৪ আনা—আর তাহারই পাশের গ্রামে চাউল ১২ টাকা মণ পাওয়া যায়। সরকারের অনুমতি ব্যতীত এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চাউল লইয়া যাওয়া চলে না। বহুদিন ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে এই অব্যবস্থা চলিতেছে। সরকারী কর্ত্তারা কি ইহার কোন সুরাহা করিতে অসমর্থ—না লোকের সুখ সুবিধার দিকে দেখিবার সময় তাঁহাদের নাই ?

শ্যামনগরে হিন্দু সম্মেলন—

গত ১৪ই জুন হইতে ২৪শে জুন ৮ দিন ধরিয়া ২৪ পরগণা শ্যামনগরে ঠাকুরবাবুদের প্রকাণ্ড সংস্কৃত কলেজ গৃহে শ্যামনগর হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে হিন্দু সংস্কৃতির প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম দিন সম্মিলনের উদ্বোধন করেন ও শেষ দিনে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ উৎসব হয়। সেদিন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তথায় সম্বর্দ্ধনা করা হয় ও তিনি হিন্দু আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া এক বক্তৃতা করেন। প্রদর্শনীতে স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বহু নূতন জিনিষ প্রদর্শিত হইয়াছিল। একটি গ্রামে এইভাবে ৮ দিন ধরিয়া উৎসব—দেশবাসীর অসাধারণ উৎসাহ ও কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচায়ক।

মিশরে ভারত সম্বন্ধে অপ্রচার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায়চৌধুরী ইসলামিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য মিশরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিয়াছেন—"আধুনিক ভারত ও ভারতবাসীর আশা আকাজ্ক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মিশরবাসীর জ্ঞান যৎসামান্য এবং অত্যন্ত অস্পষ্ট। ভারতীয় সংবাদ মিশরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। ভারত-বিরোধী সংবাদসমূহ মিশরে প্রচারিত হয়।" রায় চৌধুরী মহাশয় এল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন—সেখানে দুইজন বাঙ্গালী আছেন—তাঁহারা প্রাচীন পন্থী। মিশর সম্বন্ধে তিনি পুস্তক প্রকাশ করিয়া সে দেশের কথা ভারতবাসীকে জানাইবার জন্য মনস্থ করিয়াছেন।

দুর্ঘটনার পর রেলগাড়ীগুলির অবস্থা

ফটো—তারক দাস

দুর্ঘটনার পর উৎক্ষিপ্ত এঞ্জিন

ফটো—তারক দাস

এঞ্জিন—অপর দিক হইতে

ফটো—তারক দাস

মণিরামপুর (ই-আই-রেল) রেল দুর্ঘটনার হতাহতগণ—(সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে)

ফটো—তারক দাস

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে গত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে বিনা বিচারে বাঙ্গালা দেশ হইতে দূরে মাদ্রাজের কুন্নুরে আটক

ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৫২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

কর্মযোগ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

পূর্বাভাস

গীতায় যে তিনটি যোগের কথা বলা হয়েছে—জ্ঞান ভক্তি কর্মযোগ—তা যে খুবই প্রাচীন—গীতার যুগেও প্রাচীন—সে কথা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই উল্লিখিত হয়েছে। যা বহু পূর্ব হতেই ছিল, সে আবার নতুন করে রূপ নিল কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে। এই সুপ্রাচীন যোগ বিবস্বান্ সূর্যকে বলা হয়েছিল, মনু-ইক্ষ্বাকুরা জানতেন, পরবর্ত্তীকালের রাজর্ষিরা জানতেন, তারপর 'কালেন মহতা'—সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে নষ্ট হয়ে গেল। সূর্য মৌন হ'য়ে আছেন, মনু-ইক্ষ্বাকু রাজর্ষিরা সব মৃত—কিন্তু একজন সাক্ষী আজও আছেন—যিনি গীতার এই উক্তির সত্যতার অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ দিচ্ছেন। সেই সাক্ষী বেদ—আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতম সঞ্চয়। এই বেদেরই অঙ্গীভূত, উপকণ্ঠে বা সামীপ্যে স্থিত উপনিষদের মধ্যে অনুসন্ধান করলে সেই অবলুপ্ত যোগের সন্ধান মিলবে।

তার আগে উপনিষৎ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ দুএকটি কথা জানতে হবে। বাংলা দেশে উপনিষৎ প্রায় অপঠিত, অবহেলিত, তাই ছোট্ট একটু ভূমিকায় তার পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'উপনিষৎ' নামে পরিচিত রচনাগুলির সংখ্যা অনেক হলেও পণ্ডিতদের মতদ্বৈধ নেই যে ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি বারোখানিই হল আসল উপনিষৎ, আর বাকি সব বহু পরবর্ত্তিযুগের রচনা। এই আসল উপনিষৎগুলি হয় একেবারে বেদেরই অঙ্গ, আর নয় তো অতি অল্পকালের ব্যবধানে বেদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ঋষিদের রচনা। মতদ্বৈধ নেই যে ঈশোপনিষদই প্রাচীনতম উপনিষদ।

বেদের কোন্ অংশ উপনিষৎ, বেদের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? বেদের প্রধানতঃ দুটি অংশ, এক হল 'মন্ত্র' বা দেবস্তুতি ও যজ্ঞাত্মক বচন, আর এক অংশ হল ব্রাহ্মণ',—কোন্ মন্ত্র কোন্ যজ্ঞে প্রয়োগ করতে হবে, তার বিধিব্যবস্থাই বা কি রকম, এই সব। বেদমন্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যা কবিতা, যা গান, আর যা গদ্য। যজ্ঞের সময় কবিতা বা 'ঋক্' আবৃত্তি করতেন হোতা, সঙ্গীত বা 'সাম' গান করতেন উদ্গাতা, আর গদ্য বা 'যজুঃ' পাঠ করতেন অধ্বর্যু। বেদের 'ব্রাহ্মণ' অংশের ভেতর এমন বেদাংশ আছে যা যজ্ঞবিধিও নয়, মন্ত্রও নয়, স্তবস্তুতিও নয়, —তারই সাধারণ নাম 'আরণ্যক' বা উপনিষৎ। 'আরণ্যক' এর নাম, কেননা এ ছিল অরণ্যবাসী তপস্বীদের জন্যে। এর যে প্রতিপাদ্য বিষয়,

তার জন্যে কোনো দেবায়তন ছিল না, যজ্ঞবেদী ছিল না, হোমাগ্নি ছিল না; অনাড়ম্বর, নিরায়োজন, নিরুপকরণ সে-যজ্ঞ শুধু মনে মনেই, শুধু অন্তরের শ্রদ্ধায়, ধী ও মনীষায়। উদার তার ছন্দ, পুলকময় তার ভাষা, মৃত্যুবিজয়ী তার বাণী, অমৃতলোকের সে সন্ধানী। এ যেন অরণ্য তার আড়ম্বর-বিহীন শ্যামল অঞ্জলি তুলে ধরেছে আকাশ পানে। কোনো বিশেষ দেবালয় গাঁথা হয় নি, কোনো বিশেষ পূজা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা নয়, শুধু অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে উপনিষৎ দেখতে চেয়েছেন সৃষ্টির পরমতম তথ্যকে, অন্তরতম আত্মাকে—ব্রহ্মকে, যিনি বাক্যমনের অতীত হ'য়েও আনন্দরূপে এই আকাশে পরিব্যাপ্ত, যাঁকে আশ্রয় ক'রে আছে সকলে, অথচ কেউই যাঁকে অতিক্রম ক'রে নেই, যিনি বৃক্ষের মতো একাকী এই আকাশে স্তব্ধ হ'য়ে আছেন, যাঁর দ্বারা এই যা কিছু সমুদায় পরিপূর্ণ। এমন প্রাচীন হ'য়েও সকল যুগের সকল ধর্মের মানুষের জন্যে উপনিষদের দুয়ার খোলা। কোনো দীক্ষা নিতে হবে না, কোনো ধর্মকে ছেড়ে আসতে হবে না, কোনো বিরোধের সঙ্গে সত্যই নেই—যেমন আছ তেমনি বেশে যখন খুশি এসো, কোনো বিধিনিষেধ, বাচবিচার নেই—শুধু পবিত্র মনে এসো, সংযত চিত্তে এসো, অন্তরের শ্রদ্ধায় এসো। উপনিষৎ মানুষকে আহ্বান করেছেন এক অন্তর্গূঢ়লোকে, যেখানে কবির অনুভূতিই দেখতে পারে,—এমন এক অমৃতলোকে যার আনন্দ সর্বদেহে, সর্বমনে,—ছন্দে ছন্দে সমস্ত আকাশ প্লাবিত ক'রে, গ্রহে উপগ্রহে, তারায় তারায়, সমগ্র বিশ্বচরাচরে হিল্লোলিত—যেথানে যা-কিছু-গতিশীল, যা-কিছু চলমান—সমস্তই সেই ব্রহ্ম হ'তে নিঃসৃত হ'য়ে তাতেই আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে, তাঁরই বিরাট প্রাণের হোমাগ্নিতে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সমস্ত প্রাণশিখা নিশিদিন কম্পিত হচ্ছে। মানুষের মনীষায় এত বড় কাব্য সাহিত্য, এমন ধারা রচনা আর কোনোদিন রচিত হয় নি।

এরি মধ্যে প্রবেশ করতে হবে কর্মযোগের প্রথম বাণীর অনুসন্ধানে। ভেবে দেখো কত সহস্র বর্ষের ব্যবধান,—আজও যা সঠিক নিরূপণ করতে মানুষ পারে নি,—তারই ওপার হ'তে ভেসে আসছে আমাদের পিতৃ-পিতামহগণের কণ্ঠস্বর;—মনে রেখো, কত স্মরণাতীত কাল ধরে আমাদের পূর্বপুরুষগণ পিতা হতে পুত্রে এই মৃত্যুহীন বাণী সঞ্চারিত ক'রেছিলেন আর সকল বাণীকে উপেক্ষা ক'রে,—খ্যাতি নয়, সম্মান সম্পত্তি নয়, গর্বোদ্ধত সভ্যতার ইতিবৃত্ত নয়, সমস্ত নশ্বরতা তুচ্ছ করা এই বাণী। স্বর্গত পিতৃদেবের আলেখ্য, পিতামহের পদচিহ্ন তুলট কাগজে ধরা,—এ সব কত শ্রদ্ধায় মাথায় রাখি। সে সবের তুলনায় কত সহস্রগুণ শ্রদ্ধাই সুন্দরতম পিতৃপিতামহগণের এই বাণী! অস্পষ্ট মধুর জলোচ্ছাসের মতো এই বাণী শোনায় ঈশোপনিষৎ—

> ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

এ জগতে যা কিছু ঘটছে, যা কিছু আসছে আর চলে যাচ্ছে, যা কিছু পাচ্ছি আর হারাচ্ছি, সমুদায়কে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করতে হবে। তিনিই দিয়েছেন এই জেনে ভোগ করবে, কারো ধনে লোভ করবে না। জগত্যাং জগৎ—চলন্তের মধ্যে যা চলন্ত। এই যে সংসার, এ কেবলি সরে যাচ্ছে, ঘূর্ণায়মান রঙ্গভূমিতে দৃশ্যের পর দৃশ্য পাল্টাচ্ছে। এখানে কাকেও স্থির থাকবার জো নেই, কাকেও আঁকড়ে থাকলে চলবে না, সবাইকেই ছাড়তে ছাড়তে চলতে হবে। ধাবমান এই রথের মধ্যে কেউই স্থির হয়ে বসে নেই। চলার মধ্যে এই যে চলন্ত, গতিময় আবেষ্টনের মধ্যে এই যে গতিশীলতা, সে হল উপনিষদের ভাষায় জগত্যাং জগৎ। তাদের সকলকে ঈশ্বর দিয়ে ঢাকতে হবে। এ কেমন? ঢেউএর পর ঢেউ এসে সমুদ্রের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে, যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলি তরঙ্গের পর তরঙ্গ। এদের কেউই স্থির নয়, সবই দুলছে সবই চলছে, বালুকাময় সৈকতে এসে লুটিয়ে পড়ছে। সমুদ্র কোথায়? তরঙ্গের অন্তরালে সে আত্মগোপন ক'রে আছে, তাকে তো দেখান যায় না। কিন্তু জানি এই শত লক্ষ কোটি ঢেউ, তাদের ফেনশীর্ষ ফণা সব কিছু নিয়েই সমুদ্র, সমুদ্র দিয়েই এরা ঢাকা। তেমনি ঈশ্বর। তেমনি এই বিশ্ব-চরাচর—সে কেবলি দুলে দুলে উঠছে, কেবলি ঢেউএর পর ঢেউ, কেবলি আসা আর যাওয়া। তাদেরই অন্তরালে আছেন ঈশ্বর, তাই তাঁকে দ্যাখাই যায় না। তবু তিনিই এই, এই সকলই তিনি। একেই বলে ঈশা বাস্যং—ঈশ্বরের দ্বারা ঢাকা।

জগৎ চরাচরকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি, তাঁর বিশ্রাম নেই, বিরতি নেই। অথচ এ সবে তিনি নির্লিপ্ত। 'ন কর্ম লিপ্যতে নরে'—কর্মযোগের এই প্রথম বাণী এখনি আমরা আলোচনা করব, কিন্তু তার আগে ঈশ্বরের নির্লিপ্ততা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এ নির্লিপ্ততা কেমন? ঐ তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরের মতো। তরঙ্গ কি তাকে দোলাতে পারে, টলাতে পারে? তরঙ্গ সমুদ্রের গায়ে গায়ে লাগা, অথচ তাতে সে জড়িয়ে পড়ে নি, সে নির্লিপ্ত। ঢেউগুলি তার গায়ে আঠার মতো লেপ্টে নেই, তারা সব আসে আর চলে যায়, তাদের অন্তরালে মহাসাগর স্থির, ধীর, নির্লিপ্ত। তেমনি এই বিশ্বচরাচরের কোনো কর্মচাঞ্চল্য বিশ্বস্রষ্টার চঞ্চলতা ঘটায় না—ধ্যানের নেত্রে তাঁর এই রূপটি মানুষের ধারণা করতে হবে, মানুষকে তাঁরই অনুসরণ করতে হবে।

> কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতাং সমাঃ।
> এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

কাজ করতে করতেই এ জগতে শত বৎসর বেঁচে থাকবার ইচ্ছা করবে। আর কোনো রকমে নয়, এমনি ভাবে কাজ করলে মানুষকে কাজ আর লিপ্ত করবে না। কেমন ভাবে কাজ করবে?—আগে সব আভাস দেওয়া হল, তেমনি ভাবে। ঈশ্বর যেমন অতন্দ্রিতে এই জগৎ চরাচরের কাম্য-বিধান করে চলেছেন, যা-কিছু মানুষ ভোগ করে সে তাঁরি ত্যাগের দান,—মানুষকেও তেমনি তাঁরি অনুসরণে কাজ করতে হবে, তাকেও ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। এমনি ক'রে কাজকে যদি কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে নিয়ন্ত্রিত করো, কাজ আর তোমাকে লিপ্ত করবে না। কর্মফল তোমাকে আর জড়াবে না, টলাবে না, কর্ম আর তোমার কোনো বন্ধন রচনা করবে না। এই জরামরণশীল, দুঃখকষ্টে

জর্জরিত সংসারে শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করবার সাহস আছে কার?—যিনি যথার্থ বীর, বলিষ্ঠ যাঁর মন, যিনি যথার্থ প্রেমিক, যাঁর প্রেম আপনাকে অতিক্রম ক'রে প্রতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মানুষই চাইতে পারে দীর্ঘতম পরমায়ু, যাতে তার কাজের দান ক্ষুদ্র না হয়। যে ভীরু, অপরের ভাল করবার দায়িত্ব নিতে তার ভয়, সেই চাইবে পালাতে। মৃত্যুর মধ্যে, আত্মহত্যার মধ্যে কি বীরত্ব আছে? উপনিষদের এই বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের শিক্ষা স্বদেশের ও বিদেশের বহু কবি তাঁদের রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ইংরাজ কবির কয়টি লাইন উদ্ধৃত করছি—

'Teach me to live!' Tis far easier to die
Teach me the harder lesson—how to live,
To serve Thee in the darkest paths of life,
Arm me for conflict new, fresh vigour give
And make more than conqueror in the strife."

আমাদের দেশের শিক্ষা নিয়ে ওদেশের লোক হল কর্মবীর, আর আমরা হয়ে রইলাম কর্মত্যাগী পলাতক, এটিই হল বিধাতার নিষ্ঠুরতম বিদ্রূপ।

এক ধরণের স্বার্থপরতা আছে যা কুষ্ঠের চেয়েও ঘৃণ্য,—দুষ্পূরণীয় ভোগাকাঙ্খা। এই হ'ল মঙ্গলেচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বী,—এও অনলস, অতন্দ্রিত, সব কিছুকে এ নিজের দিকে টানে, আয়োজনের পর্বত-প্রমাণ আড়ম্বরকে এ পিঠে বেঁধে চলে, এর শাণিত নখদন্তের আস্ফালন হিংস্র পশুকেও হার মানায়। যযাতির ছিল এমনি ধারা বৈষয়িকতা, এমনি উগ্র ভোগাকাঙ্ক্ষা—তাই নিজের যৌবন শেষে পুত্রের যৌবন ধার করেছিলেন। অতি ভয়াবহ হল তার পরিণাম। ভোগেচ্ছা আত্মকেন্দ্রিক, কল্যাণেচ্ছা বহিঃকেন্দ্রিক। ভোগের পুঞ্জীভূত উপকরণ গুরুভার হয়ে পিঠে ঠেসে বসে, কেননা অন্তরের আকর্ষণ যতই তীব্র হবে, অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মে ভারও ততই গুরু হবে। তাতে মানুষের মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ে, মনুষ্যত্ব ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হয়, সমস্ত রুচি, সমস্ত শ্রী, সব উৎকর্ষ চিরদিনের মতো নাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কল্যাণের টান বাইরের দিকে। ভারকে সে লাঘব করে, কর্মকে সে মুক্তি দিতে দিতে চলে।

এই যে স্বার্থপরতা, এই যে বৈষয়িকতা, উপনিষৎ একেই বলেছেন 'অবিদ্যা'। জ্ঞান থাকলে মানুষ কখনো নিজের পিঠের ভার এমন ক'রে বাড়ায় না, আয়োজন বাহুল্যের ষ্টিম রোলারের চাপে নিজেকে এমন ক'রে পিষে মারে না,—তাই চরম স্বার্থপরতা যে অজ্ঞানতায় প্রসূত তারই নাম 'অবিদ্যা'। উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিদ্যায় রত তারা অন্ধতমসায় প্রবেশ করে। অকল্যাণই সেই অন্ধকার, সর্বনাশই সেই তমঃ। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য কথা উপনিষৎ বলেছেন, যে যারা বিদ্যায় রত তারা আরো গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

ভোগতৃষ্ণায় অন্ধ ক্রুরকর্মার দুষ্টচেষ্টাসকলের মধ্যে যে মূর্খতা আছে, তার চেয়েও বেশী মূর্খতা পাণ্ডিত্যের। যারা কোনো কিছুই করল না জীবনে, কেবল পড়েই চলেছে, পড়েই চলেছে,—কি লাভ হল দুনিয়ার তাদের সেই পড়ায়? শুধু তাদের পাণ্ডিত্যাভিমান বেড়ে চলল, ভোগীর দাম্ভিকতার মতো এও তো সমান ঘৃণার্হ। কিন্তু তাই ব'লে কাজকর্ম বিসর্জন দিতে হবে নাকি, জ্ঞানের চর্চা ছেড়ে দিতে হবে নাকি? না, তা মোটেই নয়। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, কাজও যেমন মানুষের চরম লক্ষ্য নয়, জ্ঞানও তেমনি মানুষের চরম লক্ষ্য নয়। কাজ আর জ্ঞান মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার পথ। ভক্তি তেমনি আর একটি পথ। পথ যদি মানুষের লক্ষ্য হয়, তবে তো আর পৌঁছানোই ঘ'টে ওঠে না। সুতরাং কর্ম আর জ্ঞান লক্ষ্য নয়, এরা উপলক্ষ। চরম লক্ষ্য তবে কি? চরম লক্ষ্য হল উপনিষদের ভাষায় 'অমৃতম্'। যা মানুষকে পদে পদে ছোট করছে, পদে পদে মারছে, সেই সব ক্ষুদ্র বৃহৎ মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে, যেখানে আর মৃত্যু নেই, নীচতা নেই, সঙ্কীর্ণতা নেই, যেখানে সব কিছু বিরাট, সব কিছু মহৎ, সব কিছু উদার, অনন্ত—উপনিষৎ তাকেই বলেছেন ভূমা, এই ভূমাই ব্রহ্ম, এই ভূমাই অমৃত। নদী যখন দুই তীরে মঙ্গলবর্ষণ করতে করতে সাগরে এসে পড়ে, তখন তার যা কিছু আছে সমস্তই সে মহাসাগরকে সমর্পণ ক'রে দেয়। তেমনি ক'রে মানুষকেও তার সংসারের, সমাজের, দেশের, পৃথিবীর মঙ্গল করতে করতে তার যা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ ক'রে দিতে হবে। যে-নদী সাগরে মিলল তার আর মৃত্যু নেই, তার স্রোত আর কোনোদিন শুকিয়ে যাবে না। তেমনি যে-মানুষ ব্রহ্মে নিজেকে সমর্পণ করেছে, তারও আর মৃত্যু নেই, সে অমৃতকে পেয়ে গেল। নদীর লাল জল কণায় কণায় সমুদ্রের নীলের সঙ্গে মিশে যায়, এমনি ক'রে সে তিলে তিলে সমুদ্র হ'য়ে উঠছে। এই সমুদ্র হওয়ায় তার শেষ নেই। তেমনি মানুষকেও ব্রহ্ম হয়ে উঠতে হবে, এ হওয়ায় আর তার শেষ নেই। এই ভাবটি অতি অনবদ্য ভাষায় গীতা প্রকাশ করেছেন—ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। আমাদের আর সব মিলনের শেষ আছে, পরিসমাপ্তি আছে, তারপর বিচ্ছেদ। কিন্তু ব্রহ্ম মিলনের শেষ নেই, তাই বিচ্ছেদও নেই। এমনধারা মানুষ ক্রমাগতই ব্রহ্ম হ'য়ে হ'য়ে উঠছে, ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

কর্ম আর জ্ঞান এর কোনোটিই মানুষের লক্ষ্য নয়, একথা জানতে হবে। কর্মকেও ছাড়লে চলবে না, জ্ঞানও অপরিহার্য। অমৃতের সন্ধান এরাই দেবে সে-কথা বোঝা চাই। উপনিষৎ তাই বললেন—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

যিনি জ্ঞান ও অবিদ্যা উভয়কে এক সঙ্গে জানেন, তিনি অবিদ্যার (অর্থাৎ কর্মের) দ্বারা মৃত্যুকে তরণ ক'রে জ্ঞানের দ্বারা অমৃতলাভ করেন।

যস্তদ্বেদ উভয়ংসহ,—যিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয়কেই একসঙ্গে জানেন, মানে যিনি জ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে কাজ ক'রে যান, আবার কর্ম যাঁর জ্ঞানের পরিপোষক। যে-ব্যক্তি একান্তভাবে সংসারে রত, তার যত কাজ সব

নিজের জন্যে। সে জানে না স্বার্থপরতন্ত্রতায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হবে। জ্ঞান তাকে কাজের পথ দেখিয়ে দেবে। মানুষের বুদ্ধি যতই উৎকর্ষতা লাভ করবে ততই সে বুঝবে তার কর্ত্তব্য। জ্ঞানের আলোকে তার চিত্ত যতই আলোকিত হবে, তার মনের উদারতা ততই বাড়বে, সঙ্কীর্ণতা ততই দূরে সরে যাবে। তার প্রেম ততই প্রসারতা লাভ করবে। সঙ্কীর্ণচেতা মূর্খের প্রেম শুধু আপনাকে নিয়ে, জ্ঞানীর ভালবাসা সমস্ত মানুষে ছড়িয়ে আছে। কে না জানে, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য, জাতিকে জাতিতে মনোমালিন্য, স্বদেশী-বিদেশীর মনোমালিন্য—সবই অজ্ঞানতার পরিচায়ক। আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ভালবাসতে যতই পারব, নিজের যা কিছু সব ততই তাদের দেওয়া সহজ হবে, আনন্দময় হবে। যেখানে ভালবাসা আছে, সেখানে দেওয়া মানেই যে পাওয়া। পিতা পুত্রকে অঞ্জলি ভ'রে দেন কেন, প্রেমিক তার প্রিয়তমার জন্যে উপহার আনেন কেন? এই দেওয়ার মাঝেই যে আনন্দ আছে, কারণ এখানে যে প্রেম আছে। যখন এই ভালবাসা শুধু আত্মীয়-স্বজনে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়বে, তখন আমাদের কাজ হবে তাদের সবাকার সুখবিধানের জন্যে। একেই বলে মঙ্গল, একেই বলে কল্যাণ। কাজ তখন কল্যাণ মূর্ত্তিতে দেখা দেবে। আবার জ্ঞান তখন শুধু নীরস পাণ্ডিত্য হয়ে থাকবে না, যা পড়ব, যা শিখব, সমস্তই নিয়োজিত করব কল্যাণে। একেই বলে, যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে তরণ ক'রে জ্ঞানের দ্বারা অমৃতকে পাওয়া,—সে কেমন? মৃত্যু-বৈতরণীর পরপারে অমৃত আছে, মানুষকে এই মৃত্যু-নদী পার হয়ে যেতে হবে, তবেই তার অমৃতে প্রবেশলাভ ঘটবে। সাধারণ মানুষ কাজ করে, তার ফলটি পাবার জন্যে। কাজের ফলগুলি তার পিঠের বোঁচ্‌কায় জমে ওঠে, এই বোঁচকা নিয়ে সে যখন মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়ায়, মরা তার একবারেই শেষ হয় না। মৃত্যু বলে, যাও আবার নবজন্মে ফিরে যাও, যে-ফল পিঠে বেঁধে এনেছ সেটুকু ভোগ ক'রে এসো। এমনি ক'রে কেবলি তার বাঁচা, আর কেবলি তার মরা। মানুষ যদি মৃত্যুকে বলে, দাও না আমায় তোমার ঐ নদীটুকু পার ক'রে,—মৃত্যু বলে—না বাপু, এখান থেকেই তোমায় ফিরতে হবে, তরণ করা চলবে না। বোঁচ্‌কা নিয়ে তরীতে ওঠবার হুকুম নেই। কিন্তু যিনি কর্মফল নিজে নেন না, যিনি তাঁর যা-কিছু-সব ব্রহ্মে সমর্পণ করেছেন, তিনি ঝাড়া-হাত-পা। একেবারেই তরীতে এসে উঠে বসেন। মৃত্যুকে তরণ ক'রে অমৃতলোকে যাবার একমাত্র অধিকারী তিনি। এই যে সর্বকর্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করে দিয়েছেন, এ কেন? কারণ তিনি যে জ্ঞানী, তিনি যে জানেন, বোঝা পিঠে রাখতে নেই। তাই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি অমৃতলোকে চলে যান,—বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে।

উপনিষদের কয়েকটিমাত্র শ্লোক উল্লেখ করেছি, কেন না পুঁথি বাড়াতে চাই না। এই শ্লোকগুলির নিহিতার্থ অত্যন্ত সুকঠিন। হিমাদ্রি-শিখরে পরিবেষ্টিতা গঙ্গার মতো ভাব এখানে দুরূহ বাধায় বেষ্টিত। ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্তলোকে এনেছিলেন। পাঞ্চজন্যের শঙ্খনিনাদে জটিলতার সহস্র বন্ধন ছেদন ক'রে নররূপী নারায়ণ ভগীরথের মতোই উপনিষদের গিরিশৃঙ্গ হ'তে কর্মযোগের বাণীকে আমাদের চিত্তমধ্যে প্রবাহিত ক'রে গেছেন। যদি গীতা না থাকত, কে বুঝত এই কর্মযোগের বাণী? গীতা উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্য। এত বড় ভাষ্য,—যা উপনিষদের সমান আসনের দাবী করে। তাই এর নাম গীতোপনিষৎ। উপনিষদে যা ছিল আভা, গীতায় তাই হয়েছে আলো, যা ছিল বীজ, গীতায় তাই হয়েছে মহা মহীরূহ।

শরৎ

কাদের নাওয়াজ

দুর্দ্দিন আজ, তোমারে শরৎ!
তবু যে বরণ করি,
কি দিব অর্ঘ্য মোরা যে এবার
অনশনে প্রায় মরি।
কুঞ্জে তোমার মধুপের গীতি,
শুনি জাগে হৃদে অতীতের স্মৃতি,
যেদিন তোমায় প্রাণের আসন
দিয়েছি আমরা কত না সুখে,
সেদিনের সেই স্মৃতিগুলি আজি
সায়কের সম বিঁধিছে বুকে।

ছাতিম্ হিজল শিউলি ফুটিছে,
ভুঁই চাঁপা বনে হাসিছে একি?
কি বলিব হায় মোদের নয়নে
শুধু সরিষার ফুল যে দেখি।
জানি শারদার বাহন তুমি,
তাই আবাহন বঙ্গভূমি—
দিতেছে তোমারে সাদরে শরৎ
দীন কবি শুধু অশ্রু ফুলে,
পাঠায় তোমায় প্রাণের অর্ঘ্য
গ্রহণ করিতে যেও না ভুলে।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

কাজ শেষ করে মাণিক দাঁড়িয়ে আলিস্যি ভাঙ্গিল।

ডাক্তার এসে পড়লেন। কি হে, হয়ে গেছে নাকি? আমিও যে ঐ চিন্তা নিয়েই ছিলুম।

মাণিক। "আপনার এক চিন্তা নয়, ঠোকাঠুকি হবে। ওটা আমার মাথায় ছেড়ে দিন।"

'আচ্ছা try, আমাদের জন্যে Free passage থাকলেই হ'ল, not for others—"

"সে ঠিক আছে মশাই। আমি এখন রাঁধতে যাই। ডাল-রুটি, আর মাছ-ঝাল-দে—কি বলেন?"

Grand—একদম মল্লিক বাড়ীর menu—শরীরটেও হালকা বোধ হচ্ছে বেশ। আজ আর রামমোহন নয়—তাঁর "শেষের সে দিনও মনে" কই থাকতে নয়। এটা রবীন্দ্রনাথের যুগ—

"আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জে"—তার পর কি?

"আজ্ঞে আমার তো—"

"আচ্ছা হো যায়গা—মালাক্কার মাছি গুঞ্জে। না auther's own 'অলিই' better—কি বলো—"

"আজ্ঞে তাই থাক্।"

বিনোদ মাথা চুলকে—মেলাতে হবে তো—

"ধাক্কা দেয় বীণার ঝঙ্কার
রক্ষা করো সাধু স্বর্ণকার।"

মাণিক বিনোদের পায়ের ধুলো নিয়ে—"আপনার যে কি আসেনা মশাই সেইটাই বুঝলুম না। বহু ভাগ্যে আপনাকে পেয়েছি, এর পর সব শুনবো, এখন তবে—"

"আচ্ছা যাও, কিন্তু—বেশী ঝাল দিও না লঙ্কার।"

"কি সুন্দর, এর পর আর ছেড়ে যেতে পারব না Sir"

ডাক্তার সুর সংযোগে মন দিলেন। Fortunately তন্দ্রাসুর ঘুম পাড়িয়ে থামালে।

*　　*　　*

খেতে বসে—

বিনোদ। ডালটার তোফা সুগন্ধ ছেড়েছে হে। না না চাচ্ছি না, দিতে হবে না—রাত্রে আর বাড়ের দিকে যেও না—

মাণিক। তাই একটা কথা আজ দু'দিন থেকে ভাবছি—

বিনোদ। মাথা থাকতে ভাবনা আমাদের যাবে না হে। বড়দের মাথা নেই—বেশ আছেন সব, হেডের কাজ হ্যাটেই চলে। হ্যাঁ, কি বলছিলে বলোদিকি—

মাণিক। দেখছি আর ভাবছি, এখানে আপনার শোবার বড় অসুবিধে, খাটিয়াখানা ছেলেদের দোলা খাটাবার মতই কিনা—

বিনোদ। You mean short and shallow এই ভাবনা? আর তোমার slingএর ব্যবস্থা দেখে আমার সুধু ভাবনা নয়—দুর্ভাবনা যে। যুধিষ্ঠিরের শিম্নি রয়েছে সঙ্গে, প্রসাদ-লোভী ভক্ত ঢুকলে—ঘুমের ঘোরে চট্ করে উঠতে গিয়ে নিজের ফাঁদে নিজেই না ফেঁসে যাও। তখন তোমায় ছাড়াই, না ভক্তকে তাড়াই।

মাণিক। ঢ্যালে হাঁটু ঠ্যাকে বলেই ওটা উঁচু দিকে পায়ের support মাত্র, দড়িটে শক্ত নয়—টান সইবে না, ভয় নেই। যাক্, বলছিলুম কি Trainখানা তো জখম্ হয়ে এখন invalid, 2nd classএ তোফা কুশন পাতা—

বিনোদ। ওঃ 2nd classএ গিয়ে শোবার কথা? ও নামটি মুখে এন না মাণিকলাল। ওতে বড় ঠকেছি। ওরা চুপটি মেরে থাকে, চললে—জেলের cell পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়। গাড়িগুলো এখন সরকারের প্রাণ নাড়ী, ভাঙা ফুটোর question নেই। টান পড়লেই চাঙ্গা। রাতারাতি কোথায় পাড়ি মারবে বিশ্বাস নেই। বড় দাগা দিয়েছে—

মাণিক। সে আবার কার?

বিনোদ। সে অনেক কথা। পিটিসন পকেটে কত্তর বাঙালী চাকরির জন্যে যমের বাড়ীও যায়। সবার মুখেই

শুনলুম—বিদেশে চণ্ডীর কৃপা—অর্থাৎ চাকরির। যা করতে বাঙালী জন্মেছে। বর্ম্মায় নাকি তার ছড়াছড়ি। তাড়াতাড়ি রেঙ্গুনে পাড়ি মারলুম। লেগেও গেল রেলের ডাক্তারী। ভাগ্য সঙ্গেই ছিল, সেখানের messএ স্থানাভাব, শোবার কষ্ট, দাঁড়িয়ে পাশ ফিরতে হয়। দেখতুম—সেখানেও একখানা Engine-শূন্য মুণ্ডুকাটা গাড়ি, দেড় মাস sidingএ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, নড়ে না। আর পায় কে! কাকেও না বলে 1st class কুশনে গিয়ে গা ঢাললুম। উপবাসী নিদ্রা পোষাই ছিল, আড় হতেই কুম্ভ-কর্ণের সঙ্গে নিদ্রার competition চট্ করে সুরু হয়ে গেল—

মাণিক। তার পর?

বিনোদ। তার পর বামনের ভাগ্যে যা ঘটে। ঘুম ভাঙলে দেখি, লোকজন ছুটোছুটি করছে সবাই ব্যস্ত—মস্ত station! কি ব্যাপার! স্বপ্ন নাকি? তাড়াতাড়ি উঠে ব্যাগখানা নিয়ে নামতেই একজন বার্ম্মিজ্ টিকিট্-কলেক্টর টিকিট চাইলে। টিকিট কোথায়—তায় আবার 1st class passenger! সে কথা শোনে কে? 1st class এর ভাড়া এবং ইত্যাদিও চাই। পকেটে হাত দিয়ে দেখি হাতটা গলে' একদম হাঁটুতে ঠেকলো! জিভটেও তেলোয় উঠলো—পকেট সুদ্ধ্ পাচার! কাল যে মাইনে পেয়েছি। দিনে অন্ধকার দেখলুম। টেনে নিয়ে গেল SMএর 'স্টেসন মাষ্টারের' কাছে। তিনি নাম ধাম পেশা সব শুনে হ্রেসা রবে হো হো করে হেসে বললেন "পাক্কা চোর।" তখন পুলিসে সোপর্দ্দো।

মাণিক। বলেন কি! একখানা টেলিগ্রাম—

বিনোদ। দাম কোথা, তখন সব তো গয়াধামে হে!

মাণিক। সর্ব্বনাশ, তার পর—

বিনোদ। তার পর আর শুনে কাজ নেই—সে এক মহাভারত, অন্য দিন শুনো; এখন sideএর নিরীহ silent গাড়িতে আমাকে আর কুশনে শুতে বলো কি?

মাণিক। না মশাই, কোনো অবস্থাতেই নয়।

বিনোদ। মা তখন বেঁচে ছিলেন—ছেলের চিন্তা নিয়েই থাকতেন। জগতে ওই একজনই "ছেলে সর্ব্বস্ব" থাকেন। আমার কল্যাণ কামনায় কেঁদে কেঁদে তখন যেতে বসেছেন। চিঠি পেয়েও আমি অতটা খেয়াল করিনি। বাঙালীর চাকরির চেয়ে বড় দুনিয়ায় যে আর কিছু নেই। আছে কি?

মাণিক। বোধ হয় নেই—

বিনোদ। আবার বোধ হয় লাগাও কেন? মাস গেলেই হাতে হাতে ফল প্রাপ্তি, বাঁধা বরাদ্দ

মাণিক। আজ্ঞে তা ঠিক

বিনোদ। শুধু ঠিক নয়—সত্য কথা; কিন্তু তার উপরও মায়ের চোখের জল আছে, সেই আপিসে সব ধুয়ে দেয়। মায়ের পত্র আপিসে এসে পড়েছিল—পেলুম লিখেছেন—"চোখে ঝাপসা দেখছি বাবা, এলেও যে আর তোর মুখ দেখতে পাব না" কিন্তু মনটা বিগড়েই ছিল। আপিস কর্ত্তার সহানুভূতিও এগিয়ে এল। দয়া করে পরম আত্মীয়ের মত জিজ্ঞাসা করলেন—সব ভালো তো ডাক্তার? অবস্থা শুনে বললেন—"ইস্ ছেলের তো যাওয়াই উচিত এবং আমারো উচিত তোমাকে ছুটি দিয়ে সাহায্য করা। এখন মার কাছে থাকাই ছেলের কাজ।" ইত্যাদি—তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ পেয়ে আমি চাকরিতে রিজাইন করলুম। বাহবা পড়ে গেল। তিনি খুব খুশি হয়ে সার্টিফিকেট দিলেন। বললেন, তোমার উপকার করতে পেয়ে আমি ধন্য হলুম। অর্থাৎ তাঁর বেকার সম্বন্ধীর উপায় হল। তিনি বাঁচলেন, আমিও মরে বাঁচলুম।

মাণিক। মরে বাঁচলুম মানে?

বিনোদ। 'চাকরি-ছাড়া" মানেই বাঙালীর মৃত্যু বরণ করাতো। যাক্। মা সত্যিই আমাকে আর চোখে দেখতে পাননি। গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনেক করে দেখে-ছিলেন "এই যে তোর সে জড়ুলটি রয়েছে।" তাতেই তাঁর কি আনন্দ। সে মা আমার আর নেই মাণিক!

বিনোদের চোখে জল এলো।

তার পর মা মাস দুই ছিলেন। তাঁর শেষ কথা—"সদ্বংশের একটি বড় মেয়ে দেখে বিয়ে করিস, মা কালীর পাদপদ্মে থাকিস, তোর ভাল হবে—বড় হবি। কিন্তু গরীব দুঃখীদের যত্ন করে দেখিস বাবা—পয়সা নিস নি—পয়সা বড় নয়—"

বলেছিলুম—"পয়সা নেব না, তবে বড় হব কি করে মা?" বললেন—"তাঁদের আশীর্ব্বাদেরে। দীন দুঃখীর

আশীর্ব্বাদ অন্তর থেকে আসেরে, সেটা মুখের কথা নয়। সে নিষ্ফল হয় না বাবা। টাকা আপনি আসবে।"

তাই তো দেখছি মাণিক।

মাণিক। বলতে ভুলেছি, যুধিষ্ঠির যে অস্থির করলে, 2nd Instalment দুয়ের কিস্তি পাঠিয়েছে—

বিনোদ। (অন্যমনস্কভাবে) যুধিষ্ঠির বেটাই মাথা খেলে দেখছি। মাথা ঘুলিয়ে মায়ের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

মাণিক। সে তো গরীব দুঃখী নয়, তার ঘরের টাকাও নয়।

বিনোদ। সত্যি মিথ্যে বুঝতে পারছি না, মনটা আজ ঠিকানায় নেই মাণিক। বড় সন্দেহে পড়েছি, মহাপাপ করেছি—

মাণিক। কি বলছেন বুঝতে পারছি না sir—

বিনোদ। আমিও পারছি না, তবে অপরাধটা বুঝতে পারছি। Too late না হয়।

মাণিক। দয়া করে খুলে বলুন, আমি যে—

বিনোদ। শোনো—তোমাকে না বলে আমার শান্তি নেই। স্টেসন থেকে বেরবার সময় যেন মায়ের আওয়াজ পেলুম, ঠিক আমার মায়ের গলা। চমকে চেয়ে দেখি—একটি বছর দশেকের মেয়ে—একটি বৃদ্ধাকে হাত ধরে নিয়ে চলেছে। বৃদ্ধা বলছেন—"কই কোনো খবর তো পেলুম না রাণী, গরীবের যে কেউ নেই মা—আমার বিনুর কি হবে!" একি?—মেয়েটি বললে—"রামজি তো হ্যায়!"

আমি কথা না কয়ে পারলুম না। প্রাণটা তখন তোলপাড় করে দিয়েছে। মেয়েটি হ্যাট্‌কোট্-পরা লোক দেখে ভয়ে তার মায়ের পেছনে সরে গেল। বৃদ্ধা আকুল-কণ্ঠে বললে—"বাবা আমার সর্ব্বস্ব যায়, আমার ঐ এক ছেলে বিনোদীলালের হায়জা হয়েছে বাবা, আমার আর কেউ নেই—চক্ষুও নেই, আমি তার অন্ধ মা। ডাক্তার সাহেবকে খুঁজে পাচ্ছি না বাবা। কেই বা খুঁজে দেবে।" সে কি হতাশ ধ্বনি!

তাঁকে বললুম—"সন্ধ্যা হয়েছে বাড়ী যাও। ভেব না, সকালেই ডাক্তার যাবে, আমি পাঠিয়ে দেব। রামজি ভাল করে দেবেন মা, ভেব না।" তাঁর আশীর্ব্বাদ আর চোখের জল নিয়ে এসেছি, ঠিকানাও নিয়েছি—এই কাছেই। মনটা সেই মায়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছে মাণিক। কি হতভাগা ছেলেই হয়েছিলুম। বিপদে পড়ে তাঁকেই আসতে হ'য়েছে। এখন কটা বেজে থাকবে, রাত্রেই একবার যাব নাকি?

মাণিক। ঘটনাটা আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে বটে, তার ওপর নিজেদের অপরাধও রয়েছে। যে ভাবেই হোক্— মন যখন সাড়া পেয়েছে, ভাববেন না। রাতে গিয়ে বিশেষ কিছু হবে বলে মনে হয় না। সকালেই যাবেন। ওদের নাড়ীতে আমাদের নাড়ীতে অনেক তফাৎ—সহজে বেগড়াবে না।

মাণিকের শেষ কথাগুলি বিনোদের ভাল লাগছিল না। বললে "আচ্ছা যাও, খেয়ে শুয়ে পড়। আমি আর খাব না। সকালে খালি পেটে যাওয়া হবে না—চা আর বিস্কুট খেয়ে যাব। তুমিও যাবে। ওষুধপত্র সব যেন ঠিক থাকে।"

মাণিক। এখন রাত প্রায় দশটা, সকাল হতে এখনো ৮।৯ ঘণ্টা দেরী। কিছু খেতে হবে বই কি—যা পারেন।

খেতে বসে মাণিক বললে—"কিছু মনে করবেন না sir, আমি আজ সপ্তাহ ধরে আপনাকে বার করবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিলুম। কাল সকালে যেমন করে হোক নিয়ে যেতুমই। কি জানি কখন কি ঘটে যাবে, তখন আর"—

বিনোদ আজ ও কথার উল্লেখ সইতে পারছিল না। সত্যের কামড় সাপের কামড়ের চেয়েও সাংঘাতিক।— "আচ্ছা থাক্" বলে উঠে পড়ল।

মাণিক। দুধটা যে—

বিনোদ। থাক মাণিক, কলেরা রুগী দেখতে হবে। শীত আছে নষ্ট হবে না—

মাণিক। তবে একটা gold flake ধরিয়ে শুয়ে পড়ুন—ঘুমবার চেষ্টা করুন। এখন ভেবে কোনো ফল নেই—

মাণিকলাল—instalment-পোরা প্যাণ্টএঁটে, দড়ির দোলায় পা ঢুকিয়ে নাক ডাকালে।

"ইস্ এ ডাক শুনলে বাইরের চোর না ঘরে ঢুকে প্যাণ্টে কাঁচি চালায়। আচ্ছা আমার তো আজ ঘুম

নেই।" বিনোদ আর একটা gold flake ধরালে। নিদ্রা এসে গেল।

সকালে ধড়মড় করে উঠে—"মাণিক ওঠো ওঠো, সর্ব্বনাশ করলে। চা খেতে আর দিলে না। ওঠো—ওঠো হে!" দেখলেন মাণিক নেই। "মানুষ সুদ্ধু পাচার করলে নাকি?" মাণিক ঠিক বলেছিল, এ তাদেরই কাজ। উপায়?

মাণিক ঘণ্টাখানেক আগে উঠে, সব ঠিক করে চা রুটি নিয়ে ডাকতে আসছিল।—"কি হয়েছে, মেঝেয় বসে কেন? নিন সব তয়ের"

"ওষুধ?"

"সব ready Sir"—

"আমি মরে ঘুমিয়েছিলুম হে।"

"ভালই হ'য়েছে। জল গরম। কুলকুচোটা করে চা খান"—

"সে প্যাণ্টটা?"

"আজ্ঞে পরাই আছে Sir"

"All right—ওষুধগুলো নিও।—গিয়ে কি যে দেখব মাণিক—"

"ভালই দেখবেন।—ওদের প্রাণ আমাদের মত পল্‌কা নয়।"

কথাটা বিনোদের কাণে বড় কটু লাগলো।

মাণিকলালও তাঁর ভাবটা দেখে চুপ করলে—

"আচ্ছা এখন দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক। বোধ হয় বাড়াবাড়ি হয় নি। ওষুধগুলো ভুলো না।"

"সঙ্গেই আছে।"

পাড়ায় ঢুকে—"সবি যে ফুসের বুঁড়ে হে! কোনটি? ওর মধ্যে যে সহজ মানুষই বাঁচে না!"

"আমরা তো বেঁচে আছি মশায়—"

"হ্যাঁ, সব ওই এক মায়ের পেটেরই বটে! তাই না তোমাকে বলছিলুম—ওদের ওদের করচ কেন?"

একটি মেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুচছিল। বিনোদ বললেন—"হ্যাঁ, ঐ মেয়েটিকেই তো কাল দেখেছিলুম। আমাদের অপেক্ষাই করছে বোধ হয়। ভেতরে ঢুকে গেল। চোখ মুচছিল না?"

"রাত জেগেছে কিনা, ঘুমুতে পায় নি, তাই চোখ রগড়াচ্ছিল। ভাববেন না—আমি না হয় এগিয়ে দেখছি—"

"তাই করো মাণিক—"

মাণিক যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি বৃদ্ধাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। মাণিকের ঈশারা মত ডাক্তার এগিয়ে গেলেন।

বৃদ্ধা—"আমার বিনোদীকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তার সাহেব। আমার আর কেউ নেই, আমি তার অন্ধ মা—"

মাণিকলালই কথা কইলে—"কোনো ডর নেই মায়ি, লেড়কা আরাম হো যায়গা—ডাক্তার সাহেব এসেছেন।"

"কাহাঁ ডাক্তার সাহেব" বলে বৃদ্ধা তাঁর চরণোদ্দেশে হাত বাড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল।

বিনোদ সযত্নে ধরে ফেললেন, বললেন—"ভেব না মা, রামজি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই তো বিনোদীকে আরাম করে দেবেন। চলো আমি তাকে দেখবো। এখন সে কেমন আছে, রাতে কেমন ছিল?"

"রাতে দু'তিনবার—পা গেল, পা গেল বলে কুঁকড়ে যাচ্ছিল, আর দণ্ডে দণ্ডে জল চেয়েছে। কিছুক্ষণ থেকে প্রলাপের মত—রামজি আয়া, রামজিকো বয়েঠনে দো—বলতে বলতে—চুপ করেছে বাবা—ঘুম কিনা দয়া করে দেখুন ডাক্তার সাহেব—"

বিনোদ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দেখলেন—সুন্দর সরল যুবা। মুখ চোখ ঠিক আছে। ঘুমই বটে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে বললেন—"এখন কেউ কাছে যেও না, ডেকো না, ঘুমুতে দাও।—আমি—পাড়াটা ঘুরেই এখুনি আসছি।"

বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে, মাণিকলালকে নিয়ে বিনোদ বেরিয়ে পড়ল। মাণিককে বললেন—"দেখলে তো—ছেলেটি ইতর সাধারণের মত নয়—but age and health against him—মা দয়া করুন। ওষুধের ওপর দুখ্ দরদ না রেখে, পুকুর, খানা, ডোবা, কুয়ো সব ব্লিচিং পাউডার ঢেলে disinfect—নির্দ্দোষ করে ফ্যালো।"

"যে আজ্ঞে—"

হিন্দুনারীর দায়াধিকার ও হিন্দু কোড্

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, এম্ এল্, পুরাণরত্ন

হিন্দুনারীর দায়াধিকার বিলটীর সম্বন্ধে বহু বিতর্ক চলিতেছে। ইহার পক্ষে ও বিরুদ্ধে বহু আলোচনা হইতেছে। যাঁহারা স্বপক্ষে তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিলটী পাশ হইলেই হিন্দুনারীর বর্ত্তমান অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে। আবার যাঁহারা বিপক্ষে তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিলটী পাশ হইলে হিন্দুর সর্ব্বনাশ হইবে। এই দুইটী মতই extreme বা উৎকট। যাঁহারা ভাবিতেছেন যে "এই আইনের দ্বারা হিন্দুনারীর হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার হইবে এবং সামাজিক মর্য্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় বাড়িবে" (শ্রীবেলা দত্ত চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ প্রবাসী মাঘ ১৩৫১ দ্রষ্টব্য)—তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের মুসলমান সমাজের নারীজাতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিবেন। আইনের বলে পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিতে ভ্রাতার সহিত দায়াধিকার পাইলেই যদি সামাজিক মর্য্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের কোটী কোটী পুরুষ মর্য্যাদাবোধহীন ও আত্মপ্রত্যয়শূন্য কেন? প্রগতির ধুয়া ধরিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন যে নারীর সম্মান বোধ হয় এই অধিকারের অভাবেই নাই। যাহার যে জিনিষ বা অধিকার নাই তাহার সেই জিনিষ বা অধিকারের জন্য প্রলোভন স্বাভাবিক। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে দায়াধিকারের সহিত মর্য্যাদা বা আত্মপ্রত্যয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। অর্থনৈতিক কারণে সম্মানের হ্রাস বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ভ্রাতার সহিত উত্তরাধিকার পাইলেই যে নারীজাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে বা সম্মানের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে ও হঠাৎ নারীজাতির আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠিবে তাহা মনে হয় না। আমাদের দেশে নারীজাতির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন,কিন্তু তাহা কি পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ভ্রাতার সহিত অধিকারে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিলেই সম্পন্ন হইবে? যদি কেবল এই দায়াধিকারের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইত তাহা হইলেও বুঝিতাম যে এক প্রবল সমস্যার সমাধান এই আইনের দ্বারা হইতেছে কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মুসলমান সমাজের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে কেবল দায়াধিকার দ্বারা অর্থ-নৈতিক সমস্যার মীমাংসা হইবার নয়। দেশের স্বাধীনতার সহিত অর্থনৈতিক সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা ও কৃষ্টির দ্বারা হিন্দুনারীর আজ যে সম্ভ্রম ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী হইয়াছেন তাহা কেবল শিক্ষার দ্বারাই বৃদ্ধি হইতে পারে। হিন্দুনারীর ভ্রাতার সহিত সমান দায়াধিকার না থাকা সত্ত্বেও আজ ভারতবর্ষে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরলাদেবী, শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ন্যায় নারী সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্রী। দায়াধিকারের অভাব ত তাঁহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। অথচ দায়াধিকার সত্ত্বেও বাঙ্গালা দেশের মুসলমান সমাজে এরূপ নারীর সংখ্যা কি বিরল নয়? ইহা হইতে কি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না যে কেবল দায়াধিকার দান করিলেই হিন্দুনারীর অবস্থার উন্নতি হইবে না।

তাহাই যদি হয় আমরা আজ এই হিন্দু দায়াধিকার আইনের হঠাৎ আমূল পরিবর্ত্তন করিব কেন? প্রত্যেক বিষয়ের একটী ঐতিহাসিক দিক আছে। হিন্দু আইনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে হিন্দু দায়াধিকার আইন চিরকাল একভাবে নাই। ইহার ক্রমোন্নতি হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণীর দার্শনিক ব্যবহারশাস্ত্রাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই ইহার ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু সেই ক্রমোন্নতি এরূপভাবে হওয়া উচিত যে মূলসূত্রের সহিত তাহার যেন যোগ থাকে। এই যোগ ছিন্ন হইলে হিন্দু আইনের বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে। আমার মনে হয় রাও কমিটী হিন্দু কোড্ প্রস্তুতের সময় এই তথ্যটীর প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন নাই। হিন্দু দায়াধিকার আইনের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না একথা যেমন ভুল, সেইরূপ হিন্দুদায়াধিকার আইন এরূপভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে যে হিন্দু আইনের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া ইহাকে কতকগুলি বিভিন্ন আইনের সমষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে তাহাও ভুল। রাও কমিটি কার্য্যতঃ তাহাই করিতেছেন। তাঁহারা সংহিতা সৃষ্টির নামে কতকগুলি বিভিন্ন আইনের ধারা হিন্দু আইনে সংযোজিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে হিন্দু আইনের ইতিহাসের ধারা ক্ষুণ্ণ হইবে এবং এই আইন সাধারণের শ্রদ্ধালাভ করিতে পারিবে না। রাও কমিটীর প্রস্তাবিত হিন্দু কোড্ বা সংহিতার প্রধান লক্ষ্য দুইটী—(১) বৃটিশ ভারতের হিন্দুরা এখনও যে সব বিষয়ে হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত হয় সে সব বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত হিন্দুর জন্য এক আইনের প্রবর্ত্তন (২) হিন্দু আইনের সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার। এই দুইটী উদ্দেশ্যই সাধু কিন্তু প্রস্তাবিত কোড্ দ্বারা তাহা কতদূর সাধিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া হিন্দু আইনের নিজস্ব ভাব ও স্বাতন্ত্র্যের মূলে আঘাত করা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা দেশের সুধীগণের বিচার্য্য। আমার মনে হয়, হিন্দু আইনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও মূল সূত্রগুলির সহিত যোগ ছিন্ন না করিয়া তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত বিকাশলাভ করিতে দেওয়া হইলে হিন্দু দায়াধিকার আইন বর্ত্তমান যুগোপযোগী হইবে এবং সকলের গ্রহণীয় হইবে। হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে রাও কমিটীর প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ—নিকট সম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মোটামুটি দায়ভাগের অনুসরণ এবং দূরসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মোটামুটি মিতাক্ষরার অনুকরণ। কারণ নিকট সম্পর্কীয়-গণের উত্তরাধিকারে দায়ভাগের বিধান মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার অধিকতর

অনুরূপ এবং দূরসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মানুষের বিশেষ কোন স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে না। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে কাহারও কোন বলিবার থাকে না, কারণ হিন্দু আইনের বৈশিষ্ট্য ইহা দ্বারা নষ্ট হয় না। ইহা ক্রমোন্নতির পরিচায়ক। কিন্তু দ্বিতীয়তঃ রাও কমিটীর প্রস্তাবে স্ত্রী সম্পর্কীয়দের উত্তরাধিকারের স্বত্ব প্রচলিত আইন অপেক্ষা বেশী স্বীকার করা হইয়াছে এবং মুসলমান আইনের অনুকরণে বিধবা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। আমার মনে হয় ইহাতে হিন্দু আইনের ধারা ক্ষুণ্ণ হইবে ও হিন্দু আইনের বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য নষ্ট হইবে। সেইজন্যই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অধিকাংশ লোকের আপত্তি এবং এই আপত্তি যাঁহারা তুলিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মূর্খ নহেন অথবা সকলেই স্বার্থপর পুরুষ নহেন। অধিক দৃষ্টান্ত না দিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আপত্তিকারীদের মধ্যে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ন্যায় বিদুষী ও মর্য্যাদাসম্পন্ন আধুনিকা মহিলাও আছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে এই আপত্তি তুলিয়াছেন। প্রধানতঃ আপত্তিগুলি এইরূপ :—(১) ইহা দ্বারা হিন্দুর সম্পত্তি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া হিন্দুর আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটাইবে (২) সংসারে ভ্রাতাভগ্নীর মধুর সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া হইয়া বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিবে—প্রীতির ও স্নেহের সম্বন্ধ আর থাকিবে না (৩) কৃষিপ্রধান দেশে এই বিভাগের ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে (৪) হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু দর্শনের সহিত হিন্দু আইনের যে সম্বন্ধ তাহা ছিন্ন হইবে। এই আপত্তিগুলি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। ইহাদের প্রত্যেকটী ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার মত। এই আপত্তিগুলি খণ্ডনকালে হিন্দু কোডের একজন বিশিষ্ট সমর্থক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেন "সম্পত্তির যাহাতে ভাগ বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন রচিত হয় নাই। তাহা হইলে পিতার এক পুত্র অথবা দুই পুত্র মাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার সম্পত্তি পাইবে এইরূপ বিধান হইত। উত্তরাধিকার আইনের একটী প্রধান লক্ষ্য—যাহাদের উত্তরাধিকার ন্যায়সম্মত বলিয়া মনে হয় তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করা। অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্যই উত্তরাধিকারের একমাত্র, এমন কি প্রধান উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বাপের বিষয়ে মেয়েদের অংশ ও সে অংশ ছেলের অর্দ্ধেক নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। যাঁহারা এই ব্যবস্থায় হিন্দুর আর্থিক অবনতির আশঙ্কা করেন তাঁহারা সম্ভবতঃ ভাবিয়া দেখেন নাই যে ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এবং বহু দেশে ছেলেমেয়ের একসঙ্গে উত্তরাধিকার প্রচলিত আছে এবং তাহাতে তাহাদের অবস্থা হীন হইয়াছে ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।" ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে যেমন সম্পত্তির যাহাতে ভাগ বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন রচিত হয় নাই একথা সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে যাহাদের দায়াধিকার ন্যায়সম্মত কেবল তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই হিন্দু দায়াধিকার স্থির হয় নাই। তা ছাড়া 'ন্যায়সঙ্গত' কথাটির যথার্থ মাপকাঠি পাওয়া অতীব শক্ত। আজ রাও কমিটীর নিকট অথবা হিন্দুকোডের সমর্থকগণের নিকট যাহা ন্যায়সম্মত বলিয়া মনে হইতেছে কাল হয়ত দেখা যাইবে তাহা ন্যায়সম্মত নয়। ন্যায়ের দণ্ডে আজ যদি মনে হয় যে কেবল স্ত্রী পুত্র এবং কন্যার একসঙ্গে ত্যক্ত সম্পত্তি উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, তাহা হইলে যদি কেহ বলে যে বৃদ্ধ পিতা, মাতা বা ভ্রাতার অধিকার কি ন্যায়সঙ্গত নয় তাহা হইলে তাহার কি উত্তর রাও কমিটীর বা রাও বিলের সমর্থকগণ দিবেন জানি না। সেইজন্য আমার মনে হয় হিন্দুদায়াধিকার আইন যে মূলসূত্রগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সূত্রগুলির সহিত যোগ রাখিয়া এই সংস্কার প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের নিব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকার করিলে নিব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রী পুত্র কন্যা ইহাদের একসঙ্গে সম্পত্তিতে অধিকার দিবার যে প্রস্তাব তাহা হিন্দু দায়াধিকার আইনের মূলসূত্রগুলির বিরোধী এবং তাহা গ্রহণ করিলে হিন্দু-আইনের ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য ক্ষুণ্ণ হইবে। মুসলমান আইনে মৃতব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার যে নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা হইতেছে এই যে মৃতের নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে যাঁহাদের দাবী বেশী তাঁহারাই উত্তরাধিকারী। কোরাণে লিখিত আছে—"পিতামাতা এবং পুত্রগণের মধ্যে কে অধিক নিকট এবং উপকারী তাহা বলা শক্ত।" আধুনিক যুগের অত্যাধুনিকদের নিকট কি কোরাণের এই বাণী অর্থশূন্য? যাহাদের উত্তরাধিকার ন্যায়সঙ্গত তাহাদের উত্তরাধিকার প্রদান করিতে হইলে মুসলমান আইনের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে হয়। জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটী সেইজন্য আশ্রিত পিতামাতা ও বিধবা পুত্রবধূকেও পুত্রকন্যার সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও যাহাদের উত্তরাধিকার ন্যায়সঙ্গত তাহাদের উত্তরাধিকার প্রদান করা হয় না কারণ পিতামাতা আশ্রিত হউন বা ধনী হউন, তাঁহাদের অধিকার পুত্রকন্যার অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যায়ের দণ্ডে কম নয়। এইভাবে ন্যায়ের বিচার সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং সেইজন্যই হিন্দুআইনে উত্তরাধিকারীর স্তর সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই স্তরে পুত্রের স্থান প্রথমে রাখা হইয়াছে—কারণ পুত্রই সর্ব্ব বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে পিতার সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ। এ কথা আজ জোর করিয়া যদি কেহ অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাহা জোরের কথাই হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। প্রত্যেক ব্যাপারের ন্যায় আইনের ক্ষেত্রেও বিবর্ত্তন (evoiution) বাঞ্ছনীয়, বিপ্লব (revolution) নয়। কারণ বিপ্লবের ফল অধিকাংশ সময়েই মন্দ হয় এবং জনসাধারণ বিপ্লবপ্রসূত কোন ব্যাপার সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও রাও কমিটীর হিন্দু কোড, যেরূপভাবে দায়াধিকারের সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাকে বিবর্ত্তন বলা যায় না কারণ বর্ত্তমান আইনের যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত সম্প্রসারণ ইহা নয়। প্রত্যেক সভ্যজাতি স্বীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রত্যেক ব্যাপারের উন্নতি চায়। ইংরাজ জাতির আইনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে স্বীয় ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইংরাজ জাতি আইনের কিরূপভাবে উন্নতি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট ইংরাজ লেখকের নিম্নের বক্তব্যটী প্রণিধানযোগ্য :

"ইংরাজ জাতির সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডে এইরূপ মনীষাসম্পন্ন বিচারকগণ জাতীয় ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে তাঁহারা ইংরাজ জাতির আইনের মূলসূত্রগুলির সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া ব্যবহারশাস্ত্রের এইরূপ উন্নতি ও সংস্কার সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে তাহা প্রত্যেক যুগের উপযোগী হইয়াছে। রাষ্ট্রের ও আইনের ইতিহাসে এই সামঞ্জস্য রক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা এই মঙ্গল সাধন করিয়াছে যে ইহা ইংরাজজাতির আইনের প্রতি চিরন্তন শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছে এবং শ্রদ্ধা হইতেই ইংরাজ জাতির নিয়মানুবর্ত্তিতার অভ্যাস বিকাশলাভ করিয়াছে। আইনশাস্ত্রের ইতিহাসেও এই সামঞ্জস্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কম নয় কারণ ইহা দ্বারাই ব্যবহারশাস্ত্রের যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত বিবর্ত্তন সম্ভব এবং এইরূপ বিবর্ত্তনের ফলে দেশে একটী স্থায়ী ব্যবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে।" অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতি স্বীয় জাতীয় ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রত্যেক ব্যাপারের উন্নতি প্রার্থনা করে। হিন্দু আইন—যাহার সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন যে ইহার অতি প্রাচীন উদ্ভব সত্ত্বেও ইহার ধারার কোন লক্ষণ নাই—যদি আজ কয়েকজন অত্যাধুনিকের অতিতৎপরতায় স্বীয় সামঞ্জস্য বিচ্যুত হয় তাহা হইলে সত্যই পরিতাপের বিষয়।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মণিমোহন যখন ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আসিল—তখন রোদ বেশ চড়িয়াছে। চারিদিকের জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে প্রতিদিনের চিরন্তন কর্ম্মকুশলতা লইয়া। জেলেপাড়ায় কালো কালো প্রকাণ্ড কড়াইগুলিতে গাবের রস জাল দেওয়া হইতেছে—রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া অতিকায় বেড়াজাল শান্ত রোদে শুকাইতেছে—ফাঁসের এখানে ওখানে রূপোর টুকরার মতো চিক চিক করিতেছে মাছের আঁশ। লেংটি-পরা এবং উলঙ্গ একপাল ছেলেমেয়ে বিহ্বল ভীত চোখে মণিমোহনকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কতগুলি মাথা ভাঙা সুপারীর গাছ এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া তিনবছর আগে যে সাইক্লোন বহিয়া গেছে তাহারি চিহ্ন বহন করিতেছে যেন। আদিম বর্ব্বরদের উত্তর-পুরুষেরা মাথায় টোকা পরিয়া, হাতে হাঁসুয়া লইয়া এবং কাঁধে লাঙল তুলিয়া নিরীহের মতো কাজ করিতে চলিয়াছে। একজনের হাতে একটা হুঁকা, চলিতে চলিতেই সে তাহাতে গোটাকতক টান মারিল। সব যেন নিজের চক্রপথে ঘুরিতেছে নির্ভুল নিয়মে, এতটুকু ছন্দপতন হইবার আশংকা বা সম্ভাবনা নাই কোনোখানে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ছয় ফুট উঁচু যে সমস্ত মানুষের পায়ের চাপে মাটি টলমল করিত, আজ তাহারা কোথায় গেল?

তাহারা নাই—কিন্তু একেবারেই কি নাই? সময় যখন আসে, তখন তাহারাও কি ধুলা-হইয়া-যাওয়া কবরের তলা হইতে ঠেলিয়া ওঠেনা নতুন সাড়া লইয়া, নতুন মত্ততা লইয়া? তাহা হইলে জমিরের চোখে কিসের আগুন দেখিল সে? ওই যে মানুষগুলি অহিংস অনাসক্তভাবে মন্থরগতিতে পথ চলিতেছে—সময় আসিলে ওরা কি অমনি প্রশান্ত স্তিমিত চোখ মেলিয়াই তাকাইয়া থাকিবে? ইহাদের সকলের কাছ হইতেই কি বিন্দু বিন্দু করিয়া আগুন লইয়া জমিরের চোখ অমন দপ দপ করিয়া শিখায়িত হইয়া ওঠে নাই?

ডাকবাংলোর বারান্দায় রাণী বসিয়া আছে। রোগক্লান্ত মুখশ্রীতে একটা শান্ত কমনীয়তা—একটা অপরূপ মাধুর্য। এই তো বাংলা দেশ—করুণ আর স্নিগ্ধ। বর্দ্ধমানের ধানক্ষেতের পাশ দিয়া দ্রুতগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চলিবার সময় চারিদিকের পৃথিবীকে যেমনটা মনে হয়, ঠিক তেমনই। এখানে ওখানে বিল আর মরা-নদীর জল ঝলমল করিতেছে, তাহার উপরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে খণ্ড চন্দ্রের মধু জ্যোৎস্না। ছোট ছোট গ্রামগুলি আমবাগানের অন্ধকারে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে। যতগুলি লাল নীল আলো হাতছানি দিয়া ডাকিল—কালো কাঁকর ফেলা টিনের শেড্ দেওয়া নগণ্য একটি ষ্টেশনে আসিয়া দম লইল রেল-গাড়ি। সেখান হইতে এক মেটে পথ দিয়া বাজারটি পার হইলেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারের আশ্রয় মিলিবে। পথের ধারে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া গন্ধ ছড়াইতেছে—সান্ধ্য-হুঙ্কারকে উপলক্ষ করিয়া বৈরাগীর আখড়া হইতে উঠিতেছে কীর্তনের সুর। বাড়ির সদর দরজায় একটুখানি ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল দরজাটা। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গলবস্ত্রে একটি প্রণাম করিতেছে—তাহার সীমন্তে এয়োতির চিহ্ন গৃহস্থের মঙ্গল আর কল্যাণের বার্তার মতো জাগিয়া আছে। এই রাণী, আর এই বাংলা দেশ।

সপ্রেমে মণিমোহন রাণীর দিকে তাকাইল: এই সকালে উঠেই বাইরে এসে বসেছ যে? ঠাণ্ডা লাগবে না?

রাণী হাসিল: এত রোদ—সকাল কোথায়? ঠাণ্ডা লাগবে না···ভয় নেই তোমার। কী সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, দেখেছ? ঘরে থাকতে কি ইচ্ছে করে?

—জ্বর নেই তো ?

—না।

রাণীর হাতটা টানিয়া লইয়া মণিমোহন নাড়ী পরীক্ষা করিল হুঁ ছেড়ে গেছে। কবিরাজ চিকিৎসা করে ভালো, পাঁচনের গুণ আছে দেখছি। ঝিণ্টু কোথায় ?

—ওই তো।

একটু দূরেই ছোট একটা ঝোপ। নাম-না-জানা একরাশ বেগুনী রঙের ফুলে আকীর্ণ হইয়া আছে। ছোট বড় কতগুলি প্রজাপতি সকালের আলোয় উল্লসিত পাখা কাঁপাইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরই দু একটাকে ধরিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিতেছে ঝিণ্টু।

—প্রজাপতির সন্ধানে আছে বুঝি ? কিন্তু এদিকের ঝোপ-জঙ্গল বড় খারাপ, সাপ-খোপ থাকতে পারে। ঝিণ্টু, ঝিণ্টু !

—আসছি বাপী !

—না, এক্ষুণি চলে এসো।

অপ্রসন্ন হইয়া ঝিণ্টু ফিরিয়া আসিল—একেবারে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল বাবার কোলের কাছে। ছোট মাথাটির চুলগুলি আঙুল দিয়া আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল—শিকার মিলিল ? ধরতে পারলে প্রজাপতি ?

—না বাপী, ভারী দুষ্টু ওরা। ধরা যায় না।

—ধরতে নেই ওদের। ঝিণ্টুকে দুহাত দিয়া হাঁটুর উপর তুলিয়া আনিয়া মণিমোহন বলিল, আমি তোমাকে খুব মস্ত একটা ঘোড়া কিনে দেব, আর একটা মোটর। কেমন, তা হলে তো হবে।

পিয়ারী চা আর টোষ্ট লইয়া দর্শন দিল। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা টোষ্ট অধিকার করিল ঝিণ্টু। রাণী হাসিয়া বলিল, ঝিণ্টু কী বলেছে জানো না বুঝি ? ও আর মোটর কিংবা ঘোড়ায় চড়বেনা। একেবারে এরোপ্লেনে উঠে কোথায় যেন যুদ্ধ করতে যাবে।

—সত্যি নাকি ? তা হলে পুরোদস্তুর পাইলট ?

ঝিণ্টুর সমস্ত মনোযোগ হাতের পাঁউরুটির টুকরাতেই সীমাবদ্ধ। সংক্ষেপে জবাব দিল, হুঁ। রাণী বলিল, বেশ, তা হলে এই কথাই ঠিক রইল। কালই তোমার জন্যে এরোপ্লেন আনা হবে, তাইতে চড়ে তুমি যুদ্ধ করতে যেয়ো। কিন্তু একটা কথা আছে। সেখানে মা ও থাকবেনা, বাপীও থাকবেনা। কার কোলে উঠবে, কার বুকের মধ্যে ঘুমোবে, শুনি ? আর পিয়ারীও যাবেনা—আমাদের চা করে দিতে হবে তো। তা হলে যুদ্ধটা কার সঙ্গে হবে ?

ঝিণ্টু বিশ্বাস করিলনা, ভয়ও পাইলনা। কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিল, তারপরে বলিল, ঈস্ !

রাণী ছেলেকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিল, দুষ্টু !

মণিমোহন সস্নেহে গভীর দৃষ্টিতে ঝিণ্টুর কচি কোমল মুখের দিকে তাকাইল, তাকাইল রাণীর স্নেহ সুকুমার নিবিড় দুইটা কালো চোখের দিকে। তাহার সন্তান, তাহার স্ত্রী, তাহার সংসার। বর্দমানের পল্লীপ্রান্তে সেই শঙ্খধ্বনিমুখরিত বিরাম মধুর সন্ধ্যাটির বার্তা যেন ইহারা বহন করিয়া আসিয়াছে। এই চর ইসমাইলে ইহাদের মানায় না—এই খাপছাড়া জগতের বন্যতার মাঝখানে একান্তভাবেই অনাহূত আগন্তুক।

—আর না রাণী, চলো, এখান থেকে ফিরে যাই।

—কেন, কাজ কি শেষ হয়ে গেছে তোমার ?

—কাজ তো শেষ করলেই শেষ হয়ে যায়, আবার বাড়ালেই বাড়ে। আরো পাঁচ সাতদিন থাকতে পারলে অবশ্য ভালো হত, কিন্তু তোমার শরীর টিকছেনা এখানে। যা হতভাগা দেশ, একটু ওষুধ-বিষুধের ব্যবস্থাও তো করা যায় না দরকার হলে। তা ছাড়া আমারও ভালো লাগছে না।

—বেশ তো, তোমার ভালো না লাগে, চলো।

—হুঁ, তাই ভাবছি। দেখি, কাল পরশুর মধ্যেই—

বাংলোর কম্পাউণ্ডের বাহিরে একটা সাইকেল দ্রুতগতিতে আসিয়া থামিল। নামিল ইউনিফর্ম-পরা একটি মূর্তি—পুলিশের লোক নিঃসন্দেহ। চোখে মুখে তাহার একটা ব্যগ্র ব্যস্ততা। কিন্তু বাংলোর বারান্দায় রাণীকে দেখিয়াই সে চমকিয়া থামিয়া দাঁড়াইল, তারপর সাইকেলটা লইয়া কয়েক পা পিছনে সরিয়া গেল।

—কে আবার এল এই সময় ? একটু বিশ্রাম করতেও এরা দেবেনা নাকি ? ভেতরে যাও তো রাণী। লোকগুলো জ্বালাতন করে মারল একেবারে। নাঃ, কালই পালাতে হল এখান থেকে। ঝিণ্টুকে টানিয়া লইয়া রাণী ভিতরে চলিয়া গেল।

—পিয়ারী, ভাখ তো কে এসেছে। ডেকে নিয়ে আয়।

যিনি আসিলেন, তিনি পুলিশের দারোগা। সশ্রদ্ধভাবে একটা নমস্কার করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, একটু জরুরি তাগিদেই আপনাকে বিরক্ত করতে হল স্যার, কিছু মনে করবেন না।

পলকের জন্য জমিরের আগ্নেয় দৃষ্টিটা মণিমোহনের চেতনার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। নতুন প্রাণ, নতুন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বলিষ্ঠ বুকের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কোন্ অনাগত কালের সুনিশ্চিত পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে যেন। আর দারোগার মুখে যা প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তা কি রাশীকৃত ক্লান্তি আর অবসাদ ? যেন বোঝা টানিতে টানিতে নিজের সম্পর্কেই বিস্ময়করভাবে অনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছে ! যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়া যাক, পৃথিবী যেমন করিয়া চলিতেছে, তেমনি ভাবেই চলুক।

তাহার জীবনটা যেন নিমিত্ত মাত্র—তাহার বেশি এতটুকু কোথাও কিছু নাই। পুলিশের চাকুরী আর ফকিরিটা তাহার কাছে একই পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রয়োজন হইলেই সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া কম্বল অবলম্বন করিতে পারে।

মণিমোহন বলিল, বলুন, কী দরকার?

অত্যন্ত সংকোচে দারোগা বসিলেন। ঘর্মাক্ত মলিন টুপিটা রাখিলেন টেবিলের উপরে—শ্রান্তস্বরে বলিলেন, আমি মামুদপুর থানার দারোগা।

—চা খাবেন এক পেয়ালা?

—না, থ্যাঙ্কস স্যার। চা আমি খাই না।

—তা হলে কী বলছিলেন, বলুন।

দারোগা বড় করিয়া একটা নিশ্বাস টানিলেন—যেন বাতাস হইতে খানিক অক্সিজেন আকর্ষণ করিয়া নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করিয়া লইতে চান। আবার জমিরের ছায়ামূর্তিটা মণিমোহনের চেতনার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। ইহারা দুইজন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমানে সমানেই তো? একজন নতুন জীবনের আলোকে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, আর একজনের সর্বাঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু শ্রান্তির দ্যোতনা। জয় হইবে কার?

দারোগা বলিলেন—আগষ্ট মুভমেন্টের ব্যাপার আশা করি, জানেন স্যার।

—জানব না কেন, ভারতবর্ষের মানুষ তো। কিন্তু কী হয়েছে, এখানে আবার নতুন করে একটা ওইরকম আন্দোলন দেখা দেবে নাকি?

—কী যে বলেন স্যার।—গর্বে গৌরবে দারোগা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার কণ্ঠে আত্ম-প্রত্যয়ের সুর লাগিল: আমার এলাকায় ট্যাঁ ফোঁ করতে আমি দেবনা, সেদিক দিয়ে শক্ত আছে বনোয়ারী দারোগা।

অকারণেই মণিমোহনের ঠোঁটের আগায় সূক্ষ্ম একটুকরা হাসি খেলিয়া গেল: তা হলে তো আর কথাই নেই; কিন্তু আপনার সমস্যাটা কোথায়?

—তাই বলছিলাম স্যার। আমার এলাকায় না হলেও আমাদের জেলাতে নানা রকম ট্রাবল্‌স হয়ে গেছে, আপনি বোধ হয় সবই জানেন। খবর পেয়েছি, ওখান থেকে জনকয়েক অ্যাব্‌স্কণ্ডার এসে কালুপাড়ায় লুকিয়ে আছে। সদরে খবর দেওয়ার সময় নেই, তার আগেই হয়তো পালাবে। তাই আপনি একটু হেল্প করবেন, মানে লীড্ করবেন আমাদের। একজন রেস্‌পন্‌সিব্‌ল অফিসার যখন আছেন—

মণিমোহন অপ্রসন্ন হইয়া গেল। বড় ঝামেলা—অত্যন্ত বিরক্তিকর। তা ছাড়া এ তার কাজও নয়। বলিল, আপনারাই যান না। আমাকে আবার এর ভেতরে কেন?

—বুঝতে পারছেন না স্যার। রিস্কি ব্যাপার তো—হয়তো ফায়ার করতে হবে। আপনি থাকলে আমার দায়িত্বটা কমে, সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়।

—আচ্ছা বেশ, যাবো আমি।—মণিমোহনের মুখের উপর দিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল: কখন যেতে চান?

—শুভস্য শীঘ্রম্ স্যার—এক সারি দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন দারোগা: একটা পাকা খবরের জন্যে অপেক্ষা করে আছি। লোকও পাঠিয়েছি। যদি ডেফিনিট্ হতে পারি. তা হলে কাল রাত্রেই রেইড্ করব। আজ আমি সদরে একটা টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি—দেখি কী জবাব আসে। ওখান থেকে লোক পাই ভালোই, নইলে যা করবার আমাদেরই করতে হবে।

—তা হলে আগেই আমাকে খবর দেবেন।

—দেব স্যার, নিশ্চয় দেব। সে আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আর আপনার কোনো অসুবিধেই হবেনা—সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই ঠিক করে রাখব আমরা। আপনি শুধু আমাদের সঙ্গে থাকবেন, তা হলেই জোর পাবো আমরা—বুঝতে পারছেন না?

—বুঝতে পারছি।—ক্লান্তি-বিরক্ত মণিমোহন প্রসঙ্গটা থামাইয়া দিবার জন্যই যেন উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, তাই হবে।

দারোগা টুপিটা তুলিয়া লইলেন টেবিলের উপর হইতে। এত উৎসাহ, উদ্দীপনা সত্ত্বেও মণিমোহনের মনে হইল দারোগার চোখের কোণায় ক্লান্তির মসীরেখাটা যেন গাঢ়তর হইয়া পড়িতেছে।

—তা হলে আসি স্যার, নমস্কার। কিছু মনে করবেন না।

—না, না, মনে করবার কী আছে। এ তো আপনার ডিউটি—আমারও। আচ্ছা, নমস্কার। প্রত্যুত্তরে দারোগা আবার খানিকটা বিগলিত হাসি হাসিলেন, তারপরে সাইকেলে উঠিয়া বেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার অনেক কাজ—এতটুকুও সময় নাই।

রেলিংয়ের উপরে ভর দিয়া শূন্য চোখে নদী আর দিগন্তের দিকে তাকাইল মণিমোহন। আবার এক নতুন বিড়ম্বনা দেখা দিল—ফেরারী ধরিয়া বেড়াইতে হইবে তাহাকে। যাহারা দেশে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, যুদ্ধকালীন নিরাপত্তায় বিঘ্ন সঞ্চার করিয়াছে—অপরাধী তাহারা নিশ্চয়ই—শাস্তি তাহাদের পাইতেই হইবে?

কিন্তু ইহারা কাহারা? পলকের জন্য তাহার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল: কী ধাতু দিয়া এই ছেলেগুলি তৈরী হইয়াছে? ঘর থাকিতেও ঘর ভাঙিয়া মৃত্যু এবং রাজরোষের অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল কী কারণে এবং এই সর্বনাশা প্রেরণাই বা পাইল কোথা হইতে?

মানস-দৃষ্টির সামনে ভাসিয়া গেল আগা খাঁ প্রাসাদের বন্দী শিবির। রুগ্না পত্নীর মৃত্যু-শয্যার পাশে ধ্যান-স্তিমিত নেত্র মেলিয়া বসিয়া আছে Naked Fakir of India—তাহার মুখের উপরে প্রসন্ন সূর্যালোক স্বর্গ কিরণের মতো বিচ্ছুরিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ঘোষাল

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে ভারতীয় ভাবধারায় শুচিস্নাত করিয়া পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও জীবনের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য যে কয়েকজন মনীষী আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন তন্মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ —শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী। যে শিক্ষা আমাদের দেশে এখন চলিতেছে তাহার যে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। সংস্কার সুরু হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই। সংস্কার কিরূপ হইবে ও কোন্ পথে আসিবে তাহারও একটা মোটামুটি আভাস আমরা পাইয়াছি। কেননা, এখন আমরা সকলেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, এই শিক্ষার সহিত দেশের নাড়ীর কোনও সম্পর্ক নাই; ইহার শিকড় দেশের মাটী হইতে রস আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে নাই। ইহা কচুরিপানার মত ভাসিতে ভাসিতে এই দেশে আসিয়াছে; আমরা যত্ন করিয়া তুলিয়া আনিয়া টবে বসাইয়া উপরের বারান্দা হইতে ঝুলাইয়া দিয়াছি ইত্যাদি।

কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য কি উপায় ছিল? যে শিক্ষাকে আমরা একদিন বরণ করিয়া তুলিয়াছি, যে শিক্ষার অনিশ্চিত ফলের কথা স্মরণ করিয়া মাতা ক্রোড়স্থ শিশুর কানে কানে গাহিয়াছেন—'লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে'—তাহার স্বস্তিবাচন ছিল "To form a class who may be interpreters between us and the mellions whom we govern—a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect."

সুতরাং ইহার দক্ষিণান্ত যে 'হরীতকীফলমিবম্' না হইয়া 'রম্ভায়' সারিতে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

কিন্তু কে আমাদের অবচেতন মনকে সর্ব্বপ্রথম প্রবুদ্ধ করিল? কে আমাদের বলিল, 'জাগৃহি'? শিক্ষা-সমস্যা, শিক্ষাসংস্কার, শিক্ষার বাহন, শিক্ষার . মিলন সম্বন্ধে আমরা যত কথা বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি তাহা রবীন্দ্রনাথের বাণীর পুনরাবৃত্তি মাত্র।

প্রায় বায়ান্ন বৎসর পূর্ব্বে ১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান শিক্ষার এই গলদ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিব, আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব, সে-গৃহের উন্নত-চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্য্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না; আমাদের আকাশ পৃথিবী, আমাদের নির্ম্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোন সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই। আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল আমাদিগকে কেরাণীগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র। * * * যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি, সেই সিন্দুকের মধ্যেই আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই।"

একটু অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান; ইহার গোড়ায় এই গলদ থাকায় আমাদের বিদ্যালয়গুলি প্রাণহীন; ছাত্ররা নিষ্প্রভ—নিরানন্দ, আমাদের বিদ্যালয়ের ইট, কাঠ, চেয়ার, বেঞ্চ এবং টেবিলের চাপে এমনই নিপীড়িত যে, আনন্দের এতটুকু অবকাশ সেখানে নাই। শিশুদের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির দিকে নজর না রাখিয়া শুধু পড়া মুখস্থ করিবার জন্য যে পাঠ্যতালিকা রচিত হইয়াছে তাহাতে শিশু-মনের স্ফুরণের অবকাশ কোথায়?

কি বাংলা কি ইংরাজী শিশু-পাঠ্যপুস্তক খুলিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুস্তকের ভাষা, ভাব, শব্দ ও বিষয়ের সহিত শিশুর পরিচয় নাই। এখন অবশ্য ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অভিনব প্রণালীতে নূতন নূতন পাঠ্য-পুস্তক বাহির হইতেছে। কিন্তু এই সংস্কারের মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী লেখনী। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন—"কোনো একটা শিশুপাঠ্য readerএ hay making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক; অথবা Snow ball খেলায় Charlie ও Katieর মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক। কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলি পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মত করিয়া কিছু দেখিতে পায় না।"

শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কয়েকজন আধুনিক ইংরেজ পণ্ডিতের মন্তব্য শুনুন। তাঁহারা ভারতবর্ষের কয়েকটী প্রদেশের স্কুল-কলেজ দেখিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—

"Neither cultural nor utilitarian needs can be met by an education which does not fully derive its content and its inspiration from the environment of the pupils. Some of the best Schools that we have seen in India are those which eschewing the teaching of English lease their instruction and their activities on the natural and social phenomena with which they

are familiar" প্রশ্ন উঠিবে, দোষ কার? রামপ্রসাদের গানের দুইকলি মনে পড়িয়া যায়—"স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

কেবল যে ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উপরিলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা নহে। বাংলা ভাষায় রচিত বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের রচনাপদ্ধতিও শিক্ষার্থীর মনে হৃৎকম্পের উদ্রেক করিত। চারুপাঠের 'চারুত্ব প্রলোভনে' চোখের বালির আশার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; 'বল্মীক' সম্বন্ধে সে যতই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে অক্ষরগুলা ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মত সার বাঁধিয়া চলিয়া যায় এবং চারুপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বেও "পুরুভুজ" সম্বন্ধে তাহার অনভিজ্ঞতা দূর হয় না।

এখনও এর জের মেটে নাই। এখনও দেখি যে কানমলার চোটে বাঙ্গালী ছেলেরা "জাড্য" কথঞ্চিৎ পরিহার করিলেও "বাত্যয়" হইবার দুরাশায় "কুজ্ঝটিকায়" "দিগ্বিদিক" জ্ঞান হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বেচারারা দোটানায় পড়িয়া মার খাইতেছে। বোধ করি ইহাদের কথা স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"বাঙালী ছেলের মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দ মনে ইক্ষু চর্ব্বণ করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চের উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধ মাত্র বেত হজম করিতেছে।"

শুধু তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে শিশুপাঠ্য কয়েকটী পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। বাজারের জিনিষ নহে বলিয়াই সম্ভবতঃ স্কুলের বাজারে ইহার প্রচলন নাই।

শিক্ষার মূলতত্ত্বগুলি রবীন্দ্রনাথ এরূপ সুন্দরভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়; মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে। তিনি দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, পথ-নির্দ্দেশ করিয়াছেন একথা স্মরণ করিয়া আমরা মনে বল পাই, সাহস পাই। আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌গণ সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেবল ভাষা শিক্ষার উপর অত্যধিক ঝোঁক দিবার নিন্দা করিয়াছেন। ইহাতে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীনতা নাই। ১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেলেন তাহাও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে দুইটী অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চ্চা না করিলে কাজের সময় তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত শুধু ভাষা শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। মাল-মসলা যাহা জড় হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপযুক্ত এত ইট-পাটকেল পূর্ব্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্ম্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয় সেইটেই একটা মস্ত ভুল।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির বহু বৎসর পরে, ইংরাজী ১৯৩৭ সালে ভারতসরকারের অনুরোধে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট ভারতীয় শিক্ষা সমস্যার সমাধান কল্পে দুইজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এদেশে পাঠান। এ. দেশের বিদ্যালয়গুলিতে পুঁথিগত বিদ্যার বাহুল্য ও ভাষা শিক্ষার উপর অত্যন্ত ঝোঁক দেখিয়া তাঁহারা যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রতিধ্বনি:—

"It is surprise to discover that this concentration at the infant stage on literacy as the goal of schooling finds its natural expression in the worship of literary facility at the higher stage. If the seed is sown in the infant school it is idle to complain of the fruit as it ripens in the University."

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শিক্ষার ধারাটা আগাগোড়া বিদেশী বলিয়া আমাদের দেশের শিক্ষাটা কাজে লাগিতেছে না। ধারা বা পদ্ধতির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দেশের উপযোগী করিয়া ইহার অদল বদল করা চলে। কিন্তু বিদেশী বলিয়াই যে শিক্ষাটি বর্জ্জনীয় তাহা নহে। বস্তুতঃ যাহা সত্য তাহা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে সত্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "যা সত্য তা'র জিয়োগ্রাফী নাই" ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা' পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়।"

আসল কথা, বিদেশীর জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে মধু আহরণ করিতে হইবে। কিন্তু তার উপযুক্ত বাহন চাই। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাভাষা তাহার উপযুক্ত বাহন। আমাদের শিক্ষা, শুধু উপযুক্ত বাহন পায় নাই বলিয়াই "স্কুল কলেজের জিনিষ হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে।"

"Sooner or later in the course of the higher education of Indian boys the English language becomes not only a subject of study but the medium through which instruction is given in other subjects. This is indeed another great hardship from which the system of education in India suffers—the use of a language not native to the people as a medium for their education."

এখন অবশ্য মাট্রিকিউলেশন পর্য্যন্ত ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য বিষয় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার বাহন করিতে হইবে। একটি মামুলি প্রতিবাদ উঠিতে পারে যে, বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ নাই। ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন:—

"শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারী করিবে। কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।"

সুখের বিষয়, এই বৎসর বাংলাদেশের কলেজের শিক্ষকদের যে সম্মিলন হইয়া গেল তাহাতে বাংলাভাষাকে উচ্চ-শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচটিকে একেবারে আগাগোড়া বদল করার অসুবিধাও আছে। অন্ততঃ কাজ খুব সোজা নহে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, এই কলটি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ ছাঁচে তৈয়ারী। ইহার উপাসকগণের সংখ্যাও কম নহে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "শুধু চাকরীর বাজারে নয়, বিবাহের বাজারে বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাতেই।" সুতরাং এই রাস্তাটাতেই যে, লোক চলাচল বেশী করিবে তাহা জানা কথা। কিন্তু অনেক ছেলে ভাষা শিক্ষায় তেমন পটু নহে। তথাপি তাহাদের শিখিবার আগ্রহ ও উদ্যম কাহারও অপেক্ষা কম নহে। এই সব ছেলেদের উচ্চ-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় গোড়া হইতে তাহাদিগকে আট্‌কাইয়া দিয়া দেশের শক্তির অপব্যয় করা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা সমাধানের একটি সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রিপারেটারি ক্লাস পর্য্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে ইংরাজী ও বাংলার দুইটি বড় বড় রাস্তা খুলিয়া দিতে। ইহাতে ভিড়ের চাপ কমিবে, শিক্ষার বিস্তার হইবে। এইরূপ ব্যবস্থায় দেশের মন মানুষ হইয়া উঠিবে।'

প্রকৃতপক্ষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। অভিভাবকদিগের প্রসন্ন দৃষ্টি যে, বাংলা অঙ্গের দিকে পড়িবে না তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "ইংরেজী চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িবে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে এবং এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিতে পারিবে।" কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাংলা অঙ্গ হইবে সজীব পদার্থ। তাই তিনি লিখিয়াছেন:—"কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয় দান করিবে।"

এইখানেই রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম দেশকে ভারতের বাণী শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। বাংলা অঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়েই সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

"এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং বাংলাভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার মত মিলিয়া যায়, তবে বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর পক্ষে একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।"

তাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী শুধু আজ বাঙালীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর মিলনতীর্থ। এই তীর্থেই ভারত পশ্চিমকে তাহার বাণী শুনাইবে। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় হইবে—

"দিবে আর নিবে মিলাবে মিলাবে,
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

বক্তব্য

শ্রীলেখা সেন

—"শান্তি তার কথা শেষ করতে পারলে না। কাসতে কাসতে তার মুখ দিয়ে আবার এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। ক্লান্ত হয়ে সে বিছানায় এলিয়ে পড়লো।"

এই পর্য্যন্ত পড়ে বিরক্ত হয়ে নিরুপমা বইখানা রেখে দিলে। কেন যে এই সব বাজে কথাগুলো লেখে। যক্ষ্মা রোগটা আজকাল নভেলের জগতে বড়ই ছড়িয়ে পড়েছে। ছোঁয়াচে রোগ কিনা। সকলেরই যক্ষ্মা হচ্ছে। আর যক্ষ্মা হলেই কথায় কথায় মুখ দিয়ে ঝলক ঝলক রক্ত উঠ্‌ছে। যা জানে না তা নিয়ে কেন যে কবিত্ব করতে যায় নিরুপমা ভেবে পায় না। তার হাসি পেল। সে নিজে এই রোগে ভুগছে আজ তিন বছর, কই তার মুখ দিয়ে তো, একদিন একফোঁটাও রক্ত উঠল না। সে স্যানাটরিয়ামে থাকে; তিনবছর রয়েছে, রোগী তো কম দেখল না, কিন্তু কারুরই মুখ দিয়ে যখন তখন রক্ত উঠে বিছানা লাল হয়ে যায় না। রক্ত ওঠে খুব কম রোগীর, সংখ্যায় তারা শতকরা দশটার বেশী হবে না। তাও রোজ রোজ ওঠে না, কিম্বা যখন রক্ত ওঠে তখন তারা প্রেমের কথা কয় না। কোন কথাই কয় না—ক্ষমতা থাকে না।

নিরুপমা ভাবে সে যখন ভাল হয়ে যাবে, এই নিয়ে কাগজে লিখবে, তার অনেক কিছু বলবার আছে। বাংলা দেশের লেখক-সমাজের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ জানাবে,—"দোহাই তোমাদের, মিনতি করছি, আমাদের তোমরা আর গল্পের নায়িকা কোরো না। কোন মাধুর্য্যই আমাদের নেই। মুখ দিয়ে রক্ত ওঠার মধ্যে কী অসীম সৌন্দর্য্যের সন্ধান তোমরা পেয়েছ তা

তোমরাই জান, কিন্তু আমি তো নিদারুণ যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। তোমরা শুধু দূর থেকে দেখে আর শুনে আমাদের নিয়ে যা খুসী তাই লিখো না। সত্যি যদি কাছে এসে ভাল করে দেখতে তাহলে হয়ত তোমাদের গল্প লেখবার সাধ মিটে যেত। যদি আর একটু ভাল করে মিশতে আমাদের সঙ্গে, দেখতে পেতে তোমাদের কল্পনার সঙ্গে কোথাও আমাদের মিল নেই। রোগের যন্ত্রণা ভোগ করে করে কী ভীষণ স্বার্থপর আমরা হয়ে গেছি। মায়া, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা সব আমাদের জ্বরের তাপে শুকিয়ে মরে গেছে। এই রূপরসগন্ধস্পর্শময় পৃথিবী—যা আজ আমাদের ভোগের বাইরে চলে গেছে, তার ওপরে আছে শুধু অসীম বিতৃষ্ণা। নিরুপায় হতাশাপূর্ণ হিংসা।" নিরুপমা শিউরে উঠলো। হিংসা? সে কী ভাবছে? সে কী আজ হিংসাও করছে অপরকে? এত অবনতি তার হয়েছে? কিন্তু আজ তো সে নিজের কাছে নিজেকে লুকোতে পারে না, মনোবিশ্লেষণ করে দেখতে পাচ্ছে, এই যে সব কিছুর প্রতি নিদারুণ ঔদাসীন্য,অসীম বিতৃষ্ণা,এটা হিংসারই নামান্তর ছাড়া কিছু নয়। অক্ষম বঞ্চিতের হিংসা।

প্রেম? প্রেম কী? নিরুপমা ভুলে গেছে। নিজেকে ভুলে গিয়ে একজনকে ভালবাসা তার সুখের জন্য নিজের কষ্টকে তুচ্ছ করা এই রকম কোন মনোবৃত্তি কি মানুষের থাকে? তার ছিল? কে জানে, নিরুপমা ভুলে গেছে। মনই কি আছে? সেও কবে মরে গেছে। এখন শুধু মানুষের সঙ্গে দেনাপাওনার সম্পর্ক। বহুদিন স্যানাটরিয়ামে বাস করার ফলে সে জেনেছে যে নিজের সুবিধা নিজে করে নিতে না পারলে কেউ তোমার মুখ চেয়ে করে দেবে না। স্বার্থপর,চক্ষুলজ্জাহীন না হতে পারলে তার অশেষ দুর্গতি।

তার মাথা গরম হয়ে উঠল। একবার এসব জিনিষ নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করলে তার মাথা দিয়ে যেন আগুন ছুটতে থাকে। ভাবনার কি শেষ আছে? আবার সে বইখান তুলে নিলে।

—অবিনাশ শান্তির মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বাতাস করতে লাগলো। রুমাল দিয়ে সযত্নে তার মুখখানি মুছিয়ে দিল।

হায়! এও মিথ্যে কথা। লেখক কি জানে না কতবড় ছোঁয়াচে এই রোগ! আর কতখানি ভয় মানুষের প্রাণে? এ ভয়ের কাছে স্বামীর প্রেম, স্ত্রীর ভালবাসা, পিতার স্নেহ সব বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। অসীম ভালবাসাও এই ভয়ের কাছে তুচ্ছ। নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছিয়ে দিতে সে আজ পর্য্যন্ত কাউকে দেখলে না। আর রোগীর যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকে তাহলে সে তা করতে দেবেও না। লেখক মহাশয়রা জানেন না—এ জ্ঞান প্রত্যেক রোগীরই থাকে, কাসি অথবা রক্ত ওঠার সময় তার যত কষ্টই হোক্ কাউকে সে কাছে আসতে দেয় না, গায়ে এলিয়ে পড়া তো দূরের কথা।

এসব খবর কি তোমরা রাখ? তোমরা খালি যক্ষ্মারোগীকে দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলাতে পার, আর কাজ শেষ হয়ে গেলেই মেরে ফেলতে পার।

হায় রে! এ দয়াটাও যদি ভগবান আর একটু অকৃপণভাবে করতেন। যক্ষ্মারোগীর মৃত্যুও তো সহজে হয় না। জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তবুও তারা বেঁচে থাকে। অশেষ কষ্ট নিজে পেয়েও লোককে দিয়ে, সকলের ধৈর্য্য ও অর্থ শেষ করে দিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে ধনেপ্রাণে মেরে তবে তাদের এই ঘৃণিত ধিক্কারপূর্ণ জীবনের শেষ হয়। যমের অরুচি যক্ষ্মারোগী! যে সময়ে মরলে সহানুভূতি পাওয়া যেত, তার দু'বছর পরে তারা মরবে। সে নিজেও তিন বছরের বেশী ভুগছে, কই এখনও মরলো না তো। তার স্বামী পিতামাতা আগে তার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে কেঁদেছিলেন, এখন মরণ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে ভীত হয়েছেন। এর শেষ কোথায়?

নিরুপমা চোখবুজে শুয়েছিল, পায়ের শব্দে চোখ তাকাল। কতকগুলি সুসজ্জিত নরনারী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সকৌতুহলে তার দিকে চেয়ে আছে। হাসপাতাল দেখতে এসেছে, প্রায়ই এরকম আসে। "অসীম সহানুভূতি" নিয়ে দরজার বাইরে থেকে তাদের পর্য্যবেক্ষণ করে যায়। অসহ্য। সে যখন ভাল হয়ে যাবে এই নিয়ে কাগজে লিখবে। তার অনেক কিছু বলবার আছে। লোকগুলি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কি দেখছে? তার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—"ওগো তোমরা আমাদের দিকে অমন করে কী দেখ? এটা চিড়িয়াখানা নয়। আমরাও একদিন তোমাদের মতই মানুষ ছিলাম। হয়ত এখনও আছি। কিন্তু তোমাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে—একটা বিচিত্র জীব দেখছ। তোমরা দয়া করে চলে যাও। আমাদের শরীরের কষ্ট এবং মনের দুঃখ নিয়ে, একপাশে পড়ে আছি, আমাদের তাই থাকতে দাও, এর ওপর আর তোমাদের সহানুভূতি দেখাতে এসে আমাদের জ্বালাতন কোরো না। কেন আমাদের এমন করে দেখবে?" নিজের মুখটা আড়াল করবার জন্য সে বইখানা তুলে নিলে। আবার সেই হাস্যকর বর্ণনা—"শান্তির নিদ্রিত দেহখানি একগাছি বাসি বকুলের মালার মত করুণ, কোমল, ম্লান দেখাচ্ছিল।" ভাল এক কবিত্ব করবার বিষয় পেয়েছ তোমরা। বাসি মালা, ঝরাফুল! এই ভীষণ রোগের মধ্যেও এত মিষ্টি কথা ঢোকাতে পার, তোমাদের বাহাদুরী আছে।

এঁরাই হয়ত কেউ ফিরে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসবেন, হয়ত গল্পের উপাদান খুঁজতেই এসেছেন। কিংবা প্রবন্ধ। যা কিছু জ্ঞাতব্য সব জানা হয়ে গেল। সচক্ষে দেখে গেলেন। এঁর প্রবন্ধের দাম বেশী হবে। সাধারণ লোকে আবার তাই পড়ে জ্ঞান সঞ্চয় করবেন—স্যানাটরিয়াম এবং রোগীদের সম্বন্ধে।

কিন্তু সে জানে তাদের বেশীর ভাগই ভুল হবে। সে যখন ভাল হয়ে যাবে তখন সে নিজেই এই সম্বন্ধে কাগজে লিখবে। লোকে তখন অনেক সত্যকথা জানতে পারবে। তার অনেক কিছু বলবার আছে।

কবে সে ভাল হবে? শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে থাকে শেষ পর্য্যন্ত। সব ভাবনার শেষ ভাবনা।

বারাণসী ধামে

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

কাশী সহর ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরানো সহর। এখানে জিনিষ-পত্র কলকাতার চেয়ে বেশ সস্তা। এখনও তামার পয়সা চলে। পাণ্ডাদের উপদ্রব বেশী নেই তবে পথের সাধুবাবাদের আবেদন অগ্রাহ্য করা যায় না। মন্দিরের আশে পাশে ভিখারীর আক্রমণ মন্দ নয়। কাশীতে এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে কোনও না কোন ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী নেই। কাশী আসমুদ্র হিমাচল, ভারতবাসী হিন্দুর প্রধান তীর্থ হওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথম বারাণসীর অদূরে সারনাথ। যেখানে ভগবান বুদ্ধ তাঁর অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেছিলেন ও প্রধান পাঁচজন শিষ্য এখানেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় কারণ, প্রাচ্য ভূখণ্ডে কাশী তিন হাজার বছরের অতীত ইতিহাস নিয়ে বিদ্যমান। এর প্রতি গলিতে দেব-মন্দির। বাইশ কোটী হিন্দুর জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমে অভিষিক্ত এর প্রতি ধূলিকণা।

ষ্টেশনের পথেই ভারতমাতার মন্দির। বাইরের থেকে এই মন্দিরটী আমাদের বেলুড় মাঠের মত দেখতে লাগে। তবে অত বৃহৎ নয়। সমস্ত মন্দিরটী কারু কার্য্য খচিত শ্বেত প্রস্তর নির্মিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে ভারতবর্ষের ভৌগলিক মানচিত্র প্রস্তর খুঁদে নির্মাণ করা। অখণ্ড হিন্দুস্থানের পরিকল্পনা করে তার মন্দির স্থাপনের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

ভারতমাতার মন্দির দর্শন করে আমরা বাড়ীতে এলুম। আমাদের বাড়ীটী ছিল ঠিক দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর। আমরা ছিলাম পাঁচ তলায়। প্রত্যহ দিনে পাঁচ ছয় বার সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় আমার মনে হোত আমরা যেন কেদারনাথের যাত্রী। ছাদ ও জানালা দিয়ে সব সময় দেখা যেতো, উত্তরবাহিনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। তার পশ্চিম পারে পুণ্যকামী স্নানার্থীর মেলা, পূর্বপারে দেখা যাচ্ছে, কাশীরাজের রাজধানী রামনগর। উত্তর পারে বিন্ধ্যাচল পর্বতমালা অটল গৌরবে স্থির হয়ে আছে; আর দক্ষিণে শুধু জল আর জল। দেখতে দেখতে মনে হয় এ দেখার তৃপ্তি কোন কালে নেই। এই সেই কাশী, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত, সাধক, পাপাত্মা ও দুরাত্মার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পরম আশ্রয়স্থল। পাপপুণ্যের অপূর্ব সম্মিলনী সভা। এই গঙ্গায় একবার অবগাহন করলেই দেহ পাপমুক্ত, মন পবিত্র হয়। কিন্তু মনে যার বিশ্বাস নেই কোনও তীর্থে-ই তার দেহ ও মন কখনও পাপমুক্ত পবিত্র হতে পারে না।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে আমরা বিশ্বনাথের মন্দিরে এলুম। লক্ষ্মী-পূর্ণিমা, তাই সেদিন ছিল ভয়ঙ্কর ভীড়। বসুমতীর বুকে পাথর চাপা দিয়ে মন্দিরের পথ নির্মাণ করা হয়েছে বলেই হয়ত তিনি এই সহস্র সহস্র যাত্রীর ভার বহন করতে সমর্থ হন। আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই বিশ্বনাথের মন্দির। সর্বজাতির সমন্বয় ঘটে এই মন্দির প্রাঙ্গণে। বহু কষ্টে বিশ্বনাথের দর্শন লাভ ঘটল। এখানে দেবাদিদেব মহাদেব বিরাজ-মান। সমস্ত মন্দিরটী লাল প্রস্তরে নির্মিত। এখানে যেমন বহু সাধু সন্ন্যাসী আছে, সেই রকম মন্দিরের আশেপাশেও অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছে। নাট-মন্দিরে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসে বেদমন্ত্র পাঠ করছেন। তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠস্বরের কাছে জনতার কোলাহল নিস্তেজ হয়ে যায়। তাঁদের সেই বেদ ও সাম গান শুনে মনে হোল, আমরা সুদূর অতীতের সেই আর্যসভ্যতার গৌরবময় যুগে ফিরে গেছি। মনে পড়ল, রবীন্দ্রনাথের বাণী, "প্রেম মোর ভক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া—মোহ মোর মুক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া!"

বিশ্বনাথের মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে—শয়ন আরতি। তাঁর পূজার প্রত্যেকটী বাসন, সুবৃহৎ, সুদৃশ্য, রৌপ্য নির্মিত। বাবার স্নানের জন্য দুধ, দই, চন্দন, ফুলের সাজ ইত্যাদি আর বহু জিনিস, ভারে ভারে অকাতরে আসে। সাজ করানোর পদ্ধতিও চমৎকার। সে না দেখলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। স্নানের পর ভোগের সময়, অসংখ্য যাত্রীর চোখের সামনে ঠাকুর ঘরের দরজায় পর্দার আড়াল দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজে। তারপর রূপার পালঙ্কে বাবার শয্যা প্রস্তুত হয়। এখানে শ্মশানবাসী ভিখারী ভোলানাথ, অন্নপূর্ণার প্রতাপে রাজরাজেশ্বর। সন্ধ্যা আরতির সময়, যাজ্ঞিক ও পুরোহিতবর্গের মন্ত্রপাঠে, ধূপ, ধুনা, পুষ্প চন্দনের গন্ধে; শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদ্যোদ্যমের বিপুল দ্যোতনায় সমস্ত কাশী সহর যেন ভক্তিতে, সাধনায়, প্রেমে, করুণায় অকস্মাৎ জেগে ওঠে।

দেবেন্দ্র সভা। এই মন্দিরটী দেখার মত একটা স্থান বটে। এর অভ্যন্তরে হিন্দুর সকল দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা আছে। মূর্ত্তিগুলি দেখতে বড় সুন্দর। সমস্ত শ্বেতপ্রস্তরের, সুবৃহৎ এবং শিল্প চাতুর্যও চমৎকার। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা এই দেবেন্দ্রসভা দেখতে গেলুম। দেখলুম হরপার্বতীর মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসী একতারা বাজিয়ে গান গাইছেন। মনে হ'ল এটা যেন সত্যই দেবেন্দ্র সভা! আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে হয়ত গান শুনতুম, কিন্তু সঙ্গীদের ডাকে ফিরতে হোল।

পরের দিন মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করতে যাওয়া ঠিক হোল। কাশীর সেই বিখ্যাত পাহাড়ী গলি অতিক্রম করে ঘাটে পৌঁছানো হোল। কাছেই শ্মশান। পাণ্ডাজীকে বহু সাধ্য সাধনা করে সঙ্গীদের লুকিয়ে আমি শ্মশানের মধ্যে ঢুকলুম।

মণিকর্ণিকা ঘাটের পাশেই সিন্ধিয়া ঘাট। বিরাট সে ঘাট। দেখার মত জিনিষ বটে। তার পাদমূলে মাতৃঋণের ধ্বংসস্তূপ পড়ে রয়েছে। প্রবাদ শুনা যায়, কোন রাজা নাকি, মণিকর্ণিকার তীরে এক অপূর্ব কারুকার্য খচিত, বিরাট মন্দির ও ঘাট, নির্মাণ করে দর্পের সঙ্গে বলেছিলেন,

"আমি মাতৃ পিতৃঋণ শোধ করলাম" দর্পিত রাজার স্পর্ধা জননীর সহ্য হয়নি। তাই সেই বিরাট শিল্পচাতুর্যকে জলস্রোতে ধূলিসাৎ করে তাঁর দর্পচূর্ণ করেছিলেন। তারই স্মৃতি অর্দ্ধেক জলগর্ভে, অর্দ্ধেক ভূমিবক্ষে আজও বিদ্যমান। তার পাশেই চক্রতীর্থ। যেথানে হাজার বছর তপস্যার ফলে, ভগবান বিষ্ণু বান মেরে পাতাল কেটে গঙ্গোত্রীকে এনেছিলেন। এখন সেখানে সামান্য একটু ঘোলাজল পড়ে রয়েছে। গঙ্গা দূরে সরে গেছেন, কাজেই পড়ে আছে শুধু স্মৃতি-মাহাত্ম্য। পুরাকালে একদিন হরপার্বতী এই ঘাটে স্নান করতে এসে জলকর দিতে অস্বীকার করায়, শিবের কানের মণিকুণ্ডল এই জলে হারিয়ে যায়। তাই এই ঘাটের আদি নাম "মণিকা হারিণী কর্ণিকা।"

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখে অতীত যুগের নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় কাহিনী মনে পড়ে। আর্য সভ্যতার কৃষ্টি, ঐতিহ্য, শিল্প পুরোভাগে রেখে, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞান ও ললিতকলার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধনই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ বলে মনে হয়। সমগ্র বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী দেখলে শুনলে সমস্ত মন এক অপূর্ব আনন্দরসে ভরে ওঠে। মনে হয় আদর্শে এবং প্রাচুর্যে এত বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় এসিয়া খণ্ডের আর কোথাও নেই। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান বাড়ীর অদূরে একটী নূতন কৃত্রিম হ্রদ নির্মাণ করা হয়েছে। এর পরিকল্পনা অতি চমৎকার! এই হ্রদের মধ্যভাগে একটী সুন্দর অলিন্দ আছে। তার সর্বোচ্চ মঞ্চ হতে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়টীকে সুন্দররূপে নিরীক্ষণ করা যায়। যিনি এই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই সর্বজনবরেণ্য পণ্ডিত মালবীয়কে মনে মনে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বজরা ও শণক্ষেতের পাশ দিয়ে বিরাট প্রাঙ্গণ পার হয়ে আমরা ফিরে এলুম।

সন্ধ্যার তখনও কিছু দেরী ছিল, সেই সময় আমরা দুর্গাবাড়ী দেখে সঙ্কটমোচনের মন্দিরে এলুম। আমলকী বনের ছায়ায় ঢাকা নির্জন মন্দিরটী। মন্দিরের অভ্যন্তরে হনুমানজীর পাষাণ মূর্ত্তি। তার অপর ধারে একটী মন্দিরে রাম, সীতা, লক্ষ্মণের মূর্ত্তি। সেই নির্জন মন্দিরের মর্মর চত্বরে বসে বহু সন্ন্যাসী রামায়ণ পাঠ করছেন। আমি খানিকক্ষণ সেথানে বসে শুনলুম। জ্ঞান দিয়ে না বুঝলেও মন দিয়ে কিছু বুঝলুম। জায়গাটী বড় সুন্দর। আমার ভারী ভালো লাগল। ঠিক যেন সেই আদিকালের শান্ত সৌন্দর্য্যময় ঋষি তপোবন। আমরা যে নাগরিক জীব, আর এটা যে বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্লাবিত, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ, একথা কিছুক্ষণের জন্য মন থেকে মুছে যায়। মনে হয়, বহু শতাব্দী পূর্বের বৈদিক যুগের এক প্রসন্ন সন্ধ্যায় আমরা ফিরে গেছি। এটা যেন মহাকবি বাল্মীকির আশ্রম। সমস্ত মন্দির ও বনের অন্তরাত্মায় যেন ধ্বনিত হচ্ছে—

"সেই আর্যাবর্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনও উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনও ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।"

মধ্য ভারতের শের পরব

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম্-এ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবের প্রচলন আছে। এই উৎসবগুলির মূল্য অপরিসীম। জনসাধারণে্য প্রচলিত উৎসবগুলিকে 'জন-উৎসব' (**Folk-Festivals**) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। জন-উৎসবগুলি বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং এগুলি সাধারণতঃ ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি দেশের নরনারীর প্রাণের প্রাচুর্য্যের পরিচয়। উৎসবগুলির ভিতর দিয়া নরনারী দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় অপরিমেয় আনন্দ ও বৈচিত্র্য লাভ করে। জন-উৎসবে গ্রামবাসী আনন্দের উচ্ছ্বসিত আবেগ অনুভব করে। উৎসবের বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের অন্তরে আনন্দসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং মানুষের আত্মার সৌন্দর্য্য-পিপাসা তৃপ্ত হয়। ইহাতে মানুষের অন্তর হইতে ক্ষণেকের জন্য দীনতা ও বিষাদ অন্তর্হিত হয়। জন-উৎসবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একস্থানে বলিয়াছেন—"**We, in the United states. are amazingly rich in the elements from which to weave a culture. We have the best of man's past on which to draw, brought to us by our native folk from all parts of the world. In binding these elements into a native fabric of beauty and strength, let us keep the original fibers so intact that the fineness of each will show in the complete handiwork.**"

এখানে মধ্য ভারতের জনসাধারণে্য প্রচলিত 'শের পরব' সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। বাংলার স্থানে স্থানে যেমন পৌষ সংক্রান্তির দিনে ব্যাঘ্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ উৎসব মধ্য ভারতে 'শের পরব' নামে সুপরিচিত। বাংলায় পৌষ-সংক্রান্তির সময়ে গ্রামবাসীরা দল বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে 'দক্ষিণরায়ের গান' অথবা 'বাঘাইর বয়াত্' গাহিয়া দান গ্রহণ করে এবং পৌষ-সংক্রান্তির দিনে গ্রামের মণ্ডপে মাটির ব্যাঘ্র মূর্ত্তির পূজা দেয়। মধ্য ভারতের শের পরবে কিন্তু বেশ বৈচিত্র্য রহিয়াছে। পল্লীতে একটী করিয়া দল সংগঠিত হয় এবং আট দশজন 'শের' অর্থাৎ ব্যাঘ্র সাজে। প্রত্যেকের সমস্ত গাত্র হলুদ, কাল প্রভৃতি বর্ণে বিচিত্রিত করা হয় এবং মুখে ব্যাঘ্রের মুখোস ও কোমরে লেজ পরাইয়া দেওয়া হয়। পল্লী-শিল্পীরা সোলা দিয়া রং বেরং-এ চিত্রিত করিয়া ব্যাঘ্রের মুখোস ও কাপড়ের সাহায্যে লেজ তৈয়ারী করে। এইরূপে 'শের' দল প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে ঢোল ও সানাইয়ের তালে তালে নাচ দেখায়। শের দলের সর্দ্দারকে লোহার লম্বা শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই শের নাচ আরম্ভ হয়। সংক্রান্তি দিনে পাহাড় অঞ্চলে বন্-ভোজনান্তে শের পরবের পরিসমাপ্তি ঘটে। এথানে শের দল সমারোহের সহিত নৃত্য করে। শের পরব উপলক্ষে কোথায়ও কোথায়ও মেলা বসে।

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় দৃশ্য

পরদিন সকাল। প্রতুল চৌধুরীর বাড়ীর ল্যাবরেটরী। কেমিষ্ট্রির যন্ত্রপাতি চারিধারে সাজানো। একটা টুলে প্রতুল বসে। সার্ট আর একটা চেয়ারের পিঠে টাঙ্গানো। ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে প্রতুলের বুক পরীক্ষা করছে।

নিরঞ্জন। হার্ট খুবই ভাল…তবে…

প্রতুল। তবে…কি ?

নিরঞ্জন। বীট্‌স ঠিকই আছে, কিন্তু সামান্য হলেও…ডেফিনিট নার্ভাস ট্রেমর রয়েছে।

প্রতুল। (সার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে) এ সময় ওটা স্বাভাবিক। অপারেশান—

নিরঞ্জন। সেজন্য নয়। ওঘরে তোমার বাথটাবে যা তৈরী করে রেখেছ—সেই জন্য।

নোট বুকে লিখতে লাগল। প্রতুল চুপ করে
রইল। লেখা শেষ করে

ওতেই কাজ হবে ?

প্রতুল। হ্যাঁ।

নিরঞ্জন। তা হলেই বডির কোন ট্রেস পাওয়া যাবে না। একেবারে ডিজল্‌ভ হয়ে যাবে তো ?

প্রতুল। হ্যাঁ। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক্।

নিরঞ্জন। (মাইক্রোস্কোপে দেখতে দেখতে) বেশ। আমি তোমার রক্তের স্লাইড পরীক্ষা করছি। রেজার স্লাইড কোথায় ?

প্রতুল। দিচ্ছি।

প্রতুল স্লাইড খুঁজতে লাগল

নিরঞ্জন। বডিটা কমপ্লীটলি গলতে কতক্ষণ লাগবে ?

প্রতুল। ঘণ্টা পাঁচেক।

নিরঞ্জন। একেবারে সলিউশন, মানে জলবৎ হয়ে যাবে ?

প্রতুল। (স্লাইড হাতে) হ্যাঁ।

নিরঞ্জন। তারপরেই বাথটব ছেড়ে দেবে—ব্যস্ !

প্রতুল। হ্যাঁ। এই নাও রেজার রক্তের স্লাইড।

নিরঞ্জন। তোমার কেমিষ্ট্রীর জ্ঞান সত্যই অসাধারণ।

প্রতুল। (আড়ষ্ট ভাবে) ধন্যবাদ।

নিরঞ্জন। লোকটার জন্য দুঃখ হয়।

প্রতুল। আমিও কম দুঃখিত নয়, কিন্তু নিরুপায়।

নিরঞ্জন। সে লোকটার নাম কি ?

প্রতুল। গিরীন পাত্র।

নিরঞ্জন। গিরীন পাত্র। কাল বলছিলে বটে, ভুলে গিছলুম। (প্রতুলের হাত থেকে রেজার স্লাইড নিয়ে) টাকাটা কবে পাবে ?

প্রতুল। যখন সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

নিরঞ্জন। (রেজার স্লাইড দেখতে দেখতে) ঠিক আগেকার মত—

প্রতুল। হ্যাঁ।

নিরঞ্জন। কি করে টাকাগুলো সরাতে হবে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ তো ?

প্রতুল। হ্যাঁ। (একটু থেমে) ডাক্তার গুপ্ত, এত কথা জিজ্ঞেস করবার কারণ কি ?

নিরঞ্জন। এমনি। কিন্তু তুমি যখন এ সম্বন্ধে কথা বলতে নারাজ, লেট আস ফরগেট ইট। (হঠাৎ চমকে) একি ! একবার দেখতো। মোটেই সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না।

প্রতুল। (মাইক্রস্কোপে চোখ দিয়ে) তাইত ! তবে ?

নিরঞ্জন। তোমার আর রেজার রক্ত এক সাবডিভিজনে পড়ে না।

প্রতুল। কেবল মাইক্রস্কোপিক টেষ্টেই তো মীমাংসা হয় না।

নিরঞ্জন। তা হয় না বটে—তবু…

প্রতুল। না মিললে তো একে দিয়ে কোন কাজ হবে না।

নিরঞ্জন। শেষ অবধি দেখা যাক। ওর আর একটা স্লাইড কোথায় ?

প্রতুল। এই যে।

আর একটা স্লাইড এনে দিল। বাহিরের দরজায় খট খট ধ্বনি

প্রতুল। কে ?

জনার্দ্দন। (নেপথ্যে) আমি হুজুর। জনার্দ্দন।

প্রতুল। দাঁড়াও খুলছি।

দরজার চাবি খুলতে জনার্দ্দন ঘরে ঢুকল

প্রতুল। কি ?

জনার্দ্দন। হুজুর, আপনার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

প্রতুল। কে ? কি নাম ?

জনার্দ্দন। গিরীন পাত্র।

প্রতুল। গিরীন পাত্র !

জনার্দ্দন। আজ্ঞে হ্যাঁ। খিড়কী দোর দিয়ে এসেছেন। আর কয়েকটা বাক্স নিয়ে একজন সামনের ফটক দিয়ে এসেছেন—

প্রতুল। কোথা থেকে এসেছে কিছু বলেছে ?

জনার্দ্দন। ওষুধের দোকান থেকে। বললে আপনার সই দরকার।

প্রতুল। আচ্ছা। আমি যাচ্ছি। তুমি গিরীনবাবুকে পাশের ঘরে নিয়ে এসে বসাও।

জনার্দ্দনের প্রস্থান

নিরঞ্জন। গরীন পাত্রের আসবার কথা ছিল কি ?

প্রতুল। (কোট পরতে পরতে) না। বরং আমি ওকে এখানে আসতে বারণ করেছিলুম।

নিরঞ্জন। রাদার স্ট্রেঞ্জ।

প্রতুল। বটেই তো। দেখা যাক কি চায়।

প্রস্থান

নিরঞ্জন একটা টেষ্টটিউবে কি সব করছে। নেপথ্যে প্রতুলের ও গিরীনের কথা শোনা যাচ্ছে

প্রতুল। (নেপথ্যে) কি খবর গিরীনবাবু······

গিরীন। (নেপথ্যে) একটা বিশেষ দরকার ছিল। এসেছি বলে কিছু মনে করেন নি তো ?

প্রতুল। (নেপথ্যে) না, বসুন। আমি এখনই আসছি।

কথোপকথন শেষ হয়ে গেল। নিরঞ্জন দরজার কাছে গিয়ে ডাকল

নিরঞ্জন। গিরীনবাবু, ওখানে একলা বসে কেন? ভেতরে আসুন না।

গিরীনের প্রবেশ

গিরীন। ধন্যবাদ ! নমস্কার।

নিরঞ্জন। নমস্কার। বসুন।

গিরীন। (বসে) ধন্যবাদ।

নিরঞ্জন। আমার নাম নিরঞ্জন গুপ্ত। প্রতুল বাবুর বন্ধু।

গিরীন। আপনি প্রতুলবাবুর বন্ধু। নমস্কার। পরিচিত হয়ে খুবই সুখী হলুম। (চারিধারে দেখে) ঘরটা যেন ডাক্তারখানা। প্রতুলবাবুরও ডাক্তারীর সখ আছে বলেছিলেন।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, তা একটু আছে। আপনি আগে কখনও এখানে আসেন নি ?

গিরীন। না। এই প্রথম।

নিরঞ্জন। আমি ওর বন্ধু। মধ্যে মধ্যে ওর কাজে একটু আধটু সাহায্য করি।

গিরীন। আমিও ওঁকে সাহায্য—মানে—

নিরঞ্জন। আপনিও বুঝি ডাক্তার।

গিরীন। আজ্ঞে না। আমার সঙ্গে ওর একটু ব্যবসাদারী—

নিরঞ্জন। ওঃ! আপনি ব্যবসাদর।

গিরীন। মানে দেখুন ঠিক ব্যবসাদার নয় তবে—আজ ভয়ানক গরম।

নিরঞ্জন। কই? বিশেষ গরম বলে তো মনে হচ্ছে না।

গিরীন। আমি খুব জোরে হেঁটে এসেছি কিনা—

নিরঞ্জন। অবশ্য তাহলে গরম লাগবে বই কি। আমি পাখা খুলে দিচ্ছি।

পাখা খুলে দিল

গিরীন। ধন্যবাদ। আমাদের আধ ঘণ্টা মাত্র লাঞ্চের ছুটী। সেই সময়ের মধ্যে আপিস থেকে এখানে আসা আর যাওয়া······মানে বুঝতে পারছেন তো, হাতে সময় খুবই অল্প।

নিরঞ্জন। আপনি প্রতুলবাবুর সঙ্গে গোপনে কথাবার্ত্তা বলতে চান ?

গিরীন। মানে, যদি কিছু মনে না করেন উনি এলে······

কয়েকটা পার্শেল নিয়ে প্রতুলের প্রবেশ

প্রতুল। আই অ্যাম সো সরি, দেরী হয়ে গেল—

পার্সেলগুলি টেবিলের ওপর রাখল

নিরঞ্জন। প্রতুল, আমার নোট বইটা শোবার ঘরে রয়েছে। আমি নিয়ে আসি। কিছু মনে করবেন না গিরীনবাবু···

গিরীন। না, না। বটেই তো, বটেই তো···

নিরঞ্জনের প্রস্থান

প্রতুল। আপনি এখানে এলেন কেন ?

গিরীন। কোন ক্ষতি মানে অন্যায়···

প্রতুল। বলেছিলুম না যে, নিজে কখনও এখানে আসবেন না। যদি কেউ দেখে ফেলে···

গিরীন। আমি বাড়ীর পিছন দিকের গলি দিয়ে এসেছি। এত দরকারী কথা যে নিজে না এসে থাকতে পারলুম না। আপনি বলেছিলেম কোন গণ্ডগোল হলে তক্ষুণি আপনাকে খবর দিতে—

প্রতুল। কোন গণ্ডগোল হয়েছে নাকি ?

গিরীন। ফণীবাবু, মানে আমাদের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ভারী গোলমাল করছে। এবার থেকে ওয়ার্কশপের লোক এসে টাকা নিয়ে যাবে, আমরা আর ভবিষ্যতে পেঁ ছে দেব না।

প্রতুল। তবে তো আমাদের সব প্ল্যানই গুলিয়ে গেল।

গিরীন। প্রায়। তবে নতুন নিয়মে কাজ আরম্ভ হতে এখন দিন দশ বারো লাগবে—

প্রতুল। তা হলে অবিলম্বে কাজে হাত দিতে হয়।

গিরীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই পরামর্শই তো করতে এসেছিলুম।

প্রতুল। এই সপ্তাহে কোন বড় চালান আছে ?

গিরীন। আপনাকে খোঁজ নিয়ে জানাব।

প্রতুল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ হাসিল করতে হবে।

গিরীন। আমরা তো তৈরী আছি। নয় কি ?

প্রতুল। হ্যাঁ। শুধু আপনার মুখের কথার অপেক্ষা।

গিরীন। তারপর আমায় আর কাজ করতে হবে না।

প্রতুল। না।

গিরীন। রোজ রোজ ঘানির বলদের মত খাটুনী—সে সব থেকে রেহাই পাব। কি বলেন ?

প্রতুল। পাবেন বই কি।

গিরীন। কোন অভাব অশান্তি আর ভোগ করতে হবে না।

প্রতুল। না, কিছুই আর ভোগ করতে হবে না।

গিরীন। আমার কাপড় জামা সব রেডী করে রেখেছেন?

প্রতুল। হ্যাঁ। আপনার কাছে যে ব্যাগে টাকা যায় তার ডুপ্লিকেট চাবী আছে তো?

গিরীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। বুক পকেটের মধ্যে যে ঘড়ির পকেট আছে তার মধ্যে। (চাবী বার করে) এই দেখুন।

প্রতুল। বেশ। সাবধানে রাখবেন।

গিরীন। সে তো বটেই। এই সপ্তাহে কবে চালান যাবে আর কত যাবে তা খোঁজ পেলেই আপনাকে জানাব।

প্রতুল। আচ্ছা। এখন ওসব কথা থাক—

বাহিরের দরজায় খট খট ধ্বনি

প্রতুল। কে?

জনার্দ্দন। (নেপথ্যে) আমি হুজুর।

প্রতুল। ভেতরে এস।

জনার্দ্দন ভেতরে এল

প্রতুল। কি চাও? বলেছি না কাজের সময় বিরক্ত কোরো না।

জনার্দ্দন। আজ্ঞে কাল যে মেয়েটী এসেছিলেন তিনি এসেছেন—

প্রতুল। মল্লিকা! মিলি! এখানে!

জনার্দ্দন। তাঁকে বসবার ঘরে বসিয়েছি—

গিরীন। আমি এবার যাই—

জনার্দ্দন। তাঁকে এখানে নিয়ে আসব কি?

প্রতুল। একটু পরে। আগে এঁকে পৌঁছে দিয়ে এস—

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। আমি একলা চুপ করে বসে থাকতে না পেরে বিনা হুকুমেই চলে এলুম—(গিরীনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে) সরি, আমি জানতুম না কেউ আছেন—

প্রতুল। তাতে কি হয়েছে। ইট ইজ অল রাইট।

গিরীন। আচ্ছা মিষ্টার চৌধুরী, আমি এবার চলি।

মল্লিকা। আমার জন্যে চলে যাবেন না, আমি না হয় বাইরে একটু অপেক্ষা করছি—

গিরীন। না, না—আমি যাচ্ছিলুমই—

মল্লিকা। আপনাদের কাজের ক্ষতি হ'ল বোধ হয়—

গিরীন। আজ্ঞে না। আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হয়ে গেছে। নমস্কার। ধন্যবাদ—

গিরীন ও জনার্দ্দনের প্রস্থান

মল্লিকা। বেশ লোকটী।

প্রতুল। হ্যাঁ।...তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে?

মল্লিকা। পেয়েছিলুম। আপনাকে একটা দরকারী কথা বলবার জন্য তাড়াতাড়ি এলুম?

প্রতুল। কি কথা?

মল্লিকা। আজ সকালে সুবোধবাবু আমাদের বাড়ী গিছলেন।

প্রতুল। ডাক্তার রায়?

মল্লিকা। হ্যাঁ।

প্রতুল। কাল বলেছিলেন বটে তোমার মাকে সকালে দেখতে যাবেন।

মল্লিকা। হ্যাঁ। মাকে দেখতে গিছলেন। কিন্তু তাঁর ভিজিটের আসল কারণ অন্য ছিল।

প্রতুল। তুমি?

মল্লিকা। না আপনি।

প্রতুল। আমি?

মল্লিকা। হ্যাঁ। বাবা কিছু দিন গভর্ণমেন্ট প্লীডার ছিলেন, জানেন?

প্রতুল। না, তা জানতুম না।

মল্লিকা। তাতে প্র্যাকটিসের ক্ষতি হয় বলে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সরকার মহলে ওঁর খুব খাতির আছে।

প্রতুল। তা তো থাকবেই। অত বড় ব্যারিষ্টার, তার ওপর আবার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর মেম্বার—

মল্লিকা। ডাক্তার রায় বাবার কাছে গিছলেন কারণ তিনি একটু... ধাঁধায় পড়েছেন।

প্রতুল। ধাঁধায় পড়েছেন! কেন?

মল্লিকা। আপনি তাঁকে কোন কাজ করতে বলেছিলেন?

প্রতুল। হ্যাঁ।

মল্লিকা। তিনি বাবাকে বলেছেন, অবশ্য আমি জানি সব বাজে কথা—যে আপনি ওঁকে এমন একটা কাজ করতে বলেছেন যা ঠিক উচিত নয়।

প্রতুল। উচিত নয়! কেন?

মল্লিকা। জানি না। বাবা আমায় সব কথা বলেনি। আমার মনে কেমন যেন ভয় হ'ল তাই আপনাকে বলতে এলুম। গোলমালের কিছু—

প্রতুল। না, না। ডাক্তার হিসেবে ওঁকে ডেকেছিলুম আমায় একটু সাহায্য করতে। যদি তাঁর আপত্তি থাকে অন্য ডাক্তার ডাকব। এতে অসুবিধার কিম্বা গোলমালের কিছু নেই।

মল্লিকা। যাক্, অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

প্রতুল। আমার মনে হয় উনি মিছিমিছি গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছেন, কারণ তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা তিনি ঠিক পছন্দ করেন না।

মল্লিকা। আই ডোণ্ট কেয়ার।...আচ্ছা, এখানে রেজা বলে কোন লোক আছে?

প্রতুল। আছে।...কেন?

মল্লিকা। জেল ফেরত?

প্রতুল। হ্যাঁ।

মল্লিকা। সুবোধবাবু তার কথাও বলেছেন। রেজাকে মানে জেল ফেরত লোককে আপনার কি প্রয়োজন?

প্রতুল। রেজা অথবা জেল ফেরত লোককে আমার ঠিক প্রয়োজন নয়। আমার দরকার এমন একজন লোক যে আমার এক্সপেরিমেণ্টে সাহায্য করবে। রেজা সাহায্য করতে রাজী হয়েছে, তাই তাকে দরকার।

মল্লিকা। অন্য কোন লোক হলেও চলত' ?

প্রতুল। নিশ্চয়ই।

মল্লিকা। তা হলে জেল-ফেরত লোক বলে তাকে নিয়ে গণ্ডগোল করবার তো কোন কারণ দেখি না।

প্রতুল। কোন কারণই নেই। আমি তো বলেছি ও সব বাজে কথা। আসল কারণ তুমি।

মল্লিকা। আমার জন্য অনর্থক আপনাকে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।

প্রতুল। না মিলি, এ কথা কেন বলছ? তুমি তো জান তোমার জন্য…

মল্লিকা। জানি। (একটু পরে) আমার এক এক সময় কি মনে হয় জানেন?

প্রতুল। কি?

মল্লিকা। মনে হয় যেন আপনি দু'জন লোক…

প্রতুল। (হেসে) তাই নাকি। এ যে ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইডের মত হ'ল।

মল্লিকা। একজন মিষ্ট কথা কয়, আমাকে…(একটু থেমে) আর একজন রুক্ষ—একনিষ্ঠ সন্ন্যাসী যাকে দেখলে ভয় করে, যার চোখে আগুন জ্বলে—আপনার চোখের তারা অমন জ্বলে কেন?

প্রতুল। বোধ হয় ঘরে আলো জ্বলছে বলে অমন দেখাচ্ছে।

মল্লিকা। দিনের বেলা ঘরে আলো জ্বেলে রেখেছেন কেন?

প্রতুল। মাইক্রস্কোপে স্লাইড দেখছিলুম।

মল্লিকা। আপনার বাড়ীটা যেন হাসপাতাল…

প্রতুল। উঁহু, ঠিক হ'ল না। হাসপাতালে রুগী থাকে এখানে রুগী কই? এ যে গবেষণামন্দির।

মল্লিকা। (একটা যন্ত্রের দিকে দেখিয়ে) ওটা কি?

প্রতুল। "ইনফ্রা-রেড" অ্যাপারেটাস। মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করতে হয়।

মল্লিকা। চার ধারেই যন্ত্রপাতি। আমার জানতে ইচ্ছে করে আপনি এখানে কি করেন?

প্রতুল। এই সব গবেষণা ইত্যাদি করি।

মল্লিকা। (ঘরের মধ্যে এদিকে ওদিক বেড়াতে বেড়াতে) কত বই! এটা কি?

প্রতুল। ভরটেক্স মেশিন।

মল্লিকা। ও ঘরটায় কি আছে? (পাশের ঘরের দরজা খুলে) এ যে একটা বাথ টব—

প্রতুল। (রূঢ়স্বরে) হ্যাঁ। ওটা বাথরুম। সরে এস।

উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল

মল্লিকা। রাগ করলেন?

প্রতুল। না, না। আই অ্যাম সরি মিলি—

মল্লিকা। আমার এ সব জিনিষে হাত দেওয়া আপনি পছন্দ করেন না—না?

প্রতুল। তা নয়। চারধারে ওষুধ বিষুধ ছড়ানো রয়েছে, যদি হাত পা পুড়ে যায়—তার চেয়ে এস, তোমায় মাইক্রস্কোপ দেখাই—

মল্লিকা। মানে যাতে আর আমি কোন দুষ্টুমী না করতে পারি। বড্ড বিরক্ত করছি না?

প্রতুল। ও কথা বোলো না মিলি।

মল্লিকা। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

প্রতুল। কি?

মল্লিকা। এখান থেকে চলে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন?

প্রতুল। না। আমি তো বলেছি আমায় যেতে হবেই এবং—হয়ত' কিছু দিনের মধ্যেই—

মল্লিকা। কেন?

প্রতুল। নিরুপায়। যদি সম্ভব হত…(দীর্ঘনিঃশ্বাস)

মল্লিকা। অসম্ভব কিসে?

প্রতুল। তা তোমায় বোঝাতে পারব না মিলি।

মল্লিকা। কেন পারবে না?

প্রতুল। কারণ…(মিলির একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে) কারণ, মিলি আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি। কিন্তু আমার এই কাজ—

মল্লিকা। আমি লেখা পড়া শিখেছি। তোমার কাজে তো আমি সাহায্য করতে পারি। তুমি আমায় শিখিয়ে নেবে—

প্রতুল। তা হয় না মিলি।

মল্লিকা। কেন হয় না? পৃথিবীতে কোন কাজ শেখাই অসম্ভব নয়। মেয়েরাও তো ডাক্তার হয়—

প্রতুল। কিন্তু এ তো ঠিক ডাক্তারী নয়—

মল্লিকা। তবে কি?

প্রতুল। আমি বলতে পারব না। আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। এ অসম্ভব। তোমাকে এর মধ্যে আমি জড়াতে চাই না। মিলি, তুমি যাও—আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও, আর এস না—

মল্লিকা। (ভীত ভাবে) কি বলছেন? চলে যাব—

প্রতুল। না, না, মিলি, তুমি যেও না। আমি একা, বড় একা। একটু আগে মনে হয়েছিল তুমি পারবে—আমার কাজের, আমার জীবনের—

মল্লিকা। কেন পারব না বল?

প্রতুল। (মল্লিকার দিকে চেয়ে) পারবে? হয়ত' পারবে। তুমি আর আমি—জগতে প্রথম…সত্যই চমৎকার হবে…কিন্তু না, না, তা হতে পারে না—সে এক ভয়ানক জীবন!

মল্লিকা। তুমি অমন করে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন?

প্রতুল। আই অ্যাম সো সরি। মিলি, আমায় ক্ষমা করো। কি আবোল তাবোল বকছিলুম—আজ ওসব কথা থাক্—

বাহিরে হৈ হৈ ধ্বনি

প্রতুল। কে?

জনার্দ্দন। (নেপথ্যে) আমি হুজুর।

প্রতুল। ভেতরে এস।

জনার্দ্দনের প্রবেশ

প্রতুল। কি?

জনার্দ্দন। একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন—

কার্ড দিল

প্রতুল। (কার্ড দেখে) ডিটেক্‌টিভ ইন্সপেক্টর খগেন দত্ত—

মল্লিকা। খগেন দত্ত। আমাদের বাড়ীতে বাবার কাছে তিনি বহুবার এসেছেন। আমি তাঁকে চিনি।

প্রতুল। কিন্তু আমার কাছে কেন?

মল্লিকা। নিশ্চয়ই এ সুবোধবাবুর কাজ।

প্রতুল। তা হতে পারে। (জনার্দ্দনের প্রতি) ওঁকে এখানে নিয়ে এস, আর ডাক্তার গুপ্তকে একবার আসতে বল।

জনার্দ্দন। আচ্ছা হুজুর।

জনার্দ্দনের প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

স্থূল দৃষ্টি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার চোখে যা লাগেনাকো ভাল—
দেখেই বলো না ছাই,
হয় ত তাহার মহিমা বুঝিতে
অধিকারী হওয়া চাই।
চেনে যারা, জানে তারাই ত দাম,
শিলা হয়ে পড়ে রহে শালগ্রাম,
জানে ভূ-গর্ভে মণি-রত্নের
সন্ধান গুণীরাই।
রুক্ষ প্রাচীন তুলট কাগজ
নেহাৎ অসুন্দর,
কত অমৃত ধরিয়া রেখেছে
কাল ও কালির গড়।
কতই শান্তি, কত আনন্দ,
ওকি ধ্রুবলোক রয়েছে বন্ধ
যাহার নিকটে তুচ্ছ ক্ষুদ্র
গোটা এ পৃথিবীটাই।
দেখিয়া দেখি না শুষ্ক শীর্ণ
বসে আছে সন্ন্যাসী,
বুঝিনা ও বুকে কত উৎসব
কত আনন্দ রাশি।
চলে শ্রীহরির কত রাস, দোল,
কত ঝুলনের কত হিল্লোল,
সুধা সাগরের কত কল্লোল উঠিতেছে একলাই।
মন্দির গায়ে কুৎসিত ছবি দেখিয়াই হয় ঘৃণা,
আছে ভক্ত ও শিল্পীর কাছে মূল্য উহার কি না?

মন তন্ময়, জানে না বিকার,
মন্দিরে তারি প্রবেশাধিকার,
পিপাসু চকোর সুধা চায় শুধু
আন ক্ষুধা তার নাই।
পূজার পথেতে নীড় পাতাইয়া
বিলাসিনী দল রয়
মুক্তা-তোলার ডুবারীরে কিসে
ভুলাবে সফরীচয়?
যাহারা পূজারী, যারা উপাসক,
তারা চির শিশু তাহারা বালক,
দেখিয়া তাদিকে পাপ প্রলোভন
ভাবে "লাজে মরে যাই।"
লৌহ মনকে চুম্বক পারে
করিতে আকর্ষণ
সোনা যে হয়েছে নির্ভিক আর
নির্ম্মল তার মন।
ছাগলে কি ভয় কল্পতরুর,
ঘুঘু ফাঁদে পড়ে, পড়েনা গরুড়,
কালো ও নিকষে খাঁটি স্বর্ণের
প্রথমে হয় যাচাই।
বাহির দেখিয়া আমরাই ভুলি অনধিকারীর দল,
বুঝিতে পারিনে তবু করি শুধু তর্ক ও কোলাহল।
চিনিতে দেবের চরণ দাগগো,
চাই যোগ্যতা—চাই যে ভাগ্য,
বুঝা ও পড়ায় পাইনে যাহারে পূজায় তাহারে পাই।

নঞ্‌তৎপুরুষ*

বনফুল

১

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল কিন্তু পুরন্দরবাবু কার্য্যগতিকে কোলকাতা ছাড়তে পারলেন না। দার্জিলিং যাবেন ঠিক ছিল কিন্তু সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল। হাইকোর্টে মকোর্দ্দমাটার কোন কূলকিনারাই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। জমিদারি সংক্রান্ত এই মকোর্দ্দমাটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে যেন। বেশ ভালর দিকেই যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ কেমন বিগড়ে গেল। হু হু করে' টাকা খরচ হচ্ছে, নামজাদা বড় বড় উকীল লাগিয়েছেন, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছেন তিনি, কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, নিজেই নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে সুরু করেছেন। দলিলপত্র দেখে নিজে যে এজাহারটা লিখেছিলেন তাঁর উকীল নাকচ করে' দিলে সেটাকে। তিনি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, সাক্ষী জোগাড় করছেন, একে বলছেন, তাকে ধরছেন—এবং সম্ভবত কাজের চেয়ে অকাজই করছেন বেশী। তাঁর উকীল অন্তত সেই কথাই বলছে। সে তাঁকে দার্জ্জিলিং পাঠাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু পুরন্দরবাবু কিছুতেই যেতে পারছেন না। কোলকাতা শহরের ধুলো, ধোঁয়া, গরম, কলের তেল, পচা মাছ, শ্যামবাজারে তাঁর বাড়ির পাশের ড্রেনটা সব হার মেনেছে। পুরন্দরবাবুকে কিছুতেই কোলকাতা থেকে তাড়ান যাচ্ছে না। "কিচ্ছু হচ্ছে না, সব গেল" বারম্বার তিনি মনে মনে আবৃত্তি করছেন, স্নায়বিক বিকার বেড়ে যাচ্ছে রোজ, কিন্তু কিছুতেই কোলকাতা ছাড়তে পারছেন না।

একদা পরিপূর্ণ এবং বিচিত্র জীবন ছিল পুরন্দর রায়চৌধুরীর। যদিও বয়সের হিসাবে তিনি যৌবন-সীমা পার হয়েছেন—এখন আটত্রিশ বছর বয়স তাঁর—কিন্তু বুড়ো হবার সময় হয় নি এখনও। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে বার্দ্ধক্য এসে গেছে এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে এসে গেছে। বয়সের হিসাবে নয় অন্তরের মানদণ্ডে, বাইরে থেকে নয় ভিতর থেকে অনুভব করছেন তিনি এবং যতই সেটা অনুভব করছেন ততই যেন জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন আরও। বাইরে থেকে এখনও তাঁকে বেশ শক্ত সমর্থ দেখায়। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি, একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল—একটি পাকেনি এখনও। যদিও খুব ছিমছাম নন, কিন্তু একটু নজর করে' দেখলেই বোঝা যায় যে অভিজাত বংশের ছেলে তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন। কথায় ব্যবহারে বনেদি ঘরের চিহ্ন সুস্পষ্ট এখনও। ইদানিং অবশ্য চরিত্রে একটু শৈথিল্য এসেছে, মেজাজও খিটখিটে হয়েছে—তবু কিন্তু অভিজাতসুলভ সহজ সহৃদয়তা অবলুপ্ত হয় নি এখনও চরিত্র থেকে। এ ছাড়া তাঁর এমন একটা গভীর আত্মপ্রত্যয় আছে—যা প্রায় অহঙ্কারেরই সম-গোত্র। বুদ্ধি বিদ্যা সংস্কৃতি, এমন কি কিঞ্চিৎ প্রতিভা সত্ত্বেও এই দাম্ভিকতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন নি তিনি কিছুতেই। তাঁর চোখে মুখে ফুটে বেরুত তা। চোখে মুখে একটা সরলতাও ছিল। পুরাকালে তাঁর টকটকে লাল মুখখানাতে এমন একটা নারীসুলভ কমনীয়তা ছিল যা সকলকে মুগ্ধ করত, বিশেষ করে' নারীদেরই। এখনও অনেকে তাঁকে দেখে বলে—"বাঃ কি চমৎকার রং, কি সুন্দর স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের।" কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে স্নায়বিক বিকারে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন—তা কেউ বুঝতে পারত না। বড় বড় টানাটানা চোখ ছিল তাঁর—দশ বছর আগে এই চোখই মোহ বিস্তার করত অনেকের মনে—এমন প্রদীপ্ত, এমন প্রাণবন্ত ছিল যে লোকে মুগ্ধ না হয়ে পারত না। এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে সে চোখের দীপ্তি নিবে গেছে, চোখের কোনে বলি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ, আশায় আনন্দে ঝলমল করত একদিন যে চোখের দৃষ্টি, এখন তাতে ফুটে উঠছে নীতিচ্যুত বিপর্য্যস্ত ছন্নছাড়া জীবনের ভণ্ডামি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস—কিঞ্চিৎ ব্যথা এবং হতাশা। কেমন যেন একটা নাম-হীন ব্যথা এবং অনির্দ্দিষ্ট হতাশা। যখন একা থাকতেন তখন এই হতাশাটা আরও যেন প্রবল হয়ে উঠত। আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি মাত্র দু'বছর আগে হাল্লা হৈ হৈ নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন, হাসতেন হাসাতেন, চমৎকার গল্প বলতে পারতেন তিনি এখন একা থাকতে পেলে আর কিছু চান না। এই কারণে, তিনি বহু লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছেন যাঁদের সঙ্গে এখনও (মানে, আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও) সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলেও চলত। অবশ্য দাম্ভিকতা একটা কারণ। তা ছাড়া কোন কিছুর উপরই আস্থা ছিল না আর। কিছু আর ভাল লাগত না, কারও সঙ্গ আর সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু ক্রমশ একা থেকে থেকে তাঁর এই দাম্ভিকতারও রূপ বদলে গেল। একটুও কমল না, বরং ঠিক উল্টো। কিন্তু তা এক বিশেষ রকম অভিনব দাম্ভিকতায় পরিণত হল ; নানা বিভিন্ন অদ্ভুত কারণে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়তেন—যেন তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগত। কারণগুলো অদ্ভুত—পূর্ব্বে একথা ভাবাও অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। সেগুলো ঠিক আধিভৌতিক নয়, যেন আধ্যাত্মিক। "আধ্যাত্মিক কারণে কারও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব না কি"—নিজেই মনে মনে বলতেন, কিন্তু কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারতেন না।

না, কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারতেন না। একটা 'আধ্যাত্মিক' ব্যাপার সর্ব্বদাই চিত্তকে আকুল করে' রাখত। পূর্ব্বে এমন কখনও হয় নি—এ সব নিয়ে মাথাই ঘামান নি কখনও ইতিপূর্ব্বে। তিনি সেই সব ধারণাকেই আধ্যাত্মিক বলতেন যা কিছুতেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুতেই যায় না! নিজের অন্তরে অন্তরে তা মানতেই হয়। লোক সমাজে পাঁচজনের সামনে অবশ্য হেসে

* ফিয়ডর ডস্টয় ভেস্‌কির 'দি ইটারনাল হাস্‌বাণ্ড' অবলম্বনে রচিত।

উড়িয়ে দেওয়া যায়—লোক-সমাজের কথাই স্বতন্ত্র! প্রয়োজন হলে কালই তিনি পাঁচজনের সামনে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে রসিকতা করবেন হয় তো। বিবেকের কথা, বিশ্বাসের কথা তখন মনেই থাকবে না। আর প্রকৃতই তাই হচ্ছে। তথাকথিত 'স্বাধীন চিন্তা' 'স্বাধীন মতবাদ' প্রভৃতির কবলে' পড়ে এই সেদিন পর্য্যন্ত তিনি এই করেছেন। বিনিদ্র নয়নে সারারাত যা ভাবেন সকালে লজ্জা পান তার জন্য। আজকাল রাত্রে ঘুমও হচ্ছে না। কিছুদিন থেকে এ-ও লক্ষ্য করেছেন যে আজকাল মনটাও বড় সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে—কারণ ক্ষুদ্র বৃহৎ যা-ই হোক। সুতরাং মনের উপর নির্ভর করতে ভরসা হয় না তাঁর। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইদানিং এক অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে। রাত্রে তিনি যা ভাবেন, যা সত্য বলে' অনুভব করেন, সকালে ঠিক তা ভাবতে পারেন না, সকালে তা সত্য বলে' স্বীকার করতে দ্বিধা হয়। রাত্রিতে সমস্ত রূপান্তরিত হয়ে যায় যেন। একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে বলেছিলেন ব্যাপারটা। ডাক্তারটি অবশ্য বন্ধুলোক—রহস্যভরেই বলেছিলেন তাকে কথাটা। ডাক্তারবাবু বললেন যে ওরকম হয়। বিশেষত যারা ভাবুক প্রকৃতির তাদের মনে একাধিক বিভিন্ন চিন্তাধারার অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। বিনিদ্র রজনীরও এমন একটা অদ্ভুত প্রভাব আছে যে সমস্ত জীবনের সংস্কার রাতারাতি বদলে যেতে পারে। সব সময়ে হয় না অবশ্য। কেউ যদি তার এই দ্বিবিধ সত্তার সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন হয়ে কষ্ট পায় তাহলে অবশ্য সেটা রোগেরই সূচনা বলে' ধরতে হবে এবং তার চিকিৎসা করা উচিত। সব চেয়ে ভাল হচ্ছে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সুরটাই বদলে ফেলা। আহার, বিহার, পারিপার্শ্বিক সমস্ত আমূল পরিবর্ত্তন করা। সব ছেড়ে ছুড়ে দিনকতকের জন্য কোথাও বেরিয়ে পড়া মন্দ নয়...ওষুধ অবশ্য আছে... কিন্তু...

পুরন্দরবাবু আর শুনছিলেন না—তিনি যা জানতে চাইছিলেন তা জেনে গেছেন। এটা একটা অসুখেরই সূচনা তাহলে।

"অসুখ? এই সব আধ্যাত্মিক ধারণা অসুখ ছাড়া কিছু নয় তাহলে।" মন কিন্তু কিছুতেই মানতে চাইত না এ কথা।

অনতিকাল পরে আর একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এতদিন যা রাত্রিতেই নিবদ্ধ ছিল তা সকালেও ঘটতে লাগল। তফাত' রাত্রিতে মনটা বিষাদে পরিপুর্ণ হয়ে থাকত সকালে হত রাগ। রাত্রির আবেগ সকালে রূপান্তরিত হত তিক্ত আত্মগ্লানিতে। অতীতের—এমন কি সুদূর অতীতের কতকগুলো ঘটনাও—বার বার মনে পড়ত। অদ্ভুতভাবে মনে পড়ত। কিছুতেই এড়াবার উপায় ছিল না। সত্যিই আশ্চর্য্য কাণ্ড। পুরন্দরবাবুর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে। পরিচিত লোককে চিনতে পারেন না, নাম মনে থাকে না, বই পড়বার দুই একদিন পরেই গল্পটা ভুলে যান—এ সবের জন্যে অনেকবার অপ্রস্তুতও হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু স্মৃতি-ভ্রংশ হওয়া সত্ত্বেও সুদূর অতীতের এই ঘটনাগুলো—যা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি—এমন স্পষ্ট এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ এমন আশ্চর্য্য রকম নিখুঁতভাবে স্মৃতিপটে ফুটে উঠছে কি করে? মনে হচ্ছে কিছুই যেন অতীত হয় নি, আবার যেন ঘটছে সব, আবার যেন সে জীবন ভোগ করছেন তিনি। অস্বাভাবিক অলৌকিক কাণ্ড বলে' মনে হচ্ছে তাঁর এটা। এমন কতকগুলো ঘটনা মনে পড়ছে যা বিস্মৃতির তলায় একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়—অতীতের অনেক কথাই অনেকের অনেক সময় মনে পড়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই—কিন্তু পুরন্দরবাবুর যা হচ্ছিল তা একটু বিস্ময়কর। শুধু স্মৃতি নয়, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অনুভূতি যেন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছিলেন তিনি—মনে হচ্ছিল কেউ যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই জীবনের ঘটনা-প্রবাহের মাঝখানে। অতীত জীবনের এই ঘটনাগুলোকে হঠাৎ পাপ বলেই বা মনে হচ্ছে কেন? নিজে বিচার করে' যে সে-গুলোকে পাপ বলে' ঠিক করছেন তা নয়—নিজের এই ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ অসুস্থ মনের উপর কিছুমাত্র আস্থা নেই তাঁর...কিন্তু আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপুর্ণ হয়ে উঠছে অকারণে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ছে! মাত্র দু'বছর আগেও কি তিনি ভাবতে পারতেন—কেউ কি ভাবতে পারত —যে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়া সম্ভব!

প্রথম প্রথম যে ঘটনাগুলো তাঁর মনে পড়ছিল সেগুলো ঠিক অশ্রু-জনক নয়—ক্ষোভজনক। জীবনের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ছিল, কোথায় কবে অপমানিত হয়েছিলেন তা-ও মনে পড়ছিল। একবার একটা লোক কুৎসা রটিয়েছিল তাঁর নামে, ফলে ভদ্রসমাজে গতিবিধি বন্ধ হয়ে গেল তাঁর কিছুদিন। প্রকাশ্য সভায় একটা লোক অপমান করেছিল তাঁকে একবার, কিন্তু তিনি মানহাহির মকোর্দ্দমা করেন নি: আর একবার এক মহিলা-মজলিসের কয়েকটি সুন্দরী সভ্যা তাঁর সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল তার জবাব দিতে গিয়ে আরও হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন তিনি: টাকা ধার করে' শোধ করেন নি এরকম কয়েকটা ঘটনাও মনে পড়ল—সামান্য সামান্য টাকা—কিন্তু শোধ করা হয় নি। শুধু তাই নয় তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন—নিন্দাও করেছেন তাদের নামে। খুব যখন মন খারাপ হ'ত তখন মনে পড়ত—দু' দুবার কি জঘন্য বাজে ব্যাপারে টাকা উড়িয়েছেন তিনি। এক আধটাকা নয় প্রচুর টাকা! কিন্তু এসবের চেয়ে গুরুতর ঘটনাও মনে পড়ে যেত সঙ্গে সঙ্গেই।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বুড়ো কেরাণীটার কথা মনে পড়ে যেতে—সেই নিরীহ পক্ককেশ লোকটাকে চোখের সামনে দেখতে পেতেন যেন, বিস্মৃতির তলায় সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে গিয়েছিল অথচ...হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে যেত। বহুকাল পুর্ব্বে প্রকাশ্যে লোকটাকে অসঙ্কোচে অপমান করেছিলেন তিনি। কোন কারণ ছিল না, কেবল বাহবা পাবার জন্য তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করে' একটু আত্মশ্লাঘা অনুভব করবার জন্য অনেক লোকের মাঝখানে অপ্রস্তুত করেছিলেন লোকটাকে। এই রসিকতাটি করার জন্যে বন্ধুবান্ধবদের কাছে খাতির বেড়ে গিয়েছিল তাঁর! ঘটনাটা এত দিন আগে ঘটেছিল যে ভদ্রলোকের নামটা পর্য্যন্ত ঠিক মনে করতে পারছিলেন না তিনি...কিন্তু আর সমস্ত পরিষ্কার মনে পড়ছিল...পারিপার্শ্বিক সমস্ত ছবি হুবহু যেন দেখতে পাচ্ছিলেন। বেশ মনে পড়ছে ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের পক্ষ সমর্থন করছিলেন—অবিবাহিত

মেয়ে—যৌবন সীমা পার হয়েছে—তাকে কেন্দ্র করে' নানারকম গুজব উঠেছিল তখন। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম বেশ জোর গলায় তর্ক করছিলেন, পুরন্দরের বাক্যবাণে বিধ্বস্ত হয়ে হঠাৎ তিনি কেঁদে ফেললেন—সকলের সামনে। এখন হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সেই ছবিটা মনে পড়ছে। ছোট ছেলের মতো কাঁদছিল লোকটা—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—দুহাতে মুখ ঢেকে। হঠাৎ মনে হল এ ছবি তাঁর মনে বরাবর আঁকা আছে—কোনদিনই মুছে যায় নি। আর আশ্চর্য্য—তখন যা খুব কৌতুকজনক বলে' মনে হয়েছিল—যেমন ওই ছোট ছেলের মতো দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদাটা—এখন তা আর মোটেই কৌতুকজনক নেই। বরং ঠিক উল্টো।

আর একটা ঘটনা। একবার এক গরীব স্কুল মাষ্টারের যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে কুৎসিৎ একটা রসিকতা করেছিলেন তিনি—কেবল নিছক রসিকতার খাতিরেই। সে কথা তার স্বামীর কাণে গিয়ে উঠেছিল। ফলে কি হয়েছিল তা অবশ্য তিনি জানেন না, কারণ ঠিক তারপরই তাঁকে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল—কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে ও জাতীয় রসিকতার বিষময় ফল হওয়া অসম্ভব নয়—হয় তো হয়েছিল···এই নিয়ে তাঁর কল্পনা হয় তো অনেক জাল বুনতো—কিন্তু আর একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এই সেদিনের কথা। সামান্য একটা চাকরাণির সঙ্গে কি কাণ্ড করলেন তিনি···তার যে প্রেমে পড়েছিলেন তা নয়···কিন্তু তাকে নিয়ে যা ঘটল তা লজ্জাকর। আর সব চেয়ে লজ্জাকর তাকে ফেলে পালানো···অসহায় শিশুটার দিকে পর্য্যন্ত চেয়ে দেখেন নি তিনি···অবশ্য এও ঠিক—একটা জরুরি দরকারে তাঁকে চলে' যেতে হয়েছিল সে সময়—দেখা করবার সময়ও ছিল না—তারপর এক বচ্ছর ধরে' তিনি মেয়েটাকে খুঁজেছিলেন, কিন্তু আর পান নি। এরকম বহু ঘটনার স্মৃতি মনে জাগছে···মনে হচ্ছে আরও আছে। আত্মসম্মান সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ।

আত্মসম্মানবোধের মানদণ্ডটাও তাঁর বদলে যাচ্ছিল যেন ইদানিং। আজকাল (অবশ্য, মাঝে মাঝে) পায়ে হেঁটে বেড়াতে তাঁর আর লজ্জা হত না তত। নিজের গাড়ি নেই, রাস্তায় রাস্তায় আপিশে আদালতে টো-টো করে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পরণে আড় ময়লা জামা কাপড়—আগে এ অবস্থায় পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে কুণ্ঠিত হয়ে পড়তেন—আজকাল ভ্রূক্ষেপই করেন না। ভণ্ডামি নয়। সত্যিই এরকম মনোভাব হচ্ছিল তাঁর আজকাল। কিন্তু সব সময়ে নয়। মাঝে মাঝে এরকম হত—বিশেষ করে' যে সময়ে তাঁর মানসিক চঞ্চলতা বাড়ত, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হয়ে পড়তেন—সেই সময়ে মনে হ'ত···। কিন্তু না, আত্মসম্মানবোধের চেহারাটা বদলে ছিল সত্যিই। যে সব বাহ্যিক আড়ম্বর আত্মমর্য্যাদার জন্যে প্রয়োজনীয় মনে হত আগে, আজকাল তার অভাব বা আধিক্য মনকে আর নাড়া দেয় না তত। আজকাল সমস্ত মন একটি কথাই ভাবছে কেবল এবং দিবারাত্রি সেই দিকে উন্মুখ হয়ে আছে।

শ্লেষ-ভরে মাঝে মাঝে ভাবতেন (এবং যখনই আজকাল নিজের সম্বন্ধে ভাবতেন শ্লেষ থাকত তাতে)—"স্বর্গে হয় তো ভগবান ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আমার জন্যে! আমার চরিত্র সংস্কার না করা পর্য্যন্ত ঘুম হচ্ছে না তাঁর বোধহয়। ক্রমাগত জাগিয়ে তুলছেন বীভৎস স্মৃতিগুলোকে। অনুতাপের অশ্রু! হতে পারে। কিন্তু কিচ্ছু হবে না। বন্দুক ছুঁড়লে কি হবে—টোটা একদম খালি! আমি জানি না নিজেকে? স্মৃতি অনুতাপ চোখের জল—সমস্ত সত্ত্বেও কিছু করবার উপায় নেই আমার। প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞা সত্ত্বেও আমি কিছু বদলাই নি। কালই যদি প্রলোভন আসে, কালই যদি ঘটনাচক্র এমন হয় যে একটা গুজব রটিয়ে দিলেই আমার স্বার্থসিদ্ধি হবে কালই আমি আবার গুজব রটিয়ে দিতে পারি যে ওই স্কুলমাষ্টারের রূপসী বউ লুকিয়ে টাকা নিয়েছিল আমার কাছ থেকে। কালই পারি আবার—একটু ইতস্তত করব না। অতিশয় ঘৃণ্য জেনেও করব না। ফের যদি আমাকে সেই পুরুতটা আবার অপমান করে—আবার জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব তার···তার মেয়ের কান্নায় দৃকপাত করব না। সুতরাং টোটায় কিছু নেই···বন্দুক ছোঁড়া বৃথা। বুঝলেন ভগবান মশাই? অতীতের দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়ে, লাভ কি···নিজের হাত থেকেই যে পরিত্রাণ নেই আমার···"

যদিও স্কুল মাষ্টারের স্ত্রীর নামে গুজব রটাবার অথবা পুরোহিতের মুখে জুতো মারবার কোন সুযোগ আর উপস্থিত হল না—কিন্তু উপস্থিত হলে যে তিনি দ্বিধা করবেন না এই চিন্তাই পুরন্দরবাবুকে দগ্ধ করতে লাগল। কোন মানুষই অনুতাপানলে একটানা দগ্ধ হয় না, মাঝে মাঝে ছাড়া পায় এবং সেই মুক্ত অবস্থায় জীবনকে উপভোগও করে।

পুরন্দরবাবুরও অনুতাপের অবকাশে জীবন-উপভোগে আপত্তি ছিল না। অরুচিও ছিল না। কিন্তু কলিকাতা-প্রবাস মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে উঠত তাঁর কাছে। জ্যৈষ্ঠমাস শেষ হতে চলল···মাঝে মাঝে ইচ্ছে করছিল মকোর্দ্দমা টকোর্দ্দমা চুলোয় যাক—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, পিছন দিকে না চেয়ে···সোজা কোথাও দৌড় দিতে। বনে পর্ব্বতে যেখানে হোক। হরিদ্বারে গেলে হয়! কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই সব উলটে গেল আবার। মনে হল—"হরিদ্বারেই যাই আর যেখানেই যাই 'কমলি' তো ছাড়বে না কিছুতেই। তাছাড়া দায়িত্ব যখন নিয়েছি—তখন ফেলে পালানোর কোন মানে হয় না। পালাবই বা কেন? এই ধুলো এই গরম, এই বিশৃঙ্খলা এই তো বেশ। আদালতে ওই যে শকুনের ঝাঁক বসে রয়েছে—প্রকাশ্যভাবে দিব্যি ছেঁড়াছেঁড়ি করে' খাচ্ছে—সঙ্কোচ নেই, শঙ্কা নেই, ভণ্ডামি নেই। রাস্তায় জনস্রোত চলেছে, স্বার্থপর, ভীরু, লোভীর দল···তার মতো পাষণ্ডের পক্ষে এই তো স্বর্গ! সমস্তই খোলাখুলি, সমস্তই স্পষ্ট পরিষ্কার—ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। তথাকথিত ভদ্র সমাজের মুখোস-পরা ভণ্ডামির চেয়ে এ ঢের ভাল। এ সারল্যকে বরং শ্রদ্ধা করা চলে। যাব না—এইখানেই থাকব আমি।"

ক্রমশঃ

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

(১৪)

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে উমেশচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশন হইয়াছিল এলাহাবাদে লাউদার কাস্‌ল্ নামক প্রাসাদে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, কারণ কংগ্রেসের জন্যই প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ইতোমধ্যে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল তখন স্থান সংগ্রহে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল ; সেই-জন্য দ্বারভাঙ্গার স্বদেশহিতৈষী মহারাজা স্তর লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর লাউদার কাস্‌ল্ ক্রয় করিয়া কংগ্রেসকে ব্যবহার করিতে দেন। স্তর হেনরি কটন
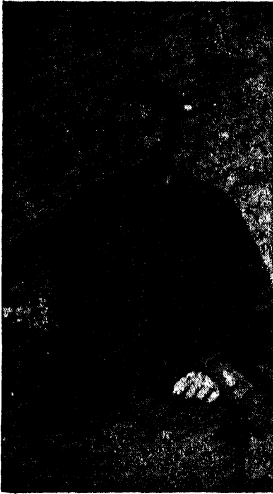
মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

তাঁহার Indian & Home Memories নামক গ্রন্থের ২২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন : দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী। ভূতপূর্ব্ব মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত, দয়ালু ও মহৎচরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। * * তিনি ভারতের জাতীয় মহাসমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং উহার জন্য প্রভূত অর্থদান করিতেন। তাঁহার সরল জীবন-যাত্রা প্রণালী ও দেশবিস্তৃত সুখ্যাতি সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতির জন্য 'সন্দেহজনক পাত্রগণের তালিকায়' তাঁহাকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে গোয়েন্দারা অনুসরণ করিতেছে বলিয়া তিনি আমার নিকট ন্যায়সঙ্গত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি অনেক কষ্টে তাঁহাকে এই গোয়েন্দার দৃষ্টি হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।" উমেশচন্দ্রই দ্বারভাঙ্গাধিপতিকে ইলবার্ট বিল আন্দোলনের পর দেশের কাযে যোগদান করিতে উদ্বোধিত করেন। উমেশচন্দ্রের (সভাপতির) অভিভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, জর্জ্জ ইউল ও রামস্বামী মুদালিয়র, রামস্বামী নায়ডু, মহাদেব চেট্টি, প্রাণনাথ পণ্ডিত এবং অক্ষয়কুমার দাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। অযোধ্যানাথ ও ইউলকে উমেশচন্দ্রই কংগ্রেসে যোগদান করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় কিরূপে তিনি তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের বন্ধুরূপে পরিণত করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করেন।

মহারাজা স্তর লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর

(২) কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান, অতএব উহাতে সামাজিক সংস্কার লইয়া বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করা অনুচিত। কোন কোন প্রদেশে কোন সম্প্রদায় স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, কোন প্রদেশে কোন সম্প্রদায় বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী, কোন প্রদেশে কোন সম্প্রদায় বিধবা বিবাহের বিরোধী, অতএব এই সকল ব্যাপার লইয়া কংগ্রেসে বাক্‌বিতণ্ডা দলাদলি অভিপ্রেত নহে। সামাজিক প্রথাদি সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকিলেও রাজনীতিক সংস্কারের দিকে সকলে একমত হইয়া কার্য্য করা সম্ভব ও উচিত।

(৩) লর্ড ক্রশের ভারত শাসনসংস্কার বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায়

হর্ষ ও বিষাদ। লর্ড ক্রশের আইন অনুসারে প্রাদেশিক গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়, বড় বড় মুন্সিপালিটী প্রভৃতি হইতে অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি লওয়া হইবে এইরূপ নিয়ম হয়। ব্যাপকভাবে প্রজাগণের প্রতিনিধি না লইলেও ইহা মন্দের ভাল।

(৪) দাদাভাই নৌরোজীকে ইংলণ্ডের অন্তর্গত সেণ্ট্রাল ফিন্‌সবেরীর উদারনীতিক দল কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য ভোটদাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান। কমন্স সভার ৬৭০ জন সদস্যের মধ্যে একজনও ভারতীয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ইহা আশার উদ্রেককর।

(৫) শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে অধিকতর অর্থসাহায্য করা উচিত।

(৬) জুরীপ্রথার সঙ্কোচসাধনের চেষ্টার জন্য নিন্দা।

(৭) ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস কমিটির জন্য অর্থসংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা।

এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ইংলণ্ডে যে ভারতপ্রেমিক ইংরাজগণকে লইয়া তথায় কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য চালিত হইতেছিল তজ্জন্য বহু অর্থ আবশ্যক হইত এবং উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হইলে উমেশচন্দ্র স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে বাকী টাকা প্রদান করিয়া এই পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটীকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্রের মধ্যম খুল্লতাত শম্ভুচন্দ্র পরলোকগমন করেন। ইঁহাকে উমেশচন্দ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। শম্ভুচন্দ্র তৎকালীন

শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এটর্ণি ওয়েন এণ্ড ব্যানার্জ্জীর অফিসে মুৎসুদ্দী ছিলেন এবং উমেশচন্দ্র বিলাত হইতে যখন প্রথম প্রত্যাগমন করেন তখন তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য শোভাবাজারের মহারাজ কমলকৃষ্ণ ও রাজা কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি সমাজপতিগণের নিকট অনুরোধ করেন ও তাঁহাদের সহানুভূতি অর্জ্জন করেন। ব্যবসায়ের প্রথম অবস্থাতে মোকদ্দমা প্রভৃতি সংগ্রহেও তিনি সাহায্য করিতেন। উমেশচন্দ্র প্রতিবৎসর বিজয়ার পর তাঁহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিতেন এবং তাঁহার অনুরোধে স্বামী বিবেকানন্দের (তখনও নিমাই বসুর আর্টিকেল্‌ড্ ক্লার্ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত) পৈতৃক বিষয়াদি বাঁটোয়ারার মোকদ্দমা বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দেন। শম্ভুচন্দ্রের পুত্র আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কেও উমেশচন্দ্র যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে লিখিত পত্রাবলীতে এই স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রাবলী তাঁহার রচিত উমেশচন্দ্রের ইংরাজী ও বাঙ্গালা জীবনচরিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেসের নবম অধিবেশন হয়। পার্লিয়ামেণ্টের নবনির্ব্বাচিত সদস্য ভারতবর্ষের সুসন্তান দাদাভাই নৌরোজী এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'ট্রিবিউন' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সর্দ্দার দয়াল সিংহ এইবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। উমেশচন্দ্র এই অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। লর্ড ক্রশের নবপ্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে ইতোমধ্যে ব্যবস্থাপকসভাসমূহে কোন কোন প্রতিষ্ঠান হইতে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই—কংগ্রেসের উৎসাহশীল সভ্য এবং সাধারণের উপযুক্ত প্রতিনিধি ছিলেন, যথা—

(১) বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায়—ফিরোজশাহ মেটা, দ্বারবঙ্গের মহারাজা স্যর লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ও গঙ্গাধর চিটনবিশ।

(২) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়।

(৩) মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায়—রঙ্গিয়া নায়ডু, কল্যাণসুন্দরম্ আয়ার ও বৈশ্যম আয়েঙ্গার।

(৪) বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায়—ফিরোজশাহ মেটা ও চিমনলাল শীতলবাদ—

(৫) এলাহাবাদের ব্যবস্থাপক সভায়—রাজা রামপাল সিংহ ও চারুচন্দ্র মিত্র—

দাদাভাই নৌরোজী ইঁহাদের নির্ব্বাচনে আনন্দপ্রকাশ করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি রূপে, সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধিরূপে, লালমোহন প্রেসেডেন্সী বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের প্রতিনিধিরূপে, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ জমিদারগণের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। হেনরি কটন (চীফ সেক্রেটারী), রমেশ দত্ত (বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার) প্রভৃতি মনোনীত সদস্যদের মধ্যেও অনেকে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তৎকালে মনোনীত সভ্যগণকে ব্যক্তিগত মত পরিহার করিয়া গবর্ণমেণ্ট পক্ষে ভোট দিতেই হইবে এরূপ নির্দ্দেশ না থাকায় (সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন) ইঁহারা কখনও কখনও গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষেও মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহা অসম্ভব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উমেশচন্দ্র যেবারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন সেবারে রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায় উমেশচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করায় তিনিই জয়ী হন। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে

উমেশচন্দ্র ব্যবস্থাপক সভায় যে কার্য্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে স্যর আশুতোষের মন্তব্য পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। স্যর হেন্‌রি কটন লিখিয়াছেন যে তিনি যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য ছিলেন তখন শাসন কার্য্যে অভিজ্ঞতালব্ধ সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত—যিনি সমান দক্ষতার সহিত একদিকে কবিতা দেবীর আরাধনা এবং অপরদিকে ভারতবাসীর ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিক ইতিহাসের গবেষণা করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় বাগ্মী. আজীবন শিক্ষাব্রতী ও স্বদেশনেতা এবং চিরস্মরণীয় স্বদেশপ্রেমিক লালমোহন ঘোষ—আর একজন প্রতিভাশালী বাগ্মী যাঁহার বক্তৃতা জন ব্রাইটের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—অদ্বিতীয় ব্যবহারাজীব এবং কংগ্রেস-নেতা—যিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্যারো-ইন-ফার্ণেসের উদারনীতিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হইবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালী ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য ছিলেন এবং ইঁহাদের সহিত তিনি বহুবার সভাকক্ষে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি যে পরাজিত হন নাই তাহার কারণ এই যে সর্ব্বদাই তাঁহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট পক্ষ সমর্থন করিতেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে উমেশচন্দ্রের ভাগিনেয়ী বিনোদিনীর স্বামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন। ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুকাল উমেশচন্দ্রের পার্ক ষ্ট্রীটের বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতেছিলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছিলেন। তাঁহার 'গুরুজী' 'রেইজ এণ্ড রায়ত'-সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বৎসরে পরলোক গমন করেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও এই বৎসর স্বর্গারোহণ করেন। উমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। বাল্যকালে তিনি থিয়েটারের অনুরাগী ছিলেন, পরিণত বয়সেও উমেশচন্দ্রের সে অনুরাগ যায় নাই এবং ন্যাশন্যাল থিয়েটার, রয়েলবেঙ্গল থিয়েটার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের গৃহে অভিনীত সখের থিয়েটারে বাঙ্গালা গ্রন্থাদির অভিনয় দেখিতে তিনি ভালবাসিতেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের তিনি একজন উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নারী দ্বারা নারীর ভূমিকা অভিনয় তিনি সমর্থন করিতেন। পুরাতন সংবাদপত্রাদি হইতে প্রতীত হয় যে বহুবাজারের অক্রুর দত্ত বংশীয়গণ দ্বারা স্থাপিত সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে—বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সকল অধিবেশনে যোগদান বা প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনা করিতেন,—তাহাতে উমেশচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইতেন। এই বৎসরে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বয়ং য়ুরোপীয় বেশভূষা আচার ব্যবহারাদি অবলম্বন করিলেও হিন্দুধর্ম্মের এবং প্রকৃত হিন্দুর প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল; সেইজন্য ভূদেবকে তিনি অসীম শ্রদ্ধা করিতেন।

এই বৎসরে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্যতম সভ্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ও পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেমিনারীর অর্থ তাঁহাদের ব্যক্তিগত বলিয়া দাবী করেন। উমেশচন্দ্র এই ব্যাপার মিটমাট করিয়া সেমিনারীর আর্থিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পার্লিয়ামেণ্টের আইরিশ সদস্য অ্যালফ্রেড ওয়েব উহাতে সভাপতিত্ব করেন, রঙ্গিয়া নাইডু অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি ছিলেন। উমেশচন্দ্র এই অধিবেশনেও যোগদান করিতে পারেন নাই। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, সভাপতি নির্বাচন বোধ হয় উমেশচন্দ্রের মনঃপুত হয় নাই। উমেশচন্দ্রের এইরূপ
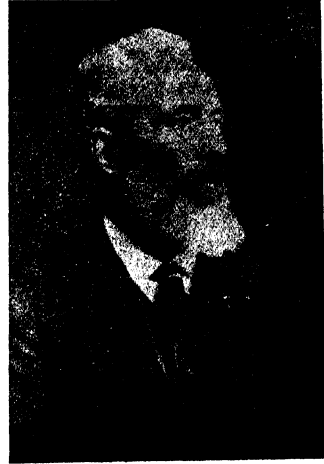
অ্যালফ্রেড ওয়েব

মত ছিল যে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত কংগ্রেসে ভারতবাসীই সভাপতিত্ব করিবেন। (A nation in Making ১৩৬ পৃষ্ঠা)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি উমেশচন্দ্রের পত্নী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলকৃষ্ণ শেলী* ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় আসেন,তিনি গার্ট্রুড নাম্নী একজন ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনী হেলইস একজন ইংরাজ ব্যারিষ্টার জর্জ্জ রোগারকে বিবাহ করেন। মধ্যমা কন্যা সুশীলা এনিটা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং এম-ডি উপাধিলাভান্তে আজীবন কুমারী থাকিয়া রোগী ও আর্ত্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ধর্ম্ম ব্যক্তিগত বিষয় বলিয়া উমেশচন্দ্র মনে করিতেন এবং তিনি কাহারও এমন কি নিজ পত্নী ও সন্তানের ধর্ম্ম বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বিবেচনা করিতেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার পিতৃপিতামহগণ প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণ কেহ সে দৃষ্টিতে দেখিবে না এবং দেব-সেবা ক্ষুণ্ণ হইবে ইহা মনে করিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইতেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা এটর্ণী সত্যধনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেবসেবার যথোচিত ব্যবস্থা

* গত বারে কংগ্রেসের গ্রুপ ছবিতে মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ "শেলী" বনার্জীর পরিবর্ত্তে "শেফালী" বনার্জী মুদ্রিত হইয়াছিল।

করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার খুল্লতাত শম্ভুচন্দ্রও তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই পরামর্শের ফলে তিনি সিমলায় বলরাম দে ষ্ট্রীটস্থ (বর্ত্তমান ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী ষ্ট্রীটস্থ) পৈতৃক বাড়ীর ছয় আনা অংশ দেবোত্তর করিয়া এবং এক লক্ষ টাকা মূল্যের ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া দেবোত্তর দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্টারী করিয়া গিয়াছেন। এই দলিলে তাঁহার সহোদর সত্যধন একজন দলিলদাতা।

নলিনী ব্রেয়ার

জর্জ্জ ব্রেয়ার

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী আড়িয়াদহ গ্রামে বুড়া শিবতলায় ৺শ্রীশ্রীমুক্তকেশী শক্তিমূর্ত্তির পার্শ্বে যে চাঁদশঙ্কর শিব আছেন তাহা তাঁহার পিতামহ পীতাম্বর স্থাপিত। পীতাম্বরের মাতার নাম চাঁদরাণী ও পিতার নাম রামশঙ্কর ছিল—উঁহাদের নাম হইতে চাঁদশঙ্কর শিব স্থাপনা হয়। ৺শ্রীশ্রীমুক্তকেশী ৺রামনারায়ণ বা নারায়ণ মিশ্র স্থাপিত করেন। উমেশচন্দ্র সেবায়ৎ পুরোহিতগণকে বার্ষিক বৃত্তি দিতেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুনায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং রাও বাহাদুর ভীড়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। উমেশচন্দ্র এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং জুরী দ্বারা বিচার প্রথার সঙ্কোচসাধনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে বাঙ্গালার প্রাদেশিক কনফারেন্স আহূত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বন্ধু মনোমোহন উমেশচন্দ্রকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখ পিছাইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু উমেশচন্দ্র তখন অসুস্থ এবং দেওঘরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি আসিতে সমর্থ হইলেন না। নাটোরাধিপতিও অনুপস্থিত হইলেন, কারণ ('রেইজ এণ্ড রায়ৎ' লিখিয়াছিলেন, রহস্য করিয়া কি না জানি না,) এইরূপ নাকি রীতি ছিল কৃষ্ণনগরে নাটোরাধিপতির যাইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের মহারাজাকে তিনবার সবিনয়ে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং তিনবার তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না, পরে পুনরায় নিমন্ত্রণ করিলে তিনি যথোচিত পার্শ্বচর লইয়া আগমন করিবেন !! এই অধিবেশনের অল্প কয়েকদিন পরে মনোমোহন অকস্মাৎ স্নানাগারে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া বঙ্গভূমিকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও সহযোগীকে হারাইয়া অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। য়ুনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে মনোমোহনের চিত্র প্রতিষ্ঠাকালে উমেশচন্দ্র বক্তৃতা করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন "তোমাদিগের কক্ষের প্রাচীরে তোমাদিগের পরলোকগত হিতকামীদিগের আলেখ্য রক্ষাই যদি তোমাদিগের উদ্দেশ্য হয়—তবে এই কক্ষের প্রাচীর যেন দীর্ঘ—অতি দীর্ঘকাল আলেখ্য-শূন্য থাকে।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতি হইয়াছিলেন রহমৎউল্লা সিয়ানী এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র। স্বয়ং অভিভাষণ পাঠ করিতে অক্ষম হওয়ায় স্যর রাসবিহারী ঘোষ রমেশচন্দ্রের অভিভাষণ পাঠ করেন।

ইংলণ্ডে এই সময়ে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়ায় উদারনীতিক দাদাভাই নৌরোজী পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন এবং রক্ষণশীল ভারতবাসী ভবনাগরী পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন। ৭০ বৎসর বয়স্ক দাদাভাই নৌরোজী- যৌবনোচিত উৎসাহসহকারে এখনও

রহমৎউল্লা সিয়ানী

ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যপ্রার্থী হইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ এবং অচিরে তিনি সফলকাম হউন এই কামনা কংগ্রেস হইতে তাঁহার পুরাতন বন্ধু উমেশচন্দ্রই করিয়াছিলেন।

যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এই কংগ্রেস উপলক্ষে প্রতিনিধিগণকে একটি সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে তাঁহার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী !" রচনা করেন।

(ক্রমশঃ)

অলক্ষ্মী

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

অনুপম বিয়ে করেছে। বিয়ে করবে না এমন কথা অবশ্য সে কোনো দিন বলেনি। চিরকালই বলে আসছিল, আশে-পাশে, পথে ঘাটে এবং ঘরে ঘরে সচরাচর যা দেখতে পাওয়া যায়, ওসব লক্ষ্মী মেয়ে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না; তার চেয়ে বরং সারাজীবন চিরকুমার থাকার কৃচ্ছ্রসাধন করবে।

বিয়ে করার মতো অলক্ষ্মী মেয়েটি কেমন করে তার ভাগ্যে জুটে গেল সে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যা জানা গেল গল্প করে তা বলতে গেলে এরকম দাঁড়ায়:—

একদা অফিস ছুটির পরে অনুপম ট্রামে বাড়ী ফির্‌ছিল। যুদ্ধের বাজারে নিজের গাড়ি থাকলেও ইচ্ছামতোই তাতে চড়া যায় না। ট্রাম-এ উঠে বদঅভ্যাসবশে 'সিট্' এর কোলে গা ঢেলে দিয়ে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ বুক পকেটে একটু চাঞ্চল্যের অনুভবে ঝিমানির ছন্দোপতন হল। সেই সংগে সংগেই কটাং করে একটা আওয়াজ হতেই সে জেগে গেল। বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখল, তার কলম নেই। কলম আজকাল বহুমূল্য হলেও সেজন্য দুর্ভাবনায় পড়ার মতো দুরবস্থা তার নয়। বহুদিন ব্যবহারে যে কলমটির উপর একটা মমতা জন্মে গেছে, সেটা খোয়া গেল পকেটমারার হাতে একটা তুচ্ছ ব্যাপারে এজন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

তার ঠিক পাশেই নির্লিপ্ত শান্তমুখে দাঁড়িয়েছিল সুন্দরী এক তরুণী। তাকে সন্দেহ করা অসম্ভব। কিন্তু সে-মুহূর্তেই সামনের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিঃসংকোচে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটির হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে তুলে ধর্‌লেন। দেখা গেল, অনুপমের কলম মেয়েটির হাতে। ভদ্রলোক কৃতিত্বের আনন্দে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—তখন থেকে সন্দেহ করছিলাম মশাই, সহজ মেয়ে ও নয়; নিজে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রতা ক'রে ওকে বস্‌বার জায়গা দিলাম, বস্‌ল না; লাভের মধ্যে অপর লোকে আমার জায়গা মেরে নিল।

সেই অপর লোকের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিজয়স্ফীত বক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ট্রাম থামার একটা ঝাঁকুনি খেলেন। কলমসুদ্ধ মেয়েটির হাত তখনো তাঁর মুষ্টিবদ্ধ।

আজকাল যে নারীজাতীয়া পকেটমারও দেখা যাচ্ছে, কথাটা তাহলে নিতান্তই গুজব নয়। বিশ্বের যে কোনো বিস্ময় যার কাছে ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ ব্যাপার, সেই অনুপম বিস্মিত, নির্বাকভাবে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে মুখ রক্তলেশহীন। অপমানের ভয়ে মুখ পাণ্ডুর, কিন্তু কৃতকর্মের জন্য একবিন্দু সংকোচ মেয়েটির চোখে নেই।

চতুর্দিকে তখন নারকীয় চিৎকার উঠেছে। তরুণীকে সকলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেল্‌তে চায়। মেয়েদের সিট্-এর মহিলাদের আক্রোশ যেন সবচেয়ে বেশি। প্রকৃত বিস্ময়ভাব চেষ্টায় ঘুচিয়ে মুখে অভিনয়ের বিস্ময় ফুটিয়ে অনুপম তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়াল, মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল,—আরে, সুমিত্রা যে!

তরুণীর মুখে দেখা দিল অকৃত্রিম বিস্ময়ভাব। তার কোমল মণিবন্ধ থেকে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির ধারণমুষ্টি শিথিল হয়ে খ'সে পড়্‌ল। অনুপম বল্‌ল—কতকাল পরে দেখা কি আশ্চর্য্যি, মোটে চিন্‌তেই পারিনি! তুমি তো আমায় চিন্‌তে পেরেছ বোঝা গেল, কিন্তু ঘুমিয়ে প'ড়ে অপরাধ করে ফেলে'ছি ব'লে এমন রসিকতা করতে হয়?

মেয়েটির বিস্ময় আরো বেড়ে উঠ্‌ল। তেরশ'একান্নর কল্‌কাতার ট্রামের সূচিভেদ্য জনতা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। অনুপম বলে চলেছে, —গাড়িসুদ্ধ লোক যে তোমায় পকেটমার মনে ক'রে মারমুখো হয়ে উঠেছে। এমন সর্বনেশে রসিকতাও করে অ্যাঁ? আমি চিন্‌তে না পারলে তো তুমি নিজে যেচে পরিচয় দিতে ব'লে মনেই হচ্ছে না। মার খেয়ে মরতে যে এক্ষুণি! তরুণীর মুখ নত হয়ে এল। রক্তোচ্ছ্বাসে সে মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল।

যে মেয়ের নাম কোনোকালেই সুমিত্রা নয়, যে তরুণীকে চেনা দূরে থাক, আগে কোনোদিন দেখেই নি, তারি হাত ধ'রে অনুপম বল্‌ল,—মজা করতে গিয়ে কাণ্ড যা বাধিয়ে তুলেছ এর পর আর এ গাড়িতে থাকা চলে না। চল নেমে যাই।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি জোড়হাত করে বল্‌লেন—দেখুন, না জেনে—মানে একটা—মানে—

হাসিমুখে অনুপম তাঁকে বল্‌ল—কিচ্ছু অপরাধ করেননি; যা করেছেন মানুষের মতোই করেছেন। আচ্ছা, নমস্কার।

স্তব্ধ, বিমূঢ় জনতার মাঝ দিয়ে পথ করে নতমুখী তরুণীর হাত ধরে অনুপম নেমে পড়্‌ল। নিরালা জায়গায় গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বল্‌ল—কলমটা নিশ্চয় বিক্রি করার জন্য নিয়েছিলে। এ বাজারে ওটার দাম শ'খানেক টাকা তো হবেই।

পকেট থেকে একশ' টাকার নোট নিয়ে সে তরুণীকে দিতে গেল। তরুণী কিন্তু নতমুখে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। টাকা আবার নিজের পকেটে রেখে দিতে দিতে অনুপম বল্‌ল,—নেবে না? ভালো। তোমার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কি নাম তোমার? তরুণী উত্তর দিল না, বিদ্রোহী দৃষ্টিতে অনুপমের মুখের দিকে চাইল। অনুপম বল্‌ল—যাক্‌গে আপাততঃ ওই সুমিত্রা নামই রইল তোমার। কে আছেন তোমার? রূঢ় কণ্ঠে তরুণী উত্তর দিল—কেউ না।—কেউই না?—অনুপম বল্‌ল,—ভালো, আমারো কেউ নেই। ছিলেন, এখন নেই।—আমারো ছিলেন,—মেয়েটি বল্‌ল—কেউ না খেতে পেয়ে মরেছেন, কেউ মরে'ছেন রোগে পড়ে ওষুধ না পেয়ে। অনুপম বল্‌ল,—খেতে পেয়ে এবং ওষুধ পেয়েও আমার সকলে মরেছেন। ও কিছু নয়, যাক্‌গে। তুমি চাকরি করো না কেন? চেষ্টা করেছিলাম—তরুণী বল্‌ল—বিদ্যে কম, তাতে কুলোল না।—চাকরি একটা আমার অফিসে তোমায় দিতে পারি;—অনুপম বল্‌ল—কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে তোমায় অপমান করতে চাইনে। তোমায় আমি বিয়ে করবো।

তার পরের যা সব নাটকীয় ঘটনা এবং কথা, সবই অকেজো। কাজের কথা হচ্ছে, ওই মেয়েটিকেই অনুপম বিয়ে করল।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

সন্ধ্যায় লাইব্রেরী হইতে ফিরিবার পথে অপর্ণা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—আজ আপনি চা খেয়েছেন ?

—না। আপনি জানলেন কি ক'রে ?

—বেশ, একবারও লাইব্রেরী থেকে বেরুলেন না।

অমল ঠাট্টা করিল—আপনি তা হলে লাইব্রেরীতে যান পড়তে নয়।

—না, আপনার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাক্তে। কিন্তু চা খেলেন না কেন ?

—মনিব্যাগ ভুলে রেখে এসেছি—তাই। এক্ষুণি গিয়ে খেলেই হবে—

অপর্ণা কি যেন ভাবিয়া বলিল,—চলুন, ইউনিভারসিটি রেষ্টুরেণ্টে চা খেয়ে আসা যাক্—আপত্তি আছে ?

—আপনি মেয়েমানুষ হ'য়ে যদি যেতে পারেন, দশজনের কটাক্ষ ও সমালোচনাকে উপেক্ষা ক'রে, তবে আমি পুরুষমানুষ অবশ্যই পারবো।

অপর্ণা ব্যঙ্গ করিল—পৌরুষের অভাব আছে একথা বলা যায় না। চলুন—

চলিতে চলিতে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অপর্ণা বলিল,—হ্যাঁ, ভাল কথা এমনি ভুল হওয়া রোগে ধ'রেছে কতদিন—

অমল আঘাত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। অপর্ণাকে আঘাত করিয়া সে যেন তৃপ্তি পায়, আঘাতে আঘাতে অপর্ণার খোলোস যেন খুলিয়া পড়িয়া তাহাকে আরও আপনার, আরও সুন্দর করিয়া তুলে। অমল তাই বলিল,—আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে ব'ললে আপনি হয়ত খুশী হ'বেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, এটা আমার চিরকালের দুরারোগ্য ব্যারাম।

—আমি খুশী হব কেন ?

—জানেন না, এটাও একটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মেয়েদের পিছনে ল্যাংবোটের মত কতকগুলি হতাশ প্রেমিক চলা ফেরা ক'রলে তারা খুশী হয়—

অপর্ণা জবাব দিল না।

ক্ষণিক অপেক্ষা করিয়া বলিল—কেবল হতাশ প্রেমিক ?

—হ্যাঁ।

—একজনও সফলকাম প্রেমিক থাক্‌বে না।

—না।

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া কৃত্রিম ক্ষোভের সহিত বলিল,—আমার কি হবে তা হ'লে ?

অমল উচ্চকণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—বিয়ে হবে না।

—হবে না! কেন ?

অমল জানে অপর্ণা অভিমান করিলে বড় ভাল লাগে, সে তাই বলিল—প্রেমিককুলকে হতাশ ক'রতে ক'রতে এমন একটা বয়সে এসে পৌঁছবেন যখন আর বিয়ে করা যায় না।

অপর্ণা আবার ক্ষণিক অগ্রসর হইয়া বলিল—বড়ই শোচনীয় অবস্থা !

—না হয়, ডাইভ বোমারু বিমানের মত নোজ ডাইভ ক'রবেন কোন ব্যক্তি ঠিক ক'রে, ডাইভ ক'রবেন বটে কিন্তু আর উঠ্‌তে পারবেননা,—মাটিতে পড়ে একেবারে ছাতু !

—সর্ব্বনাশ। তবে এক কাজ করা যাক্, একটা দিন ঠিক ক'রে মনে মনে সংকল্প করি, ঘুম থেকে উঠে, যাকে দেখ্‌বো তাকেই বিয়ে ক'রে ফেল্‌বো।

অমল বলিল—এটা ভাল প্রস্তাব, অমনি ডেস্‌পারেট্ না হ'লে লোকে বিয়ে ক'রতে পারে না। হ্যাঁ, তবে দিনটা কবে ঠিক ক'রলেন সেটা জানাবেন।

—কেন প্রত্যুষে হাজির হবেন নাকি ?

—মন্দ কি ? লক্ষ্যভেদ ক'রেছিল ফাল্গুনী, কিন্তু সভায় উপস্থিত ছিল ত অনেকেই—তাদের মতই ভগ্ন-হৃদয়ে না হয় ফিরে আস্‌বো—

অপর্ণা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া একটু তিরস্কারের সুরেই বলিল—আপনার মুখেও লাগাম নেই, মনেরও না। ল্যাংবোটের মত ঘুরতে সখ করে ? ছিঃ—

অপর্ণা রেষ্টুরেণ্টে প্রবেশ করিয়া বলিল—আলডুস্ হাক্সলির কি কি বই পড়েছেন ?

—সামান্যই। অমল জানিত, এ প্রসঙ্গ অবান্তর এবং দোকানের লোকগুলির চোখে কুয়াশার পর্দা টানিয়া দিবার একটা কৌশল মাত্র। অমল অপর্ণার দুর্ব্বলতা দেখিয়া হাসিল।

মেসে ফিরিবার পথে অপর্ণার একটি কথা অমলের মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। যে ইঙ্গিতের উত্তরে সে বলিয়াছিল তাহার মনের লাগাম নাই সে ইঙ্গিত তাহার ইচ্ছাকৃত এবং অপর্ণারও বুঝিবার মত বয়স ও শিক্ষা আছে, কাজেই ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা তাহার নাই এবং এই উত্তরটুকুও তাহার সুচিন্তিত অভিমত নিশ্চয়ই। অমল ভাবে, তাহার পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থার কথা জানিলে হয়ত অপর্ণা এইরূপ উক্তি করিতে পারিত, কিন্তু সে ত তাহা জানিবার কোন সুযোগ দেয় নাই। যদি কেবলমাত্র

বন্ধুত্বই হয়, কেবলমাত্র জীবন পথে একটু 'ভাল-লাগা' হয় তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না,—সে নিজেই হয়ত অসংযমের সহিত কল্পনা করিয়া গিয়াছে, অকারণে হঠকারিতার সহিত অযৌক্তিক ভাবে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাই তাহার পক্ষে স্বর্গচ্যুতির আশঙ্কা ও বেদনা পাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু অপর্ণার হয়ত নয়। এত বুঝিয়াও, এত ভাবিয়াও অমল নিজেকে অপর্ণার দুর্নিবার আকর্ষণ-মুক্ত করিতে পারে না, অক্টোপাশের বাহুর মত অপর্ণা তাহাকে যেন নির্ম্মম অনিবার্য্য ভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছে—আকর্ষণে তাহাকে ক্রমাগতই সমুদ্রের তলদেশে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সে প্রাণপণ চেষ্টায়ও নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না; অসহায়, একান্ত নিরুপায় হইয়া অনির্দ্দিষ্ট অদৃশ্য সাহায্যের জন্ত নিমজ্জমান লোকের মত বার বার বাহু প্রসারিত করিতেছে—

মেসে ফিরিয়া অমল বাড়ীর পত্র পাইল—মা লিখিয়াছেন ব-কলমে। মা লিখিতে জানেন না কিন্তু পড়িতে পারেন, কাজেই পাড়ার বৌ ঝি ধরিয়া কোন সময়ে হয়ত পত্র লিখিয়া লন। এতদিন আঁকাবাঁকা অক্ষরে যত পত্র আসিয়াছে তাহার চেহারা অমলের পরিচিত, কিন্তু আজকার পত্রখানির লেখা নতুন ছাঁদের। লেখা মেয়েলী, আঁকা বাঁকাও বটে কিন্তু তাহার মধ্যে বেশ একটা শ্রী আছে এবং বানান ভুল নাই—লেখাটা তাহার একেবারেই অপরিচিত। লেখা যাহাই হোক্, পত্রের সংবাদটী শুভ নয়—মা'য়ের আজ কয়েকদিন জ্বর, কিন্তু আজ অর্থাৎ পত্র লিখিবার দিন ভালই আছেন এবং পরিশেষে চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অমল মাতৃআজ্ঞা পালন করিতে পারিল না, বিশেষ রকম চিন্তাই করিতে হইল। বাড়ীতে থাকেন মা একা, বার্দ্ধক্য ও দীর্ঘ বৈধব্যে শরীর জীর্ণ—রোগশয্যায় কে তাহাকে জল দিতেছে, পথ্য দিতেছে—কে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেছে! পাড়ার লোক যদি দয়া করিয়া তৃষ্ণায় জল দিয়া থাকে তবে পাইয়াছেন নইলে নয়। পল্লীগ্রামেও পরোপকারের মহৎ প্রবৃত্তি দুষ্প্রাপ্য। অমল ভাবিয়া দেখিল একবার যাওয়া প্রয়োজন—

কিন্তু হাতে একটি পয়সা নাই, মাহিনা পাইতে এখনও দুইদিন—অবশ্য ১লা পাইলে কালই যাওয়া যাইতে পারে। করিবার কিছুই নাই—মাহিনার জন্তে অপেক্ষা করিতেই হইবে।

অমল ছাত্রবাড়ীতে যাইয়া ছাত্রকে কাজ দিয়া আনমনে ভাবিয়া যাইতেছিল, মায়ের অসহায় অবস্থার কথা—তাহাদের বাড়ীর জীর্ণ দালানের সেই স্বল্পান্ধকার ঘরে মা থাকেন, অযত্নে দালানের গায়ে পাকুড়গাছ জন্মাইয়াছে। তাহাদের উঠান দিয়াই পাড়ার বধূগণ ঘাটে যান, হয়ত যাওয়া আসার পথে মায়ের কুশল প্রশ্ন করিয়া সময় থাকিলে এক ঘটি তৃষ্ণায় জল আনিয়া দেন। এই পর্য্যন্ত—হাতে যদি অর্থ না থাকে তবে ঔষধ হয়ত এক কৌটাও জোটে নাই, জুটিলেও হাতুড়ে বৈছের ঔষধ কাজে লাগে নাই—

কাহার কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া অমল ফিরিয়া চাহিল। বর্ত্তমানের মাঝে মনটাকে টানিয়া দেখে—রমলা দরজার কবাট ধরিয়া কি যেন বলিতেছে—কি বলিয়াছে সে তাহা বুঝিল না! সে একটু উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—কি ব'ল্লেন ?

—আপনার কি হ'য়েছে ? বড় বিমনা মনে হচ্ছে—

সংক্ষেপে অমল বলিল—হ্যাঁ মনটা ভাল নাই।

রমলা কাছে আসিয়া ছাত্রের পাশের চেয়ারে বসিয়া বলিল,—কি হ'য়েছে, কোন দুঃসংবাদ পেয়েছেন ?

—হ্যাঁ, আজ চিঠি পেলাম মায়ের অসুখ।

—মায়ের অসুখ ? তা চ'লে গেলে ত পারতেন! আবার পড়াতে এসেছেন কেন ?

প্রকৃতিস্থ থাকিলে অমল হয়ত স্বীকার করিত না, কিন্তু হঠাৎ চিন্তা না করিয়াই সে বলিল,—যাবো ত' কিন্তু এটা মাসের শেষ—

রমলা বলিল—কেন, আপনি একটু খবর দিলেই পারতেন, বাবার কাছ থেকে আপনার মাইনে চেয়ে রাখতুম। কাল সকালে রেখে দেব, আপনি এলেই পাবেন।

—সকাল নয়, রাত্রে পেলেই চলবে। আমি রাতের গাড়ীতেই যাবো।

অমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—এই স্পর্দ্ধিতা মেয়েটির নির্লজ্জ আত্মাভিমানের অন্তরালে কেমন করিয়া কোথায় এই সহানুভূতি লুকাইয়া দিল! সে তাহার দারিদ্র্যের প্রতি একটা নির্ম্মম শ্লেষই প্রত্যাশা করিয়াছিল কিন্তু আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে সমবেদনা পাইয়া সে রমলার মুখের পানে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল।

রমলা পুনরায় প্রশ্ন করিল,—বাড়ীতে আর কে আছেন।

—আর কেউ নেই। প্রতিবেশীরা আছেন ?

—আপনাদের দেশ কোথা ?

—যশোর জেলায় কোন গণ্ডগ্রামে, ম্যাপে সে নাম পাওয়া সম্ভব নয়।

রমলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—বাড়ীতে যখন আর কেউ নেই তখন ত যাওয়াই দরকার—এ রকম অবস্থায় আপনার বিয়ে করা উচিত ছিল।

অমল হাসিল। একটা জবাব দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রমলা পুনরায় বলিল,—জানি ব'ল্বেন টাকা নেই, চাকুরী নেই ইত্যাদি, আপনাদের কথা শুনলে রাগ হয়, যেন মেয়েরা খেয়েই তাদের ফতুর ক'রে দিলে—

অমল জবাব দিল,—তা নয়, খেয়ে তারা ফতুর করে না, তবে তাদের আমাদের মনের মত ক'রে রাখতে পারি না বলেই কষ্ট হয়, ভাবি দারিদ্র্যের মাঝে টেনে দুঃখ দেওয়ার চেয়ে না আনাই ভাল—

রমলা বলিল,—মেয়েরা কি কষ্ট করতে জানে না। তাদের কি ইচ্ছে করে না স্বামীকে সেবা ক'রে সুখী ক'রতে, তারাও কি চায় না স্বামী সুখী হোক্—

অমল আরও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল—রমলার মুখে এমন কথা সে প্রত্যাশা করে নাই। তাহার সমস্ত মুখোস যেন সহসা খুলিয়া পড়িয়াছে! কিন্তু কেন? অমল বিস্মিত, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল।

রমলা চোখ দুইটিকে দূরে অন্ধকার গলির মাঝে ন্যস্ত করিয়া বলিল—কি দেখ্‌ছেন।

অমল বলিল,—আপনার মুখে এ কথা প্রত্যাশা করি নি!

— কেন?

—যার মধ্যে ইয়েটস্, কিপলিংএর ভাবধারা বিচরণ ক'রছে তার মাঝে ক্ষুদ্র গৃহ, গৃহস্থালীর কথা, তার তুচ্ছতম সুখ দুঃখের কথা কি বেমানান বলে মনে হয় না! আপনার অন্তর হবে গগনবিহারী, তা কেন পৃথিবীর বাস্তবতায় নেমে আস্‌বে!

রমলা অকারণে ক্ষণিক হাসিয়া লইয়া বলিল—মানুষ মানুষই, তারা ব্যোমযান নয়। খোকার উদ্দেশ্যে সে বলিল,—যা আজকে উনি পড়াতে পারবেন না, ওর মন যে রকম তাতে ও হবে না।

খোকা ছুটি পাইয়া মহোল্লাসে হৃষ্টচিত্তে পুঁথিপত্র গোছাইয়া রওনা দিল।

রমলা ক্ষণিক্ক পরে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা অমলবাবু, একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন—সত্যি কথা বলতে হবে—

—নিশ্চয়ই ব'ল্‌বো। সত্যভাষণের সংসাহস আমার আছে —

অমলা অত্যন্ত অকস্মাৎ এবং বিনা আড়ম্বরে বিনা দ্বিধায় প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা আপনি কি রকম মেয়ে বিয়ে ক'রবেন? বাজে কথা বাদ দিয়ে ব'লবেন, এখনও ভাবিনি,ভেবে ব'লবো, ওসব কথা চলবে না—

অমল বলিল,—এ সব বিষয়ে আমার চিন্তা করা আছে। আমি বিয়ে করবো একটা গেঁয়োমেয়েকে. যে ঠিকানা লিখ্‌লে পত্র যথা স্থানে পৌঁছবে না। সাত চড়ে কথা কইবে না, যথেচ্ছ অত্যাচার করা চলবে অথচ প্রতিবাদ শুন্‌তে হবে না, এমনি একটা মেয়েকে—

রমলা হাসিয়া বলিল,—সত্যি কথা আপনি বলেন কি নিশ্চয়ই।

—যথার্থই সত্য কথা বলেছি। মিথ্যা বলার কোন হেতু নেই।

রমলা প্রতিবাদ করিল—হেতু অবশ্যই আছে।

—কি?

—যেহেতু আমি শিক্ষিত, শিক্ষিত না হলেও শিক্ষাভিমানী, সেই হেতুই এই কথাটা বলেছেন, সম্ভবতঃ আমার গর্ব্ব বা স্পর্দ্ধাকে আঘাত ক'রবার উদ্দেশ্যেই—

অমল আরও আশ্চর্য্য হইল—রমলার কথার মধ্যে এতখানি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বুদ্ধির পরিচয় সে কোন দিনই পায় নাই। যে রমলা অত্যন্ত নগ্নভাবে নিজের অন্তরের দৈন্য ও অক্ষমতাকে কথার ফাঁকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, সে আজকে এমনিভাবে সরলভাবে নিজেকে প্রকাশ করিবে তাহা সে আশা করে নাই। অমল বলিল,—আপনাকে আঘাত ক'রে আমার লাভ? আপনার গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধা থাকতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, কাজেই তাকেও আঘাত করা আমার এক্তারের বাইরে—

—তবে কেন? শিক্ষিত মেয়েদের উপর আপনার রাগ কেন?

—রাগ নেই, যথেষ্ট প্রলোভন আছে, আপনাদের মত মেয়েদের সঙ্গে আমার এই স্বল্প পরিচয়কে আমি যথেষ্ট গৌরবের বলে মনে করি; কিন্তু মোটর থাকা ভাল জানি তাই বলি মোটর কিনবার সখ থাকা আমাদের উচিত নয়। আর যাই হোক, আমি যে আপনাদের বাড়ীতে চাকুরী ক'রেই জীবিকা অর্জ্জন করি একথা আমি কখনও ভুলি না, কাজেই অতখানি আশা পোষণ করা সম্ভব নয়। যাদের আমরা কেবল ফুলের মত দেখ্‌তে চাই তাদের ধুলায় ফেল্‌তে স্বভাবতঃই মায়া করে—এ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিয়া অমল নেহাত অপ্রস্তুতের মতই থামিয়া গেল।

রমলা কি যেন ক্ষণিক চিন্তা করিয়া বলিল,—এই মাত্র! আর কারণ নেই?

—আর একটা কারণ এই যে, তারা দুঃখের সঙ্গে দারিদ্র্যের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত, কাজেই—আমার দারিদ্র্যকে ভয় করে তারা আমার প্রতি অপ্রসন্ন হবে না, আমার অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ ক'রবে না।

—শিক্ষিত মেয়েরা ও আপনার কাঁধে কেবল ভারই না হ'য়ে সংসারের সাহায্যও ত ক'রতে পারে।

—পারে না। কারণ আজকার জগতে তাদের মেয়েরাই শিক্ষিত; যাদের ছেলেদের পড়িয়েও মেয়েদের পড়াবার ক্ষমতা থাকে—এক কথায় যারা বড়লোক তাদের মেয়েরাই শিক্ষিত সুতরাং আমাদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ আকাশ পাতাল—

রমলা বলিল,—যাক্ কিছু মনে ক'রবেন না। আপনাকে এ সব প্রশ্ন করলুম কেন জানেন? লিখবার সময় মাঝে মাঝে মনস্তত্ত্বের দিকে নজর যায়, তাই আপনাদের মনের খবর না জান্‌লে

লেখা সম্ভব নয়! আপনাদের মনকে study করা একান্তই দরকার হ'য়ে পড়ে।

অমল বলিল—যা হোক্, আপনার লেখার যদি সহায়তা ক'রতে পারি তবে আনন্দিত হব; কিন্তু আমার যতদূর ধারণা নিজের মনটাকে ভাল ক'রে দেখলেই পরের মনকে বোঝা যায়—সে পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক।

অবান্তর আরও কিছু আলোচনার পরে অমল চলিয়া আসিল। রমলাকে সে নূতন করিয়া দেখিয়াছে, তাহার নূতন পরিচয় পাইয়াছে—তাহার আভিজাত্য অহঙ্কারের অন্তরালে যে মন আছে তাহা ত আর সকলেরই মত, বৃথা মুখোসে সে কেবল নিজেকে প্রতারিত করে। যাহার সহিত নিষ্ঠুর অভিনয় করিয়া সে সংগোপনে হাসিত ও খেলার আমোদ পাইত আজ তাহার জন্যই সে সমবেদনা বোধ করিতে লাগিল। সভ্যতার মোহ-ভারাক্রান্ত অন্তর তাহার সত্যই মুমূর্ষু! তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া লাভ নাই, উদ্ধার করা প্রয়োজন।

পরদিন সকাল হইতে সমস্ত চিন্তা তাহার মন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল কেবল একটিমাত্র চিন্তা শ্রাবণের মেঘের মত সমস্ত অন্তরাকাশ ছাইয়া দিল। অসুখ গুরুতর না হইলে মা কখনও তাহাকে অসুস্থ সংবাদ দেন নাই, কারণ তাঁহার স্বভাব সে জানে। সাধারণ জ্বর-জারিকে তিনি অসুখ বা শয্যাগ্রহণের মত অবস্থা বলিয়াই স্বীকার করেন না। বৃথা একটি দিন দেরী করিয়া সে হয়ত শেষ দেখাও করিতে পারিবে না—রমলা সকালেই টাকা দিতে চাহিয়াছিল, আনিলেই হইত। বৃথা আভিজাত্যের অভিমান লইয়া বসিয়া থাকিয়া সে হয়ত' জীবনের মহার্ঘতম সুযোগকে হারাইবে।

যদি মা আর নাই উঠেন, তবে ত এ জগতে তাহার আর কোন আকর্ষণই থাকিবে না—এই পরিশ্রম, এই জীবনসংগ্রাম, এ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যদি বৈধব্যক্লিষ্ট, দারিদ্র্য লাঞ্ছিত মা'কে সে জীবনে কয়েক দিনের জন্যও খুসী না করিতে পারে, তবে বৃথা বিদ্যার্জনের সমারোহ ও অর্থের আড়ম্বরে তাহার কি প্রয়োজন!

কলেজের গৃহে বসিয়া এই কথাই সে ভাবিয়া যাইতেছিল—শঙ্কা ও ব্যর্থতাকে উত্তেজিত করিয়া দুঃসংবাদকে মনের ব্যাকুলতা দিয়া ফেনাইয়া চরম দুঃখের সৃষ্টি করিয়া মনে মনে সে কাল্পনিক দুর্ভাগ্যকে বিশ্বাস করিয়া ফেলিতেছিল। কি পীড়া হইয়াছে কিছুই সে শোনে নাই, মাঝে মাঝে কেবল সজল চোখদু'টিকে পরিষ্কার করিতে বাহিরের পানে চাহিয়াছিল—

বাহির হইবার পথে অপর্ণা তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনার কি হ'য়েছে? আজ এত চুপচাপ কেন?

অমল বলিল,—না এমন কিছু নয়।

অপর্ণা ব্যাকুলতার সহিত প্রশ্ন করিল,—কি হ'য়েছে বলুন না।

—আমার মা'য়ের খুব অসুখ সংবাদ পেয়েছি, আজই দেশে যাবো—

অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—কি অসুখ—আজই যাবেন?

—হ্যাঁ,—আপনার মায়ের আদেশ কবে পালন ক'রতে পারবো জানি না।

—সে পরে হবে—কখন যাচ্ছেন? গাড়ী কখন? আপনাদের দেশ কোথায়?

—অমল ধারাবাহিক প্রশ্নগুলির ক্রমিক উত্তর দিয়া চুপ করিল। অপর্ণা পুনরায় বলিল—বাড়ীতে কে কে আছেন?

—মা একা।

—তবে, জমিদারী থেকে আপনার পড়ার খরচা সব পাঠান কে?

অমল হাসিয়া বলিল,—চ'লে যায়। মা একা বলেই যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

—নিশ্চয়ই, দেরী করা মোটেই সঙ্গত নয়। আর মাকে ওখানেই বা রাখেন কেন, এখানে এনে কাছে রাখলে উভয়েরই দুর্ভাবনা যেতো।

অমল সংক্ষেপে জবাব দিল,—হুঁ।

অপর্ণা ব্যস্ততার সঙ্গে বলিল,—যাক্, এসব আলোচনার সময় এ নয় কিন্তু আপনার মা কেমন থাকেন তা আমাকে একটু জানাবেন—আমিও হয়ত ভাববো—

অমল আনন্দোজ্জ্বল চোখ দুইটির কৃতজ্ঞতা-করুণ দৃষ্টি অপর্ণার মুখের উপর নির্ভয়ে ন্যস্ত করিয়া বলিল,—আপনি অনুমতি ক'রলে অবশ্যই জানাবো, আর আমার দুঃখে যে সহানুভূতির প্রমাণ পেলাম আপনার কাছ থেকে—তার জন্যে মনে মনে গর্ব্ব বোধ করছি। আপনার উদারতাকে প্রশংসা করি।

অপর্ণা কৃত্রিম তিরস্কারের সুরে বলিল,—এখন উদারতা হিসাব করার সময় আপনার না থাকাই উচিত ছিল। যান তাড়াতাড়ি ফল-টল কিনে তৈরী হ'য়ে নিন্—

অপর্ণা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল—

অমল ক্লান্ত পদক্ষেপে চলিতে চলিতে ভাবিল,—তার দীনা দুঃখিনী মাতার জন্যে আজ অপর্ণা যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে তাহা সে না করিলেও ক্ষতি ছিল না, অশোভনও হইত না। তবুও এই আভিজাত্য, ওই শিক্ষার অভিমানের মাঝে তাহার জন্য, তাহার মাতার জন্যে যে সহৃদয়তা সে দেখাইয়া গেল তাহা তাহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও উদারতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

অমল মনে মনে বিশ্বাস করিল,—তাহার প্রতি অপর্ণার

নিশ্চয়ই একটু আকর্ষণ আছে, তাহা না হইলে এই সমবেদনা স্বাভাবিক নয়—সে যে আজ বিমনা একথা ত আর কেহ লক্ষ্য করে নাই কিন্তু অপর্ণা তাহা লক্ষ্য করিয়াছে—

……যদি কোনদিন এমন হয় যে অপর্ণা তাহার মায়েরই সেবায় নিযুক্ত হইল। তবে সেইদিন তাহার মাতাকে এমনি আগ্রহে, এমনি যত্নে সে সেবা করিতে পারিবে—এমনি করিয়া তাহার কুশল সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইবে। আজ যেমন তাহার জন্যই তাহার মাতার প্রতি এই আগ্রহ—একদিন সে ঈশ্বরের তাহার মাকেই মা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে।

অমল আনন্দিত হইল—অপর্ণা সত্যই সুন্দর! তাহাকে না পাইলে দুঃখের কিছু নাই কিন্তু এই সৌন্দর্য্যকে ভাল না বাসিয়া পারা যায় না। অন্তরের এই উদারতা, এই সমবেদনার আকর্ষণ-শক্তি অনিবার্য্য—অমল তাই আজ একান্তই অসহায়।

ক্রমশঃ

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

তৃতীয় প্রকরণ—ইন্দ্রিয়-জয়

সপ্তম অধ্যায়—রাজর্ষি-বৃত্ত

মূল :—সেই হেতু অরিষড়্বর্গ ত্যাগ দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিবে। বৃদ্ধসংযোগ-দ্বারা প্রজ্ঞা, চার-দ্বারা চক্ষুঃ, উত্থান দ্বারা যোগক্ষেম সাধন, কার্য্যানুশাসন দ্বারা স্বধর্ম্মস্থাপন, বিদ্যার উপদেশ দ্বারা বিনয়, অর্থসংযোগ দ্বারা লোকপ্রিয়ত্ব ও হিত দ্বারা বৃত্তি (করিবে)।

সঙ্কেত :—সেই হেতু—যেহেতু অরিষড়্বর্গ-ত্যাগ শ্রেয়ঃ-সাধন, অতএব—। বৃদ্ধসংযোগ-দ্বারা প্রজ্ঞা—করিবে (কুর্ব্বীত)—এইরূপ অন্বয় সর্ব্বত্র হইবে। করিবে—উৎপাদন করিবে, অর্জ্জন করিবে, বর্দ্ধন করিবে, বিকশিত করিবে—ইত্যাদি রূপ অর্থ। চার-দ্বারা চক্ষুঃ করিবে—চরকে চক্ষুঃ-স্থানীয় করিবে। রাজগণ চারচক্ষুঃ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের ব্যাপারসমূহ প্রত্যক্ষ-করণার্থ রাজা চারচক্ষুঃ হইবেন (গঃ শাঃ)। উত্থানেন—উদ্যোগ-অনুষ্ঠান-দ্বারা; **by ever being active (SH)**। কার্য্যানুশাসন—ইহা এইভাবে কর্ত্তব্য ইত্যাদি আদেশ-দ্বারা স্বধর্ম্মে লোককে নিয়ন্ত্রিত করিবে ; **by exercising authority (SH) ; by issuing orders for the performance of duties**—বলা ভাল। স্বধর্ম্ম-স্থাপন—স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থাপন—**restriction in (their) respective duties**, অর্থসংযোগ—উপযুক্ত পাত্রে ধন অর্পণ—ইহা-দ্বারা জনপ্রিয় হওয়া যায়। **Endear himself to the people by bringing them in contact with (SH) ; popularity by means of contact with wealth**—বলা চলে। হিতেন বৃত্তিং (কুর্য্যাৎ)—যাহা বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে উপকার-জনক, তদ্দ্বারা লোকযাত্রা করিবেন। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ মূলানুগ নহে—"**and doing good to them**" (SH)। **Subsistence by means of what is good**—বলা উচিত।

মূল :—এইভাবে বশীকৃতেন্দ্রিয় হইয়া পরস্ত্রী, পরদ্রব্য ও পর-হিংসা বর্জ্জন করিবে। স্বপ্নচাপল্য-অনৃত উদ্ধতবেশ অনর্থসংযোগও (পরিহার করিবে)। আর অধর্ম্ম সংযুক্ত ও অনর্থ সংযুক্ত ব্যবহারও (ত্যাগ করিবে)।

সঙ্কেত :—স্বপ্নলৌল্য—স্বপ্নে চাপল্য ; **lustfulness even in dream (SH, Jolly)** ; গণপতি শাস্ত্রীর পাঠ—স্বপ্নং লৌল্যং—**drowsiness and voluptuousness (Jolly)**. স্বপ্ন—অযথোচিত নিদ্রা, দিবা-নিদ্রা ইত্যাদি ; লৌল্য—চাপল্য। অনৃত—মিথ্যাবদন। উদ্ধত-বেশত্ব—অবিনীত-বেশতা (গঃ শাঃ) ; শ্যামশাস্ত্রী 'বেশ' অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়াছেন—**haughtiness.** অনর্থসংযোগ—পূর্ব্বোক্ত অর্থ-সংযোগের বিপরীত—অপাত্রে ধন দান, **evil proclivities (SH)**। অধর্ম্মসংযুক্ত অনর্থসংযুক্ত ব্যবহার—**unrighteous and uneconomical transactions (SH)**।

মূল :—ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে কামের সেবা করিবে—সুখ-বিহীন হইবে না। অথবা—পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত ত্রিবর্গের সমভাবে সেবা করিবে। যেহেতু ধর্ম্ম-অর্থ-কামের একটি অত্যন্ত সেবিত হইলে নিজেকে ও অপর দুইটিকে পীড়িত করিয়া থাকে।

সঙ্কেত :—ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে—যাহাতে ধর্ম্ম ও অর্থের কোন বাধা উপস্থিত না হয়—এভাবে কামের সেবা করিবে—একেবারে কাম বর্জ্জন করিয়া সুখভোগে সম্পূর্ণ উদাসীন হইবে না—ইহাই অভিপ্রায়। অন্যোন্যানুবন্ধং (মূল)—ত্রিবর্গের (ধর্ম্ম-অর্থ-কামের) প্রত্যেকটি অপর দুইটির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। মনুও বলিয়াছেন—"ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ" (২।২২৪)। ত্রিবর্গের সমভাবে সেবা না করার দোষ কি?—ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—ত্রিবর্গের মধ্যে কোন একটির উপর পক্ষপাত-পূর্ব্বক অধিক সেবা করিলে সেই অতিরিক্ত সেবিত বিষয়টিরও পীড়া হয়—আর অপর দুইটি অল্প সেবিত বিষয়ের পীড়া ত হইয়াই থাকে। অতিরিক্ত ধর্ম্মসেবায় অর্থ-কাম (ও সেই সঙ্গে ধর্ম্মও), অতিরিক্ত অর্থসেবায় ধর্ম্ম-কাম (ও সেই সঙ্গে অর্থও), অতিরিক্ত কামসেবায় ধর্ম্ম-অর্থ (ও সেই সঙ্গে

কামও) পীড়াপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই বলা হয়—"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা—যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ"।

মূল :—অর্থই প্রধান—ইহা কৌটিল্য (বলেন)—যেহেতু অর্থ-মূলক ধর্ম্ম ও কাম।

সঙ্কেত :—অথবা সমভাবে ত্রিবর্গের সেবা করিবে—এইমত প্রায় সর্ব্বজনমান্য হইলেও কৌটিল্য ইহার পূর্ণসমর্থক নহেন। তাঁহার মতে—ত্রিবর্গের মধ্যগত অর্থেরই প্রাধান্য—ধর্ম্ম ও কামের অপেক্ষাকৃত অপ্রাধান্য। অর্থমূলক—অর্থসাধ্য (গঃ শাঃ); অর্থ থাকিলে তবে ত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কামপূরণ করা চলে—অর্থ না থাকিলে উহা অসম্ভব। শ্যামশাস্ত্রী ধর্ম্ম বলিতে বুঝিয়াছেন—charity—ইহা ঠিক নহে—religious deeds বলা উচিত। **Charity and desire depend upon wealth for their realisation (SH)**। Jolly বলেন—"The prominence given to অর্থ agrees with the standpoint of an Arthashastra of : Yachodhara's remark, Kamasutra p.1—" "তত্র ব্রাহ্মণাদীনাং গৃহস্থানাং মোক্ষস্থানভিমতত্বাৎ ত্রিবর্গঃ পুরুষার্থঃ। তত্রাপি ধর্ম্মার্থয়োর্হেতুত্বাৎ কাম এব ফলভূতঃ প্রকৃষ্টঃ পুরুষার্থ ইতি কামবাদিনঃ"। এরূপ পক্ষপাত-বিশিষ্ট মতসমূহ অপেক্ষা ভগবান্ মনুর অপক্ষপাতী সিদ্ধান্তই এ প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত বলিয়া শ্রেষ্ঠ—

"ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ" ॥

—মনু (২।২২৪)

মূল :—আচার্য্যগণকে অথবা অমাত্যগণকে মর্য্যাদা (রূপে) স্থাপন করিবেন—যাঁহারা ইঁহাকে অনর্থ কারণ হইতে নিবারিত করিতে পারিবেন, অথবা নির্জ্জনে প্রমাদকারী ইঁহাকে ছায়া-নাড়িকা-রূপ প্রতোদের দ্বারা তাড়িত করিতে পারিবেন।

সঙ্কেত :—মর্য্যাদা—সীমা। আচার্য্য ও অমাত্যগণকে সীমারূপে কল্পনা করিবেন। সীমা যেরূপ অলঙ্ঘনীয়, সেইরূপ গুরু ও মন্ত্রীকে অলঙ্ঘনীয় মনে করিবেন। কে?—রাজা। গুরুবাক্য ও মন্ত্রীর হিতোপদেশ যিনি অবহেলাক্রমে লঙ্ঘন করেন না—তিনিই রাজর্ষি-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। এই আচার্য্য ও অমাত্যগণ কিরূপ হইবেন, তাহাও বলা যাইতেছে—যাঁহাদিগের এই রাজাকে অনর্থ-কারণ হইতে নিবারিত করিবার যোগ্যতা আছে। অপায়স্থানেভ্যঃ (মূল)—অনর্থ-কারণানুষ্ঠান হইতে (গঃ শাঃ); **keep him from falling a prey to dangers (SH)**। অপায় হইতেছে উপায়ের ঠিক বিপরীত। উপায়—সাধন, means; অপায়-ধ্বংসের হেতু; **who should check him from the zones of disaster (causes of danger)** বলা উচিত। মর্য্যাদারূপে আচার্য্য ও অমাত্যগণকে স্থাপন করিতে হইবে—এ অংশটির ইংরাজি শ্যামশাস্ত্রী যথাযথভাবে দেন নাই। বলিয়াছেন—**'shall in variably be respected'**. ছায়া-নাড়িকা-প্রতোদ—ছায়া-নাড়িকার বিশদ বিবরণ প্রথম অধিকরণের উনবিংশ অধ্যায়ে (রাজ-প্রণিধি-প্রকরণে) দ্রষ্টব্য। সকালে বা বৈকালে কয়টা বাজিয়াছে, তাহা ছায়া-দর্শনে স্থিরীকৃত হইত। ত্রিপুরুষ-প্রমাণ, একপুরুষ-প্রমাণ, চারি-অঙ্গুলি পরিমাণ ছায়া ও ছায়াবিহীনতা দর্শনে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সময়ের চারিটি ভাগ করা হইত। আবার মধ্যাহ্নের পর হইতেও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময় উহার বিপরীত ক্রমে (ছায়াশূন্যতা, চারি অঙ্গুলি, একপুরুষ ও তিনপুরুষ পরিমাণ ছায়াদর্শনে) চারিভাগে বিভক্ত করা হইত। ছায়ার পরিমাণ দেখিয়া সূর্য্যোদয়ের পর কয়ঘণ্টা বা মধ্যাহ্নের পর কয়-ঘণ্টা অতীত হইয়াছে—তাহা বেশ বুঝা যাইত। ছায়া-নাড়িকা—ছায়া-দ্বারা সূচিতা নাড়িকা। নাড়িকা—ঘটিকা—যাহাকে 'দণ্ড' (২৪ মিনিট) বলা হয়। ৬০ নাড়িকায় এক অহোরাত্র। প্রতোদ—চাবুক। ছায়া-নাড়িকা-প্রতোদ—ছায়ানাড়িকা-রূপ প্রতোদ। ছায়ানাড়িকার সাহায্যে আচার্য্য-অমাত্যবর্গ পুনঃ পুনঃ সূচিত করিবেন যে, রাজা কার্য্যান্তরে কালাতিপাত করিতেছেন—এক্ষণে তাঁহার অন্য যথাকালোচিত কার্য্যে মনোনিবেশ কর্ত্তব্য। পুনঃ পুনঃ এইরূপ সূচনা পাইলে রাজা যে কর্ম্মে তখন আসক্ত থাকিবেন সেই প্রিয় কার্য্যে বাধা জন্মিবে ও তাহার ফলে তাঁহার মনঃকষ্ট উপস্থিত হইবে। প্রতোদ যেরূপ শরীরে আঘাত প্রদান করিয়া বিপথগামীকে নির্দ্দিষ্ট পথে আনয়ন করে, ছায়া-নাড়িকা-সূচনা-দ্বারা সেইরূপ প্রমাদী রাজাকে তাঁহার প্রিয় ব্যসনাদি কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া ও তাহার ফলে তাঁহার মনঃকষ্টের উদ্রেক করিয়া আলোচিত রাজকার্য্যে নিয়োজিত করা যায়। এই কারণে ছায়া-নাড়িকাকে প্রতোদ-তুল্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গণপতি শাস্ত্রীও সংক্ষেপে অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—**by striking the hours of the day as determined by measuring shadows warn, him of his careless proceedings even in secret.**" ইহাতে অর্থব্যাখ্যা থাকিলেও মূলানুগ অনুবাদ হয় নাই। **should whip him, going astray, in private, by means of the whip-like hour measuring shadows**—বলা চলিতে পারে। অভিতুদেয়ুঃ আঘাত করিবেন, ব্যথা দিতে পারিবেন—প্রমাদী রাজার প্রমাদ ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে (গঃ শাঃ); **warn him (SH) ; strike him**—বলা উচিত।

মূল :—রাজত্ব সহায়সাধ্য। এক (মাত্র) চক্র বর্ত্তমান নাই। সেই হেতু সচিবগণকে (নিয়োজিত) করিবেন ও তাঁহাদিগের মত শ্রবণ করিবেন।

সঙ্কেত :—রাজত্ব—রাজভাব; **sovereignty (SH)**। প্রশ্ন উঠিতে পারে,—রাজাই ত সচিবসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা—অতএব প্রভু। তবে কেন তিনি স্বয়ং প্রভু হইয়াও স্বেচ্ছায় আপনাকে সচিবগণের অধীন করিয়া রাখিবেন? তাহারই উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ-ভাব সহায়সাধ্য—সহায় ব্যতীত রাজা রাজা থাকিতেই পারেন না। তিনি কিছুতেই একাকী রাজকার্য্য-সমূহ নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত :—একটিমাত্র চক্র-দ্বারা শকট বা রথ ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। শকটে যুক্ত একমাত্র চক্র চক্রান্তর রূপ সহায় ব্যতীত থাকিতে বা চলিতে পারে না। অতএব, সচিব-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। সচিব—আচার্য্য ও অমাত্য। নিযুক্ত করিবেন কে?—রাজা। স্বয়ং তাঁহাদিগের নিয়োগকারী হইলেও তাঁহাদিগের মত শ্রবণ করিতে রাজা বাধ্য—কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—একাকী রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ অসম্ভব।

ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে ইন্দ্রিয়-জয়-নামক তৃতীয় প্রকরণে রাজর্ষি-বৃত্ত-নামক সপ্তম অধ্যায় ॥

ক্যাসমেমোর কাণ্ড

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারি

সেদিন স্ত্রীর সহিত তুমুল কলহ হইয়া গেল। কারণটা তুচ্ছ, কিন্তু কাণ্ডটা ঘটিল চায়ের পেয়ালায় তুফানের মত।

আমার জামার পকেটে পাঁচ টাকা আট আনা দামের ব্লাউসের একটা ক্যাসমেমো পাওয়া গেল। ক্যাসমেমোর সঙ্গে ব্লাউজটা পাওয়া গেলে কোন অনর্থই অবশ্য হইত না। গৃহিণী সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ব্লাউজটা আবিষ্কার করিতে পারিল না। আমিও বিস্মিত কম হই নাই কারণ সে ব্লাউজ আমি কিনি নাই, তাহার ক্যাসমেমো আমার পকেটে আসিল কেমন করিয়া ; অথচ এমন একটা হাস্যকর কৈফিয়তে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশী বলিয়া অগত্যা চুপ করিয়াই থাকিতে হইল। এমন একটা সন্দেহজনক ব্যাপার বাংলা দেশের কোন সতী স্ত্রীই সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং সেদিন বিকাল বেলা গৃহিণী সপুত্র পিত্রালয়ে যাত্রা করিল। বলিতে লজ্জা নাই মনে মনে খুসীই হইলাম—দিনকতক মুক্তির আনন্দে ইচ্ছামত ঘুরিতে পারিব। কিন্তু যাত্রার সময় মদীয় বদনমণ্ডল যথাসম্ভব করুণ করিয়া তুলিলাম—কি করিব উপায় নাই। অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান মাথা পাতিয়াই লইতে হইবে। খোকার জন্য মনটা—থাক্ ভাবিয়া লাভ নাই। মায়ের ছেলে মায়ের সঙ্গেই যাইতেছে তার মামার বাড়ী।

সন্ধ্যার দিকে শূন্য বাড়ীতে একটা তক্তাপোষের উপর চিত হইয়া শুইয়া বিড়ি টানিতে টানিতে ক্যাসমেমোর রহস্যের কথাটাই ভাবিতেছিলাম। ক্যাসমেমোর ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়। যদি মাসটা হইত এপ্রিল আর তারিখটা হইত পয়লা, তাহা হইলে না হয় এই রহস্য সমাধানের একটা ক্লু পাওয়া যাইত। কিন্তু বঙ্গদেশের ঘোরতর বর্ষাকালটাকে কোন মতেই ইংরাজি এপ্রিল মাসের সামিল করা সম্ভব হইল না এবং ডজনখানেক বিড়ি পুড়াইয়াও যখন সমাধানের কোন সূত্রই পাওয়া গেল না তখন উত্তপ্ত মস্তিষ্কে একেবারে রাস্তার বাহির হইয়া পড়িলাম একটা পার্কের উদ্দেশ্যে। মাথাটা একটু শীতল করিয়া লইতে হইবে।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং। মেঘের কোলে সচকিতা দামিনীর ভ্রূকুটী-বিলাস। গুরুগর্জ্জনে আকাশ মাঝে মাঝে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। জলকণা-বাহী শীতল বাতাস চলিতে চলিতে যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বৃষ্টি নামিল বলিয়া। ভজহরির চায়ের দোকানের দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া লইয়া পার্কের দিকেই পা চালাইয়া দিলাম। ভজহরির আবার আজ নগদ, কাল ধার—অথচ পকেটে আমার একটা কানাকড়িও নাই। রাগের মাথায় মালতী অনেক আবশ্যক জিনিষই ভুলে ফেলিয়া গিয়াছে, তবে তার মধ্যে চাবির রিংটা নাই।

সন্ধ্যায় আসন্ন বাদলের মধ্যে পার্কে কাহারো থাকিবার কথা নয় এবং বিশেষ কেহ ছিলও না। এতবড় পার্ক প্রায় খালি—উৎসব শেষে জনহীন পুরীর মত বিষণ্ণ, বিরস।

মনটা দমিয়া গেল। যে স্থান থাকে নিত্য কোলাহলমুখর, তার বুক নির্জ্জনতায় মনে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব আসে। ভাবিলাম চায়ের দোকানেই ফিরিয়া যাই। তার দোকানে অনেকদিনই চা পান করিতেছি, কোন দিনই ফাঁকি দিই নাই। মানুষ ত, চক্ষুলজ্জা একটা আছে। কিন্তু হাতের কাছের বেঞ্চিটায় চক্ষু পড়িতেই দেখি, এক কোণে একজন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক বসিয়া। যাক্ ভালই হইল—একজন সঙ্গী ত বটেই। আমি বেঞ্চিটার আর এক কোণ দখল করিলাম।

ভাবিতে লাগিলাম। ভাবনাটা অবশ্য আজিকার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করিয়া আমার মগজে অনবরত পাক খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্ত্রীর সঙ্গে খুব কম দিন ঘর করিতেছি না এবং নারীজাতিকে যদি ভাল করিয়া চিনিয়াই থাকি তাহা হইলে বলিতে হয়—সংসারে এমন সুঁচ হইয়া ঢুকিতে আর ফাল হইয়া বাহির হইতে ইহাদের জুড়ী নাই—শুধু কি তাহাই ? নিজেদের রঙীণ দেহ-পেয়ালা ভরিয়া মদ খাওয়াইয়া সমস্ত পুরুষজাতটাকেই ইহারা অক্ষম দুর্ব্বল নির্লজ্জ মাতাল করিয়া রাখিয়াছে।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পকেটে একটা বিড়িতে হাত দিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোকটির দিকে আড় চক্ষে চাহিয়া দেখি, তিনি আমার দিকেই চাহিয়া আছেন। লজ্জিত হইয়া আবার বেঞ্চিতেই বসিলাম।

বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। সমগ্র পার্কটায় একবার চক্ষু বুলাইয়া লইলাম। ইতিপূর্ব্বে যে দুই একজন পার্কে ছিলেন তাহারাও বোধ হয় চলিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের ম্লান ছায়ায় পার্কটা যেন অবসন্নের মত স্থির, নিশ্চল। রাস্তার ঘোমটা পরা দূরদূরান্তে স্থিত আলোগুলি অন্ধকারে জোনাকীর মত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। পার্কের দক্ষিণ দিকের লালরংএর বাড়ীর বাতায়নে আলোর রেখা। অকস্মাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া গেল। বাহিরের শীতলতায় অন্তর যেন ক্রমশঃ কেমন সিক্ত হইয়া উঠিতেছে। চিন্তার ধারা বদ্‌লাইয়া গেল। নারীর মনস্তত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ক্যাসমেমোর কীর্ত্তিটা খুবই তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। আর যদি তুচ্ছই হয়, সামান্যই হয় ! তাহা হইলেই বা কি ? সামান্যতম তুচ্ছতম ঘটনা জগতে অনেক প্রলয় কাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তর মানবজীবনে এই প্রলয় কাণ্ডের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কথাটা তা নয়। আজ হউক, কাল হউক, তিন দিন বাদে হউক গৃহিণী আবার গৃহে ফিরিবে। কিন্তু আজিকার এই বাদল রাত্রিটা আর ফিরিবে না।

ক্ষণকাল পূর্ব্বে মালতীর অন্তর্দ্ধানে যতখানি উল্লসিত হইয়াছিলাম মনটা আবার ততখানি বিষণ্ন হইয়া গেল। আবার উঠিয়া দাঁড়াইলাম

এবং পকেটে হাত দিয়া একটা বিড়ি তুলিব তুলিব করিতেছি, দেখি ভদ্রলোক আমার মুখের দিকেই পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। নেশার তৃষ্ণা যথাসম্ভব দমন করিয়া বসিব কি চলিয়া যাইব ঠিক করিতে পারিলাম না।

—ম'শায়ের থাকা হয় কোথায়? ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন; বিরক্ত কণ্ঠেই জবাব দিলাম—চিৎপুর।

—তা হ'লে ত গঙ্গার কাছে—ভদ্রলোক বলিলেন।

বুঝিলাম দড়ি ও কলসী লইয়া গঙ্গায় ডুবিবার ইঙ্গিত ভদ্রলোক দিতেছেন না, তবুও বক্তব্যের অন্তর্নিহিত খোঁচাটুকু সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়াইয়া দিল। একবার রুখিয়া উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ থামিয়া গিয়া একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম—খুবই কাছে।

ভদ্রলোক পকেট হইতে একটা সিগারেট কেস বাহির করিয়া আমার সামনে ধরিয়া বলিলেন—নিন একটা।

নিলাম।

তিনি নিজের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিতে করিতে বলিলেন—তা হ'লেই দেখুন কাছের চাইতে দূরের আকর্ষণ কত বেশী।

সিগারেটে একটা দীর্ঘ দম দিয়া ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিলাম। তিনশ ছাপান্ন নম্বর চিৎপুর হইতে গঙ্গা খুবই কাছে এবং বিলাস ভ্রমণের পক্ষে তুলনা করিলে দেশবন্ধু পার্কের দূরত্বটা একটু বেশীই বলিতে হইবে। তবুও বোধহয় আমার চোখের দৃটিতে এবং মুখাকৃতিতে একটা জিজ্ঞাসার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভদ্রলোক বলিলেন—আমি মানুষের মনের কথাই বলছি। কি অদ্ভুতই না এই মন।

ব্যাপারটা ঠিক ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারিলাম না। নিজেকে ভদ্রলোকের কাছাকাছি একটু ঠেলিয়া দিয়া উত্তর দিলাম—কথাটা এক হিসাবে সত্য। এক হিসাবে মানে? ভদ্রলোকটি যেন চম্‌কাইয়া উঠিলেন। তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—যা সত্য তার সবটাই সত্য। এর মধ্যে মাপজোক করে কোন অংশ বাদ দেবার উপায় নেই। তা না হ'লে কি ম'শাই ব্লাউজের চাইতে ক্যাসমেমো বড় হয়?

ক্যাসমেমো! ব্লাউজ! বলেন কি ভদ্রলোক? স্বপ্ন দেখিতেছি না ত? বিব্রত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

আমার ভাব দেখিয়া ভদ্রলোকটি বোধহয় একটু অপ্রতিভই হইলেন, একটু নড়িয়া বসিয়া বলিলেন—কথাটা বোধহয় বুঝ্‌তে পারেন নি না? দেখুন আজই একটা ব্লাউজ কিনেছি, কিন্তু তার ক্যাসমেমোটা যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।

—তাতে আর হয়েছে কি? সহানুভূতির স্বরে জবাব দিলাম। হয়েছে কি? শুনবেন? হয় ব্লাউজটা কোথাও বিক্রী করতে হবে, নয়ত যেমন করেই হ'ক ক্যাসমেমো একটা যোগাড় করতেই হবে। দামের কথা শুধু মুখে বললে সবাই বিশ্বাস নাও ত করতে পারে।

কেন? সভয়ে প্রশ্ন করিলাম।

—হিসেব ম'শাই, হিসেব। হিসেবের সঙ্গে ভাউচার না থাকে সে হিসেবের মূল্যই বা কি বলুন। এখন যদি ক্যাসমেমোটা না পাই, আমার ধার করে টাকাটা গচা দিতে হবে।

—নিজের স্ত্রীর কাছেও এই ভাবে হিসেব দিতে হবে? পুনরায় প্রশ্ন করিলাম।

—কড়ায় ক্রান্তিতে। একচুল এদিক ওদিক হবার যো নেই।

বলিলাম—তবুও—

কথাটা শেষ করিতে পারিলাম না। আমার নবলব্ধ বন্ধু বাধা দিয়া বলিলেন—এর মধ্যে তবু নেই। যখন স্ত্রী হিসেব নেন, তখন তিনি মনিব। এখানে তার কোন দুর্ব্বলতা নেই।

কিন্তু টাকা ত আপনার। বলিলাম।

তিনি হাসিয়া জবাব দিলেন—মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। অর্থাৎ পয়লা তারিখ আফিস থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত।

ভদ্রলোকটির কথা শুনিয়া আমার করুণা হইল এবং সহমর্ম্মিতায় মনটা গলিয়া গেল। জীবনে অযাচিতভাবে কাহাকেও কোন দিন কিছু সাহায্য করিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না, কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই ক্ষণ পরিচিত দুর্ভাগা বন্ধুর মর্ম্মবেদনা যেন আমাকে অতি মাত্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। যে ক্যাসমেমোটি আজ আমার জীবনে ট্রেজেডির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা দান করিলেই ত ভদ্রলোকের ফাঁড়া কাটিয়া যায়। কথাটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলাম, হয়ত ভদ্রলোক কিছু মনেও করিতে পারেন। অপাঙ্গে একবার চাহিলাম—তিনি আর একপ্রস্থ সিগারেট বাহির করিবার চেষ্টায় আছেন। নিজের পকেট হইতে অভিশপ্ত ক্যাসমেমোটা অতি সন্তর্পণে বাহির করিয়া লইয়া টুক্ করিয়া ভদ্রলোকের পাঞ্জাবীর পকেটে ফেলিয়া দিতেই তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং আমাকে আর একটা সিগারেট দিয়া বলিলেন—নমস্কার। দোকানটা একবার ঘুরেই যাই।

হাত দুইটা কপালে ঠেকাইয়া প্রত্যাভিবাদন করিতে করিতে আমি কতকটা সান্ত্বনার সুরে বলিলাম—তা যান। তবে পকেটটা আর একবার ভাল করে খুঁজে দেখবেন।

নবপরিচিত বন্ধুটি চলিয়া গেলেন। স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই আজিকার এই যোগাযোগটা যেমনি বিস্ময়কর, তেমনি অসম্ভব রকমের অদ্ভুত—অবশ্য কতকটা সিনেমার সস্তা ছবির মত। তা হউক। ট্রুথ ইজ ষ্ট্রেন্‌জার দ্যান ফিক্‌সন। হঠাৎ বেঞ্চির নীচে নজর গেল, খবরের কাগজে মোড়া ছোট্ট একটা বাণ্ডিলের মত কি পড়িয়া আছে। তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি কাগজটাকে ছিঁড়িয়া দেখি—কচি কলাপাতা রংএর একটি সিল্কের ব্লাউস। ভগবান, জানি না আজ সকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম। এত বিস্ময় কি তুমি আমার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলে? কিন্তু এই মাত্র সে লোকটা ক্যাসমেমোর খোঁজে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া গেলেন, হায়রে! তিনি যখন একটি ক্যাসমেমো শেষ পর্য্যন্ত নিজের পকেটেই পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিলেন তখনই জানিবেন ব্লাউজটা আর তাহার কাছে নাই। কল্পনা নেত্রে ভদ্রলোকটির দুঃখ ও দুর্দ্দশার ছবি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

তখন তাহাকে ধরিবার আর কোন উপায়ই ছিল না। প্রত্যাসন্ন বৃষ্টি

মাথায় করিয়া অতি দ্রুত পদে খোকার মামার বাড়ীর দিকে চলিলাম—পার্কের গায়েই লাল রং-এর বাড়ী।

ব্লাউজটা চাকরের মারফৎ উপরে পাঠাইয়া দিতেই ব্লাউজটা হাতে করিয়া গৃহিণী নীচে আসিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—ছি, ছি, তোমার জন্য কি আমি গলায় দড়ি দেব, না বিষ খেয়ে মরব।

নূতন কোন বিপদের আশঙ্কায় আবার ভয় পাইয়া গেলাম। শঙ্কিত চিত্তে কম্পিত বক্ষে তবুও প্রশ্ন করিলাম—ব্যাপার কি?

—আজ রাণুর জন্ম দিন তা তুমি জানো না?

রাণু আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালকের কনিষ্ঠা কন্যা। রাগে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। শ্যালক কন্যার জন্মদিনের খবর আমার রাখিবার কথা নয়। কিন্তু বুঝাইব কাহাকে? যথাসম্ভব কণ্ঠস্বর নরম করিয়া জবাব দিলাম—না।

স্ত্রীর মুখ গহ্বর হইতে অতি মাত্রায় নিষ্পেষিত হইয়া বিক্ষুব্ধ ঠোঁটের ফাঁক দিয়া বাহির হইল—না। কেন, দাদা তোমাকে আফিসে বেরোবার সময় চিঠি দেন নি?

চিঠি? যেন আকাশ হইতে পড়িতেছি। হঠাৎ ধরণীর ধুলায় পা ঠেকিয়া গেল। সত্যইত। সকালবেলা আফিসে যাইবার সময় ভীড় ঠেলিয়া ট্রামে উঠিবার জন্য যখন রীতিমত ঘামিয়া উঠিয়াছি তখন দাদা কাগজের মত কি একটা আমার পকেটস্থ করিয়াছিলেন। হয়ত কিছু বলিয়াও থাকিবেন, গোলমালে শুনিতে পাই নাই।

অন্ধকারে যেন আলো দেখা দিল। ক্যাসমেমো রহস্যের সমাধানসূত্র পাওয়া যাইতেছে। তবু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বলিলাম সেই ক্যাসমেমো ছাড়া আর ত কোন—

স্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—ক্যাসমেমোর উল্টা দিক্‌টা উল্টে দেখেছিলে দাদা কি লিখেছিলেন?

স্বীকার করিলাম দেখি নাই কিন্তু একেবারে হাল ছাড়িলাম না। কর্ত্তব্য বুদ্ধিটাকে সজাগ করিয়া লইয়া এই অকূল সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলাম—দাও ত চাবিটা। চট্ করে একবার ঘুরে আসি।

চাবির আশায় স্ত্রীর দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলাম।

তন্বী শ্যামাঙ্গিনী গৃহিণী কচি কলাপাতা রং-এর ব্লাউসটা আমার নাকের ডগার উপর খুলিয়া ধরিয়া বলিল—তা না হয় দিচ্ছি। কিন্তু জিগ্‌গেস্ করি এটা কুড়িয়ে পেয়েছ না কেউ দয়া করে দান করেছে। এত বড় ব্লাউজ আমার গায়ে হয়, না রংটাই মানায়।

একেবারে বসিয়া পড়িলাম।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

(১) বিদেহীর ছায়ামূর্ত্তি

ধরণীর সুকোমল ক্রোড় হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রে মানব কোনও একদিন—শৈশবে, যৌবনে, অথবা বার্দ্ধক্যের শুচি শুভ্র সজ্জায়—পরপারে যাত্রা করে। ইহলোকে সে রেখে যায় তার স্মৃতি; ওপারে তার সাথী হ'য়ে যাত্রা করে আপনার শুভাশুভ কর্ম্ম আর অপূর্ণ বাসনা-কামনা। সেই সূক্ষ্মলোকে জড় দেহের অস্তিত্ব থাকে না সত্য, থাকে বিদেহীর সর্ব্ব অনুভূতি—সুখ-দুঃখ বোধ, প্রেম ও স্নেহ, অনুরাগ বিরাগ, মানব মনের সকল বৃত্তি, সব বৈশিষ্ট্য। শ্রুতি সুদূর অতীতে প্রচার করেছেন—দেহান্তে মানবের অনুগমন করে শুধু তার প্রাণশক্তি নয়, তার যাবতীয় সংস্কার।১ প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকও আজ এই কথাই স্বীকার করে অসংশয়ে বলেছেন—শিক্ষা ও সংস্কার, স্মৃতি ও কৃষ্টি—এ সকলই দেহত্যাগের পরেও মানবের সাথী হ'য়ে অবস্থিতি করে।২

বিদেহী-জনের স্নেহ-প্রীতি অক্ষুণ্ন থাকে তাই এপার ও ওপারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনা হয়ে যায়। প্রবাসগামী পুত্র যেমন বিদেশে উপস্থিত হ'য়েই, সেথান হ'তে সর্ব্বাগ্রে আপনার কুশল সংবাদ গৃহে আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করে, বিদেহী-মানবও তেমনি পরপারে উত্তীর্ণ হ'য়ে, তন্দ্রাঘোর দূর হ'লেই যখন সে আপনার চৈতন্যময় অস্তিত্বে নিঃসংশয় হয়, তখন উৎফুল্ল আনন্দে তার নব-জাগৃতির বার্ত্তা পরিত্যক্ত পার্থিব প্রিয়জনকে প্রেরণ করতে সচেষ্ট হয়।৩ দেহান্তের পরবর্ত্তী কিছুদিন এরূপ ঘটনা এত

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ—৪।৪।২

২. ...Memory, culture, education, habits, character and affection—all these, and to a certain extent tastes and interests, for better, for worse, are retained.

Sir Oliver Lodge—Survival of Man. p. 349.

Character, memory, affection, personality, etc., go with the etheric, because they pertain to the etheric body on earth.

Findlay—On the Edge of the Etheric. p. 114.

৩. The first thing that comes into his mind is the question whether it is possible for him to get this wonderful discovery (about his being alive and his faculties being alert) through to those he has left behind.

Owen—Facts and Future Life. p. 161.

সাধারণ যে আমরা তা' কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু বেতার-যন্ত্রের সকল তন্ত্রীতেই যেমন সর্ব্ব দেশের ধ্বনি সুস্পষ্ট ঝঙ্কার দেয় না, পার্থিব মানবের স্থূল অনুভূতিও তেমনি সাধারণতঃ বিদেহীর প্রেরিত এরূপ বহু বার্ত্তারই স্পর্শ লাভ করে না। কর্ম্মব্যস্ত জাগতিক জীবের অতীন্দ্রিয় বস্তুতে একাগ্রতা কোথায়? তবুও, কখনো স্বপ্নে, কখনো তন্দ্রায়, কখনো বা মনের বিশ্রাম অবস্থায় বিদেহীর বাণী আমাদের অন্তর্দ্বারে এসে প্রবেশ করে। একরূপে নয়, নানা ভাবেই তাঁরা আমাদের নিকটে বার্ত্তা প্রেরণ করেন।৪

যাঁরা ওপার হ'তে এ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের জন্য নিতান্ত কাতর হন, কোন না কোন প্রকার সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তাঁদের এখানে সাময়িক প্রকাশ হ'তে দেখা যায়। পৃথিবীর সব দেশেই পণ্ডিত ও অপণ্ডিত বহু জনেই বিদেহীর এই সব ছায়ামূর্ত্তি—বর্ব্বর যুগ হ'তে বৈজ্ঞানিক যুগ পর্য্যন্ত চিরদিনেই দর্শন করেছেন। বিজ্ঞানও আজ এই সকল মূর্ত্তির প্রকাশ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।৫

প্রখর দিবালোকেও যে এরূপ মূর্ত্তির প্রকাশ দেখা যায় তার কয়েকটি মাত্র প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হ'ল—দু-টি বিদেশী, অপরটি আমাদের বাঙলারই ঘটনা।

(১) পুত্র বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে নিহত হবার পর দুর্ভাগ্য মাতা শোকে ও রোগে প্রায় শয্যাশায়িনী। কিন্তু যুদ্ধ-বিরতির দিন (Armistice Day) কোনও প্রকারে আপনার অশক্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে তিনি স্থানীয় উপাসনা-গৃহে উপস্থিত হলেন। এই গৃহেই যে তাঁর পুত্র যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বে সেবকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রার্থনার স্থানে গিয়ে নতজানু হ'য়ে আসন গ্রহণ করা বৃদ্ধার সাধ্যাতীত হ'ল।

এমন সময় কাঁধের উপর কার করস্পর্শ অনুভব ক'রে তিনি মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন—এ যে তাঁর সেই হারানো সন্তান! "মাগো! আমি তোমায় নিয়ে যাই চল" ;—এই কথা ব'লে সেই বিদেহী পুত্র ভগ্নদেহ জননীকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা-বেদিতে অগ্রবর্ত্তী হ'ল এবং জননীর পাশেই নতজানু হ'য়ে বসে প্রার্থনা করেছিল।৬ এ ঘটনা ইংলণ্ডের।

(২) দ্বিতীয় ঘটনা মার্কিণের :—

দুটি সামরিক কর্ম্মচারী—ক্যাপ্টেন্ সেরব্রুক্ আর লেফ্‌টেনাণ্ট্ ওয়াইলিয়ার বেলা ন'টার সময় সিড্‌নে সহরে রেজিমেণ্টের ভোজন-কক্ষে ব'সে কাফী পান করছিলেন, এমন সময় একটি যুবার মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাঁদের পাশ দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে শয়ন গৃহে প্রবেশ করেছিল। উভয়েই সে মূর্ত্তি দর্শন করেছিলেন।

ওয়াইনিয়ার মূর্ত্তিটি দেখেই ব'লে উঠ্‌লেন—"আরে! এ যে আমার ভাই জন্"। অপর একজন লেফ্‌টেনেণ্টের সঙ্গে তারপর সেই বাড়ীর প্রত্যেক ঘরই অনুসন্ধান করা হয়েছিল, কিন্তু মূর্ত্তিটির আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

কয়েক দিন পরে ওয়াইনিয়ারের কাছে সংবাদ এসেছিল যে, ঘটনার তারিখে ও ঠিক সেই সময়েই তাঁর ভ্রাতা জনের মৃত্যু হ'য়েছে।৭

(৩) আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন—

মতিবাবু (ঠাকুর পরিবারের এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি) মরবার পরও দেখা দিয়েছিলেন, সে এক আশ্চর্য্য গল্প।...তিনি অসুখে পড়লেন। বড় ছেলে নিয়ে গেল তাঁকে দেশে।...অনেকদিন আর কোন খবর পাইনে।...এক-দিন সকালে বসে আছি বারান্দায়, একটা লোক ধীরে ধীরে বারান্দায় ঢুকল, দেখি মতিবাবু। চাকরদের বললুম—'ওরে দেখ্, দেখ্, মতিবাবু এসেছেন, তামাক টামাক ঠিক রাখ্।' চাকররা ছুটে নেমে গেল নিচে, দেখলে কোথাও কেউ নেই। বললুম, 'আমি নিজের চোখে স্পষ্ট দেখলুম দিনের বেলা তিনি বাগান দিয়ে হেঁটে দেউড়িতে আসছেন। নিশ্চয়ই তিনি হবেন, খুঁজে দেখ্, যাবেন কোথায় আর'। কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেল না খুঁজে।

দু-চার দিন বাদে তাঁর ছেলে এসে জানালে মতিবাবুর গঙ্গালাভ হয়েছে।৮

এরূপ বহু বহু ঘটনার সংবাদ সকল দেশ হতেই পাওয়া যায়। সংশয়ীকে নিরাকুল ক'রে, নাস্তিকের কুতর্ককে লাঞ্ছিত ক'রে, দিবসে ও নিশীথে বিদেহী বারম্বার পৃথিবীতে এসে দর্শন দিয়েছেন। জড়বিজ্ঞান পরাভূত হ'য়েছে, সে শাস্ত্র এ সকল অপূর্ব্ব ব্যাপারের কোনও মীমাংসার সন্ধান পায় নি।

পৃথিবীর সংলগ্ন সূক্ষ্মভূমি হ'তে সুদূরবিস্তৃত পারলৌকিক জগতের প্রায় সীমান্ত পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ব্বগামীগণের অনেকেই আপনাপন সাময়িক কর্ম্ম অনুসরণ করে পরিভ্রমণ করছেন। সুদীর্ঘকাল না হ'লেও এই ভাবে অনেকেই কিছুকাল ব্যাপৃত থাকেন। তাঁদের করুণ, সস্নেহ, নিঃস্বার্থ দৃষ্টি নিরতই জীব-জগতের প্রতি, পরিত্যক্ত প্রিয়জনের প্রতি, আর্ত্ত

৪. In general it appears that the spirits are ardently desirous of making themselves known to the living, and their failures only spur them on to new attempts, They employ for that purpose ways to which they are most inured.

Lombroso—After Death—What ? p. 338.

৫. The result of a critical examination of the evidence left no doubt in the mind of any student that these apparitions are veridical,...and their occurrence was not due to any illusion of the percipient, or chance.

Sir Wm. Barret—Threshold of the Unseen, p. 134.

৬. *Owen*—Facts and Future Life—p. 40-41.

৭. *Lombroso*—After Death—what ? p. 238-239.

৮. রাণী চন্দ—জোড়াসাঁকোর ধারে—পৃঃ ৬১-৬২.

ও দুঃস্থের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। তাই কখনো কখনো আমরা তাঁদের দর্শন লাভে ধন্য হই। পার্থিব জীবনই যে মানব-অস্তিত্বের শেষ সীমা নয়, এ হতে তার শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ আর কী হওয়া সম্ভব।

বিদেহী যে কেবল মাত্র ক্ষীণ ছায়ামূর্ত্তিতেই পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তা নয়। সুস্পষ্ট, সুঠাম স্থূল-দেহে,—এই পার্থিব দেহেরই অনুকল্প মূর্ত্তি ধারণ করে,—তাঁরা বহুবার এখানে উপস্থিত হয়েছেন। বিশিষ্ট সুধীজনের সভায়, কত বৈজ্ঞানিকের গবেষণা-গৃহে বিদেহীর বার বার অভিযান হ'য়েছে। জিজ্ঞাসুকে সচকিত ক'রে, বিজ্ঞানীকে চমৎকৃত ক'রে, তাঁরা ক্ষণেকে প্রকাশ ক্ষণেকে অন্তর্হিত হয়েছেন; আবার কখনো বা একই পরীক্ষাগৃহে বারম্বার আবির্ভূত হ'য়ে সংশয়ীকে নিঃসংশয় করেছেন। তাঁদের এই দেহগুলি শুধু যে বাহ্যিক সুগঠিত তা নয়; তাঁদের শ্বাসযন্ত্র হ'তে স্পন্দমান বক্ষঃস্থল—সবই পার্থিব মানবের সম্পূর্ণ অনুরূপ; মুখে আনন্দের প্রকাশ, নয়নে প্রীতিপূর্ণ করুণ দৃষ্টি।

এমনি সুস্পষ্ট ও সুগঠিত এক যুগল মূর্ত্তির বিবরণ স্বনামধন্য ফরাসী অধ্যাপক ডাঃ গেলের গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর টিস্‌সো এই মূর্ত্তি দুটি দর্শন ক'রে পাশের চিত্রখানি অঙ্কিত করেছিলেন।[৯] তিনি বলেছেন,—প্রথমে একটি নারী মূর্ত্তি প্রকাশিত হ'ল; তার বক্ষ হ'তে নীলাভ জ্যোতি বিকীর্ণ হ'চ্ছিল, মাথাটি বেষ্টন ক'রে ক্ষীণ উত্তরীয়, মুখে প্রসন্ন মধুর হাসি। ক্ষণ পরেই সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হ'ল।

শীঘ্রই তার পুনরাবির্ভাব হয়েছিল, এবার আরও পরিস্ফুট, সম্পূর্ণ জীবন্ত, মুখখানি যেন চন্দ্রালোকিত।...তার দুইখানি করতল বুকের সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে সে ধারণ ক'রে রয়েছিল যেন তড়িতের একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলক। হঠাৎ সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অপর একটি মূর্ত্তি এবার প্রকাশ হ'ল; একটি কৃষ্ণকায় পুরুষের মূর্ত্তি; রক্তবর্ণ তার ওষ্ঠ, মাথার উপর ক্ষীণ মস্‌লিনের মত কোন বস্তুর উষ্ণীষ, অঙ্গে সেই বস্তুরই আবরণ। তাঁরও হাতে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলক, যার আভা তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আলোকিত করেছিল। সেই মূর্ত্তিটি আমার বামদিক অতিক্রম ক'রে সমস্ত গৃহটি পরিভ্রমণ ক'রে, উপস্থিত সকল ব্যক্তির সম্মুখে পূর্ণরূপে প্রকাশ হ'য়ে তারপর গৃহতলে বিলীন হয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই সভার কে একজন ব'লে উঠলেন,—"ঐ দেখুন! দুটি আলোক, দুটি মূর্ত্তি! কি সুন্দর!" ডানদিকে চেয়ে দেখি, যুগল মূর্ত্তি প্রকাশ হয়েছে। আপনাদের কর-ধৃত খণ্ডচন্দ্রের (দুটি জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর) আলোকে তাদের অবয়ব আলোকিত হয়েছে। পুরুষ মূর্ত্তিটি ভারতীয়ের
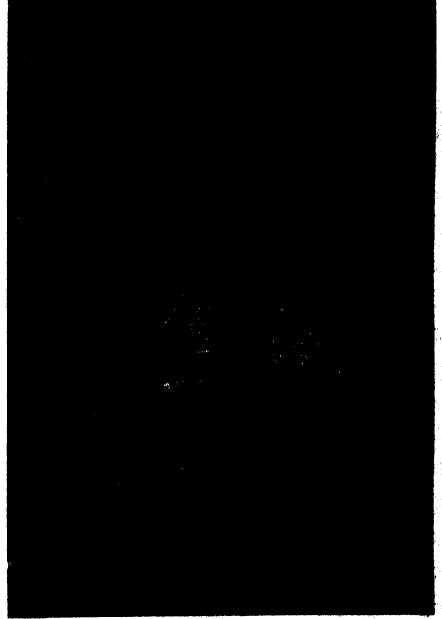
Taken from Geleys' Cloirvoyance and Metrialisation by permission

মত, নারীটি আমাদের পূর্ব্ব-দৃষ্টা 'বিদেহী কেটী'। আমার মুখ হ'তে আপনিই বাহির হ'ল—"কি সুন্দর! কি মধুর!"[১০]

কি ভাবে বিদেহী স্থূল-দেহ ধারণ ক'রে আমাদের দর্শন দিতে সক্ষম হন, আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

(ক্রমশঃ)

৯. I add, by way of record, the very curious observation of the painter James Tissot, and his picture from life, of a double materialisation...
Geley—Clairvoyance and Materialisation—p356.

১০. *Geley*—Clairvoyance and Materialisation. p. 356-357.

বিদ্যা ও বিনয়

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বিনয় নম্র মধুর কোমল কথা,
আলোর আড়ালে ছায়া সুষমার মত,

চিত্রকরের তুলীর সুনিপুণতা—
আভাষে ফুটায় ভাষায় ফুটেনা যত।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

ভারতীয় শিল্পপতিদের সফর

সম্প্রতি ভারত হইতে একদল শিল্পপতি ব্রিটেন ও আমেরিকা সফরে গিয়াছেন। মিঃ বিরলা, মিঃ টাটা, মিঃ শ্রফ, মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় শিল্পনায়ককে লইয়া এই দল গঠিত এবং ইহাদিগকে ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বহু চিন্তাশীল ভারতবাসীর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তবে সমস্ত সমালোচনার উত্তরে এই শিল্পপতির দল আমাদের জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে ভারতের ভবিষ্যত সৃষ্টির জন্য বিদেশ যাত্রা করিতেছেন এবং ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে যাহাতে ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পপ্রসারের জন্য সুদক্ষ শিল্পী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। মোটের উপর ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই যে তাঁহারা এই বিদেশযাত্রার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না একথা ঘোষণা করায় অনেকেই তাঁহাদের সফর সাফল্যমণ্ডিত হইবার কামনা জানাইয়াছিলেন।

কিন্তু শেষপর্য্যন্ত এই শিল্পমিশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ব্রিটেন বা আমেরিকা কোথাওই এই শিল্পপতির দল উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পান নাই। তাহারা লর্ড ন্যুফিল্ডের ন্যায় কোটিপতি ব্রিটিশ শিল্পনায়ককে এ বিষয়ে সহযোগিতা করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু এই আবেদনে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায় নাই। ব্রিটেনে বা আমেরিকার সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে কারখানাগুলির সমরপণ্য উৎপাদনে ব্যস্ত থাকার অজুহাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য সংবাদ যতদূর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ব্রিটিশ শিল্পনায়কগণ এবং মার্কিন শিল্পনায়কদের একাংশ নাকি ভারতীয় শিল্পমিশনকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সেই সাহায্যদানের পরিবর্ত্তে তাঁহারা দাবী জানাইয়াছিলেন নবগঠিত ভারতীয় শিল্পের উপর স্থায়ী বখরা। বলা বাহুল্য, সর্ব্বভারতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে আলোচনা চালাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যে ভারতীয় শিল্পপতির দল এই মিশনের সভ্য হইয়াছেন তাঁহারা এইরূপ অন্যায় দাবী পূরণে রাজী হন নাই। অবশ্য আমেরিকার এক শ্রেণীর শিল্পপতি নিছক ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতির জন্যই ভারতকে সাহায্য করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার বহন করিতে ব্রিটেন বর্ত্তমানে নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা প্রভৃতি উপনিবেশ এখন শিল্পাদি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এ সময় ভারতের বিরাট বাজারই যুদ্ধোত্তরকালে রপ্তানী বাণিজ্যজীবী ব্রিটেনের বাঁচিবার একমাত্র আশ্রয়। মার্কিণ শিল্পপতিগণ ব্রিটেনের এই একমাত্র ভরসাস্থলে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়া ব্রিটিশ স্বার্থ আহত করিতে চাহেন নাই। যাহা হউক, মোটের উপর ব্রিটিশ ও আমেরিকান শিল্পনায়কগণের সাহায্য প্রদানের অনিচ্ছায় শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পমিশনের সফর ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আমেরিকার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; কিন্তু ব্রিটেন যে এখনও ভারতের শিল্পপ্রসারে সাহায্য করিতে রাজী হইতেছে না, ইহা শেষ পর্য্যন্ত তাহার ভবিষ্যত ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, যে দেশে শিল্পাদি প্রসারিত হয় সে দেশে আমদানী বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হয়।* শিল্প-প্রসারের ফলে জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে অর্থের প্রচলন গতিও বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় শিল্পপ্রসারের পূর্ব্বের তুলনায় অন্তর্দেশীয় পণ্য ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া আমদানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। ব্রিটেন যদি ভারতবর্ষে শিল্পপ্রসারে সাহায্য করে তাহা হইলে ভারতের যুদ্ধোত্তর আমদানী বাণিজ্য প্রসারের সম্পূর্ণ সুযোগ যে কৃতজ্ঞ ভারতবাসীর শুভেচ্ছাপ্রাপ্ত ব্রিটেনই লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন ভারতীয় অবস্থার সহিত বহুদিনের পরিচয়গত অভিজ্ঞতায় ব্রিটেনের ভবিষ্যত বাণিজ্য-বাজারের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান শিল্পপ্রগতির মুখে ব্রিটিশ শিল্পনায়কগণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন, তাঁহারা যেন অসঙ্কোচে ভারতীয় শিল্পগুলির উন্নতি ও প্রসারের জন্য সর্ব্ববিধ সাহায্য করেন। দুঃখের বিষয় স্যার আলফ্রেডের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির এই উপদেশপ্রদান ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে। আমেরিকার যদিও এ বিষয়ে ঠিক এতখানি স্বার্থ নাই, তথাপি আমেরিকা যদি এখন ভারতবর্ষকে সাহায্য করে তাহা হইলে যুদ্ধোত্তরকালে বিরাট ভারতের বাজারে আমেরিকাও অবশ্য কতকটা সুবিধা পাইবে। তা ছাড়া মার্কিণ ব্যবসায়ীর পণ্যক্রেতা দেশ হিসাবে ভারতকে সাহায্যদানে এইরূপ অনিচ্ছার কারণ কি? ভারতবর্ষকে দক্ষ শিল্পী বা যন্ত্রপাতি, যাহাই আমেরিকা জোগাক, তজ্জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা মূল্য তো তাহারা অবশ্যই লাভ করিবে। ভারতীয় শিল্পে কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার কথা তাহাদের তো চিন্তা করারই কথা নয়, এমনকি বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এই অন্যায় চিন্তা ব্রিটেনও করিতে পারে না। ভারতবর্ষকে জমিদারীরূপে এতকাল ভোগ করিলেও সেই

---

* ১৩৫১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে 'দুনিয়ার অর্থনীতি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জমিদারী বর্তমানে ব্রিটেনের হাতছাড়া হইতে চলিয়াছে ইহাতো ব্রিটিশ শিল্পপতিগণেরও বোঝা উচিত।

তবে ধনতন্ত্রবাদী আমেরিকায় বা রক্ষণশীল ব্রিটেনে ভারতীয় শিল্প-মিশন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ভারতের শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা যে একেবারে চলিয়া গিয়াছে এমন কথাও মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কৃষিজীবনের অসহ্য দারিদ্র্যের কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভারতের জনসাধারণ এখন আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে, কাঁচামাল বা শিল্পশ্রমের দিক হইতেও ভারতের সম্পদ পৃথিবীর ঈর্ধ্যার বস্তু, মূলধনেরও ভারতে এখন আর বিশেষ অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং এখন ধীরে ধীরে হইলেও ভারতের শিল্পপ্রসার যে অবশ্যই সম্ভব হইবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তা ছাড়া টোরী গভর্ণমেন্টের আমলে ধনতন্ত্রবাদী ইংলণ্ড ভারতকে সাহায্য না করিয়া ফিরাইয়া দিলেও সেই অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবতঃ ইংলণ্ডে আর দীর্ঘকাল বজায় থাকিবে না। পার্লামেন্টের নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের তীব্র পরাজয়ে বিশ্বমানবতার জয় কতকটা সূচিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলী সরকারের আমলে যে লর্ড ন্যুফিল্ড ব্রিটিশ শিল্পের সাময়িক স্বার্থের সহিত ভারতের শিল্প-প্রসারের প্রশ্ন মিলাইয়া দেখিয়া শিল্পপতিগণকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদানে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন, শ্রমিক দলনায়ক স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের বোর্ড অফ ট্রেডের সভাপতিত্বের আমলে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অবশ্যই আশা করা যায়। টোরি দলের সময়ের রক্ষণশীল ইংলণ্ড অপেক্ষা শ্রমিক দলের আমলের সমাজতন্ত্রমুখী ইংলণ্ড অনেক বেশী উদার মনোভাব অবলম্বী হইবে একথা অনুমান করাই স্বাভাবিক। ফিউডাল্‌ইজম্ বা সামন্ততন্ত্রবাদের আমলের পৃথিবী অপেক্ষা ধনতন্ত্রবাদের আমলের পৃথিবী বিশ্বমানবতার দিক হইতে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল, আবার এই ধনতন্ত্রবাদের আসন্ন অবসানে সমাজতন্ত্রবাদের অভ্যুত্থানের সহিত সেই পরিবর্তন আরও প্রত্যক্ষ হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। একদা একজন ভাগ্যবান জমিদার লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য নরনারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, এখনও একজন শিল্পনায়কের ব্যাঙ্কের খাতা ভরাইতে লক্ষ লক্ষ লোক জীবন বিকাইয়া দেয়; কিন্তু যেদিন আসিতেছে সেদিন এই লক্ষ লক্ষ নিরুপায় ও দরিদ্র নরনারীর অবিচ্ছিন্ন দুঃখভোগের ইতিহাসের যবনিকাপাত হইবে। যে মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ শিল্পনায়কদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী এতকাল নির্বিচারে কৃষিজীবনের দারিদ্র্য ভোগ করিয়াছে, তাহাদের চিরকাল জয় হইতে পারে না। ভারতের বিপুল সম্ভাবনা ব্রিটিশ শিল্পনায়ক বা বণিকদের স্বার্থের অজুহাতেই ব্যর্থ থাকিবে এরূপ কথা আগামী যুগে ভাবাও চলিবে না। তবে অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, আজ যাঁহারা শিল্পনায়ক হিসাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন সেদিন তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন ফুরাইবে; কিন্তু ভারতের জনসাধারণ যে শিল্পপ্রগতির সহিত সেদিন মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার অর্জন করিবে, এরূপ চিন্তা আজ আর কল্পনা বিলাসমাত্র নয়।

বাংলার খাদ্যশস্যের অবস্থা

নয়াদিল্লীর ২৫শে জুলাইয়ের এক সংবাদে দেখিলাম বাংলা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ-নীতি সাফল্যলাভ করায় বাংলায় নাকি যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য জমিয়া গিয়াছে। উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, এখন বাংলায় খুব ভাল ফসল হইতেছে এবং বাংলা সরকারের শস্যসংগ্রহ নীতিও বর্তমানে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বাংলায় এখন আর দুর্ভিক্ষের কোন ভয়ই নাকি নাই, বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত এত খাদ্যশস্য বাংলায় জমিয়া গিয়াছে যে, বাংলাকে এখন খাদ্যশস্যের দিক হইতে উদ্বৃত্ত প্রদেশ বলা চলে। উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, বাংলার এই উদ্বৃত্ত চাউল হইতে ২৫ হাজার টন চাউল যুক্তপ্রদেশ সরকার গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাংলা নাকি বিহারকে ১৫ হাজার টন চাউল এবং মাদ্রাজকে কিছু পরিমাণ মোটা চাউল সরবরাহ করিবে।

শুধু এই সংবাদেই নয়, বাংলার গভর্ণর মিষ্টার কেসির গত ৩১শে জুলাইয়ের বেতার বক্তৃতাতেও আমরা বাংলায় এই শস্য উদ্বৃত্ত হইবার সংবাদ পাইয়াছিলাম। মাননীয় লাট বাহাদুর গর্বের সহিত বলিয়াছিলেন যে, বাংলায় যখন আর দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি হইবার ভয় নাই এবং এই প্রদেশে যখন বর্তমানে প্রয়োজনাতিরিক্ত বহু শস্য জমিয়া গিয়াছে, তখন এই উদ্বৃত্ত শস্য হইতে ভারতের ঘাটতি অঞ্চল সমূহে শস্য পাঠান উচিত। বাংলার দুঃখের দিনে সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাকে খাদ্যশস্য যোগাইয়া সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া বাংলার এই সুদিনে তাহারও ভারতের অন্যান্য অভাবগ্রস্ত ভগ্নিপ্রতিমা প্রদেশগুলিকে খাদ্যশস্য পাঠাইয়া সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়া মিঃ কেসি মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

অবশ্য বাংলাদেশে যদি সত্যই খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হয় এবং ভারতের অন্য প্রদেশের লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পায়, তাহা হইলে বাংলা হইতে বাড়তি শস্যাদি রপ্তানীতে আমাদের আপত্তি করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু নয়াদিল্লীর সংবাদে বা মিঃ কেসির বক্তৃতায় উদ্বৃত্ত শস্যের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, বাংলাসরকারের খাদ্য পরিচালনা নীতি দেখিলে তো সেই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের নিঃসংশয় কোন ধারণা জন্মায় না। এখনও রেশনিং অঞ্চলে ১০৲ টাকা মণ দরে যে চাউল বিক্রীত হইতেছে তাহা মানুষের খাদ্য হিসাবে প্রায় অচল বলা চলে এবং ১৬ টাকা ৪ আনা মণ দরের চাউলেও কাঁকর ও বিভিন্নপ্রকার চাউলের মিশ্রণ স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের পূর্বে যেখানে ৫৲ টাকা মণ দরে ভাল চাউল পাওয়া যাইত, সেস্থলে এখন ভাল চাউলের মণ রেশনিং এলাকায় ২৫৲ টাকা। এইভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার জন-সাধারণ যখন যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় এখনও পাঁচ গুণ মূল্যে অন্নক্রয়ে বাধ্য হইতেছে তখন বাংলা সরকারের খাদ্যনীতির সাফল্য বা উদ্বৃত্ত শস্যের সত্যতা আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? সকলেই জানেন যে, দুর্ভিক্ষোত্তর বাংলায় খাদ্যশস্যই একমাত্র অত্যাবশ্যক পণ্য এবং এই খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণের উপর বাংলার 'সাধারণ বাজারের মূল্য রেখায়

তেজী বা মন্দাভাব সকল দিক হইতেই নির্ভর করে। চাউলের দর কমিলে কৃষকদের ক্ষতি হইবার যে বিজ্ঞাপন সাড়ম্বরে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও যুক্তিসহ কিনা সন্দেহ। চাউল সস্তা হইলে সাধারণ বাজার সস্তা হইতে বাধ্য এবং তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবশ্যই ক্ষতিপূরণ হইবে। তাছাড়া দুর্ভিক্ষোত্তর বাংলায় চাউলবিক্রেতা মুনাফাভোগী কৃষক কয়জন আছে যে তাহাদের জন্ত এই প্রদেশের অসংখ্য দরিদ্র জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করা চলে? এখন খাদ্যশস্যের মূল্য পাঁচ গুণ বলিয়াই পণ্য-সাধারণের মূল্যস্তর যে কৃত্রিমভাবে চড়া রহিয়াছে একথা তো বলাই বাহুল্য। বাংলার যে সব এলাকায় রেশনিং প্রথা চালু হয় নাই সেখানেওতো এখন যথেষ্ট অধিক দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। মুন্সিগঞ্জের মত শস্তপ্রধান স্থানেও এখন বাজারে ও অপেক্ষাকৃত ভাল চাউলের দর প্রতি মণ প্রায় কুড়ি টাকা। এই অবস্থা লক্ষ্য করিবার পর একথা কখনই বলা যায় না যে বাংলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল আছে অথবা উদ্বৃত্ত অঞ্চল বাংলা হইতে জন-সাধারণের অসুবিধা না ঘটাইয়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাউল রপ্তানী করা সম্ভব। তা ছাড়া যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এখনও বাংলার তুলনায় অনেক কম দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে; বাংলায় ১৬ টাকা ৪ আনা মণ দরে বিক্রীতব্য চাউল একই দরে এই সকল প্রদেশে বিক্রয় করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অপর দিকে বাংলার চাউল যদি কোন কোন প্রদেশে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিক্রীত হয়, তাহা কি বাংলার অধিবাসীদের প্রতি অবিচারের পরিচায়ক হইবে না। এবৎসর বর্ষার যে অবস্থা তাহাতে বাংলায় শস্য উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম হইবে বলিয়াও অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। অবশ্য ভিতরের খবর আমরা ঠিক জানি না, হয়তো বাংলা সরকারের হাতে সত্যই প্রচুর পরিমাণ চাউল জমিয়াছে; কিন্তু চাউল যদি সত্যই হাতে যথেষ্ট থাকে এবং বাংলা সরকারই যদি রেশনিং অঞ্চলে চাউল বিক্রয় করিবার একমাত্র অধিকারী হন, তাহা হইলে এই একচেটিয়া ব্যবসা চালাইবার সময় তাঁহাদের কি উচিত নয় বাংলার দুঃস্থ অধিবাসীদের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনা করা? পণ্যাভাব ঘটিলেই চাহিদার চাপে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হয়। বাংলা সরকারের এমনিই নিয়ন্ত্রণনীতি চালু করিয়া সেই অন্যায় মূল্যস্ফীতি রোধ করা উচিত। দেশবাসীর প্রতি এই সাধারণ কর্ত্তব্য পালন না করিয়া বাংলা সরকার যদি তাহাদের অসহায়তার সুযোগে এবং একচেটিয়া ব্যবসাদারীর মোহে হাতে যথেষ্ট চাউল থাকা সত্ত্বেও চাউল বিক্রয়ে চতুর্গুণ মূল্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মুনাফাখোরদের সাজা দেওয়ার আইন প্রণয়নের এবং সেই আইনের সংবাদ জনসাধারণের নিকট বিশদভাবে বিজ্ঞাপিত করিবার সার্থকতা কোথায়? বিদেশে চাউল রপ্তানীর আগে বাংলার চাউলের মূল্য হ্রাসের কথা বাংলা সরকার বিবেচনা করিবেন কি?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনা নীতি

অনেকদিন হইতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীনে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পরিচালনার জন্ত এদেশে আন্দোলন চলিতেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে যখন ১৯৩৫ সালে নূতন আইন প্রবর্ত্তনের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন এদেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে আগ্রহশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্যাঙ্ক সমূহের এবং ভারত সরকারের ব্যাঙ্কারের কাজ করা ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়িয়াছিল। এই কাজগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে ভারতের মুদ্রানীতি পরিচালনা করা। টাকার চাহিদা বুঝিয়া নোট ছাপাইবার এবং মুদ্রার মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিবার ফলে ভারতে শিল্পপ্রসারে অর্থাভাব ঘটিবে না, এমন আশাও অনেকে করিয়াছিলেন। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসার সংকোচ সম্পর্কেও সকল প্রকার সংবাদ রাখিবার ভার পাইয়াছিল এবং ইহার সাহায্যে ভারতীয় কৃষি বা শিল্প বাণিজ্য অর্থের দিক হইতে কোন অসুবিধা ভোগ করিবে না, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় এমন কথাও এদেশে অনেকে ভাবিয়াছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের ব্যাঙ্কারের কার্য্য করিত, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর আইন অনুসারে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মর্য্যাদা পাইয়াছিল তাহা অবলুপ্ত হইল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৫ সালের পর হইতে আইনের চোখে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক একটি বড় ধরণের সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু অনেক আশা ও সম্ভাবনা লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলেও এ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কার্য্যকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদেশের শিল্প বাণিজ্য বা কৃষির কোন প্রত্যক্ষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে নাই। মুদ্রানীতির পরিচালনাভার হাতে পাইয়া এদিক হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়াছে, কোন সভ্য দেশের আধুনিক ব্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাসে তাহার তুলনা হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের একটি বিধানে আছে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে সোনার জামিন না থাকিলেও বিলাতী ষ্টার্লিং সিকিউরিটির জামিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট ছাপিতে পারিবে। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ক্রীড়নক হইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই বিধানটিকে সাধারণ বিধিতে রূপান্তরিত করিয়াছে এবং কাগজী ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে পর্ব্বত প্রমাণ নোট ছাপিয়া ভারতের মুদ্রানীতির ভারসাম্য একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতের ন্যায্য প্রাপ্য পণ্যমূল্যের পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার্লিং ঋণপত্র প্রদান করিতে শুরু করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের স্বার্থ একেবারে উপেক্ষা করিয়া ব্রিটিশ সরকারের এই অন্যায় সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে এবং একদিকে যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পাহাড় জমিয়া উঠিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও গোছা গোছা নূতন নোট মুদ্রাযন্ত্রের অন্ধকার গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আসে। এইভাবে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ যখন ছিল ১৭৮ কোটি টাকা মাত্র, সে স্থানে বর্ত্তমানে এই নোটের পরিমাণ ১১৩৮ কোটি ৬৮ লক্ষ

টাকা দাঁড়াইয়াছে (১৭ই জুলাই, ১৯৪০)। ব্রিটেনের কাগজী প্রতিশ্রুতিতে পণ্যাভাব সংক্ষুব্ধ ভারতের বাজারে অজস্র নোট ছাড়িবার ফলে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কই বলিতে গেলে ভারতের ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির, এমন কি লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়কারী তীব্র দুর্ভিক্ষের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি ও শিল্পের জন্য আশানুরূপ কর্ম্মনিষ্ঠা না দেখাইয়া এবং নিতান্ত অসঙ্গতভাবে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলিতে গেলে যতদূর সম্ভব ব্যর্থতা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে পক্ষপাতিত্ব দেখান হইতেছে তাহাও নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্ত্তিত হইবার ফলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে সাধারণ একটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। এখন প্রকৃতপক্ষে ভারতের বড় বড় যৌথ ব্যাঙ্কের মর্য্যাদা যতটুকু, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মর্য্যাদা তদপেক্ষা কানাকড়ি বেশী নয়। তথাপি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া যেখানে যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই, সেই সকল স্থানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে তাহার এজেন্সি করিতে দিতেছে। এই ভাবে সুযোগ লাভ করিয়া শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এতদিন বৎসরে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা মুনাফা লাভ করিয়াছে। এই বৎসর এপ্রিল মাসে এজেন্সির মেয়াদ শেষ হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন এজেন্ট নিযুক্ত করিবার সুযোগ আসিয়াছিল। আমরা আশা করিয়াছিলাম, ভারতীয় গভর্ণর স্যার দেশমুখ অন্ততঃ কোন ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ককে এই এজেন্সি-অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু প্রকাশ, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই নাকি মুনাফার হার কতকটা সঙ্কুচিত করিয়া পুনরায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছে।

এসব অন্যায় অবিচার সহ্য করা যাইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে তাহার তালিকাভুক্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির প্রতি যেরূপ জুলুম করিতেছে তাহা এই সকল দেশীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক স্বার্থের দারুণ প্রতিকূল বলিয়া আমরা মনে করি। এদেশে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হইলে সরকারী সিকিউরিটি বা হুণ্ডি জামিন রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও এই ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের উপর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুদ গ্রহণ করে। সচরাচর নিয়ম হইল এই যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত এই সুদের হার অপেক্ষা ঋণকারী ব্যাঙ্ক তাহার দাদনের উপর অপেক্ষাকৃত চড়াহারে সুদ আদায় করে। ১৯৩৬ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইভাবে প্রদত্ত ঋণের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ আদায় করিতেছে। অবশ্য যুদ্ধের আগে সাধারণ ব্যাঙ্কের পক্ষে দাদনের উপর বার্ষিক শতকরা ৩ টাকার বেশী সুদ আদায় করা অনায়াসেই সম্ভব ছিল, কারণ তখন গভর্ণমেন্টই আরও বেশী সুদে জনসাধারণের টাকা ধার নিতেন। কিন্তু যুদ্ধ বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে কাঁপাই টাকার প্রাচুর্য্য হওয়ায় সস্তা টাকার যুগে ঋণের উপর সুদের পরিমাণ অসম্ভবরকম কমিয়া গিয়াছে। এখন যে কোন সাধারণ ব্যাঙ্ক যুদ্ধের পূর্ব্বের শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা সুদের স্থানে এক বৎসরের জন্য জমা স্থায়ী আমানতে শতকরা ২৷৷০ আনার বেশী সুদ প্রদানে সক্ষম হইতেছে না। চলতি আমানতে সুদের পরিমাণ বর্ত্তমানে শতকরা বার্ষিক ।০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। লোকের হাতে টাকা আসায় ব্যাঙ্কের পক্ষে লাভজনক ভাবে টাকা খাটানো এখন অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে এবং যদিও টাকা ধার দেওয়া যায়, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই শতকরা বার্ষিক ৩ টাকার বেশী সুদ আদায় করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে এখনও ব্যাঙ্কগুলিকে অসময়ে টাকা জোগাইয়া তাহার বিনিময়ে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হারে সুদ আদায় করিতেছে ইহাতে নিঃসন্দেহে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ভারতসরকার বর্ত্তমানে শতকরা বার্ষিক ২৸০ আনা ও ২৷৷০ সুদের ঋণপত্র বাহির করিয়াছেন এবং এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঋণপত্রগুলি বিক্রয় আরম্ভ হইবার অল্পসময়ের মধ্যেই বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, এসময় শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হারে সুদ আদায় করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে দেশীয় ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্কগুলির অসহায়তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ভারতীয় ব্যাকিংয়ের প্রসারের জন্য ইহা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, ইহাই সকলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আশা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানাভাবে এ পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে ক্ষতিগ্রস্তই করিয়াছে।

প্রকাশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ নাকি স্থির করিয়াছেন যে, শীঘ্রই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপরোক্ত সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হইবে। অনেক দিন অবিচার চালাইবার পর যে এখন কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, ইহাও অবশ্যই আশার কথা। আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান টাকার বাজারের স্বচ্ছলতা লক্ষ্য করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত শতকরা বার্ষিক ৩ টাকার স্থলে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের অনুকরণে বার্ষিক শতকরা ২ টাকার সুদের হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া। তবে একথা ঠিক যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকৃতই সুদের হার না কমাইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করা অর্থহীন। গত নভেম্বর মাসেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদ কমাইবে বলিয়া বাজারে জোর গুজব রটিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই গুজব সত্যে পরিণত হয় নাই।

ত্যাগী

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাপ আপনারে পঙ্কিল করি'
পুণ্যের দাবে দান,

মিথ্যা নিজেরে নিঃস্ব করিয়া
দিল সত্যের প্রাণ।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন

বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচনের ফল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বের কমন্স সভায় রক্ষণশীল দলের যে পরিমাণ সংখ্যাধিক্য ছিল, এই নির্ব্বাচনে তাহা অপেক্ষাও শ্রমিক দলের সংখ্যাধিক্য বেশী হইয়াছে। বৃটেনের ভোটদাতাদের মনোভাবের যে এইরূপ আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা শ্রমিক নেতারাও বুঝিতে পারেন নাই; রক্ষণশীলদের পক্ষেও ইহা কল্পনাতীত ছিল।

এই নির্ব্বাচনে শ্রমিক দল ২১৪টি নূতন আসন অধিকার করিয়াছে; পূর্ব্বে তাহাদের যে সব আসন ছিল, তাহার মধ্যে মাত্র ৪টি আসনে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। রক্ষণশীল দল হারাইয়াছে ১৮২টি আসন; নূতন আসন পাইয়াছে মাত্র ৮টি। নূতন পার্লামেণ্টে শ্রমিক দলের সমর্থকের সংখ্যা ৪১৭; তাহাদের বিরোধীদের সংখ্যা মাত্র ২১০। নির্ব্বাচনের বৈশিষ্ট্য এই যে, চার্চ্চিল-মন্ত্রিসভার একমাত্র মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ ইডেন্ ছাড়া আর কোন রক্ষণশীল সদস্যই নির্ব্বাচিত হন নাই। একজন নিতান্ত অখ্যাত লোক মিঃ চার্চ্চিলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ১০ হাজার ভোট পাইয়াছেন।

বৃটেনের এই সাধারণ নির্ব্বাচনকে কোন কোন বৃটিশ পত্রিকা "নীরব বিপ্লব" আখ্যা দিয়াছেন। কথাটা আমাদের—ভারতবাসীর কাণে অত্যন্ত বিদ্‌ঘুটে ঠেকে; কারণ বৃটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে আমরা বিশেষ পার্থক্য দেখি না। জমিদারী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব দলের মনোভাবই যে এক, সে পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। ম্যাক্‌ডোনাল্ডের আমলে বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা আমাদের স্মরণ আছে; সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার জ্বালায় আমরা এখনও জ্বলিতেছি।

বস্তুতঃ শ্রমিক দলের ক্ষমতা লাভই একটা বিরাট ব্যাপার নয়। ইহার প্রধান কারণ—বৃটেনের শ্রমিক দলের নেতৃত্বের বল্গা এখনও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হাতে রহিয়াছে। প্রগতিমূলক 'শ্লোগান্' তাহাদের অনেকের পক্ষে জনপ্রিয় হইবার মুখোস মাত্র। প্রকৃত প্রশ্ন—বৃটিশ শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে—নেতাদের প্রতি তাহাদের এখন চাপ কতখানি।

এই দিক হইতে বর্ত্তমান বৃটিশ শ্রমিক দল আর ১৯২৪ সালের দল নয়। বৃটিশ শ্রমিক দলের রূপ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বদলাইয়াছে, দলের মধ্যে প্রগতিপন্থীদের প্রভাব অনেক বাড়িয়াছে। প্রগতিপন্থীদের সহিত প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতৃত্বের প্রবল সঙ্ঘর্ষ দেখা গিয়াছিল ১৯৪৩ সালের শ্রমিক সম্মেলনে। সেই সম্মেলনে সমগ্র জার্ম্মান্ জাতিকে শাস্তি দিবার জন্য (তথাকথিত ভ্যান্‌সিটার্টিজমের সমর্থনে) যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, প্রগতিপন্থীরা তাহার প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিল। কিন্তু প্রস্তাবটি সম্মেলনে পাশ হইয়া যায়। তখন সম্মেলন কক্ষের বাহিরে এক বিরাট সভায় তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়। এক বৎসরে এই প্রগতিপন্থীদের শক্তি কতদূর বাড়িয়াছে, তাহার পরিচয় গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৪৪ সালে) ব্ল্যাক্‌পুলে পাওয়া গিয়াছিল। ব্ল্যাক্‌পুল সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বৃটিশ জনসাধারণ আজ যে শ্রমিক দলের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিল, সে দলের রূপ ক্রমেই এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সব চেয়ে বড় কথা, এই নির্ব্বাচনে বৃটিশ জনসাধারণ কতকগুলি লোককে সমর্থন করে নাই—তাহারা সমর্থন করিয়াছে একটা নীতিকে এবং সুস্পষ্ট বিরোধিতা জানাইয়াছে অন্য একটা নীতির বিরুদ্ধে। স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে শ্রমিক দল ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী; তাহারা অবিলম্বে মূলশিল্প, যানবাহন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, কতকগুলি বৃহৎ শিল্প এবং কতক পরিমাণে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাইয়া এই সকলকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে চায়। যুদ্ধোত্তরকালীন পুনর্গঠনের জন্য ইহাই তাহাদের নীতি। পক্ষান্তরে, রক্ষণশীল দল ব্যবসায়ে ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সোস্যালিজমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে না খাইয়া মরিবার ও না খাওয়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা পাকা হইয়াছিল। বৃটিশ জনসাধারণ সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, সেই ব্যবস্থায় তাহারা আর ফিরিয়া যাইতে চায় না। সোস্যালিজমের উদ্দেশে মিঃ চার্চ্চিলের মুখ খিঁচুনি ও দাঁত খিঁচুনি দেখিয়া তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দল গ্রীসের বামপন্থীদের ডাণ্ডা মারিয়াছে, বেল্‌জিয়ামে প্রতিক্রিয়াপন্থীদিগকে উৎসাহ দিয়াছে, যুগোশ্লেভিয়া টিটোকে চোখ রাঙ্গাইয়াছে, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর পিঠ চাপড়াইয়াছে। শ্রমিক দল বরাবর এই পররাষ্ট্র নীতির বিরোধী। সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রমাণিত হইল—বৃটিশ জনসাধারণ রক্ষণশীল দলের এই পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্ত্তন চায়। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সদ্ভাব রক্ষার প্রতিশ্রুতি রক্ষণশীল দল দিয়াছিল। কিন্তু লণ্ডনের পোলদিগকে সমর্থনে, ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে টিটোর সহিত অসঙ্গত আচরণে, নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি বিধান সম্বন্ধে দীর্ঘসূত্রতায় এবং পরাজিত জার্ম্মানী সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনে সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাবই পরোক্ষে কাজ করিতেছিল। মধ্য প্রাচ্যকে সোভিয়েট-বিরোধী ঘাঁটিতে পরিণত করিবার জন্য বৃটিশ রক্ষণশীলদের চক্রান্তও গোপন ছিল না। বৃটিশ জনসাধারণ এই সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাব ও কাজের অবসান ঘটাইবার জন্য স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছে।

না। কলিকাতার মত সহরে, যেখানে বহু ধনীর বাস, সেখানেই দুধের এই অবস্থা, কাজেই বাঙ্গালার মফঃস্বলের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন—গভর্ণমেণ্ট অবহিত থাকিলে কলিকাতার মত সহরে কখনও এরূপ অবস্থা আসা সম্ভব হইত না।

খাদ্যাভাব ও পচা মাল—

এক দিকে লোক পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য না পাইয়া তিলে তিলে ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতেছে ও আর এক দিকে সরকারী গুদামে মাল পচিয়া নষ্ট হইতেছে। ২২শে জুলাই ত্রিপুরা চাঁদপুর হইতে খবর আসিয়াছে, তথায় সরকারী গুদামে প্রায় ৩ হাজার বস্তা আটা পচিয়া গিয়াছে। হয় ত ঐ আটা সস্তা দরে কোন ব্যবসায়ী কিনিয়া লইয়া ভাল আটার সহিত তাহা মিশাইয়া রেশনের দোকানের মারফত তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন—রেশনের দোকানে জিনিষ ভাল কি মন্দ—ক্রেতাকে তাহা পরীক্ষা করিবার অধিকার দেওয়া হয় না—কারণ সপ্তাহের খাদ্য না কিনিলে তাহাকে অনাহারে থাকিতে হয়। কাজেই ক্রেতা ঐ পচা মাল খাইয়া রোগে ভুগিবে—ইহা দেখিবার কেহ কোথাও নাই।

শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পরিচয়—

বিলাতে বহু ভারতবন্ধু ইংরাজ আছেন, প্রবীণ সাংবাদিক মিঃ এচ-এন-ব্রেল্‌সফোর্ড তাঁহাদের একজন। তিনি বর্ত্তমান শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত পরিচয় লাভের জন্য গত ২৯শে জুলাই ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের তিনটি কাজ করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন—(১) প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন পুনঃ প্রবর্ত্তন (২) সমস্ত রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি-দান ও (৩) কংগ্রেসের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।—তাহার পর প্রায় এক পক্ষ কাল অতীত হইতে চলিল—এখনও ইহার কোনটি সম্বন্ধে আমরা কোন খবর পাই নাই।

লাট-পাদ্রীকে সম্বর্দ্ধনা—

ডক্টর ফস্ ওয়েষ্টকট ভারতের লাট পাদরী বা মেট্রপলিটন অফ ইণ্ডিয়া ছিলেন। তিনি ২৩ বৎসর বয়সে ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন। ৫৩ বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতের জন্য বহু মঙ্গলজনক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে গত ১০ই শ্রাবণ কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। উপযুক্ত লোককেই সম্মান দেওয়া হইয়াছে।

সাংবাদিক সম্মানিত—

'বোম্বাই সেণ্টিনেল' পত্রের সম্পাদক মিঃ বি, জি, হর্ণিমান খ্যাতনামা সাংবাদিক। গত ২৬শে জুলাই তাঁহার স্বর্ণ-জুবিলী উৎসব উপলক্ষে বোম্বায়ের অধিবাসীরা তাঁহাকে ৩১ হাজার টাকাপূর্ণ একটি থলি উপহার দিয়াছেন। সম্বর্দ্ধনা সভার সভাপতি সার চিমনলাল শীতলবাদ বলিয়াছেন—মিঃ হর্ণিমান ইংরাজ হইয়াও ভারতকে নিজ মাতৃভূমিরূপে সেবা করিয়াছেন। তিনি গত ৫০ বৎসর ধরিয়া যে ভাবে নানা অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া ভারতে সাংবাদিকের জীবনযাপন করিয়াছেন, তাহা অনুকরণের যোগ্য।

বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য দান—

বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) কোম্পানী ভারতে ন্যাশানাল সায়েন্স ইনিষ্টিটিউটে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে মাসিক ৪শত টাকার কয়েকটি বৃত্তি দেওয়া হইবে—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও জীববিজ্ঞানের গবেষকগণ ঐ বৃত্তি পাইবেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে বিরাট লাভ হইয়াছে, তাহা হইতে এই বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হইল। ভারতীয় লিমিটেড কোম্পানীগুলিও বর্ত্তমান যুদ্ধে কম লাভ করে নাই—তাহাদের এই আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।

বিলাতে ভারত কমিটী—

এতদিন ভারত সচিব বিলাতে বসিয়া ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিতেন। নূতন শ্রমিক মন্ত্রিসভা ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ভারত কমিটী গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন—ঐ কমিটী বড়লাটকে পরিচালনার জন্য নূতন নির্দ্দেশাবলী প্রস্তুত করিবেন। প্রধান মন্ত্রী, ভারত সচিব, সহকারী ভারত সচিব ও সার ষ্ট্যাফোর্ডক্রিপ্‌স ঐ কমিটীতে থাকিবেন। দেখা যাউক, নূতন ব্যবস্থায় আমাদের কি লাভ হয়।

রাষ্ট্রপতি ও বড়লাট—

গত ২৮শে জুলাই রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বড়লাটকে এক পত্র লিখিয়া সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তিদান করিতে ও যে সমস্ত রাজনীতিক পরোয়ানা জারি হয় নাই সেগুলি বাতিল করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যে সকল রাজবন্দী এখন অসুস্থ, তাহাদের জন্য উন্নততর চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিতে বলা হইয়াছে।' সিমলায় বড়লাটের সহিত রাষ্ট্রপতির এ সকল বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছিল—বর্ত্তমান পত্র সেই আলোচনার ফল। আমাদের বিশ্বাস, মৌলানা আজাদের এই আবেদন নিষ্ফল হইবে না।

রাজবন্দী শরৎ বসুর স্বাস্থ্য—

বাঙ্গালার জনপ্রিয় কংগ্রেস-নেতা ব্যারিষ্টার রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, শরৎবাবুর স্বাস্থ্যের জন্য আশঙ্কার কারণ নাই। তাহার পর গত ১লা আগষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় কয়েকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা শরৎবাবুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। শরৎবাবুর দেহের ওজন অনেক কমিয়া গিয়াছে, চিকিৎসা সত্ত্বেও বহুমূত্র রোগ কমে নাই, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি খুব কমিয়া গিয়াছে—এই সকল সংবাদ সত্য কি না, জনসাধারণকে তাহা জানানো কি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না?

চাউল রপ্তানী—

বর্ত্তমান আগষ্ট ও আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গালা দেশ হইতে ২৫ হাজার টন চাউল যুক্তপ্রদেশে, ১৫ হাজার টন চাউল বিহারে ও ঐরূপ প্রচুর পরিমাণ চাউল মাদ্রাজে রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ঐ চাউল বিদেশে পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন—ইহার পর যখন ১৩৫০ সালের মত আমরা পথে পড়িয়া না খাইয়া মরিব, তখন গভর্ণমেণ্ট শুধু তাহা দেখিবে—তাহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিবে না। ইহাই পরাধীনতার মহাপাপ।

অস্থি-চিমুর সংক্রান্ত আপীল বাতিল—

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে অস্থি-চিমুরের যে ৭ জন বন্দীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহারা বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে যে আপীল করিয়াছিল, তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী হইতে ভারতের সর্ব্বসাধারণ পর্য্যন্ত সকলেই আবেদন করিয়াছিলেন—কিন্তু আমলাতান্ত্রিক সরকার কোন কথায় কর্ণপাত করে নাই। এখনও কি তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না?

শ্রীনগরে দাঙ্গা—

ভারতের একদল মুসলমান শুধু সিমলা বৈঠক নিষ্ফল করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। গত ১লা আগষ্ট কাশ্মীর শ্রীনগরে যখন মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও খাঁ আবদুল গফুর খাঁকে লইয়া এক মিছিল বাহির হয়, তখন তাহারা সেই মিছিলের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে একজন নিহত ও বহু আহত হয়। এই মুসলমানদল কাহারা, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মৌলানা আজাদ, সীমান্ত গান্ধী প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের উপর এইরূপ জঘন্যভাবে যাহারা আক্রমণ করে, তাহারাই নিজেদের ভারতের সমগ্র মুসলমান সমাজের একছত্র নেতৃত্বের দাবী করে। ইহাই আশ্চর্য্য!

নূতন ভারত সচিব—

মিঃ পেথিক লরেন্স নূতন বিলাতী মন্ত্রিসভায় ভারত-সচিব বা ইণ্ডিয়ার ষ্টেট্ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর—তাহাকে ব্যারণ উপাধি দিয়া লর্ড সভায় স্থান দেওয়া হইবে। ১৯৩১ সালে তিনি ভারতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সাল হইতে এডিনবরার পূর্ব্ব নির্ব্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি লর্ডসভায় যাইলে ঐ কেন্দ্রে উপনির্ব্বাচন হইবে। যিনিই ভারত সচিব হউন না কেন, নূতন শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারত শাসননীতি পরিবর্ত্তন না করিলে আমাদের কোন লাভালাভ নাই।

খাঁ বাহাদুর খুড়ো প্রভৃতির অব্যাহতি—

সিন্ধু দেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্সকে হত্যা করার অভিযোগে ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর খুড়ো, তাহার ভ্রাতা ও অপর ৩ জনের হুজুরের দায়রা আদালতে বিচার হইয়াছিল। সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছে। সিন্ধু দেশে হত্যাকাণ্ড একটা নিত্য ঘটনা—প্রধান মন্ত্রী হইলেও তাহার রক্ষা নাই।

ইউরোপে অন্ন-বস্ত্রের অভাব—

ইউরোপে যুদ্ধ থামিয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর সঙ্কট এখনও যায় নাই। আমেরিকার সমর দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, সত্বর নানা দেশ হইতে ইউরোপে অন্ন ও বস্ত্র প্রেরণ করা না হইলে আগামী শীতে সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে মারা যাইবে। গত ৬ বৎসর ইউরোপে ক্রমে ক্রমে শস্যের চাষ কমিয়াছে—কারখানা-সমূহও সমরসম্ভার ছাড়া অন্য কিছু প্রস্তুত করে নাই। কাজেই আজ এই অবস্থা আসা স্বাভাবিক। যাহারা ইউরোপরক্ষার ভার লইয়াছে, সেই ত্রিশক্তি কি এই অবস্থার প্রতীকারে অগ্রসর হইবে না ?

গ্রেপ্তার ও মুক্তি—

পাঞ্জাবের আটক জেলার পুলিস সহসা গত ২৫শে জুলাই সীমান্ত নেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তিনি তখন ঐ জেলার মধ্য দিয়া হাজরা জেলায় গমন করিতেছিলেন। সিমলায় নেতৃ-সম্মিলনের পর এই গ্রেপ্তারে সারা ভারতে চাঞ্চল্য দেখা দেয় ও পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট পরদিনই তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। বড় কর্ত্তাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইলেও অনেক সময় ক্ষুদে-কর্ত্তাদের তাহা হয় না—এই গ্রেপ্তার ও মুক্তি তাহার অন্যতম উদাহরণ।

আগষ্ট আন্দোলন ও জহরলাল—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কাশ্মীরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সহিত ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যার গভীর যোগাযোগ রহিয়াছে। ১৮৫৭ সালের পর ১৯৪২ সালের আন্দোলন হইতেছে, দেশের স্বাধীনতা লাভে দেশবাসীর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।"

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ও পণ্ডিতজী—

কাশ্মীরে বক্তৃতাকালে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলিয়াছেন…"সরকারী বিবরণ অনুযায়ী বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কথাই যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও সেই সময় মুনাফাকারীরা প্রতি মৃত ব্যক্তির বিনিময়ে এক হাজার টাকা হারে লাভ করিয়াছে।" এই কথার তাৎপর্য্য কি মুনাফাকারীদের মনে দাগ দিবে ?

মাদারীপুরে বিমান দুর্ঘটনা—

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের নিকট টেকেরহাট নামক স্থানের বাজারে গত ১১ই জুলাই এক বিমানপোত ভাঙ্গিয়া পড়ায় শতাধিক লোক নিহত ও বহু লোক আহত হইয়াছে। নদীর উপর বিমানখানি পতিত হওয়ায় প্রায় একশত নৌকা তখনই ভস্মীভূত হইয়াছে। বিমান-চালক ও কয়েকজন আরোহীর মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছে। পল্লী-গ্রামের মধ্যে এই ঘটনা ঐ অঞ্চলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে। সভ্যতার পাপের ইহাও একটি নিদর্শন।

ট্রাম কোম্পানীর উদাসীনতা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও কলিকাতা ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ মহম্মদ ইসমাইল এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া যাত্রীদের সুখ সুবিধা সম্বন্ধে ট্রাম কোম্পানীর উদাসীনতার কথা সকলকে জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জনসাধারণ জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে ট্রাম কোম্পানী গাড়ীতে প্রচণ্ড ভিড় কমাইবার জন্য গাড়ীর সংখ্যা বাড়ান নাই বরং তাহা কমাইয়াছেন। পূর্ব্বে গাড়ী খারাপ হইয়া ডিপোতে যাইলে কারখানার সকলের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দিয়া তাহা মেরামত করানো হইত। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় মাত্র কয়েকজনকে কাজ দেওয়া হয় ও বাকী লোক বসিয়া থাকে। ফলে কারখানায় অনেক অচল গাড়ী জমিয়া থাকে। গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের হিসাবে দেখা যায়—শ্যামবাজার লাইনে ৪৮ খানা গাড়ী চলিবার কথা ছিল, কিন্তু মাত্র ২৭ খানা গাড়ী চলিয়াছে। গাড়ী মেরামত হয় না বলিয়া ঐ সপ্তাহে বৌবাজার লাইনে ২০ খানার স্থলে ১২ খানা গাড়ী বাহির হইয়াছে। গত ১৮ই ও ১৯শে জুলাই বৌবাজার লাইনে মাত্র ৮ খানা গাড়ী চলিয়াছে। গালিফ ষ্ট্রীট হাওড়া লাইনে ৩৮ খানা গাড়ী চলিবার কথা—কিন্তু ২।৩ সপ্তাহ ঐ লাইনে মাত্র ৩২ খানা গাড়ী চলিয়াছে। হ্যারিসন রোড (হাইকোর্ট) লাইনেও ১২ খানা স্থলে কয় সপ্তাহ মাত্র ৮ খানা গাড়ী চলিয়াছে। গাড়ী মেরামতের ভাল ব্যবস্থা থাকিলে একখানা গাড়ীও বসিয়া থাকিত না ও যাত্রীদের এত ভিড় সহ্য করিতে হইত না। ৩০ খানা নূতন গাড়ীর সরঞ্জাম আসিয়া

পড়িয়া আছে, সেগুলি প্রস্তুতের জন্যও কোন তাড়া দেখা যায় না। কোম্পানী দেখিতেছেন, কম গাড়ী চালাইয়াও যখন প্রচুর লাভ হয়, তখন বেশী গাড়ী চালাইবার দরকার কি? এ বিষয়ে দেখিবার বা বলিবার কি কেহ নাই?

বিহারে নূতন মামলা—

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে আন্দোলনের সময় দারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, সারন ও পাটনা জেলায় নিখিল ভারত কাটুনি সমিতির বহু জিনিষপত্র লুঠ করা হয়, পোড়াইয়া দেওয়া হয় ও সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ঐ ক্ষতির জন্য নিখিল ভারত কাটুনি সমিতি ১৬টি মামলার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও সে জন্য নোটীশ দেওয়া হইয়াছে। বিহার গভর্ণমেণ্ট, পাটনা হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার, পুলিশের ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল, হাজারীবাগের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সারনের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সিংহভূমের ডেপুটী কমিশনার প্রভৃতির বিরুদ্ধে মামলা করা হইবে। ৬৫ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইবে। কয়েকজন খ্যাতনামা উকীলকে মামলার পক্ষে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে এই ধরণের মামলা এই প্রথম হইবে।

তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও আম্বেদকর—

ডাঃ আম্বেদকর যে ভারতের তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রকৃত নেতা নহেন, তাহা নিখিল ভারত তপশীলভুক্ত সমিতির সভাপতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত বিরাটচন্দ্র মণ্ডল এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতে উক্ত দলের ১৫১টি নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি আছেন—তন্মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ৪ জন ও বোম্বায়ের ১১ জন মাত্র ডাঃ আম্বেদকরের দলভুক্ত। বাকী ১৩৬ জন তাঁহার বিরুদ্ধ দল—নিখিল ভারত তপশীলভুক্ত সমিতি, নিখিল ভারত তপশীলভুক্ত লীগ, স্বতন্ত্রদল প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত। মহাত্মা গান্ধী এই সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে—ডাঃ আম্বেদকর তাহা অস্বীকার করিলেও সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক সেজন্য গান্ধীজির নিকট কৃতজ্ঞ।

বিলাতে আপীলের ফল—

নিম্নলিখিত ৮জন দেশকর্ম্মীকে ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারায় আটক করা হইলে তাঁহারা কলিকাতা হাইকোর্টে ডিভিসনাল বেঞ্চে আপীল করে—বিচারে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। দিল্লীতে ফেডারেল কোর্টে সরকারপক্ষ বিফল-মনোরথ হন ও পরে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা হয়—প্রিভি কাউন্সিল গত ১৭ই জুলাই মুক্তির আদেশ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম (১) শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এল-এ (২) বিজয় সিং নাহার, কর্পোরেশন কাউন্সিলার (৩) দেবব্রত রায় ছাত্র (৪) নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (৫) ননীগোপাল মজুমদার (৬) নীহারেন্দু দত্তমজুমদার এম-এল-এ (৭) ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী ও (৮) প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবার গত কনভোকেশনে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বীরবল শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর পত্নী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীকে ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক দান করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার দানের জন্যই ইহা দেওয়া হয়। পূর্ব্বে ১৯৩৫ সালে ৺মানকুমারী বসু, ১৯৩৮ সালে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী ও ১৯৪১ শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ঐ পদক লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ১৮৯২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় পাশ করেন। তাঁহার লিখিত 'নারীর কথা' সর্ব্বজনসমাদৃত।

যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য—

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ভারতীয় সৈন্যের এইরূপ ক্ষতি হইয়াছে; নিহত—১৫২৯১, আহত—৫০৭০৫, নিখোঁজ—১০৩৭১, যুদ্ধবন্দী—৫১৮০২, যুদ্ধবন্দী বলিয়া অনুমিত—২১০৫৬—মোট ১৪৯২২৫। তাহা ছাড়া হংকং ও সিঙ্গাপুরে ৫৮৩৫ হতাহত হইয়াছে। মোট সংখ্যার মধ্যে শুধু মালয়ে ৬২১৭৫ ও ব্রহ্মদেশে ৪০৪৫৮ সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। ইহার পরিবর্ত্তে ভারত কি পাইয়াছে?

সার গজনভীর আহ্বান—

সার আবদুল হালিম গজনভী খ্যাতনামা মুসলমান ব্যবসায়ী ও কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলমান সমিতির সভাপতি। তিনি গত ৪০ বৎসরকাল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক। তিনি গত ১২ই জুলাই এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া সিমলায় নেতৃ সম্মিলনে মিঃ জিন্নার কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন—এ অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে (যাঁহারা লীগের লোক নহেন) কংগ্রেসে যোগদান

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য শ্রমিক দল অঙ্গীকারবদ্ধ। রক্ষণশীল দল চিরদিন এই বিষয়ে টালবাহানা করিয়া আসিয়াছে। নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে রক্ষণশীল পাণ্ডারা শ্রমিক নেতাদের সহিত এই সম্পর্কে একটা আপোষ করিয়াছিলেন। এই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করিবার ভার ছিল চার্চ্চিল-আমেরি কোম্পানীর চাঁই লর্ড ওয়াভেলের উপর। এই ব্যক্তি বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচনের ১০ দিন আগে ভারতীয় নেতাদের সম্মেলন আহ্বান করিয়া এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া রাখিলেন যে, ভারতের ব্যাপারে একটা সাময়িক মীমাংসা আসন্ন বলিয়া সকলে মনে করিল। আমাদের বরেণ্য নেতারা এই ব্যক্তির চাতুরীতে এতদূর বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা মিলিটারী লাটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন; আর বিবাদ করিতে লাগিলেন নিজেদের মধ্যে। এইভাবে অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন যখন হইয়া গেল, তখন মিলিটারী লাট সকল দোষ নিজের কাঁধে লইয়া ভারতীয় নেতাদের বিদায় দিলেন। অবশ্য, তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, ভারতের ব্যাপারে অবস্থাটা অনুকূল থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ জনসাধারণ তাঁহার মুরুব্বির দলকে এইভাবে পথে বসাইবে।

বৃটিশ জনসাধারণ শ্রমিক দলের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়া ভারতের ব্যাপারে মীমাংসা চাহিয়াছে। তাহারা অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছে যে, ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির সহিত তাহাদের নিজেদের যুদ্ধোত্তরকালীন সমস্যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—চরম দারিদ্র্যপ্রপীড়িত ভারতবাসীর ক্রয় ক্ষমতা বৃটেনের শ্রম শিল্পকে সমৃদ্ধ করিতে পারে না; তাই, তাহারা ভারত সম্পর্কে প্রাচীন নীতির আমূল পরিবর্ত্তন চায়।

এই সাধারণ নির্ব্বাচনে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি এবং ভারতনীতি সম্পর্কে বৃটিশ জনসাধারণের যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বৃটিশ জনসাধারণের মনোভাবের বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শ্রমিক দলের হাতে ক্ষমতা আসাটা "নীরব রাষ্ট্রবিপ্লব" নয়; তবে, বৃটিশ জাতির মনোজগতে যে সত্যই বিপ্লব ঘটিয়াছে, ইহা তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। মনোজগতের এই বিপ্লবকে সমাজজীবনের বিপ্লবে রূপান্তরিত করিবার সুকঠিন দায়িত্ব পড়িয়াছে বৃটিশ শ্রমিক দলের উপর। দলের প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতারা যাহাতে জাতির সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য হন, তাহার জন্য সতর্ক দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। কেবল ভোট দিয়াই বৃটিশ জনসাধারণের কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই—যে উদ্দেশ্যে ভোট দেওয়া হইয়াছে, তাহা যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক প্রগতিপন্থী বৃটিশকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই নির্ব্বাচনের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রমিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি এড়াইবার আর পথ নাই। তাঁহারা বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছেন; যে কোন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁহাদিগকে আর অন্য কোন দলের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে না। ১৯২৪ ও ২৮ সালে শ্রমিক দল যখন দুইবার মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করে, তখন তাহাদের এই সুবিধা ছিল না। তখন অন্য সকল দলের মিলিত শক্তি সহজেই সরকারপক্ষকে পরাজিত করিতে পারিত; উদারনৈতিক দলের অনিশ্চিত সমর্থনের উপর শ্রমিক দলকে নির্ভর করিতে হইত। এবার শ্রমিক দলের বহু প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতা এই ভাবে দায়িত্ব ঘাড়ে পড়িবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে দ্বিধা ও সঙ্কোচ দেখা দিবার আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক প্রথা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হইতে না পারে, তাহার জন্য বৃটেনের গচ্ছিত স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী নানারূপ চক্রান্ত করিবেন। প্রগতিবিরোধী শ্রমিক নেতারা স্বেচ্ছায় এই চক্রান্তজালে পা দিতে চেষ্টা করিতে পারেন। ইঁহাদিগকে শ্রমিকদলের বিঘোষিত নীতি অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য করিবার দায়িত্ব বৃটিশ জনসাধারণের এবং শ্রমিক দলের প্রত্যেক প্রগতিপন্থী সদস্যের।

ত্রিশক্তির সম্মেলন

গত ১৭ই জুলাই বার্লিনের নিকটবর্ত্তী পোট্‌সড্যামে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্, জেনারলিসিমো ষ্ট্যালিন এবং মিঃ চার্চ্চিল আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। মিঃ চার্চ্চিল ২৬শে জুলাই বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচনের ফল জানিবার জন্য লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি দেখেন যে, রক্ষণশীল দলের ভরাডুবি হইয়াছে। ইহার পর বৃটেনের পক্ষ হইতে নূতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লি পোট্‌সড্যামে গিয়াছেন।

পোট্‌সড্যামে তিন জন রাষ্ট্রনায়কের আলোচনার গতি ও আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই। কাজেই, গবেষণার গঙ্গায় বান ডাকিয়াছিল। এই সব গবেষণা ভিত্তি করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিরাপদ নয়; নেতৃত্রয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্মিলিত বিবৃতি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত।

তুরস্কের নিকট রুশিয়ার দাবী

রুশিয়া দার্দ্দানেলিজ প্রণালীতে কর্ত্তৃত্বের অধিকার চাহিয়াছে এবং তুর্কি সীমান্তের কয়েকটি জেলা দাবী করিয়াছে। এই কথা প্রকাশিত হইবামাত্র সোভিয়েট-বিরোধী ধুরন্ধররা তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমতঃ দার্দ্দানেলিজ প্রণালী। মঁত্রে চুক্তি অনুসারে তুরস্ক বস্‌ফোরাস্ ও দার্দ্দানেলিজের রক্ষক। কিন্তু দ্বিতীয় ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় তুরস্ক তাহার এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করে নাই।

যুদ্ধকালীন ঘটনাবলী যাহাদের স্মরণ আছে, তাহারা জানেন—তুরস্ক এই যুদ্ধে নামে মাত্র নিরপেক্ষ ছিল; সে সর্ব্বদা বিজয়ী পক্ষকে খুসী রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রথমে সোভিয়েট রুশিয়া যখন নিরপেক্ষ ছিল, তখন তাহার সহিত মিলিত হইতে সে চাহে নাই। ইহার পরিবর্ত্তে সে চুক্তি করিয়াছিল যুদ্ধরত বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত। এই চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে ভূমধ্য সাগরে যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য সে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে জুন মাসে ইটালী যুদ্ধ ঘোষণা করিলে এবং ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে ইটালী গ্রীস আক্রমণ করিবার পরও সে নিষ্ক্রিয় থাকে। তাহার পর, সে জার্ম্মানীকে ক্রোম্ এবং অন্যান্য সমরোপকরণ সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিয়াছে। জার্ম্মানী যখন দ্রুত সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তুরস্কে সোভিয়েট-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়; সোভিয়েট

আর্মেনিয়াকে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সভা ও শোভাযাত্রা হইতে থাকে। জার্মান দূত ফন্ প্যাপেনকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে দুইজন রুশ গুরু দণ্ড লাভ করে। রুশিয়ার বোমা বর্ষণের পর জার্মান বৈমানিকদের তুরস্কে আশ্রয় পাইবার কথা একাধিকবার শোনা গিয়াছে। সর্ব্বোপরি, তৎকালীন তুর্কি পররাষ্ট্রসচিব মঃ মেনেমেনজুগলু মন্ত্রিসভার অজ্ঞাতে ইতালীয় জাহাজকে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পদচ্যুতির অন্যতম কারণ।

এ হেন তুরস্কের হাতে দার্দ্দানেলিজের ভার দিয়া সোভিয়েট রুশিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট দার্দ্দানেলিজের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এত রক্ত ও অশ্রু পাতের পর সোভিয়েট রুশিয়া স্বভাবতঃ সামরিক দিক হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে চাহে।

তাহার পর, তুর্কি সীমান্তের কয়েকটি জেলা সম্পর্কে রুশিয়ার দাবী। এই সম্পর্কিত অবস্থাটা পোল্যাণ্ডের ইউক্রেণ ও বীলো রুশিয়া সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দাবীর মত। রুশিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সুযোগে তুরস্ক এই তিনটি জেলা অধিকার করিয়াছিল। ইহার ফলে আর্মেনিয়ান্ জাতির কতকাংশ তুরস্কের অধীন হইয়াছে; অবশিষ্টাংশ রহিয়াছে সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত; তুরস্কের আর্মেনিয়ানরা তাহাদের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী স্বজাতীয়দের সহিত নিজেদের ভাগ্য গ্রথিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। তাহাদের এই আগ্রহের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার দাবীর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। জাতিগত ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভাগই গণতন্ত্রসম্মত। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এই গণতান্ত্রিক নীতি লঙ্ঘন করিয়া থাকে। পোল্যাণ্ড সম্পর্কে এই ধরণের একটা বড় অন্যায়ের প্রতিবিধান হইয়াছে। তুরস্ক সম্পর্কেও এই অন্যায়ের প্রতিবিধান হওয়া উচিত।

স্পেনে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন

স্পেনে জেনারল ফ্রাঙ্কো জাতে উঠিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। রিপাব্লিক্যানদের এড়াইয়া স্পেনের শাসন-ব্যবস্থাকে মিত্রশক্তির গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য তিনি স্পেনে রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্পর্দ্ধা খুঁজিতেছেন। বৃটেনের রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি স্পেনের সিংহাসন সম্পর্কে ডন্ জুয়ানের দাবী সমর্থন করিয়াছিল। ডন্ জুয়ান্ ফ্রাঙ্কোর প্রতি প্রসন্ন না থাকায় তিনি এখন আল্‌ফোন্‌সোর নাবালক পৌত্রকে সিংহাসনের প্রার্থী করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, মিঃ চার্চ্চিল এই ভাবে স্পেনের সমস্যার সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংযোগসূত্রে অবস্থিত স্পেনে বামপন্থীদের প্রভাব বাড়িতে দেওয়া সাম্রাজ্যবিলাসী মিঃ চার্চ্চিলের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অথচ, যে ফ্রাঙ্কো ফ্যাসিস্ত ইটালী ও নাৎসী জার্ম্মানীর অনুগ্রহে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে এবং যুদ্ধের সময় নানাভাবে মিত্রশক্তির শত্রুদ্বয়কে সাহায্য করিয়াছে—এমন কি পূর্ব্ব রণাঙ্গনে সৈন্যও পাঠাইয়াছে, তাহাকে যুদ্ধোত্তর স্পেনে আর প্রতিষ্ঠিত রাখা চলে না। এই জন্য, "দুই কূল বজায় রাখিবার" উদ্দেশ্যে চার্চ্চিল কোম্পানী স্পেনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। জুলাই মাসে পোট্‌স্‌ড্যামে যাইবার পূর্ব্বে হেণ্ডায়ীতে ছুটি উপভোগ করিবার সময় মিঃ চার্চ্চিল ফ্রাঙ্কোর লোকের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা গিয়াছে। ইহার পরই ফ্রাঙ্কো স্পেনের মন্ত্রিসভা হইতে কয়েক জন ফ্যাসিস্তকে অপসারিত করেন। মিঃ চার্চ্চিল হয়ত জানাইয়াছিলেন যে, বাহিরে স্পেনের ফ্যাসিস্ত রং একটু ফিকা হইলে পোট্‌সড্যামে ফ্যাসিস্ত স্পেন সম্বন্ধে ওকালতি করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে। যাহা হউক, বৃটিশ নির্ব্বাচনের ফল জেনারল ফ্রাঙ্কোকে অত্যন্ত নিরাশ করিয়াছে। ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশক্তির বৃটিশ সমর্থকরা এখন ক্ষমতাচ্যুত। ইতিমধ্যেই লাভাল স্পেন ত্যাগ করিয়াছেন। এখন মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে স্পেনে ফ্যাসিস্ত প্রভুত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য প্রকৃত চেষ্টা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

খাস জাপানে আসন্ন অভিযান

খাস জাপানে অভিযান আসন্ন। অভিযানের পূর্ব্বে জাপানী দ্বীপপুঞ্জে প্রবলভাবে বিমানের আক্রমণ ও জাহাজ হইতে গোলা বর্ষণ চলিতেছে। জাপান জানাইয়াছিল—সে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে; তবে, বিনা সর্ত্তে নয়। মিত্রপক্ষ বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণের জন্য জিদ্ করায় জাপান শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। জাপান আশা করে যে, তাহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মৃত্যুভয়হীন সৈন্য লইয়া সে প্রবল প্রতিরোধ চালাইতে পারিবে। খাস জাপান হস্তচ্যুত হইবার পরও চীনে আসিয়া মাঞ্চুরিয়ার অস্ত্রের কারখানাগুলি আশ্রয় করিয়া বহু দিন যুদ্ধ চালানো যাইবে বলিয়া জাপানী সমরনায়করা আশা করেন। এইভাবে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিলে মিত্রপক্ষ সর্ত্তাধীনে আপোষ করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

৩০।৭।৪৫

ঘন-বরষায়

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম্-এ

আঁখি-সিন্ধু উথলে আজি ঢেউ লাগিছে তব
হৃদয় কূলে বন্যা-স্রোত জাগে;
অন্তরেতে শুনছি একি অশ্রু-কলরব
প্রেম যে এলো আষাঢ় অনুরাগে।
বর্ষা-বেগে প্রেম-জোয়ার বাহল হৃদি-তরী
সিন্ধু হয়ে উঠেছে আঁখি-জল;

সজল কালো মেঘের মত রূপ যে সুনিবিড়
ভাসায়ে দেয় নয়ন-শতদল।
এলে কি আজ বর্ষা-রূপে সঘন বরিষণে
আর্দ্র করি প্রাণ-বসুন্ধরা;
উত্তাল তব অধীর তব সজল পরশনে
হৃদয় ছুঁয়ে একি সাগর ধারা।

বাঙ্গালায় ৯৩ ধারার অবসান দাবী—
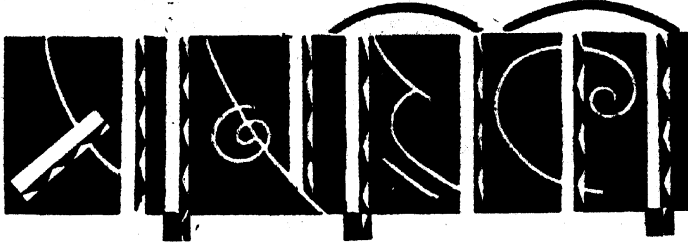
মিঃ এ-কে ফজলল হক, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লেমেণ্ট এটিলীর নিকট তার করিয়া বাঙ্গালায় এখনই ৯৩ ধারার অবসান করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যে সম্মিলিত দল সার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইঁহারা সেই দলের বিভিন্ন অংশের নেতা। ঐ তারের নকল বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকটও প্রেরণ করা হইয়াছে। যে কারণে বাঙ্গালায় ৯৩ ধারা স্থায়ী করা হইতেছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। বর্ত্তমান গভর্ণর জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধী কেন, তাহা তাঁহার প্রকাশ করা উচিত।

মিঃ জিন্না ও মুসলমান সমাজ—

মিঃ জিন্না বার বার বলিয়া থাকেন যে তিনি ভারতের মুসলমান সমাজের শতকরা ৯০ জনের প্রতিনিধি। এ কথা যে ঠিক নহে, তাহা সিমলায় নেতৃ সম্মিলনের সময় মৌলানা আজাদ ও ডাক্তার খান সাহেব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মিঃ জিন্না আবার লীগ-গঠিত মন্ত্রিসভার কথা বলিয়াছেন—উত্তরে তাঁহাকে বলা হইয়াছে, ভারতে কোথাও লীগ-গঠিত মন্ত্রিসভা নাই। সীমান্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে মুসলমান প্রধান মন্ত্রীর অধীনে মন্ত্রিসভা আছে বটে, তবে প্রথমটি কংগ্রেস গঠিত ও দ্বিতীয়টি মিলন-দল-গঠিত। কেহই লীগের ধার ধারেন না। সিন্ধু ও আসামের মুসলমান প্রধান-মন্ত্রীরা লীগ দলীয় বটে, কিন্তু মন্ত্রিসভা রক্ষার জন্য তাঁহাদের কংগ্রেসের সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাঙ্গালার লীগ মন্ত্রিসভা সম্প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব পাইয়া পরাজিত হইয়াছে। কাজেই ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টিতে কংগ্রেসের প্রভাব পূর্ণ বর্ত্তমান, বাকী ৪টির অবস্থা উক্তরূপ। কাজেই মিঃ জিন্নার প্রতিনিধিত্বের দাবী কতটা অমূলক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়—এখন ভারতের জাতীয়তাবাদী সকল মুসলমান দল ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া মিঃ জিন্নার উক্তির অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। জামিয়েৎ-উল-উলেমা দলের সভাপতি মিঃ আদামীকে ইতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। মিঃ জিন্না কংগ্রেসকে যতই হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করুন না কেন, তাঁহার উক্তি যে তাঁহার প্রতিনিধিত্বের দাবীর মতই মিথ্যা, তাহা ক্রমে প্রমাণিত হইতেছে। আগামী নির্ব্বাচনের ফলে মিঃ জিন্নার অবস্থা আরও শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইলে তাহাই ভারতের জনমত কি—তাহা সকলকে জানাইয়া দিবে।

বাঙ্গালা হইতে চাউল রপ্তানী—

বাঙ্গালা দেশে গত দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে চালের মণ ছিল ৪ টাকা—এখন লোককে সেই চাল ১৬৷০ মণ দরে কিনিতে হয়। তাহাও লোক পর্য্যাপ্ত পায় না—ফলে অনেক লোককে আধপেটা ভাত খাইতে হয়। এই অবস্থায় বাঙ্গালার গভর্ণর বাঙ্গালা প্রদেশে প্রচুর চাল উদ্বৃত্ত হইয়াছে হিসাব করিয়া এখান হইতে চাউল অন্য প্রদেশে রপ্তানীর আদেশ দিয়াছেন। গত ৩রা আগষ্ট গভর্ণরের এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া কলিকাতায় জনসভা হইয়াছিল ও ১৯শে আগষ্ট বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থার নিন্দা করা হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে অনাবৃষ্টির ফলে আগামী বর্ষে হয়ত আবার চাউলের অভাব হইবে। বাঙ্গালায় চাউলের দাম না কমাইয়াও লোককে প্রচুর চাল পাইবার সুযোগ না দিয়া গভর্ণর এ দেশের চাউল সরাইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, [illegible] সকল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতেও গভর্ণরের [illegible] নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু সে কথা কি কেহ শুনিবে?

প্রদান ও গ্রহণ—

সম্মিলিত জাতিসমূহের রিলিফ ও পুনর্বসতি সাহায্য তহবিলে ভারত গভর্ণমেন্ট যে ৮ কোটি টাকা চাঁদা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে পণ্য সরবরাহের দ্বারা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে—অবশিষ্ট দেড় কোটি টাকা নগদ দেওয়া হইবে। ভারতগভর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত জিনিষ-সমূহ সরবরাহের ভার লইয়াছেন—

নাম	পরিমাণ (হাজার টন)	মূল্য (লক্ষ টাকা)
লঙ্কা	১	১৫
চা	২॥ লক্ষ পাউণ্ড	২২
তুলা	৫	১২৫
তুলার ছাঁট	৫০০ টন	৩
পাট	১০	৫০
তিসি	৫	১৭॥০
চীনাবাদাম	১০	২২৫
নারিকেল দড়ি	১৫০ টন	১
পাটজাত দ্রব্য	২০	২০০
	মোট	৬৫৮॥০

উক্ত তহবিল হইতে ভারতকে সাহায্য দান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে সার আজিজুল হক জানাইয়াছেন—বাঙ্গালায় যখন দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল, তখন বাঙ্গালায় সাহায্য প্রেরণের অধিকার উক্ত তহবিলের রক্ষকদের ছিল না—যখন রক্ষকদের ক্ষমতা দেওয়া হইল, তখন আর বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ ছিল না। বর্তমান সময়েও বাঙ্গালার যে যে জিনিষের (বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি) প্রয়োজন সর্বাধিক, সে সে জিনিষ সরবরাহ করিবার মত অবস্থা ঐ প্রতিষ্ঠানের নহে।

চমৎকার উত্তর—তুই গরু চরা, আমি নিমন্ত্রণ যাই—না হয়, আমি নিমন্ত্রণ যাই, তুই গরু চরা।

পণ্ডিত নেহরুর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ—

[illegible] আগষ্ট কাশ্মীর শ্রীনগরে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় [illegible] জহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে [illegible]ছেন—ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র দেশগুলিকে হয় বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হইতে হইবে, নয় ত বৃহৎ দেশগুলি তাহাদের তাঁবেদার রাষ্ট্ররূপে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। রুসিয়া ছাড়া ইউরোপে একটি প্রকৃত স্বাধীন দেশ নাই। ইংলণ্ডও আজ আমেরিকা বা রুসিয়ার সাহায্য ছাড়া চলিতে পারে না, কাজেই তাহাকে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন বলা যায় না। যতদিন না স্বাধীন জাতিগুলিকে লইয়া একটি বিশ্ব সংঘ গঠন দ্বারা বিশ্ব সমস্যার সমাধান হয়, ততদিন যুদ্ধ চলিবে। ভারতবর্ষকে যদি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়, তবে উহার অবস্থা ইরাক বা ইরাণের মত হইবে। ইরাক বা ইরাণ নামে মাত্র স্বাধীন, বৃহৎ শক্তিগুলি ঐ দুইটি দেশে খুশী মত শক্তি পরীক্ষা করিতে পারে। ভারতবর্ষ ঐরূপ নামে মাত্র স্বাধীন হইতে চাহে না। ভারতবর্ষ, ইরাণ, ইরাক, আফগানিস্থান, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ লইয়া একটি দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা উচিত। তাহা একটি বিরাট শক্তিশালী স্বাধীন দেশে পরিণত হইতে পারে। পণ্ডিত নেহরুর মত আন্তর্জাতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির এই প্রস্তাব ফ্রিস্কো সম্মিলনের শান্তিকামী কর্তাদের মনঃপূত হইবে কি না কে জানে? পণ্ডিতজীর গভীর পাণ্ডিত্য পৃথিবীর সকল দেশে এখন স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত 'জগতের ইতিহাস' সকল সভ্য দেশে পাঠ্য পুস্তকে পরিণত হইতেছে। কাজেই আজ তিনি যাহা প্রস্তাব করিতেছেন, সকল দেশ ক্রমে সে কথা স্বীকার করিয়া লইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ—

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ সম্বন্ধে বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট যে তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায়, কলিকাতায় যে পরিমাণ দুধ সরবরাহ হওয়া উচিত তাহার মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ দুধ সরবরাহ হয়। লোক তাহাদের চাহিদার তিন ভাগের মাত্র এক ভাগ দুধ পাইয়া থাকে। যে দুধ বর্তমানে সরবরাহ হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ১০০ নমুনার মধ্যে ৭৯টি নমুনার দুধ জলপূর্ণ। গত দুর্ভিক্ষের সময় এত বেশী গরু ও মহিষ খাদ্যাভাবে মারা গিয়াছে যে বাঙ্গালার বাহিরের প্রদেশগুলি হইতে গরু ও মহিষ আমদানী না করিলে সহরে আর দুধ পাওয়া যাইবে

করাই সঙ্গত। মিঃ জিন্নার অন্যায় জিদ যে একদল মুসলমানকে কংগ্রেসের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত করিবে, তাহা আদৌ বিচিত্র নহে।

কলিকাতা প্রেস-ক্লাব—

কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোর্টারগণ গত ৬ই শ্রাবণ রবিবার এক সভায় সমবেত হইয়া 'প্রেসক্লাব' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে—সভাপতি শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন (ষ্টেট্‌স ম্যান)। সহঃসভাপতি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (অমৃতবাজার) ও শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত। সম্পাদক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড) সহঃসম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (এ-পি)। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগান্তর)। তাহা ছাড়া শ্রীঅমল দাশগুপ্ত, বি-সান্যাল, কালীপদ বিশ্বাস, ডি-এন ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রকুমার চৌধুরী, পবিত্রমোহন গুপ্ত, আর নন্দী, রাধাগোবিন্দ সেন ও মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হইয়াছেন। সভায় ৪০ জন রিপোর্টার উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতায় প্রেস ক্লাব

ইঁহারা কলিকাতার সকল সংবাদ, ছবি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী—

গত ১৪ই জুলাই যখন যুক্তপ্রদেশে মিঃ রফি আহমদ কিদোয়াই প্রভৃতি বহু ব্যক্তিকে মুক্তির আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই দিনই শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর আটককাল আরও ৬ মাস বাড়াইবার আদেশ জারি হইয়াছে। বক্সী মহাশয় বহুদিন বিবিধ রোগে ভুগিতেছেন, তিনি শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারেন না—এ অবস্থায় তাঁহাকে মুক্তি দিলে কি ক্ষতি হইত জানি না। জেলে এই ভাবে বহুদিন রোগ ভোগের পরিণাম যে ভয়াবহ সে কথাও কি কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন না?

কম্যুনিষ্ট দল ও মহাত্মা গান্ধী

নিখিল ভারত কম্যুনিষ্ট দলের নেতা মিঃ পি-সি যোশীর সহিত কম্যুনিষ্ট দলের দেশপ্রীতি প্রভৃতি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধকে কি জন্য "জনযুদ্ধ" বলা হয়, গান্ধীজি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রুসিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদান করার পর কি কারণে কম্যুনিষ্টদল যুদ্ধ সমর্থন করেন, তাহাও গান্ধীজি বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন। গান্ধীজির মতে একদল কর্ম্মী ভুল বুঝিয়া কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের সততা সম্বন্ধে গান্ধীজির হয় ত সন্দেহ নাই।

দামোদর উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ—

দামোদর, অজয় প্রকৃতি নদীর বন্যা নিবারণের জন্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মেঘনাদ সাহার প্রস্তাবে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, গত জানুয়ারী মাসে ভারতগভর্ণমেণ্ট এবং বিহার গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়াছেন। উহা কার্য্যে পরিণত করিতে ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন। বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের শেষভাগে প্রতিনিধিরা পুনরায় মিলিত হইয়া পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করিবেন।

...শান ও ...হিলার সম্মান—

...হুগ... জেলার ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী অসীমা মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন শাস্ত্রে ডি-এস-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। মাথা ধরার প্রতিষেধক রাসায়নিক

কুমারী অসীমা মুখোপাধ্যায়

দ্রব্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যাপক ও কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের গবেষক। ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী মহিলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্ সি উপাধি পান নাই।

ছাত্রের কৃতিত্ব—

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান অশোকচন্দ্র এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় ইতিহাস অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। অশোকচন্দ্রের দুই অগ্রজ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমান অনিলচন্দ্র ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমান অরুণচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র।

বাঁকুড়ায় হিন্দু আন্দোলন—

ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে গত ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে বৈশাখ বাঁকুড়া সহরে দোলতলায় হিন্দু সম্মেলন ও বৈদিক যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর কুমুদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সাহানা দুই দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদিগকেও যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতে দেওয়া হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে বাগদী, বাউরী, ছত্রী, কুর্ম্মী, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের জন্য জেলার নানাস্থানে ২৫টি মিশন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিদেশে বাঙ্গালী ডাক্তার সম্মানিত—

হাজারীবাগনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মল্লিক মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার ইন্দুবরণ মল্লিক গত ১৯৩৭ সাল হইতে

ডাঃ ইন্দুবরণ মল্লিক

আই-এম-এস এ যোগদান করিয়া বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাকে লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল পদে উন্নীত করা হইয়াছে।

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি স্মৃতি ভাণ্ডার—

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ (ইনি পূর্ব্বাশ্রমে ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন) জীবিত কালে কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ হাসপাতাল স্থাপনের কামনা করিয়াছিলেন। ঐরূপ একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার সমাধি ক্ষেত্র বর্দ্ধমান জেলার আমাদপুরে একটি দেবায়তন স্থাপনের জন্য তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ এক স্মৃতি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে জন্য প্রয়োজনীয় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হইতেছে। সাহায্য-অর্থ স্বামী সচ্চিদানন্দ স্মৃতি সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা কোষাধ্যক্ষ কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীমান্ অরুণকুমার দত্তগুপ্ত—

ঢাকা জৈনসার নিবাসী শ্রীমান্ জিতেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণকুমার এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষাতেও সপ্তম স্থান

শ্রীঅরুণকুমার দত্তগুপ্ত

অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। অরুণকুমার ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত ত্রিপুরা শ্রীকাইল কলেজের ছাত্র ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের এই কলেজের প্রতি যত্ন ও সে বিষয়ে সুব্যবস্থা কলেজটির এই সাফল্যের অন্যতম কারণ। আমরা অরুণকুমারের দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কামনা করি।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

আরিয়াদহ (২৪ পরগণা) অনাথ ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ ভাণ্ডারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রায় সাহেব রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি দিবসে ভাণ্ডারে এক উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর পুত্র লেপ্টেনাণ্ট বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে দিনের উৎসবের সকল ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। সে দিন বহু অনাথকে ভাণ্ডারে অন্ন বস্ত্র দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি জনৈক কর্ম্মীর চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে স্বর্গতা বিনোদিনী দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থ ভাণ্ডারে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের একটি অভাব দূর করিতেছে। ভাণ্ডারের বহুমুখী কার্য্যব্যবস্থা ক্রমে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতেছে।

শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র মিত্র—

কানপুর প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র মিত্র সংখ্যা-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য সম্প্রতি আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করিতেছেন। তিনি ঐ বিষয়ে

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মিত্র (কানপুর)

গবেষণা করিয়া ও সে বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া ভারতবর্ষেও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি অধ্যাপক আইন-ষ্টাইন, আলডুস হাকস্‌লী প্রভৃতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা—

বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২১শে জুলাই একটি 'ঠাকুর ইনিষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করিয়া রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষা করা হইবে। অধ্যাপক সি-ই-রাভেন ঐ ইনিষ্টিটিউটের সভাপতি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুব্রতরায় চৌধুরী উহার সাধারণ সম্পাদক, সমরেন সেন সহযোগী সম্পাদক ও ডাঃ সি-সি দাশগুপ্ত কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ডোনোভান, পশ্চিম আফ্রিকার আসেম, চীনের চাঙ্গে, সাইপ্রাসের সুধীর ও দিলীপ সেন কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হইয়াছেন। বহু বৈদেশিক অধ্যাপক সমিতির সহ-সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়া এ বিষয়ে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বাঙ্গালায় বস্ত্র বণ্টন—

বাঙ্গালায় নানা আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে ৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত এক গভর্ণিং বডি বস্ত্র বণ্টন করিবেন

ও ২৫ জন সদস্তের এক কার্য্যকরী সমিতি গভর্ণিং ব্যক্তিকে সাহায্য করিবেন। সার বদ্রিদাস গয়েঙ্কা, সার আদমজী হাজি দাউদ, সার আবদুল হালিম গজনভী, মিঃ বি-এম বিরলা, মিঃ আর-এল নোপানী, মিঃ এম-এ ইস্পাহানী, ডাঃ এন-এন-লাহা ও মিঃ জে-কে মিত্র গভর্ণিং বডির সদস্য হইবেন। গভর্ণিং বডির সদস্যগণ কার্য্যকরী সমিতির সদস্য থাকিবেন; তাহা ছাড়া ১৭ জন সদস্যের মধ্যে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের ২ জন, মুসলেম চেম্বার অফ কমার্সের ২ জন, ন্যাসানাল চেম্বার অফ কমার্সের ২ জন, সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৮ জন ও গভর্ণমেণ্ট মনোনীত ৩ জন সদস্য থাকিবেন। সূতী বস্ত্র ও তুলা নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বা বাংলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্ধ করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত এই সমিতির অস্তিত্ব থাকিবে।

পরলোকে মণীন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত—

তক্ষশীলা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ মণীন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত গত ১২ই জুলাই সহসা নিজ অফিসে কাজ করার সময় পীড়িত
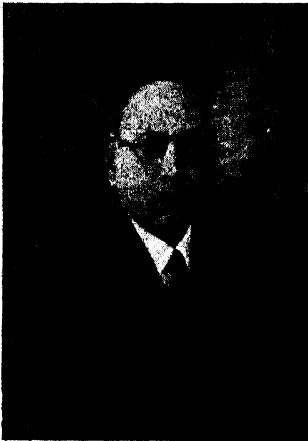
৺মনীন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত

হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৯১ সালে তাহার জন্ম হয় ও ১৯২১ সাল হইতে তিনি তক্ষশীলার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রকেই সাদর যত্ন করিতেন—সেজন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর জ্যোতিষচন্দ্র সেন—

ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী রায় বাহাদুর জ্যোতিষচন্দ্র সেন গত ৬ই মে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে

রায় বাহাদুর জ্যোতিষচন্দ্র সেন

পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে কার্য্যগ্রহণ করেন ও তথায় ১৯৩২ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটী সেক্রেটারী রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র সেন, বোম্বাই হাইকোর্টের জজ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁহার ৫ ভ্রাতা ও তিন পুত্রই কৃতী।

মুরারীমোহন চট্টোপাধ্যায়—

'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র সহকারী সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক মুরারীমোহন চট্টোপাধ্যায় গত ১৪ই জুলাই মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল—তাঁহার ২ পুত্র ও ১ কন্যা বর্ত্তমান। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি সাংবাদিকের জীবন আরম্ভ করেন ও বহু সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সাপ্তাহিক 'স্বদেশ' পত্রেরও অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

নামতে দেখা গেল না। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় একটি দলের নিয়মিত এগার জন খেলোয়াড়দের মধ্যে সাত জন কি কারণে হঠাৎ অনুপস্থিত হ'ল তার কারণ জানা যায় নি। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কে দত্ত এবং পি দাশগুপ্ত যে অসুস্থতার জন্য খেলতে পারবেন না এ খবর কারও অজানা ছিল না। মোটের উপর যাঁরা একটি ভাল খেলা দেখার লোভে মাঠে পয়সা খরচ করে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা মোটেই খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড দেখে খুশী হতে পারেন নি। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের জয় যে ঐ দিন ন্যায় সঙ্গত হয়েছে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। তারা আরও অধিক গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করলেও কারও কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু ভবানীপুর ক্লাবের এতগুলি নামকরা খেলোয়াড়ের হঠাৎ অনুপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে মাঠে যে সব আলাপ আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে তা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। খেলার পূর্ব্বে বা পরে কোন নামকরা খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতির কারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে এতগুলি খেলোয়াড় সম্বন্ধে কোন খবরই বের হয়নি বলেই লোকের সংশয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সম্বন্ধে Amrita Bazar Patrikaর কথা উদ্ধৃত করলাম :

'The reasons for their (Ismail & Taj) non-availability, according to the rumour was something unusual. It was reported that they were sick, but it was again heard that both of them were found on the ground apparently all right. Football in Calcutta is city's pride and Bengal has reasons to feel that she leads the rest of India in this game, but with this football ugly stories are associated. Time has now come for purging, to quote a political term much too common in totalitarian countries. Football in Calcutta needs a clean up. The I. F. A. from its privileged position should not only sit content by staging spectacular matches and tournaments, but it must see that it is clean all round.

It will not be irrelevant as well to ask the Bhowanipur Club to explain why they fielded such an indifferent side in such an important match, for which so many thousands had paid at the turnstiles. It will be said, perhaps, that it is nobody's concern, but people have not yet forgotten that when Mohun Bagan had lost to the Aryans years ago in a crucial league match, the I. F. A. almost was on the point of suspending the Mohun Bagan Club. Was not a famous French Lawn Tennis star brought to notice when it was alleged that he allowed a leading Indian tennis player to win a match by design? Peoples have not yet forgotten that little over ten year's ago Mr. Hilton, the then I. F. A. Secretary on his own took some positive steps when almost similar things had happened in the football league which had a salutary effect."

এই প্রসঙ্গে বিলেতের ফুটবল খেলার একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ১৯২৫ সালের ১২ই মে তারিখে নিউক্যাসল ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবকে ৭৫০ পাউণ্ড অর্থদণ্ড দিতে হয়েছিল এই কারণে যে,তারা ভাল খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও দুর্ব্বল টীম নামিয়ে বিখ্যাত এভারটোন এবং আরসেনাল ফুটবল টীমকে লীগে উঠা নামা (relegation) থেকে রক্ষা করেছিল।

খেলায় খেলোয়াড়চিত মনোভাব বজায় রেখে চললে খেলার মাঠের আবহাওয়া দূষিত হয় না এই আমাদের অভিমত।

ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ঃ

একই বছরে লীগ এবং শীল্ড নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের ফুটবল খেলার ইতিহাসে যে প্রথম গৌরব লাভ করেছে তার জন্য আমরা ক্লাবের খেলোয়াড় এবং পরিচালক মণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রথম তিনটি ক্লাব লীগ তালিকা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইষ্টবেঙ্গল	২৪	১৬	৭	১	৫৬	৭	৩৯
মোহনবাগান	২৪	১৬	৬	২	৪৫	৯	৩৮
ভবানীপুর	২৪	১৪	৭	৩	৪০	১৪	৩৫

আই এফ এ ঃ

এ বছরের আই এফ এ শীল্ডের খেলার তালিকা প্রস্তুত ব্যাপারে আই এফ এ-র শীল্ড সাব-কমিটির যে ত্রুটী দেখা

গেছে সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। শীল্ডের ফিক্‌চার প্রস্তুত করার প্রচলিত পদ্ধতি নামকরা টীমগুলিকে সমানভাবে ভাগ ক'রে পরে বাকিগুলিকে লটারি করে দেওয়া। বিলাতের এফ এ কাপে এই ভাবের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এর উদ্দেশ্য সব ভাল দলগুলিকে সমানভাবে ছড়িয়ে দিলে চতুর্থ এবং সেমিফাইনাল থেকে খেলার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় জানতাম। কিন্তু এ বছরের ফিক্‌চার দেখে আমাদের সে ধারণা বদলে গেছে। লীগের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী দল এবং পূর্ব্ব বৎসরের শীল্ড বিজয়ী দলকে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর দল বলে ধরা যায়। এই ভাবের প্রথম শ্রেণীর দলকে সিডেড্ টীম বলে। আমরা এবারের শীল্ড-ফিক্‌চারের উপরের দিকে সিডেড্ টীম হিসাবে মোহনবাগান, বি এণ্ড এ রেল দল, ভবানীপুর এবং ক্যালকাটার নাম পাই। নীচের দিকে আছে ইষ্টবেঙ্গল, হায়দ্রাবাদ এবং মহমেডান স্পোর্টিং।

লীগের খেলায় মহমেডান দল এবার পঞ্চম স্থানে আছে। তারা এবার খুব শক্তিশালী ছিল না। এবং হায়দ্রাবাদ পুলিসও প্রথম শ্রেণীর টীম নয় যদিও তারা শীল্ডের খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে দু'দিন গোলশূন্য ড্র করেছিল। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সৌভাগ্য যে, তাদের দিকে শক্তিশালী দল পড়ে নি। কিন্তু উপরের দিকে মোহন-বাগান, বি এণ্ড এ রেল, ভবানীপুর এবং ক্যালকাটা এই চারটি দলকে পরস্পরের শক্তিশালী বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে খেলতে হয়েছে। শীল্ড তালিকার উপর দিকে এতগুলি শক্তিশালী দল এবং নীচের দিকে তুলনায় কম দলের স্থান কি বিচার-বুদ্ধিতে পেল আমাদের যে একেবারে ধারণায় আসে না এমন নয়। যথার্থ কি পদ্ধতিতে শীল্ড-ফিক্‌চার তৈরী হয়েছে আই এফ এ জনসাধারণকে জানায় নি। যদি পরিচালকমণ্ডলী প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী সিডেড্ টীমগুলি প্রথম বাছাই ক'রে নিয়ে পরে বাকীগুলি লটারী করে দিয়েছেন তা হলে আমাদের কথা যে, সিড্‌ডে টীম সম্বন্ধে তাঁদের সাধারণ বিচার-বুদ্ধির খুব প্রশংসা করতে পারি না। একদিকে অনেকগুলি শক্তিশালী দল পড়েছে আর অপর-দিকে সেই তুলনায় অনেক দুর্ব্বল দলের স্থান হয়েছে এর ফলে সেই দিকের খেলার আকর্ষণ কম হয়েছে। আর যদি তাঁরা লটারী করেই তালিকা প্রস্তুত করে থাকেন তাহলে তাঁরা কি ভুল পন্থা অবলম্বন করেন নি ?

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত নাটিকা "রাজকন্যার ঝাঁপি"—২৲
প্রতিভা বসু প্রণীত গল্পগ্রন্থ "সুমিত্রার অপমৃত্যু"—৪৲
শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত "নীল আকাশের অভিযাত্রী"—১।০, "ছোটদের বেতার"—১৲
এম্. আকবর আলী প্রণীত "চাঁদ মামার দেশ"—১।০
বন্দে আলী মিয়া প্রণীত "হাদিসের গল্প"—॥০
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "যারা ছিল দিগ্বিজয়ী"—১৸০
স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব"—১৵০
চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ প্রকাশিত "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (২য় ভাগ)—৬৲
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "রক্ত-তিলক"—২৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "আব্রাহাম লিন্‌কলন্"—১৲
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রাত যখন সাতটা"—১৲
ইন্দিরা সরকার প্রণীত "French Stories from Alp' onse Daudet"—৪৲
অমল দাশগুপ্ত অনূদিত "কবে পোহাইবে রাত্রি"—২॥০
আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চ"—৬৲
গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী গ্রন্থ "মাদাম কুরী"—২৲
শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়" ১ম ভাগ—।০, ২য় ভাগ—।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আশ্বিন—১৩৫২

প্রথম খণ্ড	ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ	চতুর্থ সংখ্যা

হিন্দুধর্ম্ম ও সংগঠন

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

(১)

মহাপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দ কর্ত্তৃক হিন্দু সংগঠনের যে বিরাট কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা আজ পঁচিশ বৎসর ঐকান্তিক সাধনার পর অনেক প্রসার লাভ করিয়াছে। আজ হিন্দু নিজ মরণশীলতা উপলব্ধি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন বুঝিয়াছে। শতধা-বিচ্ছিন্ন, জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত হিন্দু-সমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ আজ কিয়ৎপরিমাণে জাগ্রত হইয়াছে। প্রণবানন্দজীর তিরোভাবের পরেও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও অগণিত ভক্ত-অনুরাগীর চেষ্টায় তাঁহার আদর্শ ম্লান বা সঙ্কল্প শিথিল হয় নাই। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও কর্ম্মীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিপুল উৎসাহে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার কার্য্য চালাইয়া হিন্দু-সমাজের সুপ্ত বিবেক ও আত্মজ্ঞানের পুনরুদ্বোধন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ফল যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা মোটের উপর আশাপ্রদ। প্রত্যেক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর হইতেছে অনুকূল জনমত গঠন ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার, উপযুক্ত পরিমণ্ডল রচনা। হিন্দু-সংগঠনের এই প্রাথমিক স্তরের কর্ম্মোদ্যম যে অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা ন্যায্যভাবেই দাবী করা যায়। এইবার আরও দুরূহ অনুশীলন সম্মুখে—এইবার আন্দোলনকে বাহিরের উন্মাদনা ও চাঞ্চল্য হইতে অন্তর্ম্মুখীনতার দিকে লইয়া যাইতে হইবে। যাহাতে ইহা মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে ও অন্তরের গভীর স্তরে কার্য্যকরী হয়, সেই বিষয়ে উপায় চিন্তার সময় আসিয়াছে। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সমস্যা সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব।

এ কথা স্বীকার্য্য যে আজ হিন্দু যে জাগরণের লক্ষণ দেখাইতেছে তাহা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতের বাস্তব প্রয়োজনে, কোন উচ্ছ্বসিত ধর্ম্মভাবের অন্তরপ্রেরণায় নহে। আজ হিন্দু দেখিতেছে যে সে জীবনযুদ্ধে পদে পদে পর্য্যুদস্ত, তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত। জীবনধারণের সমস্ত পথই এক কৃত্রিম রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফলে তাহার নিকট অবরুদ্ধ। এমন কি তাহার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্ম্মজীবনের স্বাধীনতাও বিপন্ন। আজ ক্ষুধার জ্বালায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। যতদিন উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা ছিল, চাকরীর পথ নিরঙ্কুশ ছিল, জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল, ততদিন সে সম্ভাবিত বিপদের প্রতিকারকল্পে কোন দূরদর্শিতার পরিচয় দেয় নাই। এখন সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি

করিতেছে যে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিতে পারিলে তাহাকে উপবাসে মরিতে হইবে। তাই এই অবশ্যম্ভাবী মরণ ঠেকাইবার জন্যই সে আপনার বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করিতে, নিজ দুর্ব্বলতার অসংখ্য রন্ধ্রপথ বন্ধ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বা আর্য্যসমাজের অভ্যুদয়ের পিছনে যে একটা সত্যকার ধর্ম্মগত প্রেরণা, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা ও ব্যাকুল ভাবোন্মত্ততা ছিল, বর্ত্তমান আন্দোলনে তাহার অনুরূপ কিছু লক্ষ্যগোচর হয় না। বর্ত্তমান সংগঠনপ্রয়াসের মূলে আত্মরক্ষার প্রবল তাগিদের অতিরিক্ত কোন উচ্চতর আদর্শবাদের প্রভাব আছে কি না সন্দেহ।

অবশ্য আত্মরক্ষার প্রয়োজন যে সর্ব্বাগ্রগণ্য তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। মুমূর্ষুর কাণে হরিনাম শোনাইলে তাহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে লৌকিক ইষ্টের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সর্পদষ্ট রোগীর জন্য পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা একটু অসাময়িক বলিয়াই ঠেকে। আগে তাহার সাংঘাতিক নিদ্রালুতার প্রতিষেধ করিতে হইবে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতগ্রস্ত জড়তা নিবারণ করিতে হইবে, তবে তাহার অন্য প্রয়োজনের কথা ভাবিতে হইবে। হিন্দুকে নিজ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের ঐশ্বর্য্য বুঝিয়া লইতে হইলে তাহাকে আগে বাঁচিতে হইবে। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাপারে সে যদি বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল না হয়, সুস্থ ও ভদ্রভাবে বাঁচিয়া থাকার যদি সে উপায় করিতে না পারে, তবে তাহার অধ্যাত্মসম্পদ ছায়াবাজির ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। উপবাস-ক্লিষ্ট দেহ, জড় শিথিল মন ও জীবনযুদ্ধে পরাভবের গ্লানি লইয়া বেদ-উপনিষদ-গীতার চর্চ্চা এক হাস্যকর অভিনয় মাত্র। কাজেই তাহার সর্ব্বপ্রথম সাধনা হইবে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই মর্ম্মান্তিক সত্য পরাধীন হিন্দু উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়া তাহার আন্তরিক ধর্ম্মপ্রাণতা সত্ত্বেও সে আজ সর্ব্বনাশের গহ্বরমুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংগঠনকার্য্য যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না করে, যে পর্য্যন্ত হিন্দুর সামাজিক বিবেক-বুদ্ধি ও ঐক্যবোধ পূর্ণভাবে উদ্দীপ্ত না হয়, যে পর্য্যন্ত সে আপনার ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার আর অন্য চিন্তার অবসর নাই।

(২)

তথাপি আন্দোলনের যাঁহারা নেতা ও পরিচালক, তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল আপাত-প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধার প্রতি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। নিছক প্রয়োজনমূলক প্রচেষ্টার ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে—ইহাতে শক্তিমত্তা ও দৌর্ব্বল্যের বীজ একসঙ্গে নিহিত। প্রয়োজনের তাগিদে, আশু ফললাভের প্রলোভনে মানুষ শীঘ্রই উত্তেজিত হয় ও নিজ সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিবার প্রেরণা লাভ করে। সুদূর ভবিষ্যতের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতার অস্পষ্ট ছবি তাহাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। এক অনিশ্চিত, অনাগত শতাব্দীতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাহার কর্ম্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপনা যোগায় না। আবার পক্ষান্তরে প্রয়োজনের তাগিদে যে কাজে নামা যায়, প্রয়োজন ফুরাইলে সেই কর্ম্মোদ্যমও নিঃশেষিত হয়। খাদ্য রন্ধনের জন্য যে আগুনের উদ্ভব, তাহার শিখায় পবিত্র হোমানল প্রজ্বলিত হয় না; আশু প্রয়োজন মিটাইবার পর ভস্মাবশেষেই তাহার অবলুপ্তি। স্বার্থপ্রণোদিত প্রচেষ্টা আদর্শবাদের সর্ব্বোত্তম সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়—সাংসারিকতার স্তর হইতে সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইবার বিপুল ভাবাবেগ ইহার মধ্যে সঞ্চিত থাকে না।

সুতরাং আশু বর্ত্তমান ও সুদূর ভবিষ্যৎ—উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সংগঠন আন্দোলনকে পরিচালিত করিতে হইবে। সংঘবদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত ঐক্য এই বিরাট হিন্দুসমাজের মিলনের প্রকৃত ভিত্তি তাহার মূলে জল-সেচন করিতে হইবে। প্রয়োজনের বন্ধনকে নাড়ীর টানে রূপান্তরিত করিতে হইবে। হিন্দুর পরাধীনতার বহু শতাব্দীর মধ্যে খুব অল্পস্থলেই আমরা প্রয়োজন-প্রণোদিত সংঘবদ্ধতার দৃষ্টান্ত পাই—বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেও হিন্দুর সংহতি-শক্তির পূর্ণ স্ফুরণ কদাচিৎ ঘটিয়াছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক অবসাদের যুগগুলিতেও হিন্দুর সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধ পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় ছিল—ইহাই তাহার সমাজসংহতি ও আধ্যাত্মিক সত্তাকে প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। অসংখ্য রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন, মাৎস্য-ন্যায়ের প্রাদুর্ভাব, বর্গীর হাঙ্গামা ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রবল বিপর্য্যয়েও তাহার এই মূলগত ঐক্য বিধ্বস্ত ও উন্মূলিত হয় নাই। পক্ষান্তরে আধুনিক যুগেও পল্লীসমাজে প্রয়োজনমূলক সহযোগিতার উদাহরণ একেবারে বিরল নহে। কাহারও ঘরে আগুন লাগিলে কতক আত্মরক্ষা, কতক পরোপকার-প্রবৃত্তির তাগিদে পাড়া-পড়শীরা আগুন নিবাইতে সমবেত হয়। কৃষি-কার্য্যের ব্যাপারেও অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ চাষীরা নিজ একক শক্তির অপ্রাচুর্য্য বুঝিয়া একটা সাময়িক সমবায়-সমিতি গঠন করে। কিন্তু এই বাধ্যতামূলক সহকর্ম্মিতাকে ভিত্তি করিয়া সত্যিকার প্রতিবেশী-সুলভ সহৃদয়তা ত গড়িয়া উঠে না। কাজেই মনে হয় যে শুধু বাহিরের প্রয়োজনের উপর নির্ভর না করিয়া হৃদয়ের যে গভীর স্তরে স্নেহপ্রীতি সৌহার্দ্য সমাজসেবা প্রভৃতি বৃত্তিগুলির মূল প্রসারিত সেইখান পর্য্যন্ত আমাদের আবেদন পৌঁছাইতে না পারিলে স্থায়ী ফললাভের আশা করা যায় না। হিন্দুর ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনধারাও এই সত্য সমর্থন করে।

(৩)

রাজনৈতিক অধঃপতন ও স্বাধীনতালোপের মধ্যে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির অক্ষুণ্ন অস্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে এক অদ্ভুত ঘটনা। গ্রীস, রোম ও মিসরের প্রাচীন সভ্যতা আজ নিশ্চিহ্নভাবে বিলুপ্ত। গ্রীস ও ইটালি এখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করে; কিন্তু তাহাদের জীবনদর্শন ও সাংস্কৃতিক আদর্শ ধরাপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া গিয়াছে। আধুনিক গ্রীস ও ইটালির অধিবাসীরা তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। গ্রীসে মানবিকতার যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-বিকাশ ও সুসমঞ্জস পরিণতির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনাদর্শ গৃহীত হইয়াছিল, রোমে যে দৃপ্ত

তেজস্বিতা ও অনমনীয় কর্ত্তব্যবোধ ও ন্যায়পরতা জীবনযাত্রার মেরুদণ্ড ছিল, তাহাদের আধুনিক বংশধরের রক্তধারায় তাহাদের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য। কেবল ভারতবর্ষেই প্রাচীন আদর্শ এখনও জীবনের উপর ক্রিয়াশীল—এখনও কেবল তাহা শুষ্ক গবেষণার বিষয়ে পর্য্যবসিত হয় নাই। এই সনাতন আদর্শ এখন রাজ্য-পারচালনা, দেশশাসন প্রভৃতি বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রের এই পরিধি-সঙ্কোচে ইহার জীবনীশক্তি অনেকটা ক্ষীণ হইয়াছে তাহা নিশ্চয়। আজ আর বড় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় না বলিয়াই ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধিনিষেধ ও অন্ধ সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া যান্ত্রিক অচেতনতার সহিত নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। তথাপি সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে ইহা এখনও বাঁচিয়া আছে—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিয়দংশ ছাড়া দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর ইহার প্রভাব এখনও অপ্রতিহত। বিংশ শতাব্দীর হিন্দুর সহিত বেদ-উপনিষদের যুগের হিন্দুর যোগসূত্র এখনও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। আজ যদি কোন ঋষি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন, তিনি বোধ হয় সুদীর্ঘ শতাব্দীপুঞ্জের বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তাঁহার বংশধরকে চিনিতে পারিবেন। এই অঘটন-ঘটন কি করিয়া সম্ভব হইল তাহাই ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

এই অসাধ্য-সাধনের মূলে আছে হিন্দুর সংগঠন-প্রতিভা, তাহার জনশিক্ষা ও আদর্শপ্রচার কার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ্যতার বেড়াজালে আচ্ছন্ন—ইহার মধ্যে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু তথাপি ইহার মূলতত্ত্ব ও প্রেরণা দেশের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্বকে সাধারণ মনের অধিগম্য করিয়া তোলার পিছনে কি অক্লান্ত অধ্যবসায়, কি গভীর লোকচরিত্র-জ্ঞান, কি অদ্ভুত চিত্তরঞ্জিনী শক্তির ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে! ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে সমস্ত দেশ উঠিয়া পড়িয়া এই লোকশিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া, হস্তলিখিত পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ও হিন্দুধর্ম্মের জীবনাদর্শ ও ভক্তিতত্ত্ব সকলের মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত করিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচালী, কথকতা, যাত্রাগান, কীর্ত্তন, কবি প্রভৃতির সহযোগিতায় এই অমৃত-প্রবাহিনী স্রোতস্বতী, অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বাহিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীর ভিতর দিয়া বিতরিত হইয়া, নিতান্ত মূঢ় অশিক্ষিতেরও চিত্ত-ক্ষেত্রকে উর্ব্বর ও সরস করিয়াছে। পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত মিলাইয়া অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আশ্চর্য্যরূপ তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ ও সময়োপযোগিতা জ্ঞানের পরিচয় দেয়। বৈদিক ও উপনিষদ যুগের মানস স্বাধীনতা, উদার মতবাদ ও শিথিল সমাজ-বিন্যাসের সহিত তুলনায় পরবর্ত্তী যুগের প্রস্তর-কঠিন ব্যবস্থা ও অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনে এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার চেষ্টা প্রতিফলিত হইয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম, সাধারণ লোকের আধ্যাত্মিক রুচি ও প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, উপকরণ-বহুল, শিল্প-সৌন্দর্য্যে মনোরম, আতিথেয়তার আমন্ত্রণে সহৃদয়, ভক্তির উচ্ছ্বাসে পূত, সামাজিক মানুষের সুস্থ কামনার আবেগে প্রাণবান শক্তিপূজায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কত অনার্য্য দেবতা যে এই বাস্তব প্রয়োজনের প্রভাবে আর্য্যদেব-মণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছে, কত প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার সুকৌশলে পরিবর্ত্তিত হইয়া যে পৌরাণিক হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করিয়াছে, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। হিন্দু-ধর্ম্ম কোথায়ও অনার্য্য প্রথা ও অনুষ্ঠানকে উচ্ছেদ করে নাই, শোধন করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। যেখানে অন্ধ কুসংস্কার মূঢ় ভক্তির ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে, যেখানে আদিম মানুষ সাপ, গাছ পাথরের নিকট ভীতিমিশ্রিত আরাধনার অর্ঘ্য পৌঁছাইয়া দিয়াছে, সেখানেই হিন্দুধর্ম্ম এই প্রাথমিক, স্বতঃউৎসারিত হৃদয়-বৃত্তিকে নিজ উচ্চতর আদর্শ ও পরিকল্পনার একাঙ্গীভূত করিয়া নিজের বহিঃপ্রসার ও অন্তর-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে। হিমালয়-নিঃসৃত জাহ্নবীর ন্যায় এই হিন্দুধর্ম্ম বেদ-উপনিষদের আধ্যাত্মিক সাধনার তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াও যাত্রাপথে অনেক ক্ষুদ্র অখ্যাত শাখানদীকে কুক্ষীগত করিয়া সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে ও চারিদিকের দৃশ্যাবলীতে এক স্নিগ্ধ শ্যামল শ্রী ও শস্যসম্পদ বিকীর্ণ করিয়াছে।

অবশ্য এই পরিবর্ত্তন-পরম্পরা যে নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির ইতিহাস তাহা দাবী করা যায় না। যে ধর্ম্ম লৌকিক মনোরঞ্জনের কার্য্যে অত্যন্ত ব্যগ্র তাহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি অনিবার্য্য কারণে হ্রাস পায়। বারংবার রূপান্তর-সাধন-প্রক্রিয়ার ফলে ইহার নিগূঢ় গন্ধসার অনেকাংশে ক্ষীণ হয়। যেখানে ধর্ম্মসাধনার উচ্চ ও নিম্ন স্তর পাশাপাশি বর্ত্তমান সেখানে অপ্রতিরোধনীয় মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রায় সকলেরই সাধনামার্গ নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়ে—খাঁটি সোনা অপেক্ষা খাদ মিশানো সোনারই বাজারে বেশী চল্‌তি হয়। নিরাকার, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম অপেক্ষা রূপ ও রংএ গড়া প্রতিমার আকর্ষণ অনেক বেশী—দুরূহ ধ্যান-ধারণার অধিগম্য সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর প্রসন্নহাস্যময়ী, বরাভয়দাত্রী মাতৃমূর্ত্তির অন্তরালে আত্মগোপন করেন। মোহাবেশহীন নিষ্কাম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে 'ধনং দেহি, পুত্রান্ দেহি, যশো দেহি' প্রভৃতি প্রাকৃত মানুষের কাম্যতম আকাঙ্ক্ষা ভগবদারাধনার মন্ত্রের ছদ্মবেশে তাহার গভীরতম হৃদয়-কন্দর হইতে উৎসারিত হয়—প্রবৃত্তি ধর্ম্মের নামাবলী গায়ে দিয়া পরিতৃপ্তির অবাধ ছাড়-পত্র পায়। সমস্ত সজীব ধর্ম্মের একটা নিগূঢ় শক্তিকেন্দ্র আছে—এই শক্তিকেন্দ্রে ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণের উৎস হইতে অধ্যাত্ম-শক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রকার অপব্যাখ্যা, বিকার ও লৌকিক অপকর্ষ হইতে রক্ষা করিয়া ইহার মৌলিক, বিশুদ্ধ প্রেরণাটি অক্ষুণ্ণ রাখেন তাঁহারাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি। এই কেন্দ্রবিকীরিত অধ্যাত্মশক্তি আধারের যোগ্যতা অনুসারে সমাজের সমস্ত স্তরে সক্রিয় হইয়া ইহাকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সমাজ-হিত-তৎপর ও ধর্ম্মের জন্য আত্মবিসর্জ্জনোন্মুখ করে। যখন কোন ধর্ম্মের লৌকিক সংস্করণ ইহার উচ্চতর আদর্শকে অভিভূত করে, যখন মাত্র আচার-নিষ্ঠা ও নির্দ্দেশের নিখুঁত অনুসরণ অধ্যাত্ম স্বচ্ছ দৃষ্টির স্থান অধিকার করে, তখন ইহার শক্তিকেন্দ্রে নূতন শক্তি-সঞ্চার বন্ধ হইয়া যায় ও ইহা dynamic

হইতে static অবস্থায় নামিয়া আইসে। অভ্যস্ত ধর্ম্মসংস্কার, যতই আন্তরিক ও ভক্তিপ্রণোদিত হউক না কেন, নূতন প্রাণশক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না, মূলধন বাড়ায় না। কাজেই ইহার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার মূল উৎসের সহিত সংযোগহীন হইয়া, ক্রমশঃ রিক্ত ও শূন্য হইয়া পড়ে ও কর্ম্মক্ষেত্রে কোন মহৎ আত্মোৎসর্গ ও দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রেরণা যোগায় না। তাই আজ হিন্দু সমাজের শক্তিপূজা কেবল রাজসিক আড়ম্বরে পরিণত হইয়া ইহার আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছে—ইহা ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন না করিয়া কেবল পশুবলির ক্লীব, অক্ষম আত্মপ্রসাদ জাগায়। ইংরেজ-শাসন দৃঢ়ীভূত হইবার পূর্ব্বেকার অরাজকতার যুগে ডাকাতের দল কালীপূজা করিয়া দস্যুবৃত্তির উপযোগী ধর্ম্মোন্মাদ ও সাহস অর্জ্জন করিত—তখনও শক্তিপূজার সহিত শক্তির একটা বিকৃত, অস্বাভাবিক সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু সেই দেবমন্দির আক্রান্ত হইলে মূর্ত্তি রক্ষার জন্য প্রাণ দেওয়ার সঙ্কল্প তাহারা ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা হইতে লাভ করে নাই। অর্থাৎ সমজাতীয় একটী উচ্চ ও অপর একটী নিম্ন শ্রেণীর প্রবৃত্তির মধ্যে দ্বিতীয়টী ধর্ম্মের প্রশ্রয় পাইয়াছে ও প্রথমটী ইহার সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অবশ্য রাজনৈতিক পরাধীনতা ও তজ্জনিত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতা ধর্ম্মের এই অবনতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। তথাপি ইহা নিশ্চিত সত্য যে ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিরই অপচয় না হইলে ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত আচরণের এরূপ অসঙ্গতি ঘটিতে পারিত না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক) (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযামিনীমোহন কর

মল্লিকা। সুবোধবাবু ওঁকে যে কি বলেছেন কে জানে?

প্রতুল। কিছু নাও তো হতে পারে।

মল্লিকা। বিনা কাজে পুলিশের লোকরা কখনও আসে না।

প্রতুল। অন্য কোন কাজ··· খগেন দত্তর প্রবেশ

খগেন। নমস্কার স্যর। আমার নাম খগেন দত্ত।

প্রতুল। নমস্কার। বসুন।

মল্লিকা। আমায় চিনতে পারছেন খগেনবাবু?

খগেন। মিস্ বসু! আপনাকে এখানে দেখব আশা করিনি।

মল্লিকা। আমি তো পুলিশের লোক নই। বিনা কাজেও অনেক সময় লোকদের বাড়ী যাই। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কাজে—

খগেন। এমন কিছু কাজ নয়। নিরঞ্জনের প্রবেশ

প্রতুল। খগেনবাবু, ইনি আমার বন্ধু ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত। নিরঞ্জন, ইনি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর খগেন দত্ত।

নিরঞ্জন। নমস্কার। আপনাকে দেখে পুলিশের লোক বলে মনে হয় না।

মল্লিকা। ঐখানেই তো মুস্কিল ডাক্তার গুপ্ত। ওর কথাবার্ত্তা চেহারার চেয়েও মোলায়েম, কিন্তু···

খগেন। (মল্লিকার কথা যেন শুনতে পায়নি এই ভাবে) নমস্কার ডাক্তার গুপ্ত। গ্ল্যাড টু মীট ইউ।

নিরঞ্জন। (মাইক্রস্কোপে একটা স্লাইড দিয়ে দেখতে দেখতে) কিছু মনে করবেন না খগেনবাবু আমি একটু কাজে ব্যস্ত ছিলুম—

খগেন। নট অ্যাট অল। আপনার কাজের সময় বিরক্ত করতে এলুম বলে ভারী দুঃখিত।

মল্লিকা। কিন্তু লোককে বিরক্ত করাই আপনাদের কাজ। আজ সকালে বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

খগেন। হ্যাঁ। আমি আপনাদের বাড়ী গিছলুম—

মল্লিকা। সেখানে ডাক্তার সুবোধ রায় আপনাকে মিষ্টার চৌধুরীর সম্বন্ধে কিছু বলেন যে জন্য—

খগেন। না, না, আমি সে জন্য আসিনি। মিষ্টার চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন ছিল—

মল্লিকা। এটা কি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলার ভনিতা?

খগেন। না মিস্ বসু, আই ডিড্ নট মীন ইট।

মল্লিকা। ইউ ডিড। যাই হোক, আমি এমনিতেই যাচ্ছিলুম।

প্রতুল। চল, আমি তোমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

মল্লিকা। আপনাকে যেতে হবে না—ইন্সপেক্টরের অমূল্য সময় নষ্ট হবে—

খগেন। আমি বসে আছি। একটু অপেক্ষা করতে কোন আপত্তি নেই।

মল্লিকা। শুনে সুখী হলুম। নমস্কার। নমস্কার, ডাক্তার গুপ্ত।

নিরঞ্জন। নমস্কার, মিস বসু। প্রতুল ও মল্লিকার প্রস্থান

খগেন। (ঘরের চারিধারে দেখে) মিষ্টার চৌধুরীর কেমিষ্ট্রিতে খুব ইণ্টারেষ্ট আছে দেখছি।

নিরঞ্জন। (নিজের কাজ করতে করতে) হ্যাঁ।

খগেন। (নিরঞ্জনের টেবিলের কাছে এসে) এবং ডাক্তারীতেও। ব্লডগ্রুপ টেষ্ট করছেন?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। আপনারও ডাক্তারীতে খুব ইণ্টারেষ্ট আছে দেখছি।

খগেন। যৎসামান্য। (ঘরের কোনে কয়েকটা জারের দিকে দেখিয়ে) অনেক এসিড রয়েছে।

নিরঞ্জন। তা আছে। অনেক কাজে লাগে।

খগেন। মিষ্টার চৌধুরী কোন নতুন রীসার্চ্চে ব্যস্ত আছেন বুঝি? ওঁর কি সাবজেক্ট···

নিরঞ্জন। তাকে প্রশ্ন করলেই জানতে পারবেন। কেন?

খগেন। এমনি, কিউরিওসিটি—মানে কৌতুহলবশতঃ জিজ্ঞেস করছিলুম—

নিরঞ্জন। এমনি প্রশ্ন করাতে আপনার খুব ইণ্টারেষ্ট আছে দেখছি?

খগেন। গোপন করবার কিছু না থাকলে সাধারণত লোকে বিরক্ত হন না।

নিরঞ্জন। কিন্তু কাজের সময় বাজে কথা বললে সাধারণত লোকে বিরক্তই হয়ে থাকেন। প্রতুলের প্রবেশ

প্রতুল। আই অ্যাম সরি, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম। চা আনতে বলব?

খগেন। আজ্ঞে না, ধন্যবাদ। আমি অলরেডী সকাল থেকে তিন কাপ চা খেয়েছি। আপনাদের কাজের সময় বাজে কথা বলে বিরক্ত করব না। সোজা কাজের কথাই পাড়া যাক্। আপনি বহুদিন যাবৎ কলকাতায় ছিলেন না।

প্রতুল। না।

খগেন। আপনি মাস কয়েকের জন্য এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন?

প্রতুল। মাসখানেক হ'ল নিয়েছি। তবে কতদিন থাকব সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না।

খগেন। আমি আপনার ভালর জন্য একটা কথা বলছি। এখানে আব্দুল রেজা বলে আপনার এক চাকর আছে—

প্রতুল। আছে। আমার কোন চাকর থাকাতে পুলিশের আপত্তির কি থাকতে পারে?

খগেন। সে জেল-ফেরত আসামী—

প্রতুল। তাতে কি? আমার কিছু সে চুরি করে নি—

খগেন। সে যে জেল-ফেরত আপনি জানতেন?

প্রতুল। হ্যাঁ, কিন্তু সে জেলে গিছ্‌ল বলেই আর কখনও ভাল হতে পারে না তা আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া এ সব বাজে প্রশ্ন করে আপনার কি লাভ? সবই তো ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে আপনি শুনেছেন।

খগেন। আমি কেবল আমাদের রুটীন ফলো করছি—

প্রতুল। কিন্তু তাতে আমাদের রুটীনে বিলক্ষণ বাধা পড়ছে।

খগেন। এর কোন পুরোনো বন্ধুবান্ধব দেখা টেখা করতে আসে কি?

প্রতুল। জানি না। চাকরদের সম্বন্ধে এত বেশী কৌতুহল আমার নেই। দরকার মনে হলে এসব কথা তাকেই জিজ্ঞেস করবেন।

খগেন। (একটা ছবি পকেট থেকে বার করে) এই লোকটা কি কখনও এখানে আসে?

প্রতুল। (ছবি হাতে নিয়ে) জানি না। দেখি নি।

খগেন। তা হলে ঠিক আছে। রেজার ও এক পুরোনো সাথী।

প্রতুল ছবিটার এক কোন ধরে সন্তর্পণে খগেনের হাতে দিল

প্রতুল। ছবিটা খুব সাবধানে একটা কোনে ধরুন।

খগেন। (বিস্মিত ভাব দেখিয়ে) কেন?

প্রতুল। আমার আঙ্গুলের ছাপ পড়েছে। নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

খগেন। আঙ্গুলের ছাপ!

প্রতুল। আজ্ঞে হ্যাঁ। যে জন্য আপনি কষ্ট করে অধীনের কুটীরে পদার্পণ করেছেন এবং এতক্ষণ এত কষ্ট করে অবান্তর কথা কয়েছেন।

খগেন। না, না, এ কি বলছেন। এই আমি মুছে দিচ্ছি।

সন্তর্পণে ছবির ওপর দিয়ে রুমাল বুলোলে যাতে ছাপ মিটে না যায়

প্রতুল। দেখবেন ছবিতে যেন রুমাল না ঠেকে। খগেনবাবু, আপনারা কি মনে করেন যাঁরা পুলিশে কাজ করেন তাঁরাই কেবল বুদ্ধিমান।

খগেন। সব সময় তা মনে করলে ঠকতে হয়।

ছবি কাগজে মুড়ে পকেটে রাখলে

প্রতুল। আমার আঙ্গুলের ছাপে আপনার কি প্রয়োজন জানতে পারি কি?

খগেন। এ কথা বলছেন কেন স্যর?

প্রতুল। ডাক্তার রায়ের কথায় আপনি এখানে এসেছেন তা কি আপনি অস্বীকার করছেন?

খগেন। না। তবে এসেছিলুম রেজার উদ্দেশ্যে।

প্রতুল। কিন্তু রেজার সঙ্গে দেখা না করে আমার সঙ্গে দেখা করাই অধিক প্রয়োজন মনে করলেন—

খগেন। মানে আপনি যখন বললেন সে সুধরে গেছে তখন আর তার সঙ্গে দেখা করা দরকার মনে করলুম না।

প্রতুল। ওঃ আই সী। তবু একবার তার সঙ্গে দেখা করুন। নিজের মনের সন্দেহ ভঞ্জন করে নেওয়া ভাল। এও একটা অফিশিয়াল রুটীন বই তো নয়। (কলিং বেল টিপল)

খগেন। আপনি যখন কলকাতা থেকে যাবেন রেজাকেও কি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?

প্রতুল। না টেম্পরারী কাজ। আমার এক এক্সপেরিমেণ্টে ও সাহায্য করতে ভলাণ্টিয়ার করেছে—অবশ্য এ সব কথাই আপনি জানেন।

খগেন। একটু আধটু শুনেছি বটে— রেজার প্রবেশ

রেজা। আমাকে ডাকলেন স্যর।

প্রতুল। হ্যাঁ, খগেনবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

রেজা। কেন?

খগেন। প্রতুলবাবুর কাছে এসেছিলুম, তোমাকেও দেখে গেলুম।

রেজা। আমার বিরুদ্ধে কিছু—

খগেন। না, না। মিষ্টার চৌধুরীর মুখে শুনলুম তুমি এখন ভাল হয়েছ। আচ্ছা, আমি চলি। নমস্কার।

প্রতুল। নমস্কার। রেজা,ওকে পৌঁছে দাও। খগেন ও রেজার প্রস্থান

নিরঞ্জন। লোকটি অত্যন্ত ধড়িবাজ।

প্রতুল। তাইতো মনে হলো।

নিরঞ্জন। রেজাকে দেখতে আসা একটা ছল মাত্র।

প্রতুল। সে তো বটেই। এ ডাক্তার সুবোধ রায়ের কীর্ত্তি। ওদের সন্দেহ—

নিরঞ্জন। নিজের চোখে দেখে ভঞ্জন করতে এসেছিল। তোমার সম্বন্ধে একটু বেশী আগ্রহ—

প্রতুল। নিবৃত্তি হয়ে গেছে বলেই তো মনে হয়।

নিরঞ্জন। কোথাও কোন ভুল চুক চলবে না।

প্রতুল। তা জানি, সেই জন্যই আমাকে এত সাবধানে থাকতে হয়।

নিরঞ্জন। ও লোকটা সাধারণ পুলিশের চেয়ে বুদ্ধিমান।

প্রতুল। ভয়ের কোন কারণ দেখি না। টেষ্ট কমপ্লীট করেছ?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। রেজাকে দিয়ে চলবে না।

প্রতুল। আর ইউ শিওর?

নিরঞ্জন। তুমি নিজেই দেখ। ফাইনাল স্লাইড ফিট করা আছে।

প্রতুল। (মাইক্রস্কোপে দেখে) তাই তো। এখন উপায়?

নিরঞ্জন। অন্য লোক দেখতে হবে। রেজার প্রবেশ

প্রতুল। রেজা—

রেজা। আজ্ঞে। (একটু পরে ভয়ে ভয়ে) উনি কি আমার খোঁজে এসেছিলেন?

প্রতুল। হ্যাঁ। কিন্তু সেজন্য তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। দেখ রেজা, তোমাকে দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না।

রেজা। কেন হুজুর! উনি এসেছিলেন বলে কি—

প্রতুল। না, সেজন্য নয়। তোমার গ্ল্যাণ্ডে কাজ হবে না।

রেজা। তা হলে আমার—

প্রতুল। তোমার টাকা পাবে। এর জন্য তো তুমি দায়ী নও।

রেজা। আমার স্বাস্থ্যের জন্য—যদি বলেন তো আর একজন লোক আমার হাতে আছে—

প্রতুল। এ সম্বন্ধে পরে কথা বলব—

রেজা। যদি হুকুম দেন তো তাকে আজই নিয়ে আসতে পারি—

প্রতুল। আজ থাক, পরে বলব। তুমি এখন যেতে পার।

রেজার প্রস্থান

নিরঞ্জন। ভারী মুস্কিল হ'ল।

প্রতুল। তাই তো দেখছি। ও খুব ইচ্ছুক ছিল—

নিরঞ্জন। কিন্তু ওকে দিয়ে কাজ একেবারেই চলতে পারে না। অসম্ভব। ক'দিনের মধ্যে দরকার?

প্রতুল। বেশী দিন অপেক্ষা করতে পারব না। একমাস, বড় জোর দেড় মাস—তার বেশী চলবে না।

নিরঞ্জন। তাই তো! ডাক্তার রায় কিন্তু এ কাজে আর হাত দিতে রাজী হবেন না।

প্রতুল। তাই তো মনে হচ্ছে।

নিরঞ্জন। অন্য কোন ভাল সার্জ্জন জানা আছে?

প্রতুল। দু'একজনের নাম জানা আছে। চেষ্টা করে দেখতে হবে।

নিরঞ্জন। যদি তারা রাজী না হয়—

প্রতুল। তবে অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে হবে। বম্বে—

নিরঞ্জন। সেই ভাল। এখানে মিস বসুর জন্য তোমায় বিপদে পড়তে হবে।

প্রতুল। তার কি দোষ।

নিরঞ্জন। তাঁর দোষ না থাকলেও তাঁর জন্য এই বিপদ এই কথা তুমি অস্বীকার করতে পার না। ডাক্তার রায় গণ্ডগোলের সৃষ্টি করলেন হিংসায়—পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল জেলাসী। কিন্তু তার পর পুলিশ ইত্যাদি নিয়ে যা হাঙ্গামা দাঁড়াচ্ছে—প্রতুল, মিস বসুকে তোমার মন থেকে দূর কর। আগেও বলেছি এখনও বলছি দু'নৌকায় পা দিও না। ইট ইজ ডেঞ্জারাস।

প্রতুল। আমার মনে হয় তাকে দিয়ে অনেক কাজ হতে পারে—

নিরঞ্জন। আমার মাথায় তো আসছে না—

প্রতুল। এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে ওকে নিয়ে আমি অন্য দেশে—

নিরঞ্জন। এখন তা অসম্ভব।

প্রতুল। অসম্ভব নাও তো হতে পারে।

নিরঞ্জন। প্রেম, বিবাহ এ সব তোমার সাজে না। তোমার চিরযৌবন, কিন্তু মিস বসু কিছুদিন পরে বৃদ্ধা হয়ে যাবেন, তারপর মৃত্যু—

প্রতুল। যদি সেও বৃদ্ধা না হয়, তারও অনন্ত যৌবন থাকে—

নিরঞ্জন। (কিছুক্ষণ প্রতুলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে) প্রতুল, তুমি কি ক্ষেপে গেছ?

প্রতুল। কেন? আমি কি অসম্ভব কিছু বলেছি?

নিরঞ্জন। তাকেও তুমি তোমার মত করে নেবে?

প্রতুল। হ্যাঁ। এ তো করা যায়—

নিরঞ্জন। তা যায়।

প্রতুল। তা হলে আমাকে আর একা থাকতে হয় না।

নিরঞ্জন। ওঁর ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করবে?

প্রতুল। হ্যাঁ। তাহলে আমার সাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

নিরঞ্জন। তা হয়ত' হবে, কিন্তু তার দাম অনেক বেশী দিতে হবে এবং শেষ অবধি তাকে পাবে না।

প্রতুল। কেন?

নিরঞ্জন। ঐ ঘরের ব্যাপার—ঐ বাথটব—

প্রতুল। এ সব কথা সে জানতে পারবে না।

নিরঞ্জন। যে নারী ভালবাসে তার কাছ থেকে কোন জিনিষ বেশীদিন লুকিয়ে রাখা শক্ত।

প্রতুল। কেন?

নিরঞ্জন। কারণ নারীর ভালবাসার পিছনে ভালবাসার বস্তুকে

সম্পূর্ণরূপে পাবার এবং ধরে রাখবার অদম্য ইচ্ছা থাকে। তা ছাড়া মেয়েদের সাধারণত একটু বেশী কৌতূহল। আরও ভাল করে ভেবে এ কাজে হাত দিও প্রতুল।

প্রতুল। বেশ।

নিরঞ্জন। আগে নিজের মন ঠিক করে নাও। ঝোঁকের বশে প্রথমেই তাঁকে কিছু বলে বস না।

প্রতুল। আমি জানি সে রাজী হবে…

নিরঞ্জন। আমিও তাই মনে করি। তবু ভাল করে ভেবে দেখো। (হাতঘড়ি দেখে) এইবার তোমার ওষুধটা খাবার সময় হয়েছে।

প্রতুল বাক্স খুলে একটা ওষুধ বার করে গেলাসে ঢাললে

নিরঞ্জন। তোমাকে পরীক্ষা করা এখনও আমার বাকী আছে।

প্রতুল। (ওষুধ খেয়ে) হ্যাঁ, পরীক্ষাটা শেষ করে ফেল।

নিরঞ্জন। মিস বসুকেও এই ওষুধ খেতে হবে। রেডিয়াম মিশ্রিত—এর এফেক্‌ট আছে তো!

প্রতুল। এর খারাপ এফেক্ট আমি শোধন করে নিয়েছি।

নিরঞ্জন। সেইটাই তো এই কাজের সফলতার গোড়াকার কথা। কিন্তু এর রিফালজেন্স—তাকে তো জয় করতে পার নি।

প্রতুল। সময়ে তাও করব।

নিরঞ্জন। তুমি যে তা পারবে তা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এখন? প্রতুল জান, তোমার চোখের মধ্যে দিয়ে যেন আগুন বেরোয়—

প্রতুল। জানি…(একটু থেমে) মিলিও দেখেছে।

নিরঞ্জন। এবং শুধু চোখ নয়—শরীর দিয়েও—

প্রতুল। (তীব্রভাবে) আলোতে তা দেখা যায় না। আমি অন্ধকারে কখনও কারো সামনে বার হই না।

নিরঞ্জন। কিন্তু তিনি—যদি তাঁকে বিবাহ কর, তাকে নিয়ে ঘর কর—তখন তিনি দেখতে পাবেন—

প্রতুল। সেদিন তার কাছে আমার গোপনীয় কিছু থাকবে না।

নিরঞ্জন। তা হয় ত' থাকবে না।

প্রতুল। তবে—

নিরঞ্জন। এখন আমাকে একবার সব আলোগুলি নিভিয়ে দিতে হবে।

প্রতুল। কেন?

নিরঞ্জন। অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে তোমার চোখ পরীক্ষা করতে হবে—

প্রতুল। কিন্তু…

নিরঞ্জন। কি?

প্রতুল। অন্ধকার আমি পছন্দ করি না। ভয় হয়—

নিরঞ্জন। এখানে আর কেউ নেই—

প্রতুল। পৃথিবীতে কেউ আমার অন্ধকারের রূপ দেখে, তা আমি চাই না—এমন কি তুমিও নয়!

নিরঞ্জন। আমার কাছে আপত্তি করবার তো তোমার কিছু নেই।

প্রতুল। তা নেই জানি। তবু, তবু—জান নিরঞ্জন, এই আমার একটা সীকরেট, যা আমি জগতের চোখ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই। আমার অন্ধকারের জ্বলন্ত রূপ—হা হা হা— (উচ্চ হাস্য)

নিরঞ্জন। প্রতুল, শান্ত হও, অধীর হোয়ো না—

প্রতুল। না, না, আমি অধীর হইনি—

নিরঞ্জন। বোসো।

প্রতুল। (বসে) আমি ঠিক আছি। আলো নিভিয়ে দাও।

নিরঞ্জন একে একে সব আলো নিভিয়ে দিলে। ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকারে প্রতুলের দেহের নগ্নাংশ—হাত এবং মুখ আগুনের মত জ্বলতে লাগল। যে গেলাসে ওষুধ খেয়েছিল তা থেকে যেন আগুন বেরোতে লাগল।

নিরঞ্জন। আমি দু' মিনিটে আমার কাজ শেষ করে ফেলব। আমার দিকে চাও—

প্রতুল। নিরঞ্জন দেখছ?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। তোমার শরীরের রেডিয়াম—

প্রতুল। এক এক সময় আমার নিজেরই ভয় হয়—

নিরঞ্জন। ওদিকে মন দিও না—

প্রতুল। এ যেন একটা অভিশাপ! মানুষের মধ্যে থেকেও আমি যে মানুষ নয়, তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়।

নিরঞ্জন। প্রতুল সাহস হারিও না। তুমি তো সাধারণ মর-জগতের মানুষ নয়। তুমি অমর!

প্রতুল। এই কি অমরত্ব, না আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত—

দু'হাতে মুখ ঢেকে প্রতুল টেবিলের ওপর মাথা রাখল। মনে হ'ল যেন কাঁদছে। নিরঞ্জন পুত্তলিকাবৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল

(ক্রমশঃ)

সে কথা কহিতে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল

সে কথা কহিতে প্রিয় কত না মাধুরী জাগে,
আঁখির কাজলে-লেখা যে কথা অরুণ রাগে!
যে কথা কহিতে কত সাহসিকা নীপশাখে বাঁধে ঝুলনা,
"বৌ কথা কও" কহে অনিবার, আজিকার নিশি ভুল না।
যে কথা কহিতে নীরবে নিয়ত আশা দোলে অনুরাগে।

যে কথা ভ্রমর কহিতে চাহিয়া চামেলীর কাণে কাণে,
মাধবীকুঞ্জ মঞ্জরি' তোলে গুঞ্জন কলতানে!
যে কথা পাপিয়া কহিতে চাহিয়া "চোখ গেল" বলি' কাঁদে।
যে কথা চকোরী কহিতে না পারি' খুঁজিছে গগনে চাঁদে।
সে কথা কহিতে চিরদিন রাধা কানু পদরেণু মাগে।

১

মহাযুদ্ধ ও বিশ্বসভ্যতা

রায় বাহাদুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ

একটা গল্প আছে, ইংরাজ ফরাসী জার্ম্মান ও রুশ এই চার জাতীয় চারজন পণ্ডিত হস্তী সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে বসলেন। ইংরেজ তার কার্য্যকরী জ্ঞান প্রয়োগ করে লিখলেন, বিভিন্ন কাজে হাতীর ব্যবহার আর্থিক হিসাবে কিরূপ লাভজনক হতে পারে। ফরাসী প্রেমিক পুরুষ—হাতীর প্রণয় ব্যাপার হল তার প্রবন্ধের বিষয়। পেটুক জার্ম্মান ঐ বিশাল জন্তুর প্রচণ্ড পরিপাকক্রিয়া নিয়ে গভীর গবেষণা সুরু করলেন। আর মনীষী রুশ হঠাৎ এক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করলেন—হাতী আছে কি? মায়া নয় ত? মানবসভ্যতার ওপর সংগ্রাম ও শান্তির দূরপ্রসারী ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে, আমরা যদি স্ব স্ব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে কেবলমাত্র জয় পরাজয় লাভ ক্ষতিকে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত মানদণ্ডরূপে খাড়া করি, তাহলে ঐ বিজ্ঞ চতুষ্টয়ের মত আমরাও একটা বিরাট হস্তিমূর্খতার পরিচয় দেব—যে সব কঠিন সমস্যা মানবজাতির সামনে এসে দেখা দিয়েছে তার কোনটিরই সুচারু মীমাংসা করতে পারবো না। কেন না, আজকের ঘনঘটাচ্ছন্ন জগতের বিপুল অসি-ঝঞ্ঝনা মানবাত্মার গভীর তীব্র আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি—তার মর্ম্মক্ষতে প্রলেপ দিয়ে দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে হলে শুধু যুদ্ধ জয় করলেই চলবে না, শান্তিকেও জয় করতে হবে।

জগতে যুদ্ধ কিছু নূতন নয়, অনন্তকাল ধরে চলে এসেছে দেবাসুরের সংগ্রাম। এ কথাও হয়ত সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত যে প্রাণীজগতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ জীবনতত্ত্বের একটা নির্ম্মম প্রয়োজন। ঐ জীবনযজ্ঞে কত প্রাণী দিয়েছে আত্মবলি, প্রকৃতির রক্তাক্ত নখদংষ্ট্রা মানুষকেও ক্ষত-বিক্ষত করেছে। যে সুসম্বদ্ধ প্রাকৃতিক ধারা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন পূর্ণতার পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছিল, সেই অগ্রগতির প্রধান সহায় হয়েছে—সংগ্রাম। অবনমিত যে, তার বশ্যতাকে ভিত্তি করে মানব-সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে, প্রগতির রথ টেনে নিয়ে চলেছে, অস্পৃশ্য শূদ্র! এ শুধু জাতিভেদজর্জ্জরিত আমাদের দেশের কলঙ্ক নয়, সারা জগতের কুখ্যাতি। দক্ষিণ য়ুরোপ পশ্চিম এসিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনাকীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর রোমান সাম্রাজ্যের সুবিশাল সৌধটি দাঁড়ালো একদিন নির্লজ্জ দর্পের মত,—আর সেদিন তা জগৎবাসীর সশ্রদ্ধ বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছিল, কারু সৌন্দর্য্য শিল্প সাহিত্য আইন শৃঙ্খলার বেদীরূপে। সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে ইসলাম আরোহণ করেছিল সেই দিন, যেদিন তার কাস্তে চাঁদ ও তারার সবুজ পতাকা অসংখ্য জাতির বক্ষপঞ্জরের ওপর মৃদু পবন হিল্লোলে আন্দোলিত হচ্ছিল। কঠোর জীবনসংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে এমনই কত জাতি উঠেছে, আবার পড়েওছে—অনন্তকাল সমুদ্রে বুদ্‌বুদের মত। ইতিহাসের চরম সত্যরূপে কোন জাতি তার প্রভুত্ব ও সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ কালপ্রবাহের ঊর্দ্ধে স্থায়ী মঞ্চের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় নি। বরঞ্চ এটাই প্রতিপন্ন হয়েছে জাতির সঙ্গে জাতির দ্বন্দ্ব সভ্যতার ইতিহাসে কখনো শেষ কথা বলে গ্রহণ করা চলে না—কেন না তাহলে মনুষ্য জীবন দেবানুগৃহীত না হয়ে অভিশপ্তই হয়ে উঠবে, হবে দানবের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

মানুষের বিশেষত্ব এই যে সে শুধু পশুর মত অন্ধ সংস্কার ও সংগ্রামের দ্বারাই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয় নি—তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রজ্ঞা, ধী ও উদ্ভাবনী শক্তি। অনেক পশু মানুষ অপেক্ষা বলবান, কিন্তু মানুষ তাদের সকলের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। মানুষের এই শক্তির মূল বাহুবল নয়—প্রজ্ঞাদীপ্ত জ্ঞান, উদ্ভাবনী ও ধীশক্তির প্রভাবে সে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করতে পেরেছে, তাই সে শক্তিমান—উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে, সুখ সমৃদ্ধি ও সভ্যতার উন্নতিসাধন করেছে। তার ধী-শক্তি গতানুগতিক অপরিবর্ত্তনীয় ধারা বয়ে অগ্রসর হয় নি। মাকড়শার জাতিগত সংস্কার তাকে শুধু জাল বুনতে শিখিয়েছে, পাখীর সংস্কার তাকে শিখিয়েছে বাসা বাঁধতে, কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান তাকে তার চিরাচরিত পথ থেকে টেনে এনে নূতন পথের সন্ধান দিয়ে চলেছে—কোথায় গঠনের পথ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইষ্টবৃদ্ধির পথ, বিশাল মানবতার পথ।

কিন্তু সুখস্বাচ্ছন্দ্য মানবতা নয়—বিজ্ঞানের মারণাস্ত্রগুলি ধ্বংসের পথটিও এমন পরিষ্কার বাঁধিয়ে দিয়েছে ও কাজটি মানুষ শুধু নখদন্তের সাহায্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে কখনো পেরে উঠতো না। এ কথা সত্য, মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভার অপপ্রয়োগ করেছে অনেক ক্ষেত্রে—এবং সেই সম্ভাবনা ছিল বলেই ইহুদির ঈশ্বর একদিন তাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। মানুষ যে সে কথায় কর্ণপাত না করে যুগযুগান্তের অভিযান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে চালিয়ে এসেছে, এ তার এক মহান কীর্ত্তি। অধ্যাত্ম সম্পদ থেকে বঞ্চিত, বস্তুতন্ত্রের অবৈধ সন্তান এমনই সব বিতর্ক তুলে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করলে আমাদের একটা অন্ধ গলির মধ্যে প্রবেশ করা হয় মাত্র—মানবের জীবন-কথার মর্ম্ম, তার সভ্যতার স্বরূপ বোঝা যায় না। বস্তুতন্ত্র কি, আর বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কতখানি সে আলোচনা না করলেও এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ইহলোকে মানুষ চায় সুখ, শান্তি, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, অভাব অনটনের হাত থেকে মুক্তি, স্বাধীন জীবনযাপন ও মানসিক স্ফূর্ত্তি—এবং ঐ সব ইষ্ট-সাধনকল্পে বিজ্ঞানের দান অকিঞ্চিৎকর নয়, বরঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলতে হবে।

না জানি এ কেমন বিধিলিপি—বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়েছে আজ রুদ্রবেশে, নটরাজরূপে। তার উদ্দাম তাণ্ডব দক্ষিণে বামে ঊর্দ্ধে অধোদেশে মৃত্যুর উন্মাদনা ছড়িয়ে দিচ্ছে, নৃত্যের ছন্দে রাশি রাশি কঙ্কাল

অট্টহাসি করে উঠছে। নটরাজ কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়, সারা জগতের হলাহল আকণ্ঠ পান করে নিজে হলেন নীলকণ্ঠ, আর জগতকে করেছিলেন নির্বিষ। তেমনই এই প্রলয় নাচনের অবসানে বিশ্বের সমাজকে ও সভ্যতাকে কষিত কাঞ্চনের মত পরিশুদ্ধ দেখতে পাব, নবপ্রবর্ত্তিত বিধান সকল দ্বন্দ্ব বিরোধের অবসান করে মানুষকে সৌভ্রাতৃত্বের স্বেচ্ছাকৃত নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দেবে—এরূপ আশা আমাদের মনে জেগে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ সুখ স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। জগতে যারা শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিচিত আজ হয়ত তারা বিগত মহাযুদ্ধের শোচনীয় পরিণতির কথা ভুলে গেছেন—ভাবতেও পারছেন যে, ক্রুর প্রতিহিংসাকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে, অন্ধ প্রভুশক্তিকে যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়া হয়, যদি কোন বিশ্বজনীন উদার আদর্শের অনুপ্রেরণা জঘন্য আদিম প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে মহাজাতিগুলিকে তুলে ধরতে না পারে, তা হলে এই দ্বন্দ্বের ভৈরবী চক্র কখনো শেষ হবার নয়, ভবিষ্যতে যুদ্ধও একপ্রকার অনিবার্য্য হয়ে উঠবে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে যুদ্ধ শুধু যুদ্ধমান দল বা মুষ্টিমেয় সৈন্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের নিষ্করুণ সর্ব্বধ্বংসকারী আকার ধারণ করেছে। গত পঁচিশ বছর ধরে চিন্তাশীল মনীষিগণ—কি আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র, কি সমাজ ব্যবস্থা—সকল বিষয়ে জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থ বা ত্যাগের ওপর ভিত্তি করে ন্যায়সঙ্গত উদার পন্থা অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির মত পণ্ড হয়ে গেছে। জনগণের অধিনায়ক যারা, যাদের ওপর শাসনভার ন্যস্ত করে দেশের সর্ব্বসাধারণ সকল ভয় ভাবনা, গভীর চিন্তা থেকে নিজেদের নিষ্কৃতি দিয়ে এসেছে, তাদের অদূরদর্শিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা উপর্য্যুপরি যুদ্ধের বীজ বপন করে মানব-সভ্যতাকে ক্রমাগত বিপন্ন করে তুলেছে। তাই আজ বিশ্বমানবের মনে এমনই পরিপ্রশ্ন জেগে উঠেছে: বিজ্ঞানের বজ্র কি সভ্যতার লঙ্কাদহনের জন্য চিরকাল ব্যবহৃত হবে? না, সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থার ফলে চিরন্তন বিরোধের মূলোচ্ছেদ করে মানুষ তার জীবনের আদর্শ সত্যকে বিচিত্র শোভায় পুষ্পিত করে দেবে?

বাঁচবার ইচ্ছা, শক্তিপ্রসারণের চেষ্টা প্রাণধর্ম্ম, কিন্তু মানুষের মধ্যে কতগুলি বিশিষ্ট গুণের বিকাশ হয়েছে যা মানবধর্ম্ম বলা চলে। সত্যের শিবের সুন্দরের আকর্ষণ ক্রমান্বয় মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে এক অখণ্ড পরিপূর্ণতার দিকে—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং—আধুনিক দার্শনিক যার ভিতর Theopsyche বা Dietyর পরিচয় পেয়েছেন। জীবন-দেবতার ঐ কল্পরূপ চিরদিন মানুষকে আদর্শের সন্ধান দিয়েছে—তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানবধর্ম্ম বা Theopsycheর এক মনোরম অভিব্যক্তি, সত্য শিব সুন্দরের বিচিত্র স্ফুরণ। এক হিসাবে এ কথা সত্য যে গণ-মন দেশ-কাল ভেদে পরিবেশের অনুরূপ বিভিন্ন চিন্তাধারার অনুকরণ করে এবং সেজন্য সংস্কৃতির বাহ্যরূপ বিভিন্নই দেখা যায়—কিন্তু ঐ ভেদ বিভেদগুলিকে জাতীয় সভ্যতার মূল প্রকৃতি বলে ধরে নিলে সঙ্কীর্ণ ভ্রমের মধ্যে পড়তে হয়, আর তাই থেকে যত অনর্থের সূত্রপাত। ইতিহাসের যে শিক্ষা সব চেয়ে উদার, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ তা এই যে—সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্বমানবের, ওর ওপর কোন জাতির একাধিপত্য নেই। বাইবেলে আছে—There is no new thing under the sun. Is there a thing whereof it may he said, Sir, this is new? It hath been long ago, in the ages which were before us. প্রাচীন সভ্যতাগুলির সামাজিক চিন্তার ধারা ও পদ্ধতির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে এমন লোকের কাছে এই উক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য সহজে ধরা পড়ে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের উদ্যমে মিশরে যে-সব অমূল্য রত্ন উদ্ধার করা হয়েছে, তার মধ্যে 'মৃতের পুস্তক' (Book of Dead) অন্যতম—আমেন-এম-আপ্‌ট্ (Amen-em-Apt) ও টা-হটেপ (Ptah-hotep) যে সারগর্ভ নীতি-কথার অবতারণা করেছেন তা পড়লে আধুনিক ব্যক্তির মনেও অতিমাত্র বিস্ময় জেগে ওঠে। সুদূর অতীতে প্রাচীন মিশরে সেই যে সভ্যতার দীপ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, উত্তরকালে তা ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, পরে গ্রীসের হাতে এসে পড়েছিল এবং ঐ সভ্যতা পরিশেষে রোমক ও ইসলামিক সভ্যতারূপে পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষেও দেখতে পাই প্রাগ্-আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে আর্য্য সংস্কৃতির মিশ্রণ—এবং ইস্‌লামিক সভ্যতার সংস্পর্শে তার রূপান্তর। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই যে পরিবর্ত্তন এখানে ঘটেছে, তার প্রমাণ উর্দ্দু ভাষায়, কলা-শিল্পে, স্থাপত্যে ও সঙ্গীত-বিদ্যায় বিলক্ষণ পাওয়া যায়। ফলকথা সব দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রাচীন সভ্যতা-সমূহের উত্তরাধিকারী। গ্রীসের O'ympic খেলায় যেমন একজন বাহক ছুটে গিয়ে অন্য বাহককে হাতে মশাল তুলে দিত, সে দিত আবার সেটি অপরকে চালান করে, তেমনই সভ্যতার বর্ত্তিকা পর পর জাতিসমূহের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়েছে, প্রত্যেক জাতি ওর আধারে তেল ঢেলে বহ্নিশিখা অধিকতর সমুজ্জ্বল করেছে।

আমরা ভুল করি এই ভেবে যে সভ্যতা শুধু কতকগুলি আচার, বিচার, বেশভূষা, আর অর্থনৈতিক ও সামাজিক রীতিপদ্ধতি—কিন্তু এগুলি তার বহিরাবরণ, অসার খোলস মাত্র। সভ্যতার সিংহাসন জ্ঞানের ভিত্তির ওপর মানবতার যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মনুষ্যত্ব নেই আছে দুর্নীতি, যেখানে অজ্ঞান জ্ঞানকে আবৃত করে বিদ্যমান, সভ্যতার প্রসার সেখানে সম্ভব নয়। বেশভূষা, ভাষা, ধর্ম্ম, সামাজিক আচারপদ্ধতি যত পৃথক হোক না কেন, একমাত্র মানবতার মিলনক্ষেত্রে জাতীয় সভ্যতাগুলির সমন্বয় ঘটতে পারে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে জাতিমাত্রই নিজের বিশিষ্ট সভ্যতা গর্ব্বে এমনই অন্ধ যে সকল সভ্যতার মধ্যে অনুবিদ্ধ একই সূত্রটি তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়—বহমান নদীস্রোত থেকে জল তুলে এনে স্বতন্ত্র কুম্ভে ভরে রাখে সে তীর্থবারি, যেন ঐ কুম্ভগুলির বিচিত্র গঠনই একমাত্র সত্য, গঙ্গার পুণ্যোদক যে সব ঘটেই পবিত্র এই সহজ কথাটি তার মনেও জাগে না।

যুগযুগান্ত ধরে সভ্যতার প্রবাহ স্রোতস্বিনী নদীর মত অনবরত বয়ে চলেছে। ওর দুকূল প্লাবিনী বারিরাশি কত মাঠ, কত গ্রাম, কত নগর, কত প্রান্তর অতিক্রম করে যেখানকার যা—কঙ্কর, বালু, কর্দ্দম, সব সংগ্রহ করে এগিয়েছে—সকলেই ওর বক্ষে তরী ভাসিয়েছে, দেখেছে ওর জলে

প্রতিফলিত চাঁদের ঝিকিমিকি, ভেবেছে ও তাদের নিজস্ব সম্পদ—আর উল্লাসভরে গান গেয়ে উঠেছে,

'এত স্নিগ্ধ নদী কাহার
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় ।'

ক্ষুদ্র জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে সভ্যতাকে এমনি করে আটক করে মানুষ চিরদিন ঘোরতর অনিষ্ট বাধিয়ে এসেছে, ইতিহাসের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় আমরা তার পরিচয় পাই। উন্নত সভ্যতা গর্ব্বে এক জাতি চায় অন্য জাতিকে পদানত করে রাখতে, তার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে নিজেকে নানামতে সমৃদ্ধ করে তুলতে। ঐ সভ্যতার প্রেতমূর্ত্তি একদিন মানুষকে ক্রীতদাসরূপে হাটে বাজারে বিক্রয় করতেও লজ্জাবোধ করে নি। কিন্তু সত্য একদিন জাগ্রত হয়ে উঠলো—ঐ দাস-প্রথা বন্ধ করবার জন্য আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বেধেছিল, সে বেশী দিনের কথা নয়। তেমনই আজ যদি শৃঙ্খলিত মানবের মর্ম্মব্যথা সার্ব্বজনীন বিবেককে ঘা দিয়ে ঐ দুর্নীতির মুখোস উদ্‌ঘাটন করে, সর্ব্বজাতির সহযোগিতার ফলে সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ঘটে, তা হলে এই মহাযুদ্ধ অনাগত মানবের কাছে সত্যকার ধর্ম্মযুদ্ধরূপে দেখা দেবে। কেন না, যে সঙ্কীর্ণ দেশাত্মবোধের নামে জাতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে এসেছে, দুর্ব্বলের স্বাধীনতার ওপর সবলের হস্তক্ষেপ নির্ব্বিরোধে চলেছে, সাহচর্য্য ও সহযোগিতার স্থলে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব ভাগ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে—ঐ স্বার্থদুষ্ট অনিষ্টকর ব্যবস্থাগুলির আমূল পরিবর্ত্তন করে ন্যায়ানুগ নূতন বিধানের প্রতিষ্ঠা হবে মানব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পরিণতি, সভ্যতা বৃক্ষের অম্লান পারিজাত। সৌভাগ্যক্রমে আজ প্রচলিত রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির কুফল চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন—তাই মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কারণ বোধকরি তেমন নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটি ভুললে চলবে না যে মানুষ স্বভাবত রক্ষণপন্থী, সূচ্যগ্র মেদিনীও সে কখনো বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেয় নি এবং তার ঐ মূলগত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন একেবারে অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য ব্যাপার সন্দেহ নেই।

দেশ-কাল ভেদে সংস্কৃতির রূপ যা-ই হোক, মানব-সভ্যতাকে বিশ্ব-জনীন করে তুলতে হলে কোন জাতিকে স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে স্বর্ণ বা লৌহ পিঞ্জরে বন্ধ রাখলে চলে না—কারণ স্বাধীনতার সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ প্রগাঢ় ও গভীর। সভ্যতার সম্যক স্ফূর্ত্তি স্বাধীন পরিবেষ্টনীর মধ্যে, তেমনই পরাধীন জাতি বিশ্ব-সভ্যতার অন্তরায়স্বরূপ জগতের সর্ব্বমুখী অগ্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়ায়। দেশ কালের ব্যবধানকে হ্রাস করে পৃথিবী আজ গোষ্পদের মত ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে—জাতির সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ এখন জ্ঞাতিত্বেরই নামান্তর। আজ যদি ব্যোমচারী মঙ্গল গ্রহের কোন দিব্য অধিবাসী পৃথিবীর এই স্বার্থসম্ভূত জাতিবিরোধ, আত্মঘাতী ধ্বংসকাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করতেন, তাহলে তাঁর মনে হয়ত এই ভাব জেগে উঠতো যে, প্রবৃত্তির তাড়নায় এখানকার লোক শুধু বর্ত্তমান সুযোগ-সুবিধার অন্ধ দাসরূপে নিজেকে পশুভাবাপন্ন করে রেখেছে, অতীতের ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতা ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি কিছুই তার চোখে পড়ে নি—বিজ্ঞান বলে কালের ব্যবধানকে হ্রাস করেছে—সে কালের হাতে পরাজিত হবে বলে। মঙ্গলগ্রহের ঐ নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হয়ত আরও আশ্চর্য্য হত এই ভেবে যে মানুষ চায় জগৎ-শান্তির প্রতিষ্ঠা, অনাগত কালের ওপর আধিপত্য, যা শুধু সম্ভব বিশ্বমানবের মনে একাত্মবোধ জাগ্রত হয়ে উঠলে—কিন্তু সে তার মনের কল-কব্জাগুলিকে ঐ পরম উপলব্ধির উপযোগী করে গড়ে তুলতে এখনো পারে নি; পক্ষান্তরে কৌটিল্য দর্শনের কুটিল মতি-গতি তাকে জগৎশান্তির দিকে নয়, এক বিপদসঙ্কুল পর্ব্বতের ভৃগুস্থানে চোখ বেঁধে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। ইতিহাস বার বার পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছে যে শক্তিলিপ্সা, পরাধীন জাতির ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখবার প্রবৃত্তি বিশ্বশান্তির পরিপন্থী, কিন্তু এ সত্ত্বেও উদার সহনশীলতা, সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টির শোচনীয় অভাব-হেতু বলদৃপ্ত জাতিগুলি শোষণনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের ঘূর্ণাবর্ত্তে হাবুডুবু খেয়ে মরেছে—তাতে দুর্ব্বল জাতি-গুলির ওপর নিষ্পেষণ ও নির্য্যাতন বেড়ে চলেছে যেমন, ঠিক সেই পরিমাণে বিশ্ব-সভ্যতাকেও বিপন্ন করে তোলা হয়েছে। সকল জাতির নীতিধর্ম্মে আছে ব্যক্তিজীবনের একটি মহৎ আদর্শ—ত্যাগ, পরার্থপরতা, সমগ্রের জন্য ব্যষ্টির ক্ষতি স্বীকার। জাতির সঙ্কীর্ণ সীমামধ্যে ঐ নীতির সার্থকতা মেনে নিয়ে যদি বা বলা হয়, "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" —পররাষ্ট্রক্ষেত্রে কিন্তু ঐরূপ কোন উদার মহানুভবতার ছায়াটুকুও পড়ে নি, বরঞ্চ দস্যুতা, পরস্বাপহরণ, ছল, কপটতা, মিথ্যাচার প্রভৃতি নীতি-বিগর্হিত কার্য্যগুলি রাজনৈতিক যাদুদণ্ডের স্পর্শে দেশ-প্রেমের মায়ামৃগে রূপান্তরিত হয়েছে—নব জাগরিত জাতিগুলিকে যা নিরন্তর প্রলুব্ধ করেছে এক ভ্রান্ত আদর্শের অনুসরণ করতে। এই বিস্ময়কর নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ খুঁজতে হয়ত অধিক দূর যেতে হবে না, এটুকু বললে যথেষ্ট হবে, আন্তর্জাতিক বিশ্বস্বার্থের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলবার মত, ওর মধ্যে জাতীয় স্বার্থকে বিলিয়ে দিয়ে বিশ্বমানবকে পূর্ণতর করে তুলবার মত ত্যাগ-বুদ্ধি শক্তির উপাসক, পরস্বলোলুপ, অর্থগৃধ্নু জাতি-গুলির মনে এখনো দেখা দেয় নি—যদিও এ এক পরম সত্য যে নীতিধর্ম্মে যাকে বলা হয় ত্যাগ, রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাই হয়ে ওঠে বুদ্ধি-দীপ্ত স্বার্থ—**Enlightened self interest**—কেন না, কালের আবর্ত্তনে পরার্থপরতা অনুকূল স্বার্থে পরিণত হয় আশ্চর্য্যরূপে।

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি গুটিপোকার মত নিজের চারিধারে জাল বুনে আপন ফাঁদে আটকে গেছে, শুধু তা কেটে বেরিয়ে এলেই সমস্যার সমাধান হবে না—সুতোগুলির জট ছাড়িয়ে শিল্পীর নিপুণ হস্তে বোনা রেশমী কাপড়ের ওপর বিচিত্র নমুনা ফুটিয়ে তুলতে হবে। এই মহান্ আদর্শ—জাতির ও বিশ্বসমাজের যুগপৎ হিতসাধন—কার্য্যকরী হতে পারে শুধু জাতিগুলির পরস্পর সাহচর্য্য ও সহযোগিতার ফলে এবং আমাদের ঐ সমবেত চেষ্টায় হয়ত জগতে একদিন বিভিন্ন সংস্কৃতির মনোরম উদ্যান রচিত হয়ে উঠবে। হয়ত এ স্বপ্ন, হয়ত বা মায়া—না হয় মতিভ্রম। কিন্তু তবু বলবো বিশ্ব-সভ্যতাকে মহাযুদ্ধের ধ্বংস-স্তূপ

থেকে উদ্ধার করে প্রগতির সোপানে চড়িয়ে দিতে হলে, পৃথিবী ও বিশ্ব-মানবের একত্ব—Wendoll Wilkie যা তার O..e World বই-এতে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন—জগতের অখণ্ড সমগ্রতাকে সকল রাষ্ট্রিক আচার ব্যবহার, ধ্যানধারণা ও কার্য্যকলাপের মধ্যে পরম সত্যরূপে গ্রহণ না করে মানুষের উপায় নেই। তাই আজ পৃথিবীতে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের—যা মানব-সভ্যতার প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে। ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে মনুষ্য জাতির সর্ব্ববিধ সঙ্গত স্বাধীনতা রক্ষা করা—চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা, অভাব-মুক্তির স্বাধীনতা, ধর্ম্মের স্বাধীনতা, দেশ-শাসনের স্বাধীনতা। অধুনা-লুপ্ত জাতি-সংঘ—League of Nati ›nsএর মত ঐ প্রতিষ্ঠান যদি কতিপয় পরাক্রান্ত জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের উপায় মাত্র হয়ে ওঠে, তাহলে ওর কোন সার্থকতা থাকবে না, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় এ শিক্ষা আমাদের হয়ে গেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে যেমন রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে খর্ব্ব হতে হয়, তেমনই বিভিন্ন জাতিগুলি যখন রাষ্ট্র-স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক বিধানের মধ্যে সংযত করে রাখবে, যখন দুর্ব্বল সবল, কৃষ্ণ শ্বেত পীত সকল জাতির পরস্পরের মধ্যে স্বার্থমূলক বিরোধের মীমাংসার ভার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত হবে, যখন জাতি-চেতনা মহা-জাতি চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে বিশ্ব-সভ্যতার প্রতিভূরূপী মহাজাতিসংঘকে কর্ত্তৃত্ব বলে শক্তিমান করে তুলবে—তখন হবে জাতীয় বিরোধের অবসান, সর্ব্বদেশের সর্ব্বমানবের শ্রীবৃদ্ধি।

বিশ্বসভ্যতা আজ এক কঠিন পরীক্ষাস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে, জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে পারবে কি না—এ সেই অগ্নি-পরীক্ষা। ভাগ্য-বিধাতা জগতকে কোন পথে পরিচালিত করবেন জানি না, কিন্তু পথ-নির্দ্দেশ দেবার ভার যাদের ওপর, সেই সব রাজনৈতিক কর্ণধারগণকে বিশেষভাবে সতর্ক করবার দিন এসেছে। এতকাল তারা শুধু জাতীয় স্বার্থকে পণ করে অক্ষক্রীড়া চালিয়েছেন, সমগ্রভাবে বিশ্বের কল্যাণ ছিল তাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত—নিজেদের ও জগৎকে প্রতারিত করেছেন তারা এই মনে করে যে, বিশ্বমানবের উর্দ্ধে জাতীয় জয়ধ্বজা তুলে ধরা প্রকৃত বাস্তব জ্ঞানের পরিচয়। তাদের ঐ মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তন যদি আজও ঘটে না থাকে, তাহলে জগতের ভাবী অধিবাসীগণকে এর জন্য এক অসম্ভব রকম বৃহৎ মূল্য দান করতে হবে—এমন কি সমগ্র বিশ্ব সভ্যতা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। তাই এই মহা দুর্য্যোগে, ঝঞ্জা-ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক দরিয়ায় বিশ্ব যাত্রী-বাহী নৌকাখানি যাতে বানচাল হয়ে না যায়, সে-জন্য সর্ব্বদেশবাসীকে সজাগ থাকতে হবে, রাজনীতির মোহজাল কাটিয়ে জলদ-গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার দিতে হবে—কাণ্ডারী হুসিয়ার!

"দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুসিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, কার আছে হিম্মত?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।"

রণতাণ্ডব

অধ্যপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

উন্মাদ যুদ্ধের নর্ত্তনে আজ
উদ্দাম পশ্চিমে দৈত্যের সাজ।
দুর্দ্দম লোভী যেন ব্যাঘ্র ভয়াল
ক্ষুধাতুর মেলিয়াছে দংষ্ট্রা করাল।
কম্পিত ধরণীর শঙ্কিত বুক;
নির্দ্দয় নরে তার চূর্ণিছে সুখ।
বহ্নির লেলিহান ধ্বংস-শিখায়
ভস্ম যে গৃহদ্বার শ্মশানের প্রায়।
স্বার্থ ও বিত্তের রাক্ষসী রূপ
শান্তি ও সত্যেরে করে নিশ্চুপ।
ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ সে সৈন্যের দল
হত্যায় রক্তিম করে ধরাতল।

পিষ্টা সে মাতা কাঁদে ক্লিষ্টা অশেষ;
ক্রন্দন করে শিশু ভরি' নভদেশ।
ভগ্ন-ভবন কত শান্ত সুজন
ভিক্ষুক প্রায় করে অশ্রুমোচন।

লুপ্ত রে কৃষ্টির চিত্র শোভন।
ধূল্যবলুণ্ঠিত বিদ্যায়তন।
দীর্ণ ও জীর্ণ রে মন্দির, মঠ;
তৃপ্তি কোথায় ওরে কোথা ছায়া-বট?

আর্ত্তের কে দূরিবে দুঃখ ও শোক?
প্রাণ যায়, গুঁড়া হয়, মর্ত্ত্যের লোক।

প্রেম কই, কৃপা কই, কল্যাণ নাই।
মিত্র সে শত্রু যে, নাহি জ্ঞাতি, ভাই।
প্রীতিস্নেহ লোপ, বন্ধুর লোপ,
হিংসার অগ্নি ও জ্বলে শুধু কোপ।

বিশ্বের স্রষ্টার সৃষ্টিতে আজ
দুঃশীল নরে ছোঁড়ে ধ্বংসের বাজ।
জাগ্রত হও—আর্ত্তত্রাতাস্বরূপ!
ন্যায়ধাতা জাগো ওগো বিশ্বের ভূপ!

মঙ্গল দাও, ওগো, শান্তি অক্ষয়।
শক্তির জয় নয়, সত্যের জয়॥

দেহ ও দেহাতীত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

অমল স্টেসনে নামিবার কিছু পরেই সূর্য্যোদয় হইল। এখান হইতে চার মাইল দূরে—তিনটি মাঠ অতিক্রম করিয়া তবে তাহার বাড়ী। সোজা রাস্তা গিয়াছে, তিন মাইল—মাঠের ভিতর দিয়া একটু রাস্তা সংক্ষেপ করা যাইতে পারে—

সুটকেশটাকে হাতে ঝুলাইয়া সে রওনা দিল—

রাস্তার দু'ধারে গ্রাম, তাহাতে সবে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, রাস্তার উপর ক্ষুধার্ত্ত ঘুঘু ও শালিক খাদ্য অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। ঘাসের উপর রাত্রির সঞ্চিত শিশির তখনও শুকায় নাই—কৃষক গৃহের বধূগণ উঠান ঝাট্ দিতে দিতে সলজ্জ কৌতুহলী দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিতেছে। অমল কোনদিকে না চাহিয়াই চলিয়াছে—

দুঃসংবাদকে মনে মনে সে বড় করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ও বিমর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—যদি বাড়ী যাইয়া দেখে সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে? অমল আর ভাবিতে পারে না, চোখ দুইটি ঝাপসা হইয়া যায়। পথ চলিতে চলিতে হোঁচোট খায়।

রাস্তা ছাড়িয়া অমল মাঠের সোজা পথ ধরিল—গ্রামের সাম্‌নেই দেখা যায় আম বাগান। তাহার ফাঁকে তাহাদের পৈতৃক দালানের এক অংশ দেখা যায়। আম বাগানের পথের উপরে পা দিতেই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, যাইয়া কি দেখিবে কে জানে। স্বল্পান্ধকার ঘরে তাঁহার জীর্ণদেহের পঞ্জরে কি এখনও হৃদপিণ্ডটি ধুকধুক করিয়া চলিতেছে।

সদর উঠানে পা দিয়া অমল দেখিল, বৈশাখের কাঠফাটা রৌদ্রে উঠানের মাটি চৌচির হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। অমল শঙ্কিত হইল, এই বিদীর্ণ পাষাণ মৃত্তিকা ভবিষ্যতের কোন অমঙ্গল সূচিত করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে!

দালানের সামনে একটি রক। ভিতরের উঠানে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, তাহার মা বালিশ হেলান দিয়া সেখানে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস নিক্রান্ত করিয়া দিয়া অমল ভাবিল, যাহা হউক মা বাঁচিয়া আছেন।

সুটকেশটাকে ফেলিয়া, সে মায়ের শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—কেমন আছ মা!

মাতা চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—কি অমল, তুই চলে এলি যে!

—আস্‌বো না, কেমন আছ?

—ভালই, আজ ভাত খেতে বলেছে কিন্তু আজ ত একাদশী; কাল খাবো—এই ত্যাখ বাবা অসুখ হ'লে এই জন্যেই লিখি না।

—কে জল দেয়, পত্তি দেয় বল, না এসে পারি কেমন ক'রে?

—আমার প'ত্তি আর অষুধ দিতে ভগবান আছেন, তোর ভাবনা কি? রাত্রিতে ত ঘুম হয় নি এখন চা খাবি ত?—দাঁড়া।

অমল মাতার দেহটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল—সে কি, তুমি উঠবে নাকি?

—না, না। না উঠলে খাবি কি ক'রে?

—সে কি! দশ বার দিন রোগের পর মানুষ উঠতে পারে নাকি! আমি তৈরী ক'রছি, তুমি ব'সো—

অমল কাপড় জামা ছাড়িয়া, প্যাকাটি দিয়া উনান ধরাইয়া একটি কড়ায় জল তুলিয়া চা তৈয়ারী করিতে লাগিয়া গেল। মা প্রশ্ন করিলেন—দুধ কোথায়?

—দাঁড়াও জোগাড় করি। অমল বাটি চিনি চা প্রভৃতি গোছাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখে কে একটি মেয়ে মায়ের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে—কৈশোর পার হইয়া সবে যৌবনে পদার্পণ করিতে পা বাড়াইয়াছে—বৈশাখের নূতন পাতার মত সজীব সুন্দর। সমস্ত মুখে গ্রামের সরলতা, স্বাস্থ্যের লালিত্য। খুব উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নহে, তবুও গৌর। বয়সের ধর্ম্মে, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে বর্ণ কমনীয়, সুন্দর—সমস্ত দেহ নিটোল মর্ম্মর মূর্ত্তির মত মসৃণ, সুগঠিত। সপ্রতিভ সকৌতুক দৃষ্টিতে তাহার পানে একবার চাহিয়া মাতার আদেশ শুনিতে লাগিল। মা বলিলেন—একটু দুধ এনে দিতে পারিস্ অমলকে?—গৌরী।

গৌরী চলিয়া গেল, অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার গমন ও চলন-ছন্দ দেখিতেছিল—অপর্ণার চলন আভিজাত্যপূর্ণ, এর চলিবার ভঙ্গি সাবলীল, চঞ্চল।

দুধের অপেক্ষা না রাখিয়াই অমল, তিক্ত চা একটু একটু পান করিতেছিল। গৌরী দুধ আনিয়া তাহার সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল। অমল দুধ মিশ্রিত চা লইয়া মায়ের নিকট আসিয়া বসিল—কৌতূহল হইয়াছিল, গ্রামের মেয়েকে সে চিনিল না ইহা কি সম্ভব!

গৌরী দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। মা বলিতেছিলেন—গৌরীকে চিনিস্? ওই মুখুজ্জে বাড়ীর ছোট্‌ঠাকুরপো, মহেশ,

তার মেয়ে। পোষ্টাফিসে চাকুরী করতো কখনও ত বাড়ী আসে নি, এখন পেনসন নিয়ে বাড়ী এসে বসেছে—তার মেয়ে। ওরা ত এ গাঁয়ে আসে নি কখনও, চিন্‌বি কি ক'রে! ওই আমাকে বাঁচিয়েছে, পথ্যি দেওয়া, জল দেওয়া সব করেছে, একটিবারও উঠ্‌তে দেয়নি। এই সকালে এসে বিছানা ক'রে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে। ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন—ওর গুণ আর শোধ দিতে পারবো না—

অমল মনে মনে কৃতজ্ঞ হইল। তাহার নিরুপায় অসহায় রুগ্না মাতাকে যে এমনি অযাচিতভাবে সেবা যত্ন করিয়াছে তাহাকে মনে মনে অমল কৃতজ্ঞতাই জানাইল। তাহার দান ভুলিবার নহে—কিছু বলিবে ভাবিয়া দরজার পানে চাহিল কিন্তু পূর্ব্বে যে শাড়ীর আঁচলটা দেখা যাইতেছিল এখন আর তাহা দেখা যায় না। গৌরী হয়ত চলিয়া গিয়াছে—

মা প্রশ্ন করিলেন—তুই খাবি কোথায়?

—কোথায় আবার খাব? বাড়ীতে—আমি বেঁধে নেব যা হয়।

—তুই কি পারবি? কোনদিন—

—কেন, সেবার তোমার অসুখের সময়ত রেঁধে খেয়েছি—তুমি ভেব না। এখন ঘরে কিছু আছে, না বাজার ক'রবো সেইটে দেখি। কিন্তু আজ কি তুমি কিছুই খাবে না, একটু মিছরির সরবৎ, কি—

—ছিঃ, ও কথা ব'লতে নেই। আজ যে একাদশী। কাল পথ্যি ক'রবো, একদিনে কি হবে?

অমল জানে কোন মতেই মাকে কিছু খাওয়ানো যাইবে না। বৃথা চেষ্টা না করিয়া সে ঘর দোর পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল।

দুপুর বেলায় ক্লান্ত দেহেই সে মায়ের বোগ্‌নোয় করিয়া আলো-চাল ও কিছু আলু বেগুন সিদ্ধ করিবার জন্য উঠাইয়া দিল। মা'কে সযত্নে সে ঘরে রাখিয়া আসিয়াছে, মা হয়ত একটু বিশ্রাম করিতেছেন। উনানের সামনে বসিয়া অমল নানা কথা ভাবিতেছিল—

অমল আপন মনেই হাসিল,—এই তাহার গৃহ, এই তাহার সমাজ, এই জীর্ণ বাড়ী খানার সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্যের অত্যাচার শত চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহার মাঝে ওই অপর্ণার উপস্থিতি ও স্থিতি কেবলমাত্র বেমানানই নয়, হাস্যকরও। অপর্ণা যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও আসে তবে ইহার মধ্যে তাহার স্থান কোথায়? আপনার অসংযত কল্পনা ও বিশৃঙ্খল লুব্ধ প্রকৃতির কথা ভাবিয়া সে আপন মনেই বার বার হাসিতেছিল।

কাঠের উনুন নিভিয়া ধোঁয়া উঠিতেছিল। অমল পুনরায় কিছু কাঠ ও কুটা দিয়া, বহু ফুঁ দিয়া ধরাইয়া দিল।

পাড়ার চক্রবর্ত্তী বাড়ীর খুড়িমা ঝঙ্কার দিয়া অমলের মাতার উদ্দেশ্যে বলিলেন—দিদি, একবেলা কি আমি অমলের ভাত দিতে পারতুম না। অমল হাত পুড়িয়ে খাচ্ছে, সে কি?

মা যেন কি একটা জবাব দিলেন বোঝা গেল না। অমল বলিল—এতে আর কষ্ট কি খুড়ীমা!

—ওমা, পুরুষ ছেলে কি ওই পারে? আচ্ছা দাঁড়া, আমি তরকারি ডাল দিয়ে যাবো'খন।

খুড়ীমা ঘাটে চলিয়া গেলেন। অমল ভাত টিপিয়া দেখিল বেশ নরম হইয়াছে—অর্থাৎ সিদ্ধ হইয়াছে। অমল বেড়ী দিয়া বোগ্‌নো নামাইয়া ফেলিল কিন্তু সরা নাই; কিরূপে এই ভাত হইতে ফেন নিষ্কাষিত করিতে পারা যায় তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হাঁড়িতে সে দু' একবার রাঁধিয়াছে তাহার ফেন নিষ্কাষণ পদ্ধতি সে জানিত, কিন্তু এই বোগ্‌নো হইতে কিরূপে ফেন নির্গত করা সম্ভব। ক্যাজামিয়াঁর রারিকেটের ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে এ সমস্যার সমাধান নাই. নিউটনের ক্যালকুলাসেও নাই। অমল বেড়ীর সাহায্যে একবার এ কাত, আর একবার ও কাত করিয়া দেখিল কিন্তু উত্তপ্ত পাত্র হইতে হয় সবই পড়ে, না হয় কিছুই পড়ে না। অমল একটা সরা লইয়া আসিবে স্থির করিয়া উঠিতে যাইতেছে হঠাৎ দেখে গৌরী একটা খুঁটি হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে—

অমল বিস্মিত লজ্জিত দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া থাকিতেই গৌরী বলিল—আপনি পারবেন না, আমি মাড় গেলে দিচ্ছি।

অমল সাহায্য গ্রহণ করাকে সম্ভবতঃ অপৌরুষেয় মনে করিয়া বলিল—না, আমি পারবো, একটা সরা, না হয় বাটি নিয়ে আসি।

গৌরী প্রতিবাদ করিল—বাটি, সরা কিছুই লাগবে না। সরুন—

মা প্রশ্ন করিলেন—কি হ'ল রে গৌরী।

গৌরী জানাইল যে সে ব্যবস্থা করিয়া দিবে। পাত্রের ভাত গুলির দিকে চাহিয়া একটু সকৌতুক হাসির সহিত বলিল—ভাত ত সিদ্ধই হয় নি।

অমল পুনরায় অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—হ'য়েছে, টিপে দেখেছি—

গৌরী আর একবার হাসিয়া উঠিল—অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক এই হাসিটুকু অমলকে যেন এক মুহূর্ত্তে অপ্রস্তুত করিয়া দিল। অমল পুনরায় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিল···হাসছো যে!

—ভাত সিদ্ধ হয় নি।

—না, হয় নি, দেখলাম এত ক'রে।

—কিছুতেই সিদ্ধ হয়নি। কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গৌরী একটা ভাত পরীক্ষা করিয়া বেড়ীর সাহায্যে বোগ্‌নোটা পুনরায় উনুনের উপর চাপাইয়া দিল। অমল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কেবলমাত্র উত্তপ্ত সফেন ভাতই নয়, গৌরীর কৌতুক-উজ্জ্বল কমনীয় সরল মুখখানি। গৌরী অমলের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার কাজ নয়, যান্‌ জেঠিমার কাছে।

অমল অত্যন্ত অপ্রতিভের মত এক পায়ে দুই পায়ে মায়ের ঘরে ফিরিয়া আসিল। অপর্ণা ও রমলাকে সে কথার জালে জড়াইয়া তিরস্কার করিয়াছে, ব্যঙ্গ ক'রিয়াছে কিন্তু কোনদিন এমনি করিয়া পরাজিত হয় নাই—দ্বিধায়, নিজের অক্ষমতায় এমনি অপ্রস্তুত সে কোনদিন হয় নাই অথচ এই ছোট্ট গ্রাম্য মেয়েটি তাহাকে এক নিমেষে অপদার্থ প্রমাণ করিয়া দিল। নিজের অক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াও মানুষ অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয় না, অমলও হইল না বরং মনে মনে এই চঞ্চল মেয়েটির সাবলীল ব্যবহারকে সে সাধুবাদ দিল।

অমলকে দেখিয়া মা বলিলেন—গৌরীই নামিয়ে দেবে, আমার জন্যে এতই ত ক'রেছে; একটু রেঁধে দেওয়া তাও সে পারবে। আর জন্মে নিশ্চয়ই ও আমার কেউ ছিল। নইলে এমনি ক'রে না ব'লতেই ও আমার জন্যে এত করবে কেন? কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল, ক্ষণিক পরে বলিলেন,—ওর বাবা ত দু'পয়সা ক'রেছে, আমরা গরীব, আমার ক'রে এ যত্নআত্তি ক'রতে ও আসবে কেন—ওর বাপ মাও কিছু বলে না, বরং দুবেলা খোঁজ নিতে পাঠায়।

অমল মনে মনে মাতার সাশ্রু নেত্রের নিষ্প্রভ অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাইল—যদি কোন দিন সুযোগ আসে তবে সে ইহার প্রতিদান অবশ্যই দিবে।

কিছুক্ষণ পরে গৌরী আসিয়া জানাইল ভাত হইয়া গিয়াছে। অমল বাহির হইয়া দেখে—সমস্তই প্রস্তুত বেগুন ভাতে, আলু ভাতে মাখা, খুড়িমা তরকারী ডাল দিয়া গিয়াছেন, এমন কি মুখ ধুইবার জল পর্য্যন্ত। অমল এতখানি প্রত্যাশা করে নাই, গৌরীর উদ্দেশ্যে বলিল—এত কি দরকার ছিল? এ সব আমিই ক'রতুম—

গৌরী আবার একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, নমুনা ত দেখলাম।

—আলু বেগুন মাখ্‌তে পারতুম না।

—না, নুনে পুড়তো। সবাই কি সব পারে! গৌরী পুনরায় হাসিল।

এই হাসি ও ব্যঙ্গ গ্রামের একটি মেয়ের পক্ষে প্রগল্‌ভতা। সমালোচকের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে একথা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু এই মেয়েটির মুখে এই হাসি যেন প্রগল্‌ভতা নয়। হাসিলেই গালে টোল দেখা যায় তাই মনে হয় ও সর্ব্বদাই হাসিতেছে—অমল এই ব্যঙ্গ ও প্রগল্‌ভাকে অন্ততঃ অশোভন মনে করিল না।

ক্ষুধার্ত্ত অমল যাহা খাইতেছিল তাহাই অতি সুস্বাদযুক্ত মনে হইতেছিল তবুও ওই মেয়েটিকে জব্দ করিবার জন্যেই বলিল—এ আলু ভাতে ত নুনে পুড়েছে।

—কখখনও নয়।

—নিশ্চয়ই—আমি খাচ্ছি আর তুমি বল্‌বে নুনে পোড়েনি। পুড়েছে—

—মিথ্যাকথা। ওটুকু আন্দাজ আমার আছে।

—মিথ্যাকথা!

—হুঁ। যতই বলেন, আপনার চেয়ে ভাল রাঁধতে পারি। কথাগুলি অতি দ্রুত উচ্চারণ করিয়া সে ততোধিক দ্রুতপায়ে দালানে গিয়া উঠিল। অমল তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল—নারীসুলভ মন্থরগতির ছন্দ আজও তাহার আয়ত্ত হয় নাই, কৈশোরের চঞ্চলতা অতিক্রান্ত-কৈশোরেও রহিয়া গিয়াছে।

আহারান্তে অমল ভাবিতেছিল—এঁটো থালা বাসন কি হইবে, সে উচ্ছিষ্ট কুড়াইতেছিল। ভাবিল এ কাজটি অবশ্যই তাহাকে করিতে হইবে, কিন্তু গৃহ হইতে ক্ষীণকণ্ঠে মাতা বলিলেন—ও রেখে যা অমল।

মা যেরূপভাবে শুইয়া আছেন তাহাতে অমলকে দেখা সম্ভব নয়, গৌরী নিশ্চয়ই তাহাকে বলিয়াছে। অমল তবুও বলিল—না পারবো মা, এ আমি খুব পারি—

গৌরী আবার আসিয়া বলিল—থাক্‌ হ'য়েছে। ওতে এঁটো লেগে থাক্‌বে যে!

অমলের মনে মনে রাগ হইয়াছিল, বার বার এই মেয়েটি তাহাকে অপদার্থ প্রমাণ করিবেই। অমল গম্ভীরভাবে বলিল—থাক্‌বে না।

থালা বাটি গোছাইয়া প্রস্তুত হইতেই গৌরী বোগ্‌নোটা দেখাইয়া বলিল—ওটার কি হবে।

অমল সদর্পে সেটাকেও থালার উপর উঠাইয়া লইল। গৌরী এবার একান্তই অশোভন ভাবে হাসিয়া বলিল—ওটা মাজতে তেঁতুল লাগে যে! তাই জানেন না তার—

—তেঁতুল আন্‌ছি।

—দু' হাতই ত এঁটো, তেঁতুল আন্‌বেন কি ক'রে! সব যে এঁটো হ'য়ে যাবে?

অমল পরাজিত হইয়া একান্ত হতাশার সুরে বলিল—তবে কি হবে!

গৌরী একটু হাসিতে অমলকে একেবারে পরাজিত করিয়া দিয়া সাজানো বাসন লইয়া ঘাটে চলিয়া গেল। অমল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিয়া দেখিল,—এই মেয়েটি যে বার বার তাহাকে অপ্রতিভ করিয়া দিয়াছে তবুও সে দুঃখিত হয় নাই কেন!

মায়ের ঘরে বসিয়া অমল প্রশ্ন করিতেছিল—তুমি কাল কি দিয়ে ভাত খাবে?

মা কিছুই বলেন না, বারবার কেবল বলেন—আমাদের আবার কি লাগ্‌বে। অবশেষে অমলের জিদে বলিলেন—বেতাগের ঝোল ও হিঞ্চে শাক ভাতে তিনি পছন্দ করেন।

অমল বেলা পড়িতেই দাও লইয়া বাহির হইয়া পড়িল—বেতাগ সংগ্রহ করা কঠিন হইল না কিন্তু পাঁচটি এঁদো পুকুর ঘুরিয়া কোনমতে কিছু হিঞ্চে শাক জোগাড় করিয়া হৃষ্ট মনেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বারান্দায় সেগুলিকে নামাইয়া রাখিয়া সে সগর্ব্বে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মা কাল আমি তোমার রান্না ক'রে দেব। কেমন?

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, গৃহের মধ্যে অন্ধকার বেশ ঘনীভূত। সেই অন্ধকার হইতে গৌরী টিপ্পনী করিল—আজকার মত আ-সিদ্ধ ভাত ত?

মা ব্যস্ততার সঙ্গে বলিলেন—ভাত কি সিদ্ধ হয়নি রে অমল।

—হুঁ হয়েছিল মা।

ম্যাচ জ্বালাইয়া লণ্ঠন ধরাইতে ধরাইতে গৌরী বলিল—না জেঠিমা, একেবারে কাঁচা চাল, আমি শেষে সিদ্ধ ক'রে দি। ফেন গাল্‌তে ত ভেবেই অস্থির—

মাতা তাহার রুগ্ন মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া বলিলেন—ও কি রেঁধেছে যে পারবে—

গৌরী মুখ টিপিয়া বলিল—সে কথা স্বীকার ক'রলেই ত হয়।

অমল ছেলেমানুষের মত বলিয়া উঠিল—ও মেয়েলি কাজ কে না পারে!

—তাই ত ছিষ্টি এঁটো হচ্ছিল আর কি?

ঘরের কোণে অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ একটি জীর্ণ টেবিল ছিল। গৌরী তাহার উপর লণ্ঠনটা রাখিয়া দিল। অমল প্রশ্ন করিল—শোবো কোন খাটে মা?

গৌরী আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওখানে।

ঘরের বিপরীত দিকে আর একটি খাট ছিল, তাহার উপর শয্যা রচনা করা হইয়া গিয়াছে। অমল দেখিয়া বিস্মিত হইল। মাতা প্রশ্ন করিলেন—রাত্রে কি খাবি?

—ক্ষিধে নেই, কিছু খাবো না।

গৌরী চট্ করিয়া উত্তর দিল—রাঁধার ভয়ে জেঠিমা। মা বলেছে আমাদের বাড়ীতে খেতে।

মা প্রশ্ন করিলেন—তোর মা জানে?

—হ্যাঁ, আমি ব'লনুম দুপুরের কাহিনী, মা ব'ললে কেন খেতে বল্‌লি নি এখানে—

অমল 'কাহিনী' কথাটা ব্যবহারে একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। সে গৌরীকে অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—এবার মার চিঠি কি তোমার লেখা!

মা জবাব দিলেন—হ্যাঁ, ওই লিখেছে। অসুখের কথা লিখতে বারণ করলুম তা শুনলে না।

—তুমি কতদূর পড়েছ?

গৌরী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—কতদূর আবার?

মা বলিলেন—ইস্কুলেই ত পড়েছে, পাঁচ বছর, তার পর বাড়ীতে এসে পড়া বন্ধ হ'য়ে গেছে—কোন্ ক্লাস ত মা?

—ক্লাস সেভেন। জেঠিমা রাত্রি হ'য়ে গেছে, যাই। রাত্রে ডাক্‌তে আস্‌বো?

মা বলিলেন—না আমিই পাঠিয়ে দেব, আবার ডাক্‌তে লাগবে কেন?

গৌরী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে অমল মৃদু লণ্ঠনের আলোকে বসিয়া পত্র লিখিতে ছিল—

অপর্ণা যখন মায়ের কুশল সংবাদ স্বেচ্ছায় জানিতে চাহিয়াছে তখন তাহাকে জানানই উচিত। অপর্ণা এ ব্যস্ততা না দেখাইলেও পারিত; তাহার মায়ের মত কত দুঃস্থ দরিদ্র শীর্ণ রুগ্ন মাতা অসহায় অবস্থায় রোগ শয্যায় কাটায় সে কথা ভাবিবার বা জানিবার অবসর ও ইচ্ছা তাহার না থাকাই সম্ভব। সে ধনী কন্যা, শিক্ষা গর্ব্বে উদ্ধত ও সহানুভূতিহীন হইলেও অশোভন হইত না, কিন্তু তাহার সাহচর্য্যই তাহাকে এই সমবেদনা জানাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ভাষাকে যথেষ্ট সংযত রাখিয়া সে পত্র লিখিয়া ফেলিল। পরিশেষে কেবলমাত্র শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাইয়াই শেষ করিল।

মা প্রশ্ন করিলেন—কি করিস্—অমল?

অমল বলিল—পত্র লিখ্‌ছি ওখানে বন্ধুবান্ধব সকলে তোমার অসুখের জন্য ব্যস্ত আছে, তাদের জানাচ্ছি।

মা ক্ষীণ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—আমার জন্যে? সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়া থাকিবেন—যে দিন অকস্মাৎ বৈধব্য তাহার আশ্র

আকাঙ্ক্ষাকে নির্মম ভাবে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল সেই দিন হইতে অমল বড়-না-হওয়া পর্য্যন্ত কেহ তাহার জন্যে ব্যস্ততা প্রকাশ করে নাই, আজ যদি অমলের বন্ধুরা করিয়া থাকে তবে সে তাহার ভাগ্য। অমলের যদি বন্ধু জুটে তবে সে ও ভাগ্য। মাতা প্রশ্ন করিলেন,—যার কাছে পত্র লিখ্‌লি তার নাম কি ?

অমল মিথ্যা কথা বলিতে পারিল না। মিথ্যা কথা সে প্রয়োজন হইলে বলে, কিন্তু মায়ের সামনে বসিয়া মুখোমুখি মিথ্যা কথা বলা তাহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। সে বলিল—অপর্ণা রায়—

—মেয়ে ?

—হঁ্যা, খুব বড় লোকের মেয়ে, আমার সঙ্গে পড়ে। সে নিজেই আলাপ ক'রলে, তাদের বাড়ীতে নিয়ে তার বাবা মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে।

মা আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া মা বলিলেন—আমরা গরীব তা তিনি জানেন ?

'তিনি জানেন' কথাটা মায়ের মুখে শুনিয়া অমল ব্যথিত হইল—এই সমীহ বিশেষতঃ তাহার মায়ের মুখে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হইল—বার বার কাণের কাছে ওই কথা দুইটি প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাকে যেন বলিতে লাগিল—তোমার দারিদ্র্য ও অক্ষমতা তুমি ভুলিলেও আমি ভুলি নাই—

অমল বলিল—সম্ভবতঃ না।

মা বলিলেন—নিজের অবস্থার কথা গোপন করা পাপ। এবার যেয়ে সব বলবি—

অমল ব্যথিত চিত্তে ভাবিয়া চলিল,—আজ যদি সে ভাল ভাবে পাশ করিয়া অন্ততঃ একটা প্রফেসারীও পায় তবে কি অপর্ণাকে লইয়া এই দৈন্যাহত মাকে লইয়া গৃহরচনা করা যায় না! অপর্ণা কি অন্তর হইতে ঐশ্বর্য্যকে বেশী ভালবাসিবে ? অপর্ণার মধ্যে এই মানসিক সংকীর্ণতা সে ভাবিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

মরণের ঠিক পরে

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কথা-নাট্য

[স্থান—কলিকাতা। কাল—১৯৪৫ খৃঃ অঃ]

খাটের উপরে এক বৃদ্ধ অন্তিম শয্যায় শায়িত ; ঘর ভরা লোক। বৃদ্ধের চার পুত্র, দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র, পাড়ার দুইটি যুবক খাট বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান, সকলের মুখে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার গভীর রেখা। জানালায় মুখ রাখিয়া পুরনারীরা দাঁড়াইয়া আছেন। মস্ত বড় ডাক্তার—বিধান রায় হইবেন—পরীক্ষা করিয়া নিঃশব্দে বাড়ীর ডাক্তারের পানে চাহিলেন। বলিলেন, চলো।

গৃহচিকিৎসক কহিলেন, (খুব নিম্নকণ্ঠে)…টা একবার দিয়ে দেখবো ?

বড় ডাক্তার, (তাচ্ছিল্যভরে) দেখতে পারো।

ভাবটা, কেন আর ! চলিতে চলিতে বলিলেন, ওটা পাবে কি ?

ডা। হ্যাঁ স্যার, বাথগেটে একটামাত্র আছে শুনেছি। আনিয়ে নিয়ে একটা ইঞ্জেকসান দিয়ে দেখি-না। (লিখিলেন)

পাড়ার একটি যুবক বলিল, আমি নিয়ে আসছি এখনই। [প্রস্থান

বড় ডাক্তার। দেখতে পারো। [প্রস্থানোদ্যত

গৃহিণী জানালায় ছিলেন ; জ্যেষ্ঠপুত্র অমরেশের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, অমর, ডাক্তার বাবুদের বল্, আর খুঁড়ে খুঁড়ে কষ্ট যেন না দেন।

বড় ডাক্তার। হ্যাঁ। [প্রস্থান

গৃহিণী ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; সঙ্গে দুই কন্যা ও দুই পুত্র বধূ আসিল। মুমূর্ষু চক্ষু চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, বড় বৌ ! গৃহিণী কাছে গিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইলেন।

মুমূর্ষু অত্যন্ত কষ্টে কহিলেন, বড় বৌ, তুমি আমার মনের কথা বলেছ। আর কোঁড়াখুঁড়ি করতে দিও না। (আর বলিতে পারিলেন না ; হেঁচকি উঠিতে লাগিল। আজ ৮ দিন কেবলই হেঁচকি উঠিতেছে, বিরাম নাই। এখন মনে হইতেছে এই হেঁচকির সঙ্গেই প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবে। গৃহিণী বুকের কাছে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। দুই পুত্রবধূ দুইটি পা, এক কন্যা একটি হাত, অপরা কন্যা পিতার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।)

মুমূর্ষু। সরস্বতী এসে পৌঁছতে পারলো না, না ? তবে আর তার সঙ্গে দেখা হলো না বুঝি।

সরস্বতী কনিষ্ঠা কন্যা। গয়ায় স্বামীর কাছে থাকে। পরশু 'তার' গিয়াছে, এতক্ষণে আসা উচিত ছিল। গৃহিণী বাষ্পাকুলনেত্রে দণ্ডায়মান পুত্রগণের মুখের পানে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিলেন।

মুমূর্ষু। রাণু কৈ। বৌমা, দিদিমণিকে দেখছি না কেন মা ?

পুত্রবধূ। ঘুমুচ্ছে, বাবা।

মুমূর্ষু। তুলে নিয়ে এসো মা ; আমার কাছে বসুক।

পুত্রবধূ চলিয়া গেল।

মুমূর্ষু চক্ষু মেলিয়া অমরেশ, কুমারেশ, অপরেশ, সমরেশ চারি পুত্র ; বীরেশ ধীরেশ দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ; গঙ্গা যমুনা দুই কন্যা, একবার করিয়া সকলকে দেখিয়া লইলেন। তার পর স্ত্রীকে বলিলেন, বড় বৌ, সরস্বতীকে দেখবো বলেই বোধ হয় প্রাণটা এখনও বেরোচ্ছে না। সে কি আসতে পারলে না ?

পুত্রবধূ পৌত্রী রাণুকে লইয়া উপস্থিত হইলে, মুমূর্ষু একটি হাত আস্তে আস্তে তুলিয়া তাহার মাথায় রাখিয়া বলিলেন, দিদিমণি আমি যাচ্ছি ভাই। রাণু কি-যেন বলিতে গেল, বলিতে পারিল না ; কাঁদিয়া উঠিয়া দাদুর বুকের উপরে মুখ রাখিল। এই যাওয়ার কথাটা কয়দিন হইতেই শুনিতেছিল সে।

একজন ঝি দৌড়িয়া আসিয়া খবর দিল, মা, ছোটদিদিমণি এসেছেন গো। বলিতে বলিতেই সরস্বতী ও তাহার স্বামী ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

মুমূর্ষু। সরস্বতী, আমার কাছে আয় ত মা !

সরস্বতী বাপের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। হেঁচকিতে খুবই কষ্ট হইতেছিল, অনেকক্ষণ কথা বাহির হইল না। কিয়ৎ পরে—

বড় বৌ, আমি চললুম। তুমিও বেশি দেরী করো না। তুমিও এসো। তোমায় ছেড়ে কখনও থাকি নি—ষাট বছর এক সঙ্গে—কথা শেষ হইল না।

সুরেশ্বর মিত্র পরিণত বয়সে পত্নী পুত্র কন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যু ধীর শান্তপদে সুখনিদ্রার আবেশে তাঁহাকে চিরশান্তির রাজ্যে লইয়া গেল। তাঁহার গৃহের নাম ছিল, সুখ-নীড়। সকলেই বলিল, ইহাকেই বলে সুখ-মৃত্যু।

২

দিকে দিকে লোক ছুটিল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী ব্যক্তিবৃন্দকে খবর দেওয়া—ফুল, মালা, ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ করা—খই, তামার পয়সা জোগাড় ; কীর্ত্তন-দল ডাকিয়া আনা ; খাট কিনিয়া আনা—মোটর লইয়া, বাইসাইক্ল লইয়া দিকে দিকে লোক ছুটিল। পাড়ার একজন মাতব্বর উপস্থিত ছিলেন, অমরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছাদনের কাপড় আনা হয়েছে ?

না ত !

মাতব্বর। যাও, যাও, ওয়ার্ড কমিটি থেকে পারমিট নিয়ে—কত বাজল ? এঃ, দশটা বেজে গেছে যে ! সব ত বন্ধ হয়ে গেছে।

ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেশ বলিল, তা হোক, কমিটির লোকদের আমি জানি, আমরা যাচ্ছি।

মাতব্বর। শোন বাবা, ঐসঙ্গে তোমাদের অশৌচের কাপড়ের পারমিটও নিয়ে নিও। ঘাটেই ত সেগুলো দরকার হবে কি না।

ধীরেশ। যে আজ্ঞে। [প্রস্থানোদ্যত

মধ্যমপুত্র কুমারেশ বলিল, ধীরু, টাকা—ধীরেশ কহিল, টাকা আমার কাছে অনেক আছে মেজ দা'।

ধীরেশ ও তাহার একজন বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

৩

মাখনবাবু কমিটির মেম্বর ; ধীরেশের সঙ্গে ভাব ছিল। তাহার বাড়ীতে আসিয়া শুনিল, তিনি জনাইয়ে বরযাত্র গিয়াছেন ; কখন ফিরবেন, স্থিরতা নাই ! ১৭ নম্বর গোলাম রব্বানী রোডে অশ্বিনী ঘোষ থাকেন, তিনিও মেম্বর। তাহারা সেই পথ ধরিল। অশ্বিনীবাবু শুইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক হাঁক ডাকের পর উঠিলেন। জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কি চাই ?

ধীরেশ বক্তব্য ব্যক্ত করিল।

অশ্বিনী। ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ এনেছেন ? আনেন্ নি ! চালাকি পেয়েছেন, বটে। আপনাদের বাড়ীতে, সত্যি মড়া মরেছে আমি জানবো কেমন করে ?

ধীরেশ। আমরা মিথ্যে বলে মড়ার কাপড়ের পারমিট্ নিতে এসেছি, এই আপনার মনে হোল ? আমার জ্যাঠামশাই সুরেশ্বর মিত্র—

অশ্বিনী। সুরেশই হোক আর ষাঁড়েশ্বরই হোক্, রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেট না আনলে পারমিট হয় না। সার্টিফিকেট্ নিয়ে কাল সকালে আসবেন ; রাত্রে জ্বালাতন করবেন না, যান্—জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

বন্ধু। চ ভাই, ডাক্তার ত বাড়ীতে রয়েছেনই, একখানা সার্টিফিকেট নিয়ে আসি।

ধীরেশ। (ম্লানমুখে) তাই চল্, উপায় কি আর।

উভয়ে চলিতেছে আবার বাড়ীর দিকে। অপরদিক হইতে দু'জন লোক ব্রীজের কল্ সমস্যা লইয়া তুমুল গলাবাজি করিতে করিতে আসিতেছে।

১। আমার থ্রি হার্টসের ডাকের পরে তোমার নো ট্রাম্প—

২। আরে, আমার হাতে হার্টস যে অষ্টরম্ভা—

তাহারা মৃগেন ও রমেন। এক পাড়ার লোক, সামনাসামনি হইতেই—ধীরু, নলীন, তোমরা ?

ধীরেশ। জ্যাঠামশাই—আর বলিতে হইল না।

মৃগেন ও রমেন। আমরা চট ক'রে দু'টো খেয়ে আসছি, কি বল ? তোমরা যাচ্ছ কোথায় ?—ধীরেশ ব্যাপারটা বিবৃত করিল।

রমেন। অশ্বিনী ঘোষটা ছোটলোকের বেহদ্দ। চামার বললেই হয় ! চলো, চলো, কাছেই বিশ্বেস সাহেবের বাড়ী, পারমিট করিয়ে আনি।

বিশ্বাস সাহেব নৈশভোজন করিতেছিলেন, রমেনকে বলিলেন, রমেন, তোরা ভাই ফরমগুলো লেখ ততক্ষণ, আমি আসছি।

রমেন। (ধীরেশকে) জ্যাঠামশাইয়ের দেহের আচ্ছাদন, ১ খানা, পাঁচ গজ। আর কি কি চাই বলো ত ধীরু।

ধীরেশ। জ্যাঠাইমার থান, ২ খানা ; দুই বৌদির লালপাড় শাড়ী, ৪ খানা ; তিন দিদির ২ খানা করে, শাড়ী ৬ খানা ; রাণুর ৮ হাত শাড়ী, ২ খানা। তারপর দাদাদের কাছা ধুতি ২ খানা ক'রে, আট দু'গুণে ষোলখানা।

রমেন লিখিতে লাগিল। বিশ্বাস সাহেবের প্রবেশ।

বিশ্বাস (সবিস্ময়ে)। ও কি কাণ্ড করছিস রে রমেন। মোটে ত ১৫ গজ পাবি—শবের ৫ গজ ছাড়া।

সকলে। সে কি! কাছা—দোছোট্—মেয়েদের—

বিশ্বাস। সে ত জানি রে। কিন্তু আইনে বরাদ্দ মোটমাট ২০ গজ। এই দেখ্ না। তিনি সার্কুলার, নোটিশ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিলেন।

রমেন। ওতে ত কিছুই হবে না দাদা! কিছুই না! ভালো বিপদ ত দেখি; কিন্তু উপায়?

বিশ্বাস। উপায়—বুঝতেই পারছ!

রমেন ও মৃগেন। ব্ল্যাক্‌মার্কেট্। গভর্ণমেণ্টই ব্ল্যাক্‌মার্কেট ক্রয়েট ও মেনটেন্ করছে; অথচ কাগজে কলমে লম্বা চওড়া বিজ্ঞাপন ঝাড়ছে, ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর—ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার উচ্ছেদ কর। হাম্বাগ্!

বিশ্বাস সাহেব প্রবীণ ব্যক্তি (সুবোধ ও সুধীর)। দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, ভাইরে! যে সময় পড়েছে, যে অবস্থা চলেছে, তা'তে সেই রকম ক'রে মানিয়ে চলতে হবেই ত রে!

রমেন। আহা! তা'না হয় বুঝলুম। কিন্তু এর কোন্‌টা বাদ দেওয়া যায় দাদা, আপনিই বলুন? চার ছেলে, কাছা নেবে না? বিধবা স্ত্রী থান পরবেন না? দু'টি পুত্রবধূ, তারা অশৌচাবস্থায় সৌখীন কাপড় পরে থাকবে? তিনটি মেয়ে—

বিশ্বাস। সবই বুঝিরে ভাই, সবই বুঝি। কিন্তু আইন যে!

রমেন ও মৃগেন। আইনের মাথায় মুড়ো খ্যাংরা মারুন।

বিশ্বাস সাহেব বিশ গজের পারমিট লিখিয়া দিয়া, রমেনকে কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন। রমেন তদুত্তরে কহিল, তা ছাড়া আর উপায় কি! তাই করি গে যাই।

আচ্ছা, ভাই, শুভরাত্রি।

শুভরাত্রি।

৪

পান-বিড়ির দোকানীদের জিজ্ঞাসাবাস করিয়া কাপড়ের দোকানের মালিকের বাড়ীর ঠিকানা পাওয়া গেল। দোকানীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জানা গেল, দোকানীর স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা; দোকানীর মাথার ঠিক নাই, এখন দেখা হইবে না। দোকানের একজন কর্ম্মচারী রিক্সায় চাপাইয়া একটি ধাত্রী লইয়া আসিয়া ইহাদের উদ্দেশ্য জানিয়া লইয়া কহিল, বিশ বচ্ছর চাকরী করছি মশাই; কিন্তু এতটুকু বিশ্বাস করে না! আমাকে চাবী দিলে অক্লেশে আপনাদের কাপড় দিতে পারি; তা' প্রাণ থাকতে চাবী দেবে না। আপনারা বরং একটা কাজ করুন, ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট বেঙ্গল ক্লথ ষ্টোর্সের মালিক নফর বাবুর বাড়ী যান। ভদ্রলোক নিজে হোক্, লোক পাঠিয়ে হোক, আপনাদের যা যা দরকার নিশ্চয়ই দেবেন।

রমেন। তাঁর ঠিকানাটা—

কর্ম্মচারী। ঠিকানা জানিনে, তবে বাড়ীটা জানি। ঐ যে মহানন্দ রোড আছে, জানেন ত! সেইটেতে ঢুকে বাঁ দিকে প্রথম যে রাস্তা, সেইটেতে ঢুকবেন; খানিকটা গিয়ে ফের বাঁ দিকে যে বড় গলি, তারমধ্যে—পয়লা, দোসরা, তেসরা বাড়ী, ডানদিকে। সামনেটা এক তালা, রোয়াকটা ভাঙ্গা—

রমেন। কি নাম বললেন?

কর্ম্মচারী। নফরবাবু—নফর পাড়ুই। নফরবাবু বলে ডাকবেন, তা'হলেই হবে।

রাস্তায় পড়িয়া, ধীরেশ বলিল, আমরা ত প্রায় আড়াই ঘণ্টা বেরিয়েছি, কখন ফিরতে পারা যাবে তার ঠিক নেই, বাড়ীতে ওঁরা আবার আমাদের জন্যে আটকে পড়লেন না ত?

তাহার বন্ধু বলিল, না, না, বেরোতে অনেক দেরী হবে। শ্যামবাজার থেকে তোর পিসীমারা আসবেন, চেতলার মাসীরা, বাদুড়বাগান থেকে তোর বাবা-মা'রা—বেরোতে বারোটা একটা হবেই।

আসল কথা, ধীরেশ খালি পায়ে আর হাঁটিতে পারিতেছে না। মাঝখানে একটা গর্ত্তে পা পড়িয়া মুচড়িয়া গিয়াছিল; আবার এইমাত্র একটা বড় পাথরে ঠোক্কর লাগিয়া মাথাপর্য্যন্ত ঝন্‌ঝন্ করিতেছে; বোধ হয় রক্তও পড়িতেছে। এ সব কথা ত বলা যায় না। তাহার জ্যেঠতাতকে তাহারা দেবতার মত ভক্তি করিত। আলাদা পাড়ায় ভিন্ন গৃহে বাস করিলেও দুইটি পরিবারে অন্তরঙ্গতার আদৌ অভাব ছিল না। একবার একটা আলোর নীচে দাঁড়াইয়া পড়িয়া ধীরেশ দেখিয়া লইল, ডান পায়ের ক'ড়ে আঙুল হইতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে! একটু আইডিন পাইলে, সে আর এখন কোথায় পাওয়া যাইবে! থাক্। নফর পাইড়ুয়ের গৃহের উদ্দেশে চলিতে লাগিল। ব্ল্যাক আউট উঠিয়া গিয়াছে ঠিক! আউট-টা আউট হইয়াছে, ব্ল্যাক্ অক্ষয়রূপে বিদ্যমান।

পাড়ুই মহাশয় ভাঙ্গা রোয়াকে বসিয়া হরিনামের মালা জপিতে-ছিলেন। এতগুলি ব্যক্তির আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, হরিনামের ঝুলিটি বারম্বার মাথায় ঠেকাইয়া, ভাঙ্গা কাঁসরের মত আওয়াজে ডাকিলেন, ভজা! ভজা! ওরে ভজা! ভজারে!

সাড়াও নাই, শব্দও নাই। থাকিবার কথাও নয়। ভজহরি পাড়ুই নফর পাড়ুইয়ের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী। সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছে, ব্যাঙ্কে নগদ একটি লক্ষ তিনটি হাজার টাকা স্থায়ী-জমা আছে। বছরখানেক হইল ভজহরির বিবাহ হইয়াছে। সারাদিন দোকানপাট করিয়া, একটু আগে আসিয়া, কাণে মুখে ভাত গুঁজিয়া শয্যাশ্রয় লইয়াছে; পার্শ্বে সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। কোনও বৃদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিবার সময় এটা নয়। ভজহরি বলিল, আঃ! সপ্তদশী কহিল, চুপ। বুড়া আবার ডাকিতে লাগিল, ভজহরি! ও ভজহরি! বাবা, ক'টি ভদ্রলোক—। ভজহরি বলিল, জ্বালালে বাবা! ভজহরিভার্য্যা কহিল, চুপ ক'রে থাক না তুমি। কিন্তু অনেকটা পথ, নফরপাড়ুই বুড়া হইয়াছে, কোমরে কটীবাত, চোখেও ভাল দেখে না। ভবার্ণবে ভজহরিই ভরসা। লক্ষ টাকার মালিক নফর খট্ খট্ করিতে করিতে ভিতরে উঠিতেছে, একমাত্র ওয়ারিশ ভজহরি স্ত্রীকে বলিল, নিশ্চয় কোথাও মড়া মরেছে। ভজহরি-জায়া কহিল, মরবার আর সময় পায় না মড়ারা। ভজহরি দরজা খুলিল। বাপের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া অন্ধকারে চোখ পাকাইয়া কহিল, চলুন দেখি। পার্মিট আছে ত? আচ্ছা।

ভজহরি ভদ্রলোক, দেরী করিল না বটে কিন্তু দেরী হইয়া গেল।

বাহিরে দণ্ডায়মান লোকগুলি ছটফট্ করিতে লাগিল ; তাহা করা ছাড়া তাহাদের অন্য কাজ ত দেখি না। পাশের বাড়ীর ঘড়িটা বারোটা বাজাইয়া দিল ; বাজাই তাহার কাজ, কে ঠেকাইবে? ধীরেশ মৃগেনের মুখের পানে চাহিয়া বাজাটার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিল। রমেন কিছু কর্কশ-কণ্ঠ, অন্ধকারের পানে চাহিয়া হাঁকিল, নফরবাবু মশাই, আর কত দেরী হবে ?

ভজহরি অদৃশ্যস্থান হইতে ততোধিক কর্কশকণ্ঠে জবাব দিল, দাঁড়ান না মশাই, জামাটা গায়ে দিতে হবে না।

ভজহরির স্ত্রী বলিল, ঘোড়ায় জিন্ কষে এসেছে।

নফর পাড়ুই বৈষ্ণবজনসুলভ কণ্ঠে আগন্তুকদের উদ্দেশে কহিলেন, ঐ যে আসছে।—পুত্রের রুদ্ধদ্বারকক্ষের উদ্দেশে কহিলেন, বাবা ভজ, আর দেরী করো না বাপ।

সেই ঘড়িটায় আবার একটা ঘণ্টা বাজিল।

দোতালার জানালায় নারীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল, বেতারে বার্ত্তা আদান প্রদান হইল কিনা কে জানে। ভজহরি তুফান এক্সপ্রেসের স্পীডে পা চালাইয়া দিল। আর সকলে যেমন তেমন—ধীরেশ সকলের পিছনে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিল। পথে রমেন ভজহরিকে ভজহরি 'বাবু' বলিয়া, এত রাত্রে বিরক্ত করার দরুণ দুঃখপ্রকাশ ও মার্জ্জনাভিক্ষা করিয়া, গোপন কথা জুড়িয়া দিতেই, ভজহরি দাঁড়াইয়া পড়িয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, নফরপাড়ুই চোরা কারবার করে না মশাই। সে সবের দরকার হয়, ঘটি বেটার দোকানে যান্—বলিয়াই ভজহরি ফিরিতে উদ্যত হইল। সপিতা ভজহরি পাড়ুই বাঙ্গাল, ফরিদপুরের আমদানী। বাঙ্গাল্ বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব, গৌরব ও বাহাদুরী অনুভব করে এবং যাহারা বাঙ্গাল্ নয় তাহাদিগকে গায়ে পড়িয়া ঘটি, লোটা ইত্যাদি বলিয়া পরম আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে। পাড়ার কতকগুলা ঘটি-যুবক তাহাকে ঠোকন্ দেবে বলিয়া শাসাইয়াছে। ইহার পর হইতে পাড়ায় সাবধান হইয়াছে। বেপরোয়া ঘটি চালায়। রমেন তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিল, রাগ করেন কেন ভজহরিবাবু, আমাদের দরকার, দরকারই বা বলি কেন, দায়। লোকের বিপদে আপদে উপকার করা ত ভদ্রলোকেরই কাজ ! আপনারা নামকরা ভদ্রলোক !

হঃ, বলিয়া ভজহরি পরমানন্দে আবার পথ চলিতে লাগিল। দোকান অনেকদূর পথ !

ভজহরিবাবু সর্ব্বাগ্রে তালাগুলি পরীক্ষা করিলেন ; পরে পর্য্যবেক্ষণ ; তারওপরে নিরীক্ষণ, সর্ব্বশেষে 'অনুবীক্ষণ' করিয়া, একটির পর একটী তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সুইচ টিপিয়া আলোক প্রজ্বালিত করিলেন। প্রকোষ্ঠে রক্ষিত গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্ গণেশ ঠাকুরের মৃন্ময় ও মাল্যবিভূষিত মূর্ত্তির নিকট দণ্ডায়মান হইয়া অনেক মন্ত্র পাঠ ও অনেকবার নমস্কার প্রণাম ইত্যাদি করিয়া, মিনিটখানেক চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। এই সময় ইহারা চারজনেই দোকানে ঢুকিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, ভজহরি পরম ক্রোধাবিষ্টস্বরে কহিল, আরে মশায়, ভিড় করেন কেন ! একজন আসেন—রমেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আপনি আসেন। রমেন আসিল, অপর সকলে নামিয়া গেল।

ঢং ঢং করিয়া দোকানের ঘড়িতে ২টা বাজিল।

ধীরেশ বলিল, ৮টায় আমরা বেরিয়েছি।

বন্ধু। ৮টা বাজতে ১০ মিনিট দেরী ছিল তখনও।

পারমিটখানাকে সোজা করিয়া, উল্টা করিয়া, কাৎ করিয়া, উপুড় করিয়া, আলোয় ধরিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নাকের সামনে আনিয়া (ঘ্রাণ লইল নাকি ?) দেখিয়া, ভজহরি খাতা বাহির করিল ; দোয়াত টানিয়া, কলম লইয়া, আর একবার শ্রীশ্রীগণেশজীকে দর্শন করিয়া, খাতার সাদা পাতায় "শ্রীশ্রী১০৮ সিদ্ধিদাতা গণপতিদেবের আশীর্ব্বাদাৎ" করতঃ নিম্নকণ্ঠে কহিল,হঃ ! আর কি কি দরকার বলছিলেন যে ! দেখি ফর্দ্দটা।

দেখুন দয়া ক'রে, বলিয়া রমেন বাহিরে গিয়া ধীরেশের নিকট হইতে ফর্দ্দটা লইয়া আসিল। ভজহরিবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া তাহার নির্গমন ও পুনরাগম পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ফর্দ্দ না দেখিয়াই ভজহরি কহিলেন, টালিগঞ্জে এক জায়গায় যেতে পারলে কিন্তু সবই পেতে পারেন।—বলিয়া খাতায় রুল টানিতে মনঃসংযোগ করিলেন। গুটিকয়েক রুল টানিয়া বলিলেন, পড়েন ত, ফর্দ্দয় কি লেখা আছে দেখি।

রমেন। শাড়ী, ১২ জোড়া লাল পাড়।

ভজ। ৩০ টাকা জোড়া—৩৬০৲ তারপর—

রমেন। থান, ১ জোড়া।

ভজ। ২২ টাকা। তিনশ বিরাশি টাকা।

রমেন। কাছা তিনজোড়া—তার মধ্যে পারমিট ১৫ গজে ১ জোড়া—দেড় জোড়া—না, ও এক জোড়াই ধরুন, বাকী ২ জোড়া—২ জোড়া চাই।

ভজ। ২ জোড়া ? ২০ টাকা ক'রে ৪০ টাকা। হলো চারশ বাইশ—চারশ' পঁচিশ ধরেন। টাকা আছে ?

রমেন 'দেখছি' বলিয়া বাহির হইয়া গেল ; ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চারশ' পনেরো টাকা আছে ; দশটাকা কম পড়ছে।

ভজ। আর এই বিশগজের—

মৃগেন বাহির হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, রমেন, বেশী টাকার দরকার হলে বলিস্ আমার পকেটেও শ'খানেক আছে।

ভজহরি। (রাগতভাবে) আঃ, অত চেঁচাচ্ছেন কেন, মশায় ! আমায় শুদ্ধ হাতে দড়ী দেবেন নাকি।—(খাতা লিখিয়া, পারমিট মিলাইয়া, ক্যাসমেমো তৈরী করিয়া)—এই পারমিটের টাকাটা আগে দিন ত দেখি। (টাকা লইয়া বাক্সে রাখিয়া) ঐ চারশ পঁচিশটা দিন। (বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে) আপনারা ভদ্রলোক, দায়ে ঠেকেছেন, এতরাত্রে কোথায় আবার টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ ক'রে বেড়াবেন, আমিই ওটার জোগাড় জাগাড় দেখছি। লোকের দায়ে অদায়েই যদি না করবো—কি বলেন মশায় ? কৈ—টাকাটা ! আঃ এই দিকে একটু সরে এসে গণেন্ না ম'শায়।

রমেন। ভজহরিবাবু, ব্ল্যাক্‌মার্কেট প্রাইসগুলো একটু বেশী বেশী ব্ল্যাক্ হচ্ছে না?

ভজ। (অগ্নিশর্ম্মা হইয়া) ও সব মাল আমার নাকি ম'শায়! তাই ভেবেছেন বুঝি! আপনারা ভদ্রলোক, দায়ে পড়েছেন—কাজ কি মশায়, আপনারা নিজেরা দেখুন গে—(বলিয়া ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দে খাতাপত্রাদি বন্ধ করিতে লাগিল)

রমেন। (অনুশোচনা ভরে) না, না, কথার কথা বলছি বৈ ত নয়। আপনি রাগ করলেন—এই নিন, চারশ' পঁচিশ—

ভজ। (টাকা লইয়া) আমাদের একটি সিকি পয়সাও এতে নেই মশায়। (গণনা করিয়া, নোটগুলো আলোকে পরীক্ষা করিয়া) তা, আপনারা কোন্ ঘাটে যাচ্ছেন?—(বলিয়া সাড়ে বেয়াল্লিশখানা নোট হইতে বারো খানা রমেনের অলক্ষ্যে রমেন অবশ্য দেখিতে পাইল, পকেটে ফেলিল: বাকীগুলো গেঁজেতে পুরিয়া, বলিল) যান্, পারমিটের কাপড়গুলো নিয়ে আপনারা চলে যান্—ওকে দাঁড়িয়ে? বেটা পাহারালা নাকি? (সভয়ে দেখিতে দেখিতে) না, বেটা মুস্কিল-আশান্—এই বেটারাই চোর, বুঝলেন ম'শয়।

মুস্কিল। ইঁয়া পীর—

ভজ। না, না এখানে পীর টীর হবে না; সরে পড়।

মুস্কিল। যাঁহা মুস্কিল, তাঁহা আসান—

ভজ। বেটা জ্বালালে। দিননা ম'শয়, পকেটে একটা ডবল থাকে ত ফেলে দিন্ না, বেটারা পুলিশের স্পাইও হতে পারে।

রমেন। (পয়সা দিয়া) যাও বাবা, যাও।

মৃগেন। তাহ'লে কাপড়গুলো দিন এইবার।

ভজ। (বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া) এই ত বল্লাম মশয়, ঘাটে পৌঁছে দোব। এক কথা কতবার বলবো বলুন তো! কলিকাল কি-না, কারও ভাল— নিন্ মশয়, দোকান বন্ধ করি।—বলিয়া পকেটে রক্ষিত ১২ খানা নোট আর একবার গোপনে পরীক্ষা করিয়া, দোকান হইতে বাহির হইয়া, ঝপাঝপ্ দরজা বন্ধ করিতে লাগিল। ঐ নোটগুলো স্থানবিশেষে কম্‌পেন্সেশান্‌দিতে হইবে, সপ্তদশবর্ষটা বিষম কাল।

রমেন। (হতভম্ব ভাবে) তাহ'লে শানগর ঘাটে?

ভজ। হ হ ম'শয়, হ। যান্ ত দেখি।

৫

বাড়ীতে। কান্নাকাটি থামিয়া গেলেও, থম্‌থমে ভাবটা জাঁকিয়া রহিয়াছে। ধীরেশ প্রভৃতির প্রবেশ।

সকলে। এত দেরী? চারটে বেজে গেছে যে! তোদের জন্যই আমরা বেরোতে পাচ্ছি না।

ধীরেশ। যা কাণ্ড বড়দা'—(জনান্তিকে ঘটনা বিবৃত করিল)

মাতব্বর। কাপড় ঘাটে পৌঁছে দেবে বলেছে ত? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা তাই করে। তাহ'লে আর দেরী নয়। ঠিক পৌঁছে দেবে, কিছু ভাবনা নেই। চল।

বল হরি হরি বোল্।

বল হরি হরি বোল্।

৬

শানগর ঘাট। চিতা জ্বলিতেছে। পুরুষেরা একদিকে, মেয়েরা অন্যদিকে বসিয়া আছে। অনেক লোক—পাড়া খালি করিয়া সব ঘাটে আসিয়াছে। সুরেশ্বর মিত্র পাড়ার মাথা ছিলেন; সকলে ভালবাসিত; তিনিও সকলকে ভালবাসিতেন।

একজন লোক আসিয়া রমেনবাবুর সন্ধান করিতে লাগিল। ধীরেশ তাহার কাছে গিয়া দেখিল, কিন্তু ভজহরি নয়; বলিল, কেন, তাঁকে কি দরকার?

আগন্তুক। তাঁর শ্বশুরবাড়ী থেকে পরবার কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে।

পুঁটলী খুলিয়া দেখা গেল, ভজহরি কথা রক্ষা করিয়াছে।

পাড়ার একজন যুবক কহিল, এই ব্ল্যাক্‌মার্কেটিয়ারদের পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া উচিত।

মাতব্বর। কিন্তু উপকারটা অস্বীকার করবে কি ক'রে বলো ত বাবা! ওরা না থাক্‌লে কি উপায় হত বল দেখি! কৃতজ্ঞতা অস্বীকার মহাপাপ।

এই নীতিবাক্য সকলেরই অনুমোদন লাভ করিল।

রমেন বলিল, দেখা হ'লে থ্যাঙ্ক্‌স্ দোব।

সন্ধ্যামালতী

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

সন্ধ্যামালতী, বলিতে পারিস্ কে তোরে বাসিত ভালো?
দিনের অন্তে সাজাতিস্ তুই কার কুন্তল কালো?
মুখখানি তার ছিল হাসিভরা, চাহনি তাহার ছিল প্রাণ-হরা,
রঙ, ছিল তার অমল ধবল— যেমন চাঁদের আলো!
সন্ধ্যামালতী, বলিতে পারিস্ কে তোরে লইত তুলি',
গাঁথ্‌ ড়িতে তোর বুলাত কে তার চম্পক-অঙ্গুলি?

যৌবন তার ললিত অঙ্গে কেলি করি' সদা ফিরিত রঙ্গে,
সে যে স্বরগের—পাপের ধরায় এসেছিল পথ ভুলি'!
সন্ধ্যামালতী, সে ছিল আমার তন্বী কিশোরী প্রিয়া,
মরণ-আঁধারে চিরদিন তরে গেছে সে যে হারাইয়া!
তার লাগি' আজ করি' হাহাকার, ফেলিতেছি বসি' নয়ন-আসার,
সে গিয়েছে চলে ভেঙ্গে মোর বুক— দগ্ধ করিয়া হিয়া!

আচার্য্য বলদেব ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী

যে অল্প কয়েকটী সন্তানের জননী বলিয়া ভারতভূমি বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লাভ করিয়াছে, বলদেব বিদ্যাভূষণ তাহাদের অন্যতম। বলদেবের গৃহস্থ-জীবনের অনেক কথাই এখনও যবনিকার অন্তরালে। কে তাঁহার পিতা, কে তাঁহার মাতা—তাহা হয়তো আমরা জানি না। সে সংবাদ না জানিয়া আমাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। ভক্ত বলদেব, ভক্ত সমাজের বন্দনীয়, পরম ভক্ত, ইহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। যে মাতা-পিতার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় বেশীদিন থাকিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। অপরাপর বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীগণ যেমন গৃহের বাহিরে আসিয়া শ্রীধামের অভিমুখে প্রয়াণ করিয়াছিলেন. বলদেবের জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

বলদেব যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তথাকার 'শ্রী' আগের মত আর ছিল না। ষড়-গোস্বামিগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন-বিহারীও আপন মহিমা গোপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের শিষ্য-মণ্ডলীর অনেকেই এ পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার যবনের অত্যাচার-ছলে শ্রীবিগ্রহসমূহও একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব অনুমান ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মথুরায় উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীকেশবদেবের মন্দির ধ্বংস করেন। এই মন্দির বুন্দেলরাজ বীরসিংহ কর্ত্তৃক বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রী মন্দির এইরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে কেশবজীকে লইয়া গিয়া উদয়পুরের নাথ-দ্বারে রক্ষা করা হইল। বিপদ উপস্থিত দেখিয়া শ্রীধামের প্রহরীগণ গোকুল, মহাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান হইতে অপরাপর শ্রীবিগ্রহগুলিকে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রজধাম অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, শ্রীগোপীনাথ, মদনমোহন, গোবিন্দ, রাধাবিনোদ, রাধাদামোদর প্রভৃতি ব্রজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যে বৃন্দাবনের গৌরব একদিন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃকই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে-স্থানের শ্রী-সম্পদ লুপ্ত হইতে থাকিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রভাবও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। শ্রীধামের এবংবিধ অবস্থা তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভাগ্য বিপর্য্যয়-সন্দর্শনে, একজন বাঙালী বৈরাগী আবার সমুদয় পুনর্গঠনে ব্রতী হইলেন। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। বিশ্বনাথ একাকী সমস্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়া সময় সময় অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময় একজন সঙ্গী হইলে ভাল হয়। কিন্তু কে তাঁহার সাহচর্য্য করিবে, কর্ম্মী উপযুক্ত না হইলে, তাহার সাহচর্য্য বিড়ম্বনারই নামান্তর। কিন্তু ব্রজের ঠাকুর বুঝি বিশ্বনাথের অভাব পূরণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একজন বৈরাগী আসিয়া জুটিল। ইনি শিক্ষা-দীক্ষা—সমস্ত দিক হইতেই বিশ্বনাথের যোগ্য সহচর হইবার উপযুক্ত। ইঁহারই নাম—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ।

বলদেব ন্যায়-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় বিশ্বনাথ আবার অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি দ্বারা ব্রজমণ্ডলে গোস্বামি-শাস্ত্রের প্রচার করিয়া লুপ্তশ্রী পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনাদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, রূপ-সনাতন ও তাঁহাদের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব যে অনন্য সাধারণ কর্ম্মপদ্ধতির দ্বারা জগতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, নরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি যাঁহাদের পতাকা বহন করিয়া সাধারণ্যে প্রেম-সুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই অমিয়-ধারাই আবার পুনঃপ্রবাহিত হইল এই দুই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈরাগী দ্বারা—বিশ্বনাথ ও বলদেব।

বিশ্বনাথ ও বলদেবের সমবেত চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অচিরেই ব্রজধামের পূর্ব্ব শ্রী ফিরিয়া আসিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাব আবার পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ হইল। বলদেব বৈষ্ণব দর্শনের অধ্যাপনা-মানসে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিলেন। ইহার মধ্যে প্রমেয়-রত্নাবলী, সিদ্ধান্ত-দর্পণ, ছন্দঃ কৌস্তুভঃ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'প্রমেয়-রত্নাবলী' মধ্বমতানুযায়ী গ্রন্থ। ইহাতে নয়টি প্রমেয় বা সিদ্ধান্ত আছে, যথাঃ—(১) "ব্রহ্মই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব। (২) ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি, অথবা শাস্ত্রই ব্রহ্মকে জানিবার একমাত্র উপায়। (৩) জগৎ সত্য। (৪) ব্রহ্ম ও জগৎ প্রপঞ্চের ভেদ সত্য। (৫) জীব সত্য ও ভগবৎ কিঙ্কর। (৬) জীবগণ পরস্পর ভিন্ন ও শ্রেণী ভেদে উচ্চাবচ। (৭) ভগবৎ প্রাপ্তিই-মোক্ষ। (৮) ভগবদুপাসনা মোক্ষের একমাত্র সাধন। (৯) প্রমাণ তিনটী—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভর যোগ্য।" সিদ্ধান্ত-দর্পণে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক সাংখ্যাদি নাস্তিকমত নিরসন করিয়া গ্রন্থকার বেদান্তের দুরূহ সিদ্ধান্তসমূহকেও অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিয়া তুলিয়াছেন।

এইরূপে পঠন-পাঠনের সুবিধা তথা গোস্বামি-গ্রন্থের বহুল প্রচার দ্বারা বলদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু এত চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও বোধহয় একটু ত্রুটি রহিয়াই গিয়াছিল। তাই সকলের অলক্ষ্যে আবার বিবাদপাতের সূচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ভক্তিবাদ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অতি প্রাচীন, কিন্তু ইহা কোন সময় হইতে কিরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা জানিবার বিশেষ কোন উপায় দেখা যায় না। রামায়ণ মহাভারত যুগের পূর্ব্বে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে ৭০০—৬০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দেও যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। বুদ্ধের পদচিহ্ন পূজার পূর্ব্বেও যে গয়ায়

বিষ্ণুপাদের পূজা প্রচলন ছিল, তাহা যাস্কোদ্ধৃত উর্ণবাভের "সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়াশিরসীতৌর্ণবাভঃ" বচন হইতে স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল প্রমাণ করিয়াছেন।

প্রাচীন শিলালিপিগুলিতেও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। লুডার্স প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন, নানাঘাট ও ঘোশুণ্ডির শিলালিপি খৃঃ পূঃ ২ শতক পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্মের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উপাস্য বাসুদেবের উল্লেখ আছে। ভক্তিবাদ লইয়াই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভক্তিবাদ যে খুব প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক সূক্তগুলি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় সেগুলি পরিপূর্ণ। আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনাকাণ্ডের উপরই ভক্তিমার্গ সংস্থাপিত। কাজেই রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্ত দর্শনের ভক্তিবাদিগণ উপনিষদকেই মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-প্রণয়ন দ্বারা তাঁহাদের মতবাদ গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিধায় তাহাদের ব্যাখ্যা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। এই চেষ্টার ফলস্বরূপই সূত্রব্যাখ্যা বা ভাষ্যের উৎপত্তি। ভারতে ভক্তিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের হাতে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যের সময় নবতমরূপ ধারণ করিয়া নিরক্ষর ও নির্ম্মলহৃদয় ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। এই সময় বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে 'শ্রী' উজ্জ্বল করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া সকলকেই আলিঙ্গন দান করিলেন। সকল বেদের সার 'প্রেমধর্ম্ম' শ্রীচৈতন্য জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বিতরণ করিলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, জগতে যাঁহারা ধর্ম্মমত সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রচলিত ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য রচনা দ্বারা এক একটি মতবাদ গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য এ সব কিছুই করেন নাই। তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন! যে প্রেম তাঁহার হৃদয়-মথিত, প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূল প্রতিপাদ্য, তাহা কি কখনও বই লিখিয়া বুঝানো যায়? ভাষ্য রচনায় প্রকাশ পায়? শাস্ত্র, ভাষ্য—সমস্তই যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যাহা হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চির-লিখিত, যাহা মানুষকে আত্মহারা, পাগলপারা করিয়া তুলে; সেই চির-নির্ম্মল সর্ব্বসাধ্যসার প্রেমধারাকে অনুভূতির রসে গুলিয়া নিজের জীবনকে রঙ্গাইয়া তুলিতে হয়। ভক্তিবিহীন, প্রেমলেশহীন আর্ত্ত, ক্লান্ত নর-নারীর সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদর্শখানি তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহার সম্মুখে কোন গ্রন্থ, ভাষ্য, টীকা-টীপ্পনী স্থান পাইতে পারে না। প্রেম যেখানে পাগলা-ঝোরার মত শত সহস্র ধারায় ছুটিয়া পড়িয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যায় সেখানে সংশয়-চিত্ত লোকের তর্ক-বিতর্ক কি করিবে? রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলিয়াছেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু এক নূতন অবতার—এ প্রেমের অবতার। তিনি প্রেমের ঠাকুর। এমন অবতারের কথা পূর্ব্বে কেহ কখনও শুনে নাই। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী, কিন্তু প্রেমিক। প্রেমিক কখনও সন্ন্যাসী হইতে দেখা যায় না। কিন্তু গোরা কখনও প্রেমে অজ্ঞান, কখনও বিরহে ব্যাকুল।" এই যে চিত্র ইহার সম্মুখে স্বকীয়া, পরকীয়ার কথা উঠিতে পারে না, শুচি-অশুচির প্রশ্ন স্থান পাইতে পারে না। এখানে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বাদ-বিতর্ক, দ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের কল-কোলাহল—সমস্তই অচিরে নিরস্ত হইয়া পড়ে।

কিন্তু জগতে এমন লোকও আছেন, যাঁহারা সমস্ত বুঝিয়াও আবার কিছুই বুঝিতে চান না, আত্ম-প্রাধান্য বজায় মানসে অপরের উৎকৃষ্টতর জিনিষ আমলে আনিতে দেন না। দর্পহারী ভগবান সকলের দর্পই চূর্ণ করিয়া থাকেন। বুঝি ভগবৎ-নির্দ্দেশেই এক শুভ্র শুভ মুহূর্ত্তে জয়পুরাধিপতির সভায় গিয়া কতকগুলি 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব এক গোলযোগ করিয়া বসিলেন। রুদ্র ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ন্যায় 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার পূজাকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া মনে করেন। চৈতন্য-পূর্ব্ব সময়ে কেবল নিম্বার্ক সম্প্রদায়েরই উপাস্য দেবতা ছিল—"রাধাসমন্বিত গোপাল-কৃষ্ণ।" কাজেই জয়পুরে গোবিন্দজীর সহিত শ্রীরাধাকে দেখিয়া 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তাঁহারা মহারাজকে বুঝাইলেন, প্রথমে শিলারূপী নারায়ণের পূজা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা অবৈধ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপকন্যা শ্রীরাধাকে এক সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করাও অনুচিৎ, কেন না প্রাচীন পুরাণাদিতে রাধার নাম মাত্র নাই। অতএব রাধাকে ফেলিয়া দেওয়া হউক। তৎকালে যে সমস্ত বাঙালী পূজারী গোবিন্দজীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের নিকট পরাজিত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে মহারাজ জয়সিংহ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এতদিন ভগবান-জ্ঞানে যে রাধার তিনি পূজা দিয়া আসিয়াছেন, আজ হিন্দু হইয়া কোন প্রাণে তিনি সেই রাধাকে ফেলিয়া দিতে পারিবেন? নানারূপ চিন্তার পর শেষে স্থির করিলেন যে, অন্য গৃহে রাখিয়া তিনি শ্রীরাধার পূজার ব্যবস্থা করিবেন। অচিরে এই সংবাদ বৃন্দাবনে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। তবে কি 'মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর' ব্যথা ও বেদনাতুর হৃদয়ের মর্ম্মকথা—সমস্তই কবির কল্পনা! মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রামাণ্যপুরাণে শ্রীরাধার নাম নাই। এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের "অনয়ারাধিতো" শীর্ষক শ্লোক হইতে বৈষ্ণব-দর্শনীতে এবং সারার্থ-তোষণীতে রাধার নাম আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও কি সনাতন এবং বিশ্বনাথের কষ্ট কল্পনা?

গোস্বামিগণের সকলেই একে একে ব্রজধামের নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ব্রজবাসীগণ কি করিবেন, কাহার নিকট গিয়া দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন,—"শ্রীপাদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যাওয়া যাক্—যদি তাঁহার দ্বারা কোন প্রতিকার সম্ভব হয়?" বিশ্বনাথ তখন বার্দ্ধক্যদশায় জরাজীর্ণ, স্থানান্তরে যাইতে অক্ষম। তিনি বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণের উপর শ্রীরাধার মান হইয়াছে, সেইজন্য এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। যাহা হউক, আমি তো যাইতে অক্ষম, তোমরা বলদেব বিদ্যাভূষণকে জয়পুরে লইয়া যাও। রাধাকৃষ্ণের চরণপ্রসাদাৎ, তাঁহার

দ্বারাই তোমাদের মনোরথ সফল হইবে।" বলদেব তখন অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভেক লইয়া গোবিন্দদাস নাম গ্রহণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনের কোন গুহায় ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকেন, কেহই তাঁহার সন্ধান জানেন না। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহার খোঁজ পাওয়া গেল। জয়পুরে গিয়া তিনি বিরুদ্ধপক্ষীয় বৈষ্ণবগণকে তর্কে পরাস্ত করিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে যেরূপভাবে পূজাকার্য্য চলিতেছিল, সেইরূপভাবে আবার সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, বিতাড়িত বাঙালী পূজারীগণ আবার আপন আপন পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মতাবলম্বী আচার্য্যগণ যেমন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া আপনাপন মতকে সু-প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বলদেবকেও আবার সেই পন্থা অবলম্বন করিতে হইল। এই চেষ্টার ফলেই আমরা আর এক নবতম ভাষ্যের দর্শনলাভ করিলাম। ইহারই নাম—"গোবিন্দ-ভাষ্য।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীচৈতন্য যে প্রেমের পরিমলে পাগল হইয়া কখনও অজ্ঞান, কখনও ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন—

কি ভাব উঠিল মনে কান্দিয়া আকুল কেনে
সোনার অঙ্গ ধুলায় লুটায়

তাহা কখনো ভাষ্য রচনায় বুঝানো যায় না। কিন্তু তবুও দরকারের খাতিরে, সত্যপ্রতিষ্ঠামানসে, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আবার অনেক কিছুই করিতে হয়। বলদেবকেও এই নীতি অনুসরণ করিয়া আবার কলম ধরিয়া প্রচার করিতে হইল—'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'। কথিত আছে, তিনি ইহা কৃষ্ণের আদেশানুসারে প্রকাশ করেন।

জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন হইয়াও যে অভিন্ন, ইহা সত্যের এক অচিন্ত্য-স্বরূপ। শ্রুতিতে আছে, পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি আনন্দানুভব করিবার জন্য বহু হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, পূর্ণ ও অখণ্ড আত্মায় আনন্দানুভূতি হইতে পারে না। আনন্দানুভব করিতে হইলে আরও অনেক আত্মাকে সঙ্গে করিয়া লইতে হয়। যিনি এক হইয়াও বহু হইতে পারেন, তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অতীত। তিনি একও নন, বহুও নন—যুগপৎ এক এবং বহু। আমি একদিকে যেমন সসীম, আর একদিকে তেমন অসীম, এই সসীমত্ব ও অসীমত্ব যুগপৎ আত্মার মধ্যে আছে বলিয়াই তাহা আনন্দরসপানে সমর্থ। যাহা পরিপূর্ণ তাহাই রস। জীবভৃঙ্গ তাহাই পানের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। "যিনি পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড ব্রহ্মানন্দরস, তিনিই আবার রস-পান-পিপাসু অপূর্ব্ব খণ্ডাকৃতি জীবভৃঙ্গ।" এই রসানুসন্ধান, রসাস্বাদনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রহস্য। এই জন্যই গোরা-রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত"। বলদেব এই তত্ত্বেরই রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়া জগজ্জনকে চিরদিনের জন্য কিনিয়া লইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভক্তিতত্ত্বে যে সংসারের আর্ত্ত, ক্লান্ত নর-নারীর আশা ও আনন্দের অভয়বাণী নিহিত রহিয়াছে, বলদেব তাহাই ভাষ্যজাল বিস্তারিত করিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রেম-ময়ের নিত্য লীলা যে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ কাহাকেও বাদ দিয়া হয় না, তাই তিনি সকলের জন্য ব্যাকুল। ভারতীয় সমস্ত দর্শন, সমস্ত তত্ত্ব হইতে এইখানেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মর্ম্মকথা এক গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সমস্তকে ছাড়িয়া প্রেমকে পরম বাঞ্ছনীয়রূপে লাভ করিবার পন্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এক নূতন অবদান। ইহা আমাদিগকে সেই অদ্বয়-তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দেয়—যেখানে ভেদ শুধু কাল্পনিক, লীলারসের পরিপোষক। নিত্যপ্রেম, নিত্যবিলাস এবং সেই প্রেমসমুদ্র হইতে যে তরঙ্গধারা উত্থিত হয়, তাহা আবার সেই সমুদ্রেই মিশিয়া যায়। আস্বাদন মাধুর্য্যের জন্য শ্রীরাধা তাঁহারই সত্ত্বা হইতে রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, আবার বিলাসের মাহাত্ম্যে, লীলার আতিশয্যে তিনি তাহাতেই বিলীন। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসিনী শ্রীরাধা অচিন্ত্যভেদাভেদের এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে।

এই তত্ত্বেরই স্ফুরণ হইয়াছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায়। সেই 'রম্যাকাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা' শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে আবেগ ও অনুপ্রেরণায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। সাধকের মানস-বৃন্দাবনচারী শ্রীরাধা যেন দেহ ধরিয়া সুরধনী তীরে আসিয়া দেখা দিলেন—"অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু সুরধনী তীরে উজোর।"

পৃথিবী এযুগে রণ-ভেরীর তীব্র নিনাদে বধির হইয়া গিয়াছে। কে জানে, কোন যুগে এই অমিয়-ধারা জগতের প্রতি-স্তরে বর্ষিত হইয়া স্বর্গ-রাজ্যের সৃষ্টি করিবে! হে মহাভাগ, তুমি কে, কেনই বা শচী-দুলালরূপে একবার বাংলার বুকে আসিয়া দেখা দিয়াছিলে? যোগীরা যাহাকে ক্ষণেকের তরে পাইয়া, আবার পাইবার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়ে, তুমি কি সেই তপস্যার মহাধন? সংসারে তো সকলে কেবল 'আমার' 'আমার' করিয়াই কাঁদিয়া থাকে, সন্ন্যাসীরা তোমাকে খুঁজিবার জন্য পথে পথে ফিরিয়া বেড়ায়, সিদ্ধ পুরুষেরা তোমাকে পাইতে চেষ্টা করিয়া কেবল কতকগুলি অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার মত, কে, কবে, কোথায় ভগবানের জন্য এমন করিয়া কাঁদিয়াছে? তোমার অশ্রুসজল চক্ষে যাঁহার ছায়া পড়িয়াছিল, তাঁহাকে তোমার মধ্যদিয়াই ভারতবাসী একবার মাত্র দর্শন করিয়াছে; আর সেই রূপ-মাধুরীর তত্ত্বকথা এখনও বিধৃত আছে—বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে।'

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলরাম ঘরে ফিরিলেন। কিছুই বোঝা যাইতেছে না—কেমন একটা অনিশ্চয়তায় ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে মন। কেন এই যুদ্ধ? মানুষ এমনভাবে কিসের জন্য লড়াই করিয়া মরে? বোমা আর কামানের মুখে ঘর বাড়ি উড়াইয়া দেয়, রক্তে ভাসাইয়া দেয় মাটি? দেশ আর গ্রাম শ্মশান হইয়া যায়। কীই বা হয় যুদ্ধে একটা বিরাট জয়লাভ করিয়া? যে জিতিল, মড়ার হাড়ের উপরে সিংহাসন বসাইয়া এমন কোন্ অপূর্ব স্বর্গসুখটা সে ভোগ করে?

কে যুদ্ধ চায়? বলরাম চান না—মণিমোহন চায় না, চর-ইসমাইলের কেউ চায় না, এমন কি নির্বোধ রাধানাথ পর্যন্ত চায় না। তবু কেন এই যুদ্ধ?

সমস্ত ব্যাপারটাকে সমাধানহীন একটা বিরাট গোলকধাঁধার মতো মনে হয় তাঁহার। কিছুদিন আগে এই প্রশ্নটাই তিনি করিয়াছিলেন মণিমোহনকে।

অত্যন্ত করুণাভরে মণিমোহন হাসিয়াছিল। অনেকগুলি কথাই সে বলিয়াছিল—উপনিবেশ, বাণিজ্য-বিস্তার, আর্থিক একচেটিয়া সুবিধা—বলশেভিক বিনাশ, গণতন্ত্রের প্রসার ও রক্ষা এবং আরো অনেক কঠিন কঠিন ব্যাপার।

বলা বাহুল্য, বলরাম কিছু বুঝিতে পারেন নাই। চরক-সংহিতা, ভেষজ-বিজ্ঞান, নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা অথবা নিদান-তত্ত্বে এর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। ছাগলাদ্য-ঘৃত তিনি নির্ভুলভাবে তৈরী করিতে পারেন, সহস্রবার পারদকে জারিত করিয়া লইবার প্রক্রিয়া তাঁহার জানা আছে, রস-সিন্দুর আর মকরধ্বজের তফাৎটা বলিয়া দিতে পারেন একবার চোখ দিয়া দেখা মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ-বিজ্ঞান নিদান-তত্ত্বের চাইতেও কঠিন বলিয়া তাঁহার মনে হইল।—তা ছাড়া, মণিমোহন হাসিয়া শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিল, যুদ্ধটা হচ্ছে একটা জৈবিক প্রয়োজন—দার্শনিকদের এই মত।

বলরাম হাঁ করিয়াই ছিলেন। বলিলেন, তাই নাকি? তা বেশ। কিন্তু যারা যুদ্ধ করছে না তাদের এত কষ্ট দেওয়া কেন? ভাত নেই, কাপড় নেই—

—তারও দরকার আছে। একজন ডাচ্ দার্শনিক—ডাচ্ বোঝেন, ওলন্দাজ?

বলরাম বোঝেন না। তবু মাথা নাড়িতে হইল।

—ষ্টিনমেৎস্ তাঁর নাম। তাঁর বই আছে একটা—ফিলসফি অব ওয়ার। তাতে তিনি বলেছেন যুদ্ধের সময় অসামরিকদের খুব বেশি করে কষ্ট দাও খেতে দিও না—শুধু চোখ দুটো রেখে দাও জল ফেলবার জন্যে। কেন, জানেন?

—কেন?

—যাতে তারা মনে করতে পারে যে তাদের এই দুর্গতির জন্যে শত্রুরাই দায়ী। ফলে শত্রুপক্ষের প্রতি তাদের মন বিদ্বেষ ও হিংসায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। আর তা হলেই যুদ্ধ জয় অনিবার্য। মুসোলিনীও এই কথাই বলেছেন! বুঝলেন তো?

বলরাম বুঝিলেন না। বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও লাভ নাই। যাহারা পণ্ডিত, তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব অনুকূল নয়। কোনো একটা জিনিসকে তাহারা সহজ করিয়া বুঝাইতে পারে না। কোথা হইতে শক্ত শক্ত ব্যাপার আমদানী করিয়া আগাগোড়া সব কিছুকে দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য করিয়া তোলে। যুদ্ধ কেন হয়, তাহার পিছনে এই যে বিরাট তত্ত্ব আর তথ্যের অরণ্য লুকাইয়া আছে একথা কোনোদিন বলরামের কল্পনাতেই আসিয়াছিল নাকি!

কিন্তু সেই হইতে মণিমোহনকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা তিনি ছাড়িয়াই দিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যে কাগজটা তিনি পড়েন, তাহার পাতায় পাতায় প্রতিদিন দেখা দেয় অস্পষ্ট আর রহস্যময় রাশীকৃত খবর। পৃথিবীতে এত জায়গা, এত বিচিত্ররকমের নাম আছে, এও কি কোনোদিন কল্পনায় আসিয়াছিল। কোনো কোনো নাম এমন উৎকট যে উচ্চারণ করিতে গেলে মানুষের আক্কেল দাঁত অবধি খট খট শব্দে নড়িয়া ওঠে এবং দুইটা বছরে বিরাট দুনিয়ার ভূগোলটা বলরামের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে। জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানভাণ্ডার যে পুরাদমেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবে কে?

কিন্তু কী যে হইবে! জ্ঞান বাড়িতেছে বাড়ুক, দৈনন্দিন সমস্যার কোনো সমাধানই তো চোখে পড়িতেছে না। যুদ্ধটা যেন বাধিয়াছে প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিসপত্রের সঙ্গে। কামানে বন্দুকে মানুষ মরিতেছে না, মরিতেছে চাল, ডাল নুন, আটা, তেল, কয়লা আর কুইনিন।

ভাবিয়া বলরাম আর থই পান না। চুলকাইতে চুলকাইতে টাকের উপরে খানিকটা রক্তপাতই করিয়া ফেলিলেন তিনি। অত্যন্ত বিব্রত আর বিপন্ন মুখে তাকিয়াটায় তিনি ঠেসান দিয়া বসিলেন। দেওয়ালের গায়ে কাঁচভাঙা ঘড়িটা স্তব্ধ হইয়া আছে—একটা বড়সড়ো টিকটিকি পোকার সন্ধানে পেণ্ডুলামটার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই সেটা যেন কুম্ভকর্ণের মতো অকস্মাৎ যুগনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। অত্যন্ত বিরক্তভাবে মিনিট খনিক কটাকট্ শব্দ করিয়া এলোমেলো খানিকটা সময় জানাইয়া দিয়া আবার অনন্ত নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল ঘড়িটা।

অন্যমনস্কভাবে সেদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন বলরাম। বড় একটা হাই তুলিয়া তাকিয়া হইতে পিঠ খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিলেন। যেন কী একটা ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া হাঁক দিলেন, রাধানাথ ?

—যাই বাবু, বাহির হইতে সাড়া দিয়া রাধানাথ প্রবেশ করিল। বৃহদাকার একটা কাদামাখা মাগুর মাছ তাহার হাতের মধ্যে ছটফট্ করিতেছে। মুখটা বিকৃত করিয়া কহিল, উঃ, কাঁটা দিয়েছে শালার মাছ।

—মাছ ধরছিলি বুঝি ? বাঃ, বেশ, বেশ।—বলরাম খুসি হইয়া উঠিলেন: খুব বড় মাগুর মাছ তো। পেলি কোথায় রে ?

রাধানাথ বলিল, কাঁঠাল গাছে।

—কাঁঠাল গাছে ?

—তা ছাড়া আবার কি ? শালারা কি এমন জাত যে ধরা দেবার জন্যে হাঁ করে বসে আছে ? এ ঘরের মাছ।

দপ করিয়া বলরামের উৎসাহটা নিবিয়া গেল।

—ঘরের মাছ ? তা হলে বাইরে গেল কেমন করে ?

—তা আমি কি করব বাবু ? রাধানাথ নিজেকে সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইল একটা: আমার কি দোষ ? পরশু দিন এক কুড়ি কিনে হাঁড়িতে জীইয়ে রেখেছিলাম, আজ সকালে উঠে দেখি দুটো না তিনটে রয়েছে। হাঁড়ির ঢাকা উলটে ফেলে রাতারাতি চম্পট দিয়েছে সব। তারই একটাকে অনেক খুঁজে-পেতে ধ'রে আনলাম।

—বটে, বটে! রোষে বলরাম বিকচ্ছ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন: মাছগুলো আকাশ থেকে পড়ে, তাই না ? পয়সা দিয়েই ওগুলোকে কিনতে হয় না, না ? দেখছি তুই ব্যাটাই আমাকে ফতুর করবি।

—তা কি হবে। বক বক করলে তো মাছ আসবে না। নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে প্রস্থানের উপক্রম করিল রাধানাথ।

—যাচ্ছিস্ কোথায় ? সর্বনাশ যা করবার তা তো করেছিস, এখন এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা হতভাগা।

—গালমন্দ করবেন না, সেজে এনে দিচ্ছি—গজেন্দ্র গমনে রাধানাথ বাহির হইয়া গেল। পাজী, বদমাস। নিজের মনে গালিবর্ষণ করিয়া বলরাম ক্রোধটাকে প্রশান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনো লাভ নাই ওকে গালিমন্দ করিয়া। চাকর-বাকর লইয়া ঘর সংসার করিতে গেলে এ সমস্ত ক্ষতি অপরিহার্য। কোনো জিনিসের জন্য দরদ নাই, গৃহস্থের জন্য মায়া নাই এতটুকুও। প্রাণ ভরিয়া চুরি চামারি করিতেছে নিশ্চয়।

তবু রাধানাথ না থাকার অবস্থাটাও কল্পনা করা চলে না। বিশ বছর ধরিয়া ওরই সঙ্গে সংসার করিয়া আসিতেছেন, মানাইয়াও লইয়াছেন একরকম। মুখে মুখে উত্তর করে—ওই ওর দোষ; তবু বলরামের ধাতটা একরকম চিনিয়াছে, যেমন করিয়া হোক চালাইয়া লয়। মাঝখানে শুধু ছেদ পড়িয়াছিল দিন কয়েক, শুধু কয়েকটা মাস পারিবারিক জীবনের একটা স্নেহ-মধুর আস্বাদন পাইয়াছিলেন তিনি। তার পরেই—

বুকের মধ্যে একটা ব্যথার চমক টনটন করিয়া উঠিল। শুধু মানসিক নয়—শারীরিকভাবেও কয়েক বছর ধরিয়া এই একটা নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। একি আসন্ন মৃত্যুর সংকেত ? বয়স বাড়িতেছে, তাই কি অন্তিমের আহ্বান আসিয়া বুকের মধ্যে তাহার দাবীটাকে জানাইয়া দিয়া যায়।

—বাবু, তামাক।

—রেখে যা।

ফরসীতে তামাক পুড়িতেছে। নলটা মুখে করিয়া বলরাম ভাবিতে লাগিলেন একটা কথা। এতদিন ভাবিয়াও সে কথার কোনো উত্তর মেলে নাই তাঁহার কাছে: কেন চলিয়া গেল মুক্তো ? সজ্ঞানে কি অপরাধ তিনি করিয়াছিলেন যাহার জন্য সমাজ ধর্ম সব ছাড়িয়া মুক্তো এমন একটা অস্বাভাবিক জীবনকে বাছিয়া লইল ? জাতি ছাড়িল, সমাজ ছাড়িল, বিগত যৌবন ফুলগাজীর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল ? অপরাধ তিনি হয়তো করিয়াছিলেন, কিন্তু সেজন্য কোনো দায়িত্বই কি মুক্তোর ছিল না ? তা ছাড়া সে অপরাধের এমনি করিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত হইল ? মুক্তোই কি সুখী হইতে পারিয়াছে ?

ডি সিলভার ছেলে ডি ক্রুজা সংকুচিত হইয়া ঘরে ঢুকিল। ভাবনার জালটা ছিঁড়িয়া বলরাম তাহার দিকে তাকাইলেন।

—কি রে, কি খবর ?

—আজ বাবাকে দেখতে যাবেন না একবার ?

—কেন, কি হয়েছে আবার! জ্বর ছাড়ে নি ?

ম্লানমুখে মাথা নাড়িয়া ক্রুজা বলিল, না।

ফরসীর নল দিয়া পেশাদারী ভঙ্গিতে খানিকটা ধূমোদগীরণ

করিলেন বলরাম: জ্বর ছাড়ল না, তাই তো। তা পাঁচনটা খাইয়েছিলি ঠিক মতো ?

—হুঁ।

—আর পথ্য? সাবু?

—না, সাবু পাইনি।

—তা তো পাবিই না—নিরীহ ডি-ক্রুজার উপরে বলরাম সমস্ত ক্রোধ এবং বিরক্তি একবারে বর্ষণ করিয়া দিলেন: বাপের জন্য এতটুকু দরদ বা মায়া আছে তোর! মরে যাবে নাকি লোকটা ?

—কি করব, কোথাও তো পাচ্ছি না ?

—যা, আবার খোঁজ গিয়ে। পথ্য নেই, কিছু নেই, খালি খালি ওষুধেই কারো জ্বর সারে নাকি কখনো ? যা, আমি যাবো বিকেল বেলায়। আর সাবধান, মুরগীর ঝোলটোল খাওয়াসনি, তা হলে বাপ কিন্তু সোজা মেরীর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছুবে, এই বলে রাখলাম।

*   *   *

নৌকাটা থামিতেই গঞ্জালেস্ তীরে নামিয়া পড়িল। তারপর গ্রামের দিকে আগাইতে গিয়াই সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

এই তো চর ইসমাইল। দশ বছর আগে সে যাহাকে পেছনে ফেলিয়া গিয়াছিল—একটা তীব্র অপমান বোধ এবং প্রতিশোধের কঠিন সংকল্প লইয়া। মরা রক্তে সেদিন বিদ্রোহী প্রাণের বান ডাকিয়া গিয়াছিল। পর্তুগীজদের মেয়েকে, তাহার ভাবী স্ত্রীকে কতগুলা বর্মী আসিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল! কিছু করিতে পারে নাই গঞ্জালেস্, শুধু পাথরের মূর্তির মতো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আর চিত্র করা পুতুলের মতো দুইটা বিস্ময় বিহ্বল চোখ মেলিয়া শুনিয়াছিল সেই অসহ্য লজ্জা আর অপমান মেশানো পরাজয়ের কাহিনী।

ডি সুজা পাগল হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঘোলা চোখ যেন রক্ত দিয়া মাখানো, বন্য জন্তুর মতো দুর্গন্ধ নিশ্বাস ফেলিতেছে। অকারণে হা হা করিয়া উঠিয়াছিল খানিকটা। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এর শোধ নিতে পারবে, লিসিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে তুমি ?

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া শরীরের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুতের তীব্র চমক খেলা করিয়া গিয়াছিল গঞ্জালেসের। এক চুমুক বিষাক্ত হুইস্কি পান করিলে যেমনটা হয় ঠিক তেমনই। মনে পড়িয়া গিয়াছিল দিগ্বিজয়ী পূর্ব পুরুষদের। যাহাদের পায়ের নীচে হাজার হাজার বুনো ঘোড়ার মতো সমুদ্র গর্জাইয়া উঠিতেছে—নোনা ফেনার রাশি গড়াইতেছে তাহাদের মুখ হইতে; আর সেই ঘোড়ার যাহারা আসোয়ার, তাহাদের মাথায় কালো চামড়ার টুপি তাহাদের চোখের দৃষ্টি শকুনের চাইতেও তীক্ষ্ণ এবং দূরগামী। বজ্র কঠিন হাতের মধ্যে ক্ষুধার্ত বন্দুক শিকারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কবে দূর সীমান্তরেখায় বকের মতো পালের সারি উড়াইয়া বাণিজ্য বহর দেখা দিবে। তাহাদের জাহাজের ডেকের উপরে লোহার কামান গলা বাড়াইয়া আছে—বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল তাহাদের পালে ড্রাগনের বিকট মুখাকৃতি।

ঠিক তাহাদের মতোই সংকল্প লইয়া, মনের মধ্যে তাহাদের মতোই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া গঞ্জালেস্ ভাসিয়া পড়িল লিসির সন্ধানে। চট্টগ্রাম, আরাকান, বর্মা। কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীতে এত অসংখ্য মানুষ, এত অসম্ভব কোলাহল আর কলরব। যে একবার হারাইয়া যায় ডাকিলে সে আর শুনিতে পায় না—কলরব-মুখর জনতায় লিসিও হারাইয়া গিয়াছে।

চেষ্টা সার্থক হয় নাই। আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছিল ডি-সুজা। কিন্তু গঞ্জালেসের মনের মধ্যে যে আঘাত বাজিয়াছিল, সেটাকে তো সে ভুলিতে পারিল না। জীবন যে পথে চলিতেছিল, তাহাতে সুর কাটিয়া গেছে। কি যেন নাই, কিসের অভাবে নিজেকে একান্তভাবে ব্যর্থ আর অভিশপ্ত বলিয়া মনে হয়। সেই মানসিক অস্বস্তিটার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্যই যেন গঞ্জালেস প্রাণপণে মদ ধরিল—একান্তভাবে তলাইয়া গেল উদ্দাম একটা মত্ততার মধ্যে। তার পরের দিনগুলি সব অস্পষ্ট—কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না—যেন এক সারি ছায়া মূর্তির মিছিল চলিয়াছে। যুদ্ধ আসিল, বোমা পড়িল, গঞ্জালেস্ চোখের সামনেই দেখিল রক্ত আর আগুনের বীভৎস লীলা। তারপরে হঠাৎ কি যে হইয়া গেল, কথা নাই, বার্তা নাই, হঠাৎ একদিন নৌকা ভাসাইয়া গঞ্জালেস্ আসিয়া দর্শন দিল চর ইসমাইলে।

কিন্তু চর ইস্‌মাইলে কেন আসিল সে ? দশ বছর পরে দিগন্ত বিস্তীর্ণ নদীর পঙ্কস্তরের উপর দাঁড়াইয়া গঞ্জালেস্ এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল: কোন্ খেয়ালে সে দূর সমুদ্রের মোহানার মুখে এই অখ্যাত-অজ্ঞাত দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল ? অথচ যদি সে কলিকাতায় যাইত, তাহা হইলে একটা আশা ভরসা ছিল জীবিকার, সবদিকের একটা বিলি-ব্যবস্থা হইতে পারিত। কিন্তু এখানে আশ্রয় পাইবে কোথায়, চলিবেই বা কেমন করিয়া ? আর সব চাইতে দরকারী কথা এই: হুইস্কির সদাব্রত এখানে মিলিবে কোথা হইতে ?

এখানে আসিবার কি দরকার ছিল তাহার ? লিসির স্মৃতি ? সে স্মৃতি কি এতই মনোরম—যে জন্যে এখানে না আসিলে রাত্রে তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছিল ? আসল কথা—সেই রাত্রের বিভীষিকা আর নেশার মাদকতা একটা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া

সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহার স্নায়ুতে, তাই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই সে সোজা চর-ইস্‌মাইলের উদ্দেশ্যেই নৌকা ভাসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এখন কোথায় যাইবে সে, কী করিবে?

গঞ্জালেস্‌ নিজের মনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শিস্‌ দিতে লাগিল।

এমন সময় তাহার দেখা হইল ডি-ক্রুজার সঙ্গে।

চোখের দৃষ্টি সংকুচিত করিয়া গঞ্জালেস্‌ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিল ডি ক্রুজাকে। তারপর ডাকিল, এই ছোকরা শুনে যা, আয় ইদিকে।

বিচিত্র সম্ভাষণে ক্রুজা চমকিয়া দাঁড়াইল। মুখের উপরে বিদ্রোহ ঘনাইয়া তুলিয়া বলিল, আমাকে ডাকছ?

—তা ছাড়া আর কাকে ডাকব? ওই সুপুরী গ ছটাকে নাকি?

—কেন, কি দরকার?

—তোদের বাড়ি কোথায়?

—জানি না—উদ্ধতভাবে ক্রুজা ফিরিবার উপক্রম করিল।

—এই, দাঁড়া—খপ করিয়া একটা থাবা মারিয়া তাহার কাঁধটা চাপিয়া ধরিল গঞ্জালেস্‌: বেশি বথামি করিস্‌ তো এক চাটিতে চোয়াল উড়িয়ে দেব। চিনিস আমাকে?

ডি ক্রুজা চেনে না। কিন্তু গঞ্জালেসের আরক্ত চোখ এবং প্রকাণ্ড একখানা হাতের স্পর্শে চিনিতে তাহার বেশিক্ষণ সময় লাগিল না; ক্ষীণস্বরে বলিল কি করতে হবে?

—আমি তোর মামা বুঝলি? তোদের বাড়িতে বেড়াতে এলাম।

ক্রুজা হাঁ করিয়া রহিল।

—অমন করে তাকিয়ে আছিস কি? নে নৌকো থেকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে ফেল সব, তারপর নিয়ে চল তোদের বাড়ীতে। ভয় নেই, তুইও বাদ পড়বি না।

পকেট হইতে একটা চকচকে নতুন টাকা বাহির করিল গঞ্জালেস্‌। আঙুলের উপরে সেটাকে বার কয়েক নাচাইয়া টং টং করিয়া বাজাইল। বলিল দেখেছিস?

ক্রুজা কী ভাবিল কে জানে, তারপর নিঃশব্দে নৌকার দিকে অগ্রসর হইল।

দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে নদীর বিশাল জলরাশি তখন জ্বলিতেছে।

(ক্রমশঃ)

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস্‌-এস, এফ্‌-আর্‌-ই-এস্‌

১৫

প্রাদেশিক কনফারেন্স

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নাটোরের মহারাজার কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে উমেশচন্দ্র নাটোরে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে নাটোরে প্রাদেশিক কনফারেন্সও আহূত হইয়াছিল, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও তথায় গিয়াছিলেন। পূর্ব্ববৎসর কৃষ্ণনগরে যে কনফারেন্স হয়

উমেশচন্দ্র (৫৫ বৎসর বয়সে)

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

তাহাতে মনোমোহন ঘোষ নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক প্রস্তাবের সমর্থনে অন্ততঃ একজন বক্তা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবেন। নাটোরের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উক্ত ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত করিয়া কেবল বাঙ্গালায় সম্মেলনের কার্য্য পরিচালিত করিতে আরম্ভ করেন। মহারাজা তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত অভিভাষণের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের ইংরাজী অভিভাষণ পাঠ করিবার পর রবীন্দ্রনাথ তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন। বৈকুণ্ঠনাথ সেন, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালাতেই বক্তৃতা করেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র যখন আসিয়া বলিলেন "একি ছেলেখেলা নাকি? ইংরাজদের অবগতির জন্য প্রত্যেক প্রস্তাবের অনুকূলে অন্ততঃ একটি বক্তৃতা ইংরাজীতে হওয়া আবশ্যক," তখন সকলেই তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। এই কনফারেন্সের সময়েই ভীষণ ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।

কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। স্যর শঙ্করণ নায়ার এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

স্যর শঙ্করণ নায়ার

ছিলেন গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খপর্দ্দে। প্লেগের সময় নানা অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া এক অভিযোগ হইয়াছিল এবং সেই সম্পর্কে আন্দোলন করার জন্য নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনা বিচারে এক অতি প্রাচীন আইনের সাহায্যে আটক করা হয়। বালগঙ্গাধর তিলকও রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হন। গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ সূচক একটি প্রস্তাবের ভার উমেশচন্দ্রের প্রতি অর্পিত হয় এবং তিনি গভীর আইন জ্ঞানের ও সূক্ষ্ম তর্কশক্তির পরিচয় দিয়া নবপ্রবর্ত্তিত বিদ্রোহবিষয়ক আইনের সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেন।

কংগ্রেসের চতুর্দ্দশ অধিবেশন

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতির ভাষণে গ্ল্যাডষ্টোনের মৃত্যুর জন্য শোক

বালগঙ্গাধর তিলক

প্রকাশ করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উমেশচন্দ্র গ্ল্যাডষ্টোনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। গ্ল্যাডষ্টোনের জন্মদিন ও তাঁহার জন্মদিন একই দিন—২৯শে ডিসেম্বর। তিনি বলিতেন প্রতি বৎসর তাঁহার নিজের জন্মদিনে গ্ল্যাডষ্টোনকে তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করিতেন। স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু লিখিয়াছেন, "যদি উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তিনি লর্ড চ্যান্সেলর হইতে পারিতেন।" হয়ত গ্ল্যাডষ্টোনের প্রতিভা তাঁহার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু তাহা প্রস্ফুটিত হইবার উপায় ছিল না। উমেশচন্দ্র বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিতে গেলে প্রায়ই ছাত্রগণকে গ্ল্যাডষ্টোনের চরিত্রের অনুকরণ করিতে বলিতেন। বাস্তবিক এরূপ চরিত্র দুর্লভ।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে উমেশচন্দ্রেরই পার্কষ্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁহার ভগিনী মোক্ষদা দেবীর স্বামী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় দেহরক্ষা করেন এবং এই ঘটনায় উমেশচন্দ্র বিশেষ শোকান্বিত হইয়াছিলেন।

কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশন

রমেশচন্দ্র দত্ত সাহিত্যচর্চ্চার জন্য অকালে সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে রমেশচন্দ্রকে সভাপতি নির্বাচিত করা হইল। বংশীলাল সিংহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। রমেশচন্দ্রের অভিভাষণ পাঠ করিয়া তদানীন্তন সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন একটি প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন,—

"সম্প্রতি আমি ভারতে ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতির একজন অপক্ষপাতী সমালোচকের একটি চমৎকার বক্তৃতা পাঠ করিলাম। তিনি সরলভাবে

রমেশচন্দ্র দত্ত

ও অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অনেক উপকার হইয়াছে এবং উহা জনহিতকল্পে পরিচালিত হইয়াছে কিন্তু তিনি

স্যর নারায়ণ চন্দ্রবরকর

একটি নূতন পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন, ভারতগবর্ণমেণ্ট শুধু দেশবাসীর জন্য নহে, দেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।"

রমেশচন্দ্র পরে একটি বক্তৃতায় লর্ড জর্জ্জ হ্যামিণ্টনের প্রশংসাসূচক অভিমতের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে একেবারে ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। উমেশচন্দ্রও স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না এবং তৎকালীন অবস্থায় (কবি হেমচন্দ্রের ভাষায়) জানিতেন

"একত্রে ওদেরি সাথে উত্থান পতন।"

রমেশচন্দ্রের সংবর্দ্ধনা

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী টাউনহলে কলিকাতাবাসী এক বিরাট সভায় রমেশচন্দ্রকে একটি বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। এই সভায় উমেশচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন

১৯০০ খৃষ্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেবারে নারায়ণ চন্দ্রবরকর সভাপতি ছিলেন এবং বাবু কালীপ্রসন্ন রায় বাহাদুর অভ্যর্থনা

স্যর দীনশা ওয়াচা

সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই অধিবেশনে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জনের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক কংগ্রেসের কয়েকটি প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিবার সংকল্প করা হয়। প্রস্তাবগুলিতে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পার্থক্যসাধন এবং দুর্ভিক্ষজনিত প্রজাদের ভীষণ দারিদ্র্যের প্রতিকার-চেষ্টার কথা ছিল। নিম্নলিখিত প্রতিনিধিকে লর্ড কার্জনের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে স্মারকপত্র প্রদানের ভার প্রদত্ত হয়:—

মাননীয় ফিরোজশাহ মেটা, মাননীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় আনন্দ চার্লু, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় মুন্সী মাধো লাল, মিঃ আর এন মুধোলকার, মিঃ রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী ও লালা হরিকষণ লাল।

কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বীডন উদ্যানে কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন হয়। সভাপতি হইয়াছিলেন দীনশা ঈদলজী ওয়াচা এবং অভ্যর্থনা

সমিতির সভাপতি ছিলেন নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়। এই সভাতে সরলা দেবীর রচিত ও তাঁহার দ্বারা শিক্ষিত ৫৮জন গায়ক

সরলা দেবী (তরুণ বয়সে)

দ্বারা সে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত 'অতীত-গৌরব-বাহিনী মম বাণি' গীত হয়, সরলা দেবী তদীয় জীবন স্মৃতিতে এই গীত রচনার বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ "নিজে এর সমজদার হয়ে গাওয়ানর ভার" লইয়াছিলেন।

অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি ! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান' !
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ-পূরিত সেই নাম গান।
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ, গুর্জ্জর,
নেপাল. পঞ্জাব, রাজপুতান্ ।
হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান" !
ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্য গান !
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্য গান !
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, লক্ষ্যে, লক্ষ্যে কায় মনঃপ্রাণ।
বঙ্গ বিহার ইত্যাদি—
সকল-জন-উৎসাহিনী মম বাণি ! গাহ আজি নূতন তান
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি ! গাহ আজি নূতন তান !
উঠাও কর্ম্ম নিশান ! ধর্ম্ম বিষাণ ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ !
বঙ্গ বিহার ইত্যাদি।

এই অধিবেশন উপলক্ষে রসরাজ অমৃতলাল বসু 'নবজীবন' নামক "মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যলীলা" প্রণয়ন ও অভিনীত করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালায় প্রথম সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাতে ৺কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভারত মাতা' নামক একটী একাঙ্ক নাট্যলীলা অভিনীত হইত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দ্বারা স্বদেশপ্রেমোদ্দীপনের ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা। প্রপীড়িতা ভারতমাতা যেখানে মর্ম্মস্পর্শিনী স্বরে ভগবানকে এবং তাঁহার পরলোকগত সুসন্তান গণকে—হিন্দুপেট্রিয়টের স্বদেশবৎসল সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং 'স্বদেশরক্ষার ভীম' বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষকে "কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ, কোথা রামমোহন, কোথা রামগোপাল" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছা যাইতেন, সে দৃশ্য দর্শকগণের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের তরঙ্গ তুলিত। অমৃতলাল এই "ভারতমাতা" হইতে প্রেরণা লইয়া "নবজীবন" রচনা করেন। উহার একস্থানে যখন একজন সন্ন্যাসী "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গীতটি গাহিলে ভারতমাতা বলিয়া উঠিলেন,—

"কে রে—কে রে ?—চুপ কর্—আর বলিসনে, নির্ব্বাণ আগুন জ্বেলে আমার প্রাণ আর দগ্ধ করিসনে ; তারা গেছে— যারা আমার সুসন্তান ছিল, সব গেছে ! কে আর আমার দুঃখ মোচন করবে ? কে আর আমার মুখপানে চাইবে ?"—তখন ভারত সন্তান বলিতেছেন…"মা, আমরা আছি,—আমরা আছি। তুমি পুত্রহীনা নও মা।" এবং একজন বলিতেছেন—

"মা ! ঘুমন্ত প্রাণ জেগে উঠেছে, এই যে জাতীয় মহাসমিতি সংস্থাপিত হয়েছে—বড় ক্ষুদ্র অঙ্কুর মা ! কিন্তু তোমার উর্ব্বর মৃত্তিকা আর ইংলণ্ডের বারি সিঞ্চন বিফলে যাবে না। * * * বোম্বাই মান্দ্রাজ পশ্চিম পঞ্জাব দাক্ষিণাত্য মধ্যদেশ আজ অনেক সুসন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেছেন ; বঙ্গে বিদ্যাসাগর, (১) হরিশ, (২) গিরিশ, (৩) কৃষ্ণদাস, (৪) রামমোহন, (৫) মনোমোহন, (৬) রামগোপাল, (৭)

(১) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সি-আই-ই

(১) 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(৩) 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলীর' প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক স্বদেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

(৪) 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক রাজনীতি বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল সি-আই-ই

(৫) যুগাবতার রাজা রামমোহন রায়

(৬) দীনবন্ধু মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার-এট-ল

(৭) 'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনীস' রামগোপাল ঘোষ—

নবগোপাল, (৮) রাজেন্দ্রলাল (৯) আদি গেছেন বটে, কিন্তু এখনও শিশির আছে, (১০) উমেশচন্দ্র আছে, (১১) রমেশচন্দ্র আছে, (১২) আনন্দমোহন আছে, (১৩) সুরেন্দ্রনাথ আছে ; (১৪) গুপ্তভাবে আরও অনেক স্থলে অনেক সুধীজন আছেন ; তোমার পূজার জন্য জীবনবলিদানও তাঁরা তুচ্ছ করেন ! আশীর্ব্বাদ কর মা—তাঁরা যেন দীর্ঘজীবী হন, তাঁদের প্রাণের এই উৎসাহ, এই মাতৃভক্তি যেন প্রদীপ্ত থাকে। তা হলে এই ইংরাজরাজ্যে আবার তোমার মুখ উজ্জ্বল দেখ্‌বো, আবার সকলে একমনে একতানে বঙ্কিমের সেই মধুর গাথা "বন্দেমাতরম্‌" গাইবো !"

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে ভগ্নস্বাস্থ্য উমেশচন্দ্র শেষ যোগদান করেন। বহুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল এবং প্রতি বৎসর বিলাতে কয়েক মাস করিয়া অবস্থান করত নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি হাইকোর্টের অসাধারণ প্রসার প্রতিপত্তি পরিহারপূর্ব্বক শেষ জীবন ইংলণ্ডে বাস করিতে এবং তথায় প্রিভি কাউন্সিলে ব্যারিষ্টারি করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল যে অন্ততঃ ভারতবর্ষীয় মোকদ্দমার আপীল বিচারের জন্য প্রিভি কৌন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটিতে ভারতীয় ব্যবহারজীবগণকে নিযুক্ত করা উচিত। হয়ত তাঁহার দেশবাসীর জন্য এই অধিকার লাভের ইচ্ছাও তাঁহার প্রিভি কৌন্সিলে ব্যারিষ্টারী করিতে প্রেরণা দিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

(৮) হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তক, 'ন্যাশন্যাল পেপার'-সম্পাদক, নবগোপাল মিত্র—

(৯) প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই

(১০) 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ—

(১১) বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মহাত্মা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার-এট-ল

(১২) সুপণ্ডিত ও সুলেখক রমেশ দত্ত সি-আই-ই

(১৩) শিক্ষাসুহৃদ্‌ আনন্দমোহন বসু ব্যারিষ্টার-এট-ল

(১৪) 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক বাগ্মী স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নঞ্‌তৎপুরুষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বনফুল

২

১৫ই জ্যৈষ্ঠ। অসম্ভব রকম গরম পড়েছে। সেদিন পুরন্দরবাবুকে ঘোরাঘুরিও করতে হয়েছে খুব, পায়ে হেঁটে গাড়ি চড়ে'—সবরকমে। কর্পোরেশনের নামজাদা মেম্বার এবং উকীল বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ দরকার, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছেন না তাঁকে। শেষে ঠিক করেছেন সন্ধে-বেলা বালিগঞ্জে তাঁর বাড়িতে গিয়ে অতর্কিতে ধরবেন। ছটার সময় একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকলেন। রোজই ঢোকেন। রোজই প্রায় টাকা দেড়েক খরচ হয়ে যায়। আগে—যখন সচ্ছল অবস্থা ছিল—দশ টাকার কম হত না। এখন দেড় টাকায় কুলিয়ে নিতে হয়। অবস্থা খারাপ হয়েছে—উপায় কি ! খেতে বসে যদিও রোজ মনে হত এসব অখাদ্য খাওয়া যায় না—খেতে আরম্ভ করলে কিন্তু শেষ করে' ফেলতেন সব—কিছু পড়ে' থাকত্‌ না। বরং এমন গোগ্রাসে খেতেন যেন কতদিন উপবাসী আছেন। তৃপ্তিও যে না হত তা নয়। নিজের এই বুভুক্ষা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যেতেন। ভাবতেন—"দুষ্ট্‌ ক্ষিধে এ। স্বাভাবিক নয়। হতেই পারে না !"

সেদিন হোটেলে যখন ঢুকলেন তখন মনটা খিঁচড়ে আছে। চেয়ারটা স-শব্দে টেনে বসলেন, টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসেই রইলেন খানিকক্ষণ। খোশমেজাজে থাকলে তিনি শিষ্টতার চরম করতে পারেন—কিন্তু এখন মনের অবস্থা এমন যে সামান্যতম কারণে চীৎকার চেঁচামেচি করে' প্রলয়কাণ্ড করে' বসাও অসম্ভব নয় কিছু। অকারণে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে হুকুম করলেন—এই কাটলেট্‌ দিয়ে যা ! কাটলেট্‌ দিয়ে গেল···ভেঙে খেতে যাবেন···হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন—একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে গেল···ভগবান জানেন কি করে'—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যেন তিনি তাঁর অবসাদের মূল কারণটা আবিষ্কার করে' ফেললেন। বিশেষ করে' এই ক'দিন থেকে যে অনির্দ্দিষ্ট অসহ্য মানসিক যন্ত্রণাটা তিনি ভোগ করছিলেন—এক মুহূর্ত্তের জন্য যা নিস্তার দেয় নি তাঁকে—হঠাৎ যেন তার কারণটা বুঝতে পারলেন তিনি। জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সমস্ত।

"সেই লোকটা !"···একটু উত্তেজনাভরেই অস্ফুট কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন তিনি —"বেঁটে রোগা সেই লোকটা ঠিক !"

ভাবতে লাগলেন এবং যতই ভাবতে লাগলেন ততই যেন আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল মনটা। অসাধারণ অদ্ভুত লোকটা ! কিন্তু না, অসাধারণই বা কেন, অদ্ভুতই বা কি আছে এতে। বেঁটে রোগা লোক তো কত আছে !

প্রায় দিন পনের আগে—ঠিক মনে ছিল না তাঁর, কিন্তু পনের দিনই

হবে—কলেজ ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোডের চৌমাথাটায় লোকটাকে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। বেঁটে রোগা লোকটা। খুর খুর করে' চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পুরন্দরবাবুর মনে হল মুখটা যেন চেনাচেনা। কোথায় যেন দেখেছেন। তখনই আবার মনে হল "জীবনে কত সহস্র মুখই তো দেখেছি—সব মনে রাখা সম্ভব না কি!" এগিয়ে গেলেন এবং প্রায় ভুলেই গেলেন তার কথা। কিন্তু মনের অবচেতনলোকে ছাপটা লেগেই রইল এবং ক্রমশঃ যেন একটা নাম-হীন বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল। এখন, পনের দিন পরে সমস্তটা স্পষ্ট মনে পড়ছে আবার, এ ক'দিনের বিরক্তির কারণই যে ওই তাও বুঝতে পারছেন এখন। আগে ধরতে পারেন নি···আজও সকালে দেখা হয়েছিল লোকটার সঙ্গে—তাই সমস্ত দিন মনটা খিঁচড়ে আছে। আগে একেবারেই এটা মাথায় ঢোকে নি তাঁর।

বেঁটে লোকটা কিন্তু ভোলবার অবসর দিলে না তাঁকে। তারপর দিনই আবার দেখা হল রাস্তায়—ওই হ্যারিসন রোড কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়েই। ঠিক তেমনি করে থমকে দাঁড়াল, ঠিক তেমনি করে' একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। "চুলোয় যাক্"—পুরন্দরবাবু ব্যাপারটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। এক একটা লোককে দেখলে এমন বিতৃষ্ণা হয়!

ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর আবার মনে হল—"এর আগে লোকটাকে কোথাও দেখেছি"—সমস্ত সন্ধ্যেটা মেজাজ খারাপ হয়ে রইল। রাত্রে একটা দুঃস্বপ্নও দেখলেন। এর কারণও যে ওই লোকটা হতে পারে তা মনে হ'ল না তাঁর। সন্ধ্যেবেলা তো তার কথা একবারও ভাবেন নি তিনি। আর তা ছাড়া ওই রকম একটা অপদার্থ লোক যে তাঁর মনকে এতটা অধিকার করে' থাকবে তাঁর মেজাজ খারাপ করে' দেবে, এ কথা স্বীকার করাও যে লজ্জাকর! দু'দিন পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হল একটা ভীড়ের মধ্যে। মনে হল লোকটা তাঁকে চিনতে পেরেছে যেন। তার দিকে এগিয়েও আসছিল, কিন্তু ভীড়ের জন্য পারলে না, নমস্কার করবার জন্য হাতও তুলেছিল। চীৎকার করে' ডাকলে নাম ধরে' মনে হল···পুরন্দরবাবু এটা অবশ্য ঠিক শুনতে পান নি। রাগ হল তাঁর—"কে লোকটা! আমাকে যদি চিনেই থাকে কাছে আসছে না কেন! এমন ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার মানেটা কি?" একটা গাড়ি ডেকে তাতে চড়ে' বসলেন। খানিকক্ষণ পরেই মামলা নিয়ে উকীলের সঙ্গে তর্কাতর্কিও করলেন খুব। সন্ধ্যেবেলা কিন্তু মন আবার অবসন্ন হয়ে পড়ল—অদ্ভুত রকম একটা অবসাদে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, "লিভারটাই খারাপ হয়েছে সম্ভবত। শরীরে জুৎ পাচ্ছি না কিছুতে···"

এই তৃতীয় সাক্ষাৎ। এর পর উপর্যুপরি আর দেখা হয় নি পাঁচদিন। তবু কিন্তু মন থেকে দূর হয় নি সে। পুরন্দরবাবু একথা আবিষ্কার করে' চমকেই গেলেন একদিন—"লোকটার জন্যই শরীর খারাপ হচ্ছে না কি! অদ্ভুত তো! কি করছে ও কোলকাতায় এতদিন' ধরে'। আমাকে চিনতে পেরেছে? কিন্তু, আমি কিছুতেই চিনতে পারছি না তো। উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, করুণ চোখের দৃষ্টি। করুণ দৃষ্টি হবার মানে কি! কাছে গিয়ে ভাল করে' দেখলে চিনতে পারব বোধহয়···"

বিস্মৃতি-সাগরে তরঙ্গ উঠল যেন দু'একটা—মনে আসছে আসছে, কিন্তু আসছে না। অনেক সময় একটা নাম বা কথা যেমন মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না, তেমনি। নাগাল পেয়েও যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

"অনেক দিন আগে···ঠিক কোথায় যেন···ও···না-না—চুলোয় যাক। কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছি···"

ভয়ঙ্কর রাগ হল। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ মনে পড়ল যে সকালে রাগ হয়েছিল এবং 'ভয়ঙ্কর' রাগ হয়েছিল। মনে হতেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন···যেন কোন দুষ্কার্য্য করছিলেন ধরা পড়ে গেছেন। শুধু আশ্চর্য্য নয়, কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কি যে ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রাগ হবার কারণ কি!

"নিশ্চয়ই হেতু আছে কোন···তা না হলে কোথাও কিছুই নেই··· আশ্চর্য্য!" এর বেশী আর ভাবনা এগোল না সেদিন।

তার পরদিন আরও বেশী রাগ হল এবং মনে হ'ল যে রাগ হবার সঙ্গত হেতুও আছে, রাগ করে' কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি তিনি। একি কাণ্ড! চতুর্থবার দেখা হয়েছিল বেঁটে লোকটার সঙ্গে। লোকটা এবার হঠাৎ যেন আবির্ভূত হল—মাটি ফুঁড়ে বেরুল যেন। কর্পোরেশনের মেম্বার নামজাদা উকীল বিশ্বম্ভর বোসের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল···বালিগঞ্জে এঁরই বাড়িতে অতর্কিতে সন্ধ্যেবেলা যাবেন ভেবেছিলেন···ভদ্রলোকের সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না···কিন্তু মকোর্দ্দমার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন। অপরিহার্য্য ব্যক্তিটি কিন্তু ক্রমাগতই পুরন্দরবাবুকে এড়িয়ে চলছিলেন। হঠাৎ তারই সঙ্গে রাস্তায় দেখা! পুরন্দরবাবু কথা কইতে কইতে তাঁর পাশে পাশে হাঁটছিলেন এবং প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন তাঁকে বাগাতে। আর কিছু নয় একটা ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গেও ভদ্রলোক যদি দু'একটা কথা ফাঁস করে' ফেলেন—ওই দু'একটা কথা জানতে না পারলে পুরন্দরবাবুর মামলার বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কিন্তু চতুর বৃদ্ধ উকীল ঘাড় নেড়ে মুচকি হেসে আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে লাগলেন ক্রমাগত। পুরন্দরবাবুও ছাড়বার পাত্র নন। নানা যুক্তি বিস্তার করে' তিনিও জড়াবার চেষ্টা করছিলেন ভদ্রলোককে, ঠিক এই সময়ে সামনের ফুটপাথে হঠাৎ বেঁটে লোকটা আবির্ভূত হল। তাদের দুজনের দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে···মনে হল তার চোখেমুখে একটা বিদ্রূপও ফুটে উঠেছে যেন।

উকীল ভদ্রলোককে তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে পুরন্দরবাবু ভাবলেন—আঃ, কি পাপের ভোগ! ওই অপয়াটার জন্যই সব মাটি হয়ে গেল বোধ হয়। একটি কথাও বার করতে পারা গেল না! লোকটার উদ্দেশ্য কি? গোয়েন্দা নয় তো! মনে হচ্ছে পিছু নিয়েছে! কেউ লাগিয়ে দিয়েছে হয় তো···কিম্বা···কিন্তু না, ওর চোখে মুখে একটা

ব্যঙ্গ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে মনে হল যেন। কাকে ব্যঙ্গ করছে? আমাকে? চাব্‌কে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব ব্যাটার। আজই একটা হাণ্টার কিনতে হবে। না, এর বিহিত করা দরকার অবিলম্বে। কে লোকটা? জানতেই হবে, জানতেই হবে যেমন করে' হোক···।

এই চতুর্থ সাক্ষাতের তিন দিন পরে উপরোক্ত হোটেলে পুরন্দরবাবু সত্যই অত্যন্ত বিচলিত এবং অভিভূত হয়ে পড়লেন। নিজের প্রবল অহঙ্কার সত্ত্বেও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না তিনি। আগাগোড়া সমস্ত পর্য্যালোচনা করে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে গত পনর দিনের সমস্ত অবসাদ, সমস্ত হতাশা, সমস্ত মানসিক বিকারের একমাত্র কারণ ওই রোগা বেঁটে লোকটা! "হয়তো আমার মাথা খারাপ হয়েছে"—তাঁর মনে হল—"হয়তো তুচ্ছ একটা জিনিসকে বড় করে দেখছি···কিন্তু 'হয় তো'র ওপর নির্ভর করে এটাকে কল্পনা-বিলাস বলে' উড়িয়ে দিয়েও তো লাভ নেই! কি সুবিধে হবে তাতে! রাস্তার যে কোন বদমাস যদি এমনভাবে বিপর্য্যস্ত করে' ফেলতে পারে আমাকে—তাহলে তো··· মানে তাহলে তো···"

এই পঞ্চম সাক্ষাৎটা—যা এত বিচলিত করেছিল পুরন্দরবাবুকে—ওই বেঁটে লোকটির দিক থেকে বিচার করলে খুব যে আপত্তিকর তা নয়। পুরন্দরবাবুই বরং অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলেন। বেঁটে লোকটি বিশেষ কিছু করে নি। পুরন্দরবাবুর পাশ দিয়ে একটু দ্রুতবেগে সে চলে গিয়েছিল কেবল। তাঁর দিকে তাকায় নি, তাঁকে যে সে চিনতে পেরেছে এমনও কোন ভাব প্রকাশ করে নি, বরং চোখ নীচু করে' কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে' যথাসম্ভব দ্রুতবেগেই চলে গিয়েছিল সে। পুরন্দরবাবুই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"এই, শুনছেন মশাই, পালাচ্ছেন কেন—শুনুন শুনুন—কে আপনি···"

এ রকম প্রশ্ন (বিশেষতঃ ওই চীৎকারটা) খুবই অশোভন হয়েছিল। পুরন্দরবাবু পরে সেটা হৃদয়ঙ্গমও করেছিলেন। বেঁটে লোকটা তাঁর চীৎকার শুনে একবার ঘুরে দাঁড়াল, মনে হল যেন হকচকিয়ে গেছে, তার পর হাসল একটু, পরমুহূর্ত্তেই মনে হল কি যেন বলতে চাইছে, দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল দু' এক সেকেণ্ড, তার পর হঠাৎ ঘুরে ছুট দিল উর্দ্ধশ্বাসে। পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভাবলেন—"মনে হচ্ছে ও নয় আমিই যেন গায়ে-পড়ে' আলাপ করতে চাইছি। আমার অদ্ভুত আচরণ থেকে তাই বোঝায় অন্ততঃ—"

হোটেলের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন তিনি বালিগঞ্জের উদ্দেশ্যে। কর্পোরেশনের সেই উকীল ভদ্রলোককে ধরতেই হবে যেমন করে' হোক। গিয়ে দেখেন তিনি বাড়ি নেই। শুনলেন ধর্ম্মতলায় কোথায় যেন নিমন্ত্রণ খেতে গেছেন কার জন্ম-তিথি উপলক্ষে। কখন ফিরবেন ঠিক নেই, রাত্রে না-ও ফিরতে পারেন। ঠিকানাটা জেনে নিলেন পুরন্দরবাবু,—একবার মনে করলেন ধর্ম্মতলায় গিয়েই ধরবেন তাঁকে। কিন্তু একটু পরেই মনে হল অনিমন্ত্রিত যাওয়াটা অনুচিত হবে সেখানে। রাগ হল ভয়ানক! গাড়িটা ছেড়ে দিলেন—সুরু করলেন হাঁটতে। শ্যামবাজার অনেক দূর—হোক দূর—হেঁটেই যাবেন তিনি। শরীরটা চালনা করা দরকার। যেমন করে' হোক অনিদ্রাটা দূর করতে হবে, আজ রাত্রে অন্ততঃ ভাল ঘুম হওয়া নিতান্ত দরকার···সমস্ত দেহ মন এমন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে···ক্লান্ত না হলে ঘুম আসবে না। হাঁটতে লাগলেন। বাড়ি এসে পৌঁছলেন রাত এগারোটায় এবং সত্যিই তখন অত্যন্ত ক্লান্ত তিনি।

যে বাসাটা পুরন্দরবাবু ভাড়া করেছিলেন—যদিও অহরহ তার নানারকম খুঁত তাঁর চোখে পড়ত—যদিও তিনি রোজ অন্তত পঞ্চাশ বার বলতেন যে লক্ষ্মীছাড়া মকোর্দ্দমাটার জন্যে তাঁকে এই হতচ্ছাড়া বাসাটায় বাধ্য হয়ে বাস করতে হচ্ছে—বাসাটা কিন্তু নিতান্ত মন্দ ছিল না। দোতলায় খান-দুই চমৎকার ঘর—বাথরুম—তা ছাড়া আর একটি ছোট ঘর। পুরন্দরবাবু এটাকে নিজের পড়ার ঘর বানিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ সেখানে একটা টেবিল, খান কয়েক চেয়ার, টেবিলের উপর খবরের কাগজ, বইপত্র ছড়ানো থাকতো। পুরন্দরবাবু যে ঘরটায় শুতেন—সেটা বেশ বড় ঘর—ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের কোণে একটা সোফা ছিল তাতেই শুতেন তিনি। ঘরের আসবাবপত্রগুলিও নেহাত খেলো নয়, যখন অবস্থা স্বচ্ছল ছিল তখনকার দিনের শৌখীন জিনিসও ছিল দু'চারটে। ভাল চীনেমাটির বাসন কিছু, ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি কয়েকটা, ভাল একখানা কার্পেট, ভাল ছবি গোটা দুই···কিন্তু সবই মলিন, ধূলিধূসরিত, এলোমেলো। তাঁর চাকর রামা বাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে চারদিক আরও যেন অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। রামা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। দারোয়ানের ভাই হরির তার বদলে কাজকর্ম্ম করে দেওয়ার কথা। সেই আশায় তিনি যখন বাইরে যান, ঘরের চাবি দারোয়ানের কাছে রেখে যান। হরি কিন্তু মাইনেটি নেওয়া ছাড়া আর কিছু করে না। পুরন্দরবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ছোঁড়ার হাতটানও আছে সম্ভবত। কিন্তু সবই তিনি সহ্য করেন—যা হয় হোক! বেশ তো আছেন একা একা! একা কিন্তু থাকারও একটা সীমা আছে। মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হত। বিশেষতঃ ঘরে ফিরে যখন দেখতেন—চতুর্দ্দিক অপরিচ্ছন্ন, বিছানা অগোছালো, টেবিলে, চেয়ারে, ছবিতে, আয়নায় ধুলো জমে আছে।

সেদিন কিন্তু এসব কিছু হ'ল না। জুতো জামা খুলেই সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘুমুতে হবে···বাজে চিন্তা করে' সময় নষ্ট করা হবে না···। বালিশে মাথা রাখা মাত্রই ঘুমিয়েও পড়লেন। এ রকম আশ্চর্য্য ঘটনা গত এক মাসের মধ্যে ঘটে নি।

তিন ঘণ্টা ঘুমোলেন তিনি। গভীর ঘুম কিন্তু নয়। স্বপ্ন দেখলেন নানারকম। অদ্ভুত সব স্বপ্ন—লোকে জ্বরের ঘোরে যেমন স্বপ্ন দেখে অনেকটা তেমনি। যেন তিনি একটা দুষ্কর্ম্ম করে লুকিয়ে আছেন—লোকে তা জানতে পেরেছে···দলে দলে তাঁর দিকে আসছে সব। প্রকাণ্ড ভীড় জমে গেছে একটা। কিন্তু আসছে, ক্রমাগতই আসছে। ঘরের কপাট বন্ধ করা যাচ্ছে না···ভীড়ের মধ্যে তিনি কিন্তু একদৃষ্টে একটি লোককেই দেখছিলেন কেবল—তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু একজন, অনেকদিন আগে মারা গেছে···এ হঠাৎ এল কি করে! আর সব চেয়ে বিব্রত বোধ করছিলেন তার নাম মনে না করতে পেরে। কিছুতেই নামটা

মনে পড়ছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল খুব ভালবাসতেন তাকে। সমস্ত জনতাও যেন তারই মুখের দিকে চেয়েছিল—সেই যেন ঠিক করে' দেবে পুরন্দর দোষী না নির্দ্দোষ···সবাই যেন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। সে কিন্তু নির্ব্বাক হয়ে টেবিলের ধারে চুপ করে' বসেছিল। কিছুতেই কথা বলবে না। গোলমাল বাড়তে লাগল, অস্থির হয়ে উঠছে সবাই··· সে কিন্তু নির্ব্বাক। এ নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠল পুরন্দরবাবুর পক্ষে··· তিনি উঠে ঠাস করে' একটা চড় মারলেন তাকে চুপ করে থাকার জন্য। আর মেরে যেন উপভোগ করলেন সেটা। ভয় হল, দুঃখ হল, যা করলেন তার জন্যে শিউরে উঠলেন মনে মনে—কিন্তু শিহরণটাও উপভোগ করলেন যেন। উত্তেজিত হয়ে—আবার মারলেন তাকে, আর একবার, আর একবার, আর একবার···রাগে, ক্ষোভে, আতঙ্কে যেন বুঁদ হয়ে গেলেন, শেষে উন্মাদ হয়ে উঠলেন, উন্মাদনার অন্তরালে অদ্ভুত একটা আনন্দও যেন শির শির করে' বইতে লাগল শরীরের শিরা-উপশিরায়··· ক্রমাগত মেরে যেতে লাগলেন···যেন থামতে পারছেন না। মনে হতে লাগল নিঃশেষ করে ফেলি সব—চুরমার করে ফেলি সমস্ত। হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেল একটা। সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে খোলা দরজাটার দিকে ছুটল কিসের প্রত্যাশায় যেন···আর সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল। তিন বার বাজল···ঝন-ঝন ঝন-ঝন ঝন-ঝন··· ঝনাৎকারের চোটে আকাশ ভেঙে পড়বে যেন। পুরন্দরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল···তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটলেন তিনিও। ইলেকট্রিক বেলটা স্বপ্ন নয়—তাঁর মনে হল—সত্যিই এসেছে কেউ। এমন তীক্ষ্ণ প্রবল ঝনৎকার স্বপ্ন হতে পারে না কিছুতে···।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এটাও স্বপ্ন। দরজাটা খুললেন, সিঁড়ির কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন পর্য্যন্ত। কোথাও কেউ নেই। আশ্চর্য্য লাগল বটে, কিন্তু আরামও পেলেন মনে মনে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন, তার পর মনে হল কপাটে খিল দেন নি। ফিরে দেখলেন একবার, না খিল দেন নি, ভেজান আছে। আগেও অনেকবার রাত্রে ফিরে ঘরে খিল দিতে ভুলেছেন তিনি। কি আর হবে—থাক। ঘড়িতে আড়াইটে বাজার শব্দ হল।···তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন তাহলে।

স্বপ্ন দেখে মনটা এমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে আর শুতে ইচ্ছে হল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। জানালার কাছে গিয়ে পরদাটা সরিয়ে দিলেন। গ্রীষ্মকালের রাত্রি শেষ হয়ে এল প্রায়—ভোরের আভাস দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নটা কিন্তু কিছুতেই তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। ওই লোকটাকে তিনি যে মেরেছেন—মারা যে সম্ভব হল তাঁর পক্ষে—এই অনুভূতিটাই কষ্ট দিচ্ছিল তাঁকে। কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না।

"ও রকম লোক নেই, কেউ ছিল না, থাকতে পারে না—ওটা শুধু স্বপ্ন। কেন মাথা ঘামাচ্ছি এ নিয়ে!"

যতই নিজেকে বোঝাতে লাগলেন ততই উত্তেজনা বাড়তে লাগল, ততই যেন মনে হতে লাগল তাঁর সমস্ত কষ্টের মূল কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয়···আসন্ন একটা বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে।

ক্রমশঃ বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন এ কথা ভাবলে কষ্ট হত তাঁর। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেলে নিজেকে আরও কষ্ট দেবার জন্য নিজের বার্দ্ধক্য এবং দৌর্ব্বল্যকেই বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতেন তিনি।

"জরা"—মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলেন তিনি—"হ্যাঁ জরাই। জরা ছাড়া আর কি। শরীরে শক্তি নেই—স্মরণ শক্তিও নেই···তাছাড়া ভূত দেখছি...অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখছি···স্বপ্নে ঘণ্টা বাজছে! চুলোয় যাক ···চুলোয় যাক···একটা অসুখ করবে আর কি···অসুখেরই পূর্ব্বলক্ষণ এ সব। ওই বেঁটে লোকটাও স্বপ্ন সম্ভবতঃ কাল যা ভাবছিলাম, আমিই তার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, সে কিছু করে নি...সবই আমার সৃষ্টি। নিজেই ভূত সৃষ্টি করছি, নিজেই তার ভয়ে টেবিলের তলায় লুকোচ্ছি। আশ্চর্য্য—তার উপর রাগই বা হচ্ছে কেন, ছোটলোকই বা বলছি কেন তাকে মিছিমিছি! হয় তো খুবই ভদ্রলোক সে আসলে। দেখতে ভাল নয়। বেঁটে—তাতে হয়েছে কি···পোযাক-পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মতই। কিন্তু লোকটার চোখের দৃষ্টিতে কি যেন একটা আছে···ওই, আবার সুরু করেছি। তার কথা বার বার ভাববার দরকার কি। তার চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তা আবিষ্কার করে' কি হবে আমার ঘোড়ার ডিম! ও ছাড়া কি আর ভাববার কিছু নেই!···"

হঠাৎ একটা কথা ভেবে মনের ভেতরটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। হঠাৎ তাঁর বিশ্বাস হল ওই বেঁটে লোকটা তাঁর পূর্ব্বপরিচিত—শুধু পূর্ব্বপরিচিত নয়, তাঁর জীবনের কোন গোপন কথা জানা আছে ওর, তাই দেখা হলেই চোখে ওই দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

জানালাটা ভাল করে' খুলে দেবার জন্যে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভাবলেন বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকুক একটু, আর— হঠাৎ আপাদমস্তক শিউরে উঠল তাঁর···মনে হল অসম্ভব একটা ব্যাপার চোখের সামনে ঘটছে যেন।

জানালাটা তখনও ভাল করে' খোলেন নি তিনি। চট্‌ করে' সরে' এসে জানলার একধারে লুকিয়ে পড়লেন। ঠিক জানলার সামনে ওদিকের শূন্য ফুটপাথে সেই বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর জানলার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পায় নি বোধ হয় তাঁকে, ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে কি যেন···ভাবছে কিন্তু ঠিক করতে পারছে না···হাতটা তুলে কপালে বুলিয়ে নিলে একবার। আর দ্বিধা রইল না···ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে একবার, তারপর চোরের মতো পা টিপে টিপে রাস্তাটা পার হতে লাগল। হ্যাঁ, এই বাড়িতেই ঢুকছে। গলিটার দিকে গেল···

"আমার কাছেই আসছে"—চকিতে মনে হল পুরন্দরবাবুর এবং তিনিও পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন। ভেজান দরজাটার সামনে স্তব্ধ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন···সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাবে এখনই।

বুকের ভিতর এমন কাঁপছিল। লোকটা পা টিপে টিপে যদি আসে কোন শব্দই শুনতে পাবেন না হয়তো। কি যে হচ্ছিল তা যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারছিলেন না একটুও, কিন্তু শতগুণ অনুভব করছিলেন সমস্ত সত্তা দিয়েই। স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হচ্ছে। পুরন্দরবাবু সাহসী

লোক। অনেক সময় অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি—লোকের কাছে বাহাদুরি পাওয়ার জন্যে নয়—নিজেকে পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু এখন যা হ'ল তাতে সাহস ছাড়া আরও কিছু ছিল। যিনি একটু আগে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ভুগছিলেন তিনি সহসা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। অন্য লোক যেন! একটা নীরব অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বন্ধ দ্বারের ভিতর দিয়েই তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন।

"ওই আসছে, এসে পড়ল, চারিদিকে চেয়ে দেখছে, কান পেতে শুনছে কি যেন দম বন্ধ করে'—উঠছে এইবার…ওই। কপাটের কড়াতে হাত দিয়েছে…"

তিনি যা ভাবছিলেন ঠিক তাই হয়েছিল, দরজার ওপারে সত্যিই একজন দাঁড়িয়েছিল এসে, কড়াতে হাতও দিয়েছিল নিঃশব্দে। পুরন্দরবাবু আর থাকতে পারলেন না, কেমন যেন অদ্ভুত উন্মাদনা একটা পেয়ে বসল তাঁকে। হঠাৎ কপাটটা খুলে ফেললেন। সেই বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার তামসিক সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এস্-সি

ঘটনাগুলির সময় হয়ত ঠিক মনে আসিতেছে না—যুদ্ধ, বোমাবর্ষণ, বিতাড়ন বা পলায়ন, ঘূর্ণাবর্ত্ত, বন্যা, কালীপূজার প্রমোদশালার শ্মশানীভূত অবস্থা—ইত্যাদি নানা দুর্ঘটনা বাঙ্গালার বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—বস্ত্রহরণপর্ব্ব তখনও ঘটে নাই। এমন দিনে এক বন্ধু—পণ্ডিত, প্রফেসার ও বৈজ্ঞানিক—বলিলেন, আহা হা কি চমৎকার লিখিয়াছে, কি সুন্দর ভাষার জোর এবং তর্কের বিস্তার। লেখক যেমন পণ্ডিত তেমনই সুসাহিত্যিক, তিনি দেখাইয়াছেন বাঙ্গালী জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম লেখক কি ধ্বংস নিবারণের কোনও উপায় দেখাইয়াছেন। শুনিলাম—না। বলিলাম—তাহা যদি হয় এ সাহিত্য তামসিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। যাহাতে মনে মোহ, দুঃখ, দৈন্য, বিষাদ ও নৈরাশ্য আসিয়া উপনীত হয় তাহা তামসিক সাহিত্য। উহা লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করে।

দুর্ভিক্ষের সময় একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পের নায়ক দিল্লী অঞ্চলে বড় চাকরী করিতেন। পল্লীগ্রামে এক সম্পর্কীয়া আত্মীয়াকে (কতকগুলি ছেলেমেয়েসম্পন্না) মাসিক কিছু সাহায্য করিতেন। দুর্ভিক্ষের কয়েক মাস পরে একদিন তাহার মনিঅর্ডার ফিরিয়া আসিল, মালিকের সন্ধান হইল না বলিয়া। কয়েক মাস তাহাদের কোনও সংবাদ না পাওয়ায় কলিকাতায় আসিয়া তাহাদের সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। যাহা জানিলেন তাহাতে বিষাদগ্রস্ত হইলেন। তাহারা ভদ্রঘরের পক্ষে অনামকর কলুষিত জীবন যাপন করিতেছে।

ঐ গল্প এবং ঐ প্রবন্ধ তামসিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। উহাদের পাঠে মনে যে বৃত্তির উদয় হয়—তাহা নৈরাশ্য, বিষাদ বা ভয়। উহা দ্বারা জগতের উপকার হয় না বরং অপকারই হয়।

রাজসিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত এই যুদ্ধে দেখিতেছি। জার্ম্মান জাতি হিটলার সাহিত্য দ্বারা উত্তেজিত হইয়া জগৎকে জ্বালাইয়াছে এবং এখন নিজেরা জ্বলিতেছে। রুসো, ভলটেয়ার প্রভৃতি বিপ্লব-পূর্ব্ব লেখকদিগের জ্বালাময়ী লেখা রাজা ও অভিজাতবর্গের উপর লোকের উৎকট বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সৃষ্টি করে। লেনিন প্রভৃতির লেখাও এই জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঐ সকল রাজসিক জ্বালাময়ী লেখা রাশিয়ার ও ফ্রান্সের সম্রাট ও অভিজাতবর্গের ধ্বংসের প্রধান কারণ।

বঙ্কিমচন্দ্র নব্য লেখকদিগের প্রতি উপদেশ দিয়াছিলেন "যদি এমন মনে বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" ইহাই সাত্ত্বিক সাহিত্য—যাহা দ্বারা আমাদের জ্ঞানবৃত্তি বা কার্য্যকরী বৃত্তি বিকাশ পাইবার সুবিধা পায়।

তামসিক সাহিত্যের ফলে কিরূপ ক্ষতি হইতে পারে তাহা বলিতেছি। দুর্ভিক্ষের সময় সকলেই ক্ষুধার্ত্তকে কিছু কিছু অন্ন দিয়াছি। কিন্তু এখন মনে বিষাদ হয়,—আরও সাহায্য দিয়া কতক লোককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম না। বিষাদপন্থীরা ক্রমাগত প্রচার করিতে লাগিলেন—সব রসাতলে গেল, বাঙ্গালা নিঃশেষ হইবে, এ বৎসর দরিদ্রেরা গেল, আর বৎসর মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হইবে। চালের দাম যখন দশ হইতে পনর কুড়ি তিরিশ চল্লিশে উঠিল তখন ঐ সকল প্রচার ফলে লোকের মোহ হইল। চল্লিশ টাকা মণ চাল কিনিয়া কি প্রকারে পোষ্যবর্গকে বাঁচাইয়া রাখিব ইহা ভাবিয়া লোকের দানবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তাহা না হইলে আরও অনেক লোক বাঁচিত।

লেকের অশ্বত্থতলা ক্লাবের অনেক বৃদ্ধ বলিলেন, এই যুদ্ধ বহুকাল চলিবে, আমাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না এইরূপ বলিয়া নিজেদিগকে আশঙ্কিত করিয়াই যেন আনন্দ পাইতেন। আমি—যুদ্ধ শীঘ্রই মিটিবে এবং আমাদের দুর্দ্দশারও অবসান হইবে এইরূপ বলিতাম। একদিন এক বন্ধু বলিলেন আপনি এরূপ বলেন কেন? বলিলাম—এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী—ওয়েলস্, চিনে গণৎকার, ইজিপ্টদেশী গণৎকার, বাগচীর পাঁজী এবং সেই পাঞ্জাবীটি যে ভবিষ্যৎবাণী লিখিয়া এবং তাহা প্রচার

করিয়া কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে—কাহারই মেলে নাই—অতএব আমারও না মিলিলে দুঃখিত হইব না। যখন সবই অনির্দ্দিষ্ট তখন মন্দটা ভাবিয়া দুঃস্বপ্ন দেখার চেয়ে ভালটা ভাবিয়া সুস্বপ্ন দেখাটা কি ভাল নয়?

রাজসিক ও তামসিক সাহিত্যে মিশাইয়া কিরূপ বীভৎস সাহিত্য লিখিত হইতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্ত কিছুকাল হইল দেখিয়াছিলাম। লেখক আমার সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় একজন অধ্যাপক। গল্পটি একটি পোল বা ঐ জাতীয় গ্রন্থ হইতে অনুবাদ। এক বৃদ্ধ ও তাহার তিন কন্যা নিজ দেশ হইতে বাহির হইয়া পাহাড় উৎরাইয়া অপর দেশের দিকে যাইতেছে। কন্যাগুলি সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। পথিমধ্যে চুরি করিয়া কিছু উপকরণ লাভ। পরে চুরি ও হত্যা। মেয়েগুলি চৌর্য্যকার্য্যে ও হত্যাকার্য্যে দক্ষ হইয়া উঠে। অনেকগুলি হত্যার বিবরণ আছে। পাহাড়ের গুহায় ডাকাতির মাল অনেক জমিয়া উঠে। শেষে এক হত্যা ও ডাকাতীর পর গ্রামবাসীরা তাহাদের পদাঙ্ক ধরিয়া অনুসরণ করিতে থাকে। ক্রমশঃ সকলে ফিরিয়া যায়। কেবল একটী যুবক দূরে থাকিয়া অনুসরণ করে। ডাকাত ও ডাকাতীরা হঠাৎ যুবককে বন্দী করে। মেয়েরা তাহাকে সেইখানেই হত্যা করিতে উদ্যত। বৃদ্ধ থামায়। বলে উহাকে দিয়া মুটিয়ার কাজ করা হইবে। তারপর মারিয়া ফেলিলেই হইবে। হস্তপদবদ্ধ যুবক তাহাদের গুহায় আনীত হয় এবং মেয়েগুলি তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া শুইয়া পাহারা দিতে থাকে। বৃদ্ধ পথের সন্ধানের জন্য বাহিরে যায়। এই সময় সেই যুবককে অধিকার করিবার জন্য মেয়েগুলির মধ্যে বীভৎস বিরোধ। পরে একটি মেয়ে ভগ্নিদের উপর রাগ করিয়া যুবককে ছুরী মারিয়া হত্যা করে। এমন সময় পিতার আবির্ভাব। যষ্ঠীপর বৃদ্ধ অধ্যাপক এই গল্পটি কেন অনুবাদ করিতে গেলেন তাহা বুঝিতেছি না।

প্রবন্ধটী এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া জনৈক সাহিত্যিক বলিলেন—ঘটনার স্বরূপ বর্ণনা (realistio) করাও সাহিত্যের কর্ত্তব্য। স্বরূপ বর্ণনাকারী সাহিত্য সম্বন্ধে ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বের এক ঘটনা তাহাকে বলিলাম। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক মাসিকপত্র প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন এবং একজন স্বরূপ বর্ণনাকারী লেখকও এই পত্রে লিখিতে লাগিলেন। তাহার যথাযথ বর্ণনা প্রণালী তৎকালীন নব্যদলের হৃদয় আকর্ষণ করিল। তৎকালীন বৃদ্ধগণ অবশ্য নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিলেন। উক্ত লেখক কয়েক মাস পরে এক বেশ্যা গৃহের এমন বর্ণনা করিলেন যে একজন হাইকোর্টের জজ (এরূপ একটা গল্প সেই সময় রটিয়াছিল) কাগজ খানিকে সম্পাদকের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া আর কাগজ পাঠাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। একটি যুবকসঙ্ঘে বিচারকের ঐ কার্য্যের বিচার চলিতেছিল। একজন বলিলেন—হাউপ্টম্যান প্রভৃতি বড় লেখক এর চেয়েও অনেক কুচিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। আমি বলিলাম—কাব্য এবং কলাসাহিত্যে অনেক পরিমাণে যে বাজীকরণ গুণসম্পন্ন (reotic) তাহা অস্বীকার করা যায় না। বড় লেখক আর ছোট লেখকে পার্থক্য এই যে, ছোট লেখকের লেখায় শুধু এই বাজীকরণ গুণই থাকিয়া যায়। বড় লেখকেরা কিন্তু পরে আরও উচ্চ শ্রেণীর ভাবসমূহ, করুণা, লোক-হিতৈষিণা প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশ করিয়া থাকেন। বার্ণার্ডশ ও ব্রিয়ে প্রভৃতির লেখা ইহার উদাহরণ। আজ বহুকালের পর ইহা বলা যাইতে পারে—যে লেখকের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল তিনি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠনামা হইতে পারেন নাই। এখনকার খুব কম লোকই তাহার নাম পর্য্যন্ত জানে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে বিয়োগান্ত নাটক বা কাব্য বা উপন্যাস দোষার্হ। ইহারাও তামসিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। বিয়োগান্ত গল্পের পাঠের পর পাঠকের মনে যে ভাব স্থায়ী হয় তাহা শোক ও বিষাদময়—তমোগুণ হইতে উদ্ভূত। বহুকালের একটি গল্প মনে পড়িতেছে। নদীয়া জেলার বিখ্যাত অধ্যাপকের ঠাকুর দালানে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এক প্রসিদ্ধ যাত্রা দল আসে এবং একদিন পালা গাওনাও হয়। এই যাত্রাদল অভিমন্যুবধ পালা গাহিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। যুবকদল এই পালা শুনিবার জন্য খুব উদ্গ্রীব ছিল, কিন্তু অধ্যাপকের ভয়ে তাহাদের মনবাসনা পূর্ণ হয় নাই। কারণ তিনি বিয়োগান্ত যাত্রা বাটিতে হইতে দিবেন না। যুবকরা যাত্রাদলেরসহ ষড়যন্ত্র করিয়া অধ্যাপক নিদ্রা গেলে তাহার ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া গভীর রাত্রে ঐ পালা যাত্রা আরম্ভ করিয়া দেয়। পরে অধ্যাপক উহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন ও হাঙ্গামা করেন। বর্ত্তমান যুগের মনস্তত্ত্ববিদ্যার কুয়েইজম্ (Couism) এর সাহায্যে আমরা পণ্ডিতের ও প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মনোভাব বুঝিতে পারি।

মেসমেরিজমের সাহায্যে অনেক লোকের রোগ সারিয়া যায়। মেসমেরিষ্ট রোগীর সামনে হস্তের বা অন্য পদার্থের বিবিধ গতি-ভঙ্গি করিয়া রোগীকে বলেন তোমার রোগ সারিয়া যাইতেছে। ইহাতে অনেকের রোগ সারিয়া যায়। প্রথম প্রথম লোকে ভাবিত—মেসমেরিষ্টের শরীর হইতে কোনও অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ—জান্তব চুম্বুকার্ষণ (animal magnetisim), রোগীর দেহে প্রবেশ করিয়া রোগ আরোগ্য করে। এখন জানা গিয়াছে রোগীর নিজের কল্পনা বা ভাবনাই রোগ আরোগ্য করে। মেসমেরিষ্ট শুধু সেই আরোগ্যের বার্ত্তা বা মন্ত্র (suggestion) রোগীকে দেয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের মন্ত্র গ্রহণ করিবার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন। কল্পনাশক্তি কাহারও বেশী, কাহারও কম। সম্মোহন কর্ত্তার বা মন্ত্রদাতার ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য করে। রূপ, কুরূপ, দাড়ি জটা বেশভূষা নানাভাবে লোকের অবচেতন মনের (subconscious self) উপর প্রভাব বিস্তার করে।

কুয়ে নামক ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ দেখিলেন, কোন কোনও লোকের মন উল্টা ভাবে কাজ করে। তাদের যদি বলা যায় তোমার রোগ আরোগ্য হইতেছে তাহা হইলে তাহারা কল্পনা করিতে থাকে বোধহয় আমি খারাপই হইয়া যাইতেছি। এই সকল লোকের মন কু গাহিতেই যেন ভালবাসে। কুয়ে তাহাদের রোগ আরোগ্য করিবার জন্য এক প্রণালী আবিষ্কার করেন, তাহা কুয়েইজম্ নামে খ্যাত। তাহার প্রণালী এইরূপ:—"আমি প্রত্যেক দিন সর্ব্বভাবেই আরোগ্য হইতেছি" এই

মন্ত্রটি প্রত্যহ নিদ্রার পূর্ব্বে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অর্দ্ধসুপ্তভাবে কয়েকবার আবৃত্তি করিবে। আবৃত্তি খুব দ্রুত করিতে হইবে—অনেকটা আমাদের মন্ত্র পড়ার মত। আমি আরোগ্য হইতেছি—বলিয়া একটু সময় অপেক্ষা করিলে—মন হয়ত সেই সময় গাহিবে না, আমি কোথায় ভাল হইতেছি—মন্দই ত হইতেছি। মন যাহাতে ঐরূপ কু গাহিবার সময় না পায় সেই জন্যই দ্রুত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হইবে। ঐরূপ আবৃত্তির ফলে অবচেতন মন অনেক সময় কল্পনায় অভিভূত হইয়া শরীর-যন্ত্রগুলিকে এমন নিয়ন্ত্রিত করে যে রোগ আরোগ্য হয়।

মনস্তত্ত্বের ঐ সকল অংশের আলোচনা করিয়া আমরা অধ্যাপকের বিয়োগান্ত অভিমন্যুবধ নাটকের উপর বিরাগের কারণ পাই। ছেলেমেয়ে যুবকযুবতী যাত্রা শুনিতেছে। অভিমন্যুর অদ্ভুত বীরত্ব। ষোল বছরের ছেলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি রথীর সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছে। যাত্রার techniqueএ রথীগণ হারিয়া পলায়ন করিতেছে—অভিমন্যু তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। যুদ্ধের সময় অসির উপর অসি পড়িয়া ঝঞ্জনা শব্দ হইতেছে—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে—রণবাদ্য বাজিতেছে। সকলই লোককে মুগ্ধ করে। পরে শেষ যুদ্ধ সপ্তরথী বেষ্টিত আহত অভিমন্যুর পতন ও মৃত্যু। তার পর রোদনপর্ব্ব। কঠোর বীর বৃকোদর কাঁদে, যুধিষ্ঠির কাঁদে। দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা কাঁদে। সর্ব্বশেষ বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের নিদারুণ বিলাপ।

এই সাহিত্যের ফলে কোন কোন কল্পনাপ্রবণ কুমার বা কুমারী, যুবক বা যুবতীর মনে অভিমন্যুত্ব লাভ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে; বাপ কাঁদিতেছে, মা কাঁদিতেছে, আত্মীয়স্বজন কাঁদিতেছে—আমি মৃত্যুপথে যাইতেছি—এইরূপ একটা চূড়ান্ত কামনা অবচেতন মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিয়োগান্ত কাব্যের সূচনা করিতে পারে। তাই প্রাচীন আলঙ্কারিক আমাদের অধ্যাপক বিয়োগান্ত সাহিত্যের বিরোধী।

চোর

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

দেশে তখন গৌরীদান প্রথা।

মাত্র আট বৎসর সাত মাস বয়সের সময় মনোরমা শ্রীমাধবকে তার স্বামী বলে জান্‌ল। ঐ জানার মধ্যে কতটুকু তার মন তখন জেনেছিল কে জানে? শ্রীমাধব কিন্তু বিয়ে ক'রবে কি!—সে তখন বিশ-বাইশ বছরের ষোলআনা পুরুষ। বাঁ পাশে অতটুকুন ছোট্ট মেয়ে এসে দাঁড়াবে এ যেন তার কাছে কেমন ধারা লাগ্‌ল, মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, রাত্রে আবার তো খেলাঘরের পুতুলের জন্য কেঁদে উঠ্‌বে না?

বছর চলে যায়, ছাপ রেখে যায় মনোরমার দেহে। মনোরমার তখন কত আনন্দ! বিয়ের প্রথমবারে যখন শ্রীমাধবের কাপড়ের আঁচলে নিজের আঁচল জড়িয়ে স্বামীর বাড়ীতে আসে, বুক ফেটে তখন মনোরমার কত কান্না! মনে হয়েছিল, বিয়ে আবার কি?—এই আঁচলে আঁচল মিলনের মধ্যে এবং পুরুতঠাকুরের অং বং কয়েকটা মন্ত্র আওড়ানোর মধ্যে এমন কি না-দেখা জোর আছে যা' নাকি তাকে তার বাপমায়ের এবং ভাইবোনের কাছ হতে দূরে ছিনিয়ে আনে। তার মত নিরীহ বালিকার উপর ওটা যেন একটা বড় অত্যাচারের সামিল। সে ক্ষেপে উঠ্‌ল। এ বাঁধন সে তখনই ছিঁড়ে ফেল্‌বে—শ্রীমাধব তো আগে আগেই চল্‌ছে, সে-ই তো পেছনে। আস্তে বাঁধন মুক্ত করে চলে যেতে তার একটুও আট্‌কাবে না; আর দিদি যে দুষ্টু, যদি তেমনই শক্ত করে বেঁধে দিয়ে থাকে তবে তো নিরুপায়—তার ছোট ছোট দু'টী চোখের জলে অত বড় একটা পুরুষের মন ভেজাতে সে কিছুতেই পারবে না।—এ কথাগুলো ভাব্‌তেও এখন মনোরমার অনেক লজ্জা হয়। ছিঃ ছিঃ, আঁচল ছিঁড়ে গেলে কি কেলেঙ্কারীই না হ'ত, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে নিজেকে বঞ্চিতা করে রাখত।

একটী করে বছর কালের চাকায় গড়িয়ে যায়, আর শ্রীমাধব মনোরমাকে মনে করিয়ে দেয় তার এই ষোল—এই সতের। বছরগুলোকে মনোরমার তখন বেশ ভাল লাগে। অতটুকু ছোট্ট বালিকা হ'তে বছরের কোলে ভেসে ভেসে সে তখন জীবনের স্বাদ পেয়েছে, কিন্তু এই বছরগুলোই যে আবার তার যৌবনকে চুরি করে কবরের পথে টেনে নেবে, তাও আবার তা'কে বৃশ্চিকের মত দংশন করে।

বছরটী আমার জীবনের বাঁ পাশে চলে যায়, আর আমার মন ভরপুর হ'য়ে ওঠে—বছর গুলোকে আমি, তোমাকে যা' ভালবাসি তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি—মনোরমা বল্ল শ্রীমাধবকে।

কিন্তু এই বয়সই তোমাকে একদিন বুড়িয়ে দেবে। তখন কিন্তু সকলের চেয়ে আমাকে মধুর লাগবে—আমি ছাড়া নান্য পন্থা! হেসে হেসে শ্রীমাধব উত্তর করল।

—না কিছুতেই না। কিছুতেই আমি বুড়িয়ে যাব না। যদি যাই তো তোমার অসাবধানতায়।

তার মানে?

অতি সহজ!—আমি তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকব বছর-চোরের ভয়ে। সেখানেই আমার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। স্ত্রীলোকের

রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা স্বামী—এ সত্য তুমি কি অস্বীকার করবে?—মনোরমা প্রশ্ন করল।

শ্রীমাধব কি উত্তর করবে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারল না। স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্ত্তা যে পুরুষজাতি, এতবড় সত্যটাকে এমন কোন মিথ্যা নেই যা' দিয়ে ঢেকে রাখা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে বছরের চোখের আড়ালে রেখে সর্ব্বাঙ্গে যৌবনটীকে অটুট ভাবে লাগিয়ে রাখবে তাও কারুর ইচ্ছার আয়ত্তের মধ্যে নয়। কি আর তখন বলে শ্রীমাধব, অথচ স্ত্রীর কাছ হতে আসা এমন একটী জটিল এবং আব্‌দার-মাখানো প্রশ্নের উত্তরে একেবারে কিছু না বল্‌লে নিজের পরাজয় হয় এবং মনোরমাও মনঃক্ষুণ্ণ হয় বৈ কি।

তোমার যৌবনের বিচারক তো আমিই মনোরমা। মনকে আমি তোমাকে সুন্দর দেখবার জন্য ঠিক রঙিণ করে রাখবই। নিতান্তই যদি নিরস তরুবর হয়ে পড়ি, না হয় তুমি একটু রঙিণ সুরা হাতে করে সাকী হ'য়ে আমার জীবনে এসো—আমার তোমাকে যেমনটী দেখ্‌লে তুমি সুখী হও তেমন কাঁচ আমার চোখে লাগিয়ে দিও—শ্রীমাধব হঠাৎ বল্‌ল।

সুখের সংসার তাদের এম্‌নি ভাবে একটানা চ'লেছে। কোথাও থামছে না তাদের মনের লীলায়িত গতি। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, সবগুলো একত্রিত হয়ে যুগও চলে যায়; কিন্তু কেউ তাদের সংসারে এলো না। মনোরমা দু'এক সময়ে দুঃখ করে বলত, বাড়ীটা যেন একেবারে খাঁ খাঁ করে। ঘরে দোরে ছেলেমেয়ের এলোমেলো চীৎকার, হঠাৎ কান্না, অকারণে হাসি—এ সমস্তর অভাবে মেয়েদের অন্তর একদিকে শূন্য হ'য়ে থাকে। সেই শূন্যস্থান অপূর্ণ থাক্‌লে সৃষ্টি হয় এক মানসিক অশান্তির পাথার।

মনোরমা 'মা' ডাক শুনছে না—এটা তা'কে মাঝে মাঝে পীড়া দিত। সে নিজে যতটা না বেশী ভাবত, ততটুকু ভাবিয়ে তুলত পাড়াপ্রতিবেশীনীরা। তাদের যেন কত দরদ! মনোরমা দু'এক সময় ঠিকই বুঝত যে, পানসুপারী চিবানোর জন্য এ কথাগুলো তাদের গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও মন না মানে মানা; বিশেষ করে মেয়েমানুষের মন।

বুভুক্ষু মন মনোরমার। মা হওয়ার সাধ আর সকল মেয়েদের যেমনটী থাকে, মনোরমারও থাক্‌তে দোষ কি, ছিলও। কিন্তু সেই ডাক কানে শোনা তার ভাগ্যে হ'য়ে ওঠে নি। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যে সুখের সংসার বয়ে চল্‌ছিল, হঠাৎ মনোরমার বিয়োগ ব্যথায় তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ভগবান কি নিষ্ঠুর! দু'জন যেখানে পরমপ্রীতিতে এক হ'য়ে দিন কাটাচ্ছে, সেখান হ'তে যদি কেউ নেয় বিদায়—চিরবিদায়—তবে যে রয়ে গেল—সে যে শুধু বাকী জীবন কাঁদতেই রয়ে গেল—এই সিদ্ধান্ত ছাড়া এর মধ্যে ভগবানের আর কোন্ মঙ্গল ইচ্ছার নিহিত সন্ধান পাওয়া যেতে পারে? শ্রীমাধবের সম্বল এখন শুধু ভবিষ্যতের বুকে ফেল্‌তে কয়েক ফোটা চোখের জল; তাও কতদিনে ধারা হারিয়ে যায়, কে জানে?

শ্রীমাধবের পেটের ক্ষুধা তার চোখের জল ছাপিয়ে উঠ্‌ল। ক্ষুধা কোন বাঁধা মানে না; পেট নিয়ে মানুষের তাই যত যন্ত্রণা। ক্ষুধার তাড়া, যদি না থাকত তবে সে এখন সন্ন্যাসী হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে পারত। চোখদু'টী তাকে যেদিকে টেনে নিয়ে যেত সেদিকে যেতে তারও কোন ওজর আপত্তি থাক্‌ত না। সে যেত, নিশ্চয়ই যেত। কি তার এদিকে এমন ঠেকা আছে, যা নাকি তাকে এখন এখানে ধরে রাখ্‌বে? তার আপন বলার মত এ সংসারে কেউ নেই; নিতান্ত প্রয়োজনেও যে এক গ্লাস জল তার তৃষ্ণার্ত্ত ঠোঁটের কাছে এগিয়ে ধরবে তেমন লোকটী পর্য্যন্ত নেই। আশ্চর্য্য হয়ে শ্রীমাধব ভাবে।—পৃথিবীর যে দিকে তাকায়, ভর্ত্তি দেখে লোকে—অথচ সেই অগণিত লোকের মধ্যে কি তাঁর আপন বলার মত একটী লোকও নেই!

সে ঠিক করল তার ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে, আর এখানে থাকবে না। এ যায়গা ছেড়ে না গেলে, প্রতিদিন প্রতি পদে মনোরমার স্মৃতি তাকে ব্যথা দেবে, তাকে কাঁদাবে। মনকে সে ঠিকই করে ফেললো। ঘরে গেল শ্রীমাধব। হঠাৎ আবার ঠিক করলো তার যাওয়া হবে না,—কিছুতেই না। কাচ-লাগানো আল্‌মারীর ভেতরে রাখা মনোরমার নানান বয়সের ছবিগুলো যেন যুগপৎ তার দিকে চেয়ে আছে—ফটোর চাহনি তার পথের বাধা হ'য়ে দাঁড়াল। মনোরমার ঐ চাহনিতে যেন কত প্রার্থনা, কত আকুলতা—প্রত্যাখ্যান করে শ্রীমাধবের সাধ্য কি? তা' ছাড়া মনোরমা তার সাজান ঘর-দোর স্বামীর ওপরে রেখে চলে গেছে। শ্রীমাধব এখন কাকে আবার দিয়ে যাবে. তাই স্মৃতির ব্যথা বুকে করেই স্মৃতিকে বাড়িয়ে চলবে। আলমারীর মধ্যে সাজানো মনোরমার কয়েকখানা ফটো, বাপের বাড়ীর ও শ্রীমাধবের দেওয়া মনোরমার মনোমত অনেক রকম গয়না এবং শ্রীমাধবের জন্য নিজ হাতে সেলাই করছিল সেই অসমাপ্ত রুমালখানা আজও মনোরমার হাতের কোমল পরশ নিয়েই প্রাণবন্ত রয়েছে। শ্রীমাধব নিজে তা ছোঁয় না, অপরকেও ছুঁতে দেয় না; ছুঁলেই যেন মনোরমা তখনও যতটুকু বেঁচে আছে সেটুকুনেরও মৃত্যু হয়ে যাবে—এই তার ভয়। সামনে একটা টেপয়ে সে রোজ সন্ধ্যায় মনোরমার উদ্দেশ্যে দেয় ধূপ-দীপ, আর প্রত্যেক বার ৺পূজার সময় দেয় একখানা করে নূতন শাড়ি। শাড়িগুলো মেঝেতে জমা হয়ে আছে—অনেকগুলো।

শ্রীমাধবের সংসার তখন অনেক বড়। কতকগুলো অনাথা মেয়ে ও ছেলে শ্রীমাধবের জিম্মায়। শ্রীমাধব নিজের হাতে তাদের মানুষ করে। স্নান করে এক সঙ্গে, পাছে কেউ বেশী জল গায়ে মেখে জ্বর না আনে। নিজেই লেখাপড়া শেখায়, নিজেই আবার খেলার সাথী হয়। মনোরমা একদিন কথায় কথায় তার মনের দৈন্য জানিয়েছিল, ঘরে দোরে ছেলেমেয়ে না থাকলে সত্যিই একেবারে শূন্য মনে হয়। শ্রীমাধব তাই অবুঝের মত মনোরমার ফটোর কাছে গিয়ে তাকে আবার আসতে আহ্বান জানায়, বলে, "মনোরমা! তোমার ঘর এখন ছেলেমেয়েতে ভর্ত্তি, একটীবার তুমি কি এসে দেখে যাবে না?"

একটী একটী করে শ্রীমাধবের কাছে অনেক অনাথা মেয়েছেলে স্রোতের মত চলে এসেছে। এতগুলো ছেলেমেয়ে সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে যে শ্রীমাধবের যা' নাকি বিত্তপসারের আয়, তার সাহায্যে তখন আর তার সংসার চল্‌তে পারে না। চল্‌তে পারে না বলে এই অজুহাতে

শ্রীমাধব নূতন আস্‌তে চায় এমন কোন ছেলেমেয়েকে ফিরিয়ে দেয় না এবং কোনদিন ফিরিয়ে দেয়-ও নি। নিজের অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকায় অনেকের কাছে শ্রীমাধবের হাত পাত্‌তে হয়েছিল এবং তার এই প্রচেষ্টা যাতে ফলবতী হয় এই জন্য রিক্ত হাত কারুর কাছ হতে ফিরিয়ে আন্‌তে হয় নি।

দশজনের মাসিক সাহায্যে ও শ্রীমাধবের যা' কিছু ছিল তা' দ্বারা শ্রীমাধবের সংসার তথা অনাথ-আশ্রমটি বেশ ভালই চল্‌ছিল—যতদিন পর্য্যন্ত না বাধা পেল একটা নির্ম্মম দুর্ভিক্ষের কাছ হ'তে। নির্ম্মম দুর্ভিক্ষ! এমন দুর্ভিক্ষ যা' প্রকাশ করতে লেখনী থেমে যায়, চোখের জলে বুক ভেসে যায়—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোন্ ছার্। সমস্ত দেশখানি দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর লেলিহান জিহ্বার অগ্রে। কেউ কাউকে সাহায্য করতে তখন পারে না। যার যা' কিছু আছে ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানে না খেয়ে জমা রাখে।

শ্রীমাধবের সংসার তখন আর কি করে চল্‌বে। অচল সংসার, কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্য শ্রীমাধবের ভালবাসা সচল। নিজের যা' ছিল সমস্তই একটী একটী করে শেষ হয়েছে—আছে শুধু মনোরমার সেই গয়না কয়েকখানা। জমিজমার আয় যা দুর্ভিক্ষের আগমনে প্রজারা ঠিক রাজভক্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে নি—ভবিষ্যতে আরও দুর্দ্দিন আস্‌তে পারে এই আশঙ্কায় কৃষক শ্রেণী ক্ষেতের উৎপন্ন শস্য রাজভাগ না দিয়ে গোটাটাই নিজের গোলায় তুলেছে। মরণ মধ্যবিত্তদের।

পালক-পিতা শ্রীমাধবের দিন তখন আর কাটে না। দুর্ভিক্ষের দিন বড় লম্বা। সোনায় সোহাগা হ'ল দুর্গাপূজা নিকটে এসে। শ্রীমাধবের তখন নূতন আর এক চিন্তা এসে মাথায় ঢুক্‌ল। হাতে একটী পয়সাও নেই, তার উপর যুদ্ধের দরুণ একখানা কাপড়ের দাম বৃদ্ধি হয়ে স্বাভাবিক অবস্থার চারগুণ হ'য়েছে। কিন্তু হায়! বালক বালিকারা দুর্ম্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য বল্‌তে কিছু বোঝে না। তারা জানে শুধু চাইতে, না পেলে কাঁদতে—অভিভাবককে কাঁদাতে।

"৺পূজার সময় নূতন কাপড় জামা ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে বেশী আনন্দ দেয়, আর যারা পায় না তারা শুধু কাঁদে"—এই কথাটাই শ্রীমাধবকে তখন বেশী ভাবিয়ে তুলেছে। একটী নয়, দু'টী নয়—অতগুলো ছেলে মেয়ে তার সাম্‌নে কাঁদবে ৺পূজার দিনে—সে কি করে তা সইবে? সাহায্য আসার তারিখ পেরিয়ে গেছে, কারুর কাছ হতে একটী পয়সাও এলো না। ২৩শে আশ্বিন আনন্দময়ীর সপ্তমীপুজো।

চব্বিশে আশ্বিনের রাত। রাত তখন দুপুর। সকলেই ঘুমিয়েছে, ঘুমায়নি শুধু শ্রীমাধব। তবু শ্রীমাধবের সন্দেহ যদি কেউ জেগে থাকে। আস্তে আস্তে তাই নাম ধরে দু' একজনকে সে ডাক্‌ল—কোন উত্তর এলো না।

চুপি চুপি সে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ছে। হাত তার কাঁপছে থর্‌থর্ করে, বুক কাঁপছে, চোখে আস্‌ছে অঝোরে জল। তবুও চোখের জলকে সে ফোঁটা কাটতে দেয় না—বাঁ হাত দিয়ে মুছে ফেলে।

পা টিপে টিপে শ্রীমাধব মনোরমার ফটো রাখা সেই আলমারীটার কাছে এসে দাঁড়াল। চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখ্‌ল, শেষ মুহূর্ত্তে তাকে কেউ দেখ্‌ছে কিনা। অতি যত্নে রাখা চাবিটী একটা ব্যাগের গহ্বর থেকে তুলে শ্রীমাধব আলমারীটার বুক চিরল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো মনোরমার গায়ের গন্ধ তার বহু ব্যবহৃত গয়নাগুলো থেকে—শ্রীমাধব চিন্‌ল সে গন্ধ। কোনদিন যা' আলমারী থেকে বের করবে না—নিজের মৃত্যু দিনেও মনোরমার হাতের ছোঁয়া জিনিষ নিজে না ছুঁয়ে জীবিত রেখে যাবে বলে ঠিক করেছিল; শেষ পর্য্যন্ত শ্রীমাধবের সে আশা কোথায় উড়ে গেল। তার পর বেছে বেছে কয়েকখানা গহনা তুলে নিজের আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাত্রির অন্ধকারে নিজেকে অদৃশ্য করে দিল!

ফেরার পথে শ্রীমাধবের মনে হ'ল মনোরমা তার দিকে চেয়ে আছে, আর সাম্‌নে যেন দেখ্‌তে পেল ৺পূজার দিনে নূতন জামা কাপড় নিয়ে তার পালিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে কত আনন্দের হৈ-চৈ!

মর্ত্ত্যের মায়া

শ্রীনীলরতন দাশ বি-এ

যুগ যুগ হ'তে এ ধরার সাথে আছে মোর বন্ধন,
তরুলতা তৃণে আমার পরাণে জাগে তার স্পন্দন।
নভে রবি শশী তারকার আলো—
প্রাণ দিয়ে সবে বাসিয়াছে ভালো,
সবার সঙ্গে হ'য়ে গেছে মোর মাখামাখি জানাজানি,—
আমারে ঘিরিয়া নিখিল ভুবন করে কত কাণাকাণি!
নিত্য নূতন দৃশ্যে শোভিত বিশ্বের চারিধার,
এই ধরিত্রী চির পবিত্র আমার মোক্ষদ্বার।
হেরি' ধরণীর ঋতু-উৎসব
হৃদয়ে আমার ওঠে কলরব;
বসুন্ধরার এত শোভা এত গন্ধবরণ গান—
ছাড়িয়া এ সবে চাহে না মরিতে মোর তনু মন প্রাণ।

সুন্দরী চিরউৎসবময়ী জননী পৃথ্বী মম
চিত্তের ক্ষুধা নিত্য মিটায় স্বর্গের সুধাসম।

অমৃতের সাথে আছে হলাহল,
আজ জীবনের দুখ-কোলাহল;

তবুও চিত্ত এ মহাতীর্থে মুগ্ধ দিবসযামি,—
মর্ত্ত্যের মায়া মোহ কাটাইয়া স্বর্গ চাহি না আমি!
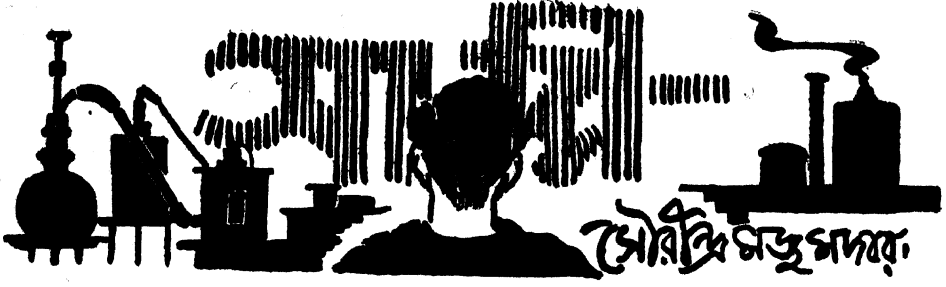
আমি ?

• আমি কী—কে ?

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিভিন্ন ধরণের উত্তাপ ও জলবায়ুর নানাপ্রকার অবস্থায় যে সকল মলিকুল এবং তার ভগ্নাংশ এটম—প্রোটন, ইলেক্‌ট্রোন, নিউট্রোন, পজিট্রোন ও মেসোট্রোনের বিভিন্ন রেডিএ্যামনের ভিতর অসংখ্য যোগবিয়োগে আকস্মিকভাবে যে প্রাণে হল পরিণত, আমি কি শুধু তারই সুসংস্কৃত শ্রেষ্ঠ সংস্করণ মাত্র। শেওলা আর মানুষ তার ভেতর রয়ে গেল লতা, বৃক্ষ, জন্তু। ক্রমিক ধারায় উন্নীত হল মানব। এর বেশি আর কিছু নয়। এর চেয়ে আরও উন্নততর কোন রহস্যময় সত্য আর নেই ?

অন্তহীন অনন্ত আকাশে ঘুরে বেড়ায় কোটি কোটি তারা আর সুস্পষ্ট ওই সূর্য। কোন এক শুভ মুহূর্তে কোন এক নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে এল নিজের বৃত্তি রেখা ছেড়ে সূর্যের বৃত্ত রেখার নিকটে। সূর্যের উত্তপ্ত গ্যাসে উঠল ঝড় আর অগ্নিময় তরল পদার্থে ডাকল জোয়ার। নক্ষত্রটি এলো আরও নিকটে। আশ্চর্য ! হল না সংঘর্ষ ; হঠাৎ সোঁ করে গেল ছুটে ফিরে। আকর্ষণে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ গেল ভেঙ্গে এবং খানিকটা বেরিয়ে এল সূর্য থেকে। টুকরো টুকরো হয়ে ঘুরতে লাগল বিভিন্ন শক্তির আকর্ষণে। ধীরে ধীরে স্থান করে নিল সূর্যের চতুঃপার্শ্বে। অগ্নিময় তরল পদার্থ জ্বলে জ্বলে জমাট বাঁধল লক্ষ লক্ষ বছরে। বিভিন্ন উপগ্রহের একটির নাম হল পৃথিবী। ধীরে ধীরে হল জল, পলিমাটি জমে জমে হল দৃঢ়। মাটির নীচে চাপা পড়ল জমাট বাঁধা ধাতু, কোথাও বা মাটি হল পাথরে পরিণত, আবার কোথাও ওৎ পেতে বসে রইল আগ্নেয়গিরি। নিয়মিত হল গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত। তারপর পৃথিবী হল প্রাণধারণের অনুকূল। প্রথম জীবন্ত কোষ, তার পর শেওলা, তার পর লতা, বৃক্ষ, পোকা—জন্তু—মৎস—বানর। আশ্চর্য লক্ষ লক্ষ বছরের রেডিএ্যশনে ও বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে বানর হল মানুষে উন্নীত। এই ত আমি—আর কোন নেই ইতিহাস ?

তবে শুধুমাত্র আকস্মিক সংযোগের পরিণতি মাত্র আমি। ভগবান কি নেই—কোন প্রয়োজনই কি তাঁর ছিল না। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর কোন প্রয়োজনই কি হল না—শুধু মাত্র কল্পনাবিলাস ভিন্ন ! যদি তিনি থাকেন তবে তিনি কি জড়পদার্থ মাত্র। নইলে নেই কেন কোন কিছুর পরিবর্তন। সবই কেন চলেছে বিজ্ঞানের কঠোর নিয়ম কানুন মেনে। যদি তিনি থাকতেন তবে সখ করেও কি অপরিবর্তনীয় ফরমুলার পরিবর্তন ঘটাতেন না।

কে জানে, হয়ত কোটি বছরের খেলা তাঁর কয়েক মুহূর্তের এক্সপেরিমেণ্ট মাত্র। সবই অদ্ভুত সবই অনুমানের খেলা মাত্র।

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে দাঁড়াল পথের ধারে। ঈশান কোণে তখনও রয়েছে জেগে দু একটি তারা—অস্ফুট তার আলোক, সূর্যের রশ্মিতে হয়নি নিষ্প্রভ। এও অদ্ভুত। কত ছোট ওই তারাটি অথচ কত বড় ! হয়ত ওই তারাটিই পৃথিবীর সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী, দূরত্ব প্রায় আড়াই আলোক বৎসর। ওর আলোক পৃথিবীতে পৌঁছতে আড়াই বৎসর লাগে। আলোকের গতি ১৮৬০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে। নিরর্থক ! কেন রয়েছে কোটি কোটি তারা উপগ্রহ—কী প্রয়োজন তাদের ? কি উদ্দেশ্যে ওরা যুগ যুগ ধরে অনাদি অনন্ত কাল ব্যাপী কল্পনাতীত সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডে একই নিয়মে ঘুরে বেড়াচ্ছে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে ? প্রথম কি একটি মাত্রই তারা ছিল ? কে জানে ?

অনুসন্ধিৎসু মনের শেষ কোথায় ?

এ সকল প্রশ্নের নিকট কোথায় তলিয়ে গেল মালবিকা, কোথায় চাপা পড়ে যায় ঘর সংসার, সমাজ রাষ্ট্র। এখানে নেই নেপোলিয়ান, নেই হিটলার, ষ্টালিন, নেই চার্চিল—রুজভেল্ট। মানুষ ত মানুষকে জানে না, চিনেনা—তবে কেন হিংস্রতা, শঠতা, শোষণ ও পীড়ন।

অদ্ভুত মানুষের মন। অর্থহীন এত বিরাট রহস্য তাকে স্তব্ধ করে দেয় না, জ্ঞানের অফুরন্ত অন্ধকার কক্ষের চাবি খুলে দেয় না।...

জয়ন্তর চিন্তাধারা আবার হোঁচোট খায়। মনে হয় এর শেষ কোথায় ? লক্ষ লক্ষ বছরে মানুষ যে এতদূর এগিয়ে এল, হয়ত কোটি বছরে আরও অনেক দূর পৌঁছে যাবে—তার পর ? রেডিয়্যামনে রেডিয়্যামান সূর্য যাবে মরে, পৃথিবী হবে হিমশীতল, সবই যাবে জমাট বেধে—কোন প্রাণই থাকবে না বেঁচে। কিংবা যেমনি করে হয়েছে পৃথিবীসৃষ্টি, তেমনি করে হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবী জ্বলে জ্বলে হবে অগ্নিময় তরল আর বিষাক্ত গ্যাস। তখন থাকবে না অতীত। আর এত বছরের সাধনা, এত জীবনপাত, এত সৃষ্টি, এত কীর্তি, এত গবেষণা—সব যাবে অন্ধকারে মুছে। এত বছরের যে এত বড় ইতিহাস তার একটি অক্ষরও থাকবে না বেঁচে। আবার যদি তারায় তারায় সংঘর্ষের ফলে নতুন কোন পৃথিবী সৃষ্টি হয় কোটি কোটি বছর পরে, তখন সে নতুন পৃথিবীর মানুষ কোটি বছরের সাধনায়ও জানবে না যে পুরাতন পৃথিবী ছিল।

আজ যদি সত্য সত্যই ভগবান থাকতেন এবং সবজানার শেষ মিলত তবে ?...

আমি যে আমাকেই জানি না। আমি যদি আমাকেই না জানিলাম না চিনিলাম, তবে যে এ জীবনের কোন সার্থকতাই হয় না।

আমি কি শুধু বিভিন্ন অনুপরমাণুর গতানুগতিক জীবন্ত কমপাউণ্ড মাত্র? আমি কি তবে ভগবানের অংশ বিশেষ নই। লক্ষ লক্ষ মুনিঋষির জীবনব্যাপী সাধনা কি ভ্রান্ত আত্মোপলব্ধি মাত্র। হয়ত হবে। নইলে আমিই যদি ভগবানের অংশ মাত্র তবে কেন আমার পৃথক সত্তা, পৃথক অনুভূতি। ভগবান ত' জল স্থল, আকাশ বাতাস, গ্রহ তারা, সৃষ্টি ধ্বংস, চিন্তা-অচিন্ত্য আমির অভঙ্গুর অপরিবর্তনীয় সমবায়—তবে আমি কে—এ প্রশ্ন কেন জাগে, কেন শেষ জানা যায় না?

জয়ন্ত পুনরায় চলতে সুরু করল। সুমুখে তার শেষ প্রশ্ন, পশ্চাতে তার—

জয়ন্ত সমাজ জীবনে নিজেই একটি প্রশ্ন। স্বাভাবিককে ব্যতিক্রম করে গেলে বাহাদুরী হয়না, ষ্টাইলও হয়না, কারণ আধুনিক সমাজে ইহাই অনুকরণীয় ফ্যাসন। জয়ন্তর জীবনে ফ্যাসন নেই, ষ্টাইল বললেও স্তায় মর্যাদা দেওয়া হয়না।

জয়ন্তর বাপ দিগ্বিজয়ী ব্যারিষ্টর, সমাজ জীবনে জনগণ কর্তৃক অভিনন্দিত। জয়ন্ত একমাত্র পুত্র। ভবিষ্যতে সে একাই হবে বড় বড় মিল ফ্যাক্টরীর লক্ষপতি মালিক। কাজেই য়ুরোপে দশ বছর বিদ্যার্জনের পর বিদ্যাচর্চা করে দেশে ফিরে কোন বড় চাকরী না গ্রহণ করলে, কিংবা পৈতৃক সম্পত্তির খপদ্দারী না করলে গতির অগতি হয় না, জীবনছন্দের ব্যতিক্রমও হয় না। অর্থসংকট যেখানে সেখানে তার স্বচ্ছলতার বাড়াবাড়ি। অথচ অর্থের প্রতি রয়েছে ঔদাসিন্য। বন্ধুরা বলে বোকা। জয়ন্ত কোন প্রতিবাদ করে না, কারণ ওরা মনের স্তরের বন্ধু নয়। অর্থ যদি মনের দিক থেকে সহজ না হয় তবেই মানুষ অর্থ কামনা করে, লক্ষ টাকাকে কোটিতে পৌঁছানোর জন্য মানুষ অর্থ উৎপাদক জন্তুতে পরিণত হয়, জীবন থেকে হয় বঞ্চিত। কিন্তু মনের মাঝে যদি অর্থ সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করে তবে সহজলভ্য অর্থ সহজ হয়েই থাকে, ভ্রান্ত কামনার ইন্দ্রধনুচ্ছটায় জীবনকে অজীবনের পথে ঠেলে নেয় না।

বুদ্ধিমান বন্ধুরা বলে, লাখো লাখো টাকা রয়েছে ক্রমোস্ফীতি পথে, তাই জয়ন্তর অর্থ বৈরাগ্য চাল। অত্যধিক ডিগ্রীর গর্বে মনে লেগেছে বিদ্যার নেশা, ব্যবসায়ী মনটা পড়েছে চাপা। সহজ কথায় বলতে গেলে, এ যেন চাষার গ্র্যাজুয়েট ছেলের বাপের চাষ করা শস্যের প্রতি স্বাভাবিক অবহেলা।

কথাগুলি জয়ন্তর উদ্দেশ্যে বলা—কাজেই কানে পৌঁছানো হয়। খোঁচা দিয়ে বলা, অথচ খোঁচা লাগে কি লাগে না, কিছুই বোঝা যায় না। কাজেই শেষটায় বন্ধুদের হার মানতে হয়।

পিতৃ-বন্ধুরাও কম চিন্তিত নয়, বিশেষ করে যারা জামাতা করবার আশা পোষণ করেন। তারা বলেন, যে ছেলে ডি-এস্‌সি ডিগ্রী নিয়ে পি-এইচ-ডি উপাধি নেবার জন্য স্কুল পরীক্ষার্থীর মত নাওয়া খাওয়া ভুলে লেখা পড়া করে, তাকে তখনই সামলান উচিত ছিল।

জয়ন্তর পিতা রাধাকান্ত বলেন, যা রেখে যাব তা ক্ষয়ের পথে নয়, বেড়েই যাবে—ছেলে যখন আমার উড়নমুখী নয়।

রাধাকান্তর বিশেষ বন্ধু অটলবিহারী বলেন, সেইটাই ত' ভয়ের কারণ। যে ছেলে উড়ে না, অথচ টাকার উর্ধ কিংবা অধঃ গতির প্রতি উদাসীন, সে ছেলে আপন নয়।

রাধাকান্ত বলেন, যারা লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতীর পুজো করে তাদের কি বাধা দেওয়া যায়—বিশেষ করে মাতৃহীন সন্তানকে।

কিন্তু বয়স?

রাধাকান্তবাবু ভাবনায় পড়েন, বলেন, তাইত অটল! বয়সটা যে এখন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অনাসক্তির জন্যই ত' বিলেতে এত বছর রাখলাম, ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা করিনি। য়ুরোপে শিক্ষা ও সভ্যতার অঙ্গ হল নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে দৃষ্টি জ্ঞান লাভ। য়ুরোপে এত বছর থেকেও যে নারীর প্রতি কৌতুহল জাগবে না, তা' আমি ভাবতেই পারিনি।

অটলবিহারী বললেন, জয়ন্ত সৃষ্টিছাড়া মানুষ। এখনও সময় আছে, রঙের খেলা সুরু করাও।

রাধাকান্ত বললেন, প্যারীর মত স্থানে যে ছেলের চোখ ফুটল না, দিব্যদৃষ্টি খুলল আদর্শের—

অটলবিহারী বাধা দিয়ে বললেন, কথার প্যাঁচ থাক্। কোন উপায় খুঁজে বের কর। ও ছেলে তোমায় দুঃখ দেবে, নিজে দুঃখের মাঝে শেষ হবে কল্পনার মরীচিকায় ধাওয়া করে।

জয়ন্তর কোষ্ঠিতে নাকি লেখা আছে, দুঃখের চরম আনন্দে জয়ন্তর সার্থকতা ও চরম পূর্ণতা।

তাই ত' দেখা যাচ্ছে। যে ছেলে বৈজ্ঞানিক হয়ে সাহিত্য পড়ে, ইতিহাস পড়ে, দর্শনশাস্ত্র পড়ে, অর্থনীতি পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে ছুড়ে ধর্ম গ্রন্থ নিয়ে মেতে উঠল তার পরিমাণ ভীষণ।

জ্ঞানলাভ ত গৌরবের।

জয়ন্ত গৌরবের উর্ধে। জ্ঞানলাভের জন্য জয়ন্ত পড়ে না, ও পড়ে জ্ঞানের এ্যানাটামী। এ ভয়ংকর নেশা। এ নেশা এসেছিল ভগবান বুদ্ধের, এসেছিল শ্রীচৈতন্যের, আর এসেছিল স্বামী বিবেকানন্দের।

এমনি ভাবেই আলোচনা চলে, কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন অটলবিহারী এসে বললেন, ভায়া, আমি মীমাংসা পেয়েছি।

রাধাকান্ত উৎসাহিত হয়ে বলেন, কি মীমাংসা?

মালবিকাকে যদি পুত্রবধূ করতে আপত্তি না থাকে তবে আমি চেষ্টা করতে পারি।

মালবিকা রমেশের মেয়ে ত'?

হাঁ।

বিয়ে দিতে চাও দিতে পার, কিন্তু বিয়ের পর না ঘর ছেড়ে পালায়।

এ আধুনিক যুগ। মেরুদণ্ডহীন যুবকরা বিয়ে করে বউ ত্যাগ করে কিংবা দুর্ব্যবহার করে সত্য, কিন্তু আদর্শ কিংবা ধর্মের জন্য কেউ তার স্ত্রী ত্যাগ করে না। আমি বিয়ে দেব না, এখন পোষ মানাব প্রথম।

জয়ন্ত মেঘভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল।

মালবিকা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, কাপটি টেবিলের উপর রেখে বলল, অত দেখছ কি ? মেঘের খেলা ?

না।

তবে ?

ভাবছি। মেঘকে নয়।

অত ভাব কেন ?

ভাবায় বলে ভাবি। ভাবব বলে ভাবিনে, তাই ত' অত ভাবতে হয়।

মেঘ তোমায় ভাবায় না, আশ্চর্য ! যে মেঘ ময়ুর ময়ুরীকে নাচায়, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় দেয় আনন্দের দোলা, মনের রঙিণ মসৃণ কোমল পাখায় তোলে হিল্লোল—

আবার কাব্য জুড়ে দিলে।

জীবনটাই ত' কাব্য—দেহটা তোমার বিজ্ঞান হতে পারে কিন্তু মনটা সম্পূর্ণ কাব্য। আমি তুমি, এ নিখিল বিশ্ব সবই ত' কাব্য। ফুল ফুটে কেন, পাখী কেন করে কলতান, ভরা নদীতে কেন আসে জোয়ার। সে কথা যাক, এখন চল বেড়াতে।

কোথায় যাবে ?

যাব প্রকৃতির মাঝে—সেখানে শুধু আমি আর তুমি।

কিন্তু—

কিন্তু নয়। জীবনটা পণ্ডিতদের গ্রন্থশালা নয়।

গ্রন্থশালা আমিও চাইনে। আমি চাই চির জীবনরস—elixir of life.

মালবিকা চম্‌কে উঠে বলল—মানে ? আধ্যাত্মিক কিছু নয় ত ?

জানিনে—অনুভূতি এখনও ধরা দেয়নি স্পষ্ট হয়ে।

মালবিকা হাঁফ ছেড়ে বলল, এবার চল, বেলা যে শেষ হতে চলল।

জয়ন্ত চাদরটা নিতে গিয়ে চমকে দাঁড়াল। সোজা মালবিকার দিকে তাকিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বলল, এর মানে অনুভব করতে পার ?

মালবিকা বলল, পারি। আমার যে বেলা তাকে যদি পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ না করতে পারি তবে তাকে চিরকালের জন্য হারাই।

জীবনের জয়রথ চলে মৃত্যুর রাজদ্বারে শান বাঁধান স্বচ্ছ সরল পথে।

তার ধ্বনি বাজে প্রতিনিয়ত আমার কর্ণে, তাই ত' আমি চাই এ জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে।

জয়ন্ত মালবিকার হাত ধরে বলল, এ শুধু কথার কথা, না অন্তরের বাণী ?

মালবিকা জয়ন্তর চোখে তুলে ধরল উত্তেজিত চোখ ছুটি, পুলক আবেগে মুদিত হয়ে এল—জয়ন্ত চিনলে না তার ভাষা।

মালবিকা জয়ন্তর হাত ধরে মোটরে এসে উঠল। সহর ছাড়িয়ে তারা এল খোলা মাঠে। নিকটে কোন জনবসতি নাই। শ্যামল মাঠ, ঝাড়-ঝোপ, বাঁশ ও কাশবন, বনতুলসী, বঁইচি, ধুঁতরা, বন্য করবী—সম্পূর্ণ শ্যামল ধরণী।

মালবিকা প্রথম নামল, হাত ধরে নামাল জয়ন্তকে। হাত ধরে তারা চলল আল ধরে। ধানের শিষ, চোরকাঁটা হেলেদুলে এসে পড়তে লাগল তাদের শাড়ি আর ধুতির কোঁচায়।

মালবিকা বলল, ভালবেসে পেয়েছি তোমায়, তাই সুন্দর এ পৃথিবী, পূর্ণ করে তুলতে চাই জীবনকে। তোমায় পেয়েছিলাম বাল্যে তখন তুমি ছিলে খেলার সাথী, এল কৈশোর, লজ্জার মাধুর্যে বন্ধুত্ব হয়ে উঠল মধুময়—তারপর যৌবনের প্রারম্ভে প্রাণ যখন চাইল রচনা করতে প্রাণের মন্দির, বিরহ করে তুলল মৃত্যুযাতনা-আনন্দময়।

জয়ন্ত বলল, আমরা পেলেই কি তোমার জীবন হবে পূর্ণ ?

তা' নয়ত' কি। তোমায় পাওয়া ত' সহজ পাওয়া নয়, তোমায় পাওয়া মানে চরিত্র, জ্ঞান, যশঃ, অর্থ আর পৌরুষের আদর্শকে পাওয়া। কুমারীত্বের সীমা থেকে যে করেছি তোমারই তপস্যা।

ভুল করেছ মালবিকা। জীবন বলতে তোমার অনুভূতি করে ছবি মনের পটে আল্পনা করে ?

জন্ম ও মৃত্যুর আঁধার পথে যে দীপ শিখা তাইত' জীবন।

এ ত' তোমার কথা নয়, তোমার বিশ্বাস নয়।

না, এ আমারও কথা, আমার বিশ্বাস। এ শিখায় আমি দেখেছি প্রকৃতির রূপ। আমি জেনেছি, যে কোন মুহূর্ত্তে দীপশিখা যেতে পারে নিভে—তারপর দু'পাশের চির-অন্ধকার দু'পাশ থেকে এসে এমনি ভাবে চেপে ধরবে যে, আমাকে আর কোথায়ও পাবে না খুঁজে আর কখনো—চির-আঁধারেই যাব মিলিয়ে চিরকালের জন্য।

এই যদি তোমার সত্য বিশ্বাস তবে ভুলের বন্ধনে কেন বাঁধ নিজেকে। জীবনমৃত্যুর মাঝে যে মৃদু তরঙ্গ তাকে করে তোল উদ্বেলিত। চির নিরন্ধ্র যে অন্ধকার তাকে করে তুল আলোকিত জ্ঞানের আঁধার চির তমসারাত্রি অজ্ঞানের।

সেই অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলবে তোমাদের বিজ্ঞান ?

না, বিজ্ঞান বিশ্বাস করবার কারণ পায় না।

তবে ?

দর্শন।

শেষটায় ধর্মশাস্ত্র নিয়েও মেতেছ ? কিন্তু মিথ্যে মরীচিকার পিছু ধাওয়া—কল্পনায় রঙ্‌ ফলান যায়, কিন্তু ছবি তোলা যায় না। যা সত্য সত্যই আঁধার, তা' সত্যই আঁধার।

এই তোমার সত্য বিশ্বাস ?

হাঁ, সত্যকে সত্য বলেই আমি মানি, কাব্য কিংবা দর্শনশাস্ত্র ভারাক্রান্ত করি না, জীবনের বহির্সীমানায় অকাল অনন্ত শূন্যতা স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ও দেহহীন অলীক কল্পনামাত্র। একে চলে না পরীক্ষা করা, বিশ্লেষণ করা, বিচার করা। যা কোন দিন ছিল না, নেই এবং কখনও হবে না তাকে নিয়ে দর্শনশাস্ত্র রচনা করা চলে, ধর্মোপদেশ দেওয়া যায়, কাব্য রচনা করা চলে, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রবেশ হয় না, বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না।

গঙ্গার তীরে এসে তারা দাঁড়াল। ওপারে দেখা যায় বোটানিক্যাল গার্ডেন। কুয়াসার মত অন্ধকার এসে ঝরে পড়ছে ঝাড়ঝোপ। অন্ত-

রবির শেষ রশ্মি সুউচ্চ গাছের ডালে, শাখায় পাওয়া হালকা হাওয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে।

একটা গাছের নীচে তারা এসে বসল। মালবিকা আঁচল দিল বিছিয়ে জয়ন্তের আসন করে।

মালবিকা বলল, আমি যা বললাম তা' ত' তোমারই প্রতিধ্বনি মাত্র। তুমি এখন দর্শনশাস্ত্র পড়তে সুরু করেছে,তাই হারিয়ে ফেলেছ দৃঢ় বিশ্বাস।

জয়ন্ত বলল, মালবিকা !

মালবিকা মুখ তুলে তাকাল। চঞ্চল আঁখি তারকায় হারাণ চাঁদ হেসে উঠল।

জয়ন্ত খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, মালু !

মালবিকার চোখ উঠল ঝলসে, বলল, এ নদী, এ বন, এ মাঠ, গাছপালা, আকাশ বাতাস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সম্পদ সবই ত' আমার।

জয়ন্ত মালবিকার হাত দুটি হাতের মুঠায় নিয়ে বলল, সংশয় আমার জ্ঞানের মন্দিরে, তুমি বল, আমি শুনি।

এ ত' তোমারই কথা।

না, সে আমাকে আমি ফেলেছি হারিয়ে। তুমি বল আমি শুনি। এ পৃথিবী কি সত্যই আমার ?

মালবিকা জোর দিয়ে বলল, এ পৃথিবী ত' শুধু আমার। আমি যখন ছিলাম না তখন এ পৃথিবী ছিল না, আমি যখন থাকব না তখন এ পৃথিবী থাকবে না। আমিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আমিই অতীত, আমিই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ।

তুমি ত' শুধু মাত্র বর্ত্তমান। তুমি ত' আর কিছু মান না।

আমি শুধু মাত্র বর্ত্তমান। বর্ত্তমানের ভূমিকা অতীত, সার্থক মৃত্যু ভবিষ্যতে। আমার জন্যই আমি রচনা করেছি এ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যাহা কিছু দৃশ্য-অদৃশ্য, যাহা কিছু পাওয়া না পাওয়া সবই ত' আমি—আমার জন্যই সব। আমি যখন থাকব না তখন কোন কিছুই থাকবে না। আমার নিকট, যেমনি আমি যখন ছিলাম না তখন কোন কিছুই ছিল না।

তোমার কথাগুলি স্বাভাবিক হচ্ছে না। তর্ক ঝংকার হচ্ছে।

তুমি হিন্দু দর্শন মান—মান তুমি তার শেষ ও মূল কথা ? যদি মান তবে আমিই ত' ভগবান। যদি আমিই ভগবান হই তবে কিসের জন্য এ নিয়মকানুন, বিধিব্যবস্থা, কিসের জন্য পাপপুণ্য, দুঃখ সুখ, কিসের তরে লাজলজ্জা, ভয়অনুতাপ, জয়পরাজয়, লাভক্ষতি, কিসের জন্য জপতপ, ধর্মাধর্ম—তবে কেনই বা এত অনুসন্ধিৎসু ও পৃথক সহানুভূতি ?

তোমার কথাগুলি জাগিয়ে তোলে মনে সংশয়—মনে হচ্ছে শব্দব্রহ্ম।

তার কারণ তোমার বস্তুতন্ত্র মনকে দ্বিধাসংশিত করে তুলেছে ধর্ম। ধর্মের পরশ বড় মারাত্মক নিষ্পাপ সরল মনে। তোমার মিথ্যে খোঁজা চিরজীবনরস বাস্তবজীবনকে ব্যর্থ করে। ফিরে এসো, উছল হয়ে উঠ জীবনানন্দে, পূর্ণ করে তোল প্রতি মুহূর্ত্ত।

এই কি জীবন ?

হাঁ, এই জীবন। যে পরজন্মকে জানিনে, জানব না, কেউ জানেনি তাকে কল্পনায় পূর্ণ করে তুলবার জন্য বাস্তবজীবন তিলে তিলে কৃচ্ছ সাধনে, পণ্ড করাই যে চরম সার্থকতা এর প্রমাণ ত' তুমি পাবেনা, কেউ পায়নি। ভগবান ? সে ত' আরও ফাঁকি। এ বাণী ত' তুমিই একদিন আমায় শুনিয়েছিলে।

এ কি আমারই কথা ছিল। ধর্ম নয়, সাধনা নয়, শুধু আনন্দোৎসবই জীবন ? শুধু ভোগবিলাস, আর কিছু নয় ?

জীবনানন্দে ত' সাধনার পথ রুদ্ধ নয়। শুধু মাত্র বৈরাগ্য সাধন-জীবন নয়। তুমি বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়ে এগিয়ে চল—জগতের কল্যাণের জন্য।

তবে তাই হোক মালু।

মালবিকা আনন্দে জয়ন্তকে জড়িয়ে ধরল, বলল, তা' হলে তোমার চৈতন্য ফিরে এসেছে। কাকাবাবুকে বলব, তোমার বিয়েতে মত হয়েছে। ফাল্গুনের মধুময় দোলপূর্ণিমায় মিলন হবে মোদের।

তাই বলো। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি নেবার দুর্বলতা সংস্কার আমার নেই। সংসারের সুখ দুঃখের মাঝে আমরা মিলিত ভাবে জীবনানন্দে পূর্ণ হয়ে উঠব—বিজ্ঞানের সাধনায় তুমি হবে আমার সহায়।

মালবিকা বলল, তোমার জীবন জয়যাত্রায় আমি হব সাথী।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে। বোটানিক্যাল গার্ডেনটা অস্ফুট আলোকে রহস্যময় হয়ে উঠল।

মালবিকা জয়ন্তর হাত ধরে বলল, এবার চল।

বিবাহ বাসরে সানাই বাজে করুণ সুরে। মঙ্গলময় আনন্দোৎসবে কেন এই করুণ ক্রন্দন ? এ কি পিতামাতার অন্তরের বিরহ বেদনা ? আনন্দের মাঝে যে শাশ্বত করুণ বেদনা নিঃশব্দে ও অলক্ষ্যে অন্তরে বাজে তাকেই কি ফুটিয়ে তোলে সানাই।

সানাই বাজছে। জয়ন্ত আর মালবিকার হবে শুভ পরিণয় কাল, দোল পূর্ণিমার মঙ্গল লগনে। চারিদিকে চলছে উৎসব-আত্মীয়স্বজন ; বন্ধুবান্ধবের কলহাস্যে, নৃত্যসঙ্গীতে দিগন্ত হয়েছে মুখরিত।

যে বৈজ্ঞানিক মনকে ধর্মের আকর্ষণে করেছিল বৈরাগী তাকে মালবিকার যৌবনচাঞ্চল্যে, কথার মাধুর্যে ঘুরিয়ে এনেছে সংসারের ছককাটা পথে। তাই আনন্দোৎসব স্বাভাবিককেও গেছে ছাড়িয়ে।

জয়ন্তর গাম্ভীর্য হয়েছে আরও কঠিন পর্বতের মত বিরাট, তাতে দেখা দিয়েছে নতুন উপসর্গ চাঞ্চল্য। এ পরিবর্ত্তন লোকের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাদের ধারণা পরিণত বয়সে আকস্মিক বসন্তের প্রভাব।

রাত্রি শেষে শিশির পরশে শ্যামল শোভা হয়ে উঠেছে অপরূপ। জয়ন্ত জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। সানাই বাজছে। সানাইএর করুণ সুর জয়ন্তর মনকে চঞ্চল করে তুলল।

এই কি জীবন ? জীবনের এই কি শেষ কথা ? মালবিকা নেই পাশে, কে দেবে এর জবাব। য়ুরোপ, আমেরিকায় মানুষ পেয়েছে ঐশ্বর্য, পেয়েছে স্বাধীনতা, হয়েছে সংস্কার মুক্ত, কিন্তু ওরা ত' জীবনানন্দ পেলে না। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি করেও ত' জীবনকে চিনলে না, সুখ

শান্তি দিতে পারলে না—জীবনটাকে করে তুলল প্রাণহীন যন্ত্র। এত ঐশ্বর্য, এত শিক্ষাদীক্ষা বিজ্ঞানের কল্যাণে এত সুযোগ সুবিধা সত্বেও মনের অশান্তি, চাহিদার উঞ্ছবৃত্তি, কৃত্রিম জীবনের দুর্ভিক্ষ, হিংসাদ্বেষ, জিঘাংসা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনধারাকে করে তুলেছে অশান্ত, জাগিয়ে তুলেছে হিংস্র পশুবৃত্তি—পরিণামে আজও বিভিন্ন জাতি রয়েছে পদানত, হচ্ছে নিপীড়িত, শোষিত এবং হিংস্র পাশবিক মনোবৃত্তির জন্য সর্বমানব-জাতি হারিয়েছে মনুষ্যত্ব হারিয়েছে সুখ, শান্তি ও স্বস্তি।

জয়ন্ত অশান্তিতে ছট্‌পট্ করতে লাগল, মানসিক বিপ্লবে সারা কক্ষময় ঘুরতে লাগল অস্থির পদক্ষেপে।

বিছানার পাশেই বই-এর একটা ছোট র‍্যাক্। তাতে দর্শনশাস্ত্রের জটিল পুস্তকগুলি রয়েছে এলোমেলোভাবে। একটা বই টেনে নিল—ভগবৎগীতা! আব্‌ছা আঁধারে পড়তে পারল না, এগিয়ে চলল।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল নিশির ডাকের সম্মোহনগ্রস্তের মত। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে ল্যাবোরেটরীর দরজার পাশে। দরজাটা বন্ধ, একটি জানালা ভুল করে রয়েছে খোলা। জয়ন্ত খোলা জানালা দিয়ে একবার তাকালে।

ওইখানে সে কত দিনরাত্রি তন্ময় হয়ে কত গবেষণা করেছে। চির-জীবন রস আবিষ্কার করবার জন্য যখন সে গবেষণায় ডুবেছিল তখন এসেছিল মালবিকা। তারপর—তারপর কী যে হল, কোথায় গেল গবেষণা, কোথায় গেল ধর্মের বৈজ্ঞানিক সাধনা। বস্তুতন্ত্র, দর্শন বিজ্ঞান সব—সব মিলে কি যে হল—জয়ন্ত বুঝতে পারছে না। স্মৃতি, বুদ্ধি, জ্ঞান—সমস্তই যেন লোপ পেয়েছে।

সে কি তবে পাগল হল? মালবিকা কি শেষ পর্যন্ত তাকে পাগল করে দিল। হয়ত হবে। এ অবস্থাকেই হয়ত লোকে বলে উন্মাদনা।

জয়ন্ত একটু হাসল, বোধহয় পাগল হবার জন্যই একটু হাসল। তারপর চলতে সুরু করল।

বিজ্ঞান নয়, সমাজ নয়, ঐশ্বর্য নয়, যশঃ নয়, সংসার নয়, রাষ্ট্র নয়, দেশ নয়, জীবন নয়, ধর্মও নয়—শুধু আমি। আমি কে? আমি কে এর জবাবই যদি না মিলল তবে কিসের জীবন।

জয়ন্তর চলার হল না বিরাম। এ চলার শেষ সেখানে, যেখানে শেষ প্রশ্নের শেষ জবাব আর পাওয়া যায় না।

সানাই-এর স্বর অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে কখন যেন থেমে গেছে।

নিষ্কৃতি ও বড়দিদি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

নিষ্কৃতি—ইহা একটি বড় গল্প—প্রথম শ্রেণীর রচনা। গল্পটি নারী-চরিত্র প্রধান। নারীর পরেই ইহাতে বালক-বালিকার স্থান। পুরুষ-চরিত্র গিরীশ গল্পের একপ্রান্তে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই চরিত্রই তিলেষু তৈলবৎ, দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের ন্যায়, সমস্ত গল্পের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া বর্ত্তমান আছে। সমগ্র গল্পের মাধুর্য্য গিরীশচরিত্রকেই আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—গিরীশের বাৎসরিক আয় অন্ততঃ ২৫ হাজার টাকা। ইহাতে গিরীশের পরিবারকে ধনীপরিবারই বলিতে হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র এই পরিবারটিকে মধ্যবিত্ত পরিবারেরই রূপ দিয়াছেন। হিন্দু-মধ্যবিত্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারের বধূদের মধ্যে যে কলহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য—তাহাই গল্পটির প্রধান উপজীব্য। এই ধরণের বিবাদ-বিসংবাদের কথা শরৎচন্দ্রের মেজদিদি, বিন্দুর ছেলে ইত্যাদি বড় গল্পেও আছে। বিন্দুর ছেলে ও মেজদিদিতে এই মনোমালিন্য একটি বালককে অবলম্বন করিয়া রূপ লাভ করিয়াছে। এই গল্পের কলহ-পর্ব্বটাও একটি বালককে অবলম্বন করিয়াই আরব্ধ বটে, কিন্তু ইহার মূলে আছে মেজ-গিন্নীর হীন স্বার্থ ও হিংসা। হিন্দুর একান্নবর্ত্তী সংসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার, সমাজ ও অঞ্চল হইতে বধূরা আসে। তাহাদের স্বভাব, প্রকৃতি, আদর্শ ও প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন। এক পরিবারের মধ্যে সন্তানসন্ততি লইয়া সংসার-যাত্রা করিতে হইলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বাধে। যেখানে সুযোগ্য গৃহকর্ত্রী থাকে না, সেখানে কলহ-বিবাদ চলিতে থাকে—শেষ পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙিয়া যায়। হয় সন্তান সন্ততি লইয়া—নয় স্বামীদের আয়ের বৈষম্য লইয়া হয় কলহের সূত্রপাত।

হিন্দু-মধ্যবিত্ত পরিবারের এই বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া এই বড় গল্পটিতে বালকবালিকাদের মনস্তত্ত্ব অতি চমৎকার ভাবে রসমূর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

হরিশ ও নয়নতারা এই গল্পের মুখ্য চরিত্র নয়—এই দুটি চরিত্র রস-সৃষ্টির উপাদান নয়—উপকরণ মাত্র। সিদ্ধেশ্বরী ও গিরীশচন্দ্রের চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এই দুটির আবির্ভাব হইয়াছিল। তবু এই দুটি চরিত্রও মুখ্যচরিত্রগুলির মত বাস্তবরূপ লাভ করিয়াছে।

এই গল্পের গিরীশ চরিত্রই অভ্রভেদী গিরীশের মত দাঁড়াইয়া আছে—ইহাকে অচল ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয়। ইহারই পাদমূলে কত দ্বন্দ্ব—কত সংঘর্ষ। কিন্তু ঐ অচল নির্বিকার অভ্রভেদী চরিত্রের হৃদয় হইতে বিগলিত বাৎসল্যের প্রপাত ধারায় সকল দ্বন্দ্ব—সকল শফরীলীলা ভাসিয়া গেল।

এইরূপ চরিত্র শরৎচন্দ্রের আদর্শবাদের কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র নয়—তিনি

এ চরিত্র নিশ্চয়ই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—আমরাও বাল্যকালে আমাদের এই ভাগীরথী মণ্ডলেই এইরূপ চরিত্র দেখিয়াছি। পরবর্তী জীবনে এরূপ চরিত্র আর দেখি নাই। যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে হিন্দু-গৃহকর্ত্তাদের আদর্শ বদলাইয়া গিয়াছে—তাঁহারা এখন অনেকটা হিসেবী ও সতর্ক হইয়াছেন।

আপনার কর্ম্মজীবনে একেবারে তন্ময়, অর্জ্জনে একনিষ্ঠ—সঞ্চয়ে উদাসীন—বর্জ্জনে মুক্তহস্ত ও অকাতর, তুচ্ছ ক্ষুদ্রতার বহু উর্দ্ধে অবস্থিত—অন্তঃপুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্যমনা—এইরূপ চরিত্র এখন আর দেখা না গেলেও একদিন ছিল। প্রশ্ন হইতে পারে, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল নিজের ব্যবসায় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে এত উদাসীন, এত অন্যমনস্ক হয় কিনা? ইহা স্বাভাবিক কিনা? জ্ঞান-চর্চ্চায় তন্ময়—অধ্যাপকের জীবনই সাধারণতঃ এইরূপ হয়। একালে এই চরিত্রকে একটু অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে, কিন্তু সেকালে ইহা অস্বাভাবিক ছিল না। যে কোন ব্রতে মানুষ তদ্গত হইলেই তাহার মনের এইরূপ অবস্থা ঘটে।

শরৎচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন—অর্জ্জনের শক্তি যাহার অপরিসীম—বর্জ্জনের শক্তি তাহারই অপরিসীম হইতে পারে। একই মানুষ অর্থার্জ্জনে একনিষ্ঠ ও তদ্গত এবং অর্থে নিস্পৃহ দুইই হইতে পারে। একই পৌরুষ শক্তি অর্জ্জনে সহস্রবাহু অর্জ্জুন এবং বর্জ্জনে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন হইতে পারে। অর্থই তাহার কাছে বড় নয়—অর্জ্জনে ও বর্জ্জনে পৌরুষ শক্তিটাই বড়।

অন্যমনস্ক ও উদাসীন গিরীশের মুখের কথাগুলি আমাদের হাস্যের উদ্রেক করে। ঐগুলিই এই বড় গল্পটির রঙ্গরসিকতার অভাব পূরণ করিয়াছে। কিন্তু এই রঙ্গরসটুকু সেই শ্রেণীর রঙ্গরস, যাহা আমরা প্রাচীন সাহিত্যে উপভোগ করিয়াছি—শিবের আচার আচরণে।

অবশ্য গিরীশচন্দ্রের অন্যমনস্কতা ও ঔদাসীন্য দেখাইবার চেষ্টায় শরৎচন্দ্র একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন—একটু বেশি রঙ চড়াইয়াছেন। ইহাতে আংশিক ভাবে অপূর্ব্ব রস পাইয়া সমগ্রতার দিক হইতেও এই রঙ্গাতিশয্যজনিত অঙ্গহানি আমরা বিস্মৃত হইতে পারি।

বৈয়াকরণরা বলেন—ভাই+শ্বশুর, সংক্ষেপে ভাশুর।

কিন্তু সংস্কৃতে ভাস্+ঘুরচ্—ভাস্বর শব্দটি নিষ্পন্ন।

এই ভাস্বর কথাটির অর্থ দীপ্যমান—ভাস্বর। বঙ্গসাহিত্যে এই ভাস্বরকে কেহই স্থান দেন নাই। শরৎসাহিত্যে ভাশুর—ভাস্বররূপে চিত্রিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এই ভাস্বর শুধু স্থান লাভ করে নাই—স্বকীয় দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া অন্বর্থনামকতা লাভ করিয়াছে। বিন্দুর ছেলেতে যে ভাশুর সন্তানের অভিনয় করিয়াছে—নিষ্কৃতিতে সেই ভাশুরই করিয়াছে পিতার অভিনয়।

শরৎচন্দ্র হিন্দু-নারী চরিত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া এবং তাহার সুন্দর ও কুৎসিত দুইদিকই পাশাপাশি উদ্ঘাটিত করিয়া অপূর্ব কলা-কৌশলে রস সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ শরৎচন্দ্র রসসৃষ্টির জন্য বিভিন্ন নারী চরিত্রের দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ও তাহাদের হৃদয়বৃত্তির যথাযথ বিকাশকেই উপাদান উপকরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। হৃদয় বৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘর্ষকে রসে পরিণত করিবার জন্য শরৎচন্দ্র তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর নারীচরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মেজো বৌ ও ছোট বৌ সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের নারী—তাহাদের মাঝে পড়িয়া ব্যক্তিত্বহীন বড়বৌকে সকল আঘাত প্রত্যাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে।

হিন্দু পুরুষগণ চিরদিনই অন্তঃপুরের নারীগণের আচার আচরণ ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উদাসীন—অন্তঃপুরের শাসন-শৃঙ্খলা-রক্ষা করিবার দিকে তাহারা দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে না। বর্ত্তমান যুগে পুরুষদের বাহিরের কাজ এত বেশি—নানাদিকে তাহাদের মনোযোগ এতই ব্যাপৃত যে তাহাদের এই ঔদাসীন্য আরো বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে, গৃহে তাহারা সম্পূর্ণ স্ত্রীশাসিত হইয়াই পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্র পুরুষদের এই ঔদাসীন্য ও স্ত্রৈণতাকে অন্তঃপুরের বিশৃঙ্খলতার একটি কারণ বলিয়াই ধরিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র এ কথাও বলিতে চাহিয়াছেন—আমাদের পারিবারিক জীবনে নিষ্কৃতি ও বড়দিদি—পুরুষ পুরুষের মতই নির্ব্বিকার—শিবের মত ভূমিশয়ান। নারী প্রকৃতির মতো চিরচঞ্চলা—কত মায়ামোহজালেরই না সে সৃষ্টি করে। পুরুষ একবার হুঙ্কার করিয়া উঠিলেই সব মায়াজাল অপসৃত হইয়া যায়।

আমাদের সমাজে একটা সংস্কার প্রচলিত আছে—যেখানে তিন ভাই, সেখানে বড় ভাই হয় উদার মহান্ ও স্বার্থত্যাগী—মেজো হয় কুটিল ও স্বার্থপর এবং ছোট সাধারণতঃ কতকটা মা-বাপের আদরে কতকটা ভাইদের আদরে হয় অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য ও গলগ্রহ। শরৎচন্দ্র নিষ্কৃতি উপন্যাসে এই প্রচলিত ধারণার অনুসরণ করিয়াছেন। বধূদের বেলাতেও এই ধারণাধারাই অনুসরণ করিয়াছেন—তবে ছোট বৌ সম্বন্ধে অন্যথা হইয়াছে। ছোট বৌকে তিনি করিয়াছেন বুদ্ধিমতী, কর্মদক্ষা, তেজস্বিনী ও প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী। অক্ষম স্বামীর ভার্য্যা হওয়ার যে দুর্ব্বলতা নিজের গুণাতিশয্যে সে দুর্ব্বলতার ক্ষতি-পূরণ করিয়া সে সংসারের অধীশ্বরীই হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্তের বিরুদ্ধেই সে সংগ্রাম করিতে পারিত কেবল হিংসা ও হীন স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অস্ত্র তাহার ছিল না। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন—এই চরিত্রের মধ্যেও গৃহবিবাদের বীজ ছিল। তাহার চরিত্রের অসহিষ্ণুতা, ক্ষমাহীন দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠতা একান্নবর্ত্তী পরিবারের গাঢ়বদ্ধতার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়।

বড়বৌ সিদ্ধেশ্বরীর ছিল স্বাভাবিক মহত্ব, উদারতা ও অকৃত্রিম স্নেহ-বাৎসল্য—কিন্তু সৎশিক্ষা ও বুদ্ধিবলের দৃঢ়ভিত্তির উপর তাহার এই উদার চরিত্রটি গড়িয়া উঠে নাই। সে ছিল নির্বোধ, অশিক্ষিত ও মেরুদণ্ডহীন। ভিত্তি দৃঢ় ও সুগঠিত না হইলে সোনার সৌধও স্থায়ী হয় না। তাই সিদ্ধেশ্বরী তাহার চরিত্রের উদারতা রক্ষা করিতে পারিল না। বুদ্ধিমতী কল্যাণময়ী ছোটবধূর প্রভাবে তাহার চরিত্র মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব ছিল না বলিয়া মেজোবৌএর আবির্ভাবে, প্রভাবে ও প্ররোচনায় তাহা অধোমুখী হইয়া গেল। এরূপ চরিত্রের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর ধাতুগত চরিত্র মেজো-বৌএর হিংসার মেঘজালে আচ্ছন্ন মাত্র হইয়াছিল—একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। তাই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ইন্দুকিরণচ্ছটার মত তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য

ও ঔদার্য্য মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেষে সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল—আজ তুমি আমাকে মাপ কর। তোমাকে যার যা মুখে এল তাই ব'লে গাল দিল বটে, কিন্তু তুমি যে তাদের সবাইএর চেয়ে কত বড়—সে কথা আজ যেমন আমি বুঝেছি—এমন কোনদিন নয়।

শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিতে অসামান্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বড়দিদি—ইহাও একটি বড় গল্প। ইহাতে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় নাই। যে বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তি ও আবেষ্টনীর জন্য শরৎচন্দ্রের রচনা অনন্যসাধারণ—সে ভিত্তি বা আবেষ্টনী ইহাতে নাই। ইহাতে যে Romanceটুকু ফুটিয়াছে—তাহা অন্য পাঁচজনের রচনাতেও আছে। এই গল্পটির চিত্রে বহুস্থলেই রঙ অত্যন্ত গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের তুলিকায় দরিদ্র গৃহের চিত্র যেরূপ জীবন্ত ও স্বভাবসুন্দর হইয়া ফুটে ধনী গৃহের চিত্রটি তেমন হয় না। ধনীগৃহের যথাযথ আবেষ্টনী ফুটে না—ধনীর সন্তানগুলি রক্তমাংসে জীবন্ত না হইয়া ভাববিগ্রহ মাত্র হইয়া পড়ে। যে কবিত্বের সুর রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গল্পগুলিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে—সে সুরও ইহাতে ধ্বনিত হয় নাই।

সুরেন্দ্রনাথের মত মেরুদণ্ডহীন চরিত্রের পক্ষে শিশুর মত সরল হওয়া যেমন স্বাভাবিক, ইয়ার বন্ধুদের প্রভাবে উৎসন্নে যাওয়াও তেমনি স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে স্বর্গীয় শুচিতায় মণ্ডিত করিয়া শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের চরিত্র প্রথমটা দেখাইয়াছিলেন—তাহার শোচনীয় পরিণতি (অতি অল্প পরিসরের মধ্যে) পাঠকচিত্তকে ক্ষুব্ধই করে। শরৎচন্দ্র এই ক্ষোভ দূর করিবার জন্য রূপকথার রাজপুত্রের মত সুরেন্দ্রনাথকে অশ্বপৃষ্ঠে উন্মত্তের ন্যায় ছুটাইয়াছেন এবং এই Romantic অনুধাবনের পরিণতি দেখাইয়াছেন তাহার প্রাণোৎসর্গে। শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্র-চরিত্রের শোচনীয় পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত দেখাইবেন বলিয়া গ্রন্থারম্ভে যথেষ্ট কৈফিয়ৎও দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় সুরেন্দ্র-চরিত্রের কলাসম্মত উন্মেষসাধনে ও তাহার পরিণতির বিবৃতিতে ফাঁক পড়িয়া গিয়াছে এবং সঙ্গতি ও সংহতিতে যুক্তিমূলক পরম্পরায় শিথিলতা আসিয়াছে।

গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা একজন যুবকের পক্ষে সমস্ত-জীবন ধরিয়া এরূপ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত হওয়া স্বাভাবিক কিনা এবং উচ্চশিক্ষিত অভিজাতবংশীয় যুবক ভূস্বামীর পক্ষে পল্লীগ্রামের ইতরশ্রেণীর বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য্যে ও প্রভাবে উৎসন্ন যাওয়া স্বাভাবিক কিনা এ প্রশ্নও মনে উদিত হয়। এ প্রশ্ন উদিত হইয়া মনের রসভঙ্গ করিয়া দেয়। এই প্রশ্নের উদয়পথ কলাকৌশলের দ্বারা অবরুদ্ধ করিতে পারিলে বোধ হয়—রসসৃষ্টির দিক হইতে সুসঙ্গত হইত।

জ্ঞানচর্চ্চায় তদ্গত অথবা কর্ম্মজীবনে তন্ময় পুরুষেরা সাধারণতঃ বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অন্যমনস্ক এবং সামাজিক ও সংসারিক জীবন এমন কি দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া থাকে—ইহা সত্য! এই সত্যটি বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। ইহা একটি Conventionএ দাঁড়াইয়াছে। এই চরিত্রের একটা নিজস্ব মাধুর্য্য আছে কিন্তু এই চরিত্র পারিবারিক জীবনে একটা বিপর্য্যয় ঘটায়। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরেও রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ে ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে। শরৎ-চন্দ্রের দত্তায় নরেন্দ্রনাথ এবং নিষ্কৃতিতে গিরিশচন্দ্র এই শ্রেণীর চরিত্র। শরৎচন্দ্র এই দুইটি চরিত্রের উদারতা ও সরলতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ চরিত্রের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধার অবধি নাই।

শরৎচন্দ্র বড়দিদিতে একটি নূতন সত্যের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—এইরূপ চরিত্রই আবার অতি সহজেই নীতিভ্রষ্ট ও ব্রতভ্রষ্ট হইয়া কেবল পারিবারিক জীবনে বিপর্য্যয় ঘটায় না, নিজেরও সর্ব্বনাশ করে। সুরেন্দ্র-চরিত্রের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা সূচিত হয় নাই বটে, তবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দরদ হইতে সুরেন্দ্রনাথ বঞ্চিত হয় নাই। সকল প্রকার দুর্ব্বলতার প্রতিই শরৎচন্দ্রের দরদ অপরিসীম। যে বিষয়েই দুর্ব্বলতা থাকুক, তরুণ-তরুণীর চরিত্র কখনও শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

মাধবী চরিত্রে অসঙ্গতি কিছু নাই। ইহাতে প্রাকৃত সত্যই সাহিত্যের সত্যে পরিণত হইয়াছে। মাধবীর চরিত্রাঙ্কনে রসজ্ঞ বিচারকদের আপত্তি করিবার কিছু নাই। কেবল মনোরমা-মাধবী প্রসঙ্গটা অবান্তর বলিয়া মনে হয়। এ প্রসঙ্গ রসসৃষ্টির অনুকূল হয় নাই—বরং রসাভাস ঘটাইয়া দিয়াছে।

সুভাষচন্দ্র

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুনীল শতাব্দীর তুহিন শীতল দেহে কে ফোটালো প্রাণ শতদল,
অতীন্দ্রিয় প্রতীক্ষায় দুর্গতি দুর্গম ঘরে ভালবেসে কেবা জ্বালে আলো,
কে এলো কুয়াশা ভেদি, কার রুদ্র বিষাণের ডাক শুনে জীবন চঞ্চল,
নবারুণ প্রীতিরাগে সম্ভ্রমভাঙ্গা জাতি কার পায়ে প্রণতি জানালো!

দুঃখের দারুণ দিনে পর্ব্বতের বাধা পেয়ে ফিরিয়া গিয়াছে ভগবান,
ক্ষুধিত শিশুর তাই একচোখে ঝরে জল, আর চোখে আগুনের শিখা,
বেদনার সিংহদ্বারে কুণ্ঠিত জীবন স্বপ্ন এতদিনে হ'ল সমাধান,
মরু সাগর মথি কে নব জাতক এলো হাতে তার বিজয় লিপিকা।

তোমার চারণ-কণ্ঠে, স্বপ্নময় তব চোখে, বাঁচিয়াছে সোনার ভারত,
দিগন্তে সাগর পারে সুন্দরের মুক তীর্থে রুদ্ধ আশা লভিয়াছে বাণী,

আমরা রয়েছি বেঁচে, আমাদেরি মুখ চেয়ে জেগে আছে দীর্ঘ রাজপথ;
এসব পুরানো কথা, তোমারি পূজার ফুল হোক আজ তোমার প্রণামী।

মাটির দেহের মায়া এ মাটি মায়ের সাথে তোমারে কি ভুলাবে না আর,
আমরা কি রব জেগে, জাগিবে প্রহরী চাঁদ, জেগে রবে রাতের আঁধার?

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

জাপানের আত্মসমর্পণ

জাপান আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মিত্রপক্ষের সৈন্য এখন খাস জাপানে অবতরণ করিতেছে এবং বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তাহারা জাপানী সৈন্যকে নিরস্ত্র করিতেছে।

প্রাচ্যে জাপান ছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া প্রাচ্যে যথেচ্ছ প্রভুত্ব করা চলিত না ; তাহাকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভাগ দিতে হইত। পাশ্চাত্য প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে কৌশলে অপসারিত করিয়া প্রাচ্যের সকল মধু নিজে পান করিবার জন্য জাপান সর্ব্বদাই ফন্দী খুঁজিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দারুণ বল্‌শেভিক্ আতঙ্কের সুযোগে জাপান চীনে সাম্রাজ্য প্রসারে মন দেয়। ১৯৩১ সালে জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে, তখন বলশেভিক্ আতঙ্কগ্রস্তদের নিকট হইতে সে পরোক্ষে উৎসাহ পাইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে চীনে জাপানের ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা আশা করিয়াছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে জাপানের সামরিক শক্তি বল্‌শেভিক্ রুশিয়ার বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হইবে।

১৯৩৯ সালে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের বল্‌শেভিক-বিরোধী নীতির জালে নিজেরা জড়াইয়া পড়ে। তখন প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী জাপান মনে করে—ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট সুযোগ। তখন হইতে সে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকে বিতাড়িত করিয়া প্রাচ্যে একাধিপত্য স্থাপনের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহার পর ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে এক গভীর রাত্রিতে সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকে অতর্কিতে আঘাত করে।

জাপানের হিসাবে ভুল হয় নাই। প্রাচ্য অঞ্চল হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদীদিগকে তাড়াইবার জন্য সে যে সময়টি নির্ব্বাচন করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা উপযুক্ত সময় আর হইতে পারে না। তবে, জার্ম্মানীর মত সে-ও ভুল করিয়াছিল সোভিয়েট রুশিয়ার শক্তি সম্পর্কে। সে আশা করিয়াছিল—নাৎসী বাহিনী লালফৌজের প্রতিরোধ ভেদ করিয়া মধ্য প্রাচ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অক্ষশক্তির সামরিক সহযোগ সম্ভব হইবে।

এই সহযোগ সম্ভব হইলে অক্ষশক্তি পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে—অন্ততঃ আগামী কিছু কালের জন্য—অজেয় হইয়া উঠিতে পারিত। প্রাচ্যের কাঁচা মাল যদি অবাধে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে অক্ষশক্তির শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগান দিতে পারিত, তাহা হইলে অক্ষশক্তি সত্যই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিত। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা প্রকৃতপক্ষে শিল্পশক্তি ও সংগঠন শক্তির সঙ্ঘর্ষ। ১৯৪১ সালে ইউরোপের প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট শ্রমশিল্পপ্রতিষ্ঠান অক্ষশক্তির হাতে আসিয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির দুয়ার পর্য্যন্ত প্রাচ্যের অফুরন্ত কাঁচা মাল পৌঁছিবার পথ যদি নির্ব্বিঘ্ন হইত, তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ শিল্পশক্তির সহিত অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত যুঝিবার ক্ষমতা অক্ষশক্তি লাভ করিত। এই পথে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করিয়াছিল লালফৌজ ; সেই প্রাচীরে আঘাত করিতে যাইয়া নাৎসী বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়।

এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত বলা যায় যে, ১৯৪২ সালে ভল্গার তীরে অক্ষশক্তির চূড়ান্ত পরাজয়ের ডিক্রীতে অদৃষ্ট হস্তের স্বাক্ষর পড়িয়াছিল ; ১৯৪৫ সালে কয়েক মাসের ব্যবধানে অক্ষশক্তির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাখা সম্পর্কে সেই ডিক্রী কার্য্যকরী কাজ হইয়াছে। ইউরোপীয় অক্ষশক্তি শিল্পে ও সংগঠনে কতকটা প্রবল হইলেও ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ শিল্পশক্তির সমকক্ষ তাহারা নয়। আর অক্ষশক্তির প্রাচ্য অংশ ঐ তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তির তুলনায় শ্রমশিল্পে অত্যন্ত অনুন্নত। কাজেই বিচ্ছিন্নভাবে ইহার কোন অংশেরই বেশী দিন টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়।

আমরা শুনিয়াছি—এটম্ বোমা জাপানের পরাজয়ের আশু কারণ। আশু কারণ যাহাই হউক না কেন, প্রকৃত কারণ শ্রমশিল্পে তাহার এই দৌর্ব্বল্য। সুপারফোর্ট্রেসের মত বিমান উৎপাদনের ক্ষমতা জাপানী শ্রমশিল্পের নাই, টাইগার ট্যাঙ্ক জাপান উৎপন্ন করিতে পারে না, আমেরিকার সহিত জাপানের নৌশক্তি বৃদ্ধির ক্ষমতার তুলনাই চলে না, প্রতি মাসে মিত্রশক্তির কারখানায় যে পরিমাণ বিমান উৎপন্ন হয়, জাপানের কারখানায় হয় তাহার এক নগণ্য ভগ্নাংশ। মিত্রশক্তির এই বিশাল যন্ত্রশক্তির সম্মুখে জাপানের একাকী বেশী দিন টিকিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। তবে, রণচাতুর্য্যের দ্বারা এবং জাপানী সৈন্যের ধর্ম্মোন্মাদ মৃত্যু-ভয়হীনতার জন্য আরও কিছু দিন যুদ্ধ টানিয়া চলা হয়ত তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত না। গত আগষ্ট মাসে হঠাৎ ইহা অসম্ভব করিয়া যুদ্ধে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছে প্রাচ্যে রুশিয়ার সামরিক সক্রিয়তা এবং এটম্ বোমার প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তি।

রুশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

এটম্ বোমা সম্পর্কে অত্যধিক হৈ চৈ করিয়া রুশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার গুরুত্ব হ্রাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের দেশের দুই একজন গণ্ডমূর্খ অশিষ্ট সাংবাদিক এইরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, এটম্ বোমার আঘাতে জাপানের পরাজয় আসন্ন বুঝিয়া প্রাচ্য অঞ্চলে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রুশিয়া ব্যস্ত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই যেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন যে, এটম্ বোমার কথা জানিবার বহু পূর্ব্বে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য রুশিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল ; মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর তিন মাসের মধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে

রুশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিবে বলিয়া মঃ ষ্ট্যালিন ইয়াল্টায় কথা দিয়াছিলেন।

এটম্ বোমার গুরুত্ব অস্বীকার করিতেছি না। তবে, উহা জাপানের পরাজয়ের অন্যতম আশু কারণ—একমাত্র কারণ নয়। জাপান ইচ্ছা করিলে মিত্রশক্তিকে এটম্ বোমার ব্যবহারে কতকটা সংযত হইতে বাধ্য করিতে পারিত। জাপান ঘোষণা করিয়াছিল যে, এই বোমার ব্যবহার আন্তর্জ্জাতিক রণনীতির বিরোধী। ইহার পরই সে বলিতে পারিত—মিত্রপক্ষ যদি উহা ব্যবহারে সংযত না হন, তাহা হইলে সে-ও আন্তর্জ্জাতিক রণনীতি লঙ্ঘন করিয়া শ্রমশিল্প কেন্দ্রগুলিতে মার্কিন যুদ্ধ-বন্দীদিগকে রাখিয়া দিবে। তখন এটম্ বোমার আঘাতে সহস্র সহস্র মার্কিন সৈন্যের জীবন-নাশের আশঙ্কায় মিত্রশক্তি কতকটা সংযত হইতে বাধ্য হইতেন। বস্তুতঃ মিত্রশক্তি কেবল এই বোমা দিয়া জাপানকে নতজানু করিবার আশা পোষণ করেন নাই। পোটস্‌ড্যাম্ হইতে যখন এটম্ বোমা ব্যবহারের (অবশ্য নাম গোপন রাখিয়া) হুমকী দেওয়া হয়, তখনও ট্রুম্যান ও চার্চ্চিল প্রাচ্যের যুদ্ধে রুশিয়ার সমরশক্তি প্রয়োগের জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়া কম্যাণ্ডের অধিনায়ক মাউণ্টব্যাটেন্ এটম্ বোমার ভয়ে জাপান আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া বিশ্বাসই করেন নাই।

উত্তর চীনে জাপানের সমরায়োজনের কথা জানা না থাকার জন্য রুশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার গুরুত্ব বুঝিতে অসুবিধা হয়। উত্তর চীনে জাপানের ৪০ ডিভিসন উৎকৃষ্ট সৈন্য সন্নিবিষ্ট ছিল। মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় জাপানের অস্ত্রের কারখানাগুলি ছিল সম্পূর্ণ অটুট; এই অঞ্চলে মিত্রপক্ষের একটি বোমাও পড়ে নাই। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনে মিত্রপক্ষের যে সামরিক সাফল্য সম্পর্কে উচ্চ রবে ঢাক পিটানো হইয়াছিল, সে সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ—রুশিয়ার বিরুদ্ধে সাবধান হইবার জন্য জাপান তাহার সমরশক্তি উত্তর চীনে সন্নিবিষ্ট করিতেছিল।

সম্প্রতি খাস জাপান অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠে; ওকিনাওয়া অধিকার করিয়া মিত্রপক্ষ খাস জাপানে অভিযান চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ফিলিপাইন্‌সের লুজন্ হাতে আসায় দক্ষিণ চীনে মিত্রপক্ষের অভিযানের সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তী হয়। মার্কিন বিমানের প্রচণ্ড আঘাতে খাস জাপানের শ্রমশিল্প প্রায় পঙ্গু হইয়াছিল; বহির্জ্জগতের সহিত খাস জাপানের সংযোগ প্রায় ছিল না।

কিন্তু ইহাও সত্য যে, উত্তর চীনে জাপানের একটা বিশাল সমরশক্তি অটুট ছিল। মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার অস্ত্রের কারখানা এবং এই সেনা-বাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া জাপান এশিয়াখণ্ডে বহুদিন যুদ্ধ চালাইতে পারিত। এ কথা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, শেষ মুহূর্ত্তে জাপানের সম্রাট ও জাপ গভর্ণমেণ্টকে চীনে স্থানান্তরিত করিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইবার পরিকল্পনা জাপানের ছিল। সোভিয়েট রুশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জাপানের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়াছে; ১০ দিনের মধ্যে উত্তর চীনের বিশাল সমরায়োজন সে চূর্ণ করিয়াছে। বস্তুতঃ জাপানের সমর-[illegible] সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে সোভিয়েট রুশিয়ার আঘাতে; জাপানের সামরিক পরাজয় ঘটাইয়াছে রুশিয়ার লাল পতাকা-বাহিনী। এটম্ বোমার আতঙ্ক সামরিক পরাজয় নয়।

প্রাচ্য অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার রাজনৈতিক গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। প্রাচ্য অঞ্চলের যুদ্ধোত্তর রাজনীতি সম্পর্কে কথা বলিবার পূর্ণ অধিকার সে এখন লাভ করিল। প্রাচ্য অঞ্চল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য-বাদীদের শোষণের ক্ষেত্র; এই অঞ্চলের রাজনীতি সম্পর্কে শোষণ-বিরোধী সোভিয়েট রুশিয়ার কথার মূল্য অত্যন্ত অধিক। প্রাচ্যের শ্রমশিল্পে অনুন্নত ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির সহিত সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধ খাদ্যখাদকের; এই সব রাজ্যের প্রকৃত উন্নতি উহাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপন্থী। কাজেই উহারা কখনও এই সব রাজ্যের মিত্র হইতে পারে না। অনুন্নত ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির একমাত্র মিত্র শোষণ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট রুশিয়া। এই মিত্র প্রাচ্যের যুদ্ধোত্তর রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বড় অংশ গ্রহণ করিবে।

এটম্ বোমা

এটম্ বোমার আঘাতে জাপানের হিরোসিমো ও নাগাসাকি নামক দুইটি সহর প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। দুই লাখ লোক হতাহত হইয়াছে; আশ্রয়হীন হইয়াছে তাহারও বেশী।

এটমের অসীম শক্তি কাজে পরিণত করিতে সমর্থ হওয়া যে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সাফল্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শক্তি প্রথম ব্যবহৃত হইল নির্ব্বিচারে শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও পঙ্গুদিগকে হত্যার অমানুষিক কাজে!

জাপানে এটম্ বোমা ব্যবহারের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন মিত্রপক্ষের প্রায় প্রত্যেক রাজনীতিক; এমন কি রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের মুখ দিয়াও ইহার সমর্থক কথা বাহির করা হইয়াছে। এটম্ বোমার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি—ইহার ব্যবহারে যুদ্ধ সংক্ষেপ হইয়াছে; মিত্রপক্ষের সৈন্যক্ষয় কমিয়াছে। স্বপক্ষের সৈন্য ক্ষয় কমাইবার জন্য নির্ব্বিচারে বেসামরিক জনসাধারণকে হত্যা করা যদি সমর্থনযোগ্য হয়, তাহা হইলে মানবতার আদর্শ, যুদ্ধ পরিচালন সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক বিধান প্রভৃতি ন্যাকামোর দরকার কি? বস্তুতঃ মিত্রপক্ষের রাজনীতিকদের এই ধরণের যুক্তিতে তাঁহাদের ভণ্ডামী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুক্তি হইতে সঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সৈন্যক্ষয় কমাইবার জন্য বিষবাষ্পের ব্যবহারেও মিত্রশক্তির রাজনীতিকদের আপত্তি নাই। তাঁহারা উহা ব্যবহার করেন না এই কারণে যে, পাল্টা বিষবাষ্প ব্যবহার করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা শত্রুপক্ষের আছে। এটম্ বোমা সম্পর্কে তাঁহাদের যুক্তির তাৎপর্য্য—"শত্রুর হাতে এই অস্ত্র নাই সুতরাং উহা ব্যবহার করিব; তাহার হাতে উহা থাকিলে আন্তর্জ্জাতিক রণনীতির দোহাই দিতাম।"

এটম্ বোমা সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতিকরা খুব পাঁয়তাড়া কষিতেছেন। তাঁহাদের ভাবটা এই—ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ব্যবহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র তাঁহাদের হাতে; সুতরাং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করিবার প্রকৃত ক্ষমতা কেবল তাঁহাদেরই। এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাঁহারা প্রাচ্যে চীন এবং ইউরোপে ফ্রান্স, বেল্‌জিয়াম্ প্রভৃতি রাষ্ট্রকে

প্রভাবিত করিতে চাহিতেছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা যেন ইহাদিগকে বলিতে চান যে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে মিত্র-নির্ব্বাচনের জন্য আর সোভিয়েট রুশিয়ার দিকে চাহিও না ; এখন আমাদের শক্তির তুলনায় তাহার সামরিক শক্তি নগণ্য।

এই সম্পর্কে বলা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে এটম্ বোমাকে যদি আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন করা না হয়, তাহা হইলেও উহা বেশী দিন বৃটেন্ ও আমেরিকার একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না। বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক কাহারও একচেটিয়া নয় ; অদূর ভবিষ্যতে অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকরাও এটমের শক্তি কাজে লাগাইবার উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ প্রধান প্রধান দেশের বৈজ্ঞানিকরা এই বিষয়ে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন।

সোভিয়েট-চীন চুক্তি

ত্রিশ বৎসরের জন্য চীন ও সোভিয়েট রুশিয়ার চুক্তি হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া যে প্রাচ্য অঞ্চলে কোনরূপ অন্যায় সুবিধা চাহে না, তাহা এই চুক্তিতে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট রুশিয়া চুংকিং গভর্ণমেন্টকে চীনের একমাত্র গভর্ণমেন্ট বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে। রুশিয়ার সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য কেবল চুংকিংএই পৌছিবে। ইহা ছাড়া, পূর্ব্ব চীন ও দক্ষিণ চীনের রেলপথে ৩০ বৎসরের জন্য রুশিয়া ও চীনের সম্মিলিত কর্তৃত্ব থাকিবে ; তাহার পর উহা চীনের হইবে। চীনা গভর্ণমেন্ট ডাইরেণকে স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষণা করিবেন। পোর্ট আর্থার ৩০ বৎসরের জন্য রুশিয়া ও চীনের সম্মিলিত পোতাশ্রয় থাকিবে।

এই চুক্তির সবচেয়ে বড় কথা—সোভিয়েট রুশিয়া চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের দেশের অর্ব্বাচীনের দল বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, চীনের কমুনিষ্টদের ক্রিয়া কলাপ যে সোভিয়েট রুশিয়া সমর্থন করে না, ইহা তাহারই প্রমাণ। আবার কোন কোন উর্ব্বর মস্তিষ্কে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সোভিয়েট রুশিয়া চীনের কমুনিষ্টদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

প্রকৃত কথা এই—সোভিয়েট রুশিয়া বুঝিয়াছে যে, চীনের ব্যাপারে বাহিরের কোন শক্তি যদি হস্তক্ষেপ না করে, তাহা হইলে চুংকিং গভর্ণমেন্টকে গণতান্ত্রিক দাবীগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার শক্তি কমুনিষ্টদের আছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা চিরদিন আভ্যন্তরীণ বিরোধে উস্কানি দিয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া নিজে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে সরিয়া থাকিতে চাহিয়া প্রতীচ্য সাম্রাজ্যবাদীদিগকে পরোক্ষে জানাইয়াছে—"তোমরাও সরিয়া থাক।" বস্তুতঃ বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সহযোগিতা ব্যতীত চীনে আধা-ফ্যাসিস্ত শাসন চালাইবার শক্তি চিয়াং ও তাঁহার কুয়োমিটাং দলের নাই। সোভিয়েট রুশিয়া এই সহযোগিতা বন্ধ করিতে চায়। মাঞ্চুরিয়া, ডাইরেণ, পোর্ট আর্থার প্রভৃতি সম্পর্কে উদার মনোভাব অবলম্বন করিয়া এবং সর্ব্বোপরি চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে সরিয়া থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সোভিয়েট রুশিয়া চীনের জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছে। এখন কুয়োমিণ্টাঙ্গের ঝুনা সোভিয়েট বিরোধীরা চীনে আর পাত্তা পাইবে না।

জাপান আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইবার পর মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্ কমুনিষ্ট সেনাপতি চু-তের উপর কড়া হুকুম জারি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈন্যরা যেন জাপানীদের নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণ না করে। চু-তে স্বভাবতঃ এই অন্যায় আদেশ পালন করিতে সম্মত হন না। তাঁহার সহজ যুক্তি—যে সব সেনাবাহিনী শত্রুর সহিত লড়িয়াছে, শত্রুর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিবার অধিকার তাহাদের নিশ্চয়ই আছে। ইহার পরই মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্ কমুনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুংকে চুংকিংএ আসিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে মাও ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। পরে, চিয়াংএর আগ্রহাতিশয্যে তিনি দুই একজন পরামর্শদাতা সঙ্গে লইয়া চুংকিংএ আসিয়াছেন ; সেখানে এখন দুই পক্ষের আলোচনা চলিতেছে।

কমুনিষ্টদের সহিত মীমাংসা করিবার জন্য চিয়াংএর এই আগ্রহের চারিটি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, চিয়াং বুঝিয়াছেন যে, কমুনিষ্টরা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক দাবানো আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, কমুনিষ্টদিগকে দাবাইবার জন্য বৈদেশিক শক্তির সাহায্য পাইবার কোন আশ্বাস হয়ত চিয়াং পান নাই। তৃতীয়তঃ, বিচক্ষণ রাজনীতিকরূপে চিয়াং হয়ত উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নানারূপ ষড়যন্ত্রের সহিত চীনকে লড়িতে হইবে। বৃটেন হংকং ফিরাইয়া দিতে মোটেই রাজী নয় ; বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতারা শাসনক্ষমতা হাতে পাইবার পর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রতি মোটেই ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন না। সাংহাইকে আবার আন্তর্জ্জাতিক অঞ্চলে পরিণত করিবার জন্য ধুয়া উঠিয়াছে। এই সব বৈদেশিক চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একতা যে একান্ত প্রয়োজন, ইহা চিয়াংএর পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব। চতুর্থতঃ কমুনিষ্টরা যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি দাবী করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই চীনের জাগ্রত জনগণের দাবী। যুদ্ধের সময় একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় সে দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব হইলেও শান্তির সময় তাহা যে আর উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না, তাহা চিয়াং বুঝিয়া থাকিবেন।

বার্লিনের নিকটে পোট্‌স্‌ড্যামে ষ্ট্যালিন-ট্রুম্যান-এট্‌লির (চার্চ্চিলও প্রথম দিকে উপস্থিত ছিলেন) সম্মিলনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর সে সম্পর্কে নানাবিধ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর শ্রমশিল্প পঙ্গু করিয়া উহাকে কৃষি প্রধান দেশে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে। পোটস্‌ড্যাম্ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচার কার্য্যের ফলে এইরূপ ধারণার সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ নাৎসী আমলে যুদ্ধের জন্য জার্ম্মানীর শ্রমশিল্প শতকরা ৭০ ভাগ বেশী প্রসারিত হইয়াছিল। জার্ম্মান শ্রমশিল্পের সামরিক উদ্দেশ্যে প্রসারিত এই অংশ সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা পোটস্‌ড্যামে হইয়াছে ; জার্ম্মানীর নিজের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্প সঙ্কুচিত করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। ৩১।৮।৪৫

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ঋণ ও ইজারা নীতির অবসানে ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়া

সর্ব্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধসংক্রান্ত সকল বিধি-ব্যবস্থার অবসান ঘটিতেছে। ব্রিটেন, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হইবার পরমুহূর্ত্ত হইতেই সামরিক বিভাগ সঙ্কুচিত করিয়া ও সমরসংক্রান্ত সাময়িক বিভাগগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া দেশের আর্থিক ভারসাম্য-রক্ষার নানাবিধ পরিকল্পনা তৈয়ারী হইতেছে। সম্পত্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত চার বৎসর যাবৎ ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী বহু পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, ভোগ্যপণ্য বা খাদ্যসামগ্রী জোগাইয়া মিত্রপক্ষীয় যুধ্যমান দেশগুলিকে সাহায্য করিতেছিল, জাপানের সহিত যুদ্ধাবসানের এক সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ঋণ ও ইজারা নীতি বাতিল করিয়া এই পণ্যসরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার এই সংবাদে ব্রিটিশ সরকারের মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের বিপুল ব্যয় বহনে ব্রিটেন আসিয়া পৌঁছাইয়াছে রিক্ততার চরম স্তরে। অন্তর্দেশীয় আর্থিক অবস্থা তাহার এত শোচনীয় যে, যুদ্ধজয়ের বিরাট আনন্দ পর্য্যন্ত এখন তেমন ভাবে উপভোগ করা ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। ব্রিটিশ ট্রেজারীর ঘাড়ে চলতি নোট ও ঋণপত্রের বোঝা, ভারতের নিকট প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং ঋণ, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজিপ্ট প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত ও মিত্রদেশগুলির নিকটও ব্রিটেনের অগাধ দেনা জমিয়া গিয়াছে। ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশগুলির নিকট ব্রিটেনের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ শত কোটি ডলার, অথবা প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। সবচেয়ে বড় কথা, ব্রিটেন এই যুদ্ধের সময় আমেরিকার নিকট হইতে যে বিরাট পরিমাণ পণ্য ধারে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মূল্য পরিশোধ করা ব্রিটেনের পক্ষে এখন দীর্ঘকাল সম্ভব হইবে না। তবে একমাত্র ভরসার কথা, আমেরিকার নিকট হইতে ব্রিটেন ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী পণ্যাদি ধার করিয়াছে। ঋণ ও ইজারা নীতির সুবিধা হইতেছে এই যে, অবস্থায় না কুলাইলে এই দেনা শোধ করিবার বাধ্যবাধকতা নাই এবং পণ্যাদি গ্রহণের পরিবর্ত্তে নগদ মূল্য না দিয়া পণ্য দিয়াই দেনা শোধ করিতে হইবে। যুদ্ধের মধ্যে এই ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী ব্রিটেন আমেরিকা হইতে বহু পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, বিমান প্রভৃতি ছাড়াও নানাপ্রকার ভোগ্যপণ্য এবং প্রচুর খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিয়া সমগ্র বৃটিশ জাতির প্রাণ ধারণের সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। ১৯৪৫ সালের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী ব্রিটেনকে জোগান দিয়াছে মোট ৩১৯ কোটি পাউণ্ড মূল্যের পণ্য। ইহার মধ্যে ৮০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য ছিল।

এই ঋণ ও ইজারা নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পশ্চাতে ব্রিটেনের আর্থিক অসঙ্গতির একটি করুণ ইতিহাস আছে। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা গত মহাযুদ্ধের পর হইতে কখনই ভাল হয় নাই এবং নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই ব্রিটেন গত ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিলে প্রথম প্রথম ব্রিটেন নগদ দামে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় পণ্যাদি ক্রয় করিতে থাকে, কিন্তু ১৯৪০ সালের শেষ নাগাদ তাহার সমস্ত ডলার সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া যাইবার ফলে তাহার পক্ষে আমেরিকা হইতে মালপত্র আমদানী একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সময় জার্ম্মানীর উপর্য্যুপরি জয়লাভ দেখিয়া এবং প্রাচ্যে জাপানের ভাবগতিক সন্দেহ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের যুদ্ধজয় কামনা করিতে থাকে এবং ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ঋণ ও ইজারা নীতি নামক বিচিত্র নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রিটেনকে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে পরিশোধের সর্ত্তে ধারে পণ্যাদি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করেন। ব্রিটেনকে এইভাবে সাহায্য করার পিছনে আমেরিকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ক্রমবর্দ্ধমান ফ্যাসিষ্টশক্তি ধ্বংস করা। পাছে ব্রিটেনে পণ্যরপ্তানীকে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃপক্ষের অকারণ বদান্যতা বলিয়া ভুল করে, এইজন্য মার্কিন সেনেটে ঋণ ও ইজারা বিল উত্থাপনের সময় সরকার পক্ষ হইতে সেকথা বলা হয়; কাজেকাজেই দেখা যাইতেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একান্ত নিজস্বার্থেই যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে এই ঋণ ও ইজারা নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, সুতরাং যুদ্ধশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির কার্য্যকারিতার শেষ হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকে না।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মার্কিন প্রেসিডেণ্টের এই সিদ্ধান্ত মোটেই ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গত ২৪শে জুন পার্লামেণ্টের অধিবেশনে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লিমেণ্ট এ্যাটেলি এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ও বর্ত্তমান বিরোধী দলের দলপতি মিঃ চার্চ্চিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এই ঘোষণার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রিটেনের বর্ত্তমান দুঃসময়ে ব্রিটিশ সরকারকে প্রস্তুত হইবার সময় পর্য্যন্ত না দিয়া যুক্তরাষ্ট্র এই যে পণ্যসরবরাহ বন্ধ করিয়া দিল, ইহা কিছুতেই তাহার শ্রেষ্ঠ মিত্রের প্রতি কর্ত্তব্যহিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনকে এখন আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে বাহির হইতে শিল্পসংগঠনের উপযোগী কাঁচামাল আগেই আনিতে হইবে, কারণ শিল্পজীবী ব্রিটেন যদি যথেষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিয়া রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিতে পারে, তবেই তাহার পক্ষে অন্তর্দেশীয় সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান নীতি বজায় রাখা সম্ভব। এই কাঁচামালের জন্য এবং ব্রিটিশ জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিতে যে নগদ মূল্যের প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহ করা এখন ব্রিটেনের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্যই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় বিচলিত হইয়া ব্রিটিশ সরকার প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনেস, ওয়াশিংটনস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এবং অন্যান্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্ট

ট্রুম্যানকে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাইতে আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকার স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন যে, যুদ্ধের পরেও ঋণ ও ইজারা নীতি চালু না থাকিলে ব্রিটেনের গৃহাদি নির্ম্মাণ ও পুনর্গঠন সমস্যার সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এদিকে তাঁহার সিদ্ধান্তের ফলে ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহার কার্য্যের সপক্ষে সুদৃঢ় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই বলিয়াছেন যে, ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হওয়ায় যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা বাতিল করিতে তিনি বাধ্য। যখন এই নীতি প্রবর্ত্তিত হয় তখন তিনি ছিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কিন্তু তখনই তিনি মার্কিন কংগ্রেসের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, জাপানী যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবেন।

এইভাবে ঋণ ও ইজারা নীতি সংশোধিত না হইলে ব্রিটিশ সরকার যে চূড়ান্ত আর্থিক অসুবিধায় পড়িবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ বিলাতী পত্রিকা 'ইকনমিষ্ট' মার্কিন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে, এই ঋণ ইজারা ব্যবস্থার অবসানের চেয়ে আমেরিকা মিত্র দেশগুলির এত বেশী ক্ষতি আর কিছুতেই করিতে পারিত না। ব্রিটেনের টোরী সরকার আমেরিকার নিকট হইতে বৎসরে প্রায় ৪শত ডলার মূল্যের পণ্যাদি ঋণস্বরূপ লাভ করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইতে না হইতেই যুক্তরাষ্ট্র এইরূপ ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ব্রিটেনে শ্রমিকদলকে কঠোর অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শ্রমিক দলের মুখপত্র 'ডেইলী হেরল্ড' সম্ভবতঃ অত্যধিক দুঃখে হতাশাগ্রস্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, লর্ড কিনেস প্রমুখ ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ যদি শেষ পর্য্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পুনর্বিবেচনায় সম্মত করাইতে না পারেন, তাহা হইলে ব্রিটেন বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে পাল্টা আঘাত হানিবে। মার্কিন সেনেটের ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য মিঃ ইমানুয়েল সেলার ইতিমধ্যেই অভিযোগ করিয়াছেন যে, ব্রিটেন নাকি ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে মার্কিন বাণিজ্য ব্যাহত করিবার জন্য অপচেষ্টা শুরু করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্র যে ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমরপণ্য উৎপাদন হইতে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে পরিবর্ত্তিত হইবার সময় না দিয়াই ব্রিটেনকে এরূপ আর্থিক অসুবিধায় ফেলিল—তাহার পশ্চাতে অবশ্যই আমেরিকার বহির্বাণিজ্যের প্রশ্ন জড়ানো আছে। যুক্তরাষ্ট্রে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বজায় রাখিতে হইলেও আমেরিকাকে তাহার বর্ত্তমান রপ্তানী বাণিজ্য অন্ততঃ দ্বিগুণ করিতেই হইবে, অথচ তাহার পণ্য বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র ভারতবর্ষ প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি। এই সকল দেশে বাণিজ্য চালাইবার আপেক্ষিক সুবিধা লাভের বিনিময়ে আমেরিকা যদি ঋণ ও ইজারা নীতির অনুরূপ কোন নূতন নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রিটেনকে ধারে পণ্য জোগাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। অবশ্য এখনও আমেরিকা তাহার মনোভাব প্রকাশ করে নাই, বরং স্পষ্টভাবেই বলিতেছে যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর ঋণ ও ইজারা নীতি চালু থাকিতে পারে না। মার্কিন বৈদেশিক অর্থনীতি বিভাগের পরিচালক মিঃ লিও ক্রাউলি বলিয়াছেন যে, আমেরিকা এখনও ব্রিটেনে মাল ও মজুর পাঠাইতে প্রস্তুত তবে আগে যেরূপ ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থানুযায়ী ইহা করা হইত এখন তাহা হইবে না, এখন নগদ অথবা ধারে মাল লইতে হইবে।" কিন্তু ব্রিটেনের বর্ত্তমান শোচনীয় আর্থিক অবস্থায় মিঃ ক্রাউলির কথামত মার্কিন পণ্য গ্রহণ করা অসম্ভব। পণ্যের পরিবর্ত্তে সুবিধামত পণ্য দিয়া দেনা শোধ করা ব্রিটেনের পক্ষে হয়তো সম্ভব, কিন্তু নগদ দাম দিয়া অথবা পরে নগদ দাম দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্রিটেন এখন আর মার্কিন পণ্য গ্রহণ করিতে পারে না। মোটের উপর অবস্থা এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার আমেরিকাকে হাতে রাখিবার মত কোন ব্যবস্থা এখনই স্থির করিয়া না ফেলিলে ব্রিটেনের পুনর্গঠন যেমন অসম্ভব হইয়া উঠিবে তেমনি অনিশ্চিত হইয়া উঠিবে তাহাদের স্থায়িত্ব। শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করিতে টোরি দলের সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করিয়া ব্রিটিশ সরকারকে অকস্মাৎ বিপদে ফেলিয়াছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার অবসানের নির্দ্দেশ প্রদানের কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যাও করিতেছেন।

মোট কথা ঋণ ও ইজারা নীতি বাতিলের প্রতিক্রিয়া ব্রিটেনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ কি ভাবে বিপন্ন করে, তাহা অবশ্যই সাগ্রহে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সরকারী প্রেসনোটেই যখন শস্য কম হইবার সম্ভাবনা স্বীকৃত হইয়াছে তখনও কি মাননীয় গভর্ণর মিঃ কেসি গত ৪ঠা জুলাইয়ের বেতার বক্তৃতায় বাংলাকে উদ্বৃত্ত প্রদেশ ঘোষণা সংশোধিত করিবেন না? চরম দুর্ভাগ্যের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া বদান্যতার এ মোহ কর্ত্তৃপক্ষ আর কতদিন আঁকড়াইয়া থাকিবেন?

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত অসংখ্য লোকের কর্ম্মসংস্থান অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। শুধু সামরিক বিভাগে নয়, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ প্রভৃতিতেও বহু লোক নিয়োজিত আছে; অতঃপর ভারতসরকার যে ইহাদের অধিকাংশকেই ছাড়িয়া দিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া যোগানদার ও ব্যবসাদার প্রভৃতি যাহারা এই যুদ্ধের সুযোগে করিয়া খাইতেছিল তাহাদের ভবিষ্যতও হইয়া পড়িয়াছে অনিশ্চিত। এইভাবে অতি শীঘ্রই ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের কর্ম্মহীন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং এই ৩০ লক্ষ লোকের বেকার হইবার ফলে একজন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির উপর গড়ে নির্ভরশীলের সংখ্যা পাঁচজন হইলে অন্ততঃ দেড়কোটি ভারতবাসীর আর্থিক স্বার্থ শীঘ্রই বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

তবু যদি ভারতবর্ষে যুদ্ধকালে শিল্পাদি প্রসারিত হইত, তাহা হইলেও এই সকল বেকার ব্যক্তির অনেকেই সেই সব সম্প্রসারিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থান লাভ করিতে পারিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী ঔদাসীন্যে এই

ব্যবস্থাও সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধের আমলে অধিকাংশ কাজকর্ম্ম সহর কেন্দ্রিক হওয়ায় অসংখ্য গ্রামবাসী গ্রাম ছাড়িয়া সহরে ভিড় বাড়াইয়াছে, এখন সহরগুলিতে যে জনবাহুল্য দেখা দিয়াছে তাহা একান্তভাবে কৃত্রিম। যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে যাহারা বেকার হইবে তাহারা কতকটা নিরুপায় হইয়াই দিনকতক সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ক্ষতবিক্ষত চিত্তে গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। তারপর সারা ভারত জুড়িয়া শুরু হইবে দুঃসহ মন্দাবাজার। সহরগুলির কর্ম্মচাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া দেশের অন্তর্দেহে সেই সম্ভাব্য ক্ষয় চক্ষুগোচর না হইলেও ক্রমে ভারতের ৭ লক্ষ গ্রাম বাঁচিবার জন্য চরম আকাঙ্খা সত্বেও নিঃস্বতার রিক্তপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছাইবে এবং ফলে অবশেষে লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর মৃত্যু ও অপমৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

অবশ্য এখনও যদি ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে শিল্পপ্রসার হইত, তাহা হইলেও এই দুর্ব্বিপাক হইতে এ দেশকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় যে সরকার লজ্জাকর ঔদাসীন্য দেখাইয়া সহস্র সুযোগ সম্ভাবনা ব্যর্থ করিয়া দিলেন, যুদ্ধের পরেই যে তাঁহারা হঠাৎ কল্পতরু হইয়া আমাদের সমস্ত অভাব মিটাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিবেন, এ কথা মনে করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। সম্প্রতি ভারত হইতে যে শিল্পপতির দল ভারতের শিল্পপ্রসারের জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি এবং কুশলী শিল্পী সংগ্রহের চেষ্টায় সফরে গিয়াছিলেন, তাহারা নিষ্করুণভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহার পর আর যাই করা যাক, আশু শিল্পপ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের আকাশ-কুসুম কল্পনা করা আর শোভা পায় না। এ সময় আমাদের যেটুকু আশা আছে তাহা সরকারী করুণাবিন্দু ও বেসরকারী কয়েকজন শিল্পপতির উৎসাহের উপর নির্ভর করিতেছে। অথচ এই আশা পূর্ণ হইলেও তাহার ফল এত সুদূরপ্রসারী হইবে না যাহাতে আমাদের দেশজোড়া সমস্যা মিটিতে পারে। তবে এই অপ্রচুর উৎসাহ উদ্যমের ব্যবহার যদি এক সুচিন্তিত করিকল্পনার ভিতর দিয়া হয়, তাহা হইলেও অবশ্য দেশের অনেক কল্যাণ হইতে পারে।

গ্রামে যখন লোক বাস করে অনেক বেশী এবং গ্রামের সংখ্যা যখন সহরের বহুগুণ, তখন ভারতের গ্রামগুলিকে শিল্পের দিক হইতে উন্নতিশীল করিয়া তুলিতে পারিলে বিভিন্ন স্থানীয় অভাব মিটিয়া যাইবার ফলে ক্রমে ক্রমে সারা দেশের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সরকারী সাহায্য বা বেসরকারী উদ্যমকে এই দিকে টানিতে হইলে প্রয়োজন গ্রামগুলির সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে পরিষ্কার হিসাব-নিকাশ এবং উপযুক্ত কারিগরী ও সঙ্ঘবদ্ধতা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের দ্বারা গ্রামবাসীকে এই সংস্কারের যোগ্য করিয়া তোলা। সম্প্রতি 'গ্রামাঞ্চলে শিল্পীকরণ' বা village Industrialisation সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা 'অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন' কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যার এম বিশ্বেশ্বরাও এই পুস্তিকার লেখক। এই পুস্তিকায় লেখক পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলিকে কয়েকটি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিতে না পারিলে এবং এই সংঘবদ্ধ গ্রামগুলির সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠিত না হইলে গ্রামাঞ্চলের সত্যকার সংস্কার কিছুতেই হইতে পারে না। এইভাবে শিল্পীকরণের দ্বারা গ্রামাঞ্চলের উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া কৃষি, যানবাহন প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের প্রাণস্বরূপ ব্যবস্থাগুলিতে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইবে না, একথা অবশ্যই পুস্তিকাখানিতে বলা হয় নাই। স্যার বিশ্বেশ্বরাওয়ের বক্তব্য হইতেছে এই যে, সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে সারা ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণকর কোন কাজ করিতে হইলে এত বেশী টাকার প্রয়োজন যাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বর্ত্তমানে জোগান সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে যদি গ্রামাঞ্চলসমূহ স্বচ্ছল হয়, তবেই এই ব্যবস্থা সম্ভব করিবার মত টাকা এই দেশে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

স্যার বিশ্বেশ্বরাও এই পরিকল্পনাটি এমনভাবে রচনা করিয়াছেন যাহা কার্য্যকরী হইলে গ্রামসমূহের সর্ব্বপ্রকার সংখ্যাতত্ব সংগৃহীত হইতে পারে। প্রধানতঃ তিনি পরিকল্পনাটির দুইটি প্রাথমিক স্তর নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি চাহিয়াছেন গড়ে ১৫ হাজার গ্রামবাসী সমন্বিত ১০টি গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রামসঙ্ঘ গঠন করিতে, এই সঙ্ঘগুলির অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহের সকলপ্রকার উন্নতিসাধন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তিনি এই সঙ্ঘগুলির প্রত্যেকটি পরিকল্পনার জন্য গ্রামবাসীগণ কর্তৃক গড়ে ১২ জন করিয়া সদস্য নির্ব্বাচিত করিবার কথা বলিয়াছেন। এই সদস্যগণ গ্রামের সুযোগ সুবিধা, গ্রামবাসীদের আর্থিক সঙ্গতি, কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়, গ্রামসমূহের সাধারণ ও কারীগরী শিক্ষার সকল ব্যবস্থা করিবেন। তা ছাড়া তাঁহারা প্রতি বৎসর গ্রামবাসীদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে আরও সংখ্যাতত্ত্বের সকল সংবাদ এমনভাবে সরবরাহ করিবেন যাহাতে নির্ভুলভাবে এই দেশের মাথাপিছু আয় নির্দ্ধারণ করা যায়। পরিকল্পনাকার আশা করেন যে, এই সকল সদস্য এমনভাবে দেখাশুনা করিবেন যাহাতে মাত্র ৫ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে গ্রামগুলির কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন অন্ততঃ দ্বিগুণ হইয়া যাইতে পারে। তা ছাড়া তাঁহারা এমন সব ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে অন্ততঃ দুই বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রামগুলিতে সঞ্চিত থাকে। মোটের উপর, স্যার বিশ্বেশ্বরায়া এই কমিটিগুলিকে যে ভাবে কাজ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা প্রতিপালিত হইলে দেশের জননেতাগণ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষিত হইবে এবং তাহারা সজাগ হইয়া গ্রামগুলির উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগ দিলে গ্রামসমূহের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের চেহারা ফিরিয়া যাইবে। ২৯।৮।৪৫
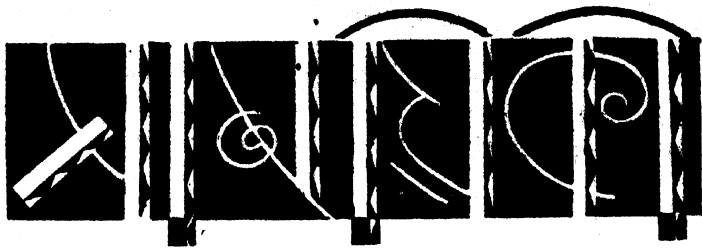
সুভাষচন্দ্র বসু—

২৩শে আগষ্ট লণ্ডন হইতে সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গত ১৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর হইতে টোকিও যাইবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ১৮ই জাপানের হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। এই সংবাদ ভারতে আসার পর দেশের সর্ব্বত্র শোকসভা হইতেছে ও দেশের নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও দেশ-সেবার কথা বর্ণনা করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের কি ছিলেন ও কে ছিলেন, তাহা আলোচনার সময় এখনও আসে নাই। যদি কোন দিন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে, সে দিন ভারতবাসী সুভাষ-চন্দ্রের মত একজন নির্ভীক, অক্লান্তকর্ম্মী দেশপ্রেমিকের কথা আলোচনার সুযোগ লাভ করিবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার লোক পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রের এই মৃত্যু সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না—ভারতের অধিকাংশ লোক—পূর্ব্ববারে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ যে ভাবে মিথ্যা বলিয়া রটিত হইয়াছিল—এবারও তাহাই হইবে বলিয়া মনে করে। সুভাষচন্দ্রকে দেশসেবার ঐকান্তিক আগ্রহের জন্য শুধু বৃটীশ শাসকদের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই, দেশবাসীর দ্বারাও তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইয়াছিল। আজ সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া আমরা বেদনা বোধ করিতেছি। অধিকাংশ দেশবাসীর সহিত একমত হইয়া আমরাও প্রার্থনা করি, সুভাষচন্দ্রের এই মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হউক এবং সুভাষচন্দ্র দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার ২৫ বৎসরের সাধনার ফল স্বাধীন ভারতে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হউন। সুভাষচন্দ্রের জীবনী ও গুণাবলী আলোচনার সময় এখনও আসে নাই—ভারতবাসী শত শত বৎসর ধরিয়া তাঁহার মত একজন দেশ-সেবকের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী—

গত ২২শে আগষ্ট মুরীতে এক জনসভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু শত্রুদলের সহিত ধৃত ভারতীয়গণের প্রতি সরকারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মদেশ ও মালয়-প্রবাসী বহু ভারতীয় স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করিয়া বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। তাহা নানা কারণে বিপথে পরিচালিত হইয়াছিল। অন্যায় পথে পরিচালিত হইলেও তাহারা বীর সৈনিক। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় তাহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। বৃটীশ সরকার যদি শাস্তির দ্বারা তাহাদের জীবননাশের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা হইবে। যবনিকার অন্তরালে তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা সকলেই অজ্ঞ।" পণ্ডিতজীর এই কথা তাঁহার দেশবাসী সকলেই সমর্থন করে। জাতীয় বাহিনী ধৃত হওয়ার পর তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দেশবাসী সকলকে তাহা জানানো সরকারের কর্ত্তব্য।

দামোদর পরিকল্পনা—

দামোদর প্রভৃতি কয়েকটি নদীর বন্যায় বাঙ্গালা ও বিহারের বহু জেলা প্রায় প্রতি বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। সে বিষয়ে ডক্টর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি বহু বিশেষজ্ঞকে লইয়া এক জনহিতকর পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। সে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে সাক্ষাৎভাবে ৫০ লক্ষ লোক ও পরোক্ষভাবে আরও বহু লোক উপকৃত হইবে। সে বিষয়ে গত ২৩শে আগষ্ট কলিকাতায় এক আলোচনা সভা হইয়াছিল। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ডক্টর বি-আর-আম্বেদকর সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালা ও বিহার গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা তথায় উপস্থিত হইয়া সত্বর ঐ ব্যবস্থা কার্য্যে

পরিণত করার কথা বলিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশ বহু বিষয়ে লাভবান হইবে।

৯৩ ধারার অবসান দাবী—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১২০ জন সদস্য একযোগে ভারতসচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্সকে এক তার করিয়া বাঙ্গালায় ৯৩ ধারার অবসান দাবী করিয়াছেন। ঐ তারের নকল বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটিলী, মিঃ আর্থার গ্রীণউড, সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স, মিঃ রেজিনাল্ড সোরেন সেন, অধ্যাপক ল্যাস্কি ও মিঃ বিভানের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের মোট ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন বর্ত্তমানে মৃত ও ৯ জন কারারুদ্ধ, একজন স্পীকার পদে প্রতিষ্ঠিত। বাকী ২৩৭ জনের মধ্যে ১২০ জনকে অবশ্যই সংখ্যাধিক বলা যায়। কারারুদ্ধ ৯ জন মুক্তিলাভ করিলে দলের সদস্য সংখ্যা ১২৯ জন হইবে। ২৫ জন শ্বেতাঙ্গও সকল সময়ে সংখ্যাধিক দলে থাকেন। কাজেই এখনও কেন বাঙ্গালা দেশে বেআইনি ও অন্যায়ভাবে গভর্ণর ৯৩ ধারা জারি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইবেন।

বড়লাটের বিলাত যাত্রা—

বিলাতের মন্ত্রিসভার আহ্বানে ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল গত ২৪শে আগষ্ট পুনরায় বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে শাসন পরিষদের সম্পাদক রাও বাহাদুর ভি, পি, মেনন গিয়াছেন। তাঁহাকে দুই সপ্তাহকাল লণ্ডনে থাকিতে হইবে। বিলাতের শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় সমস্যার সমাধান কি ভাবে করিতে চাহেন তাহা লর্ড ওয়াভেলের প্রত্যাগমনের পর বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে অধিক আশারও যেমন কারণ নাই, নৈরাশ্যেরও সম্ভাবনা নাই। লর্ড ওয়াভেলের এ বিষয়ে আন্তরিকতায় মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রভৃতির বিশ্বাস আছে। কাজেই আমরা ভারতীয় সমস্যার সমাধানের—তাহা সকলের সন্তোষজনক হওয়া সম্ভব নহে—প্রত্যাশা করি।

সুদান-ইরিত্রিয়া যুদ্ধ—

১৯৪০ সালের ১০ই জুন হইতে ১৯৪১ সালের ২৭শে নভেম্বর পর্য্যন্ত সুদান-ইরিত্রিয়া অঞ্চলে ইটালীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহা পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই যুদ্ধে নিহত সৈন্যের মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তথায় ৪৯৮৪ জন ভারতীয়, ১৫৮২ জন বৃটীশ ও ৬৯৫ জন সুদান সৈন্য নিহত হইয়াছে। এই জীবন দানের পরিবর্ত্তে ভারতীয়গণ ঐ অঞ্চলে কি অধিক কিছু সুখ-সুবিধা লাভ করিয়াছে?

চাউল রপ্তানী—

সরকারী বিবরণে প্রকাশ, গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে সা ওয়ালেস কোম্পানীর জাহাজে করিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে ৩৮১১০১ টাকা মূল্যের ১৯৯৯ টন ভাঙ্গা চাউল এবং ২৪৪৯৯৯৪ টাকা মূল্যে ৬ হাজার টন সিদ্ধ চাউল বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের অভিজ্ঞতার কথা আমরা এখনও বিস্মৃত হই নাই। বর্ত্তমান বৎসরেও বাঙ্গালার কোথাও ভাল ধান হইবে না—কাজেই এইভাবে চাউল রপ্তানীর ব্যবস্থায় বাঙ্গালা দেশকে যে আবার বিপন্ন হইতে হইবে, সে কথা চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি

বেকার সমস্যা—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সকল বিভাগীয় কর্ত্তাদের নিকট ইস্তাহার প্রেরণ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, যুদ্ধের কাজের জন্য যে সকল কর্ম্মচারীকে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহাদের সকলকে যেন সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিনে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। যে সকল লোকের কাজ বিশেষ প্রয়োজনীয়, শুধু তাহাদের চাকরীই আরও কিছু দিন চলিবে। এইভাবে যাহারা বেকার হইবে, তাহাদের জন্য কি কোন ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না?

যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্য—

বর্ত্তমান যুদ্ধে বাঙ্গালা দেশ হইতে মোট ২ লক্ষ ৩০ হাজার যুবক সাধারণ সৈন্য, নৌসেনা ও বিমান সেনারূপে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। ভারতের মোট সৈন্যসংখ্যার ইহা শতকরা ৭ ভাগ মাত্র। ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গালা হইতে যুবকগণ যাইয়া বিমান সেনা বিভাগের শতকরা ১০০টি কাজই গ্রহণ করিয়াছিল—কিন্তু পরে তাহা কমিয়া যায়। সৈন্যবিভাগে প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২ জন নির্ব্বাচন বোর্ডের পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। এ দেশে শিক্ষার অভাব ও যুদ্ধ কার্য্যের জন্য বাল্যকাল হইতে প্রস্তুতির অভাবই এই অসাফল্যের প্রধান কারণ।

যুদ্ধের বিবরণের মূল্য—

১৯১৪ সালের আরব্ধ যুদ্ধের পর তাহার বিবরণ লিখিয়া তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লর্ড লয়াড জর্জ্জ প্রকাশকের নিকট ১০ হাজার পাউণ্ড মূল্য পাইয়াছিলেন। এবার একজন মার্কিন প্রকাশক মিঃ চার্চ্চিলের লিখিত যুদ্ধের বিবরণের জন্য আড়াই লক্ষ পাউণ্ড মূল্য দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আরও অধিক অর্থপ্রাপ্তির আশায় মিঃ চার্চ্চিল এখন পর্য্যন্ত কাহারও সহিত শেষ কথা বলেন নাই। সংবাদটি এ দেশের লোককে অবশ্যই চমৎকৃত করিবে।

নির্ব্বাচন যেন বিলম্বে হয়—

গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির সাধারণ নির্ব্বাচনের আয়োজন আরম্ভ করায় সে সম্বন্ধে গত ২১শে আগষ্ট শ্রীনগর হইতে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদ বড়লাটকে এক তার করিয়া জানাইয়াছেন—সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে এখনও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় নাই এবং সকল কংগ্রেস কর্ম্মীকে এখনও মুক্তি দান করা হয় নাই। এ অবস্থায় নির্ব্বাচনের আয়োজন আরম্ভ করায় কংগ্রেসের পক্ষে নির্ব্বাচন পরিচালন করা বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে। গভর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রত্যাহার করিতেছেন বটে, কিন্তু বহু বিনাবিচারে আটক নিরাপত্তা-বন্দীকে এখনও মুক্তি দানের ব্যবস্থা করা হয় নাই। কবে যে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিবেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা মুক্তিলাভ করিবেন কিনা, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক দলকে নির্ব্বাচনে যোগদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখাই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

দিল্লীতে হিন্দুমহাসভা—

হিন্দুমহাসভার নিখিল ভারত কমিটীর অধিবেশন গত ১৮ই ও ১৯শে আগষ্ট দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বহু প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বাঙ্গালায় ৯৩ ধারার অবসান দাবী করা হয়, 'সত্যার্থ-প্রকাশ' বন্ধের বিরুদ্ধে আর্য্য সমাজ কোন আন্দোলন করিলে তাহাকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যুদ্ধের পর দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইবে ভাবিয়া তাহাদের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সেপ্টেম্বর মাসেই হিন্দুমহাসভার পক্ষ হইতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করার আশ্বাস দিয়াছেন।

কণ্ট্রোল এখন থাকিবে—

যুদ্ধের সময় এ দেশে সকল জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির ফলে গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোল করিয়া দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। তাহাতে ফল ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহা এখন আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। সে বিষয়ে আমাদের যে বহু নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র এখনও লোক বুঝিয়া থাকে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর কণ্ট্রোল প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে কি না, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইত বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার-জেনারেল শ্রীযুক্ত সি সি দেশাই জানাইয়াছেন—চাহিদা ও সরবরাহে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টা ফলবতী হইলে ক্রমে কণ্ট্রোলপ্রথা তুলিয়া দিয়া সাধারণ অবস্থা ফিরাইয়া আনা হইবে। কিন্তু কবে তাহা করা হইবে তাহা বলা হয় নাই। কণ্ট্রোল প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে একদল লোক লাভবান হইয়াছে—তাহারা উহা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে। কাজেই এ বিষয়ে বারবার গভর্ণমেণ্টকে অবহিত করাও প্রয়োজন।

কুচবিহার কলেজে হাঙ্গামা—

গত ২১শে আগষ্ট সকালে কুচবিহার কলেজের এলাকার মধ্যে পথের উপর দুইখানি সাইকেলে সংঘর্ষ হয়—একখানিতে ২ জন সৈনিক ও অপরখানিতে একজন সহর-বাসী যাইতেছিলেন। সৈনিকদ্বয় সহরবাসীটিকে প্রহার করিলে কলেজের ছাত্রগণ তথায় যাইয়া উপস্থিত হয় ও সৈনিকদের সাইকেলখানি কাড়িয়া লইয়া পুলিসে জমা দিবার ব্যবস্থা করে। তাহার পর সৈনিকদ্বয় চলিয়া যায় ও একদল সৈনিক সঙ্গে আনিয়া ছাত্রদের উপর মারপিট আরম্ভ করে। তাহার ফলে ৪৫ জন ছাত্র ও ২ ছাত্রী সাংঘাতিক আহত হইয়া স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরিত হয়। প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপক আহত হইয়াছেন। গবেষণাগারের বহু আসবাবপত্র নষ্ট করা হইয়াছে। সৈন্যগণ কলেজ গৃহ, স্কুল গৃহ ও ছাত্রাবাস সর্ব্বত্র প্রবেশ করিয়া শুধু মারপিট করে নাই, জিনিষপত্র তছনছ করিয়াছে। ঘটনাটি এমনই মর্ম্মন্তুদ যে এ বিষয়ে মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সভা হইতেছে এবং ছাত্রগণ একদিন হরতাল করিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অপরাধীদের শাস্তির বিধান অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ভারত-রক্ষা-আইন—

যুদ্ধের সময় অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় ভারত রক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কাজেই তাহা আর থাকা উচিত নহে। আইনেও আছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণার পর ঐ আইন আর ৬ মাসের অধিক বলবৎ রাখা চলিবে না। কিন্তু দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আরও এক বৎসর পরে গভর্ণমেণ্ট স্বাভাবিক অবস্থা প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ ঘোষণা করিবেন—কাজেই ঐ আইন আরও ১৮ মাসকাল থাকিবে। কিন্তু ঐ আইনের বিধিনিষেধগুলি ততদিন বজায় রাখিয়া আমাদের সাধারণ জীবনযাপনে বাধা দান করা হইবে কি ?

কলিকাতা এলাকায় কাপড় সরবরাহ—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতা এলাকায় কাপড় সরবরাহ আরম্ভ হইবে। ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে খাদ্য-রেশনের দোকান হইতে সে জন্য কুপন বিলি করা হইবে। শেষ পর্য্যন্ত পূজার পূর্ব্বে সকলেই কাপড় পাইবেন কি না তাহা জানা যায় নাই। পূজা ও ঈদ বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব—তাহাতে যদি বাঙ্গালী নূতন কাপড় পরিতে না পায়, তবে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণ হইবে। আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে সে কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

দামোদর পরিকল্পনার ব্যয়—

দামোদর নদের বন্যা নিবারণ করিয়া ঐ জল নানা-ভাবে জনহিতকর উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের সহযোগিতায় গভর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা ও বিহার গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইবেন।

বাঙ্গালার দুর্গতি—

এবার বন্যায় বাঙ্গালা দেশের ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগ বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়াছে। ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলার অধিকাংশ স্থানের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় অতি বৃষ্টির ফলে শস্য নষ্ট হইয়াছে। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি জেলায় বৃষ্টির অভাবে ধানের গাছ মাঠে শুকাইয়া যাইতেছে, ইহার কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা নাই। লোক ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের পর এখনও নিজেদের শরীর ঠিক করিতে পারে নাই—তাহার উপর এই ব্যাপক বন্যা যে সকল লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করিল, তাহাদের রক্ষা করা সুকঠিন হইবে সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট চাউল অধিক আছে বলিয়া বিদেশে চাউল পাঠাইয়া দিতেছেন, আর বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার বহু স্থানের বাজারে এখনই দারুণ ভাবে চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে। অধিকাংশ লোকই বর্ত্তমানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, কাজেই এই বিপন্নদিগকে কে সাহায্য দান করিবে। এই সকল অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালায় শতকরা ৩০ ভাগ ধানও উৎপন্ন হইবে না এবং তাহার ফলে শীঘ্রই আবার এ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। এখন হইতে গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে অবহিত হইয়া আবশ্যক ব্যবস্থায় মন দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। নচেৎ সরকারী অব্যবস্থার ফলে ১৩৫০ সালে আমাদের যে অবস্থা হইয়াছিল, আবার তাহারই পুনরাভিনয় হইবে।

মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসি—

মুঙ্গের জেলার পিপরা গ্রাম নিবাসী মহেন্দ্র চৌধুরী ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হন। গত ৭ই আগষ্ট ভোরে ভাগলপুরে তাঁহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ফাঁসি স্থগিত রাখিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের সকল রাজনীতিক নেতা সম্রাট হইতে বড়লাট পর্য্যন্ত সকলকে বার বার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বংশীবিলাস মুখোপাধ্যায়—

বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুরের নিকটস্থ নড়িয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত দয়াময় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান বংশীবিলাস মুখোপাধ্যায় ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি মেডিসিন

শ্রীবংশীবিলাস মুখোপাধ্যায়

ও গাইনোকলজিতে প্রথম হন ও সর্ব্বাধিক মোট-নম্বর পান। গত কনভোকেসনে সে জন্য তিনি ২টি স্বর্ণপদক ও ৫টি রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। কারমাইকেল কলেজ হইতে অস্ত্রোপচার বিদ্যায় প্রথম হওয়ায় তিনি আরও একটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক পাইবেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ সাফল্যমণ্ডিত জীবন কামনা করি।

৯৩ ধারা স্থায়ী করার ব্যবস্থা—

বাঙ্গালার গভর্ণর গত ১৮ই আগষ্ট হইতে বাঙ্গালা দেশে ৯৩ ধারার শাসন স্থায়ী করিবার জন্য নিম্নলিখিত ৫ জন সিভিলিয়ান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর বিভিন্ন বিভাগের শাসন ভার প্রদান করিয়াছেন—(১) মিঃ এইচ-এস-ই-ষ্টিভেন্স (২) মিঃ এ-ডি-সি-উইলিয়ম্‌স (৩) মিঃ এজ-আর- থাকাস (৪) মিঃ ও-এম-মার্টিন ও (৫) মিঃ আর-এল-ওয়াকার। গত সাড়ে ৪ মাস কাল গভর্ণর পরামর্শদাতা নিযুক্ত না করিয়া নিজেই শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ভারতীয়গণের প্রতি শাসন কর্ত্তাদের মনোভাব কিরূপ তাহা এই ৫ জন সিভিলিয়ান নির্ব্বাচন হইতেও বুঝা যায়। একজনও দেশীয় সিভিলিয়ানকে বিশ্বাস করিয়া পরামর্শদাতার পদ দেওয়া হয় নাই।

শরৎচন্দ্রের মুক্তির দাবী—

রাজবন্দী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এখন বন্দীনিবাসে অসুস্থ হইয়া আছেন। তাঁহাকে মুক্তি দিবার দাবী করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র সভাসমিতি হইতেছে এবং সকল স্থানের সকল দলের নেতারা আবেদন জানাইয়াছেন। গত ১৭ই আগষ্ট লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মিলনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, শরৎচন্দ্রকে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই, সে জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর তাঁহার মুক্তির জন্য আন্দোলন করা উচিত।

অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায়চৌধুরী 'ঘোষ ট্রাভেলি' ফেলোসিপ' পাইয়া মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করিতে গিয়াছিলেন; মিশরে তিনি প্রাচীনতম সংস্কৃতি কেন্দ্র আল-আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি মিশর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যসংস্কৃতির অধ্যাপক

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

নিযুক্ত হন। তিনি আরব সংস্কৃতি গবেষণা উপলক্ষে প্যালেষ্টাইন, লেবানন, সিরিয়া, তুরস্ক-সীমান্ত ও উত্তর আরব ভ্রমণ করেন। তিনি সিরিয়ার মরুভূমি ও সুদানের প্রান্তদেশ পর্য্যটন করেন। তিনি তাঁহার

অভিজ্ঞতা লিখিতেছেন। তাহা আগামী মাস হইতে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার ঘোষ—

খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী মিঃ এস-কে-ঘোষ এম-এ (ক্যাণ্টাব) সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

অতিরিক্ত সহকারী ডিরেকটার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য তাঁহাকে চাকরী জীবনে সাফল্য লাভে সমর্থ করিয়াছে দেখিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ সকলেই আনন্দিত হইবেন।

প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব—

মধ্য প্রদেশের অষ্টি ও চিমুর থানায় ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৭ জনের উপর প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের ফাঁসি বন্ধ করিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হয় এবং তাহার ফলে গত ১৫ই আগষ্ট বড়লাট তাঁহাদের প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা হওয়ায় দেশবাসীমাত্রই স্বস্তি বোধ করিবেন।

ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী—

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবার পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ বিধির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি নিম্নতম শ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে সকল পরীক্ষায় বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিয়া শাস্ত্রী উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি গত ২২ বৎসর কাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন।

দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডার—

উত্তর কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের নাম ও কার্য্য বর্ত্তমানে সর্ব্বজনবিদিত। গত দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে ভাণ্ডারের কর্ম্মীবৃন্দের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে। গত ১৮ই আগষ্ট ভাণ্ডারের বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত উহার সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায়চৌধুরী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গুপ্ত প্রভৃতি ৪ জন সহ-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভাণ্ডারের পুরাতন বাটীর পার্শ্বের নূতন জমীতে নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইবে। ভাণ্ডার বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মা নিবারণের ও চিকিৎসার জন্য যাহা করিতেছেন তাহা অনন্যসাধারণ বলা যায়। আমাদের বিশ্বাস, ভাণ্ডারের কার্য্যে সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হইবে না।

সুভাষচন্দ্রের গৃহ বিক্রয়—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর এলগিন রোডস্থ গৃহ বাঙ্গালা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। ঐ গৃহ নীলামে বিক্রয় করিবার জন্য ২বার চেষ্টা হইয়াছে—ঐ গৃহে সুভাষচন্দ্রের ৩ ভ্রাতার যে অংশ আছে, তাহাও তাঁহারা বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু উভয় দিনই কোন ক্রেতা পাওয়া যায় নাই। এ সংবাদ সম্বন্ধে কোন কথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

বাঙ্গালীর দুর্দ্দশার বিবরণ—

বাঙ্গালার সম্মিলিত দলের নেতা মৌলবী এ-কে-ফজলল হক গত ১৮ই আগষ্ট এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার দুর্দ্দশার বিষয়ে সকলকে অবহিত করিয়াছেন। ভারত সরকারের খাদ্যসদস্য স্যার জাওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন যে বাঙ্গালায় ২ কোটি মণ চাল জমিয়া আছে। মিঃ হক ঐ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় এত অধিক চাউল থাকা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট লোককে ১৫ টাকার কমে চাল দেন না। ইহার সার্থকতা বুঝা যায় না। বাঙ্গালায় খাদ্য দ্রব্যের

মূল্য ৫ গুণ বাড়িয়াছে। বাজারে মাছের সের ৪ টাকা হইতে ৮ টাকা, মাংসের সের ৩ টাকা হইতে ৪ টাকা, ডিমের ডজন ২ টাকা, দুধ ত পাওয়াই যায় না, পাওয়া গেলে এক টাকায় এক সের। এই অবস্থায় লোক অর্দ্ধাহারে ও কদাহারে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কি ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারেন না? ২নং ১৫ টাকা ও ৩নং ১০ টাকা মণ। ২নং চাউলই অধিকাংশ লোক ব্যবহার করিয়া থাকে—৩নং চাউলকে অখাদ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি ২নং চাউলের দাম ১৬৷০ মণের স্থলে ১৫ টাকা মণ করা হইয়াছে। বাড়িবার সময় ৩ টাকা মণের চাল ১৬৷০ হইয়াছিল—আর কমিবার সময় সেরে মাত্র ২ পয়সা কমান হইল।

দেড়লক্ষ টাকা মূল্যের গৃহদান—

কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনিষ্টিটিউট অফ কালচারের নাম সর্ব্বজন পরিচিত। ঐ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গৃহ না থাকায় বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। সম্প্রতি কর্ণেল ডি-এন ভাদুড়ী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী তাঁহার একমাত্র স্বর্গত পুত্র দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতা ১১১নং রসা রোডের সুবৃহৎ চারিতল বাড়ীটি মিশনকে ইনিষ্টিটিউটের জন্য দান করিয়াছেন। বাড়ীটির মূল্য দেড়লক্ষ টাকারও অধিক। দেবেন্দ্রনাথ মাতার সহিত ইংলণ্ডে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করেন—লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি-এস্‌সি পাশ করার পর গবেষণাগারে হঠাৎ বৈদ্যুতিক শক্তিতে তাঁহার জীবনান্ত হয়। ১৯৩৮ সালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এই ইনিষ্টিটিউট স্থাপিত হয়। ইনিষ্টিটিউটে বর্ত্তমানে সাপ্তাহিক বক্তৃতা, প্রাত্যহিক আলোচনা সভা এবং গ্রন্থাগার, কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস ও একটি চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে। ১৯৪১ সালে স্বর্গত খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরাট গ্রন্থ-সংগ্রহ ইনিষ্টিটিউট পাইয়াছেন। পরে আরও অনেকে বহু গ্রন্থ দান করিয়াছেন। যাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, আমরা তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

পুত্র ৺দেবেন্দ্রনাথ ও পত্নী হিমাংশুবালাসহ কর্ণেল ডি-এন-ভাদুড়ী

চাউলের মূল্য হ্রাস—

গভর্ণমেণ্ট এখন রেশনের দোকান মারফত ৩ প্রকার চাউল বিক্রয় করিতেছেন—১নং চাউল ২৫ টাকা মণ,

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি তর্পণ—

গত ৭ই আগষ্ট ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার প্রায় প্রতি গ্রামে ও সহরে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসি ও তাঁহার পত্নী রবীন্দ্রনাথের জোড়া-সাঁকোর গৃহে যাইয়া যে ঘরে রবীন্দ্রনাথ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তথায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে অর্থ ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, তাহাতে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার সে ভার গ্রহণ করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি বহু অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই মোট ১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এবার রবীন্দ্র মৃত্যু-তিথিতে লোক শুধু বাচনিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন নাই, প্রায় প্রত্যেকে স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থ দান করিয়া নিজেদের ধন্য করিয়াছেন।

শোক সংবাদ

পরলোকে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার—

ভারত গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব আইন সদস্য, কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আইনজ্ঞ পণ্ডিত স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার গত ২৭শে শ্রাবণ ৬৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় তাঁহার এলগিন রোডস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। সার নৃপেন্দ্রনাথের কর্ম্মবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান সহজসাধ্য নহে। তিনি রাজনীতিতে মডারেট হইলেও সারাজীবন বহু সৎকার্য্যের সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তিনি যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনই তাহার সদ্ব্যয় করিতেন। তাঁহার দানের কথা বহুলোকবিদিত। নৃপেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ প্যারীচরণ সরকার খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং পিতা নগেন্দ্রনাথ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে কাজ করিতেন। ১৩ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ১৮৯৪ সালে তিনি ডবল অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন ও রসায়নশাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া দ্বিতীয় হন। ১৮৯৭ সালে তিনি বি-এল পাশ করেন ও ১৮৯৬ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। প্রথম জীবনে তিনি ৫ বৎসর ভাগলপুরে ওকালতী করিয়াছিলেন—পরে মুন্সেফের চাকরী লইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। ১৯০৫ সালে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বিলাত গমন করেন ও ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ৫০ গিনি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন—অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৮ সালে তিনি বাঙ্গালার এডভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত হন ও ১৯৩১ সালে সার উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তাঁহাকে কে-সি-এস-আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি শেষ জীবনে 'হিন্দুস্থান কোয়ার্টার্লি' পত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করিতেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার লেখা পাঠ করিত। ১৯৩২ সালে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনে তিনি বাঙ্গালার হিন্দুদের প্রতিনিধিরূপে গমন করেন। 'ভারতীয় শাসন' ব্যবস্থা সম্পর্কিত জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীতেও তিনি প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সাল হইতে ৫ বৎসরকাল তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন সদস্য ছিলেন। সে সময়ে তিনি 'কোম্পানীর আইন' ও 'বীমা আইন' নূতন করিয়া বিধিবদ্ধ করেন। তিনি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ব্যবস্থা পরিষদে সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। তিনি কিছুকাল শাসন পরিষদের সহ-সভাপতি ও ব্যবস্থা পরিষদের নেতা ছিলেন। ১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর সহিত দিল্লীতে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও উভয়ে প্রত্যেকের প্রতি আকৃষ্ট হন। সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতেন। তিনি আর কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টাররূপে যোগদান করেন নাই বটে, কিন্তু মামলা লইয়া অন্যান্য প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে গমন করিতেন। রেওয়া তদন্ত কমিটীতেও তিনি পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতার খেলা-ধুলা ও অন্যান্য বহু সামাজিক ব্যাপারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন। সে জন্য তাঁহাকে বহু সময় ব্যয় করিতে হইত। যে কোন বিবাদ বিরোধ মিটমাটের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তখনই সে সকল সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইতেন ও সকলের মন সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মিঃ আর-এন ব্যারিষ্টার, মিঃ বি-এন নিউ থিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডিরেকটার, মিঃ এস-এন ছোটনাগপুর মাইকা কারখানার ডিরেকটার ও মিঃ ডি-এন 'অলকা' পত্রের সম্পাদক। সার নৃপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

সরলা দেবী চৌধুরাণী—

খ্যাতনামা লেখিকা ও রাজনীতিক নেত্রী সরলা দেবী গত ১৮ই আগষ্ট শনিবার কলিকাতা আলিপুরে তাঁহার একমাত্র পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীমান্ দীপক চৌধুরীর গৃহে ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভগিনী খ্যাতনামা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে ১৮৭২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতা জানকীনাথ ঘোষাল কংগ্রেসের প্রথম যুগে
উহার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ৎসর
বয়সে বি-এ পাশ করেন ও সেই ১কর
অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। কাল
'ভারতী' মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ যুগে
তিনি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশে স্বদেশী জিনিষ প্রচারের চেষ্টা করেন। ১৯০৫ সালে পাঞ্জাবের জমীদার পণ্ডিত রামভূজ দত্ত চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ঐ সময় হইতে তিনি ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করিয়া স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে মন দেন। লাহোরে তিনি স্বামীর সহিত 'হিন্দুস্থান' নামক একখানি উর্দ্দু সাপ্তাহিক পত্র চালাইতেন। পরে উহা ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। জালিয়ানওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁহার স্বামী নির্ব্বাসিত হন—সে সময়ে সরলা দেবীর পত্র পাইয়াই রবীন্দ্রনাথ 'সার' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে তিনি সভানেত্রী হইয়াছিলেন ও এলাহাবাদে উক্ত সম্মিলনের সঙ্গীত শাখায় সভানেত্রীত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার 'ভারতীয় সাংবাদিক সমিতি'র সভানেত্রী ছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক আছে। সম্প্রতি তাঁহার আত্মজীবনী 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল।

সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

২৪ পরগণা পাণিহাটী নিবাসী সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে মীরাটে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা [illegible]চরণ কলিকাতা কালীঘাট হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯০৫ সালে সরকারী চাকরী লইয়া সুধীরচন্দ্র ১৯১৪ সালে সরকারী কার্য্যে বিদেশে যান এবং প্যারী, রোম, লণ্ডন প্রভৃতি ঘুরিয়া ১৯১৭ সালে দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৯২৭ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর পাণিহাটী গ্রামের মঙ্গলজনক বহু কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪৩ সাল হইতে তিনি মীরাটে পুত্রদের নিকট বাস করিতেছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্যাপ্‌টেন অমরেন্দ্রনাথ সামরিক বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত।

চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়—

কাশী প্রবাসী খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী পণ্ডিত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৫শে জুলাই ৮৪ বৎসর বয়সে

চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়

কাশীধামে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। ১৮৮৪ সালে বি-এ পাশ করিয়া তিনি শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন ও গত ৬০ বৎসরকাল ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিই কাশী এংলো বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। আমরা গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে তাঁহার লিখিত 'গীতার কথা' প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। চিরকুমার ও দেবচরিত্র ছিলেন।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল ঃ

ফুটবল খেলায় যে পরিমাণ উত্তেজনা দর্শকদের মধ্যে [illegible] সে পরিমাণ অন্য কোন খেলায় দর্শকেরা অনুভব [illegible] আমাদের দেশেও এ উত্তেজনার অভাব নেই। [illegible] অনেকের মুখে ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড [illegible] খেলার উত্তেজনার ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু [illegible] এ কাপে ডালউইচ হ্যামলেট বনাম সেন্ট এ্যালবান্সের ফুটবল খেলাটি যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা পাওয়া এক রকম দুর্লভ। এই একটি খেলার গোল সংখ্যা রেকর্ড হয়ে আছে এবং ব্যক্তিগত গোলদাতা হিসাবে সেন্ট এ্যালবান্সের সেন্টার ফরওয়ার্ড ডবলউ মিন্টারের নাম [illegible] এ কাপের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই [illegible] কি ভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তারই খবর [illegible] প্রথম দিন ৩-৩ গোলে খেলাটি ড্র হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলাটিও ড্র হ'ল ৫-৫ গোলে। তৃতীয় দিনের খেলাতে ডালউইচ হ্যামলেট দল ৮-৭ গোলে জয়ী হ'ল। এই শেষ খেলায় বিশ্রাম সময়ের ফলাফল ৩-৩। নির্দিষ্ট সময়ে খেলাটি ৬-৬ গোলে শেষ হ'ল। অতিরিক্ত সময়ে ফলাফল দাঁড়াল ৮-৭। সব থেকে মজার ব্যাপার, সেন্ট এ্যালবান্সের সেন্টার ফরওয়ার্ড ডবলউ মিন্টার একাই দলের হয়ে প্রথম খেলায় তিন গোল, দ্বিতীয় খেলায় পাঁচ গোল এবং শেষ খেলায় সাত গোল দেন।

* * * *

এফ এ কাপ ফাইনাল উইনিং মেডেল সব থেকে বেশী পেয়েছেন জে বস্তে (ব্ল্যাকবার্ণ রোভার্স), লর্ড কিনার্ড [illegible]), এ কিন্নায়ার্ড (ওণ্ডারার্স) এবং সি আরবাথনট (ঐ)। এই চারজনেই পাঁচবার এফ এ কাপ উইনিং মেডেল পেয়েছেন।

* * * *

ওল্ডহাম দলের ব্যাক ডেভিড উইলসন পর্য্যায়ক্রমে ছ'টি ফুটবল মরসুমে ২৬৪টি খেলায় যোগদান করে রেকর্ড করেছেন। ব্রিষ্টল রোভার্সের গোলরক্ষক জে হোয়াটলি ১৯২২-২৮ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে ৬টি ফুটবল মরসুমে দলের হয়ে খেলেছিলেন, কোন খেলাতেই অনুপস্থিত ছিলেন না। ১৯২৮ সালের ১৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি মোট ২৪৬টি খেলায় যোগ দিয়েছিলেন।

* * * *

আমাদের দেশে বি এণ্ড এ রেলদলের সামাদ ১৯১২-৪২ জো গ্যালব্রেথ ১৯০৮-৩১ এবং মোহনবাগান ক্লাবের জি পাল ১৯১২-৩৫ সাল পর্য্যন্ত ফুটবল খেলেছিলেন। তবে সেটা খেলা অবিরাম নয়, মাঝে মাঝে খেলার মাঠে তাঁদের দেখা যায়নি।

* * * *

ইংলিস ফুটবল খেলায় প্রেসটন নর্থের রেকর্ড উল্লেখযোগ্য। এই দলটি কোন পয়েন্ট না হারিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় এবং কোন গোল না খেয়ে এফ এ কাপ বিজয়ী হয়।

ক্যালকাটা ফুটবল খেলায় রয়েল আইরিশ দলেরও অনুরূপ রেকর্ড আছে। ১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ দল লীগের কোন খেলায় না হেরে, কোন গোল না খেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। এ ছাড়া ঐ বছরই একটাও গোল না খেয়ে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়। তাদের এ রেকর্ড আজও কোন দল ভাঙতে পারে নি।

* * * *